পৌরাণিক অভিধান

REFERENCE

সুধীরচন্দ্র সরকার
সংকলিত

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪. বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট. কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৩

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৬৫

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

বেদ, উপনিষদ, সংহিতা
মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ,
উপপুরাণ ইত্যাদি হতে
সংগৃহিত বিবিধ বিবরণ।

প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় পৌরাণিক জ্ঞান সংগ্রহের কোনো বই এ পর্যন্ত ছিল না। দেবদেবীর কথা, প্রাচীন ভৌগলিক তথ্য, ধর্ম পুস্তকের বিবরণ, পুরাতত্ত্ব, ঐতিহ্য, প্রাচীন সংস্কৃতির কথা, বিবিধ আখ্যান, জীবতত্ত্ব ইত্যাদির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ পর্যন্ত সমগ্র ভাবে একখানা পুস্তকের মধ্যে আমরা পাই নি। স্বর্গীয় শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 'জীবনী-কোষ' এবিষয়ে একমাত্র পথ-প্রদর্শক ছিল। বাংলা অভিধানে কিছু কিছু পৌরাণিক বিবরণ ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে বটে কিন্তু তা যৎসামান্য ও তথ্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর। এই ধরণের একটা অভিধানের অভাব আমরা অনেক দিন থেকেই অনুভব করেছি। আশা করেছিলাম আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এই কাজে হস্তক্ষেপ করে এই বিশেষ অভাব দূর করবেন। প্রায় সাত আট বৎসর আগে এই দুরূহ কাজে আমি হস্তক্ষেপ করি, এবং তারই ফলস্বরূপ এই 'পৌরাণিক অভিধান'।

ইংরাজী ভাষায় Classical কিংবা Mythological Dictionary-র অভাব নাই। এই ধরণের অভিধানকে আদর্শ করে আমি এই 'পৌরাণিক অভিধান' লিখেছি। এই ধরণের ইংরাজী অভিধানে সাধারণতঃ গ্রীক, রোমান, মিশরীয়, নর্স ইত্যাদির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী এতে একেবারে থাকে না, থাকলেও দু'চারটি নামের বেশী নয়। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর তুলনায় এই পাশ্চাত্য পৌরাণিক কাহিনী সংখ্যায় অনেক কম। আমাদের সমগ্র পৌরাণিক কাহিনী সংগ্রহ করলে, রোমান, গ্রীক ও অন্যান্য পাশ্চাত্য কাহিনী থেকে দশ বারো গুণেরও যে বেশী হবে তাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় পৌরাণিক কাহিনী ও আমাদের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই—আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে এই পাশ্চাত্য কাহিনীর কোনো যোগাযোগ নাই, কেবল প্রাচীন গল্প হিসাবেই এর এখন মূল্য আছে। আর

আমাদের পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে প্রাণবন্ত। আমাদের দৈনন্দিন ধর্ম, সমাজ, কাজ ইত্যাদির সঙ্গে এর চিরকালের সুদীর্ঘ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। প্রাচীনের দেবদেবী আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে আন্তরিক স্থান অধিকার করে আছে। তাছাড়া তুলনা করে দেখলে আমাদের পৌরাণিক কাহিনী বিচিত্রতায় ও চারিত্রিক উৎকর্ষে বৈদেশিক পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে অনেক উচ্চতর।

এই পুস্তকের নাম 'পৌরাণিক অভিধান' রাখা হলেও কেউ যেন মনে না করেন এতে কেবল অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের কথাই আছে। বেদ্, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সমস্ত পুরাণ, সংহিতা, সমস্ত প্রাচীন চরিত্র, কাহিনী ও ঘটনার সমাবেশ এই পুস্তকে আছে, তাছাড়া মানুষ, দেবতা, ঋষি, রক্ষ, যক্ষ, অপ্সরা, গন্ধর্ব, কিন্নরগণ ইত্যাদি সকলেরই যথাযথ বিবরণ এই পৌরাণিক কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অনেক চরিত্র বা বেদে প্রথম সূচিত হয়ে পরে রামায়ণ, মহাভারতের ভিতর দিয়ে পুরাণে এসে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিবরণ এতে পাওয়া যায়। বেদে বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মিত্রাবরুণ, অশ্বিনী, উষা, মরুৎ, সূর্য, অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি মহাভারতের যুগে এবং পৌরাণিক যুগে পরিবর্তিত হয়ে কিরূপ আকার ধারণ করেছে তা এই সব দেবতার বিবরণে বর্ণিত হয়েছে। রূপকের সাহায্যে যে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে, তাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অভিধানকে সাধারণ অভিধানের সমগোত্র মনে করলে হয়তো ভুল করা হবে। অভিধানের মতো পর্যায়ক্রমে অক্ষর অনুসারে বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করে সাজানো হলেও, মূলতঃ দুইয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে, মহাকাব্যে, পুরাণে, বেদে ও অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ের বিরাট সমাবেশ পাওয়া যায়, তারই একটা সুসংবদ্ধ সংগ্রহ-গ্রন্থ এই বইকে বলা যেতে পারে। সাধারণ পাঠক গল্পের মতো পরপর এই কাহিনীগুলি পড়ে গেলে কেবল গল্প পড়ার আনন্দ ও পরিতৃপ্তিই যে লাভ করবেন তা নয়, আমাদের প্রাচীন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, ভূগোল, পরলোক, প্রাণিতত্ত্ব, কৃষিকার্য, পশুপালন, যজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম, পূজা-প্রকরণ, বিবাহ প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনায়াসে জ্ঞানলাভে সমর্থ হবেন। তাছাড়া,

এমন অসংখ্য ও বিচিত্র কাহিনী পৃথিবীর কোন ভাষার পুরাণে সংগৃহীত হয়েছে কি ?

পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনীগুলি এতই বিচিত্র, অসংখ্য এবং এতই বিভিন্ন যে, সে সমস্তকে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে আনয়ন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। একই চরিত্র, বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে প্রকটিত হয়েছে। আবার তাদের ঘটনার মধ্যেও আছে বিভিন্নতা। বেদে যে চরিত্র বা কাহিনী আছে তা বিভিন্ন পুরাণের মধ্য দিয়ে এসে অন্য ভাবে চিত্রিত হয়েছে। সেই জন্য অনেক স্থলে বেদের দেবতা ও দেবীরা পুরাণে এসে যখন দেখা দিয়েছেন তখন তাঁদের রূপ অন্য। অন্য রূপ বা অন্য কাহিনী সম্বলিত নয়—হয়তো অনেক স্থলে দেবতা বা দেবী হিসাবে তাদের স্থান উচ্চ বা নীচ হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে যতই বিভিন্নতা ও অসংলগ্নতা থাকুক, আমি এই কাহিনীগুলিকে এমন সুসংবদ্ধ ভাবে গ্রথিত করতে চেষ্টা করেছি, যে সেগুলি খাপছাড়া বা অসংলগ্ন বলে হয়তো মনে হবে না।

বর্ত্তমানকালে বাংলা সাহিত্যে (পাঠে ও আলোচনায়) এই ধরণের একটা অভিধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের বিভিন্ন কাব্যে, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে, এই সব পৌরাণিক তথ্য বা কাহিনীর প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সব কাব্য বা সাহিত্য বুঝতে হলে পৌরাণিক বিষয়ে জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' পাঠোদ্ধারে পৌরাণিক জ্ঞান আবশ্যক। এই অভিধান সে কার্যে বিশেষ সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁর অনেক কবিতা পুরাণ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃত উক্তিতে পরিপূর্ণ।

এই ধরণের অভিধান সংকলনে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা আছে। সেইরূপ কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি এই পুস্তকে এসে গিয়েছে। এই জন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পাঠক-পাঠিকারা পত্রদ্বারা যদি আমার ভ্রম-প্রমাদগুলি দেখিয়ে দেন এবং এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে তাঁদের মতামত প্রদান করেন, তাহলে এর পরবর্তী সংস্করণ অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ও সুসংস্কৃত রূপ ধারণ করতে পারে।

এই পুস্তক প্রণয়নে অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমি নানা প্রকার সাহায্য পেয়েছি। বাণীকুমার, বিশু মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ধ্রুবজ্যোতি সেন মহাশয়রা এই গ্রন্থ-সম্পাদনে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন।

বিশু মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকে নাম-সূচী প্রস্তুত করে দিয়েছেন এবং ধ্রুবজ্যোতি সেন পুস্তক সংলগ্ন ছবিগুলি এঁকে দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।
সুলেখা সরকার ও শ্রীঅণিমা সরকার এই গ্রন্থ-সম্পাদন বিষয়ে আমাকে নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৬৫

সুধীরচন্দ্র সরকার

ইন্দ্রানী

(জাজপুর)

বিষ্ণু

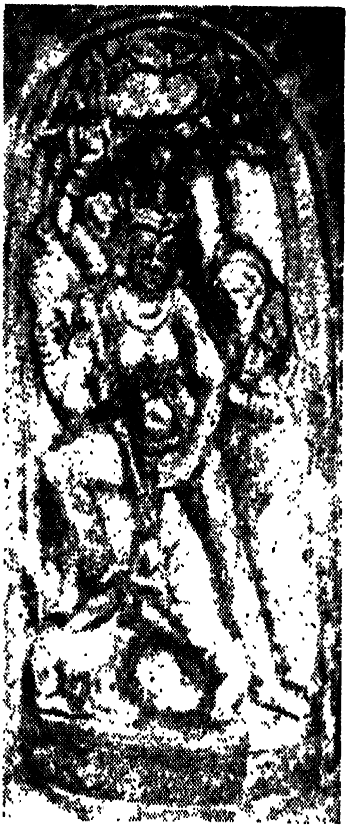

দুর্গা

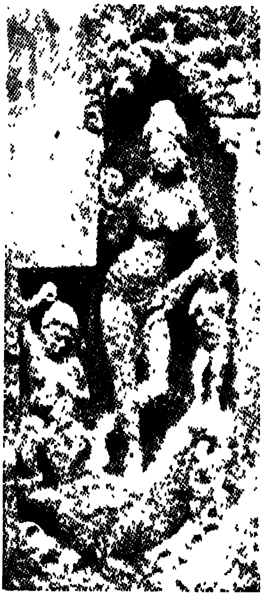

গঙ্গা

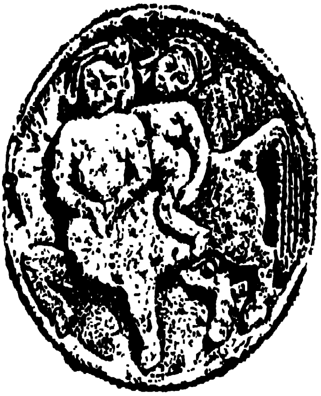

কিম্পুরুষ

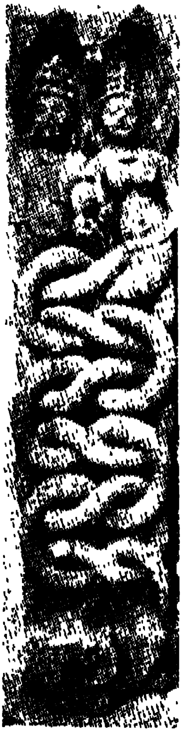

দুইনাগ

শিব ও পার্বতী

উড়ন্ত বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী

উড়ন্ত বিদ্যাধর – বীরুপাক্ষ মন্দির
(৭৪০ শতাব্দী)

যক্ষী

সুর

ঋষি

নাগিনী

(মহাবলীপুরমের গঙ্গাবতরণ হতে)

মহিষমর্দিনী

রাহু

গন্ধর্ব

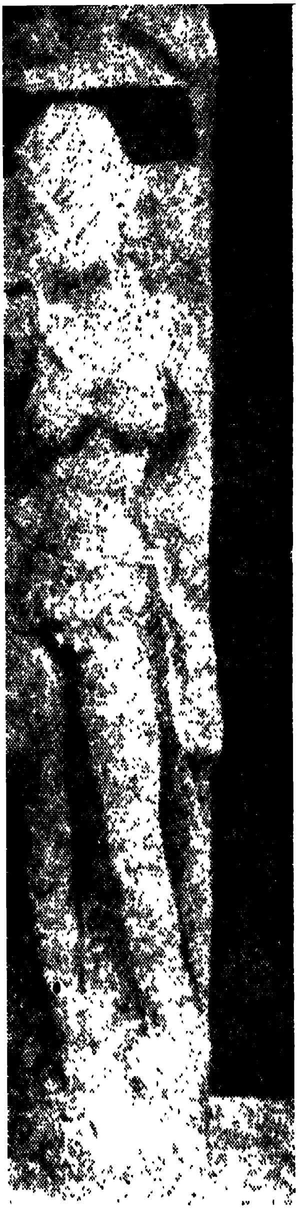

া—মথুরা মিউজিয়াম

ীয় শতাব্দী বা পরে

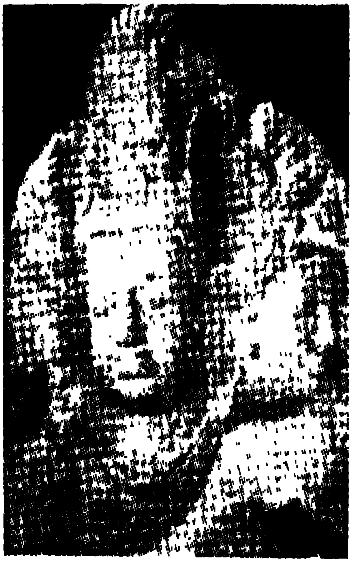

ত্রিমূর্তি

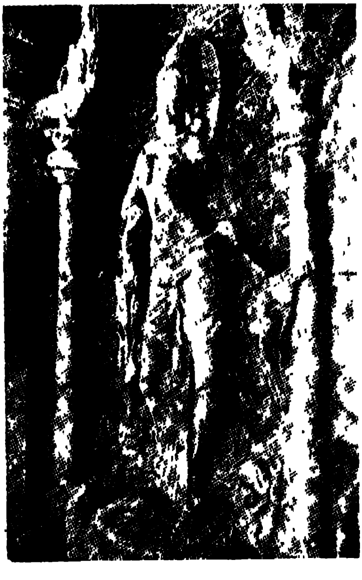

যমুনা

পৌরাণিক অভিধান

অ

অংশ—কশ্যপ মুনির পুত্র। অদিতির গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। আদিত্যরা চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে খ্যাত ছিলেন, পরে বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণুপুরাণ)

অংশুমান্—সূর্যবংশীয় সগর রাজার পৌত্র ও অসমঞ্জের পুত্র। সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করে ধ্যানমগ্ন মহর্ষি কপিলের আশ্রমে রেখে যান। সগর রাজার ৬০ হাজার পুত্র অপহৃত যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে কপিলের আশ্রমে এসে কপিলকে অশ্বচোর মনে করে নানারূপ লাঞ্ছনা করলে কপিলের যোগানলে ভস্মীভূত হয়। পুত্ররা প্রত্যাবর্তন করছে না দেখে সগর নিজের পৌত্র অংশুমানকে তাদের খোঁজে পাঠান। ইনি পাতালে গিয়ে স্তবস্তুতিতে মুনিকে সন্তুষ্ট করে অশ্ব ফিরিয়ে এনে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন এবং মুনির কাছ হতে জানতে পারেন যে, গঙ্গাকে স্বর্গ হতে আনয়ন করে গঙ্গার জলে সগরপুত্রগণের ভস্ম স্পর্শ করাতে পারলে তারা উদ্ধারলাভ করবে। সগরের মৃত্যুর পর অংশুমান রাজা হন। গঙ্গাকে আনবার জন্য ইনি তপস্যায় রত হন; কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ।

অক্রূর—কৃষ্ণের পিতৃব্য। যদুবংশে শ্বফল্কের ঔরসে কাশীরাজ-কন্যা গান্দিনীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইনি কৃষ্ণের পিতৃব্য। উগ্রসেনের এক কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন এবং এঁর দুই পুত্র হয়। অক্রূর এক সময়ে কংসের গৃহে ছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার জন্য কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কংস এই যজ্ঞে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনবার জন্য বৃন্দাবনে অক্রূরকে পাঠান; কিন্তু ইনি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কংসের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দিলেন এবং কংসের অত্যাচার থেকে যাদবদের রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন। পরে কৃষ্ণের হাতে কংসের বিনাশ হয়। কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পিতা সত্রা-

জিতের 'স্যমন্তক' নামে মণি ছিল। এই মণির সাহায্যে প্রত্যহ প্রচুর স্বর্ণ উৎপন্ন হত। শতধন্বা নামে এক ব্যক্তি সত্রাজিতকে হত্যা করে এই মণি হস্তগত করে। স্যমন্তক মণির জন্য কৃষ্ণ শতধন্বাকে উৎপীড়িত করলে সে গোপনে এই মণি অক্রুরকে দিয়ে পলায়ন করে। অতঃপর কৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করেন। এই মণির গুণে অক্রুর ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ অনায়াসে সাধন করতে পারতেন। পাণ্ডবদের সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের যথার্থ মনোভাব জানবার জন্য কৃষ্ণ অক্রুরকে হস্তিনাপুরে দৌত্যকার্যে পাঠিয়েছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসকালে অক্রুরের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অকম্পন—রাবণের সেনাপতি ও মাতুল। পিতা সুমালী ও মাতা কেতুমালী। দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্রের হাতে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও ১৪ হাজার রাক্ষস নিহত হলে অকম্পন রাবণকে এই দুঃসংবাদ দেন। এই সংবাদ পেয়ে রাবণ অত্যন্ত রাগান্বিত হলে অকম্পন রাবণকে বলেন যে, কোন দেবাসুরের এমন শক্তি নাই যে, তারা রামকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। রামকে মোহগ্রস্ত করে সীতাকে হরণ করবার প্ররোচনা ইনি দেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে অকম্পন হনুমান-নিক্ষিপ্ত বৃহৎ বৃক্ষের আঘাতে নিহত হন। এঁর ভগিনী কুম্ভীনসী ও রাবণ-জননী কৈকসী বা নিকষা। ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত এঁর ভ্রাতা।

অগস্ত্য—ইনি বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্‌বেদে কথিত আছে, ইনি মিত্র অর্থাৎ তেজোময় সূর্য ও বরুণের পুত্র। আদিত্য-যজ্ঞে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করেন। সেই কুম্ভে পতিত শুক্র হতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। ভাগবতে অগস্ত্যকে পুলস্ত্যের পুত্র বলা হয়। এঁর অনেক নামের মধ্যে কয়েকটি নাম এইরূপ—ইনি কুম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে নাম হয় কলসীসুত, কুম্ভসম্ভব, ঘটোৎভব, কুম্ভযোনী, মিত্র-বরুণের পুত্র বলে মৈত্রাবরুণি, সমুদ্র পান করেছিলেন বলে পীতাব্ধি, বাতাপিকে বিনাশ করেছিলেন বলে বাতাপিদ্বীট, উর্বশীর জন্য উর্বশীয়, মহাতেজা বলে আগ্নেয়, বিন্ধ্যকে শাসন করেছিলেন বলে বিন্ধ্যকূট, ক্ষুদ্রাকৃতি বলে তাঁর নাম মান। অগস্ত্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি চিরকাল কৃতদার থাকবেন, কিন্তু একদিন ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলেন, তাঁর পিতৃপুরুষরা এক গুহার ভিতর অধোমুখে লম্বমান অবস্থায় অতি কষ্টে ঝুলছেন। জিজ্ঞাসা করে অগস্ত্য জানতে পারলেন, বংশরক্ষা না করলে তাঁদের সদ্গতির কোন আশা নেই। অগস্ত্য আশ্বাস দিলেন যে, পিতৃপুরুষগণের জন্য তিনি

বংশরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তখন তিনি তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বিদর্ভরাজের হাতে পালন করার ভার দিলেন। সেই থেকে এই কন্যার নাম হলো লোপামুদ্রা। কারণ, সমস্ত জীবের সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ জিনিস এই নারী 'লোপ' করে নিয়েছেন। এই কন্যা যখন বড় হ'ল, তখন অগস্ত্য এঁকে স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করলেন; বিদর্ভরাজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোপামুদ্রাকে তাঁর হাতে দান করলেন।

কিছুদিন পরে লোপামুদ্রা একদিন ঋতুস্নান করে অগস্ত্যের কাছে এলে মুনি পুত্রোৎপাদনের জন্য এঁকে আহ্বান করলেন। লোপামুদ্রা তখন বললেন যে, পিতৃগৃহে যেরূপ অলঙ্কারভূষিতা হয়ে শয্যায় শয়ন করতেন, সেইরূপ তাঁকে ভূষিত করতে ও মুনিকে ভূষিত হতে বললেন। অগস্ত্য তখন জানালেন যে, এইরূপ ধনরত্ন সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ঋতুকাল গত হবার সময় হয়েছে বলে অগস্ত্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষায় বের হলেন। কিন্তু সব স্থান হতেই তিনি বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। তখন যে রাজারা তাঁকে অর্থ দিতে অসমর্থ হয়েছেন, তাঁরা তাঁকে দানবরাজ ইল্বলের কাছে যেতে বললেন। সেখানে অনেক ঘটনার পর ইল্বল-ভ্রাতা বাতাপীকে তিনি ধ্বংস করেন। অগস্ত্যের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ইল্বল তাঁকে ধনদান করলেন। এই ধনরত্ন নিয়ে মুনি লোপামুদ্রার কাছে উপস্থিত হলেন। তখন লোপামুদ্রার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায়, তিনি অগস্ত্যের কাছ হতে বীর্যবান পুত্র প্রার্থনা করলেন। এর ফলে দৃড়স্যু নামে এক শক্তিশালী পুত্রের জন্ম হয় এবং এই পুত্রই পূর্বপুরুষদের মুক্ত করেন। পুত্রের জন্মের পর অগস্ত্য কিছুদিন আশ্রমে বাস করে যোগবলে দেহত্যাগ করে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন।

অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্বত একদিন ইচ্ছা করলেন, সূর্য যেমন উদয়াস্তকালে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন, সেইরূপ বিন্ধ্যপর্বতও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবেন। সূর্য এতে অসম্মত হয়ে বলেন যে, তিনি বিশ্বনিয়ন্তার আদিষ্ট পথেই পরিভ্রমণ করেন এবং করবেন। বিন্ধ্য ক্রোধে হঠাৎ নিজের দেহ এমনভাবে বৃদ্ধি করতে লাগলেন যে, সূর্যের পথ রোধ হল। তখন দেবতারা ভীত হয়ে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। অগস্ত্য ভক্তশিষ্য বিন্ধ্যের কাছে উপস্থিত হলে, বিন্ধ্য অবনত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য বললেন, আমি যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করি, ততক্ষণ তুমি এইরূপ মস্তক অবনত অবস্থায় থাক। বিন্ধ্যকে

এই অবস্থায় রেখে অগস্ত্য ১লা ভাদ্র দক্ষিণাপথে যাত্রা করলেন এবং আর ফিরলেন না। এইরূপে দেবতারা বিন্ধ্যকে দমন করলেন। এ জন্য ১লা ভাদ্র শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে আছে। ক্রমে সকল মাসের প্রথম দিনেই শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই প্রতি মাসের প্রথম দিনকে 'অগস্ত্য-যাত্রা' বলা হয়।

কালকেয় নামে অসুররা বৃত্রাসুর বধের পর দেবতাদের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করে। এরা রাত্রে সমুদ্র হতে উঠে দেবতাদের উপর অত্যাচার করত। এই অসুরদের অত্যাচারে দেবতারা অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য সমুদ্রকে পান করে ফেলেন। সমুদ্র শোষণের পর অসুররা নিরাশ্রয় হয়ে দেবতাদের হাতে ধ্বংস হয়।

জনশ্রুতি আছে, অগস্ত্য দক্ষিণাকাশে নক্ষত্ররূপে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তিনি শরৎকালের প্রথমে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন বলে ভাদ্রের ১৭ কি ১৮ তারিখে আকাশে নক্ষত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে।

ইন্দ্র একবার ব্রহ্মহত্যার পাপে সমুদ্রের ভিতর বাস করছিলেন, সেই সময় ধার্মিক রাজা নহুষকে ইন্দ্রের অভাবে স্বর্গের রাজা করা হয়। সিংহাসন অধিকার করে রাজা নহুষ ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে হস্তগত করতে চান। বৃহস্পতির উপদেশ অনুসারে শচী বললেন, রাজা নহুষ যদি সপ্তর্ষি-চালিত রথে আরোহণ করে তাঁর কাছে আসেন, তবেই তিনি তাঁকে গ্রহণ করবেন। এই কথা অনুসারে ঋষি-চালিত রথে রাজা নহুষ আসছিলেন। রথের একজন বাহক ছিলেন অগস্ত্য। হঠাৎ রাজার পা অগস্ত্যের দেহ স্পর্শ করে। এতে ঋষি অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে 'সর্প হও' এই অভিশাপ দেন। তৎক্ষণাৎ নহুষ রথ হতে পতিত হয়ে সর্পে পরিণত হন। অভিশাপগ্রস্ত নহুষ তখন অগস্ত্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নহুষের একান্ত অনুরোধে ঋষি তাঁর অভিশাপকে সামান্য পরিবর্তন করেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে তিনি আবার নিজ মূর্তি ফিরে পান ও পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। বনবাসকালে রাম অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হলে অগস্ত্য এঁকে বৈষ্ণবধনু, অক্ষয়তূণীর ও নানারকম মহাস্ত্র দান করেন।

অক্ষক্রীড়া—পাশা খেলা। হিন্দুশাস্ত্রে দ্যূতক্রীড়া নিষেধ আছে। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে আছে—রাজা নিজ রাজ্য হতে দ্যূত ও সমাহবায় ক্রীড়া নিবারণ করবেন। এই দুই খেলা রাজাদের রাজ্যনাশের কারণ। নলরাজ ও যুধিষ্ঠির পাশা খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, মহাদেব এই খেলার সৃষ্টি করেন।

তিনি পার্বতীর সঙ্গে এই খেলা খেলতেন।

অক্ষপাদ—বিখ্যাত দার্শনিক ঋষি। এর প্রকৃত নাম গৌতম। ব্যাসদেব গৌতম-লিখিত ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা করলে গৌতম ব্যাসের মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। ব্যাসদেব ক্ষমা প্রার্থনা করলে গৌতম প্রসন্ন হন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে চক্ষুদ্বারা দর্শন না করে নিজের চরণের উপর চক্ষু সৃষ্টি করে ব্যাসের মুখদর্শন করেন। সেই হতে গৌতম অক্ষপাদ নামে খ্যাত।

অক্ষয়—মন্দোদরীর গর্ভজাত রাবণের পুত্র। হনুমান সীতাকে অন্বেষণ করবার জন্য লঙ্কায় প্রবেশ করে সীতার সঙ্গে পরিচিত হন। পরে সীতার কাছ থেকে অভিজ্ঞান গ্রহণ করে ফিরবার সময় অশোকবন বিনষ্ট করেন। তখন রাবণ হনুমানকে দমন করবার জন্য পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা সকলেই হনুমানের হস্তে নিহত হলে রাবণ পুত্র অক্ষয়কে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রেরণ করেন অক্ষয়ও হনুমানের হস্তে নিহত হন।

অক্ষয়তৃতীয়া—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। কথিত আছে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছিল।

অক্ষৌহিণী—যে সেনাদলে ১০৯,৩৫০ পদাতি, ৬৫,৬১০টি অশ্ব, ২১,৮৭০টি হস্তী ও ২১,৮৭০ খানি রথসহ মোট ২,১৮,৭০০ সৈন্য থাকে।

অগ্নি—"ভারতবর্ষের তিন জন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। ঋগবেদ-সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই"—(রমেশ দত্ত)

অগ্নিকে ২০০ সূক্তে স্তব করা হয়েছে। অগ্নির ত্রিমূর্তি—আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। পার্থিব দেবতাদের মধ্যে অগ্নি প্রধান। অগ্নিকে অনেক স্থলে যুবা যবিষ্ঠ (গ্রীক Hephaistos) বলা হয়েছে (ঋগবেদ)। দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় বলে এঁর এক নাম প্রমন্থ (গ্রীক Prometheus)। অগ্নির অন্য নাম ভরণ্যু (গ্রীক Phoroneus)। অগ্নি যজ্ঞাগ্নি রূপেই বেশীর ভাগ পূজিত হয়েছেন। অগ্নি ঘৃতপৃষ্ঠ (ঋগবেদ ৫।৩।৩), নীলপৃষ্ঠ, জ্বালাকেশ (৩।১৪।১), হিরণ্যকেশ, পিঙ্গলশ্মশ্রু (৫।৭।৭), তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা হিরণ্যদন্ত রূপে বর্ণিত হয়েছেন। জুহু নামে হাতায় করে ঘৃতাহুতি দেওয়া হোত বলে, 'জুহু' অগ্নির মুখ বা জিহ্বা। ইনি জ্বালাময়, মধুজিহ্ব, সপ্তজিহ্ব, ত্রিজিহ্ব (৩।২০।২), অগ্নি দেবতাদেরও হব্যবাহক। অগ্নি দেব ও মানবের মধ্যস্থ। অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, সেজন্য অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি পার্থিব দেবতাদের মধ্যে প্রধান। অগ্নিকে বহু পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—গর্জনকারী বৃষের ন্যায় (১।৫৮।৫),

গোবৎসতুল্য, দেববাহন অশ্বসদৃশ (১।৬১।৬), শ্যেন সদৃশ আকাশবিহারী (৭।১৫।৪),হংসবৎ বিচরণশীল(১।৬৫।৫), সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় গর্জনকারী (১।৪৪।১২)। সমিধ্‌ ইন্ধন ঘৃত অগ্নির খাদ্য পানীয়। অগ্নির দীপ্তি সূর্যের ন্যায়, ঊষার ন্যায়, বিদ্যুতের ন্যায়। ইনি পৃথিবীর কেশরূপ বনকে ধ্বংস করেন। এঁর রথ উজ্জ্বল দ্যুতিমান, হিরণ্ময় বিদ্যুজ্জড়িত,—দুই বা ততোধিক অরুণ বা পিঙ্গল অশ্ব দ্বারা বাহিত (৭।৪২।২)। ইনি যজ্ঞ-সারথি। ইনি নিজের রথে দেবতাদের বহন করে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত করেন। অগ্নি দ্যাবা পৃথিবীর পুত্র। অরণিদ্বয় অগ্নির জনক-জননী। শুষ্ককাষ্ঠ অগ্নির জনক-জননী। জাতমাত্রই সন্তান জনক-জননীকে ভক্ষণ করেন। অগ্নি জলের গর্ভ বা ভ্রূণ। অগ্নি দ্বিজ—আকাশে ও পৃথিবীতে এঁর জন্ম। গৃহে গৃহে অগ্নির অধিষ্ঠান বলে ইনি বহুজন্মা। ইনি হব্যবাহন ও দেববাহন উভয়ই। ইনি ইন্দ্রের মত বলশালী ও সহস্রজিৎ। ঋগবেদের প্রথমেই অগ্নির বন্দনা আছে (১।১), এবং অগ্নির বন্দনা করেই ঋগবেদ সমাপ্ত হয়েছে (১০।১৯১)।

মহাভারতের আদিপর্বে কথিত আছে, এক রাক্ষস মহর্ষি ভৃগুর ভার্যা পুলোমাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু পুলোমার পিতা কন্যাকে ভৃগুর হস্তে সম্প্রদান করেন। এই কন্যা যখন গর্ভবতী, তখন রাক্ষস অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করে, এই কন্যা কার ভার্যা? অগ্নি বলেন, যেহেতু পুলোমার অগ্নিসাক্ষী করে ভৃগুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে,সেহেতু সে ভৃগুর ভার্যা। ঐ রাক্ষস কিন্তু পূর্বে এই কন্যাকে মনে মনে বরণ করেছিল। তখন রাক্ষস বরাহরূপে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করে। হরণকালে পুলোমার গর্ভচ্যুত হয়ে চ্যবন ঋষির জন্ম হয়। সেই শিশুর তেজে রাক্ষস দগ্ধ হয়। অগ্নি রাক্ষসকে পুলোমার পরিচয় দিয়েছেন জানতে পেরে, মহর্ষি ভৃগু অগ্নিকে 'সর্বভুক্ হও' বলে শাপ অভিসম্পাত দেন। অগ্নি তখন আহুতি গ্রহণ করবেন না বলে অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞ হতে অন্তর্হিত হন। ব্রহ্মা তখন অগ্নিকে বলেন, তুমি সদা পবিত্র এবং কেবলমাত্র তোমার গুহ্য-দেশের শিখা ও ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর সর্বভুক্ হবে এবং মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে, তাই দেবগণের ভাগরূপে গৃহীত হবে।

মহাভারতে কথিত আছে যে, অগ্নি শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি ভক্ষণ করে দুঃসাধ্য অগ্নিমান্দ্য রোগে পীড়িত হন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে রোগমুক্তি ও শক্তিসঞ্চয় করবার জন্য খাণ্ডববনের সমস্ত জীবজন্তু, দৈত্যদানব, সর্প ইত্যাদি ভক্ষণ করবার ইচ্ছা করেন; কিন্তু খাণ্ডববন দেব-রক্ষিত বলে ইন্দ্র এতে বাধা দিলেন।

অগ্নি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাঁরা অগ্নিকে সাহায্য করতে রাজী হলেন; কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করলেন। তখন অগ্নি বরুণদেবের নিকট হতে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব-ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অর্জুনকে এবং সুদর্শনচক্র ও কৌমদকী গদা কৃষ্ণকে দান করলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডবদাহন হলে অগ্নি তাই খেয়ে রোগমুক্ত হন।

আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নানাভাবে অগ্নির উল্লেখ দেখা যায়। যেমন অঙ্গিরার পুত্র, সন্ধিলার প্রপৌত্র, সপ্তর্ষির মধ্যে অগ্নি একজন। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী (বিষ্ণুপুরাণ)। ধর্মের ঔরসে ও বসু ভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম (মহাভারত—অনুশাসন)। দক্ষের কন্যা স্বাহাকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁহার তিনটি পুত্র হয়—পাবক, পবমান ও শুচি (বিষ্ণুপুরাণ)। এঁদের আবার পঁয়তাল্লিশটি পুত্র হয়।

হরিবংশে তাঁর বর্ণনা এইরকম-কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত, ধূম্রপতাকা, সঙ্গে জ্বলন্ত বর্শা। অগ্নির বাহন ছাগ। এঁর চারটি হস্ত, লোহিতবর্ণ অশ্বচালিত রথে ইনি ভ্রমণ করেন, এবং সপ্ত বসু এঁর রথের চক্র। বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত—অনল, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর, অব্জহস্ত, ধূমকেতু, তোমরধর, হুতাশ, হুতভুজ, বহ্নি, রোহিতাশ্ব, ছাগরথ, সপ্তজিহ্বা।

অগ্নিবেশ্য—ঋষি বিশেষ; ইনি অগ্নির পুত্র। ধনুর্বিদ্যায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য এঁর মন্ত্রশিষ্য। দ্রোণকে ইনি আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। (মহাভারত—আদি)

অগ্নিকোণ—পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ। ঐ কোণের দিক্‌পাল অগ্নি বলে এই দিকের নাম অগ্নিকোণ।

অগ্নিবেশ—মহর্ষি আত্রেয়-শিষ্য অগ্নিবেশ আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বর্তমানে প্রচলিত চরকসংহিতা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের নাম অগ্নিবেশ-সংহিতা ছিল। প্রমাণ যথা—প্রতি অধ্যায়ের শেষে,' ইতি অগ্নিবেশকৃততন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্থিতে।' এই সংহিতা লুপ্তপ্রায় হলে মহর্ষি চরক ইহার সংস্কার করেন। তাই এই গ্রন্থের নাম চরকসংহিতা হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ—যাদের দেহ যথাশাস্ত্র অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েছে—পিতৃলোক।

অগ্নিজিহ্বা—অগ্নির সপ্তবিধ শিখা। করালী, ধামিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগা, সুবর্ণা—এই সপ্ত প্রকার শিখা অগ্নির সপ্ত-জিহ্বা।

অগ্নিজিহ্ব—(১) যাঁরা অগ্নিরূপ জিহ্বা দ্বারা দ্রব্যের আস্বাদন বা ভোজন করেন—দেবতা। (২) বরাহমূর্তি

ধারণকালে বিষ্ণু অগ্নিজিহ্ব হয়েছিলেন বলে বিষ্ণুকে অগ্নিজিহ্ব বলে।

অগ্নিবর্ণ—রঘুবংশের শেষ রাজা। মহারাজ সুদর্শনের পুত্র। অনেক বৎসর সুশাসনের পর সুদর্শন নিজ পুত্রের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হন। সিংহাসন লাভের পর অগ্নিবর্ণ সুখভোগে মন দিয়ে সুরা ও নারী আসক্তির জন্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে মন্ত্রীরা পরামর্শ করে উপবনের এক নির্জন স্থানে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে তাঁকে নিক্ষেপ করে তাঁর গর্ভবতী রাণীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

অগ্নিকুমার—অগ্নিদেব একবার বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষিদের স্ত্রী অরুন্ধতী প্রভৃতির সৌন্দর্যে মোহিত হন। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা স্বামীর চিত্তবিকার বুঝতে পেরে অরুন্ধতী ভিন্ন ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে ছয়বার বিহার করেন। বিহারের পর এক স্বর্ণকুণ্ডে অগ্নির রেতঃপাত রক্ষিত হয়। সেই তেজোময় রেতঃ হতে কার্তিকের জন্ম। সেজন্য তিনি অগ্নিকুমার নামে খ্যাত। শিব তারকাসুর বধের জন্য অগ্নিতে নিজ বীর্য নিক্ষেপ করেন। এতে অগ্নিকুমারের জন্ম হয়।

অগ্নিধ্র—জম্বুদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রিয়ব্রতের সাতটি পুত্র। ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নিধ্রকে জম্বুদ্বীপ দান করেন। অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর আরাধনায় যাপন করবেন মনে করে বনে প্রস্থান করলেন। অগ্নিধ্রের কোন পুত্র না হওয়ায় তিনি মনের দুঃখে পুত্র কামনায় মন্দার পর্বতে তপস্যায় রত হলেন। ব্রহ্মা এঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পূর্বচিত্তী নামে এক অপ্সরাকে এঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি গান্ধর্ব মতে একে বিবাহ করেন। ফলে, অগ্নিধ্রর ঔরসে পূর্বচিত্তীর নয়টি পুত্র হয়। পুত্রগণ বড় হলে অগ্নিধ্র আপন রাজ্য নয় পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেহত্যাগ করেন। (ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি)

অগ্নিপুরাণ—সর্বপ্রথমে অগ্নিদেবতার মুখ হতে নির্গত বলে এর নাম অগ্নিপুরাণ। মহামুনি বশিষ্ঠকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য অগ্নিদেবের মুখনিসৃত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অষ্টম পুরাণ। প্রধানতঃ প্রলয়, সৃষ্টি, প্রকরণ ও অগ্নিকার্য, দেবপ্রতিষ্ঠা, নরকবর্ণনা, প্রায়শ্চিত্তবিধি, তীর্থাদিমাহাত্ম্য, জ্যোতিষ, আশ্রমবিধি, দীক্ষা, নীতি, পূজাপদ্ধতি, সন্ধ্যাবিধি, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, ছন্দ, শব্দানুশাসন, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১৫,৪০০।

অগ্নিপরীক্ষা—(১) রাবণ বধের পর সীতা রাক্ষস-বাহিত শিবিকায় বিভীষণের সহিত রামের কাছে ফিরে

আসেন। কিন্তু অনেক দিন রাবণপুরীতে অতিবাহিত করায় সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাদের এবং রামচন্দ্রের মনে সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে। এই অপমানের জন্য সীতা আগুনে প্রবেশ করে প্রাণবিসর্জন দেবেন ঠিক করেন। সকলের সম্মুখে সীতা প্রদীপ্ত চিতাগ্নির মধ্যে প্রবেশ করলে, অগ্নিদেব সীতাকে নিজ হস্তে ধারণ করে অগ্নির মধ্য থেকে উঠে, তাঁকে রামের হাতে অর্পণ করেন। এই অগ্নিপরীক্ষায় সীতার সতীত্ব প্রমাণিত হয়। সকলের মনের সন্দেহ বিদূরিত হয়।

(২) পুরাকালে ভারতবর্ষে অগ্নিপরীক্ষার আর একটি প্রথা ছিল। কোন নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হলে, তার পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় দূর করবার জন্য লাঙ্গলের অগ্নিতপ্ত লৌহশলা তাকে লেহন করতে হ'ত। জিহ্বা দগ্ধ না হলে সেই নারী যে যথার্থই সতী তা প্রমাণ হয়ে যেত।

অঘাসুর—বকাসুর ও পূতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কংসের সেনাপতি। বাল্যকালে কৃষ্ণ যখন নন্দালয়ে ছিলেন, তখন কংস তাঁকে বধ করবার জন্য বকাসুর ও পূতনাকে পাঠান, কিন্তু কৃষ্ণ উভয়কেই বধ করলেন। অঘাসুর কৃষ্ণের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাঁকে হত্যা করবার জন্য অজগরের রূপ ধারণ ও চার যোজন মুখব্যাদান করে পথিমধ্যে পড়ে থাকে। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় কৃষ্ণের সখারা এই অজগরের মুখকে ভুলক্রমে পাহাড়ের গুহা মনে করে এর ভিতর প্রবেশ করে। কৃষ্ণ অঘাসুরের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে নিজেও সর্বশেষে অজগরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং বিরাট মূর্তি ধারণ করে অঘাসুরকে বধ করেন।

অঘোর—শিবের অপর নাম। অঘোরপন্থী নামে শিবের এক উপাসক সম্প্রদায় আছে। এরা অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে। গলিত দুর্গন্ধময় শব, এমন কি মলমূত্র পর্যন্ত উদরস্থ করে। কখনও অঙ্গ পরিষ্কার করে না। মদ্যপান করবার জন্য প্রত্যেকের হাতে একটি করে নরকপাল থাকে। নরবলি দ্বারা এরা পূজা করে। নির্বিকার ও নিঘৃণ্য হওয়াই এদের ধর্মকর্মের মূলমন্ত্র। একদা এই সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান বরোদা রাজ্যে ছিল। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন।

অঙ্গ—ইনি বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। এঁর অধিকৃত সমূহ রাজ্য এঁরই নামানুসারে খ্যাত হয়েছে। ভাগলপুরের উত্তরস্থিত অঙ্গদেশ (রাজধানী চম্পা)। জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে, বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র হয়। মহাভারতে অঙ্গদেশের নাম উল্লেখ আছে। দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশের অধিপতি করে-

ছিলেন। অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জুন বহুবিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা দেখান। এতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্ররা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন এবং কর্ণকে অস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করার জন্য অর্জুনকে বলেন। কিন্তু কর্ণ রাজা নন বলে অর্জুন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মত হন। তখন দুর্যোধন সূতপুত্র কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অঙ্গের জন্ম সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ কথিত আছে যে, জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমা প্রদ্বেষী নামে এক সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে গৌতম প্রভৃতি কয়েকটি পুত্রের জন্মের পর ইনি স্বামীর প্রতি বিরূপ হন। স্ত্রীর এই দুর্ব্যহারের জন্য দীর্ঘতমা নিয়ম করেন যে, জীবিত বা মৃত স্বামীর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে কোন নারী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে, তবে সে পতিতা হবে। স্বামীর এই কথা শুনে স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রদের স্বামীকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে বলেন। পুত্ররা পিতাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলে, তিনি ভাসতে ভাসতে বলিরাজের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। বলিরাজ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে দীর্ঘতমাকে আশ্রয় দেন। বলিরাজের স্ত্রী সুদেষ্ণা তখন নিঃসন্তানা। বলিরাজ দীর্ঘতমাকে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। অন্ধ ও অতিবৃদ্ধ মহর্ষির কাছে নিজে না গিয়ে সুদেষ্ণা তাঁর ধাত্রীকন্যাকে পাঠিয়ে দিলেন। এই শূদ্রকন্যার গর্ভে ১১ জন ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। এরপর রাজার নির্বন্ধে সুদেষ্ণা স্বয়ং দীর্ঘতমার কাছে গেলে দীর্ঘতমা তাঁর অঙ্গস্পর্শ করে বলেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বী পুত্র হবে এবং পুত্রগুলির নাম হবে যথাক্রমে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এবং তাদের দেশগুলিও ঐ সকল নামে খ্যাত হবে।

অঙ্গদ—(১) কিষ্কিন্ধ্যার বানর-রাজ বালির ঔরসে ও তারার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। রাম বালিকে নিহত করলে পিতৃব্য সুগ্রীব রাজ্যলাভ করে অঙ্গদকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। পরে বানর-সেনাদের অধিনায়ক হয়ে ইনি রামের স্বপক্ষে লঙ্কায় যুদ্ধ করতে যান এবং সম্পাতির নিকট হতে সীতার সন্ধান এনে দেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর ইনি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন (রামায়ণ)। (২) লক্ষ্মণের পুত্র এবং হিমালয়ের নিকট আঙ্গদীর রাজা। (৩) গদ এবং বৃহতীর পুত্র।

অঙ্গারপর্ণ—কুবেরের সখা ও গন্ধর্ব-রাজ; অন্য নাম চিত্ররথ ও দগ্ধরথ। ইনি ইন্দ্রের সারথির কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; এঁর একখানি বিচিত্র রথ ছিল, এইজন্য এঁর অন্য নাম হয় চিত্ররথ। কোন সময়ে পাণ্ডবরা একচক্রা থেকে পাঞ্চালে যাচ্ছিলেন। উক্ত সময় সোমাশ্রয়ণ তীর্থে গঙ্গায় নারী-পরিবৃত হয়ে অঙ্গারপর্ণ জল-বিহার করছিলেন।

পাণ্ডবদের এই স্থানে উপস্থিত হতে দেখে, অঙ্গারপর্ণ নিজের ধনুর্বাণ উত্তোলন করে অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে সগর্বে বললেন, আমার জল-বিহারের সময় দেবতারাও এখানে আসতে সাহসী হয় না, আর তোমরা মানুষ হয়ে কোন সাহসে এই স্থানে এলে? এইরূপে অর্জুনের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা ও ঝগড়া হতে হতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। অর্জুন আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে অঙ্গারপর্ণের রথ দগ্ধ করে দিলেন। সেই থেকে এঁর নাম হল দগ্ধরথ। এরপর অর্জুনের সঙ্গে এঁর সখ্য স্থাপন হয় এবং ইনি অর্জুনকে চাক্ষুষী-বিদ্যা দান করেন। (মহাভারত-আদি)

অঙ্গিরা—ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং তাঁরই মুখ হতে নিঃসৃত। ইনি কর্দম-ঋষির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন। এঁর দুই পুত্রের নাম উতথ্য ও বৃহস্পতি। মতান্তরে, দক্ষের কন্যা স্মৃতিকে ইনি বিবাহ করেন। সপ্তর্ষি ও দশজন প্রজাপতির মধ্যে ইনি একজন। অঙ্গিরা ঋগবেদের বহু শ্লোকের রচয়িতা।

অঙ্গিরসগণ—বেদে এঁরা দেবতা ও মানুষের মধ্যস্থ দৈবী-পুরুষ এবং অগ্নির অনুচর বলে কথিত। ভাগবতপুরাণে এরা অঙ্গিরা এবং অপুত্রক ক্ষত্রিয়রাজ রথীতর-এর স্ত্রীর পুত্রগণ। বিভিন্ন পুরাণে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অঙ্গিরসগণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অচ্যুত—নিজস্থান হতে যাঁর চ্যুতি বা ক্ষরণ নাই। যিনি নিজের স্বভাব হতে অবিচলিত। সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে যাঁর সংহার হয় না। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে অচ্যুত বলা হয়।

অজ—(১) যিনি কাহারও গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। জন্মরহিত দেবতাকে অজ বলা হয়। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই নামে খ্যাত। (২) মহারাজ রঘুর পুত্র ও রামচন্দ্রের পিতামহ দশরথের পিতার নাম অজ। শাপভ্রষ্টা অপ্সরা বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ইনি যাত্রা করলে, পথিমধ্যে এক হস্তী এঁকে আক্রমণ করে। তখন তিনি এই হস্তীকে নিহত করবার আদেশ দেন। এই হস্তীটি গুরুতর আহত হলে, তার দেহ থেকে এক অপরূপ সুন্দর গন্ধর্ব বেরিয়ে এসে জানায় যে, সে একজন ঋষিকে উপহাস করার জন্য তাঁরই অভিসম্পাতে মত্ত-হস্তীতে পরিণত হয়েছিল। তার নাম প্রিয়ম্বদ। আজ অজ তাকে হস্তীরূপ থেকে মুক্ত করেছেন। সেই জন্য গন্ধর্ব অজকে 'সম্মোহন' নামে একটি বাণ দান করেন। এই বাণের সাহায্যে অজ স্বয়ংবর-সভার সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হয়। স্ত্রীবিয়োগ হলে দশরথের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি

স্বর্গারোহণ করেন।

অজাতশত্রু—উপনিষদে এই নামে এক রাজা ছিলেন। এঁর রাজধানী ছিল বারাণসী। মহর্ষি গর্গ এঁকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতে আসেন; কিন্তু রাজার ব্রহ্মজ্ঞান দেখে বিস্মিত হন। এই যুগে যেসব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চা করতেন, ইনি তাঁদেরই অন্যতম।

অজামিল—কান্যকুব্জের একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রপাঠ, পূজা-অর্চনা, অতিথি ও বৃদ্ধসেবায় ইনি সময় কাটাতেন। একদিন কুশ সংগ্রহ করতে গিয়ে অজামিল এক শূদ্রাণী বারাঙ্গনাকে ভোগাসক্ত অবস্থায় দেখে তার প্রেমাসক্ত হন এবং নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করে এই শূদ্রণীকে বিবাহ করেন। এই শূদ্রাণীর গর্ভে তাঁর আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। এই পুত্রকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর সময় যখন যমদূতেরা তাঁকে নরকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন তাদের দেখে ভীত হয়ে তিনি প্রিয়পুত্র নারায়ণের নাম ধরে ডাকেন। এর ফলে, বিষ্ণুদূতেরা সেখানে উপস্থিত হয় এবং যমদূতদের তাঁকে নিয়ে যেতে বাধা দেয়। মৃত্যুর সময় নিজে নারায়ণ অর্থাৎ হরির নাম করায় ও বিষ্ণুদূতদের নিকট হতে হরি-কীর্তন শোনায়, তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় এবং তিনি পাপমুক্ত হন। মৃত্যুর হস্ত হতে পরিত্রাণ পেয়ে অজামিল তপস্যায় রত হন এবং যথাসময়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, পুত্রাদির নামের ছলেই হোক, পরিহাস ছলেই হোক, গীতালাপের পরিপূরণার্থেই হোক, ভগবানের নাম উচ্চারণ করলেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

অজমুখ—দক্ষপ্রজাপতির অন্য নাম। জামাতা শিবকে অপমানের জন্য দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে শিব ও সতী ব্যতীত সমস্ত দেবদেবী নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই এই যজ্ঞে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা করলেন। শিব তাঁর নিকটে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালে সতী কালী, তারা প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করলেন। এতে শিব ভীত হয়ে পলায়ন করলেন। দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হলে পিতা দক্ষ শিব-নিন্দা আরম্ভ করলেন। পতি-নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করলেন। দেহত্যাগের পূর্বে পিতাকে বললেন, যে মুখে পিতা স্বামীনিন্দা করেছেন, সেই মুখ ছাগমুখ হবে। সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে শিব অনুচরসহ এসে যজ্ঞ নষ্ট করে দক্ষের মস্তক ছিন্ন করলেন। তারপর দক্ষপত্নীর স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শিব দক্ষের প্রাণদান করলেন বটে, কিন্তু সেখানে ছাগমুণ্ড সংযোজিত

করে দিলেন। সেই হতেই দক্ষের নাম অজমুখ।

অজিত—দেবগণ বিশেষ। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করার পূর্বে একাকী সমস্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয় বলে প্রথমে জয় নামে বারো জন দেবতার সৃষ্টি করেন; কিন্তু ব্রহ্মার কথা না শুনে এঁরা ধ্যানে নিযুক্ত থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি-বিস্তারের ব্যাঘাত জন্মান। প্রজা বৃদ্ধি না হওয়াতে ব্রহ্মা এঁদের অভিসম্পাত করেন যে, এঁরা যেন প্রতি মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করবেন। এঁরা সপ্ত মন্বন্তরে ক্রমে—অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ নামে খ্যাত হয়েছিলেন (বায়ু পুরাণ)

অণীমাণ্ডব্য—একজন মৌন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। একদিন নিজের আশ্রমের দ্বারের কাছে যোগাভ্যাস করছিলেন, এমন সময় একদল চোর আত্মগোপনের জন্য তাঁর আশ্রমে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে। নগরপালরা চোর ধরতে সেই আশ্রমে উপস্থিত হয়। মুনি যোগাভ্যাসে এরূপ মৌন ছিলেন যে, নগরপালরা তাঁকে চোরদের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন উত্তর দিতে সক্ষম হন না। সুযোগ বুঝে চোরেরা চুরির জিনিসপত্র আশ্রমে ফেলে রেখে পলায়ন করে। নগরপালরা তখন তাঁর আশ্রমে চুরির জিনিসপত্র পেয়ে চোরদের আশ্রয়দাতা বলে তাঁকে বিচারের জন্য রাজদ্বারে নিয়ে যায়। রাজা এই অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। মাণ্ডব্যকে শূলে চড়ান হয়। মৌন ধ্যানমগ্ন ঋষি এই বিচারের কারণ কিছুই জানতে পারেন না; এবং শূলবিদ্ধ অবস্থায় বহুকাল বেঁচে থাকেন। রাজার কাছে এই খবর গেলে, রাজা নিজে উপস্থিত হয়ে মাণ্ডব্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঋষি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা করেন। রাজা ঋষিকে শূল থেকে নামিয়ে শূল বের করবার বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত অক্ষম হন। তখন তিনি শূলের বাইরের অংশটুকু কেটে দেন। মাণ্ডব্য এই শূল নিয়েই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন। সেই থেকে তার নাম হয় অণীমাণ্ডব্য (অণী অর্থাৎ শূলের অগ্রভাগ)।

একদিন তিনি যমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ পাপে তাঁর এই শাস্তি হ'ল। যম বললেন, বাল্যকালে আপনি এক পতঙ্গের মলদ্বারে তৃণশলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পাপের ফল এখন আপনাকে ভোগ করতে হচ্ছে। ঋষি বললেন, লঘু পাপে আপনি আমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণী বধের চেয়ে ব্রাহ্মণবধ গুরুতর পাপ। আপনি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন। অতঃপর তিনি নিয়ম করেন যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য

কাহারও দণ্ডভোগ করতে হবে না। তাঁর শাপের ফলে যম দাসী-গর্ভে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভারত)

অর্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তীর গর্ভে ও ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম। প্রথমে কৃপাচার্য ও পরে দ্রোণাচার্যের নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। এঁর ন্যায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী কেহই ছিল না। পাণ্ডবদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা মহামনা, ন্যায়বান্ ও মিতভাষী ছিলেন। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় অর্জুন একাগ্রতার বলে উত্তীর্ণ হয়ে সকলের শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হন। কৌরবসভায় অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনকালে কর্ণের সহিত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। অর্জুন দ্রোণাচার্যের তুষ্টিসাধন করে তাঁর নিকট হতে ব্রহ্মশির নামে এক অমোঘ অস্ত্র লাভ করেন। গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত করে তাঁর কাছ থেকে চাক্ষুষী-বিদ্যা (যার প্রভাবে যে কোন বস্তু দেখা যায়) লাভ করেন। দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় চক্রমধ্যে মৎস্য লক্ষ্যবিদ্ধ করে তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং মাতার আদেশে পঞ্চভ্রাতা মিলিতভাবে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এর পর দ্রৌপদী সম্পর্কে ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণকল্পে সকলে নিয়মবদ্ধ হন যে, দ্রৌপদীর সহিত যখন যে ভ্রাতা অবস্থান করবেন, সে সময়ে অন্য ভ্রাতার সেখানে আবির্ভাব ঘটলে তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে ১২ বৎসর বনবাসী হতে হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে অর্জুনকে ১২ বৎসর বনবাসে গমন করতে হয়েছিল। এই বার বৎসর বনবাস ও ভ্রমণকালে তিনি পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ করে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। এই সময় তিনি নাগকন্যা উলূপী ও মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। তারপর তিনি দ্বারকায় যান ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে অভিমন্যুর জন্ম হয়।

যুধিষ্ঠির যখন শকুনি কর্তৃক পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে রাজ্য হারালেন এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে ১৩ বৎসরের জন্য বনে চলে গেলেন, তখন অর্জুন কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করবার জন্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে হিমালয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। এখানে কিরাতবেশধারী মহাদেবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। কিন্তু কিরাতের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়ে মহাদেবকে পূজায় ও তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। তারপর ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ও যমের

সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং প্রত্যেকেই তাঁকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দান করেন। এর পর অর্জুনের পিতা ইন্দ্র পুত্রকে স্বর্গে নিয়ে যান। সেখানে তিনি কয়েক বৎসব গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের নিকট নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করেন। স্বর্গবাস-কালে উর্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করার জন্য উর্বশীর অভিশাপে তিনি এক বৎসর নপুংসক অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ইন্দ্রের নিকট অস্ত্রশিক্ষার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তিনি নিবাতকবচ নামক তিন কোটি দানবকে তাদের সমুদ্র মধ্যস্থ দুর্গসহ ধ্বংস করেন এবং পৌলোম ও কালকেয় অসুরদের বিনাশ সাধন করেন। এর জন্য ইন্দ্র তাঁকে অভেদ্য দিব্যকবচ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্য কিরীট এবং দিব্য বস্ত্র ও আভরণ দেন। বনবাসকালে দুর্যোধন যখন সপরিবারে দ্বৈতবনস্থিত সরোবরে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন কর্তৃক নিগৃহীত হন, তখন অর্জুন চিত্রসেনকে পরাস্ত করে দুর্যোধনকে উদ্ধার করেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করলে ভীমের সহিত অর্জুন মিলিত হয়ে তাঁকে শাস্তি দেন। মৎস্যরাজ ভবনে অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন বৃহন্নলা নামধারী নপুংসক বেশে বিরাট-কন্যা উত্তরার নৃত্য-গীত শিক্ষকরূপে এক বৎসর অবস্থান করেন। অজ্ঞাতবাসের শেষাংশে দুর্যোধন বিরাটরাজের গোধন হরণ করলে বৃহন্নলা-রূপী অর্জুন কৌরব-সৈন্যকে পরাস্ত করে গোধন উদ্ধার করেন। তখন অর্জুনের পরিচয় পেয়ে বিরাটরাজ উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু শিষ্যা কন্যা সদৃশা বলে অর্জুন স্বয়ং বিবাহ করতে অসম্মত হন এবং নিজ পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দেন। মহাভারতের যুদ্ধে তিনি কৃষ্ণকে উপদেষ্টা সারথিরূপে পান। পরে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন স্বজন বধে বিমুখ হলে কৃষ্ণ তাঁকে যে সকল মহাবাক্য উপদেশ দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন, তাহাই শ্রীভগবদ্গীতা। অর্জুনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। যুদ্ধের দশম দিনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। দ্বাদশ দিনের যুদ্ধে ভগদত্ত, চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে অভিমন্যু বধের প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি জয়দ্রথ বধ করেন। পঞ্চদশ দিনে তিনি দ্রোণাচার্যকে বধ করেন। ষোড়শ দিনের যুদ্ধে মগধরাজ দণ্ডধার ও সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠবীর কর্ণকে বধ করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে রাজ্যলাভের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের সময় যজ্ঞাশ্ব রক্ষার জন্য অর্জুন যাত্রা করেন। ত্রিগর্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, সিন্ধুদেশ জয় করে মণিপুরে নিজপুত্র বভ্রুবাহনের

হস্তে নিহত হন। তখন অর্জুনের স্ত্রী নাগকন্যা উলূপী নাগলোক হতে সঞ্জীবন মণির সাহায্যে তাঁকে পুনর্জীবন দান করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন দ্বারকার নারীদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন। পথে আভীর দস্যুরা যাদব নারীদের লুণ্ঠন করে। কৃষ্ণের মৃত্যু ও নিজের দৈবশক্তি হানির ফলে তিনি দস্যুদের বাধা দিতে অক্ষম হন।

পাণ্ডবগণ অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজা করে মহাপ্রস্থান করেন। পথে লৌহিত্য সাগর তীরে অগ্নিদেবের অনুরোধে অর্জুন গাণ্ডীব-ধনু ও অক্ষয় তূণ দুইটি নিক্ষেপ করেন। হিমালয় পার হয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতনের পর অর্জুনের মৃত্যু হয়। ভীমের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন, অর্জুন একদিনে শত্রু-সৈন্য বিনষ্ট করবার প্রতিজ্ঞা করে তা রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং অন্যান্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন বলেই তাঁর পতন হয়। তার ফলে তাঁর সশরীরে স্বর্গারোহণ সম্ভব হয়নি। অর্জুনের কয়েকটি নাম : সর্বদেশ জয় করে ধন আহরণ করার জন্য ধনঞ্জয়, যুদ্ধে শত্রু জয় করে আসেন বলে বিজয়, শুভ্রাশ্ব-যোজিত রথ বলে শ্বেতবাহন, ফল্গুনী নক্ষত্রযোগে জন্ম বলে ফাল্গুনী, ইন্দ্রদত্ত কিরীটের জন্য কিরীটী, যুদ্ধে বীভৎসতা পরিহার করেন বলে বীভৎসু, উভয় হস্তে শর সন্ধান করতে পারেন বলে সব্যসাচী, শুভ্র (নিষ্কলঙ্ক), তথা শুভ্রবর্ণ বলে অর্জুন শুভ্র, শত্রুজয়ী বলে জিষ্ণু, গুড়াকেশ, মাতার নাম পৃথা (ও কুন্তী) বলে পার্থ। এঁর অক্ষয় তূণীর, গাণ্ডীব-ধনুক ও কপিধ্বজ রথ ছিল।

অতিকায়—রাবণের অন্যতম পুত্র। এঁর বিশাল দেহ ছিল বলে ইনি অতিকায় নামে অভিহিত হন। ইনি অস্ত্র ব্যবহারে এবং হস্তী ও অশ্ব চালনায় সুদক্ষ ছিলেন। যুদ্ধে এক সময়ে ইনি ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও বরুণের পাশকে প্রতিহত করেন। ব্রহ্মার বরে দেবতা ও অসুররা একে বধ করতে পারতেন না। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসকুল ধ্বংস হওয়ায় ইনি যুদ্ধে নিহত হন।

অতিবলা—বিদ্যাবিশেষ। বিশ্বামিত্র কৃশাশ্বমুনির কাছে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন। পরে তিনি নিজের আশ্রমে রাক্ষসের দৌরাত্ম্য নিবারণ করবার জন্য যখন রামকে নিয়ে যান, তখন রামকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে তাড়কা রাক্ষসীর অধিকৃত বনে রামকে প্রবেশ করান। এই বিদ্যার প্রভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না ও রাক্ষসরা কোন অনিষ্ট করতে সক্ষম হয় না।

অত্রি—(১) ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের অন্যতম। অথর্ববেদে এঁর প্রাধান্য দেখা যায়। (২) ব্রহ্মার মানস

পুত্র—তাঁর চক্ষু হতে উৎপন্ন এবং সপ্তর্ষির মধ্যে অন্যতম। কর্দম প্রজাপতির কন্যা অনসূয়া এঁর স্ত্রী। ইনি স্ত্রীর সহিত কোন পর্বতে পুত্রলাভের জন্য তপস্যায় রত হন। তাঁদের তপস্যায় প্রীতিলাভ করে ত্রিমূর্তি উপস্থিত হয়ে তাঁদের অংশ হতে তিনটি পুত্র দান করেন। দত্তাত্রেয়=বিষ্ণু, দুর্বাসা=শিব ও সোম=ব্রহ্মা। (ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ)। (৩) মহাভারতে আছে, ব্রহ্মা প্রথমে যে সপ্তর্ষিদের সৃষ্টি করেন, অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন।

অথর্ববেদ—চতুর্থ বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর দিকের, মতান্তরে পূর্ব দিকের মুখ হতে প্রকাশ হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। অনেকে এই বেদকে বেদ বলে গণ্য করেন না। মনুসংহিতায় ও অমরকোষে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ বলে উল্লিখিত আছে। এই বেদ প্রধানতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। এর বহু শাখার মধ্যে এখন শৌনকশাখা মাত্র পাওয়া যায়। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণভাগের নাম গো-পথব্রাহ্মণ। এতে ৭৩০ সূক্ত ও ২০ খণ্ড আছে। এর কিয়দংশ গদ্যে ও অবশিষ্ট অংশ বৈদিক ছন্দে রচিত।

অথর্বা—একজন ঋষি। ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মা অথর্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ দেন। অথর্বা এই বিদ্যা অঙ্গিরার নিকট প্রকাশ করেন, অঙ্গিরা আবার ভরদ্বাজ বংশের সত্যবাহের কাছে ইহা ব্যক্ত করেন। সত্যবাহ সেই বিদ্যা অঙ্গিরসকে শিক্ষা দেন। অথর্বা প্রথমে অগ্নিকে সৃষ্টি করে আর্যদের মধ্যে যজ্ঞাদি কাজে নিযুক্ত করেন। এবং ইনিই সর্ব প্রথমে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবর্তন করেন।

অঞ্জনা—শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। বানরশ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের কন্যা ও বানর-দলপতি সুমেরুর রাজা কেশরীর স্ত্রী। এঁর গর্ভে ও বায়ুর ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। হনুমান্ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি পূর্বজন্মে পুঞ্জিকস্থলা নামে অপ্সরা ছিলেন। (২) পশ্চিমদিকের হস্তিনী।

অদিতি—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী। ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, বরদমনু ও পর্জন্য—এই দ্বাদশ জন দেবতার ইনি মাতা; এই জন্য ইনি দেবমাতা নামে আখ্যাতা হন। বামন অবতারে বিষ্ণু এঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্র এঁকে সমুদ্রমন্থনলব্ধ কুণ্ডল দান করেন। পারিজাত লাভের জন্য কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে যে বিবাদ হয়, তা ইনি মীমাংসা করে দেন। এঁর ভগিনী দিতি হতে দৈত্যদের জন্ম হয়।

অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠপুত্র শক্তি, শক্তির

স্ত্রী অদৃশ্যন্তী। মহর্ষি শক্তি কল্মাষপাদ রাক্ষস কর্তৃক নিহত হলে অদৃশ্যন্তী পরাশরকে প্রসব করেন।

অদ্রিকা—অপ্সরা অদ্রিকা ব্রহ্মশাপে যমুনার জলে বাস করছিলেন। রাজা উপরিচরের ঔরসে অদ্রিকা মৎস্যরাজ নামে এক পুত্র ও সত্যবতী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। এই সত্যবতীই বেদব্যাসের মাতা।

অধিরথ—কর্ণের পালক পিতা। ইনি একজন ক্ষত্রিয় হয়েও সারথির কাজ করতেন বলে, ইনি সূত অর্থাৎ সারথি নামে পরিচিত। কুন্তী লোকভয়ে তাঁর কুমারী অবস্থাজাত পুত্র কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। একটি কাঠের সিন্দুক নদীর জলে ভাসমান অবস্থায় দেখে অধিরথ জল হতে উঠিয়ে সিন্দুক খুলে দেখেন একটি সুন্দর শিশু। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাধা এই শিশুকে সযত্নে পালন করেন। এই শিশুই পরে কর্ণ নামে সুপরিচিত। অধিরথের স্ত্রী রাধা কর্তৃক প্রতিপালিত বলে কর্ণের অন্য নাম রাধেয়। কুন্তীর পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণকে ইনি নিজ পুত্রবৎ পালন করেন।

অর্ধনারীশ্বর—শিব ও দুর্গার একক মূর্তি। এই মূর্তিতে মহেশ্বর অর্ধ দিকে নারী ও অপর দিকে নর। ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, হস্তে পাশ, রক্তকমল, নরকপাল ও শূল।

অনংশা—নন্দ ও যশোদার কন্যা। কৃষ্ণ এঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এবং এঁর পরামর্শ নিয়ে অনেক সময় কাজ করতেন।

অনরণ্য—ইনি সূর্যবংশের অযোধ্যাধিপতি রাজা। ইনি সম্ভূতের পুত্র। দিগ্বিজয়কালে রাবণের কাছে অনেক রাজা পরাজয় স্বীকার করেন, কিন্তু অনরণ্যই বশ্যতা স্বীকার না করে সসৈন্যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। রাবণের শরাঘাতে রথভ্রষ্ট অনরণ্যের মৃত্যু হয়। ইনি ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথ ও রামের জন্ম এবং রাবণের ধ্বংসের কথা রাবণের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করে স্বর্গে যান। (বিষ্ণুপুরাণ)

অনন্ত—শেষনাগ। নাগদের মধ্যে অনন্তই সর্বপ্রধান। কদ্রুর গর্ভে ও কশ্যপ মুনির ঔরসে এঁর জন্ম। ইনি তুষ্টিকে বিবাহ করেন। ইনি ভ্রাতাদের অসৎ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের ত্যাগ করে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন এবং পৃথিবীকে তাঁর মাথার উপর এমনভাবে ধারণ করতে বলেন যে, যেন পৃথিবী বিচলিত না হয়। এই আদেশ পেয়ে অনন্ত রসাতলে প্রবেশ করেন এবং পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করেন। ব্রহ্মা এতে সন্তুষ্ট হয়ে নাগশত্রু গরুড়কে অনন্তদেবের সখা করে দেন। অনন্তদেবের অন্যান্য নাম — শেষনাগ,

বাসুকি, গোনস। কালিকাপুরাণ-মতে প্রলয়ান্তে নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত অনন্তের মধ্যম ফণায় শয়ন করেন। অনন্তের ছয়টি ফণা শতদলের ন্যায় বিস্তৃত হয়ে বিষ্ণুকে ছত্রের আচ্ছাদনে রক্ষা করে। দক্ষিণ ফণা বিষ্ণুর উপাধান ও উত্তর ফণা পাদপীঠ হয়। বিষ্ণুপুরাণ-মতে ইনি বলরামের অবতার।

অন্তরীক্ষ—(১) ভুবর্লোক, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান। গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষদের বাসস্থান। যযাতি স্বর্গ হতে পতিত হয়ে এই স্থানে অবস্থান করতেন। (২) ইনি অষ্টাবিংশ ব্যাস মধ্যে ত্রয়োদশ ব্যাস। বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাপর যুগে যারা বেদ বিভাগ করেন, তাঁদের নাম ব্যাস। এই মন্বন্তরে ২৮ জন বেদ বিভাগ করেন। এঁদের নাম—স্বয়ম্ভু, প্রজাপতি, উশনাঃ, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্র, এয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণ, গোতম, উত্তম, বেন (রাজশ্রবা), তৃণবিন্দু, ঋক্ষ (বাল্মীকি), শক্তি, পরাশর, জরৎকারু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

অনু—শর্মিষ্ঠার গর্ভে রাজা যযাতির পুত্র। যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। দানবকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর পরিচারিকা ছিলেন। দেবযানীর অজ্ঞাতসারে রাজার ঔরসে শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র হয়। রাজা যযাতিকে এই জন্য শুক্রশাপে অকালে জরাগ্রস্ত হতে হয়; কিন্তু পরে শুক্রাচার্যের আদেশে তিনি পুত্রদের মধ্যে একজনের দেহে ঐ জরা সংক্রামিত করবার ও যৌবন ভোগ করবার অধিকার পান। সমস্ত পুত্রের মধ্যে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র পুরুই পিতার জরাভার গ্রহণ করে। এই জন্য যযাতি অন্য পুত্রদের অভিশাপ দেন। তাঁর শাপে অনু পুরান্বিত হন, ও তাঁর সন্তান যৌবনলাভেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তিনি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াহীন হন। শেষে যযাতি নিজের জরা নিজেই নিয়ে পুত্র পুরুকেই রাজ্য দান করেন।

অন্ধক—ইনি ও এঁর স্ত্রী দুই জনেই অন্ধ ছিলেন। অন্ধক নিজে বৈশ্য এবং তাঁর স্ত্রী শূদ্র-কন্যা। সরযূ নদী-তীরে এক আশ্রমে এঁরা দুইজনে বাস করতেন। একদিন রাজা দশরথ মৃগয়া করতে সেই নদীর তীরে এসে পড়েন। অন্ধকমুনির একমাত্র পুত্র সিন্ধু সেই সময়ে (রাত্রে) কলসীতে জল ভরছিল। দশরথ কলসীতে জলপূর্ণ হবার শব্দকে ভুলক্রমে হরিণ মনে করে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে সিন্ধুকে বধ করেন। পরে ইনি দশরথকে শাপ দেন যে, পুত্রশোকে কাতর হয়ে রাজাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। পুত্রশোকে কাতর হয়ে অন্ধকমুনি

ও তাঁর স্ত্রী জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন করেন।

অন্ধক—দৈত্যর নাম। কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে এই দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। দিতির সমস্ত পুত্রকে দেবতারা হত্যা করেন। সে কারণ দিতি কশ্যপের কাছে দেবতাদের অবধ্য এক পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ সম্মত হয়ে দিতিকে আলিঙ্গন করায় তাঁর আঙুল হতে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের এক হাজার হাত, দুই হাজার চক্ষু ও দুই হাজার পদ ছিল। অন্ধ না হলেও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অন্ধের মত চলত বলে একে অন্ধক বলা হত। ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণী অন্ধকের অত্যাচারে ও উপদ্রবে অস্থির হলে, দেবতারা নারদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন একদিন নারদ সাধারণের অগম্য মন্দারপর্বতের দেবভোগ্য মন্দার পুষ্পমালা গলায় ধারণ করে অন্ধকের ভবনে যান। মালার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অন্ধক উহা সংগ্রহ করবার জন্যে মন্দার পর্বতে যায়। তখন সেখানে মহাদেব উমার সহিত আমোদ-প্রমোদে রত ছিলেন; এমন সময় অন্ধককে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে মহাদেব শূল নিক্ষেপ করেন। মহাদেবের হস্তে অন্ধক নিহত হয়। (হরিবংশ)

অনুশল্য—দৈত্য বিশেষ। কৃষ্ণের উপর এর প্রবল বিদ্বেষ ছিল। এই পরাক্রমশালী দৈত্যকেও কৃষ্ণ ভয় করে চলতেন। একবার পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করবার সময় এই দৈত্য কৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য সসৈন্যে হস্তিনাপুর আক্রমণ করে। ভীম ও অর্জুন এই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। শেষে কর্ণপুত্র বৃষকেতু একে পরাজিত ও বন্দী করে কৃষ্ণের সম্মুখে আনয়ন করেন। কৃষ্ণের উপদেশে এর মনে ধর্মভাব জাগে ও তপস্যা করবার জন্যে বনে গমন করে। (মহাভারত)

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY

অনসূয়া—(১) মহর্ষি অত্রির স্ত্রী। দক্ষপ্রজাপতি ও প্রসূতির কন্যা। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসূয়াশূন্য, তাই তাঁর নাম হয়েছিল অনসূয়া। একদিন অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্রাহ্মণ-অতিথি বেশে তাঁর কুটীরে উপস্থিত হন। অতিথি সংকারের উদ্যোগ করবার আগেই ব্রাহ্মণবেশধারী এই তিন দেবতা তাঁকে জানালেন যে, পুত্ররূপে তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে তাঁরা আতিথ্যগ্রহণ করবেন না। অনসূয়া তিন অতিথির দেহে স্বামীর পাদোদক ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "বালো ভব"; তখন বাৎসল্য হেতু তাঁর স্তন দিয়ে দুধের ধারা প্রবাহিত হল। সেই স্তন্য পান করে এই তিন দেবতা পরম পরিতৃপ্ত হলেন। তাঁর এই অপূর্ব মহিমা দেখে

ত্রিমূর্তি বর দিতে চাইলেন, অনসূয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে পুত্ররূপে কামনা করেন। সতীর এই ইচ্ছা পূর্ণ হল। তিনি তিন পুত্রের জননী হলেন। ব্রহ্মার অংশে সোম, মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয়। বনবাসকালে রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে চিত্রকূটে অত্রিমুনির আশ্রমে অতিথি হন। অনসূয়া তখন অতি বৃদ্ধা। জরাপ্রযুক্ত তাঁর সর্বশরীর শিথিল। পতির পথ-গামিনী হয়ে অনসূয়া কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সীতার বিনয়ে ও মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে অনসূয়া সীতাকে দিব্য বরমাল্য, রত্নাভরণ, অঙ্গরাগ ও গন্ধানুলেপন দান করলেন। এইগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ব্যবহৃত হলেও নিয়ত অম্লান থাকত। (২) কণ্বমুনির কন্যা শকুন্তলা যে সময়ে কণ্বমুনির আশ্রমে ছিলেন, সে সময়ে এই অনসূয়া শকুন্তলার প্রধানা সহচরী ছিলেন।

অয়োমুখী—রামায়ণে বর্ণিত এক রাক্ষসী। সীতাহরণের পর রাম ও লক্ষ্মণ যখন ক্রৌঞ্চারণ্যে সীতান্বেষণে ব্যস্ত, তখন এই রাক্ষসী লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করে। লক্ষ্মণ একে বিতাড়িত করেন।

অনঙ্গ—পুরাকালে দেবতারা বারবার অসুরদের নিকট পরাভূত হন। বিশেষতঃ তারকাসুরের কাছে পরাজিত হয়ে এঁরা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মা বললেন, ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মাবে, সেই হবে দেব-সেনাপতি, তিনিই তারকাসুরকে শাস্তি দিতে পারবেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য কন্দর্প হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। পুষ্প-ধনুতে আকর্ণ টঙ্কার দিয়ে কন্দর্প বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই পুষ্পবাণের আঘাতে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হল এবং তাঁর ক্রোধাগ্নিতে কন্দর্প ভস্মীভূত হলেন। সেই হতে কন্দর্প অঙ্গহীন বা অনঙ্গ নামে পরিচিত। ইনি কামদেব, মদন, কন্দর্প, পঞ্চশর প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইনি দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। একদিন কৈলাস পর্বতে শিবের সঙ্গে পার্বতীর ক্রীড়ারত অবস্থা দেখে, উষা স্বামী সহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে পার্বতী বলেন যে, স্বপ্নে যাকে তুমি দেখবে, সেই তোমার স্বামী হবে। উষা অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে পতিত্বে বরণ করেন এবং দ্বারকা হতে অনিরুদ্ধকে নিজের গৃহে আনবার জন্য সখী চিত্রলেখাকে প্রেরণ করেন। দ্বারকায় নারদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় চিত্রলেখা নারদের পরামর্শে অন্তঃপুরে

প্রবেশ করে নারদ-প্রদত্ত তামসীবিদ্যা প্রভাবে সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে অনিরুদ্ধকে নিয়ে পলায়ন করলেন। তারপর চিত্রলেখার সহিত অনিরুদ্ধ বাণের রাজধানী শোণিতপুরে প্রবেশ করে গোপনে গন্ধর্বমতে উষাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের কথা জানতে পেরে দৈত্যরাজ বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। নারদ এই সংবাদ কৃষ্ণ ও বলরামকে জানান। তখন কৃষ্ণ ও বলরাম শোণিতপুর আক্রমণ করে বাণকে পরাজিত করেন এবং অনিরুদ্ধকে মুক্ত করেন। তখন বাণ এই বিবাহে সম্মতি দেন। পরে তাঁরা দ্বারকায় গমন করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়।

অপর্ণা—হিমালয়ের স্ত্রী মেনকা হতে অপর্ণার জন্ম। অপর্ণা শিবকে স্বামীরূপে পাবার জন্য কঠোর অপস্যায় রত হলে তাঁর মাতা মেনকা দুঃখিত হয়ে 'উ—মা' (অর্থাৎ হে পার্বতী, তপস্যা কোরো না), এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে পার্বতীকে নিষেধ করেন। সেই হতে অপর্ণার অন্য নাম উমা। শিবের আরাধনার সময় উমা অনাহারে থাকতেন, এমন কি গলিত-পত্রও ভক্ষণ করতেন না ; সেই জন্য তাঁর আর একটি নাম অপর্ণা। হরিবংশে আছে, হিমালয়ের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা নামে তিনটি কন্যা হয়। এই তিন ভগিনী কঠিন তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। একপর্ণা গাছের কেবলমাত্র একটি পত্র খেতেন ; সেই জন্য তাঁর নাম একপর্ণা। একপটলা প্রত্যহ একটি পটলা খেতেন, এইজন্য তাঁর নাম একপটলা। আর অপর্ণা একটি পত্রও খেতেন না, সেই জন্য তাঁর নাম অপর্ণা। শিবের সঙ্গে অপর্ণার বিবাহ হয়। অসিত দেবল একপর্ণাকে বিবাহ করেন। একপটলার বিবাহ হয় জৈগীষব্যের সঙ্গে।

অপ্সরা—অপ্ (জল) হতে এরা উৎপন্ন হয়েছিল বলে এদের নাম অপ্সরা। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন সময়ে এরা সমুদ্রের ভিতর হতে অসংখ্য পরিচারিকার সঙ্গে ওঠে। দেবদানব কেউই এদের গ্রহণ করল না, সেই জন্য এরা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হল। মনুসংহিতায় এরা সপ্তমনু সৃষ্ট বলে উল্লিখিত আছে। এরা সংখ্যায় ৬০ কোটি। কামদেব অপ্সরাদের অধিপতি ছিলেন। এরা নৃত্যকলাদিতে পারদর্শিনী। রামায়ণ, মহাভারতে অপ্সরাদের আমরা গন্ধর্বদের স্ত্রীরূপে দেখতে পাই। এরা ইন্দ্রসভায় গায়িকা ও নর্তকীরূপে গন্ধর্বদের সহিত নৃত্য ও সঙ্গীতে যোগদান করে। দেবতারা এদের নানাভাবে নানা কাজে নিযুক্ত করতেন। পাছে কোন মুনি বা ঋষি কঠোর তপস্যাবলে দেবতাদের চেয়েও ক্ষমতাশালী হয়ে

ওঠেন, এই ভয়ে দেবতারা কখন কখন মুনি-ঋষিদের প্রলুব্ধ করে তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য অপ্সরাদের পাঠিয়ে দিতেন। যেমন বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য মেনকাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়। অপ্সরাদের সৌন্দর্য ও যৌন-আবেদনের কথা সব সময়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অপ্সরারা মায়ারূপিণী, সেইজন্য নিজেদের দেহের পরিবর্তন করতে পারত; তারা প্রায়ই মর্ত্যলোকে এসে নানাভাবে মানুষদের সাহায্য করত। অথর্ববেদে আছে, এরা পাশা খেলতে খুব ভালবাসত এবং উক্ত ক্রীড়ায় বিশেষ সুনিপুণ ছিল। অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, সুকেশী, মঞ্জুঘোষা, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্ণা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সরসা, পঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরা স্বর্গের স্বাধীনা নারী।

অবতার—দেবতারা সময়ে সময়ে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আগমন করেন, অথবা আবির্ভূত হন। স্বয়ং ভগবান (পূর্ণব্রহ্ম) বা তাঁর অংশে জীবদেহে পূর্ণাবতার বা অংশাবতার রূপে ধরাধামে অবতরণ করেন এবং অধর্মের নাশ, ধর্মসংস্থাপন এবং জীবোদ্ধার করেন।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা অবতারতত্ত্বের বিবরণ দেখতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা শূকর, কূর্ম ও মৎস্য অবতারে পৃথিবী-সৃষ্টি বা রক্ষা করেন। পৃথিবীর রক্ষক হিসাবে বিষ্ণু অনেকবার অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্কৃত-দমনের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য তাঁকে বারংবার জন্মাতে হয়েছে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"। মহাভারতের যুগে বিষ্ণু যখন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে পরিগণিত হলেন, তখন অবতার বলে তাঁর প্রকাশ আরম্ভ হল। এরপর পুরাণের যুগেই বিষ্ণু দশ অবতারে পূর্ণ প্রকাশ হলেন। এই দশ অবতারের নাম—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। নিম্নে দশ অবতারের বর্ণনা দেওয়া হল:—

(১) মৎস্য অবতার—জলপ্লাবনে বিবস্বত মনুকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান মৎস্য অবতাররূপ গ্রহণ করেন। এই মৎস্য মানবজাতির জন্মদাতা। একটি ক্ষুদ্র মৎস্য মনুর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি এই মৎস্যকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে লাগলেন; পরে সে এত দ্রুত বর্ধিত হতে লাগল যে, সমুদ্রে তাকে স্থাপন করতে হল। মনু এঁর ঈশ্বরত্ব বুঝতে পেরে ভগবানের অবতার বিষ্ণু বলে পূজা করলেন। ভগবান তখন মনুকে আসন্ন প্লাবনের কথা জানালেন।

প্লাবন উপস্থিত হলে ঋষিগণ ও অন্যান্য জিনিসের বীজ সঙ্গে মনুকে নিয়ে একটা নৌকায় উঠলেন। তখন মৎস্যরূপে বিষ্ণু প্রকাণ্ড শিঙ-ধারী হয়ে উপস্থিত হলেন। এই নৌকাকে সর্পরজ্জু দিয়ে শিঙ-এর সহিত বাঁধা হল এবং পরে ক্রমে ক্রমে প্লাবনের জল কমে গেল। এই অবতারে বিষ্ণু দৈত্য হয়গ্রীবকে বধ করে বেদ উদ্ধার করেন।

(২) কূর্ম—প্লাবনে যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য নিমজ্জিত হয়েছিল, তা উদ্ধারের জন্য সত্যযুগে বিষ্ণু কূর্ম-অবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। দুগ্ধ-সাগরের নীচে তিনি নিজেকে স্থাপন করেন এবং তাঁর পিঠকে মন্দার পর্বতের কেন্দ্রে করেন। সর্পরাজ বাসুকীকে তিনি এই পর্বতের চারিদিকে বেষ্টন করে দেন। দুই দলে বিভক্ত হয়ে দেব ও দানবরা সর্পের দুই অংশ রজ্জুরূপে ধারণ করে সমুদ্র মন্থন করতে থাকেন এবং মন্থনকালে ঈপ্সিত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হন।

(৩) বরাহ—দানব হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রের নীচে পৃথিবীকে নিয়ে যায়। পৃথিবী উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু বরাহ অবতাররূপ ধারণ করেন। এক হাজার বৎসর যুদ্ধের পর এই দানবকে হত্যা করে তিনি পৃথিবীকে উত্তোলন করেন।

(৪) নৃসিংহ—দানব হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করবার জন্য বিষ্ণু নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়েছিল। সে দেবতা, মানুষ এবং জন্তুর অবধ্য ছিল। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সেই জন্য পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু হিরণ্যকশিপু এতে অকৃতকার্য হয়। পুত্র প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করে যে, পুত্রের আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু সর্বত্র সর্ববিষয়ে বিদ্যমান আছেন কিনা। উত্তরে পুত্র জানালেন যে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। পিতার সম্মুখস্থ প্রস্তরস্তম্ভেও দেবতা বিদ্যমান আছেন—এই কথা পুত্রের কাছ থেকে জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে পদাঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ হরিভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য এবং নিজের শক্তি প্রমাণিত করার জন্য, নৃসিংহ অবতাররূপে বিষ্ণু সেই স্তম্ভ হতে বেরিয়ে এসে হিরণ্যকশিপুকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। ভগবানের এই চার অবতাররূপ সত্যযুগে প্রকটিত হয়।

(৫) বামন—ত্রেতাযুগে দৈত্যরাজ বলি নানা প্রকার কঠোর অপস্যার ফলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিনটি পৃথিবীর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এর ফলে দেবতারা সর্বপ্রকার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হন।

তাই দেবতাদের রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু বামন রূপে কশ্যপ ও অদিতির পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই বামন বলির কাছে গিয়ে মাত্র তিনবার পদক্ষেপ করার জন্য যে পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন তাহা প্রার্থনা করেন। বলি তথাস্তু বলে বামনকে বিদায় দেন। বিষ্ণুরূপী এই বামন তখন পৃথিবীতে এক পদ ও স্বর্গে অপর পদ স্থাপন করেন এবং বলির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তৃতীয় পদক্ষেপে বিরত হন। সে কারণ পাতালরাজ্য বলির অধিকারে থেকে যায়।

(৬) পরশুরাম—পরশুরাম ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ জমদগ্নীর পুত্র। উদ্ধত ক্ষত্রিয়দের হস্ত হতে ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য তাঁর জন্ম হয়েছিল। (পরশুরাম দ্রষ্টব্য)।

(৭) রামচন্দ্র—সূর্যবংশের রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। বিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করে রাক্ষস-রাজ রাবণকে ধ্বংস করেন।

(৮) কৃষ্ণ—কৃষ্ণকে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার রূপে স্বীকার করা হয়।

(৯) বুদ্ধ—বুদ্ধাবতারে ভগবান জীবক্ষয়কর হিংসানিরোধ করেছিলেন।

(১০) কল্কি—কলিযুগের অন্তে ভগবান বিষ্ণু সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী সুমতীর গর্ভে কল্কি অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শ্বেত অশ্বের উপর আরোহণ করে ধূমকেতুর ন্যায় জ্বলন্ত উন্মুক্ত তরবারি হস্তে উপস্থিত হয়ে দুষ্কৃতদের দমন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

অভয়া—ভগবতীর মূর্তি বিশেষ। ইনি সিংহবাহিনী ও অষ্টভুজা। অসুররা যখন দেবতাদের অত্যাচার করতে আরম্ভ করে, তখন ভগবতী এই রূপ ধারণ করে দানবদের ধ্বংস করে দেবতাদের অভয় দেন। সেই জন্য এই দেবীর নাম অভয়া।

অভিমন্যু—অর্জুন ও কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার পুত্র। নির্ভীক ও মন্যুমান (ক্রোধী বা তেজস্বী) বলে তাঁর নাম অভিমন্যু। অল্প বয়সেই অভিমন্যু পিতা অর্জুনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে অস্ত্রবিশারদ হন। মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। সেই যুদ্ধে অভিমন্যু অসংখ্য কুরুসেনা বিনাশ করেন এবং ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করেন। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা করেন। অর্জুন তখন সংশপ্তকদের সহিত যুদ্ধে অন্যত্র নিযুক্ত ছিলেন। অভিমন্যু চক্রব্যূহের প্রবেশ-প্রণালী জানতেন, কিন্তু নির্গমের উপায় জানতেন না। দ্রোণকে বাধা দেবার কোন উপায় নাই দেখে যুধিষ্ঠির

অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ ভেদ করতে বলেন এবং অভিমন্যুকে রক্ষা করবেন বলে আশ্বাসও দেন। এই আশ্বাসে অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করেন। শল্যপুত্র রুক্মরথ, কর্ণের এক ভ্রাতা ও দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ তাঁর হাতে নিহত হন। অন্যান্য মহারথীরাও পরাস্ত হন। তখন মহাদেবের বরে বলীয়ান জয়দ্রথ ব্যূহমুখ রুদ্ধ করে পাণ্ডবপক্ষকে প্রতিহত করেন। দ্রোণ কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা —এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল ও আরো অনেক রাজা অভিমন্যুর হাতে নিহত হন। অবশেষে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি—একে একে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও রথ ধ্বংস করেন এবং দুঃশাসনের পুত্র তাঁর মস্তকে গদাঘাত করেন। এই ভাবে সকলে মিলে অন্যায় যুদ্ধে তাঁকে নিহত করেন। অভিমন্যুর মৃত্যুকালে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর পরীক্ষিতের জন্ম হয়। ভারত-যুদ্ধে পাণ্ডবদের সমস্ত পুত্র নিহত হলে একমাত্র পরীক্ষিৎই পাণ্ডবদের বংশ রক্ষা করেন। (মহাভারত)

অমরকণ্টক—বিন্ধ্য পর্বতের পূর্ব-দিকের সমতলভূমি; হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান।

অমরাবতী—ইন্দ্রের আলয় ও রাজধানী। এই নগর বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন। সুমেরু পর্বতের উপর ইহা দেবতাদের বাসভূমি। এখানে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু কিছুই নাই। এখানে নন্দনকানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, অপ্সরা ইত্যাদি আছে। নন্দনকাননে মন্দার, পরিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন—এই পাঁচটি বৃক্ষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অলকনন্দা নদী এই অমরাবতীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অপ্সরা ও গন্ধর্বরা নাচে ও গানে দেব-নগরীকে ভূষিত করে রেখেছে।

অমাবসু—উর্বশীর গর্ভজাত পুরুরবার পুত্র। এরা সাত ভাই—আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু বনায়ু, এবং শতায়ু। (হরিবংশ)

অম্বরীষ—ইনি বিষ্ণুভক্ত সূর্যবংশীয় রাজা নাভাসের পুত্র। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে সুদর্শন চক্র দান করেন। একবার রাজা বর্ষব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপন করে ও তিন দিন উপবাসী থেকে দ্বাদশী তিথিতে পারণে বসবেন, এমন সময় দুর্বাসা এসে আহার্য প্রার্থনা করলেন। পরে দুর্বাসা স্নানে গেলেন কিন্তু আর ফিরলেন না দেখে সমাগত ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে রাজা ভোজনে বসলেন এবং মাত্র বিষ্ণুপাদোদক পান করলেন। এমন সময়ে দুর্বাসা নদী হতে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জেনে মহা ক্রুদ্ধ হয়ে জটা ছিন্ন করে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। সেই

জটা প্রকাণ্ড উগ্রদেবতারূপে আবির্ভূত হয়ে অম্বরীষকে বিনাশ করতে গেল। সেই সময়েই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সেখানে এসে উগ্রদেবতাকে ভস্মীভূত করে দুর্বাসাকে বধ করবার জন্যে ধাবিত হল। দুর্বাসা নিরুপায় হয়ে ত্রিভুবনে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। তিনি অম্বরীষের কাছে যেতে বললেন। অবশেষে দুর্বাসা অম্বরীষের শরণাপন্ন হয়ে রক্ষা পেলেন। তারপরে অম্বরীষ পুত্রদের রাজ্য দান করে অরণ্যে তপস্যা করতে চলে গেলেন। (ভাগবত)

অমোঘা—মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী। পরম রূপলাবণ্যবতী অমোঘা ব্রহ্মপুত্র নদের প্রসবিতা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা একবার পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে শান্তনুর আশ্রমে উপস্থিত হন এবং স্ত্রী অমোঘার রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হন। সেই সময়ে শান্তনু অন্যস্থানে গিয়েছিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে ব্রহ্মা অমোঘার সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এতে অমোঘা রুষ্ট হয়ে যেমন ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিতে যাবেন, অমনি ব্রহ্মা তার বীর্য আশ্রমে স্খলিত করে প্রস্থান করলেন। স্বামী ফিরে এলে অমোঘা ব্রহ্মার এই আচরণ স্বামীর কাছে বিবৃত করলেন। কিন্তু শান্তনু সব শুনে মত প্রকাশ করলেন যে, তিনি এতে স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্টই হয়েছেন। যাহোক, তেজ প্রভাবে অমোঘার গর্ভসঞ্চার হল এবং কালক্রমে ব্রহ্মার মত জলরাশি সমেত এক পুত্র জন্মাল। শান্তনু সেই জল একটি কুণ্ডের মধ্যে রেখে দিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সেই জল বৃদ্ধি পেয়ে এক নদের সৃষ্টি হল; সেই নদের নাম ব্রহ্মপুত্র। (কালিকাপুরাণ)

অম্বা—কাশীরাজের প্রথমা কন্যা। এঁর দুই ভগিনী, অম্বিকা ও অম্বালিকা। স্বয়ংবরসভা হতে ভীষ্ম তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য এই তিন কন্যাকে হরণ করে আনেন। কিন্তু অম্বা ভীষ্মের কাছে নিবেদন করেন যে, তিনি পূর্বেই শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন। ভীষ্ম আর দ্বিরুক্তি না করে অম্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অম্বা অপহৃতা হয়েছিলেন বলে শাল্ব তাঁকে আর বিবাহ করতে রাজী হলেন না। অম্বা তখন ভীষ্মের বাল্যগুরু পরশুরামের শরণ নিলেন। গুরু পরশুরাম আদেশ দিলেও ভীষ্ম কিছুতেই অম্বার পাণিগ্রহণে সম্মত হলেন না। গুরুর কথা অমান্য করাতে গুরুশিষ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হল এবং এর ফলে পরশুরাম পরাজিত হলেন। তখন অম্বা ভীষ্মবধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে মহাদেবের তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব বর দিলেন যে, "তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদ গৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করে ভীষ্ম-বধের কারণ হবে।" এই

বর পেয়ে অম্বা চিতাগ্নির মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। পরজন্মে অম্বা প্রথমে দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী হয়ে জন্মান পরে এক দানবের বরে পুরুষ হন। ভীষ্ম-বধের জন্য অর্জুন কৃষ্ণের পরামর্শে এই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল নপুংসক দেখলে ধনুক ধরবেন না। নপুংসক শিখণ্ডীকে দেখে তিনি ধনুক ত্যাগ করেন এবং অর্জুনের শরে মৃতকল্প হয়ে শরশয্যায় থেকে ইচ্ছামৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করেন।

অম্বিকা—(১) কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বালিকা। ভীষ্ম এই তিন ভগিনীকেই স্বয়ংবর-সভা হতে হরণ করে নিয়ে যান এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে এঁর বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য সুন্দরী স্ত্রী-লাভে কামাসক্ত হয়ে সাত বৎসর পরে যক্ষ্মারোগে মারা যান। তখন অম্বিকা শাশুড়ী সত্যবতীর আদেশে ব্যাসের সঙ্গে সহবাস করেন। এই সহবাসের ফলে তাঁর এক অন্ধপুত্র জন্মে। এই পুত্রের নামই ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা শেষ জীবনে কনিষ্ঠা ভগিনী অম্বালিকার সঙ্গে তপস্বিনীর ন্যায় জীবনযাপন করেন।

(২) আদ্যাশক্তি ভগবতীর এক নাম অম্বিকা, ইনি শিবের স্ত্রী। এই নামে ইনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই ভীষণ দৈত্যকে বধ করেন। এই যুদ্ধের ব্যাপারই চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

অম্বালিকা—কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। ভীষ্ম স্বয়ংবরসভায় সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে অন্য দুই ভগিনীর সঙ্গে এই কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যান। ভীষ্মের বিমাতা সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ হয়। কিন্তু সাত বৎসর পরে তাঁর স্বামীর ক্ষয়রোগে মৃত্যু হলে, শান্তনুর বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শাশুড়ী সত্যবতী অম্বালিকাকে মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে পুত্র উৎপাদন করতে উপদেশ দেন। তার ফলে এক পাণ্ডুবর্ণ পুত্র জন্মে। এঁর নাম পাণ্ডু।

অমৃত—সুধা, পীযুষ ও জীবন-বারি, যা দেবতারা পান করে অমর হয়েছেন। মনে হয়, হোমের সময় যে সব জিনিস অর্পণ করা হোত তাদের এই নাম ছিল। বিশেষতঃ সোমরসকেই অমৃত বলা হোত। অমৃতের নির্ঝর এবং পীযুষ নামেও এই সোমরস খ্যাত ছিল।

মহাভারতে অমৃতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে দেবতারা তাঁদের শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সেই জন্য তাঁরা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শক্তি ও অমরত্ব-লাভ প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু দেবতাদের উপদেশ দেন যে, সমুদ্রমন্থন করে

এই অমৃতকে সংগ্রহ কর। বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতমন্থনে সাহায্য করেন। মন্দারপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকী সর্পকে মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত ওঠে।

পুরাণে অমৃত সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—পৃথুরাজার উপদেশ অনুসারে ধরিত্রীকে গাভীরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস করে দেবতাদের দ্বারা হিরণ্ময় পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হলে, তা হতে অমৃত উৎপন্ন হয়। দুর্বাসার অভিশাপে এই অমৃত সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়। পরে ইন্দ্র দুর্বাসার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিষ্ণুর কাছে যান। তখন বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করেন এবং মন্দারপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে মন্থনরজ্জু করে সমুদ্রমন্থন করা হলে, তা হতে অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি উত্থিত হয়।

বায়ু ও মৎস্যপুরাণে আছে—দেব ও অসুরের সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃত উত্থিত হয়। এই সঙ্গে দধি, সুরা, সোম, লক্ষ্মী, অশ্ব, কৌস্তভ, পারিজাত এবং শেষে কালকূট উঠল। তারপর উঠলেন ধন্বন্তরী। অসুরদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিষ্ণু মোহিনী বেশে এই অমৃত দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করলেন। রাহুকে অমৃত গ্রহণ করতে দেখা গেলে তাঁর মস্তক খণ্ডিত হয়। এইরূপে পরাজিত হয়ে অসুররা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়।

অরিষ্ট—(১) অসুর বিশেষ; বলিরাজের ঔরসে এর জন্ম। অরিষ্ট রাজা কংসের প্রিয়পাত্র ছিল। কৃষ্ণকে বধ করবার জন্য কংস একে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। তখন এই অসুর বৃষভের রূপ ধারণ করে গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণ যেখানে ক্রীড়া করছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়। গোপিনীরা অত্যন্ত ভীত হওয়াতে কৃষ্ণ একে বধ করবেন বলে স্থির করেন। তখন এই অসুর কৃষ্ণকে নিকটে পেয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, কৃষ্ণ এর শৃঙ্গ ধারণ করে পীড়ন করেন এবং বাম শৃঙ্গ উৎপাটন করে বধ করলেন। (হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ) (২) বৈবস্বত-মনুর পুত্র, এঁর নাম নাভাগ।

অরিষ্টনেমা—মহাভারতোক্ত ঋষি। জনৈক হৈহয়-রাজকুমার মৃগ-ভ্রমে এঁর পুত্রকে হত্যা করেন। পরে ভ্রম অবগত হয়ে অনুতপ্ত চিত্তে তিনি মুনিপুত্রের পিতার অনুসন্ধান করতে করতে মহর্ষি অরিষ্টনেমার আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সেই মুনিপুত্র জীবিত হয়ে আছেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বললেন, তাঁরা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করেন, ব্রাহ্মণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বলেন, অতিথি সেবা ও ঋষিদের সংসর্গে বাস করেন বলে তাঁদের মৃত্যুভয় নেই।

অরিষ্টনেমি—(১) যক্ষবিশেষ। ইনি বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র। প্রতি মাসে সূর্যরথে এক এক আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস ও এক সর্প নিয়ে ভ্রমণ করতেন। পৌষ মাসে সূর্যরথে অধিষ্ঠিত থাকতেন—আদিত্য, ভগ, ঋষি ক্রতু, গন্ধর্ব উর্ণায়ু, অপ্সরা পূর্বচিত্তি, যক্ষ অরিষ্টনেমি, নাগ কর্কোটক এবং রাক্ষস স্ফূর্জ। ঋষি স্তব করেন, গন্ধর্ব গান করেন, অপ্সরা নৃত্য করে, রাক্ষস পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, নাগ অশ্ব সজ্জিত করে এবং যক্ষ লাগাম লাগায়। সকল শুভ কার্যের স্বস্তিবচনে অরিষ্টনেমির নাম-কীর্তন করা হয়ে থাকে।

(২) জনৈক প্রজাপতি—ইনি দক্ষের ৪টি কন্যা বিবাহ করেন।

অযোধ্যা—সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর কোশলরাজ্যের রাজধানী এবং দিলীপ, রঘু, রামচন্দ্রাদি সূর্যবংশীয় রাজাদের জন্মভূমি। প্রাচীন অযোধ্যা ৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ ও ৮ ক্রোশ প্রস্থ ছিল।

অযোনিসম্ভবা—(১) অযোনি হতে সম্ভব অর্থাৎ উৎপন্ন যারা। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টিযজ্ঞকালে যজ্ঞীয় অগ্নি হতে জন্ম হয়েছিল বলে দ্রৌপদীকে অযোনিসম্ভবা বলা হয়। (২) সীতা, অগস্ত্য, দ্রোণ।

অরুন্ধতী—কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবাহুতির গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি বশিষ্ঠের পত্নী। ইনি অতীব বিদুষী ছিলেন। নিয়মিত তপশ্চর্যার ফলে এঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছিল। পতিভক্তি ও পাতিব্রত্যের ইনি আদর্শ ছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে লিখিত আছে—পতিসেবারূপ ধর্মপথ যে নারী অনুসরণ করেন, তিনি অরুন্ধতীর মত স্বর্গেও পূজিতা হন। আকাশে নক্ষত্ররূপে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী বিরাজ করেন। যাঁরা সপ্তর্ষিমণ্ডলে অরুন্ধতীকে দেখতে না পান, তাঁদের আয়ু শেষ হয়েছে বলে প্রতিপন্ন হয়। বিবাহের কুশণ্ডিকাকালে মন্ত্র উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখান হয়।

অরুণ—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও স্ত্রী বিনতার গর্ভে ডিম্বরূপে এঁর জন্ম হয়; ইনি গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সূর্যের সারথিরূপে সপ্ত অশ্বযুক্ত রথ চালনা করেন। প্রসূত ডিম বহুদিনেও বিদীর্ণ হচ্ছে না অথচ সপত্নী কদ্রুর সান্তনরা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে দেখে, বিনতা অকালেই উক্ত ডিম বিদীর্ণ করে ফেলেন। এই ডিম হতে ঊরুহীন অবস্থায় অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর নাম অনূরু বা ঊরুহীন। অর্ধপুষ্ট অরুণ নির্গত হয়ে মাতাকে অভিসম্পাত দেন: পাঁচশত বৎসর তিনি সপত্নী কদ্রুর দাসী থাকবেন এবং যদি অসময়ে অপর অণ্ড না ভাঙেন, তবে সেই অণ্ডজাত

সন্তান তাঁকে দাসীত্ব থেকে উদ্ধার করবেন। রামায়ণের মতে অরুণের পত্নী শ্যেনীর সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্র হয়।

অরুণা—কশ্যপ পত্নী ও দক্ষের কন্যা কপিলা হতে অরুণা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

অলর্ক—(১) সত্যযুগে দংশ নামে একজন মহাসুর জোর করে ভৃগুমুনির স্ত্রীকে অপহরণ করলে, মুনির শাপে অষ্টপদ বিশিষ্ট অতি তীক্ষ্ণ দন্ত ও ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করে অলর্ক কীট নামে খ্যাত হয়। একবার পরশুরাম পরিশ্রান্ত হয়ে নিজের শিষ্য কর্ণের কোলে যখন মস্তক স্থাপন করে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় এই অলর্ক-কীট রক্তপান করবার জন্য কর্ণের উরুদেশ ভেদ করে উপরে উঠতে থাকে। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে কর্ণ সেই কীটকে বিনাশ বা দূরে নিক্ষেপ করতে সাহস করলেন না। ধৈর্যের সঙ্গে কীটের দংশন-বেদনা সহ্য করতে লাগলেন, পাছে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরে কর্ণের উরু হতে রক্ত পরশুরামের গাত্রে লাগায় তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল এবং কর্ণকে রক্তপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কর্ণের উক্তি শুনে পরশুরাম কীটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র কীট প্রাণত্যাগ করে অসুর-মূর্তি ধারণ করে মুক্তিলাভ করল। (মহাভারত—শান্তি)

(২) চন্দ্রবংশীয় প্রতর্দন রাজার পুত্র। এঁর মাতা মদালসা অতি ধর্মপরায়ণা ও তত্ত্বদর্শিনী নারী ছিলেন। ইনি পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। কথিত আছে, রাক্ষসদের হাত হতে ইনি কাশীরাজ্য নিজের অধীনে এনে মনুষ্যের বাসোপযোগী করেন। যোগাভ্যাস দ্বারা সকল রিপু জয় করে ইনি যোগবলে দেহ-ত্যাগ করেন।

অলকা—হিমালয় পর্বতের উপর অলকানন্দা নদীর তীরে কুবেরের রাজধানী। গন্ধর্বদের বাসস্থান।

অলকানন্দা—গঙ্গোত্রীর কাছে গঙ্গার চার ধারার মধ্যে ... না।
অন্য তিনটি ধারার নাম সী তাঁকে বধ
ভদ্রা। অলকানন্দা ভ প্ররোচনায়
দিক প্রবাহিণী ও সাত ভ দ্রোণকে
হয়ে সমুদ্রে পড়ছে। মা হতঃ'

অলক্ষ্মী—সমুদ্রমন্থন রে বল্লেন,
জ্যেষ্ঠা ভগিনী অলক্ষ্মী 'হলে 'ইতি
রক্তকমলে ভূষিতা হয়ে স রয়ে
আবির্ভূতা হন। দেবাসুরের কেহই তাঁকে বিবাহ করতে রাজী না হওয়ায় দুঃসহ নামে একজন মহাতপা মুনি তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং পরে এঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এঁর বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ, ইনি দ্বিভুজা, হাতে ঝাঁটা, লৌহ-অলঙ্কারে ভূষিতা, গর্দভারূঢ়া। ইনি দুর্ভাগ্যের দেবী।

এবং এঁর সর্বাঙ্গে কাঁকরের চন্দন লিপ্ত।

অলম্বুষ—জটাসুর রাক্ষসের পুত্র। কুন্তীপুত্রগণ জটাসুরকে বধ করাতে পাণ্ডবদের প্রতি অলম্বুষের জাতক্রোধ ছিল। দুর্যোধনের আদেশে এই রাক্ষস কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করে। ঘটোৎকচ বহুক্ষণ এর সহিত যুদ্ধ করে, অবশেষে মায়াযুদ্ধে একে পরাস্ত করে খড়্গাঘাতে এর মস্তক ছেদন করে।

অলম্বুষা—একজন অপ্সরা। কশ্যপের স্ত্রী প্রধার গর্ভে এর জন্ম হয়। রাজা তৃণবিন্দুর সঙ্গে এর বিবাহ হয়। বিশালরাজা এর পুত্র।

নে**অলায়ুধ**—বক রাক্ষসের ভাই। ভীম
(২) ৎর আত্মীয় কিমীর এবং হিড়িম্ব
দক্ষের ৪টি কন্যছিল। এই হত্যাকাণ্ডের
অযোধ্যা—স ণের জন্য এই রাক্ষস বহু
উত্তর কোশলর ভারত যুদ্ধে দুর্যোধনের
দিলীপ, রঘু, হয় এবং ঘোরতর যুদ্ধে
রাজাদের জন্মভূ ঘটোৎকচের হস্তে
৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ ও

অযোনিসম —কুরুপাণ্ডবের অস্ত্র-গুরু
সম্ভব র্যের পুত্র। এঁর মাতা ছিলেন
- পাচার্যের ভগিনী কৃপী। জন্মমাত্রই নবজাতক উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের মতো হ্রেষা রব করেছিলেন বলে, ইনি অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন। ইনি পিতা দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে গুপ্ত অস্ত্রের প্রয়োগে ইনি সিদ্ধহস্ত হন। পিতার কাছ থেকে নারায়ণ প্রদত্ত নারায়ণাস্ত্র এবং ব্রহ্মশির অস্ত্রলাভ করেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে অশ্বত্থামা দ্বারকায় গিয়ে যুদ্ধে অজেয় হবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মশির অস্ত্রের বিনিময়ে কৃষ্ণের কাছ থেকে সুদর্শন-চক্র প্রার্থনা করেন; কিন্তু সুদর্শন উত্তোলন করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁকে নতশিরে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বত্থামা পিতা দ্রোণের সঙ্গে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোণাচার্যের নিধনের পর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের সংহার করবার জন্য নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে সকলে রথ, অস্ত্রাদি ত্যাগ করে অস্ত্রের দিকে পিছন করে দাঁড়ালে এই অস্ত্র বিফল হয়। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা তাঁর কাছে গিয়ে পাণ্ডবদের বিনাশ করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে হতাবশিষ্ট কুরুসৈন্যের সেনাপতি হন। মাতুল কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রে গুপ্তভাবে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব শিবিরের সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব নিধন করেন। এই সময় পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি সেখানে না থাকায় তাঁরা এই গুপ্তহত্যার হাত থেকে রক্ষা পান। পুত্রশোকে দ্রৌপদি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন এবং ভীমকে বলেন,

অশ্বত্থামাকে নিহত করে তার মস্তকের সহজাত মণি না পেলে প্রায়োপবেশন ত্যাগ করবেন না। তখন ভীম অশ্বত্থামাকে হত্যা করবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। অর্জুন ও যুধিষ্ঠির তাঁর অনুগমন করেন। তাঁরা গঙ্গাতীরে এসে দেখেন যে, অশ্বত্থামা ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে আছেন। পাণ্ডবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে এঁদের বিনষ্ট করবার জন্য অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের ইচ্ছা করে একটি ঈষীকা (কাশতৃণ) নিক্ষেপ করলেন। আত্মরক্ষার্থে অর্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র মোচন করলেন। দুই অস্ত্রে প্রলয়ের আশঙ্কায় নারদ ও ব্যাসদেব দুই অগ্নিরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে অস্ত্র প্রত্যাহার করতে বললেন। ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য অর্জুন তাঁর অস্ত্র প্রতিহারে সমর্থ হলেন, কিন্তু সদা সৎপথে না থাকার জন্য অশ্বত্থামা তাঁরঅস্ত্র সংবরণে অসমর্থ হয়ে সেইঅস্ত্র অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করেন। ফলে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হয়, কিন্তু পরে কৃষ্ণ যোগবলে শিশুকে আবার জীবিত করেন। এইরূপে অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করে পাণ্ডবদের মণি দান করে বনগমন করেন। ভীম দ্রৌপদীকে সেই মণি দান করে শোক ত্যাগ করতে বলেন। দ্রৌপদীর অনুরোধে যুধিষ্ঠির সেই মণি মস্তকে ধারণ করেন।

(২) অশ্বত্থামা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে একটি হস্তী ছিল। অজেয় দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধে বিরত করতে না পারলে কিছুতেই তাঁকে বধ করা যাবে না জেনে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের উপদেশ দিলেন যে, তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করুন যে, দ্রোণের প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামা হত হয়েছে। সকলেই এই কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করলেও দ্রোণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বল্লেন, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির যদি অশ্বত্থামার মৃত্যু-সংবাদ তাঁকে বলেন, তবেই তিনি বিশ্বাস করবেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এই মিথ্যাকথা বলতে রাজী হলেন না। ভীম পদাঘাতে ইন্দ্রবর্মার হস্তীকে বধ করলেন। তখন কৃষ্ণের প্ররোচনায় এবং ভীমের সমর্থনে যুধিষ্ঠির দ্রোণকে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'অশ্বত্থামা হতঃ' আর অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে বল্লেন, 'ইতি গজঃ'। যুদ্ধের কোলাহলে 'ইতি গজঃ' শব্দটি দ্রোণের কানে অশ্রুত রয়ে গেল। পুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনে দ্রোণ অস্ত্রত্যাগ করে যোগস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গাঘাতে দ্রোণের শিরশ্ছেদ করেন। এই মিথ্যাভাষণের ফলে যুধিষ্ঠিরের যে রথ সর্বদা ভূমি হতে চার আঙুল উপরে অবস্থান করত তা ভূমিস্পর্শ করে এবং মহাপ্রস্থানের

পর যুধিষ্ঠিরকে নরকদর্শন করতে হয়।

অশ্বমেধ—প্রাচীন ভারতে সকল যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ প্রধান। ভারতে শ্রেষ্ঠ রাজারা নানাপ্রকার কামনায়,—যেমন পুত্র কামনায় বা রাজচক্রবর্তী হয়ে সার্বভৌমত্বপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য—এই যজ্ঞ করতেন। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করবার পর অতি সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব, যা দেখতে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, যার মুখ সুবর্ণের তুল্য, দুই পার্শে অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন-অঙ্কিত, পুচ্ছ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত, উদর কুন্দফুলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, হরিংবর্ণ চরণ, কর্ণ সিন্দুরের ন্যায় রক্তিম, জিহ্বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়, চক্ষু সূর্যের ন্যায় তেজস্কর, বেগবান ও সর্বাঙ্গ সুগন্ধযুক্ত, তার কপালে জয়পত্র বন্ধন করে ছেড়ে দেওয়া হোত। এই অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজারা সসৈন্যে অশ্বের অনুগমন করতেন। এক বৎসরকাল এই অশ্ব পৃথিবীর চারিদিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করত। এর অগ্রগতি কোন বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজা রোধ করতে এলে প্রমাণ হোত যে, তিনি অশ্বাধিকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না। তখন যুদ্ধে শক্তিপরীক্ষা হোত। অশ্ব ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করলে সেই দেশের রাজাকে যুদ্ধ করতে হোত কিংবা বশ্যতা স্বীকার করতে হোত। এইরূপে অশ্বের অধিকারী অন্য সমস্ত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে রাজচক্রবর্তী উপাধিলাভে সমর্থ হতেন। এক বৎসর পরে এই অশ্ব ফিরে এলে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞের সমস্ত কাজ আরম্ভ হোত। যূপবদ্ধ অশ্বটি শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণগণ বধ করতেন। রাত্রে রাজপত্নীগণ অশ্বের মৃতদেহ রক্ষা করতেন। অশ্বের বক্ষঃস্থলের মেধ অগ্নিদগ্ধ করে যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা দগ্ধাবসার ধূম আঘ্রাণ করতেন। অশ্বদেহের অন্যান্য অংশ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে হোম করা হোত। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা এবং নিমন্ত্রিত নৃপতি ও অন্যান্য বর্ণের লোকদের যথাযোগ্য উপহার দিয়ে বিদায় দেওয়া হোত। এই যজ্ঞের ফলে সর্বপ্রকার পাপক্ষয়, স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হোত। শত অশ্বমেধকারী রাজা ইন্দ্রত্বলাভ করতেন। সেই জন্যে ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দুই জনেই অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন।

অশ্বিনী—নক্ষত্রবিশেষ। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের স্ত্রী। এই নক্ষত্রের আকৃতি অশ্বের মস্তকের ন্যায়। এই জন্য এর নাম অশ্বিনী। এই নক্ষত্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে অবস্থান করে বলে, এই মাসের নাম আশ্বিন। চন্দ্রের সাতাশ জন স্ত্রীর মধ্যে ইনি প্রথমা। চন্দ্রমণ্ডলে যে সাতাশটি নক্ষত্র বর্তমান, তার মধ্যে অশ্বমস্তকাকৃতি প্রথম নক্ষত্রটি অশ্বিনী।

অশ্মক—সূর্যবংশীয় রাজা। পুরাণে কথিত আছে, সূর্যবংশীয় সৌদাসের স্ত্রী মদয়ন্তী সাত বৎসর গর্ভধারণ করে একদিন অত্যন্ত অধীরা হয়ে তীক্ষ্ণ অশ্ম (প্রস্তর) দ্বারা নিজের গর্ভপাত করাতে উদরস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই জন্য এই বালক অশ্মক নামে অভিহিত।

অশ্বিনীকুমার—স্বর্গবৈদ্য। বিশ্বকর্মার কন্যার নাম সংজ্ঞা; সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হয়। কিন্তু সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে, তিনি নিজের শরীর থেকে ছায়া নামক এক নারীকে নির্গত করে স্বামীর কাছে রেখে চলে গেলেন। বিশ্বকর্মা পতি-সেবায় বিরত হয়ে চলে আসার জন্যে কন্যাকে ভৎ'সনা করলেন এবং কন্যাকে স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিলেন। সংজ্ঞা স্বামীগৃহে ফিরে না গিয়ে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে উত্তর-কুরুবর্ষে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই সংবাদ পেয়ে সূর্য অশ্বরূপে উত্তর-কুরুবর্ষে গিয়ে অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে সূর্যের ঔরসে অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনী ও রেবন্ত নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। এঁরাই অশ্বিনীকুমার নামে খ্যাত স্বর্গবৈদ্য। পাণ্ডু-পত্নী মাদ্রীর কামনায় নকুল ও সহদেব নামে এঁদের ঔরসজাত দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এঁরা একই রকম দেখতে ও সর্বদা একসঙ্গে থাকতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় পরম সৌন্দর্যের অধিকারী ও চিকিৎসাবিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শী। এঁরা 'চিকিৎসা সারতন্ত্র' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রকৃত বিবরণ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। নিরুক্তকার যস্কের মতে এঁরা ইন্দ্র ও সূর্য; বেদে এঁরা (১) পৃথিবী ও স্বর্গ, (২) দিবা ও রাত্রি (৩) সূর্য ও চন্দ্র (৪) বিবস্বান ও কারণ্যুর যমজ পুত্র (৫) আকাশের পুত্র (৬) সিন্ধুগর্ভ সম্ভূত (৭) দক্ষ সম্ভূত (৮) সুযাত্মাজার স্বামী বলে উক্ত হয়েছেন। এঁরা স্বর্ণরথে দিনে তিনবার ও রাত্রে তিনবার জগৎ ভ্রমণ করেন।

অশ্বসেন—তক্ষকের পুত্র, নাগ বিশেষ। খাণ্ডবদাহনকালে তক্ষক-পত্নী অশ্বসেনকে গলাধঃকরণ করে বাইরে আসবার চেষ্টা করলে, অর্জুন তার শিরশ্ছেদ করেন। তখন ইন্দ্র বায়ু বর্ষণ করে অর্জুনকে মোহাচ্ছন্ন করলে সেই সুযোগে অশ্বসেন মুক্ত হয়। অগ্নি, কৃষ্ণ ও অর্জুন তাকে অভিশাপ দেন যে, সে নিরাশ্রয় হবে। কর্ণার্জুনের যুদ্ধের সময় মাতৃহত্যাকারী অর্জুনকে বধ করবার জন্য অশ্বসেন সর্পবাণ রূপে কর্ণের অজ্ঞাতে তাঁর তূণে প্রবেশ করে। কর্ণ এই বাণরূপ অশ্বসেনকে নিক্ষেপ করলে, সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ পায়ের চাপে অর্জুনের রথ এক হাত নিম্নাভি-

মুখী করার ফলে অর্জুনের বিখ্যাত স্বর্ণকিরীট দগ্ধ হয়। অশ্বসেন কর্ণের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে পুনর্বার বাণরূপে ব্যবহৃত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কর্ণ এক বাণ দুইবার নিক্ষেপ করতে ও অন্যের সাহায্যে জয়ী হতে অসম্মত হওয়ায়, অশ্বসেন নিজেই অর্জুনকে মারবার জন্য ধাবিত হয়। তখন কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন তাঁকে হত্যা করেন। (মহাভারত—আদি ও কর্ণ)

অশ্বপতি—মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্মিক রাজা বাস করতেন। এই রাজা সন্তানলাভের জন্য সাবিত্রীকে আরাধনা করেন। সাবিত্রীদেবীর বরে ইনি এক কন্যারত্ন লাভ করেন এবং এই কন্যার নাম রাখেন সাবিত্রী। দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হয়। সত্যবান অকালে প্রাণত্যাগ করলে, সাবিত্রী তাঁর সতীত্বের মহিমায় স্বামীকে যমালয় হতে ফিরিয়ে আনেন। (মহাভারত—বন)

অষ্টতারিণী—ভগবতীর অষ্ট-মূর্তি—তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সাম্বতী, কামেশ্বরী ও চামুণ্ডা।

অষ্টদিক্‌পাল—আট দিকের পালন-কর্তা। ইন্দ্র—পূর্ব দিকের, অগ্নি—অগ্নি কোণের, যম—দক্ষিণ দিকের, নিঋতি—নৈর্ঋতকোণের, বরুণ—পশ্চিমের, মরুৎ—বায়ুকোণের, কুবের—উত্তরের এবং ঈশ—ঈশানকোণের অধিকারী।

অষ্টদিগ্‌গজ-পূর্বাদি অষ্ট দিকের রক্ষক ৮টি হস্তী। ইহাদের নাম—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতিক।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ—এই অষ্ট প্রকার সর্প।

অষ্টনায়িকা—দুর্গার অষ্ট-শক্তি—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী।

অষ্টদশ পুরাণ—যথাক্রমে ইহাদের নাম—ব্রহ্মা, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্ধ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাবক্র—বিখ্যাত মহর্ষি ও সংহিতাকার। মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিল। তিনি কহোড়ের সঙ্গে নিজ কন্যা সুমতির বিবাহ দেন। সুমতির অন্য নাম সুজাতা। গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ বালক শ্রুতি দ্বারা সর্ববেদজ্ঞ হয়ে ওঠে। সেই গর্ভস্থ অবস্থায় শিশু একদিন পিতা কহোড়ের বেদপাঠ অশুদ্ধ বলায় কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দেন যে, ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই যখন তার স্বভাব এত বক্র, তখন ভূমিষ্ঠ হলে তার দেহের অষ্টস্থান বক্র হবে। গর্ভস্থ শিশু যথাসময়ে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালে তার নাম হয় অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্রের জন্মের পূর্বেই অর্থাভাবে কহোড় জনকরাজার কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখানে বরুণ-পুত্র সভাপণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে কহোড় পরাস্ত হন ও সর্তানুযায়ী বন্দী তাঁকে জলে নিমজ্জিত করেন। বার বৎসর বয়সে অষ্টাবক্র সুজাতার নিকট পিতার দুরবস্থার বিবরণ শুনে তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুর সহিত জনকরাজার সভায় গিয়ে, তর্কে বন্দীকে পরাজিত ক'রে জলমগ্ন পিতাকে উদ্ধার করেন। তখন কহোড সন্তুষ্ট হয়ে অষ্টাবক্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করতে আদেশ করেন। তার ফলে তিনি নদী থেকে অবক্র এবং স্বাভাবিক সুন্দর দেহে উত্থিত হন। সেই কারণে এই নদীর নাম হয় সমঙ্গা। বদান্য-ঋষির কন্যা সুপ্রভার রূপে মুগ্ধ হয়ে অষ্টাবক্র তাঁর পাণি-প্রার্থনা করেন। বদান্য তাঁকে হিমালয় ও কুবেরের ভবনাদির পরে এক বনে জনৈকা বৃদ্ধা তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করে আসতে বলেন। অষ্টাবক্র যথাকালে সেই বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হন। বৃদ্ধা তাঁকে বিধিমতে পরিচর্যা করে প্রতি রাত্রে নানাভাবে তাঁর সংযম পরীক্ষা করেন। অবশেষে তাঁর জিতেন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে আত্মপ্রকাশ করেন ও মহর্ষি বদান্যের অনুরোধে অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করছিলেন বলে জানান। অবশেষে বদান্য তুষ্ট হয়ে কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে অষ্টাবক্রের বিবাহ দেন। অষ্টাবক্র জনক রাজাকে মোক্ষজনক যে উপদেশ সমূহ দেন, তার নামই 'অষ্টাবক্র সংহিতা'।

অষ্টক—মহারাজ যযাতির দৌহিত্র। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইনি একজন পুণ্যবান রাজা। যযাতি পুরুকে রাজ্যভার দান করে বানপ্রস্থে গেলেন এবং কিছুকাল পর স্বর্গে গমন করলেন। কোন্ তপস্যার বলে তিনি স্বর্গে আসতে সমর্থ হয়েছেন, তা ইন্দ্র যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে যযাতি বললেন,—কেহই তাঁর সমকক্ষ তপানুষ্ঠান করতে সক্ষম হয় নাই। এই উক্তি অত্যন্ত অহঙ্কারপূর্ণ ও অন্য সকলের অবমাননাসূচক মনে করে ইন্দ্র যযাতিকে স্বর্গভ্রষ্ট করলেন। স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পতিত হবার সময় যযাতির নিজের দৌহিত্র অষ্টকের সঙ্গে ও অষ্টকের বন্ধু প্রতর্দন, বসুমান ও শিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অষ্টক যযাতিকে অন্তরিক্ষের বা দিব্যের যে কোন স্থান দিতে চাইলেন; প্রতর্দন অন্তরিক্ষের বা স্বর্গের যে কোন স্থান দিতে চাইলেন, বসুমান এবং শিবিও অনুরূপ বললেন। কিন্তু যযাতি বললেন তোমাদের ত্যাগ করে আমি একলা স্বর্গে যাব না, কর্মফলে আমরা স্বর্গ জয় করেছি। এইরূপে অষ্টক, প্রতর্দন

বসুমান ও শিবির সহিত যযাতি স্বর্গে গেলেন।

অষ্টবসু—ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে ধর, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, সাবিত্র, প্রত্যুষ, প্রভাস—এই অষ্টবসুর জন্ম হয়। অন্য মতে—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু (বিষ্ণুপুরাণ)। মহাভারতের মতে—বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত।

অস্তি—কবিরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই কন্যা ছিল। উহারা দুইজন মথুরাপতি কংসের স্ত্রী।

অসুর—বেদের প্রাচীনতম অংশে অসুর অর্থে দেবতা; তুলনা পারসীক আবেস্তার 'আহুর'। দেবতা হিসাবে ইন্দ্র, অগ্নি এবং বরুণকে অসুর বলা হোত। পরে এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়—যারা দেবতার সহিত বিরোধ করে, যারা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত সুধা পায় নাই, তাদেরই অসুর বলে। বেদের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ, ঋক্‌বেদের শেষে এবং অথর্ববেদে যারা দেবতা-বিরোধী, যাদের সুধা নাই—এই অর্থেই এখন ব্যবহার হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে, প্রজাপতির নিঃশ্বাস একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেই প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস হতে অসুরদের সৃষ্টি হয়। শতপথ ব্রাহ্মণেও অসুরদের জন্ম সম্বন্ধে এই একই কথা লেখা আছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে ব্রহ্মার জঙ্ঘা হতে অসুরদের জন্ম। দেব-শত্রুদের এই নামে অভিহিত করা হয়। এরা পূজা ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধ্বংস করত। অসুরদের তিনটি ইন্দ্র ছিল—হিরণ্যকশিপু, বলি ও প্রহ্লাদ (মৎস্যপুরাণ)। এরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতীক এবং তামসে পরিপূর্ণ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। যে সব অসুর দেবতাদের সহিত যুদ্ধে নিহত হোত, তারা পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে নানাপ্রকার বিপদ সৃষ্টি করত (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। এই শ্রেণীতে পড়ে দৈত্য, দানব এবং কশ্যপের বংশধররা; কিন্তু পুলস্ত্যের বংশধর রাক্ষসদের বোঝায় না।

অসমঞ্জ—অযোধ্যার রাজা সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র। সগরের জ্যেষ্ঠা মহিষী বিদর্ভরাজ কন্যা কেশিনী, এবং কনিষ্ঠা মহিষী কশ্যপের কন্যা ও গরুড়ের ভগিনী সুমতি। পুত্র কামনায় সগর দুই পত্নীর সহিত হিমালয়ে শতবর্ষ তপস্যা করলে, মহর্ষি ভৃগুর বরে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জ নামে এক পুত্র ও সুমতির গর্ভে ষাট হাজার পুত্র হয়। কালক্রমে অসমঞ্জ অত্যন্ত পাপচারী ও দুরাত্মা হয়ে উঠল, পিতা তাঁকে নির্বাসিত করেন। সগরের যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে তাঁর ষাট হাজার পুত্র যখন কপিলমুনির ক্রোধে ভস্ম হয়, তখন অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান কপিলমুনিকে

সন্তুষ্ট করে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে আনেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ।

অসিতদেবল—সরস্বতী তীরস্থ আদিত্যতীর্থবাসী গার্হস্থ্য-ধর্মী তপস্বী। একদা ভিক্ষু জৈগীষব্য মুনি দেবলের আশ্রমে এসে সেখানে যোগনিরত হয়ে বাস করতে থাকলেন। তিনি কেবলমাত্র ভোজনকালে উপস্থিত হতেন। একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখতে না পেয়ে ভাবলেন, দীর্ঘকাল এঁর সেবা করা সত্ত্বেও ইনি আমার সঙ্গে আলাপ করেন নি। অবশেষে একটি কলস নিয়ে তিনি আকাশচারী হয়ে মহাসমুদ্রে এসে দেখলেন, জৈগীষব্য তাঁর পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। আশ্রমে ফিরে এসেও দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্ববৎ বসে আছেন। তখন দেবল অন্তরীক্ষ, পিতৃলোক, যমলোক, সূর্যলোক প্রভৃতি সকল স্থানে ভ্রমণ করে জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন। অবশেষে জৈগীষব্য ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হলে, দেবল তাঁর অল্প তপস্যার প্রভাবে সেখানে যেতে অক্ষম হন। পরে আশ্রমে ফিরে এসে দেবল জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষধর্ম গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। মহর্ষি অসিতদেবল হিমালয়-পত্নী মেনকার অন্যতমা কন্যা একপর্ণাকে বিবাহ করেন। ইনি 'অসিতদেবল' 'দেবল' 'অসিত'—এই তিন নামে খ্যাত।

অসিক্নী—বীরণ প্রজাপতির কন্যা ও দক্ষের স্ত্রী। এঁর অন্য নাম বৈরণী। প্রজা-সৃষ্টির জন্য দক্ষ অসিক্নীর গর্ভে প্রথমে হর্যশ্ব নামে পাঁচ হাজার পুত্রের জন্মদান করেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই নারদের উপদেশে সন্ন্যাসী হন। দ্বিতীয়বারে তাঁর গর্ভে শবলাশ্ব প্রভৃতি নামে এক হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পুনরায় তাঁরাও নারদের উপদেশে সন্ন্যাসী হন। তৃতীয় বারে তাঁর গর্ভে ৬০ কন্যা জন্মে। তাদের মধ্যে ধর্ম ১০টি, কশ্যপ ১৩টি, চন্দ্র ২৭টি, অরিষ্টনেমী ৪টি, বহুপুত্র ২টি, অঙ্গিরস ২টি, এবং কৃশাশ্ব ২টিকে বিবাহ করেন। (হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ)

অসিতলোমা—দানব বিশেষ। কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দনুর গর্ভে এর জন্ম। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অসিতলোমা দেবীর সহিত যুদ্ধ করে এবং ব্রহ্মার বরে এই যুদ্ধে জয়ী হয়। এর পরে এই দানব যুদ্ধে বরুণকেও পরাজিত করে। যখন অসিতলোমা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন দেবতারা ভয়ে শিবের শরণাপন্ন হন। কিন্তু এটা সহজসাধ্য কাজ নয় বলে, তিনি দেবতাদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যান। বিষ্ণু এই দানবকে পরাস্ত করবার জন্য একটি স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করেন। বিষ্ণুর শরীর হতে অষ্টাদশভুজা

মহালক্ষ্মী অবির্ভূত হয়ে একে বিনাশ করেন। (দেবীভাগবত)

অহল্যা—ব্রহ্মার মানসী কন্যা ও শতানন্দের জননী। 'হল' শব্দের একটি অর্থা কদর্যতা। সকল প্রকার হল্য বা বিরূপতাশূন্যা অদ্বিতীয়া সুন্দরী বলে সত্যযুগে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট মানসপুত্রীকে অহল্যা নাম দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা অহল্যাকে বহুদিনের জন্য গৌতম ঋষির কাছে রেখে যান। সংযতচিত্ত গৌতম অতি যত্নসহকারে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে তাঁকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় ব্রহ্মার নিকট ফিরিয়ে দেন। ব্রহ্মা এতে সন্তুষ্ট হয়ে গৌতমের হাতে অহল্যাকে দান করেন। ইনি গৌতম ঋষির স্ত্রী ও ধর্মপত্নী। গৌতমের সঙ্গে অহল্যার বিবাহ হওয়ায় ইন্দ্র ঈর্ষান্বিত হয়েওঠেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এই অপূর্ব সুন্দরী নারী তাঁরই প্রাপ্য। একদিন গৌতম স্নান করবার জন্য আশ্রম থেকে অন্যত্র চলে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে অহল্যার কাছে উপস্থিত হন এবং তার সঙ্গম প্রার্থনা করেন। অহল্যা দেবরাজকে চিনতে পেরেও সেই সময় কামার্ত ছিলেন বলে দুর্মতিবশে তাঁর দ্বারা কামনা পরিতৃপ্ত করেন। ইন্দ্র সেই স্থান ত্যাগ করবার পূর্বেই গৌতম উপস্থিত হন। ইন্দ্রকে দেখে ক্রুদ্ধ গৌতম অভিশাপ দেন যে, ইন্দ্র নপুংসক হবেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের অণ্ড খসে পড়ে। ইন্দ্র অতঃপর পিতৃদেবগণের নিকট নিজের দুর্দশা জানালে, তাঁরা মেষাণ্ড উৎপাটিত করে ইন্দ্রের দেহে সংযুক্ত করেন। অতপর তিনি অহল্যাকে অভিশাপ দেন যে, তুমি রূপযৌবনসম্পন্না, কিন্তু তোমার মন অস্থির; সুতরাং জগতে তুমিই কেবল একমাত্র রূপবতী থাকবে না। সহস্র বৎসর তোমাকে এখানে অদৃশ্য অবস্থায় বায়ুভুক্ হয়ে অনাহারে অনুতপ্ত হৃদয়ে জীবনযাপন করতে হবে। একদিন যখন রামচন্দ্র এই গভীর অরণ্যে আসবেন, তখন সেই আতিথিসংকার করে তুমি পাপমুক্ত হবে। তারপর একদিন রাম গৌতমের আশ্রমে এলে তাঁর আগমনের ফলে অহল্যা সর্বপাপমুক্তা হন।

বেদের ভাষ্যকার কুমারিলভট্টের মতে অহল্যা-ইন্দ্র উপাখ্যান একটি রূপকমাত্র। ইন্দ্র সূর্যের এবং অহল্যা রাত্রির রূপকমাত্র। সূর্যোদয়ে রাত্রি অদৃশ্য হয়। এই কাহিনী অবলম্বন করে উপাখ্যানটি কল্পিত হয়। মতান্তরে, অহল্যা উষার রূপক। দিনে ইন্দ্ররূপী সূর্যের উদয়ে, উষা অসূর্যম্পশ্যা হয়। অহল্যা পঞ্চ প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যার অন্যতমা।

আ

আগমনী—গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী মেনকার কন্যা উমা বা পার্বতী বিবাহের পর স্বামীর (শিবের) ঘরে

গিয়েছিলেন। তাঁকে আনবার জন্য এই বিষয় নিয়ে অনেক বাঙালী কবি গীত রচনা করেছেন। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় এই আগমনী গান গেয়ে লোকের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা হয়। আগমনী বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট গান।

আগ্নেয়—(১) দেবসেনাপতি কার্তিকেয় অগ্নিসম্ভূত বলে অগ্নিজ ও আগ্নেয় নামে অভিহিত হতেন। (২) অগ্নিসম্ভূত অঙ্গিরারা আগ্নেয় নামে খ্যাত ছিলেন।

আগ্নেয়াস্ত্র—অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্যকে ভরদ্বাজ প্রদত্ত অস্ত্র। অগ্নিবেশ্য এই অস্ত্র দ্রোণকে দিয়েছিলেন এবং দ্রোণের কাছ থেকে অর্জুন এই অস্ত্র লাভ করেন।

আদিপুরাণ—প্রথম পুরাণ, যাকে সাধারণতঃ ব্রহ্মপুবাণ বলা হয়।

আদিত্য--অদিতির পুত্রগণ। অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বান, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম—এই বারোজন আদিত্যের জন্ম হয়। কালিকাপুরাণে বিধাতার স্থলে সোম। ঋক্‌বেদে একস্থানে আদিত্য-সংখ্যা ৬। যথা—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। স্থানান্তরে ৭ এবং অন্যত্র ৮ দেখা যায়। তৈত্তিরিয়ে—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান-এই আট জন আদিত্য। শতপথ ব্রাহ্মণে বারোজন আদিত্য বারো মাসের প্রতীকস্বরূপ উল্লিখিত আছে। পুরাণে আছে—সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে পিতাকে জানালে বিশ্বকর্মা আদিত্যকে বারো খণ্ডে ভাগ করে সূর্যের তেজ হ্রাস করেন। এই বারো ভাগে বিভক্ত সূর্য বারো নামে বারো মাসে উদিত হন। সেই থেকে সূর্য বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র, পৌষে বিষ্ণু, মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য এবং চৈত্রে বেদজ্ঞ নামে উদিত হন।

আদ্যাশক্তি—মহাদেবের স্ত্রী দুর্গার অন্য নাম।

আত্রেয়ী—ঋষিকন্যা। মহাকবি বাল্মীকির শিষ্যা, ইনি বাল্মীকির কাছে বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি পাঠ করেন। কিন্তু পরে যখন বাল্মীকি সীতা দেবীর পুত্র লব-কুশের শিক্ষাদানে সব সময় কাটাতে লাগলেন, তখন জ্ঞানলাভের আর সুযোগ না পেয়ে আত্রেয়ী বাল্মীকির আশ্রম ত্যাগ করে উপযুক্ত গুরু খুঁজতে লাগলেন এবং মহামুনি অগস্ত্যের কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যা হলেন। ঋষি আত্রেয়ীকে অত্যন্ত যত্নে শিক্ষা দিলেন এবং পরে আত্রেয়ী অদ্বিতীয়া বিদুষীরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

আর্যাবর্ত—পূর্ব-সমুদ্র, পশ্চিম-সমুদ্র, হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বত—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী ভূভাগ।

আয়ান—পূর্বে ইনি একজন ঋষি ছিলেন। এক সময়ে ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত থাকাকালীন নারায়ণ ঋষির সম্মুখে এসে জানালেন যে, তিনি তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এর জন্য তাঁকে বর দেবেন। ঋষি এই বর প্রার্থনা করলেন যে, নারায়ণের স্ত্রী যেন তাঁর স্ত্রী হয়। নারায়ণ এই বর প্রদান করে জানালেনযে, পরজন্মে (দ্বাপরে) লক্ষ্মীকে তিনি পাবেন। কিন্তু তাঁকে ক্লীব হয়ে জন্মাতে হবে। পরে দ্বাপর যুগে লক্ষ্মী (রাধিকা) বৃষভানুরাজার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এইসময় কৃষ্ণেরও জন্ম হোল। রাধিকার সঙ্গে আয়ানের বিবাহ হয়। একদিন শাক্ত আয়ান কালীপূজায় রত ছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ রাধিকার সহিত বনমধ্যে বিহার করছিলেন—এই সংবাদ আয়ানের ভগিনী কুটিলা দেয়। তখন আয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে রাধিকাকে মারতে অগ্রসর হলেন। এতে রাধিকা অত্যন্ত ভীত হওয়ায় কৃষ্ণ কালী মূর্তি ধারণ করলেন এবং রাধিকা কালীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে কালীভক্ত আয়ান রাধিকার উপর সন্তুষ্ট হয়ে কুটিলাকে বিস্তর তিরস্কার করলেন। এরপর আয়ানের মৃত্যু হয়।

আয়োদধৌম্য—মহর্ষি আয়োদধৌম্য একজন আদর্শ ঋষি ও গুরু। তাঁর বেদ, উপমন্যু ও আরুণি নামে তিন জন বিখ্যাত ছাত্র ছিল। আয়োদধৌম্য শিষ্যদের গুরুভক্তি পরীক্ষা করবার জন্য তাদের নানা প্রকার ক্লেশ দিতেন। শিষ্যদের গুরুভক্তি দর্শন করে ও বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী করে গুরু এদের গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি দেন। (মহাভারত)

আয়ুর্বেদ—চিকিৎসাশাস্ত্র। ইহা অথর্ববেদের অন্তর্গত। কারণব্যূহ মতে ইহা ঋক্‌বেদের উপবেদ, একে পঞ্চম-বেদ বলা হয়। প্রজাপতি চার বেদ হতে স্বতন্ত্র পঞ্চম-বেদ নামে অভিহিত আয়ুর্বেদ রচনা করে সূর্যকে প্রদান করেন। সূর্যও এক স্বতন্ত্র সংহিতা রচনা করে উভয় গ্রন্থ ধন্বন্তরি অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি ১৬ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। এঁরা প্রত্যেকে আবার এক এক খানি চিকিৎসাশাস্ত্র রচনা করেন। পরবর্তী পণ্ডিতেরা এই তন্ত্রসিন্ধু মন্থন করে নানা জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করেন। শল্য, শলাকা, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র এই আটভাগে আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিভক্ত।

আরুণি—এক ব্রাহ্মণকুমার। পূর্বোল্লিখিত আয়োদধৌম্য নামক ঋষির শিষ্য। আরুণি সর্বদা গুরুর আদেশ সযত্নে পালন করতেন।

একদিন মহর্ষি আরুণিকে ক্ষেত্রের জল নির্গমনস্থানে আল বাঁধতে আদেশ দিলেন। আল বাঁধতে অসমর্থ হয়ে আরুণি আলের মধ্যে শয়ন করে নিজের শরীর দিয়ে জলস্রোত রোধ করলে। এদিকে গুরু শিষ্য প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখে আরুণিকে ডাকতে লাগলেন এবং তথায় উপস্থিত হলেন। গুরুর সন্ধানে আরুণি আল হতে উঠে এসে বললেন—আমি জলপ্রবাহ রোধে অসমর্থ হয়ে শয়ন করে জল রোধ করছিলাম। আয়োদধৌম্য এই কথা শ্রবণে প্রীত হয়ে তখন বললেন, তুমি কেদার খণ্ড (ক্ষেত্রের আল) ভেদ করে উঠেছ বলে তোমার নাম উদ্দালক হোল এবং আমার আজ্ঞা পালন করেছ বলে সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র সর্বদা তোমার কণ্ঠস্থ থাকবে। (মহাভারত)

আরণ্যক—বেদের উপসংহার ভাগ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ আরণ্যক। ব্রহ্মচর্য গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে বাস করবার সময় গুরুর কাছে যে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ হোত, আরণ্যকে তা লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে এর উৎপত্তি বলে এর নাম আরণ্যক। যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য যেমন ব্রাহ্মণখণ্ডের প্রয়োজন, বানপ্রস্থাবলম্বীর জন্য সেইরূপ আরণ্যকের প্রয়োজন। আরণ্যকের সংখ্যা চার—বৃহৎ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় এবং কৌশিতকী। উপনিষদের সঙ্গে আরণ্যকের নিকট সম্বন্ধ। সেই জন্য এদের অনেক সময় বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ঐতরেয় উপনিষদ, কৌশীতকী উপনিষদ বলা হয়।

আশ্রম—ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রার চারিটি অবস্থা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য—ছাত্রাবস্থা, গুরুগৃহ বাস, গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন ও শিক্ষা। গার্হস্থ্য—গৃহী সংসারী হয়ে বিবাহিত অবস্থায় সংসারধর্ম পালন করা, পূজার্চনা, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি করা। বানপ্রস্থ—৫০ বৎসরের পর সংসারের কাজ শেষ করে বন গমন। সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করে ফলাহার, ভগবৎপূজা ও চিন্তায় অতিবাহিত করা। সন্ন্যাস—সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ ও ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করা। সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের হাতে জীবন সমর্পণ।

আস্তিক—জরৎকারু মুনিও তাঁর পত্নী নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর বা মনসাদেবীর সন্তান। এঁর মাতা নাগরাজ বাসুকির ভগিনী। জরৎকারু মুনির নিদ্রাভঙ্গ করে অপ্রিয় হওয়ায় তিনি তাঁর গর্ভবতী পত্নীকে ত্যাগ করে যাবার সময় গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"অস্ত্যয়ং সুভসে গর্ভস্তব," ইত্যাদি। 'অস্তি' পদাদি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, সেই জন্য এঁর নাম আস্তিক। অর্জুনের

পৌত্র এবং অভিমন্যুর পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ-এর ব্রহ্মশাপে তক্ষক দংশনে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র জনমেজয় সর্পসত্র করে নাগবংশ নির্মূল করতে চান। বাসুকী এই ঘটনা ভগ্নীর সাহায্যে আস্তিককে জানান। আস্তিক যজ্ঞস্থানে গিয়ে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করে মাতৃশাপে বিলুপ্তপ্রায় সর্পকূলকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন। আস্তিকের নাম স্মরণ করলে সর্পভয় দূর হয়।

আকুতি—মনু হইতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র ও আকুতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। মহর্ষি রুচির স্ত্রী আকুতি দক্ষিণা নামে এক কন্যা, যজ্ঞ নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

আগ্নিমাঠর—মহর্ষি বাস্কল ঋগ্‌-বেদের প্রথম চার শাখাকে চার ভাগে বিভক্ত করে বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামে নিজের চার জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান।

আপস্তম্ভ—অষ্টাদশ ধর্মশাস্ত্রকারের মধ্যে ইনি অন্যতম। এঁর লিখিত আপস্তম্ভ সংহিতা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থে কেবল প্রায়শ্চিত্তবিধি সবিস্তারে লেখা আছে। ইনি কল্পসূত্র সংকলন করেছিলেন। কেহ কেহ কল্পসূত্রকে বেদের সমপর্যায় জ্ঞান করে থাকেন। অনেকের মতে বৌধায়ন, আপস্তম্ভ, আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন প্রভৃতি লিখিত কল্পসূত্রাদি অপৌরুষেয়।

আপস্তম্ভ—একজন ঋষি। যখন দিতি নিজের স্বামী কশ্যপের নিকট 'ইন্দ্রহন্তা' পুত্র প্রার্থনা করেন, তখন কশ্যপ আপস্তম্ভ দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে বলায় অপস্তম্ভ বেদ-বিধান অনুসারে কার্য সম্পন্ন করেন। পূর্ণাহুতির সময় ইনি বলেছিন, ইন্দ্রহন্তা অমিততেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করুক। (অগ্নিপুরাণ)

আয়ু—চন্দ্রবংশের রাজা। পিতা পুরুরবা, মাতা উর্বশী। ইনি চ্যবন ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিত হন। এঁর নহুষ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। রাজকন্যা প্রভাকে ইনি বিবাহ করেন।

আহুক—প্রাচীন ভোজ রাজবংশের একজন পরাক্রান্ত ও চরিত্রবান রাজা। যে সময় কৃষ্ণ জরাসন্ধ জামাতা কংসকে নিহত করেন, উক্ত সময় জরাসন্ধ কৃষ্ণকে নিহত করার জন্য যুদ্ধের উদ্যোগ করলে, আহুক তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। বলদেবের সঙ্গে আহুকের যুদ্ধ হয় এবং এর ফলে আহুক পরাজিত হন। তারপর ভীষ্মকের সঙ্গে যুদ্ধেও তিনি পরাজিত হন। আহুকের পত্নীর নাম কাশ্যা।

ই

ইক্ষ্বাকু—সূর্যবংশীয় রাজাদের আদি-পুরুষ। বৈবস্বত মনুর পুত্র এবং হাঁচবার সময় (অর্থাৎ ক্ষুৎ) মনুর নাসিকা থেকে উৎপন্ন। ইনি

অযোধ্যার রাজা। ইনি বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক ইত্যাদি একশত পুত্রের পিতা। এদের মধ্যে পঁচিশ জন পশ্চিমদেশ, তিন জন মধ্যদেশ এবং অবশিষ্টরা অন্যান্য দেশ শাসন করত। এঁর নাম হতে এই বংশের নাম হয় ইক্ষ্বাকু বংশ। সূর্যবংশের ইনি স্থাপয়িতা। এই বংশ শান্তনু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই ইক্ষ্বাকু বংশেই রামচন্দ্রের জন্ম হয়। একদিন ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শশক মাংস আনতে বললেন। পুত্র মৃগয়া করে শশক মাংস সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধিত হওয়ায় তিনি সেই মাংস ভক্ষণ করে ফেলেন। এতে পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিকুক্ষিকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন। কিছুকাল পরে ইক্ষ্বাকুর মৃত্যু হলে, বিকুক্ষিই রাজা হন।

ইড়া—মনু প্রজা-সৃষ্টির মানসে এক পাকযন্ত্র তৈরী করেন। তিনি যজ্ঞের জন্য ঘি, মাখন ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করেন এবং এর ফলে এক বৎসরের মধ্যে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বালিকা জল হতে উত্থিত হলে পর, মিত্র-বরুণ তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কে? এর উত্তরে কন্যা বলেন, আমি মনুর কন্যা। তখন মিত্র-বরুণ বলেন, তুমি আমার। কন্যা তখন কোন উত্তর না দিয়ে মনুর কাছে যান। মনুর প্রশ্নের উত্তরে ইড়া বললেন যে, আমি আপনার কন্যা, আপনার ঘি, মাখন ও আমিক্ষা হইতে আমার জন্ম। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন। মনু তাকে দিয়ে কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ)

ইন্দুমতী—বিদর্ভের রাজা ভোজের কন্যা এবং সূর্যবংশের রাজা রঘুর পুত্র অজের স্ত্রী। স্বয়ংবর সভায় অন্যান্য রাজাকে উপেক্ষা করে ইনি রাজা অজের গলায় মাল্যদান করেন। অন্যান্য রাজারা ঈর্ষান্বিত হয়ে অজকে আক্রমণ করেন কিন্তু অজ সম্মোহন অস্ত্রের সাহায্যে সকলকে পরাজিত করেন। ইন্দুমতীর গর্ভে রাম, লক্ষণ প্রভৃতির পিতা দশরথ জন্মগ্রহণ করেন একদিন ইন্দুমতী উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন, এমন সময় শূন্য-পথগামী নারদের বীণা-চ্যুত হয়ে পারিজাত মাল্য তাঁর দেহের উপর পতিত হয়। উক্ত মাল্যের স্পর্শমাত্রেই ইন্দুমতী প্রাণত্যাগ করেন এবং অপ্সরার মূর্তি ধারণ করে স্বর্গে প্রস্থান করেন।

পুরাকালে তৃণবিন্দু নামে এক ঋষির কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র হরিণী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর তপোভঙ্গ করতে পাঠান। মুনির তপোভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর কোপে পড়ে মনুষ্য-যোনীতে জন্মগ্রহণ করে বিদর্ভ-রাজ গৃহে হরিণী ইন্দুমতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে অপ্সরার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মুনি

বলেছিলেন, স্বর্গীয় কুসুম স্পর্শনে তার শাপ-মুক্তি হবে।

ইন্দ্র—ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান প্রথম। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শক্তি-সম্পন্ন। কিন্তু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন শক্তির তিনি অধীন। অপর সকল দেবতার উপর ইনি কর্তৃত্ব করেন বলে ইনি দেবরাজ নামে বিখ্যাত। ইনি স্বয়ম্ভু নন।

ঋগ্‌বেদের দুইটি সূক্তে (৩।৪৮, ৪।১৮) তাঁর জন্মের বিবরণ আছে। তিনি মাতৃগর্ভ থেকেই মাতার পার্শ্ব ভেদ করে জন্মাবার চেষ্টা করেন। জন্মগ্রহণ করেই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩।৪৪।৪)। তিনি জন্মাবধিই যোদ্ধা (৩।৫১।৮, ৫।৩০।৫, ৮।৪৫।৪) ও শত্রুদমনকারী (১০।১১৩।৪ ও অজেয় (১০।১৩৩।২)। তাঁর জন্মসময়ে ভয়ে পর্বত, আকাশ, পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল (৪।১৭।২) এবং দেবগণ ভীত হয়েছিলেন। তাঁর মাতা অদিতি। দেবগণ তাঁকে রাক্ষস বধের জন্য সৃষ্টি করেন (৩।৪৯।১)। পুরুষসূক্তে (১০।৯০।১৩) ইন্দ্র ও অগ্নি পুরুষের মুখ হতে উৎপন্ন বলা হয়েছে। তিনি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র ও জনক দুই-ই (১০।৫৪।৩)। তাঁর পিতা দ্যো ও ত্বষ্টা। অগ্নি ও পূষা তাঁর ভ্রাতা। তাঁর স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও শচী।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, অমৃত নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণ নিহত ও পরাজিত হলে ইন্দ্রের বিমাতা অসুর-জননী দিতি কশ্যপের কাছে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারে এমন সন্তান প্রার্থনা করেন। কশ্যপ বলেন, দিতি যদি এক সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকেন, তবে প্রার্থিত পুত্র লাভ করবেন। নয়শত নব্বই বৎসর তপস্যা করার পর একদিন মধ্যাহ্নে দিতি মাথার দিকে পা ও পায়ের দিকে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছেন দেখে, ইন্দ্র তাঁকে অশুচি জ্ঞানে তাঁর উদরে প্রবেশ করে বজ্রদ্বারা গর্ভ সপ্ত খণ্ড করেন। গর্ভস্থ শিশু কেঁদে ওঠায় ইন্দ্র 'মা রুদ' 'মা রুদ' (কেঁদো না) বলে শিশুকে কেটে ফেলেন। পরে সেই শিশু যখন সপ্তমূর্তি ধরে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাঁদের নাম হয় মারুত এবং এই রূপেই তাঁরা সপ্তলোকে বিচরণ করতে থাকেন।

ইন্দ্রের বর্ণ কেশ শ্মশ্রু অশ্ব রথ সবই হরিৎ বা পিঙ্গলবর্ণ। তাঁর দুই দীর্ঘ হস্ত, তাঁর অস্ত্র বজ্র, ধনুর্বাণ অঙ্কুশ। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ—সহস্র সহস্র নক্ষত্রে বিভূষিত আকাশই ইন্দ্র। এছাড়া তিনি প্রকাণ্ড কাঁটা ও জাল দ্বারা শত্রুদের জড়িত করতেন।

সোমরস তাঁর প্রিয় পানীয়। ইন্দ্র জন্মিয়াই তাঁর মাতা অদিতির স্তনে সোম দর্শন করেন (৩।৪৮।৩)। তিনি

পিতা ত্বষ্টার সোম বলপূর্বক পান করেন (৪।১৮।৩,। সোমরস পান করতে করতে তাঁর উদর স্ফীত হয়েছে এবং দাড়িতে জট. বেঁধেছে। সোমরস রাখবার ঘটের নামই হয়েছিল ইন্দ্রোদর। ইন্দ্রের উদর সোমরসের হ্রদ (৩।৩৬।৮)। তিনি এক চুমুকে ত্রিশ হ্রদ সোমরস পান করেন (৮।৬৬।৪)। সোমপানে উত্তেজিত হয়ে তিনি মহাযোদ্ধা, বৃত্রহা। সোম হতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি (৯।৯৬।৫)। বায়ুমণ্ডলের দেবতারূপে আবহাওয়ার ও বৃষ্টিপাতের উপর তাঁর প্রভূত আধিপত্য ছিল। বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাহায্যে তিনি অনাবৃষ্টি ও অতি-বৃষ্টি ঘটাতেন। হস্তে বজ্র থাকলেও রথে আরোহণ করে তীর-ধনুক ও বর্শার সাহায্যে তিনি যুদ্ধ করতেন। তিনি বহুভোজী ও চির-যুবা।

ইন্দ্রের বর্ণনা ঋগ্‌বেদের চতুর্থাংশ (২৫০ সূক্ত) জুড়ে আছে। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে আরও ৫০টি সূক্তে ইন্দ্রের বর্ণনা দেখা যায়। ইন্দ্র প্রাকৃতিক ব্যাপারে অধিষ্ঠাতা দেবতা, অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা এবং তিনি প্রধানতঃ ঝড়-বজ্রেরও দেবতা। তিনি অনাবৃষ্টি ও অন্ধকার-রূপ অসুরকে বিনাশ করেন। বৃত্র বা ব্যাপক মেঘকে তিনি বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করেন। তিনি জলকে প্রমুক্ত করেন ; তিনি আলোক বিজয় করেন। তাঁর সেবকার ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য লৌহ ও প্রস্তর দিয়ে তীক্ষ্ণ বহুসূচীমুখ ও হিরণ্যবর্ণ বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। ইন্দ্রের শরীর প্রকাণ্ড, শক্তি প্রচুর, তিনি বজ্রবাহু। তিনি সুর ও অসুর। তিনি হিরণ্ময় রথারূঢ় ও মনোরথ। হরিৎবর্ণ শত সহস্র সূর্যচক্ষু অশ্ব তাঁর রথ বহন করে (৪।৪৬।৩, ৬।৪৭।১৮)। ইন্দ্রের রথ ও অশ্ব ঋভুগণের নির্মিত। ইন্দ্র যখন সোম-পানোন্মত্ত হয়ে বজ্র নিয়ে মরুৎগণের সাহায্যে অনাবৃষ্টির অসুর অহি-বৃত্রকে আক্রমণ করেন, তখন আকাশ ও পৃথিবী প্রকম্পিত হয় (১।৮০।১১)। জলরোধকারী বৃত্রকে তিনি বজ্রে বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে পর্বত বিদীর্ণ করে বন্দী জলকে গোষ্ঠবদ্ধ গাভীগণের ন্যায় বিমুক্ত করেন। পর্বতে ও মেঘে যে দৈত্যদের বাস, তাদের পরাজিত করে ইন্দ্র জলকে মুক্তি দেন।

ইন্দ্রের শত্রু—রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, অ[illegible] উরণ, বিশ্বরূপ, অর্বুদ, বল প্রভৃতি দানব। ইন্দ্র অহিকে অপহৃত করলেই আকাশে সূর্য দীপ্যমান হন। তিনি উষাকে প্রকাশিত করেন। তখন অন্ধকার গোষ্ঠ হইতে মুক্ত গাভীগুলির ন্যায় সূর্যকিরণ বহির্গত হয়। এজন্য তিনি গো-পতি। শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে ইন্দ্রত্বলাভ হয়। সেই কারণ ইন্দ্রের নাম

শতমুখ, শতক্রতু ও শতমন্যু। শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে পাছে কেউ ইন্দ্রত্ব লাভ করে, এই ভয়ে ইন্দ্র তপস্বীদের তপস্যা ও সাধনায় নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন। এই ছিল তাঁর আত্মরক্ষার একটি প্রধান উপায়। ইন্দ্র অসুরদের চিরশত্রু। অসুরদের অত্যাচার হতে রক্ষা লাভের জন্য এবং স্বর্গরাজ্য যাতে অসুরদের হস্তগত না হয় সে জন্য, তিনি তাদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে তাদের বিনাশ করতেন; কিন্তু এদের হস্তে তিনি পরাস্তও হয়েছিলেন। এইরূপে অসুরদের প্রধান—বৃত্র, নমুচি, বল, জম্ভ, অহি, চুমুরি, ধুনি, পিপন, শুষ্ণ প্রভৃতিগণ তাঁর হাতে নিধনপ্রাপ্ত হয়। এই জন্য ইন্দ্র বৃত্রহা, বৃত্রঘ্ন, নমুচিসূদন, জম্ভভেদী, জম্ভভেদন, বলরিপু, বলভিদ, বলভেদন, বলারাতি, পুরুহুত, পাকশাসন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে খ্যাত। ইনি অসুরপুরী ধ্বংস করার জন্য পুরন্দর নামেও পরিচিত। মেঘ বাহন বলে এঁর নাম মেঘবাহন, বারিবর্ষণ করেন বলে ইনি বৃষা। প্রধান অস্ত্রস্বরূপ বজ্রকে ধারণ করেন বলে, এঁর নাম গোত্রভিদ, বজ্রী, আখণ্ডল। এঁর অশ্বগণ হরিদ্বর্ণ বলে, এঁর নাম হরিহয়, হরিদশ্ব। ইনি পূর্বকোণের শাসক, স্বর্গরাজ্যের রাজা। বেদে এঁর যে সব বিশেষত্বের কথা উল্লেখ আছে, তার সবই পৌরাণিক যুগেও বর্তমান ছিল। এখানেও তিনি বজ্র ও বিদ্যুতের নিক্ষেপক।

একবার তিনি বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পরে দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করে স্বর্গরাজ্য জয় করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সোমরস পানের মাত্রা বর্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয়াসক্তিও প্রবল হয়।

কথিত আছে যে, একদা সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার উদ্দেশে দারুণ তপস্যা করে। তখন ব্রহ্মা তাদের বর দেন যে, তাদের পরস্পরের হাতে ভিন্ন কাহারও মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা তাদের নিহত করবার জন্য তিলোত্তমা নামে এক অপরূপ সুন্দরী নারীর সৃষ্টি করেন। সমস্ত প্রাণীর সবচেয়ে সুন্দর অঙ্গ তিল তিল করে নিয়ে এই নারীমূর্তি সৃষ্টি হয়েছিল বলে এই নারীর নাম হয় তিলোত্তমা। ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করতে যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ করে। তিলোত্তমাকে দেখবার জন্য তার গমনপথের অনুসরণে ব্রহ্মার চার দিকে চারটি মুখ নির্গত হয়, এই ঘটনা হতেই তিনি চতুর্মুখ হন। ইন্দ্রের সহস্র নয়ন হল এবং শিব স্থির হয়ে ছিলেন বলে তাঁর নাম হয় স্থাণু। তারপর সুরা-পানমত্ত সুন্দ-উপসুন্দের

কাছে তিলোত্তমা উপস্থিত হলে, তাকে লাভ করার জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হয়। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র তাঁর রূপ ধারণ করে স্ত্রী অহল্যার সতীত্বনাশ করেন বলে মুনির শাপে তাঁর সমস্ত দেহে সহস্র যোনি-চিহ্ন প্রকাশ পায়। ইন্দ্রের অনুনয়-বিনয়ে গৌতম ঐ চিহ্নগুলি লোচন-চিহ্নে পরিণত করেন। এই জন্য ইন্দ্রের আর এক নাম সহস্রাক্ষ বা নেত্রযোনি। রামায়ণের কাহিনী অনুসারে গৌতমের শাপে ইন্দ্রের অণ্ড খসে পড়ে; পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মেষাণ্ড সংযোগে ইন্দ্রের পুরুষত্ব ফিরিয়ে আনেন। রামায়ণে কথিত আছে যে, রাবণ স্বর্গে গিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকারের জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। রাবণ-পুত্র মেঘনাদ কর্তৃক পরাজিত ইন্দ্র লঙ্কায় নীত হন। এই জন্য মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নামে সুপরিচিত। ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুক্তি প্রার্থনা করলে ইন্দ্রজিৎ অমরত্বের বিনিময়ে ইন্দ্রের মুক্তি দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু ব্রহ্মা তা প্রত্যাখ্যান করায় ইন্দ্রজিৎ বর প্রার্থনা করেন যে, অগ্নিপূজা করলে অগ্নি হতে তাঁর জন্য অশ্ব সমেত রথ উত্থিত হবে এবং সেই রথে আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করলে ইন্দ্রজিৎ অবধ্য হবেন। অভীষ্ট বরের বিনিময়ে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে মুক্ত করেন এবং বলেন যে, অহল্যার সতীত্ব নাশের জন্যই ইন্দ্রের এই দুর্গতি।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, ইন্দ্র যৌন-আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করেন। অন্যান্য গ্রন্থে আছে তিনি ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং শাপ হতে রক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রাণীর পিতা পুলোমাকে হত্যা করেন।

মহাভারতে কথিত আছে যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এঁর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং অর্জুনের জন্যই তিনি কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করে তার পরিবর্তে অব্যর্থ শক্তি-অস্ত্র দান করেন।

একবার তিনি ঋষি দুর্বাসার প্রদত্ত মালা প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধ ঋষি অভিশাপ দেন যে, তাঁর সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হবে। ইন্দ্র দৈত্যদের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে এমন দুর্দশাগ্রস্ত হন যে, সামান্য গবঘ্যতের জন্যও তাঁকে ভিক্ষা করতে হয়।

পুরাণে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রজবাসীরা এক সময়ে ইন্দ্রের উপাসক ছিল। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় তারা ইন্দ্রের উপাসনা ত্যাগ করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সৃষ্টি করে তাদের দেশ প্লাবিত করতে থাকেন। তখন কৃষ্ণ আঙুলে গোবর্ধনপর্বত ধারণ করে ব্রজবাসীদের রক্ষা করেন। একবার

কৃষ্ণ তাঁর স্ত্রী সত্যভামার অনুরোধে ইন্দ্রের পারিজাত বৃক্ষ কেড়ে নেন। তখন ইন্দ্রাণীর প্ররোচনায় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্র কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের ফলে ইন্দ্র পরাজিত হন। পরে কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের সদ্ভাব স্থাপিত হয়।

ইন্দ্রের পুত্রের নাম—জয়ন্ত। জয়ন্ত ব্যতীত ইন্দ্রপুত্র—বালী ও অর্জুন। কন্যা—জয়ন্তী। এঁর নগরীর নাম—অমরাবতী। উদ্যান—নন্দন। প্রমোদপুরী—বৈজয়ন্ত। অশ্ব—উচ্চৈঃশ্রবা। হস্তী—ঐরাবত। রথ—বিমান। রথচালক—মাতলি। তরবারি—পারঞ্জ। ধনু—ইন্দ্রচাপ। অস্ত্র—বজ্র।

এইরূপ মত প্রচলিত আছে যে, স্বর্গরাজ্যের যিনি অধিপতি হতেন, তিনিই 'ইন্দ্র' উপাধি লাভ করতেন। ইনি আদিত্যগণের অন্যতম। ইনি সংবর্ত, পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর বলে মর্ত্যের রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণ শস্য ও অন্নের প্রাচুর্য কামনায় ইন্দ্রের অর্চনা করতেন। বেদোক্ত ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু নামান্তর মাত্র।

ইন্দ্রকীল—হিমালয়স্থ মন্দরপর্বত। মতান্তরে মহেন্দ্রপর্বত। এই পর্বতে নানা রকম মণিমুক্তা থাকত। এখানে অর্জুন তপস্যা করেন এবং কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণের অন্যতম পুত্র। প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর গর্ভে এঁর জন্ম। এঁর অন্য নাম মেঘনাদ। জন্মকালে মেঘ গর্জনের মত গভীর শব্দে ক্রন্দন করেছিলেন বলে এঁর এই নাম হয়। মহামায়ার পূজা করে মেঘনাদ মায়াবল লাভ করেন। ইনি অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সপ্তযজ্ঞ সম্পন্ন করেন ও দুঃসাধ্য মহেশ্বর যজ্ঞ করে পশুপতির নিকট বর লাভ করেন। ইনি কামচারী আকাশগামী স্যন্দন, তামসী মায়া, অক্ষয় তূণীর ও শত্রুনাশক অস্ত্রসমূহ লাভ করে দুর্ধর্ষ হন। দিগ্বিজয় করবার সময় রাবণ পুত্রসহ ইন্দ্রকে জয় করবার জন্য স্বর্গে যান; সেই সময়ে মেঘনাদ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে পরাজিত করেন এবং শিবের বরে মায়া প্রভাবে অদৃশ্য থেকে, ইন্দ্রকে মায়াতে আচ্ছন্ন, শরজালে অবসন্ন এবং বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রের মুক্তি-ভিক্ষা করতে আসেন। ব্রহ্মা মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা দেন। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ইন্দ্রজিৎ অমরত্ব প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা উক্ত বর দিতে অস্বীকার করে অন্য বর প্রার্থনা করতে বলায়, ইন্দ্রজিৎ প্রার্থনা করেন যে, যখন আমি যথাবিধি অগ্নির পূজা করে যুদ্ধযাত্রা করব, তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে অশ্ব সমেত রথ উত্থিত হবে, সেই রথে যতক্ষণ অবস্থান করব, ততক্ষণ আমি যেন অমর হই। অগ্নি

পূজার জপ ও হোম অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধযাত্রা করলেই আমি বধ্য হব। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ব্রহ্মা এই বরেই স্বীকৃত হন।

রামচন্দ্র বানর সৈন্যের সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশ করলে, ইন্দ্রজিৎ প্রথমেই অঙ্গদ হস্তে পরাজিত হন। এতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত গরুড়ের কৃপায় এঁরা উভয়েই রক্ষা পান। এরপর কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হলে, ইন্দ্রজিৎ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও অজ্ঞান করেন; কিন্তু হনুমান ঔষধ এনে তাঁদের সঞ্জীবিত করেন। এরপর তিনি যুদ্ধস্থলে মায়া-সীতা প্রদর্শন করে কৌশলে রামকে পরাজিত করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু রাম এই চাতুরী বুঝতে পারায় তাঁর কৌশল ব্যর্থ হয়। তখন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে অজেয় হবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পূর্বেই নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তাঁকে বধ করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ—(১) দিল্লীর নিকটবর্তী শহর। যুধিষ্ঠিরের রাজধানী। বর্তমান দিল্লীতে ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে লাভ করে হস্তিনাপুরে আসবার পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের অর্ধ-রাজ্য দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করতে বলেন। পাণ্ডবেরা সম্মত হয়ে খাণ্ডবপ্রস্থকে বাসোপযোগী করে বিরাট শহরে পরিণত করেন। এই শহরকে তাঁরা বহু সৌধ, পরিখা-প্রাকার বেষ্টিত ও উপবন-সরোবর শোভিত করেন এবং এই শহর ইন্দ্রপ্রস্থ নামে খ্যাত হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থ—(২) খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে একটি নগর। কথিত আছে দেবতারা ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনা করেন। এই স্থানে পূর্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করতেন, সেই থেকে এর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। এই স্থানে মৃত্যু হলে বিষ্ণুতুল্য হয়। বর্তমান দিল্লীর মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। এখন সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখা যায়।

ইন্দ্রধ্বজ—দেবাসুরের যুদ্ধে পীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার স্তব করেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বললেন, ক্ষীরোদ সাগরে গিয়ে নারায়ণের স্তব করলে দেবতারা একটা ধ্বজ পাবেন। এই ধ্বজ বংশদণ্ডে যুক্ত ও ইন্দ্রের দ্বারা পূজিত হয়ে অসুর নাশে সাহায্য করবে। নারায়ণ দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে সেই ধ্বজ দিলেন। তার সাহায্যে দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করলেন। নারায়ণ আরো বলেছিলেন, যে রাজা ইন্দ্রধ্বজের পূজা করবে, তাঁর রাজ্য শস্যপূর্ণ হবে সেখানে প্রজা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রজারা নীরোগ হবে। ভাদ্র মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে রাজ্যের বিঘ্নশান্তি ও প্রজাবৃদ্ধির কামনায়

রাজারা পূর্বে ইন্দ্রের প্রীত্যর্থ এই ধ্বজা বিধিমত পূজা করে প্রোথিত করতেন। পরে বৈধানুষ্ঠানসহ ঐ ধ্বজা বিসর্জন দেওয়া হত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(১) ইনি সূর্যবংশীয় অবন্তি বা উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি বিষ্ণুপূজা করতে মনস্থ করেন; কিন্তু আরাধনার মনোমত স্থান খুঁজে না পেয়ে অবশেষে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এসে পূজা করেন এবং যজ্ঞশেষে এক বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন; কিন্তু কি মূর্তি স্থাপন করবেন, তা স্থির করতে অসমর্থ হন। বিষ্ণু তাঁকে স্বপ্নে তাঁর সনাতনী মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করতে বলেন এবং আরও বলেন যে, অদ্য প্রাতঃকালে সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখবে, একটা প্রকাণ্ড কাঠ ভেসে যাচ্ছে। এই কাঠ হতে আমার মূর্তি প্রস্তুত করবে। প্রভাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রতীরে এক ভাসমান কাঠ পেয়ে স্বহস্তে কুঠার দিয়ে কাঠ কাটতে লাগলেন। এমন সময় ছদ্মবেশে বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা এলেন। বিষ্ণু বল্লেন, এই মূর্তি তৈরী করার কাজ তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে একজন কুশলী শিল্পী আছেন, তিনি বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি তৈরী করে দিতে পারবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজী হয়ে ছদ্মবেশী শিল্পীকে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরী করে দিতে বল্লেন। এইরূপে ঐ তিন-মূর্তি তৈরী হল।

(২) রাজা তৈজসের পুত্র। ইনি সব সময় ভগবানের তপস্যায় রত থাকতেন। এক সময় তপস্যায় রত থাকা কালে অগস্ত্য তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁর কোনরূপ অভ্যর্থনা না করায় ক্রুদ্ধ অগস্ত্যের অভিশাপে রাজা হস্তীতে পরিণত হন। পরজন্মে ইনি যূথপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্দ্রধনু—বনবাস কালে এই ধনু মহর্ষি অগস্ত্য রামকে উপহার প্রদান করেন। এই অস্ত্র দিয়ে রাম রাবণকে নিধন করেন। রাম-রাবণ যুদ্ধকালে মাতলি দ্বারা ইন্দ্র এক ইন্দ্রধনু পঠিয়ে দেন।

ইন্দ্রপ্রমতি—ঋগ্‌বেদের একজন আচার্য; ইনি ঋষি পৈলের ছাত্র। পৈল ঋগ্‌বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক অংশ ইন্দ্রপ্রমতিকে অধ্যায়ন করান। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁর সংহিতার এক অংশ নিজের পুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যায়ন করান। এঁর পুত্র মাণ্ডুক্য।

ইন্দ্রপ্রমিতি—বশিষ্ঠ হতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্মগ্রহণ করে। এই কপিঞ্জলের অন্য নাম ত্রিমূর্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি। পৃথু-কন্যা হতে ইন্দ্রপ্রমিতির ভদ্র নামে এক পুত্র হয়। (লিঙ্গপুরাণ)

ইন্দ্রসেন—(১) নল ও দময়ন্তীর পুত্র। (২) যুধিষ্ঠিরের সারথি। (৩) পরীক্ষিতের পুত্র।

ইন্দ্রবর্মা—মালবরাজ ইন্দ্রবর্মা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁর অশ্বত্থামা নামে এক হস্তী ছিল। ভীম অশ্বত্থামা নামে এই হস্তীকে বধ করে দ্রোণকে যুদ্ধ ত্যাগ করবার জন্য, অশ্বত্থামা হত, বলে জানান। নিজের পুত্র অশ্বত্থামা মৃত মনে করে দ্রোণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের নিকট এই কথার সত্যতা নির্ণয় করতে যান। কৃষ্ণাদির পরামর্শ মত যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে 'অশ্বত্থামা হতঃ' এবং মৃদুস্বরে 'ইতি গজ' উচ্চারণ করেন।

ইন্দ্রলোক—ইন্দ্রের অমরাবতী; স্বর্গ।

ইন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দশ অর্থাৎ শেষ মনু।

ইন্দ্রসেনা—(১) নল ও দময়ন্তীর কন্যা. (২) মহর্ষি মুদ্গলের স্ত্রী। ইনি বীরাঙ্গনা ছিলেন। মহর্ষি মুদ্গল একবার বৃষযোজিত রথে আরোহণ করে শত্রু জয় করবার জন্য বাহির হন। তখন তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রসেনা তাঁর সারথী হয়ে শত্রুদের পরাজিত করে বহু গাভী সংগ্রহ করেন (ঋগ্‌বেদ)

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের স্ত্রী, জয়ন্ত ও জয়ন্তীর মাতা। এঁকে শচী বা ঐন্দ্রী বলা হয়। ঋগ্‌বেদে এঁর নাম কয়েকবার উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে যে, স্ত্রীকুলে ইনিই বিশেষ ভাগ্যবতী। কারণ এঁর স্বামীর কখনও বার্ধক্যজনিত মৃত্যু হবে না। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, সমবেত কয়েকটি রাজকুমারীর মধ্য হতে ইন্দ্র এঁকেই স্ত্রী বলে মনোনীত করেন। কারণ, এঁর মধ্যে যৌন-আবেদন ছিল বেশী। রামায়ণ ও পুরাণে ইনি দৈত্য পুলোমার কন্যা। ইন্দ্র এঁর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং তার শাপ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এঁর পিতাকে হত্যা করেন। মহাভারতের মতে রাজা নহুষ এঁর রূপে মুগ্ধ হন এবং অনেক কষ্টে ইনি নহুষের হাত থেকে পরিত্রাণ পান। দেবীদের মধ্যে ইন্দ্রাণীর স্থান খুব উচ্চে নয়।

ইন্দ্রানুজ—পৌরাণিক মতে ইন্দ্রের জন্মের পর কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনাবতারের জন্ম হয়। ইনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, সেই জন্যে এর নাম ইন্দ্রানুজ।

ইরা—দক্ষের ষাট জন কন্যার মধ্যে ইরা প্রভৃতি তিন জন কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন। ইরা তৃণ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম প্রভৃতি প্রসব করেন।

ইরাবান—অর্জুনের এক পুত্র. যুধিষ্ঠির ও দ্রোপদী যখন এক সময়ে গোপনে একাসনে ছিলেন, তখন অর্জুন সহসা সেই দৃশ্য দর্শন করে বারো বৎসর বনবাসে থাকেন। তৎকালে অর্জুন একদিন গঙ্গাস্নানে নামলে ঐরাবত কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা উলুপী তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন এবং উলুপীর পুত্র ইরাবান।

মতান্তরে, অর্জুনের ঔরসে নাগ-

রাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার গর্ভে ইরাবানের জন্ম হয়। ঐরাবত-কন্যার পূর্বপতি গরুড় কর্তৃক নিহত হন। তখন নাগরাজ বংশরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে তাঁর বিধবা কন্যাকে অর্জুনের হস্তে সম্প্রদান করেন। তখন সেই কন্যার গর্ভে ইরাবানের জন্ম হয়। জন্মের পর ইরাবান নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এঁর পিতৃব্য অশ্বসেন এঁকে ত্যাগ করেন। সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষাকালে ইরাবান অর্জুনের কাছে গিয়ে আত্মপরিচয় দান করেন এবং অর্জুন যুদ্ধকালে তাঁকে পাণ্ডবদের সাহায্য করতে বলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টম দিনে শকুনির ছয় ভ্রাতা গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্মবান, আজক ও শুককে ইরাবান হত্যা করেন ও বহু কৌরব সৈন্য ধ্বংস করেন। অবশেষে কৌরব পক্ষের অলম্বুষ নামে এক রাক্ষসের হাতে ইরাবানের মৃত্যু হয়।

—বাহ্লীক দেশের কর্দমপ্রজাপতির পুত্র। ইনি একদা মৃগয়ায় বহু পশু বধ করতে করতে কার্তিকেয়ের জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই স্থানে মহাদেব ও উমাকে ক্রীড়ারত দেখতে পান। দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য মহাদেব তখন স্ত্রীরূপে খেলা করছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমে অরণ্যের সমস্ত পুরুষ জন্তু বা পুংবাচক বৃক্ষ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং রাজা ইলও এখানে এসে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। এজন্য ইল মহাদুঃখিত হয়ে হরপার্বতীর সাধ্যসাধনা করতে লাগলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি পুরুষত্ব ব্যাতীত অন্য বর চাও। তখন রাজা পার্বতীর নিকট গেলেন। পার্বতী বললেন, মহাদেব তোমাকে অর্ধবর দিয়েছেন অপর অর্ধবর আমি দিচ্ছি। ইল বললেন, তবে যেন আমি এক মাস পুরুষ ও এক মাস নারী রূপ ধারণ করতে পারি। বর-প্রাপ্তির পর স্ত্রীরূপে ইল এক দিন ভ্রমণ করতে করতে চন্দ্রের পুত্র তপস্যারত বুধের সঙ্গে মিলিত হন। রূপেমুগ্ধ হয়ে বুধ নারীরূপী ইলের গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রের নাম পুরুরবা। পরে রাজা ইল চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদের দ্বারা মহাদেবের তুষ্টি সাধনে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাতে মহাদেব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে স্ত্রীরূপ হতে নিষ্কৃতি দেন। রাজা ইলের পুরুষ অবস্থার পুত্র শশবিন্দু।

ইলবিলা—তৃণবিন্দু ও অপ্সরা অলম্বুষার কন্যা। যক্ষরাজ কুবেরের মাতা ও বিশ্রবা মুনির স্ত্রী। এঁর সন্তান বলে কুবেরের অন্য নাম ঐলবিল। কোথাও তাঁকে পুলস্তের স্ত্রী ও বিশ্রবের মাতা বলে উল্লেখ আছে।

ইলা—বৈবস্বত মনুর কন্যা, বুধের পত্নী ও পুরুরবার মাতা। মনু মিত্রাবরুণের উপাসনা করে একটি সন্তান প্রার্থনা

করেন ; কিন্তু আরাধনার ত্রুটিবশতঃ পুত্রের পরিবর্তে কন্যা হয়। এই কন্যার নাম ইলা। ইনি পরে বিষ্ণুর বরে পুরুষত্ব লাভ করে 'সুদ্যুম্ন' নামে খ্যাত হন। পরে মহাদেবের অভিশপ্ত কুমার বনে প্রবেশ করে আবার স্ত্রীভাবাপন্ন হন। এঁর পুরোহিত বশিষ্ঠ শিবের উপাসনা করলে ইনি একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হয়ে থাকবার বর পান। (ইড়া দেখ)

ইল্বল—এক জন অসুর। সিংহিকার গর্ভে ও বিপ্রচিত্তির ঔরসে এর জন্ম। ইল্বলের অন্যতম ভ্রাতা বাতাপি। কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে পুত্রের জন্য বর প্রার্থনা করেন; কিন্তু বর না পাওয়ায় রাগান্বিত হয়ে ব্রাহ্মণ হত্যায় নিযুক্ত হন। ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সংস্কৃত বাক্য বলে শ্রাদ্ধের ছলে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আনত। বাতাপি মেষরূপ ধারণ করত এবং ইল্বল তাকে ব্রাহ্মণদের সম্মুখে কেটে রন্ধন করে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াত। ভোজন শেষ হলে ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে বাতাপিকে ডাকা মাত্র বাতাপি মেষের রব করে ব্রাহ্মণদের পাকাশয় ভেদ করে নির্গত হত। এইরূপে বহু ব্রাহ্মণ হত্যার পর এক দিন দেবতারা অগস্ত্য ইত্যাদি মুনিদের সঙ্গে ইল্বলের অতিথি হলেন। ইল্বল পূর্বের ন্যায় মেষরূপী বাতাপিকে কেটে রন্ধন করে অগস্ত্যকে আহার করতে দিল। অগস্ত্য সমস্ত মাংস একাই আহার করলেন। তারপর ইল্বল যখন বাতাপিকে ডাকতে লাগল, তখন সমুদ্রশোষক অগস্ত্য বায়ুনিঃসরণ করে হেসে উত্তর দিলেন যে, বাতাপি তাঁর উদরে জীর্ণ হয়ে যমালয়ে গিয়েছে। ক্রুদ্ধ ইল্বল অগস্ত্যকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হয়। (রামায়ণ ও মহাভারত)

ইলাবৃত—(১) স্থানের নাম। এখানে অভিশপ্ত স্ত্রী-রূপী ইল (অর্থাৎ ইলা) বুধের সঙ্গে বাস করতেন, সেই জন্য এই স্থানের নাম ইলাবৃত। ইহা কৈলাসের নিকটবর্তী। (২) জম্বুদ্বীপের নববর্ষের চতুর্থ বর্ষ। এর উত্তরে নীল পর্বত, দক্ষিণে নিষধ পর্বত, পশ্চিমে মাল্যবান পর্বত ও পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। ইহা মেরু পর্বত (সুমেরু) বেষ্টন করে আছে।

ঈ

ঈশান—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে সূর্যমূর্তি। ঈশান কোণ পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণ।

ঈশানী—মহেশ্বরী, দুর্গা, সতীর অন্য নাম ঈশানী।

ঈশান কোণ—পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণ। এই কোণের অধিপতি শিব।

ঈর্ষা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ স্ত্রীর অন্যতমা।

উ

উগ্র—(১) শিবের অষ্টমূর্তির বায়ুমূর্তি। শিবের অষ্টমূর্তি—ক্ষিতি (পৃথিবী) মূর্তি সর্ব ; অপ (জল) মূর্তি ভব; তেজ (অগ্নি) মূর্তি রুদ্র ; মরুৎ (বায়ু) মূর্তি উগ্র ; ব্যোম (আকাশ) মূর্তি ভীম। যজমান মূর্তি (পশুপতি) ; চন্দ্র মূর্তি (মহাদেব), সূর্য মূর্তি (ঈশান)। (২) বরাহ কল্পের একাদশ দ্বাপরে মহাদেব গঙ্গাদ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বদেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁর চার পুত্র জন্মে। তাঁরা সকলেই মাহেশ্বর-যোগে পারদর্শী ছিলেন। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হলে, মাতৃকা জটাধরা তার সাহায্যার্থে উগ্র প্রভৃতি সহচরকে প্রেরণ করেছিলেন। (৪) মহিষাসুরের একজন সেনাপতি। (৫) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম।

উগ্রচণ্ডা—ভগবতীর মূর্তি বিশেষ। এঁর অষ্টাদশ হস্ত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে কোটি-যোগিনীর সঙ্গে অষ্টাদশ-ভুজসমন্বিতা দেবী প্রথমে আবির্ভূতা হয়ে মহিষাসুরের প্রথম মূর্তি বিনষ্ট করেন। এই মূর্তি ধারণ করে সতী নিজের পিতা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেছিলেন। দক্ষ-যজ্ঞে যখন পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী রাগে ও অপমানে দেহত্যাগ করেন, তখন শিব তাঁর সমস্ত অনুচরসহ দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ড করতে আসেন। দেহত্যাগ করে সতী উগ্রচণ্ডার রূপ নিয়ে কোটি যোগিনীসহ শিবের সঙ্গে মিলিত হন ও দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন। (কালিকাপুরাণ)

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্তি ভেদ। অন্য নাম মাতঙ্গী। শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দৈত্যদ্বয়ের উৎপাতে দেবতারা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে এসে ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করেন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী মাতঙ্গমুনির স্ত্রী মাতঙ্গীর রূপ ধারণ করে দেবতাদের কাছে এলেন এবং তাঁদের স্তবে তুষ্ট হয়ে মুনিপত্নীর শরীর হতে এক দিব্য মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। এই মূর্তির চার হাত ও গলায় মুণ্ডমালা। এই মূর্তিই উগ্রতারা। মাতঙ্গীর শরীর হতে উৎপন্ন বলে ভগবতীর এই উগ্রতারা মূর্তিকে মাতঙ্গী বলা হয়।

উগ্রসেন—(১) যদুবংশীয় রাজা আহুকের পুত্র ও কংসের পিতা। আহুকের স্ত্রী কাশ্যার গর্ভে দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবকের চার পুত্র ও সাত কন্যা। এই সাত কন্যার বিবাহ হয় বসুদেবের সঙ্গে। এই সাত কন্যার মধ্যে দেবকী সর্বজ্যেষ্ঠা। দেবকীর গর্ভে ও বসুদেবের ঔরসে কৃষ্ণের জন্ম হয়। উগ্রসেনের নয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা। এই নয় পুত্রের মধ্যে কংস সর্বজ্যেষ্ঠ। কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি রাজ্যলোভী নিজ পুত্র কংস কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে

সিংহাসন চ্যুত ও কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ বলদেবের সাহায্যে কংসবধ করে এঁকে উদ্ধার করেন এবং মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। যদুকুলের ধ্বংস ইনি স্বচক্ষে দেখে যান। (২) পরীক্ষিতেক এক পুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম।

উচ্চৈঃশ্রবা—দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে সমুদ্র হতে শ্বেত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা উদ্ভূত হয়। এই শ্বেতবর্ণ অশ্ব ইন্দ্রের অশ্ব। এই অশ্ব অমৃত পান করত এবং অশ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত।

উজ্জয়িনী—আধুনিক উজ্জয়িনী। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। প্রাচীন হিন্দু ভৌগোলিকরা এই স্থান হতে সব রকম ভৌগলিক গণনা করতেন।

উতঙ্ক—মহর্ষি আয়োদ-ধৌম্যের বেদ নামে একজন শিষ্য ছিল। উক্ত বেদের শিষ্যগণের মধ্যে একজনের নাম উতঙ্ক। গুরুভক্তির জন্য উতঙ্কের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। একদিন বেদ যাজন কার্যের জন্য স্থানান্তরে যাবার সময় উতঙ্কের উপর গৃহের সমস্ত ভার দিয়ে গেলেন। উক্ত সময়ে একদিন আশ্রমের নারীরা উতঙ্কর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, গুরুপত্নী ঋতুমতী হয়েছেন, অতএব ঋতু যাতে নিষ্ফল না হয়, তাঁকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উতঙ্ক এই অসঙ্গত অনুরোধ প্রত্যাখান করলেন। কারণ গুরু তাকে ঈদৃশ কোন অকার্য করবার আদেশ দেন নাই। গুরু আশ্রমে প্রত্যাগমনের পর এই ঘটনা শুনে শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বগৃহে ফিরে গিয়ে গৃহী হতে বললেন। অতঃপর উতঙ্ক গুরুকে তাঁর অভীষ্ট দক্ষিণা দিতে চাইলেন। গুরু তখন এই দক্ষিণা দান স্থগিত রাখতে বললেন; কিন্তু শিষ্য আবার দক্ষিণার কথা বলায় গুরু বললেন, তাঁর স্ত্রী শিষ্যের কাছে যা চাইবেন, তাই হবে গুরুদক্ষিণা। উতঙ্ক গুরুপত্নীর কাছে গেলে গুরুপত্নী উতঙ্ককে রাজা পৌষ্যের ক্ষত্রিয়া-পত্নীর দুইটি কুণ্ডল চেয়ে আনতে বললেন। কারণ, চারদিন পরে যে পুণ্যকব্রত হবে, তাতে গুরুপত্নী ঐ কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে ইচ্ছা করেন।

কুণ্ডল আনবার যাত্রাপথে উতঙ্ক প্রকাণ্ড বৃষারূঢ় এক মহাকায় পুরুষকে দেখতে পেলেন। সেই পুরুষ উতঙ্ককে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করতে বলায়, উতঙ্ক অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি উতঙ্ককে পুনর্বার উক্ত অখাদ্য ভক্ষণ করতে বলেন এবং জানান যে উতঙ্কের উপাধ্যায়ও পূর্বে ইহা গলাধঃকরণ করেছেন। তখন উতঙ্ক বৃষের মলমূত্র খেয়ে, সত্বর আচমন করে রাজা পৌষ্যের নিকট গিয়ে, রানীর কুণ্ডল

প্রার্থনা করলেন। রাজা উতঙ্ককে রানীর কাছে গিয়ে উক্ত প্রার্থনা জানাতে বললেন। কিন্তু উতঙ্ক মহিষীকে খুঁজে পেলেন না। তখন পৌষ্য বললেন যে, সম্ভবতঃ অশুচি থাকার দরুন রানীকে দেখতে পাওনি। তখন উতঙ্কের মনে হল, তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র আসবার জন্যেই দাঁড়িয়েই আচমন করেছিলেন, সেজন্য এতে এই দোষ এসেছে। তখন তিনি পূর্বাস্য হয়ে ভাল করে আচমন করে অন্তঃপুরে গিয়ে রানীকে দেখতে পেলেন ও অভীষ্ট কুণ্ডল লাভ করলেন। রানী তাঁকে উপদেশ দিলেন যে, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুইটির প্রার্থী, উতঙ্ক যেন যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেন কুণ্ডল দুটি নিয়ে যাবার জন্য।

রাজা পৌষ্য উতঙ্কের সংকারের অভিলাষে অন্নের ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু অন্ন শীতল ও তাতে কেশ থাকায় উতঙ্ক রাজাকে অশুচি অন্ন দেওয়ার জন্য অন্ধ হবার অভিশাপ দিলেন। রাজাও নির্দোষ অন্নের দোষ দেওয়া হয়েছে মনে করে উতঙ্ককে নিঃসন্তান হবার অভিশাপ দিলেন। উতঙ্ক বললেন, অশুচি অন্নদাতার অভিশাপ দেওয়া অনুচিত। রাজা অন্ন পরীক্ষা করে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, অন্ন হয়ত কোন মুক্তকেশী স্ত্রী এনেছে, তাই এতে কেশ পড়েছে। তখন রাজা ক্ষমা প্রর্থনা করায় উতঙ্ক বললেন যে, অন্ধত্বলাভের পর রাজা পুনর্বার দৃষ্টি ফিরে পাবেন কিন্তু অন্নের দোষ স্বীকার করার জন্য রাজার শাপ নিষ্ফল হবে। এই বলে উতঙ্ক কুণ্ডল নিয়ে চলে যান। পথে স্নান করবার সময় উতঙ্ক যখন কুণ্ডল দুটি ভূমিতে রেখেছেন তখন এক নগ্ন ক্ষপণক (দিগম্বর সন্ন্যাসী) সেই দুটি নিয়ে পলায়ন করে। স্নান শেষে উতঙ্ক দৌড়ে ক্ষপণককে ধরলেন বটে, কিন্তু সে তক্ষকের রূপ ধারণ করে সহসা আবির্ভূত এক গর্তের মধ্য দিয়ে নাগলোকে চলে গেল। উতঙ্ক দণ্ডকাষ্ঠ দিয়ে গর্ত খুঁড়তে অকৃতকার্য হওয়ায় ইন্দ্রের আদেশে বজ্র দণ্ডকাষ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়ে গর্ত বড় করে নাগলোক গমনের পথ করে দিল। নাগলোকে গিয়ে কুণ্ডল ফিরে পাবার জন্য উতঙ্ক নাগদের স্তব করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, দুই স্ত্রী শাদা ও কালো সুতো দিয়ে তাঁতে কাপড় বুনছে এবং ছয় কুমার দ্বাদশ অর (পাখি) যুক্ত একটি চাকা ঘোরাচ্ছে। তাছাড়া একজন সুদর্শন পুরুষ এবং একটি অশ্বও সেখানে রয়েছে। এঁদের স্তব করলে সেই পুরুষ উতঙ্ককে বর প্রার্থনা করতে বলায় উতঙ্ক নাগদের বশীভূত করতে চাইলেন। তখন সেই পুরুষ উতঙ্ককে অশ্বের গুহ্যদেশে ফুৎকার দিতে বললেন। আদেশ পালন করা

মাত্র অশ্বের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার থেকে সধূম অগ্নিশিখা নাগলোক ব্যাপ্ত করল এবং ভীত তক্ষক উতঙ্ককে কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যার্পণ করলেন। সেইদিনই আবার উপাধ্যায়ানীর পুণ্যকব্রতের দিন। তখন সেই পুরুষের কথামত ঐ অশ্বে আরোহণ করে উতঙ্ক যাত্রা করলেন। গুরুপত্নী স্নানান্তে কেশ-সংস্কার করতে করতে উতঙ্কের বিলম্বাতিশয্যে তাঁকে শাপ দেবার উপক্রম করছিলেন; কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই উতঙ্ক সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কুণ্ডল দান করলেন। পরে গুরুর কাছে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করায় গুরু বললেন, বস্ত্রবয়নকারী দুই স্ত্রী হলেন ধাতা ও বিধাতা, কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র রাত্রি ও দিন। ছয় কুমার ছয় ঋতু, চক্র সংবৎসর, দ্বাদশ অর দ্বাদশ মাস, পুরুষ ইন্দ্র এবং অশ্ব অগ্নি। যাবার পথে বৃষারূঢ় পুরুষ, ঐরাবত-আরোহী ইন্দ্র, বৃষের পুরীষ অমৃত! নাগলোকে উতঙ্ক নিরাপদ ছিলেন, কারণ, ইন্দ্র উপাধ্যায়ের সখা, তাঁর অনুগ্রহেই কুণ্ডল আনা সম্ভব হয়েছে। তারপর গুরু তাঁকে স্বগৃহে যেতে বললেন। অতঃপর উতঙ্ক হস্তিনাপুরে গিয়ে রাজা জনমেজয়কে তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করতে পরামর্শ দেন।

উতথ্য—এঁর পিতা অঙ্গিরা, মাতা শ্রদ্ধা। ইনি একজন ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন ঋষি। এঁর স্ত্রীর নাম মমতা এবং কনিষ্ঠভ্রাতা দেবগুরু বৃহস্পতি। মমতার গর্ভজাত সন্তান দীর্ঘতমা ঋষি পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন।

উত্তর—ইনি মৎস্যরাজ বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র। অন্য নাম ভূমিঞ্জয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শঙ্খ। বিরাট-গৃহে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে দুর্যোধন বিরাট রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের গোধন হরণের জন্য সুশর্মা এবং উত্তরাঞ্চলের গোধন হরণের জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে পাঠান। সুশর্মাকে বাধা দিতে গিয়ে বিরাট বন্দী হন এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্মাকে পরাজিত করে বিরাটরাজ ও তাঁর গোধন উদ্ধার করেন। উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধে উত্তর বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে সারথী করে যুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু কুরুসৈন্যর সমাবেশ দেখে পলায়ন করেন। তখন অর্জুন আত্মপরিচয় দিয়ে উত্তরকে আশ্বস্ত করে তাঁকেই সারথি নিযুক্ত করে কৌরবদের পরাজিত করেন ও গোধন উদ্ধার করেন। যুদ্ধশেষে উত্তর বিরাটরাজের কাছে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে নিজ ভগিনী উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব করেন। বিরাটরাজ অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিনেই উত্তর শল্যের হাতে নিহত হন।

উত্তম—রাজা উত্তানপাদ ও রানী

সুরুচির পুত্র। অন্য রানী সুনীতির পুত্র ধ্রুব। সুরুচি রাজার প্রিয়তমা মহিষী। তিনি সুনীতি ও ধ্রুবকে অবজ্ঞা করতেন। এই কারণে ধ্রুব বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। একদিন মৃগয়াকালে উত্তম বনমধ্যে যক্ষকর্তৃক নিহত হন। উত্তমের মা সুরুচিরও পুত্রের অনুসন্ধানকালে অরণ্যের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ঘটে।

উত্তমৌজা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষীয় পাঞ্চাল-পতি দ্রুপদের অন্যতম পুত্র উত্তমৌজা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে রাত্রিকালে পাণ্ডব-শিবিরে নিদ্রিত অবস্থায় ইনি অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন। (মহাভারত-কর্ণ)

উত্তরকুরু—জম্বুদ্বীপের বর্ষ বিশেষ। কুরুবর্ষ। মহাভারত-মতে সুমেরুর উত্তর ও নীলপর্বতের দক্ষিণপার্শ্বে উত্তরকুরু অবস্থিত।

উত্তরা—ইনি মৎস্যরাজ বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার সুদর্শনা কন্যা এবং অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর স্ত্রী। পাণ্ডবদের বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলা নামে ক্লীববেশী অর্জুন উত্তরাকে নৃত্য-গীতাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। উত্তর-গোগৃহ হরণকালে উত্তরার অনুরোধে পরাজিত কৌরব রাজাদের গাত্র হতে উত্তরার জন্য উত্তরের দ্বারা অর্জুন কৌরদের সূক্ষ্মবস্ত্রাদি অপহরণ করিয়ে আনেন। যুদ্ধশেষে অর্জুনের পরিচয় পেয়ে বিরাটরাজ অর্জুনের হাতে উত্তরাকে সম্প্রদান করতে চান, কিন্তু কন্যাস্থানীয়া শিষ্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত অর্জুন নিজ পুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথী কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে যখন অভিমন্যু নিহত হন, তখন উত্তরা অন্তঃসত্ত্বা। অশ্বত্থামার মণি হরণকালে অশ্বত্থামা ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। নারদ ও ব্যাসের অনুরোধে অর্জুন আপন অস্ত্র সংবরণ করেন; অশ্বত্থামা অস্ত্র সংবরণে অসমর্থ হয়ে সেটি পাণ্ডব নারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করেন। পরে উত্তরা মৃত পুত্র প্রসব করলে, কৃষ্ণ যোগবলে তার জীবনদান করেন। এই সন্তানের নাম হয় পরীক্ষিৎ। মহাপ্রস্থানকালে পাণ্ডবরা পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে যান।

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণের সখা ও তাঁর পরম ভক্ত। ইনি সত্যকের পুত্র। উদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তজীব, সাধু লক্ষণ ও ভক্তি লক্ষণ প্রভৃতি সাধুসঙ্গের মহিমা, কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে একবার বদরিকাশ্রমে গিয়ে বল্কল পরিধান করে ফলমূল আহারে জীবনযাপন করতে বলেন এবং অলকানন্দাকে দেখে পাপমুক্ত হতে বলেন। উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গিয়ে

ধ্যান ও যোগ দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

উদ্দালক—একজন বিখ্যাত ঋষি। এঁর প্রকৃত নাম আরুণি। ইনি গুরু আয়োদধৌম্যের বরে উদ্দালক নামে খ্যাত হন। এঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতুকেতু তাঁর পিতার কাছে বসেছিলেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁদের সম্মুখেই তাঁর মাতাকে যৌন আবেদন জানায় এবং বলপূর্বক তার হস্ত ধারণ করে নিয়ে যায়। এতে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাতে, তাঁর পিতা উদ্দালক পুত্রকে বলেন যে, 'হে পুত্র! ক্রুদ্ধ হয়ো না, এই সনাতন ধর্ম, গাভীদের ন্যায় স্ত্রীরাও অরক্ষিতা।' শ্বেতকেতু এই বাক্য অস্বীকার করেন এবং তিনি স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, নারী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ ত্যাগ করবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, তারা উভয়েই ভ্রূণহত্যার পাপে নিমগ্ন হবে।

উত্তানপাদ—স্বয়ম্ভুব মনু ও শতরূপার পুত্র। ইনি ধ্রুবের পিতা। এঁর দুই স্ত্রী—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব, কীর্তিমান, আয়ুষ্মান ও বসু এবং সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করে। রাজা সুরুচির অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় তিনি সুনীতি ও ধ্রুবকে বনবাসে পাঠান; কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে ধ্রুবের হাতে সমূহ রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই ধ্রুব অদ্বিতীয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

উপপ্লব্য—মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্‌যোগকালে অজ্ঞাতবাসের শেষে পাণ্ডবগণ এখানে ছিলেন।

উপমন্যু—মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য। গুরুভক্তির জন্য ইনি বিখ্যাত। উপমন্যু গুরুর গোচারণ করতেন। একদিন শিষ্যকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হতে দেখে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আহার করে এমন স্থূল হয়েছ। শিষ্য উত্তর দিল, সে ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ করে। গুরুকে নিবেদন না করে ভিক্ষান্ন ভোজন অনুচিত বলায়, উপমন্যু ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে দিতে থাকেন। তথাপি তাকে পুষ্ট হতে দেখে গুরু একদিন প্রশ্ন করলেন যে, সমস্ত ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে দেওয়া সত্ত্বেও সে কি আহার করে? শিষ্য জানালেন যে, সমস্ত ভিক্ষান্ন গুরুকে দেবার পর সে পুনর্বার ভিক্ষা করে এবং দ্বিতীয় বারের ভিক্ষান্নে ক্ষুধা নিবারণ করে। গুরু এ কাজে তাকে নিষেধ করে বলেন, দুই বার ভিক্ষা করায় তোমার লোভ বৃদ্ধি পায় ও অন্য ভিক্ষাজীবীদেরও এতে ক্ষতি হয়, অতএব তুমি এ থেকে নিবৃত্ত হও। অতঃপর উপমন্যু

একবার মাত্র ভিক্ষা করে গুরুকে ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী দিতে লাগলেন। পরে গুরু আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাকে এখনও বেশ স্থূলই দেখা যাচ্ছে; এখন তুমি কি আহার কর? উত্তরে উপমন্যু বলে যে, সে আশ্রমের গাভীর দুগ্ধ পান করে। বিনা অনুমতিতে দুধ খাওয়া অন্যায় বলে গুরু তাকে এ কাজ করতেও নিষেধ করলেন। এর পরেও শিষ্যকে স্থূলকায় দেখে গুরু পুনর্বার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উপমন্যু বললে যে, দুগ্ধ পানান্তে গোবৎসরা যে ফেন উদ্গার করে, সে তাই পান করে। গুরু বললেন, এই গোবৎসরা তোমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রচুর ফেন উদ্গার করে। এতে তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে; সুতরাং ইহা অনুচিত। গুরুর সকল নিষেধ পালন করেও সে যথারীতি গরু চরাতে লাগল। একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে উপপমন্যু অর্কপত্র (আকন্দপাতা) আহার করে এবং সেই তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীব্র বস্তু খেয়ে, অন্ধ হয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় এক কূপের মধ্যে পতিত হয়। উপমন্যুর প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব দেখে ধৌম্য সশিষ্য তাঁকে খুঁজতে বেরোলেন। ধৌম্যের আহ্বান শুনতে পেয়ে কূপের মধ্য থেকে উপমন্যু আপন অবস্থা গুরুকে জানালেন। তখন ধৌম্য উপমন্যুকে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করতে বললেন। উপমন্যুর স্তবে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আবির্ভূত হয়ে তাকে পিষ্টক খেতে দিলে সে গুরুকে নিবেদন না করে তা খেতে অস্বীকার করে। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তার গুরুভক্তিতে প্রীত হয়ে বলেন যে, তোমার গুরুর দন্ত কৃষ্ণ লৌহময় ও তোমার দন্ত হিরণ্ময় হবে, তুমি চক্ষুষ্মান হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে। চক্ষুলাভ করে গুরুকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃতি করার পর গুরু বললেন, সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার আয়ত্ত হবে। গুরুগৃহে এইরূপ পরীক্ষা দেবার পর উপমন্যু নিজ গৃহে গমন করেন। (মহাভারত)

উপকীচক—মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের ভ্রাতা। এরা সংখ্যায় একশ পাঁচজন। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার জন্য কীচক ভীমের হাতে নিহত হলে এরা কীচকের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে তাঁকেও কীচকের সঙ্গে দাহ করবার জন্য বন্ধন করে নিয়ে যায়। দ্রৌপদীর আর্তনাদে ভীম শ্মশানে গিয়ে এক বৃক্ষ উৎপাটন করে একশ পাঁচজন উপকীচককে নিহত করেন।

উপবেদ—বেদের চেয়ে এর স্থান নিম্নে। শ্রুতির সঙ্গে এর কোন যোগ নাই। এই বেদ সাধারণতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। সকল বেদেরই উপবেদ আছে। ঋগ্‌বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ,

যজুর্বেদের ধনুর্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ববেদ এবং অথর্ববেদের স্থাপত্যবেদ।

উপসুন্দ—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশজাত নিকুম্ভের অন্যতম পুত্র। এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। ত্রিলোক বিজয় কামনায় এরা দুই ভাই বিন্ধ্যপর্বতে কঠোর তপস্যায় রত হয়। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা এদের বর দেন যে, ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম হতে এদের কোন ভয় থাকবে না। এদের পরস্পরের হাতে ছাড়া কোথাও এদের মৃত্যু নেই। তখন এরা ত্রিভুবন বিজয় করে আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপর নানারূপ অত্যাচার করতে থাকে। উংপীড়িতদের ও ঋষিগণের অনুরোধে ব্রহ্মার আদেশ মত বিশ্বকর্মা তিলোত্তমা নামে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার আদেশে এই নারী সুন্দ-উপসুন্দের কাছে যায়। তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে লাভ করবার জন্য দুই ভাই পবস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে উভয়েই নিহত হয়।

উপরিচরবসু—পুরুবংশজাত চেদিদেশের রাজা। ইন্দ্রবংশীয় কৃতি রাজার পুত্র। ইন্দ্রের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব হওয়াতে ইন্দ্র এঁকে স্ফটিকময় বিমান, বৈজয়ন্তীমালা এবং যষ্টি উপহার দিয়েছিলেন। ইনি ইন্দ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন বলে এঁর নাম উপরিচর। উপরিচর অগ্রহায়ণ মাসে উংসব করে ইন্দ্রদত্ত যষ্টি রাজপুরীতে এনে ইন্দ্রপূজা করতেন ও পরের দিন ইন্দ্রধ্বজা উত্তোলন করতেন। সেই থেকে এই উংসব প্রচলিত হয়। এঁর পাঁচ পুত্র বিভিন্ন দেশে রাজ্যস্থাপন করেন। এঁর রাজধানীর নিকটবর্তী শক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। রাজা কোলাহল নামে এক পর্বত বিদীর্ণ করলে শক্তিমতী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়ে বহির্গত হন। এই পর্বতের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শক্তিমতী পুত্র-কন্যাকে রাজার হস্তে অর্পণ করেন। রাজা সেই পুত্রকে সেনাপতি ও কন্যা গিরিকাকে মহিষী করেন। একদা পিতৃলোকদের আদেশে রাজা মৃগয়া করতে বাহির হন, কিন্তু মৃগয়াকালে তিনি ঋতুস্নাতা সুন্দরী মহিষী গিরিকার স্মরণে কামাবিষ্ট হন এবং তাঁর স্খলিত-শুক্র এক শ্যেনপক্ষীর দ্বারা রানীর কাছে প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হয়। ব্রহ্মশাপে মংসী-রূপিণী অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা সেই শুক্র গ্রহণ করে গর্ভিণী হয়, এবং দশ মাস পরে ধীবরের জালে ধৃত হয়। মংসীর উদরে এক পুত্র ও কন্যা পেয়ে ধীবর রাজার কাছে যায় এবং অপ্সরাও শাপমুক্ত হয়। উপরিচর পুত্রকে গ্রহণ করেন ও কন্যাকে ধীবরের হাতেই দান করেন। পুত্রের নাম হয় মংস্যরাজ। তিনি পরে এক ধার্মিক রাজা হয়েছিলেন। কন্যার

নাম সত্যবতী, কিন্তু মৎস্যজীবীদের কাছে থাকার জন্য তার নাম হয় 'মৎস্যগন্ধা'। একদিন যখন এই কন্যা যমুনায় নৌকা চালনায় রত ছিল, তখন পরাশর মুনি তার কাছে পুত্র কামনা করেন। পরাশরের প্রার্থনা পূরণ করায় মৎস্যগন্ধার দেহ সুগন্ধময় হয় এবং তার নাম হয় 'গন্ধবতী'। সদ্যগর্ভ ধারণ করে সত্যবতী যমুনার দ্বীপের মধ্যে যে পুত্র প্রসব করেন, তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। (মহাভারত)

উর্ব—পাণ্ডববংশীয় পুরঞ্জয়ের পুত্র। মহর্ষি উর্ব কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং ব্রহ্মার সমান গুণযুক্ত ও তেজস্বী ছিলেন। একবার তিনি তাঁর উরুতে হুতাসন প্রবিষ্ট করে তপস্যায় নিবিষ্ট ছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁর উরু ভেদ করে এক অনল উত্থিত হয়। এর নাম উর্ব অনল। ব্রহ্মা এই অনলকে সমুদ্রে স্থাপন করেন।

উর্বশী—(১) অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী স্বর্গের অপ্সরা। এই অপ্সরার জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। কারো মতে উর্বশী নারায়ণের উরু ভেদ করে বহির্গত হন, তাই তাঁর নাম উর্বশী। আবার কথিত আছে, সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্র হতে উত্থিত অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশীও অন্যতম। উর্বশী সাতজন মনুর সৃষ্টি—একথাও প্রচলিত আছে। ঋগ্‌বেদে উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনী পাওয়া যায় শতপথব্রাহ্মণে। একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালে আহূত রাজা পুরুরবার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে উর্বশীর নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়। ফলে ইন্দ্রের শাপে উর্বশীকে মর্ত্যে বাস করতে হয়। অভিশপ্তা উর্বশী মর্ত্যে এসে পুরুরবার স্ত্রী হতে চাইলেন, কিন্তু সর্ত হল—দিনে তিনবার পুরুরবা উর্বশীকে আলিঙ্গন করতে পারবেন বটে, তবে উর্বশীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরুরবা তাঁর সঙ্গে শয়ন করতে পারবেন না; তাছাড়া পুরুরবাকে যেন কোন দিন নগ্ন অবস্থায় দেখবার সুযোগ উর্বশীর না হয়। এই প্রতিশ্রুতি দেবার পর পুরুরবা উর্বশীকে স্ত্রীরূপে পান। এইরূপে তাঁরা বহু বর্ষ একসঙ্গে কাটান। বহু বর্ষ গত হবার পর গন্ধর্বরা স্বর্গে উর্বশীর অভাব অনুভব করতে থাকে। কি উপায়ে উর্বশীকে ফিরিয়ে আনা যায়, সেই বিষয়ে তারা চিন্তাকুল হয়ে পড়ে। অতঃপর একদিন তারা রাত্রে গোপনে এসে উর্বশীর শয্যার সঙ্গে দুইটি মেষশাবক বেঁধে রেখে যায়। তারপর গন্ধর্বরা দুইটি মেষশাবকের মধ্যে একটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। উর্বশী নিদ্রিত রাজকে মেষশাবক উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন। নিজের শয্যায় পুরুরবা তখন নগ্ন অবস্থায় ছিলেন। উর্বশীর অনুরোধে বিচলিত হয়ে তিনি ত্রস্তপদে চোর ধরতে বেরিয়ে যাবার

উপক্রম করলে, গন্ধর্বরা এই সুযোগে বজ্রপাতের ব্যবস্থা করে তারই উজ্জ্বল আলোকে রাজপ্রসাদ আলোকিত করে দিল। এবং এই আলোকে রাজার নগ্নাবস্থা দেখে উর্বশী তক্ষণাৎ শাপমুক্ত হয়ে অদৃশ্য হলেন।

উর্বশীর শোকে ও দুঃখে জর্জরিত হয়ে পুরুরবা উর্বশীকে পুনরায় পাবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়লেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রের নিকটে চারজন হংসী দেহধারী অপ্সরীর সঙ্গে স্নানরতা উর্বশীকে তিনি দেখতে পেলেন। উর্বশীকে বার বার গৃহে ফিরে আসবার জন্য পুরুরবা অনুরোধ করলেন, কিন্তু পুরুরবার আকুল ক্রন্দনে উর্বশীর মন বিচলিত হোল না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর উর্বশী এই সর্তে রাজী হোলেন যে, বৎসরের শেষ রাত্রে পুরুবরা এলে তাঁর সঙ্গে উর্বশী শয্যাগ্রহণ করবেন এবং তাতেই তাঁদের পুত্রসন্তান হবে। বৎরান্তে পুরুরবা ফিরে এলে উর্বশী তাঁকে প্রথম পুত্র আয়ুকে দান করলেন। এইভাবে তাঁদের বাৎসরিক মিলন চলতে লাগল। এর ফলে প্রতি বৎসরেই উর্বশী রাজাকে একটি একটি করে পাঁচটি সন্তান দান করলেন। কোন কোন মতে সন্তানের সংখ্যা সাতটি। একদিন উর্বশী পুরুরবাকে জানালেন যে গন্ধর্বরা তাঁকে তাঁর প্রার্থিত যে কোন বর দেবেন। উর্বশীর সহিত বাস করাই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল, অতএব তিনি তাই প্রার্থনা করলেন। তখন গন্ধর্বরা একটি প্রজ্জলিত পাত্র এনে পুরুরবাকে বললেন, "এই অগ্নি গ্রহণ করুন এবং বেদের বিধান অনুসারে একে তিন ভাগে বিভক্ত করুন, তবেই আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।" সেই থেকে উর্বশী ও পুরুরবা অবিচ্ছিন্ন হয়ে গন্ধর্বলোকে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের ভলবাসা চিরস্থায়ী হয়ে রইল। এই আখ্যানটি শতপথব্রাহ্মণে ও পুরাণে পাওয়া যায়।

(২) বেদের মতে মিত্রাবরুণ আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে অপ্সরা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় ওঁদের রেতঃপাত হয়। রেতের যে ভাগ কুম্ভে পড়ে, সে ভাগ হতে বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। এতে এই দুই দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে পৃথিবীতে নির্বাসিতা হতে হবে। এখানে এসে উর্বশী পুরুবার স্ত্রী হন।

(৩) দিব্যাস্ত্র ও নানা অস্ত্রশস্ত্র লাভ ও নৃত্য-গীতাদি বিদ্যাশিক্ষার জন্য যখন অর্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করেন, সেই সময় ইন্দ্রের অনুজ্ঞায় উর্বশী অর্জুনের সঙ্গ কামনা করেন। উর্বশীর গর্ভে ও পুরুরবার ঔরসে, আয়ু জন্মগ্রহণ করে। তাঁরই প্রপৌত্র পুরু। তাই উর্বশী পৌরবংশের মাতা।

অর্জুন তাঁকে জননীর ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করেন। উর্বশী বলেন, তাঁকে গুরুস্থানীয়া মনে করা অনুচিত। কারণ, অপ্সরারা কোন নিয়মাধীন নয়। তখন অর্জুন বলেন, উর্বশী মাতৃবৎ পুজনীয়া এবং তিনি পুত্রবৎ রক্ষণীয়। এইরূপে অর্জুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হবার পর ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশী তাঁকে অভিশাপ দেন যে, তিনি সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবেন। এই অভিশাপের ফলে বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন বৃহন্নলা নামে নর্তকের ছদ্মবেশ ধারণ করেন ও এই অভিশাপ তাঁর বরস্বরূপ হয়।

(৪) মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রম-উর্বশী' নাটকে উল্লিখিত আছে যে, কেশী দৈত্য উর্বশীকে হরণ করলে পুরুবরা তাঁর কবল থেকে উর্বশীকে উদ্ধার করেন ও উভয়ে পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হন। স্বর্গে অভিনয়কালে ভুলক্রমে পুরুবার নাম উল্লেখ করে ফেলায় শাপগ্রস্তা হয়ে উর্বশী মর্ত্যে পুরুরবার স্ত্রী হন। পুত্র-মুখ দর্শনের পর উর্বশীর শাপমোচন হয়। পরে নারদের বরে উর্বশী ও পুরুরবার মিলন চিরস্থায়ী হয়।

(৫) পদ্ম পুরাণের বিবরণ এইরূপ—পুরাকালে কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্মপুত্র হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র তাঁর উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে তাতে বিঘ্ন জন্মাবার জন্য কয়েকজন অপ্সরার সঙ্গে বসন্ত ও কামদেবকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। এই অপ্সরারা বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ করতে অক্ষম হয়। তখন কামদেব অপ্সরাদের উরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি করলেন। উর্বশী বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতে পারায় ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে ও তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে চাইলেন। উর্বশী তাতে সম্মত হলেন। কিন্তু পরে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় উর্বশী ওঁদের প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ওঁদের অভিশাপে উর্বশী মনুষ্যভোগ্যা হয়ে পুরুরবার স্ত্রী হন।

উমা—মহাদেবের স্ত্রী এবং হিমালয় ও সুমেরু-দুহিতা মেনকা বা মেনার কন্যা; এঁর অন্য নাম পার্বতী। পূর্বজন্মে ইনি দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের মুখে স্বামীর নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে হিমালয়-রাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। কখনও তিনি নিদারুণ গ্রীষ্মে, কখনও ভীষণ ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শিবের চিন্তা করতেন। শেষে গলিত পত্র পর্যন্ত না খেয়ে 'অপর্ণা' সেজে শিব-সাধনা করতে থাকেন। উমার কঠোর তপস্যা দেখে তাঁর মা কন্যাকে বলেছিলেন, উ (হে পার্বতি) মা (না)—তপস্যা কোরো না। এই জন্যই এঁর নাম হয় উমা।

তারকাসুরের উৎপাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ উত্যক্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা বললেন, মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয়র হস্তে এই তারকাসুরের মৃত্যু হবে। সে কারণ, যাতে মহাদেবের পুত্র উৎপাদনের অভিলাষ জন্মে, তার চেষ্টা করা দরকার। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের কৌশলে হর-পার্বতীর মিলন হয়, এবং কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করে তারকাসুর বধ করেন।

একদা ইনি স্বামীসহ হিমালয়ে বিহারে রত ছিলেন, এতদ্‌কালে কুবেরের দৃষ্টি উত্তরদিকে পতিত হওয়ায় কুবের একাক্ষিপঙ্গল হয়ে যান।

একদিন মহাদেব স্ত্রী সেজে এঁর সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলেন। তখন উক্ত বনের সমূহ প্রাণী মহাদেবের ইচ্ছানুসারে স্ত্রীরূপে রূপান্তরিত হয়। মৃগয়া করতে করতে রাজা ইল দৈবক্রমে উক্তস্থানে গিয়া উপস্থিত হলে ইলা হয়ে যান। (রামায়ণ)

উলূপী—ঐরাবত-কুলজাত কৌরব্য নাগের কন্যা। যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অর্জুন বারো বৎসর বনবাসে থাকেন। বনবাসের সময় অর্জুন একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নামলে নাগরাজ-কন্যা উলূপী কামাতুরা হয়ে এঁকে আকর্ষণ করে পাতালে নাগ-ভবনে নিয়ে যান ও অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদন করেন। উলূপী অর্জুনকে বলেন যে, অর্জুনের ব্রহ্মচর্যের নিয়ম কেবলমাত্র দ্রৌপদীর জন্যে, অতএব উলূপীর সহিত মিলিত হলে তাঁর ধর্ম নষ্ট হবে না। সেখানে তাঁর বিবাহ হয়। উলূপীর মনের কামনা সিদ্ধ হলে, তিনি অর্জুনকে বর দিলেন যে, তিনি জলে অজেয় হবেন এবং সমস্ত জলচর জীব তাঁর বশীভূত হবে। অর্জুনের ঔরসে উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করতে ব্রতী হন। অর্জুন এই যজ্ঞাশ্বের রক্ষক হয়ে নানা দেশে যুদ্ধ করে মণিপুরে উপস্থিত হলে, চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের ঔরসজাত পুত্র বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব হরণ করেন এবং পিতাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন। নিজ পুত্রকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসতে না দেখে অর্জুন অত্যন্ত বিরক্ত হন। তখন উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন পিতার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উলূপীর মায়াতে অর্জুন পুত্রহস্তে শরাঘাতে অচেতন হন। তখন উলূপী নাগলোক থেকে সঞ্জীবন-মণি এনে বভ্রুবাহনকে সেটি অর্জুনের বক্ষে রাখতে বলেন এবং তারই প্রভাবে অর্জুন আবার নবজীবন লাভ করেন।

(মহাভারত—আদি)।

উলূক—ইনি দুর্যোধনের মাতুল শকুনির পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আসন্ন হলে দুর্যোধন উলূককে

পাণ্ডবদের কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। উলূক পাণ্ডব-শিবিরে গিয়ে দুর্যোধনের সকল কথা জানালে, তার উত্তরে অর্জুন বললেন—দুর্যোধন যে গর্বিত বাক্য বলেছেন কাল সৈন্যদের সম্মুখে গাণ্ডীবের সাহায্যে আমি তার প্রত্যুত্তর দেব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে উলূক সহদেবের ভল্লের আঘাতে নিহত হন। (মহাভারত)

উশীনর—ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা। ইনি মহারাজ যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে শিবি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। উশীনর নানা যজ্ঞ করে ইন্দ্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। এঁর ধর্মবল পরীক্ষা করার জন্য ইন্দ্র শ্যেন পক্ষিরূপে আর অগ্নিদেব কপোতরূপে এঁর কাছে আসেন। শ্যেন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কপোত উশীনরের উরুদেশে আশ্রয় নেয়। কপোতকে অনুসরণ করে শ্যেনরূপী ইন্দ্র উশীনরের কাছে এসে তার ভক্ষ্য কপোতকে তাঁর আশ্রয় থেকে মুক্ত করে দিতে বলেন। উশীনর তার উত্তরে বলেন যে, শরণাগত ও ভীতকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর ধর্ম। শ্যেন উত্তর দেয় যে, সকল প্রাণীই আহারের জন্য জন্মাচ্ছে, আহারের জন্য বৃদ্ধি হচ্ছে, আহার করেই জীবনধারণ করছে। এই ভক্ষ্যবস্তু থেকে বঞ্চিত হলে, ক্ষুধায় আমার ও আমার পুত্রকন্যার প্রাণনাশ হবে। একজনের জন্য এতগুলি প্রাণনাশ করা অধর্ম। যে ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতিবন্ধক, সে ধর্ম ধর্মই নয়। রাজা এই ধর্মতত্ত্ব শুনে কপোত ছাড়া তাঁহার নিকট অন্যান্য যে আহার্য আছে, যেমন—গরু, মহিষ ইত্যাদি শ্যেনকে গ্রহণ করতে বলেন। শ্যেন তখন কপোতের পরিবর্তে কপোতের সমান ওজনে মাংস রাজার দেহ হতে কেটে দিতে বলে। রাজা তুলাদণ্ডের এক দিকে কপোতকে স্থাপন করে ও অন্য দিকে নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে দিতে থাকেন। কিন্তু ক্রমাগত মাংস দিয়েও দেখা যায় যে, কপোতের সনান হয় না। তখন রাজা নিজেই তুলাদণ্ডের অন্য দিকে উঠে বসেন। তখন ইন্দ্র ও অগ্নি পক্ষিবেশ ত্যাগ করে উশীনরকে আশীর্বাদ করে বলেন যে, তোমার কীর্তি জগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে। (মহাভারত—আদি ও বন)।

উপনিষদ—উপনিষদ বেদের শিরোভাগ। এই জন্য এর নাম বেদান্ত। উপনিষদ বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক কথিত হয়েছে। এদের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে কৌশীতকী, ঐতরেয়, ছান্দাগ্য, কেন, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি বারোখানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলে গণ্য। এদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ নিয়ে কর্মকাণ্ড; আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড।

এতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয়

গভীর তত্ত্বকথা আছে। উপনিষদগুলি প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ।

প্রধান ১২ খানি উপনিষদের নাম—ঋগ্‌বেদীয় - (১) ঐতরেয়, (২) কৌশীতকী; সামবেদীয়—(৩) ছান্দোগ্য, (৪) কেন; কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়—(৫) তৈত্তিরীয়, (৬) কঠ, (৭) শ্বেতাশ্বতর; শুক্ল যজুর্বেদীয়—(৮) বৃহদারণ্যক, (৯) ঈশ, (১০) প্রশ্ন, (১১) মুণ্ডক, (১২) মাণ্ডুক্য। অবশিষ্ট সবই অথর্ববেদীয়।

উপপুরাণ—অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ। নানা মুনি রচিত। যথা—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, দুর্বাসাঃ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর। মতান্তরে—নন্দিকেশ্বর, পদ্ম ও দেব পুরাণ স্থলে বামন, ব্রহ্মাণ্ড ও ভার্গব পুরাণ। মতান্তরে বায়ু, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, মারীচি ও ভার্গব স্থলে মানব, মন্দিকেশ্বর, আদিত্য, ভাগবত ও বশিষ্ঠ।

উশিজ—ঋগ্‌বেদে কাক্ষিবতের মাতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। উশিজ কলিঙ্গ রাজমহিষীর ধাত্রী। পুত্রলাভের আশায় রাজা স্ত্রীকে দীর্ঘতমা ঋষির আলিঙ্গন গ্রহণ করতে বলেন, কিন্তু রাণী নিজের পরিবর্তে তাঁর ধাত্রীকে ঋষির কাছে পাঠিয়ে দেন। ঋষি এই পরিবর্তন জানতে পেরেও ধাত্রীকে একটি পুত্র দান করেন। এই পুত্রের নামই কাক্ষিবৎ। পিতার দিক হতে এই সন্তান ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু দীর্ঘতমার দিক থেকে ছিল ব্রাহ্মণ।

ঊ

উর্ধ্বরেতা—যার বীর্য উর্ধ্বগত হয়েছে, অথবা যার কখনও রেতঃস্খলন হয় না, যার রেত উর্ধ্ব অর্থাৎ অধঃপতিত হয় না। অস্খলিত বীর্য। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

(১) মহাদেব, শিব। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে মহাদেব রেতঃ উর্ধ্বগত করাতে উর্ধ্বরেতা নাম প্রাপ্ত হন।

(২) রাজা শান্তনু সত্যবতীর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে সত্যবতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সত্যবতীর পিতা দাসরাজ শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম বর্তমান থাকায়, তাঁর কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজ্যের অধিকার লাভে অসমর্থ হবে বলে শান্তনুকে কন্যাদান করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম আর বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করে চির-কুমার ব্রহ্মচারী হওয়াতে উর্ধ্বরেতা বলে বিখ্যাত হন।

(৩) মুনি বিশেষ; যেমন সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ঋষিগণ ইত্যাদি।

(৪) মহাভারতে অষ্টাশীতি সহস্র

ঊর্ধ্বরেতা ঋষির উল্লেখ আছে।

ঊর্মিলা—মিথিলার রাজা জনকের কনিষ্ঠা কন্যা ও সীতার ভগিনী। লক্ষ্মণের সহিত এঁর বিবাহ হয়। এঁর গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে লক্ষ্মণের দুই পুত্র জন্মে। সীতা ক্ষেত্রশোধন কালে হলমুখ থেকে উদ্ভূতা, কিন্তু ঔরসজাত নন। ঊর্মিলাই জনকের ঔরসজাত কন্যা।

ঊষা—(১) ঋগ্‌বেদের কুড়িটি সূক্তে ইনি স্তুতিলাভ করেছেন। ইনি জ্যোতির্বসনা। স্বর্ণকন্যা ও আদিত্যদেব ভগিনী। ইনি চির-যৌবনা ও সকল সৌন্দর্যের আধার। ঊষা প্রাতঃকালের দেবতা। বেদোক্ত ঊষা প্রজাপতির কন্যা। প্রজাপতি রাজা সোমের (চন্দ্র) সহিত কন্যার বিবাহ দিবার সংকল্প করেন, কিন্তু বিবাহের সংবাদ পেয়ে দেবগণের মধ্যে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় ঊষার পাণিপ্রার্থী হন। এই পাচজন শক্তিশালী দেবতা কন্যার পাণিপ্রার্থী হওয়ায়, প্রজাপতিগণ ঘোষণা করেন যে, অনন্ত আকাশ-পথ অনুধাবনে যিনি কৃতকার্য হবেন এবং যিনি সঙ্গে সঙ্গে যত বেশী স্বরচিত বেদ-সূক্ত উচ্চারণ করতে পারবেন, তাঁরই হাতে ঊষাকে সমর্পণ করা হবে। এই পথের কথা শুনে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য আজীবন অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন অশ্বিনীদ্বয় ইন্দ্রের কাছ থেকে বেদসূক্ত লাভ করে শেষ পর্যন্ত সফল হন এবং ঊষাকে লাভ করেন। কিন্তু অন্যান্যরা সূর্যের অনুচর বলে প্রীতি-কামনায় ঊষাকে প্রতিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু সূর্য ঊষাকে বরণ করে নেন।

(২) প্রহ্লাদের পৌত্র শোণিতপুরের রাজা বাণাসুরের রূপবতী কন্যা ছিলেন ঊষা। ঊষা পার্বতীর শাপভ্রষ্টা পারিপার্শ্বিকা। একদিন ঊষা পার্বতীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করতে দেখে নিজেও নিজের স্বামীর সহিত ঐরূপ ক্রীড়া করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে পার্বতী সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন, স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তির সহিত তুমি সম্ভোগ করবে, সেই তোমার স্বামী হবে। পার্বতীর কথানুযায়ী এক ব্যক্তি স্বপ্নে ঊষাকে সম্ভোগ করেন। ঊষার সখী চিত্রলেখা বহুলোকের চিত্র অঙ্কন করে ঊষাকে দেখান। তার মধ্যে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের চিত্রই স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি বলে ঊষা চিনতে পারেন। চিত্রলেখার সাহায্যে ঊষা দ্বারকা হতে অনিরুদ্ধকে নিদ্রিতাবস্থায় হরণ করে আপনার গৃহে আনয়ন করেন এবং পরে গন্ধর্বমতে অনিরুদ্ধ ঊষাকে বিবাহ করেন। প্রাসাদে অনিরুদ্ধের অন্যায় আগমন অবগত হয়ে, ঊষার পিতা বাণাসুর তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেন এবং বন্দী করে রাখেন। এই সংবাদ জ্ঞাত

হয়ে কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে সাহায্য করতে এলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। বাণের পক্ষে ছিলেন মহাদেব ও স্কন্দ। মহাদেবের সাহায্য সত্ত্বেও বাণ পরাজিত হন। পরাজয়ের পর অনিরুদ্ধ উষার সহিত দ্বারকায় নীত হন। (বিষ্ণুপুরাণ)

ঊর্ব—পুরঞ্জয়ের পুত্র ঊর্ব। মহর্ষি ঊর্ব সব সময়ে কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন। দেবতারা তাঁর বংশলোপ হবে এই আশঙ্কা করে তাঁকে বিবাহ করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি বিবাহ না করেই অগ্নিতে উরু-মন্থন করত ঔর্ব নামে এব পুত্রের জন্মদান করেন। (হরিবংশ)

ঋ

ঋক্—যা দিয়ে দেবগণের স্তুতি করা হয়। বেদের অন্তর্গত ত্রিবিধ মন্ত্রের অন্যতম। অন্য দুই—যজু ও সাম।

ঋক্ষ—পর্বত বিশেষ। এই পর্বতের মধ্য দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ-পূর্বাংশ পুবাকালে 'ঋক্ষ', 'ঋক্ষবান' ইত্যাদি নামে অভিহিত হোত।

ঋক্ষরাজ—ভল্লুকরাজ জাম্ববান; শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর পিতা।

ঋগ্‌বেদ—চারিটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ; ইহা জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। প্রাচীন যুগে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হয়ে ইহা প্রচারিত হোত বলে এর অন্য নাম 'শ্রুতি'। ঋগ্‌বেদে ১০,৫৮০ ঋক্ আছে; কিন্তু বর্তমানে ১৬৩ ঋক্ লোপ পেয়েছে। ঋগ্‌বেদ প্রথমতঃ শাকল ঋষি কর্তৃক অধীত হয়েছিল; এইরূপে বাস্কল, অশ্বলায়ন, শঙ্খায়ন ও মণ্ডুক নামক চারজন ঋষি ঋগ্‌বেদ পরে পরে অভ্যাস করলে এর পাঁচশাখার উদ্ভব হয়। যথা—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন এবং মাণ্ডুক। অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ যতবারই নূতন ঋষির দ্বারা অভ্যস্ত ও চর্চিত হয়েছে, ততবারই এর বিভিন্ন নূতন শাখার উদ্ভব হয়েছে। এ কারণ, প্রতিবারই মূলের সঙ্গে প্রভেদও ঘটেছে অল্পবিস্তর। উপর্যুক্ত পাঁচ শাখা ব্যতীত, ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়ী, কৌষিতকী, শৈশিরী, পৈঙ্গী প্রভৃতি বহুপ্রকার উপশাখা আছে। ঋগ্‌বেদে ব্রাহ্মণ নামে দুই প্রধান বিভাগ আছে—ঐতরেয় ও কৌষিতকী বা শাঙ্খায়ন। ঐতরেয় আট পঞ্জিকায় এবং প্রতি পঞ্জিকা পাঁচ অধ্যায়ে, প্রতি অধ্যায় ন্যূনাধিক সাত কাণ্ডে (সর্বসমেত ২৮৫ কাণ্ড) বিভক্ত। ঋগ্‌বেদের অন্য অংশ ঐতরেয় আরণ্যক। ঐ অংশ আঠারো অধ্যায়ে ও পাঁচ আরণ্যকে বিভক্ত। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলি অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, উষা অশ্বিনীদ্বয়, পৃথিবী, মরুৎ, রুদ্র, যম ও সোম—প্রভৃতিদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। এই সকল স্তবস্তুতি ও

মন্ত্রদ্বারা আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন।

ঋচীক—ভৃগু মুনির পুত্র। পাঠান্তরে, ঔর্ব ঋষির পুত্র বলেও কথিত। গাধির কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে ঋচীকের তিন পুত্র হয়—জমদগ্নি, শুনঃশেফ, শুনঃপুচ্ছ। (হরিবংশ)। ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করার জন্য অলৌকিক উপায়ে সমস্ত ধনুর্বেদ ঋচীক শিক্ষা করেন। নিজের বংশরক্ষা করবার জন্য মহারাজ কুশিকের পুত্র গাধির কন্যাকে ঋচীক বিবাহ করেন। গাধির কোন পুত্র না হওয়ায় এবং তাঁর স্ত্রী খুব দুঃখিত হওয়ায়, ঋচীক নিজের স্ত্রী ও শাশুড়ীর পুত্র হবার জন্য ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র—দুই প্রকার যজ্ঞের পায়স তৈরী করেন। গাধিরাজের স্ত্রী সুপুত্র লাভের আশায় ব্রাহ্ম পায়স খান এবং কন্যা (ঋচীকের স্ত্রী) আহার করেন ক্ষাত্র-পায়স। অবশেষে ঋচীকের স্ত্রী পায়সের প্রভাব জ্ঞাত হয়ে, যাতে তাঁর পুত্র ক্ষত্রিয়ত্ব না পেয়ে পৌত্র পায়, তার জন্য স্বামীর কাছে বর চান। এই পায়সের প্রভাবে ঋচীকের স্ত্রীর জমদগ্নি নামে এক পুত্র হয়, আর জমদগ্নির ঔরসে জন্মলাভ করেন পরশুরাম। পরশুরাম নিজের পিতামহর বরানুসারে ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী হয়ে সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত করেন। অপর দিকে গাধীরাজের স্ত্রী পায়সের প্রভাবে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (মহাভারত—অনুশাসন)

ঋতধ্বজ—ইনি শত্রুজিতের পুত্র। এক সময়ে দৈত্য পাতালকেতু গালব ঋষির আশ্রমে উৎপাত করে। সেই সময় গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু গালবকে কুবলয় নামক একটি অশ্ব দান করেন। মহর্ষি গালব সেই অশ্ব ঋতধ্বজকে দেন। ইতঃপূর্বে পাতালকেতু বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করেছিল। ঋতধ্বজ এই অশ্বে আরোহণ করে পাতালকেতুকে পরাজিত করেন ও মদালসাকে উদ্ধার করে বিবাহ করেন।

ঋতুপর্ণ—ইনি সূর্যবংশীয় অযোধ্যারাজ অযুতাশ্বের পুত্র। অক্ষক্রীড়া ও গণনা-বিদ্যায় এঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। কলির কোপে রাজ্য হারিয়ে কলিগ্রস্ত নলরাজা 'বাহুক' পরিচয়ে সারথিরূপে এঁর আশ্রয়ে ছিলেন। নলকে পুনঃপ্রাপ্ত হবার আশায় দময়ন্তী যখন মিথ্যা স্বয়ংবরের ঘোষণা করেন, তখন মাত্র একদিন পূর্বে ঋতুপর্ণ এ সংবাদ পান। ঋতুপর্ণের অনুরোধে 'বাহুক'রূপী নল একদিনেই তাঁকে অযোধ্যা হতে বিদর্ভে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। পথিমধ্যে নল ঋতুপর্ণকে অশ্বহৃদয় (অশ্বচালনা-বিদ্যা) শিক্ষা দেন ও পরিবর্তে ঋতুপর্ণের নিকট হতে

অক্ষহৃদয় (পাশাখেলার বিদ্যা) ও গণনা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিদর্ভে নলদময়ন্তীর মিলন হয়। ঋতুপর্ণ স্বয়ংবর সভার ব্যাপারে মিথ্যা জানতে পেরে ক্ষুণ্ণ হলেও, নলের পরিচয় পেয়ে ও দময়ন্তীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন দেখে আনন্দিত হন। ঋতুপর্ণের প্রদত্ত বিদ্যার প্রভাবেই নল কলির হাত থেকে মুক্তি ও পুষ্করের হাত থেকে রাজ্যোদ্ধার করেন। (মহাভারত—বন)

ঋত্বিক—যজ্ঞকার্যে চারজন মুখ্য পুরোহিত নিযুক্ত হন—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা। এঁদের প্রত্যেকের অধীনে তিনজন করে দ্বাদশ জন ঋত্বিক নিযুক্ত থাকেন। এঁদের কেহ উচ্চৈঃস্বরে ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতার আবাহন বা প্রশংসাদি করতেন, কেহ যজ্ঞের জিনিস প্রস্তুত করতেন, কেহ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতেন, কেহ বা সামমন্ত্র গান করে দেবতার স্তুতি করতেন।

ঋভু—(১) দেবগণ বিশেষ। সতীর দেহত্যাগের পর প্রমথগণ দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করলে, দক্ষের পুরোহিত ভৃগু মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হতে ঋভু নামক সৈন্যদের সৃষ্টি করেন। এরা সতীর অনুচরদের বিতাড়িত করে। ঋভুগণ বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা।

(২) ঋগ্‌বেদে ঋভুগণ অত্যন্ত কর্মকুশল; এরা ইন্দ্রের রথ ও অশ্বদের শোভান্বিত করত। এই জন্য ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে এদের পিতামাতাদের পুনর্যৌবন দেন। মেক্সমূলার বৈদিক ঋভুর সঙ্গে গ্রীকদের প্রাচীন দেবতা অর্ফিয়সের (Orpheus) তুলনা করেছেন।

(৩) পুরাণ মতে ঋভু ব্রহ্মার পুত্র, ইনি তপোবলে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। পুলস্ত্য-পুত্র নিদাঘ এঁর শিষ্য।

ঋষি—কবি ও মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি। পরমার্থ তত্ত্বে যিনি সম্যক দৃষ্টি রাখেন, তিনিই ঋষি। যিনি জ্ঞানমার্গে গমন করে সংসার অতিক্রম করেছেন, তিনিই ঋষি। পুরান মতে যা হতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি সম্যক রূপে নিরূপিত হয়—তিনিই ঋষি।

এঁরা ঈশ্বর অদিষ্ট, এঁদের কাছে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। এঁরা সাত জন ঋষি, সপ্তর্ষি বা প্রজাপতি নামে খ্যাত। এঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্রও। শতপথব্রাহ্মণে এঁদের নাম এইরূপ উল্লেখ আছে—গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি। মহাভারতে এঁদের নাম—মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ। বায়ু পুরাণে ভৃগুর নাম যোগ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে আরো দুইটি নাম যোগ করা হয়েছে—ভৃগু ও দক্ষ। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে গৌতম, কণ্ব, বাল্মীকি,

ব্যাস, মনু, বিভাণ্ডক নামক ঋষি হিসাবে এঁদের অখ্যাত করা হয়েছে। প্রথমোক্ত সপ্তর্ষি আকাশে সাতটি তারকারূপে অবস্থিত আছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় এই সপ্তর্ষিমণ্ডল Great Bear নামক নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত। ঋষি সাত প্রকার—শ্রুতর্ষি যেমন সুশ্রুত; কাণ্ডর্ষি যেমন জৈমিনি; পরমর্ষি যেমন পৈল, মহর্ষি যেমন ব্যাস, রাজর্ষি যেমন বিশ্বামিত্র ও জনক; ব্রহ্মর্ষি যেমন বশিষ্ঠ; দেবর্ষি যেমন নারদ, অত্রি, মরিচী, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ; ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, ভরত, তুম্বুরু, কনদাদি। প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম আছে। এই প্রসঙ্গে আরও বিশ প্রকার ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—বৈখানস, বালখিল্য, মরীচি, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট, আকাশনিলয়, অনবকাশিক, দন্তোলুখল, অশয্যা, পত্রাহার, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্রপট্টবাস, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্ধ্ববাস, তপোনিষ্ঠ, পঞ্চতপাস্থিত, সযপ। মহাভারতেও এই প্রকার ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—ফলাহারী, মূলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য প্রভৃতি।

ঋষ্যমূক—ঋষ্য (মৃগ) সেখানে মূক (নীরব)। যেখানে হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করে। দক্ষিণদেশীয় পর্বত। পূর্বঘাট ও নীলগিরি পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থিত পর্বত। পম্পা সরোবর ও কাবেরী নদী এই স্থান হতে উৎপন্ন হয়েছে। এখানে মাতঙ্গমুনির আশ্রম ছিল। সুগ্রীব বালীর ভয়ে এই পর্বতে বাস করতেন। রাবণ সীতাকে হরণ করার পর রাম লক্ষ্মণ কবন্ধ দানবকে শাপমুক্ত করলে, তিনি রাম লক্ষ্মণকে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে বানরদের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেন। রাম লক্ষ্মণ ঋষ্যমূকে গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ও বালী বধ করেন। (রামায়ণ—অবণ্য)

ঋষ্যশৃঙ্গ—কশ্যপ-তনয় বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ও দশরথের জামাতা। বিভাণ্ডকের ঔরসে দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম ভগের কন্যা মৃগরূপিণী স্বর্ণমুখীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম। একদিন বিভাণ্ডক মুনি দীর্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে কোন হ্রদে স্নানরত ছিলেন। সেই সময় স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দেখে কামাবিষ্ট হন এবং জলমধ্যে রেতঃপাত করেন। এক তৃষিতা হরিণী সেই রেতঃ মিশ্রিত জলপান করাতে গর্ভিণী হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করে। এই হরিণী একজন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। হরিণীর গর্ভজাত বলে এই মুনির মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল। ইনি কৌশিকী নদীর তীরে পিতার তপোবনে একেবারে নিঃসঙ্গভাবে প্রতিপালিত হন ও তপোবনে বাস করে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা ও বেদ অধ্যয়নে কালাতিপাত

করেন। তিনি ভোগসুখ ও নারী সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। রাজা দশরথের বন্ধু অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ একবার ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রতি অসৎ ব্যবহার করাতে ব্রাহ্মণরা তাঁকে ত্যাগ করেন ও ইন্দ্র জলবর্ষণে বিরত হন। ফলে প্রজাদের দুর্দশা উপস্থিত হয়। জনৈক মুনির পরামর্শে রাজা প্রায়শ্চিত্ত করে মুনিদের প্রসন্ন করেন ও ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়ন করে বৃষ্টিপাত ঘটবার চেষ্টা করেন। মন্ত্রীদের পরামর্শে চিত্তোন্মাদক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বারাঙ্গনাদের এঁকে প্রলোভিত করবার জন্য পাঠান হয়। পিতা বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিতে বারাঙ্গনারা নানা উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত ও প্রলুব্ধ করে। পরে বারাঙ্গনাদের সঙ্গে তিনি অঙ্গদেশে প্রবেশ করা মাত্র রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে আর্ঘ্যাদি দিয়ে যথারীতি সংকার করেন ও পালিতকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন। এই কন্যা দশরথের ঔরসজাত। এরপর ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশেই বাস করতে থাকেন। দশরথ পুত্র কামনায় যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন, তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী সুমন্ত্রের পরামর্শ অনুযায়ী ঋষ্যশৃঙ্গকে যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত পদে বরণ করেন এবং তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে দশরথের পুত্র কামনা সার্থক করেন।

ঋক্ষরজা—বালী ও সুগ্রীবের জনক। সুমেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শত যোজন বিস্তৃত দিব্য-সভা বসতো। এখানে একদিন যোগাভ্যাসের সময় তাঁর নেত্র হতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়; তা থেকে ঋক্ষরজা নামে এক বানরের জন্ম হয়। এই বানর ব্রহ্মার আদেশে ফলমূলাদি খেয়ে সুমেরু পর্বতে বাস করত। একদিন সুমেরু পর্বতের উত্তর শিখরে এক নির্মল সরোবরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে ভাবলো যে, নিশ্চয়ই অন্য কোন বানর-শত্রু তাকে অপমান করছে। এই ভেবে সে লাফ দিয়ে জলে পড়ে আবার উঠলো। এই অবগাহনের ফলে সে এক পরমা সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হ'ল। এই সুন্দরীকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য দু'জনেই উত্তেজিত হলেন। তখন ইন্দ্র তার চিকুরে রেতঃপাত করলে তা থেকে বালীর জন্ম হয়। অতঃপর সূর্য এঁর গ্রীবায় রেতঃপাত করলে সুগ্রীবের জন্ম হয়। পরদিন বানররূপ ফিরে পেয়ে ঋক্ষরজা তার দুই পুত্র নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যায়। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে এক দেবদূতের সাহায্যে তাদের কিষ্কিন্ধ্যায় রাজপদে অভিষিক্ত করবার জন্যে পাঠিয়ে দেন। ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঋক্ষরজা পৃথিবীর সমস্ত বানর কুলের অধিপতি হ'ল। এই ঋক্ষরজা একাধারে বালী ও সুগ্রীবের পিতা ও জননী।

ঋষভ—(১) হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের নিকট এক পর্বত বিশেষ। তৎকালের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এখানে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সন্ধিনী, সুবর্ণকরণী ইত্যাদি ওষধি পাওয়া যেত।

(২) অগ্নিধ্রের পুত্র নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে মহাত্মা ঋষভের জন্ম হয়। ইনি পরমহংস ব্রতের পথ-প্রদর্শক। এঁর এক শত পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে একাশী জন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন ও অবশিষ্ট পুত্র ভরত প্রমুখ নয়জন ভারতের নয়টি দ্বীপের অধীশ্বর হন।

এ

একচক্রা—জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবরা মাতা কুন্তীর সঙ্গে একচক্রা নগরে আশ্রয় নেন। এই স্থানেই ভীমের হাতে বকাসুর নিহত হয়। ইহার বর্তমান নাম আরা নগর। (মহাভারত—আদি)

একজটা—উগ্রতারার অন্য নাম। চার হাত, কৃষ্ণবর্ণ, মুণ্ডমালা বিভূষিত, দুই দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও ইন্দীবর। বাম হস্তে কর্ত্রী ও খর্পর, মাথায় গগন-স্পর্শী এক জটা ও গলায় মুণ্ডমালা, বুকে সর্পহার; রক্তবর্ণ চোখ, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম ও কলো বস্ত্র। বাম পদ শবহৃদয়ে ও দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত। এঁর অষ্ট যোগিনী আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ নির্যাতিত দেবতাদের প্রাণরক্ষার জন্য ইনি হিমালয়ে মাতঙ্গীর কায়কোষ হতে উদ্ভূতা হন। (কলিকাপুরাণ)

একপর্ণা—শৈলরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী মেনকার কন্যা। এই কন্যা একটি মাত্র পর্ণ (পাতা বা পান) খেয়ে কঠোর তপস্যা করতেন। এইজন্য এঁর নাম একপর্ণা। ইনি অসিতদেবলের স্ত্রী।

একপটলা—মেনকার গর্ভজাত হিমালয়-কন্যা অপর্ণার সহোদরা। ইনি জৈগীষব্যের স্ত্রী। একটিমাত্র পটলা-পুষ্প (পারুল) ভক্ষণ করে তপস্যা করার জন্য এঁর এইনাম হয়।

একদন্ত—গণেশ। গণেশের এই নামের কতকগুলি কারণ আছে। কারণগুলি যথাক্রমে এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরশুরাম কুঠারাঘাতে গণেশের একঠি দন্ত ভগ্ন করেন। (২) পাশা খেলার জন্য পার্ষ্ণির প্রয়োজন হওয়ায় রাবণ গণেশের এক দন্ত উৎপাটিত করেন। (৩) একবার রাবণ কৈলাসে শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ বরতে গিয়ে মন্দির দ্বারে গণেশের কাছে বাধা পেয়ে গণেশের একটি দন্ত খণ্ডিত করেন। আবার কথিত আছে যে, কার্তিকের সঙ্গে যুদ্ধক্রীড়ায় গণেশের একটি দন্ত চূর্ণিত হয়।

একলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য। অদ্বিতীয় ধনুর্ধারী ও আদর্শ গুরুভক্ত একলব্য একবার দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা

করতে এলে নীচজাতি বলে দ্রোণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন দুঃখিত মনে একলব্য বনে গিয়ে দ্রোণের মৃণ্ময় মূর্তি নির্মাণ করে এবং তাঁকেই গুরুরূপে কল্পনা করে যোগবলে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষালাভ করতে থাকেন। গুরুভক্তির প্রসাদে একলব্য ধনুর্বিদ্যার নিপুণতায় অর্জুন প্রমুখ দ্রোণের শিষ্যগণ অপেক্ষা অধিক অস্ত্রকুশলী হয়ে ওঠেন। একদিন কুরুপাণ্ডবগণ মৃগয়ায় গেলে, তাঁদের সারমেয় ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে এসে তাঁর কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবসন ও মৃগচর্মাবৃত জটাধারী রূপ দর্শনে চীৎকার করায় একলব্য একত্রে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করে সারমেয়র স্বর সংরোধ করেন। সেই শরদ্বারা রুদ্ধমুখ কুকুরটি রাজকুমারদের কাছে গেলে, তাঁরা কুকুরের মুখে শর প্রয়োগের কৌশল দেখে বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে উপস্থিত হন ও তাঁকে দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে জানতে পেরে তাঁর কথা দ্রোণকে জানান। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বলেন, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে, আপনার অন্য কোন শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকেও অতিক্রম করেছে। এই কথা শ্রবণ করার পর দ্রোণ বললেন, তিনি নিষাদপুত্র একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দেননি। পরে তিনি অর্জুনের সঙ্গে একলব্যের কাছে গমন করেন। একলব্য গুরু দ্রোণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ালেন। দ্রোণ বললেন, যথার্থই যদি তুমি আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে জানালেন যে গুরুকে অদেয় তাঁর কিছুই নেই। তখন আচার্য দ্রোণ একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যাচ্ঞা করেন। একলব্য প্রফুল্লমুখে অকাতরে উক্ত অঙ্গুলী ছেদন করে দ্রোণকে উপহার দেন। একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষাই এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর একলব্য অন্য অঙ্গুলি দ্বারা শরবর্ষণ করে দেখান যে, তাঁর দক্ষতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। অর্জুন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এবং দ্রোণাচার্য আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখার জন্য অনার্য একলব্যের প্রতিভার বিনাশ-সাধন করেছিলেন।

একাক্ষ—বনবাসকালে চিত্রকূট পর্বতে একদা জয়ন্ত নামে একটি কাক চঞ্চুপুট দ্বারা নিদ্রিতা সীতার কুচদেশে আঘাত করলে রাম ঈষীকাস্ত্র দ্বারা কাকের চোখ দুইটি উৎপাটিত করেন। প্রাণ ভয়ে কাক নানা দেবতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, কিন্তু দেবতারা কোন আশ্রয় দিতে অসমর্থ হয়। দেবতাদের পরামর্শে কাক রামের শরণাগত হয়। কাকের দুরবস্থা

দেখে সীতা এর জীবনরক্ষার জন্য রামকে অনুরোধ করেন। তখন রাম একে একটি মাত্র চক্ষু দান করেন।

একাঘ্নী—অব্যর্থ মহাস্ত্র। কর্ণ ইন্দ্রকে নিজের কবচ দিয়ে অর্জুনকে বধ করবার জন্য এই অস্ত্র ইন্দ্রের কাছ থেকে পান এবং সযত্নে রক্ষা করেন। কিন্তু ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে ঐ অস্ত্র তিনি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করেন। (মহাভারত)

একাদশতনু—যিনি একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন; মহাদেব। তাই তাঁকে একাদশতনু বা একাদশ রুদ্র বলা হয়। মহাদেব একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত হন। যথা—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর।

ঐ

ঐতরেয়—ঋগ্‌বেদের শাখা বিশেষ। মহিদাস ঐতরেয় নামক এক ঋষি এই শাখার প্রবর্তক। ইতরার পুত্র বলে এই ঋষির নাম ঐতরেয়। ঐতরেয় মুনির দ্বারা প্রণীত বলে ইহার নাম ঐতরেয় হয়েছে। ঐতরেয় শাখায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষৎ পাওয়া যায়।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রাসুরের স্ত্রী।

ঐরাবত—দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কালে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ঐরাবত হস্তীর উদ্ভব হয়। ইন্দ্র নিজের বাহন রূপে এই ঐরাবতকে গ্রহণ করেন। ইরাবৎ, অর্থাৎ জল হতে উদ্ভূত—এই থেকে এর নাম ঐরাবত হয়েছে। কথিত আছে, ভগীরথের তপস্যায় মর্ত্যলোকে গঙ্গার স্রোতোধারা শিবজটা হতে যখন প্রবাহিত হতে থাকে, তখন ঐরাবত আপন শক্তিতে মত্ত হয়ে গঙ্গাপ্রবাহকে ধারণ করতে অগ্রসর হয়; কিন্তু গঙ্গার প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে না পেরে ভেসে যায়। পরে গঙ্গার কৃপায় সে আবার রক্ষা পায়।

(২) এক শ্রেণীর চতুর্দন্তী শ্বেতহস্তী। হস্তীদের রাজা ঐরাবত একজন দিকপাল।

ঐলবিল—বিশ্রবা মুনির অপর নাম। এঁর স্ত্রীর নাম ইলবিলা।

ঐলাবৃতবর্ষ—জম্বুদ্বীপের এক অংশ। জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীজের নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মে। পরে তিনি জম্বুদ্বীপকে নয় ভাগে ভাগ করে ঐ নয় পুত্রকে দান করেন। তাদের অধিকৃত দেশ নিজেদের নাম অনুসারে 'বর্ষ' বলে খ্যাত হয়। যেমন জম্বুদ্বীপ, নাভিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কেতুমালবর্ষ। জম্বু-

দ্বীপের অন্তর্গত ইলাবৃতবর্ষ মধ্যভাগে অবস্থিত।

ও

ওঘবতী—ইনি নৃগরাজের পিতামহ ওঘবানের কন্যা। এঁর সঙ্গে অগ্নিদেবের ঔরসে মাহিষ্মতী নগরীর ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভজাত পুত্র সুদর্শনের বিবাহ হয়। সুদর্শন স্ত্রীসহ কুরুক্ষেত্রে বাস করতে থাকেন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমেই মৃত্যু জয় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি ওঘবতীকে বলেন যে, তিনি যেন অতিথি সংকারে যত্ন নেন। এমন কি, প্রয়োজন হলে আত্মদান করতেও যেন কুণ্ঠিত না হন। স্বামী গৃহে অনুপস্থিত থাকলেও যেন অতিথি সংকারের কোন ত্রুটি না হয়। কারণ, জগতে অতিথিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি। একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে ওঘবতীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ওঘবতী তাঁকে অভ্যর্থনা করে তাঁর প্রয়োজন সম্বন্ধে জানতে চাইলে, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম তাঁকেই প্রার্থনা করে বসেন। ওঘবতী তাঁকে অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে অসম্মত হলেন। তখন পতি-আজ্ঞা স্মরণ করে সলজ্জভাবে 'তাই হোক' বলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহাস্যে ওঘবতী অন্য গৃহে গমন করলেন। সুদর্শন ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে বারংবার তাঁকে ডাকতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের বাহুপাশে আবদ্ধ ওঘবতী নিজেকে উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে স্বামীর আহ্বানে নিরুত্তর রইলেন। তখন ব্রাহ্মণ কুটীরের ভিতর থেকে বললেন, আমি অতিথি ব্রাহ্মণ, তোমার গৃহে এসেছি, তোমার স্ত্রী আমার প্রার্থনা পূরণ করছেন। এ অবস্থায় তোমার যা উচিত মনে হয়, তুমি তাই করতে পার। অতিথিসংকার ব্রত পালনে বিমুখ হলে সুদর্শনকে বধ করবার জন্য তাঁর পাশ্চাতে লৌহমুদ্গরধারী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছিল। অতিথির কথায় বিস্মিত সুদর্শন ঈর্ষা ও ক্রোধ ত্যাগ করে বললেন যে, আপনার অভীপ্সা পূর্ণ হোক, আমার প্রাণ-পত্নী ও সর্বস্ব আমি অতিথিকে দান করতে পারি। আমি সত্য বলছি, এই সত্য দ্বারা দেবতারা আমাকে পালন অথবা দহন করুন। তখন ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি সুদর্শনকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু মৃত্যুকে সুদর্শন জয় করেছেন। ওঘবতী, সুদর্শন ও তাঁর নিজেকে নিজের ক্ষমতায় রক্ষা করতে সমর্থা এবং তিনি যা বলবেন, তার অন্যথা হবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী নিজ তপস্যার প্রভাবে অর্ধ-শরীর দ্বারা ওঘবতী নদীরূপে লোকপাবন এবং অর্ধ-শরীরে

সুদর্শনের অনুগমন করবেন। সুদর্শন এঁর সঙ্গে সশরীরে শাশ্বত সনাতন লোক পাবেন। সুদর্শন মৃত্যুকে পরাভূত, বীর্যবলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম ও গার্হস্থ্যধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র শ্বেতবর্ণ সহস্র অশ্বযোজিত রথে সুদর্শন ও ওঘবতীকে তুলে নিলেন। (মহাভারত)

ওম্—অ (বিষ্ণু)+উ (মহেশ্বর)+ম্ (ব্রহ্মা)। ইহা বেদের সনাতন বীজ। ঈশ্বরের প্রার্থনা, আশীর্বাদের বাক্য। ইহা এত পবিত্র যে, উচ্চারণের সময় কেহই যেন না শুনতে পায়। কোন প্রার্থনার প্রারম্ভে, পূজা-অর্চনার প্রারম্ভে কিংবা কোন পুস্তকের প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঔ

ঔর্ব—ভৃগুবংশীয় একজন ঋষি। পুরাকালে কৃতবীর্য নামে এক রাজা তাঁর ভৃগুবংশীয় পুরোহিতদের প্রচুর ধন দান করেন। মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর ক্ষত্রিয়দের অর্থাভাব হওয়ায় তাঁরা ভার্গবদের কাছে অর্থ-প্রার্থী হন। ভার্গবরা কেউ ভূগর্ভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহ্মণদের দান করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়দেরও দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদের গৃহ খনন করে ধন দেখতে পাওয়ায় সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবদের বধ করলেন। ভার্গবনারীরা ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণী তাঁর উরুদেশের গর্ভ গোপন করলেন। ক্ষত্রিয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নষ্ট করতে এলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণীর উরু ভেদ করে এক দীপ্তিমান পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তাঁর তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন অনুগ্রহপ্রার্থী ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণী বললেন যে, তোমরা আমার উরুজাত পুত্র ঔর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়দের প্রার্থনায় ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। ঔর্বকে সর্বলোক বিনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগণ তাঁকে ক্রোধ সংবরণ করতে বললেন। তাঁরা স্বর্গারোহণে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু আত্মহত্যায় স্বর্গলাভ সম্ভব নয় বিবেচনায়, স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয়দের হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানালেন। তখন পিতৃগণের অনুরোধে ঔর্ব সমুদ্রে তাঁর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করেন। সেই ক্রোধ ঘোটকীর মস্তকরূপে (বড়বা) অগ্নি উদ্গার করে সমুদ্রজল পান করে। (মহাভারত—আদি)

ক

কচ—বৃহস্পতির পুত্র। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য আহরণের জন্য যখন দেবাসুরের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন দেবতারা বৃহস্পতিকে ও অসুরেরা শুক্রাচার্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। দেবতা-

দের হাতে যুদ্ধে নিহত অসুরদের শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করতেন। এই বিদ্যা সম্যকভাবে অধিগত না থাকায়, বৃহস্পতি মৃত দেব-সৈন্যদের জীবনদানে অক্ষম হলেন। দেবতারা তখন বৃহস্পতি-পুত্র কচকে শুক্রাচার্যের সমীপস্থ হয়ে, তাঁর প্রিয় কন্যা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করে এই মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা অর্জন করতে বল্লেন। কচ সহস্র বৎসরের জন্য শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। গুরু ও গুরুকন্যার সেবারত কচ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেবযানী ক্রমে রূপবান কচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। সুদীর্ঘ পাঁচশ বৎসর পরে, দানবরা কচের অভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে, গোচারণকালে তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে সারমেয়ের আহার্যে ব্যবহার করে। দেবযানীর অনুনয়ে শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী-বিদ্যার প্রভাবে কচকে জীবিত করেন; সারমেয়দের শরীর ভেদ করে কচ ফিরে আসেন। এর পর দানবরা দ্বিতীয়বার কচকে হত্যা করে, এবং শুক্রাচার্য পুনর্বার তাঁকে জীবিত করেন। তৃতীয়বারে দানবরা কচকে ভস্ম করে সেই ভস্ম-মিশ্রিত 'সুরা' শুক্রাচার্যকে পান করায়। দেবযানী পুনরায় কচের জীবন প্রার্থনা করলে, শুক্রাচার্য জানান যে, কচকে পুনর্জীবিত করতে হলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য, কারণ তাঁর উদর বিদীর্ণ না হলে কচ পুনর্জীবিত হবে না। শুক্রাচার্যের এই উক্তির পর দেবযানী তাঁকে বললেন যে, তাঁদের উভয়ের মৃত্যুই তাঁর কাছে কষ্টদায়ক এবং তাঁদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তাঁরও মৃত্যু অনিবার্য। তখন শুক্রাচার্য কচকে সঞ্জীবনী-বিদ্যা দানকরে বললেন যে, তুমি পুত্ররূপে আমার উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করো। কচ শুক্রের দেহ ভেদ করে নির্গত হয়ে নবলব্ধ সঞ্জীবনী-বিদ্যার প্রভাবে শুক্রচার্যকে পুনর্জীবিত করেন। সহস্র বৎসর পরে কচ স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জানালে দেবযানী তাঁকে প্রেম নিবেদন করে বিবাহ করতে চান। কচ বললেন যে, দেবযানী তাঁর গুরু-কন্যা, তাঁকে বিবাহ করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দেবযানী তথাপি কচকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করলেন। তখন কচ এই কথাই বললেন, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শুক্রাচার্যের সেই দেহের মধ্যে আমিও বাস করেছি, ধর্মতঃ তুমি আমার ভগিনী, সে জন্য এ বিবাহ অসম্ভব। দেবযানী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন যে, কচের লব্ধ সঞ্জীবনী-বিদ্যা ফলবতী হবে না। তাতে কচও দেবযানীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমার অন্তরের

কামনাও সিদ্ধ হবে না। কোন ব্রাহ্মণ ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। তোমার অভিশাপে আমার পক্ষে এই বিদ্যা নিষ্ফল হলেও আমি যাকে এই বিদ্যা দান করব, তার বিদ্যা ফলবতী হবে। এই বলে কচ দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

কর্কোটক—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে এক হাজার নাগ জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে কর্কোটক একটি প্রধান সর্প। একদা কর্কোটক দেবর্ষি নারদকে বঞ্চনা করে। এতে নারদ ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন যে, যে পর্যন্ত না রাজা নল এসে অন্যত্র নিয়ে যান, সে পর্যন্ত তাকে অরণ্যে বাস করতে হবে। তারপর সে শাপমুক্ত হবে। রাজা নল কলির কোপে পড়ে রাজত্ব হারান এবং নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে এই বনে এসে উপস্থিত হন। তখন ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। অগ্নির মধ্য হতে কর্কোটকের চীৎকার শুনতে পেয়ে নল তাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন। শাপমুক্ত হয়ে কর্কোটক নলের কাছে নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে নলকে দংশন করল। কর্কোটকের দংশনে নলের শরীর একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। নল কর্কোটকের এই ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে কর্কোটক বললে যে, আমি অকৃতজ্ঞ নই, দংশন করে আমি আপনার উপকারই করেছি। আপনার শরীর বিবর্ণ হওয়াতে আপনার দেহস্থিত শত্রু কলি আপনাকে আর চিনতে পারবে না, বিশেষতঃ আমার বিষের জ্বালায় আপনার শরীরস্থ কলি নির্জীব হয়ে থাকবে। কর্কোটক নলকে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে থাকতে অনুরোধ ক'রে তাঁর কাছে অক্ষক্রীড়া শিখতে বললে, কারণ, অক্ষক্রীড়া পারদর্শী হলে কলি দূরে পলায়ন করবে।

কর্দম—(১) একজন প্রজাপতি। ব্রহ্মার পুত্র। ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতিকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে অতি বিখ্যাত কপিলমুনি নামক পুত্র ও কলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি নামক নয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতী নদীর তীরে ইনি দশ হাজার বৎসর শ্রীহরির তপস্যা করেন। তপস্যার ফলে হরি তাঁর কাছে আবির্ভূত হলে, তিনি হরির কাছে উপযুক্ত স্ত্রী প্রার্থনা করেন। হরি দেবহুতিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে বলেন। অতঃপর মনু তাঁর কন্যা দেবহুতির সহিত কর্দমের বিবাহ দেন। কর্দম দেবহুতিকে বিবাহ করে সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন। নয়টি কন্যা জন্মাবার পর কর্দম সংসার ত্যাগ করে যোগাভ্যাসের জন্য অরণ্যাশ্রমে যাওয়া স্থির করেন। এতে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত হওয়াতে কর্দম বলেন যে, তিনি তাঁকে হরির মত পুত্র দান

করবেন। ফলে কপিলমুনির জন্ম হয়। কপিলের জন্মের পর কন্যাদের বিবাহ দিয়ে কর্দম সংসার ত্যাগ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

(২) পুলকের ঔরসে ক্ষমার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে অঙ্গিরার কন্যা সিনিবালিকে বিবাহ করেন। সিনিবালি পরে সোম বা চন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামী কর্দমকে ত্যাগ করে চন্দ্রের ভজনা করেন। এই জন্য কর্দম অত্রিকন্যা শ্রুতিকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে শঙ্খপাদ নামে এক পুত্র ও কাম্যা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত কাম্যাকে বিবাহ করেন (লিঙ্গপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও হরিবংশ)

কদ্রু—সর্প জননী। ইনি দক্ষরাজের কন্যা ও কশ্যপ ঋষির স্ত্রী। পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই কন্যা ছিল। তাঁরা দুজনেই মহর্ষি কশ্যপের ধর্মপত্নী। কশ্যপ তাঁদের বর দিতে চাইলে কদ্রু বলশালী সহস্র নাগপুত্র ও বিনতা কদ্রুপুত্র অপেক্ষা বলশালী ও তেজস্বী দুই পুত্র প্রার্থনা করলেন। যথাকালে কশ্যপের বরে কদ্রু সহস্র ও বিনতা দুইটি ডিম্ব প্রসব করলেন। পাঁচশ বৎসর পরে কদ্রুর প্রত্যেক ডিম্ব হতে নাগপুত্ররা নির্গত হল; কিন্তু বিনতার ডিম্ব থেকে কিছু না হওয়ায় তিনি একটি ডিম্ব অসময়ে ভেঙে দেখলেন যে, দেহের ঊর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ ও নিম্নভাগ অসম্পূর্ণ এক সন্তান রয়েছে। সেই সন্তান অসম্পূর্ণ অঙ্গের জন্য বিনতাকে দায়ী করে বললে যে, এজন্য তোমাকে পাঁচ শত বৎসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকতে হবে। অন্য ডিম্বটি অসময়ে না ভাঙলে তার থেকে নির্গত সন্তান তোমার দাসীত্ব মোচন করবে—এই বলে সেই সন্তান আকাশে উঠে অরুণ-রূপে সূর্যের সারথি হল। একদিন উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ নিয়ে কদ্রু ও বিনতার মধ্যে তর্ক হয়। বিনতা বললেন, অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত; কদ্রু বললেন, অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণ। স্থির হল, পরদিন তাঁরা অশ্বটিকে ভাল করে দেখবেন এবং যার কথা মিথ্যা হবে, তিনি সপত্নীর দাসী হবেন। কদ্রু তাঁর সর্প পুত্রদের ডেকে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছলগ্ন হতে বললেন, যাতে অশ্বের পুচ্ছলোম কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়। যে-সকল সর্প মাতার কথায় অসম্মত হয়েছিল, কদ্রু তাদের জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হবার অভিশাপ দেন। পরদিন দূর হতে উভয়ে অশ্ব দেখতে গেলেন। অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ দেখে বিনতা কদ্রুর দাসীত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ডিম্ব হতে গরুড়ের জন্ম হল। কদ্রুর আদেশে গরুড় সর্পদের পিঠে বহন করতে বাধ্য হলে একদিন মাতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে,

কপট উপায়ে বিনতা কদ্রুর দাসী হতে বাধ্য হয়েছেন। তখন গরুড় সর্পদের কাছে মাতার মুক্তির উপায় জানতে চাইলে তারা বললে যে, যদি নিজের শক্তিবলে সে অমৃত আনতে পারে, তবে তার মা মুক্তি পাবে। গরুড় অমৃত আনয়নের জন্য যাত্রা করলেন। মাতার পরামর্শ অনুযায়ী পথের ভক্ষ্য হিসাবে সমুদ্র প্রান্তের নিষাদদের ভক্ষণ করলেন। তাতেও তৃপ্ত না হয়ে পিতা কশ্যপের পরামর্শ মত গজ-কচ্ছপরূপী বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে আত্মকলহরত দুই ভ্রাতাকে ভক্ষণ করে দেবলোকে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেবতাগণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে জয়ী হয়ে অমৃত হরণ করলেন। গরুড় নিজে অমৃত পানের লোভ সংবরণ করায়, বিষ্ণুর বরে তিনি অজর ও অমর এবং বিষ্ণুর রথধ্বজে অধিষ্ঠান করেন। ইন্দ্র গরুড়ের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করে অমৃত প্রার্থনা করেন। গরুড় বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি অমৃত নিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে তিনি অমৃত স্থাপন করবেন, ইন্দ্র সেখান থেকে অমৃত হরণ করতে পারেন। ইন্দ্র বর দিতে চাইলে গরুড় এই বর প্রার্থনা করলেন যে, সর্পগণ যেন তাঁর ভক্ষ্য হয়। তারপর সর্পদের কাছে এসে গরুড় জানালেন, তিনি অমৃত এনে কুশের উপর স্থাপন করছেন; সর্পগণ যেন স্নানান্তে অমৃত ভক্ষণ করে এবং এখন থেকে যেন তাদের কথা মত তাঁর মাতার মুক্তি হয়। সর্পদের স্নানকালে ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করলেন। সর্পগণ অমৃত না পেয়ে কুশ লেহন করতে লাগল। এর ফলে তাদের জিহ্বা দ্বিধা বিভক্ত হল, আর বিনতার দাসীত্বও মোচন হল। (শ্রীমদ্ভাগবত, মৎস্যপুরাণ)

কর্ণ—ইনি যদুশ্রেষ্ঠ শূরের কন্যা এবং তাঁর পিতৃষ্বসার পুত্র কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা পৃথা বা কুন্তীর পুত্র। এঁর আদি নাম বসুষেণ। পরে ইনি নিজের অঙ্গ কর্তন করে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করায় কর্ণ নামে খ্যাত হন। একদা ঋষি দুর্বাসা অতিথিরূপে গৃহে এলে কুন্তী তাঁর পরিচর্যা করেন। এতে দুর্বাসা তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দেন—যার বলে কুন্তী যে দেবতাকে আহ্বান করবেন, তাঁর প্রসাদে তাঁর পুত্রলাভ হবে। কৌতূহল বশে কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করলেন। সূর্য এসে বললেন যে, তোমার আহ্বান বৃথা হবে না, আমার সহিত মিলনের ফলে তোমার পুত্রলাভ হবে এবং তুমি কুমারীই থাকবে। ফলে, কবচ কুণ্ডলধারী কর্ণের জন্ম হল। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী একটি পাত্রের মধ্যে পুত্রকে রেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা সেই শিশুকে উদ্ধার করে বসুষেণ নাম দিয়ে পালন করেন। রাধা কর্তৃক প্রতিপালিত

হয়েছিলেন বলে বসুষেণের অপর নাম রাধেয়। পরে পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ হয় ও যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম হয়; সুতরাং কর্ণ পাণ্ডবদের ভ্রাতা। কর্ণের মৃত্যুর পর এই সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। দ্রোণাচার্যের কাছে নানা দেশের রাজপুত্রদের সঙ্গে কর্ণও অস্ত্রশিক্ষা করেন। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন-কালে কর্ণ অর্জুনের প্রদর্শিত সমস্ত অস্ত্রকৌশল দেখান এবং অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতকুলশীল কর্ণের পরিচয় না পেয়ে যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্জুনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ দুর্যোধন কর্ণের বিক্রম দেখে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। প্রত্যাখ্যানের জন্য কর্ণ বিমর্ষ ও লজ্জিত হওয়াতে দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষেক করেন।

কিছুকাল পরে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যভেদের জন্য ধনু উত্তোলন করলে দ্রৌপদী সূতপুত্রকে বরণ করতে অসম্মত হন। তখন কর্ণ ধনু ত্যাগ করেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করলে উপস্থিত রাজগণের সহিত পাণ্ডবদের যুদ্ধ হয়, তাতে কর্ণ অর্জুনের কাছে পরাস্ত হন। হস্তিনাপুরের দ্যূতসভায় কর্ণ দ্রৌপদীর প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নেন।

একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু সূতপুত্র বলে দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিতে অসম্মত হন। তখন ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে কর্ণ পরশুরামের কাছে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের কৌশল শেখেন। একদিন পরশুরাম কর্ণের ঊরুতে মস্তক রেখে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় অর্জুনের হিতকামী ইন্দ্র এক বিকট কীটের রূপ ধারণপূর্বক কর্ণের ঊরু বিদীর্ণ করেন। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় কর্ণ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলেন। পরশুরাম নিদ্রাভঙ্গের পর শিষ্যের সহিষ্ণুতা দেখে বলেন যে, ব্রাহ্মণের এত সহিষ্ণুতা সম্ভব নয়, অতএব তিনি কর্ণের সত্য পরিচয় জানতে চান। কর্ণের কাছে তাঁর যথার্থ পরিচয় জ্ঞাত হন। এতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে এই শাপ দেন যে, কপট উপায়ে তাঁর নিকট হতে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাব জন্য কার্যকালে কর্ণ তা বিস্মৃত হবেন। কারণ, বেদমন্ত্রযুক্ত অস্ত্র অব্রাহ্মণের কাছে স্থায়ী হয় না। একবার পরশুরামের কাছে অস্ত্রাভ্যাস কালে অসাবধানতাবশতঃ এক ব্রাহ্মণের হোম-ধেনু হত্যা করার জন্য ব্রাহ্মণ কর্ণকে অভিশাপ দেন যে, যুদ্ধকালে তাঁর মহাভয় উপস্থিত হবে এবং রথচক্র পৃথিবী গ্রাস করবে, আর যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি পরাজিত করতে সচেষ্ট হবেন তাঁরই হস্তে কর্ণের মৃত্যু হবে।

পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা-কালে একবার কলিঙ্গরাজের কন্যার

স্বয়ংবর উপলক্ষ্যে কর্ণের সহিত মহারাজ জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জরাসন্ধ সন্তুষ্ট হয়ে কর্ণকে মালিনী নগর দান করেন।

দুর্যোধনের একজন প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন কর্ণ। জতুগৃহ দাহের পরামর্শদাতাদের মধ্যে কর্ণ অন্যতম। বনবাসকালে দ্বৈতবনে অবস্থানের সময় পাণ্ডবদের দুর্দশা-দর্শন অভিলাষে কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন সপরিবারে সেখানে যান। সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে কৌরবরা পরাজিত হন। তখন কর্ণ তাঁদের রক্ষা করতে অসমর্থ হন। গন্ধর্ব-হস্তে সপরিবারে বন্দী হলে অর্জুন দুর্যোধনদের মুক্ত করেন। এর পর কর্ণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন ও দুর্যোধনকে বলেন যে, পাণ্ডবরা রাজসূয়যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে সকল দেশ জয় করেছেন, তা তিনি একাই জয় করতে পারেন। দিগ্বিজয়ে নানা দেশ জয় করে কর্ণ প্রভূত ধন সংগ্রহ করেন। কর্ণের স্ত্রীর নমে পদ্মাবতী। কৃষ্ণসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রভৃতি তাঁর পুত্র। দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ কালে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত তিনি পাদ-প্রক্ষালন বা জলগ্রহণ করবেন না। পরে আসুরব্রত অবলম্বন করে প্রতিজ্ঞা করেন যে, অর্জুন নিহত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই ব্রত পালনের সময়ে কোন প্রার্থী এলে তাঁর নিকট যা চাওয়া হবে, তিনি তাই দান করবেন। কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করতে চান। কর্ণ অম্লান বদনে নিজ পুত্র বধ করে তাঁকে আহার করতে দেন। এই দানশীলতার পরিচয় পেয়ে কৃষ্ণ বৃষকেতুকে পুনর্জীবন দান করেন। এই ব্রতপালন কালে অর্জুনের হিতাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে কর্ণের সহজাত কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করেন। পূর্বাহ্নে সূর্য কর্ণকে সতর্ক করে দিলেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্ণ প্রতিজ্ঞারক্ষা করাই স্থির করেন। তবে সূর্যের পরামর্শে অর্জুনবধের জন্য ইন্দ্রের কাছে তিনি একাগ্নী শক্তি প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র তাঁকে উক্ত শক্তি দিয়ে বলেন যে, এই শক্তি অত্যন্ত বিপদকালে মাত্র একজনকে বধ ক'রে পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। কবচ ও কুণ্ডল দেওয়ায় তাঁর নাম হোল বৈকর্তন ও কর্ণ। কর্ণের এই শক্তি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে ঘটোৎকচ বধেই লোপ পায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর জন্মবিবরণ জানিয়ে বলেন যে, তিনি পাণ্ডবদের অগ্রজ এবং ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র; অতএব তিনিই রাজত্বভার গ্রহণ করে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সেবা লাভ করে বসবাস

করুন। কর্ণ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তিনি কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং অধিরথ ও রাধার স্নেহ-যত্নে পালিত হয়েছেন ব'লে অধিরথকেই পিতা হিসাবে গণ্য করেন। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও তিনি এই সম্বন্ধ মিথ্যায় পর্যবসিত হতে দেবেন না। দুর্যোধনের আশ্রয়ে তিনি রাজ্য ভোগ করছেন এবং তাঁরই ভরসাতে দুর্যোধন এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মৃত্যু ও বন্ধন ভয়ে বা লোভের বশবর্তী হয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে তিনি মিথ্যাচরণ করতে অক্ষম। এই আলোচনার বিষয় যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন রাখতে কর্ণ কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কারণ, কর্ণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে জানলে যুধিষ্ঠির কখনই রাজ্য গ্রহণ করবেন না এবং কর্ণ রাজ্যলাভ করলে দুর্যোধনকেই দান করবেন। অতএব কৃষ্ণার্জুন সহায়ে যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করুন এবং কুরুক্ষেত্রে নিহত যোদ্ধাগণ স্বর্গলাভে সমর্থ হউক—তিনি এটাই চান।

একদিন সন্ধ্যাকালে কর্ণ যখন গঙ্গাতীরে জপে রত ছিলেন, তখন পাণ্ডব-মাতা কুন্তী পাণ্ডবদের প্রাণরক্ষা কামনায় কর্ণকে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে রাজ্যগ্রহণের কথা উত্থাপন করেন। কর্ণের পিতা সূর্যও দৈববাণী করে কর্ণকে কুন্তীর অভিলাষ পূর্ণ করতে বলেন। মাতা-পিতার অনুরোধেও কর্ণ বিচলিত হন না, পরন্তু শৈশবে তাঁকে পরিত্যাগের জন্য তিনি কুন্তীকে তিরস্কার করেন এবং এ কথাও বলেন যে, কুন্তী তাঁর নিজের হিতের জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছেন। এতদ্ব্যতীত একথাও বলতে তিনি কুণ্ঠিত হন না যে, এক্ষণে কৌরবপক্ষ ত্যাগ করলে লোকে তাঁকে বলবে যে, কৃষ্ণার্জুনের মিলিত শক্তির ভীতিতেই কর্ণ একাজে ব্রতী হয়েছেন। অন্যান্য সকল বিষয় বাদ দিলেও, কেবলমাত্র দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতা হেতু তাঁর পক্ষে কৌরবপক্ষ পরিত্যাগ অসম্ভব। পরিশেষে কর্ণ কুন্তীকে আরও বলেন যে, অর্জুন ভিন্ন কোন পাণ্ডবকেই তিনি যুদ্ধে হত্যা করবেন না। অর্জুন বা কর্ণকে নিয়ে কুন্তী পঞ্চপুত্রের জননীই থাকবেন। কর্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর এই প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীষ্ম কবচ-কুণ্ডলহীন কর্ণকে গর্বিত, নীচ ও পরশুরাম কর্তৃক অভিশপ্ত বলে অর্ধরথ গণনা করেন। এতে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের জীবিতকালে যুদ্ধ করবেন না বলেই প্রতিজ্ঞা করেন।

ভীষ্মের শরশয্যায় অবস্থানকালে কর্ণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভীষ্ম তাঁকে বলেন যে, তিনি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছেন, এবং সেই কারণেই তিনি তাঁর আপন ভ্রাতা

পাণ্ডবদের পক্ষে কর্ণকে যোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু একথা শ্রবণান্তে কর্ণ জানান যে, তিনি কোনমতেই দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করবেন না। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে কর্ণ অন্য ছয়জন মহারথের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্যায় যুদ্ধে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেন। ষোড়শ দিনে দ্রোণের মৃত্যুর পর কর্ণ সেনাপতি হন। অর্জুন ব্যতীত সকল পাণ্ডবই কর্ণকর্তৃক তখন পরাজিত, কিন্তু কুন্তীর কাছে প্রতিশ্রুত থাকায় তিনি তাদের কারুকেই বধ করেন নি। এই যুদ্ধে মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্যগ্রহণ করেন ও কর্ণের সহিত কলহ ক'রে তাঁর মনোবল ক্ষুণ্ন করতে সচেষ্ট হন। যুদ্ধকালে পরশুরাম ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ অনুযায়ী কর্ণ দিব্যাস্ত্র সকল বিস্মৃত হন এবং মেদিনী তাঁর রথচক্র গ্রাস করে। রথচক্র উদ্ধারকালে অঞ্জলিক বাণে অর্জুন কর্ণের শিরশ্ছেদ করেন ও কর্ণের দেহস্থ তেজ সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে।

কর্ণের চরিত্রে একত্রে নীচতা ও মহত্ত্ব দুয়েরই অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। জতুগৃহ দাহ, পাণ্ডবদের লাঞ্ছনা, পাশা খেলা ইত্যাদি কুপরামর্শের মূলে ছিলেন কর্ণ। অপর দিকে রাজ্যলোভেও তিনি কৌরবপক্ষ ত্যাগ করেন নি। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন ধর্মশীল, প্রতিশ্রুতিপালক, মহৎ ও দাতা; অন্যদিকে তেমনি ছিলেন আত্মম্ভরী, কোপনস্বভাব, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও পাপমতি। এই দুই পরস্পরবিরোধী কর্মের অপূর্ব সংমিশ্রণে কর্ণ চরিত্র অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। (মহাভারতে)

কর্ণিক—ধৃতরাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদাই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। শত্রুকে যে কোন উপায়ে ধ্বংস করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক মত।

কতি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। ইনি মহর্ষির ঔরসে শীলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কতি কর্তৃক কাত্যায়ন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কণাদ—বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনি। এঁর অপর নাম উলূক। এই জন্য বৈশেষিক দর্শনের আর এক নাম ঔলুক্য দর্শন। ইনি তণ্ডুলকণা খেয়ে জীবনধারণ করতেন বলে কণাদ নামে পরিচিত। ইনি পরমাণুবাদী; এঁর মতে জীবনের কঠোরতাই ঋষিদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলসূত্র। মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেছেন, এই জন্য তাঁর দর্শনের নাম বৈশেষিক। কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর চারটি অভাব পদার্থ—মোট দশটি। ভাবপদার্থ ছয়টি হ'ল—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। অভাবপদার্থ চারটি হ'ল—প্রাগভাব, ধ্বংসা-

ভাব, অন্যোন্যভাব ও অত্যন্তাভাব। কণাদই সর্বপ্রথম পরমাণুবাদ প্রচার করেন! তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্যপদার্থ, তার আর কারণ নেই। সমস্ত জড়পদার্থই পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলে প্রতীতি হয়। তিনি প্রথমে দেখান তেজ ও আলোক—একই মূল পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা। অনেকের মতে কণাদই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পরমাণুবাদ প্রচার করেন। কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় না, সেই জন্য অনেকে কণাদকে নাস্তিক বলে থাকেন।

কন্দর্প—কামদেবের অন্যনাম। ইনি প্রেম ও কামের দেবতা। এঁর জন্ম সম্বন্ধে নানা মত আছে—(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইনি ধর্মের পুত্র। (২) হরিবংশ অনুসারে ইনি লক্ষ্মীর পুত্র। (৩) অন্য মতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। (৪) ইনি জল হতে উৎপন্ন ব'লে এঁর নাম ইবজা। (৫) ইনি আত্মভূ, সেই জন্য এঁকে অজ বলা হয়। পুরাণের মতে এঁর স্ত্রীর নাম রতি। দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে, মহাদেব গভীর তপস্যায় মগ্ন হন। অপর দিকে হিমালয়-গৃহে সতী পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করবার জন্য কঠোর তপস্যায় রত হন। দেবতাদের অনুরোধে কন্দর্প মহাদেবের মনে কামের ভাব উদ্রেকের জন্য বাণ নিক্ষেপ করে তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। এতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তৃতীয় নেত্রের অগ্নিবর্ষণে কন্দর্পকে ভস্ম করেন। পরে দেবতাদের প্রার্থনায় মহাদেব বর দেন যে, কন্দর্প অশরীরী হয়েও পূর্বের মত মানবদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। মতান্তরে লিখিত আছে, স্বামীবিয়োগের পর স্ত্রী রতি মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, তিনি বর দেন যে, বিষ্ণু কৃষ্ণ-রূপে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর ঔরসে কন্দর্পের পুনর্জন্ম হবে। সে কারণ, কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে ইনি আবার জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রদ্যুম্ন নামে পরিচিত হন। স্বর্গের অপ্সরাদের ইনি অধিপতি। এঁর হাতে পুষ্পের তীরধনু থাকে। মানবের অন্তঃকরণে কামভাবের উদ্রেক করাই কন্দর্পের কাজ। এই জন্য এঁর নাম মনোজ ও ভবজ। মহাদেব এঁকে ভস্ম করাতে এঁর নাম হয় অনঙ্গ। সুন্দর রূপের জন্য ইনি অভিরূপ। ব্রহ্মাকে সন্দীপিত করেছিলেন বলে কন্দর্প। কন্দর্পের অস্ত্র তীরধনুকের নাম কুসুমায়ুধ। পুষ্পশোভিত ধনু বলে এর নাম পুষ্পবাণ বা পুষ্পশর। এঁর পুষ্পরচিত পঞ্চশরের নাম—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। ইনি ত্রিলোকের

মন মন্থন করেন বলে এঁর নাম মন্মথ।

কণ্ব—ইনি একজন প্রাচীন ঋষি। পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র এবং মেধাতিথির পিতা। ইনি কণ্ব গোত্রীয়গণের আদি পুরুষ, শুক্ল যজুর্বেদের স্মৃতিকার এবং শুক্ল যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা প্রণয়ন করেন। মালিনী নদীর তীরে এঁর আশ্রম ছিল। ইনি অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত পরিত্যক্তা কন্যার পালক-পিতা। বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকার বসন বায়ু দ্বারা অপহরণ করলে, তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ফলে, মেনকার একটি কন্যা হয়। সদ্যোজাত কন্যাকে নদীতীরে নিক্ষেপ করে মেনকা ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। জনহীন স্থানে শকুন্তপক্ষী সেই সদ্যোজাত কন্যাকে রক্ষা করতে থাকে। মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে গিয়ে, যেই কন্যাকে দেখে, নিজের কন্যার মত লালন-পালন করতে থাকেন ও জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পাদন করেন। শকুন্তপক্ষী কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিল বলে মুনি এই কন্যার নাম রাখেন শকুন্তলা।

কণ্ডু—মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ইনি কঠোর তপস্যার গুণে মহর্ষি পর্যায়ে উন্নীত হন। কণ্ডু গোমতীর তীরে কঠোর তপস্যায় রত হলে, ইন্দ্র ভীত হয়ে প্রম্লোচা নামে এক সুন্দরী অপ্সরাকে তাঁর তপোভঙ্গ করবার জন্য প্রেরণ করেন। প্রম্লোচার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে কণ্ডু তার সঙ্গে বহুকাল বসবাস করেন। পরে প্রায় শতবর্ষ অতীত হবার পর মুনি একদিন সন্ধ্যা-বন্দনার উদ্যোগ করলে, প্রম্লোচা তাঁকে পরিহাস করে শতবর্ষ পরে সন্ধ্যা-বন্দনার কথা উল্লেখ করেন। তখন তিনি নিজের অধোগতির কথা চিন্তা করে স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় ত্যাগ করে আবার তপস্যায় রত হন। এদিকে প্রম্লোচা সেই গর্ভ বৃক্ষোপরি মোচন করেন। তা হতে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বৃক্ষদের রাজা সোম সেই প্রসূত কন্যা মারিষাকে প্রতিপালন করে প্রচেতা নামে দশ ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ দেন। (বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত)

কন্যাকুব্জ—কুশ নামে এক ধর্মাত্মা রাজার কুশনাভ নামে এক পুত্র ছিল। কুশনাভের স্ত্রী ঘৃতাচীর গর্ভে এক শত কন্যা জন্মগ্রহণ করে। একদিন উদ্যানে এই কন্যাদের নৃত্যগীতকালে বায়ু এঁদের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বলেন যে, তোমরা আমার স্ত্রী হও। কন্যারা অবজ্ঞাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় বায়ু ক্রুদ্ধ হয়ে এঁদের সর্বাঙ্গ ভগ্ন করে দেন এবং তারই ফলে এঁরা কুব্জা হন। কুশনাভ তখন কম্পিল্যা-নগরীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে এই একশত কন্যার বিবাহ দেন। ব্রহ্মদত্ত কন্যাদের পাণিস্পর্শ করতেই তাঁদের কুব্জতা দূর হয়ে তাঁরা পূর্বরূপ

ফিরে পান। এই কন্যাদের স্থাপিত নগরীর নাম কান্যকুব্জ। (রামায়ণ)

কন্দলী--বহ্মার পৌত্রী, ঔর্ব ঋষির জানুস্তবা কন্যা ও দুর্বাসা মুনির স্ত্রী। ব্রহ্মার জানু হতে জন্মগ্রহণ করেন বলে এঁর নাম কন্দলী। ইনি অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ছিলেন। মহর্ষি ঔর্ব দুর্বাসার হাতে এঁকে সম্প্রদান করেন। ইনি দুর্বাসাকে অনুরোধ করেন যে, দুর্বাসা যেন কন্যার শত অপরাধ ক্ষমা করেন। দুর্বাসা শতাধিকবার এঁর দোষ ক্ষমা করে অবশেষে বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে শাপ দিলেন, "ভস্ম হও।" কন্দলী জন্মান্তরে আর কারো স্ত্রী হন নি। তিনি কন্দলী (কলাগাছ) রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

কবন্ধ—এক মহাকায় দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস। সে শ্রী নামক দানবের পুত্র; এবং তার নাম দনু। এই রাক্ষসের বর্ণনায় আছে যে, সে মুণ্ডগ্রীবাহীন কবন্ধ, তার উদরে মুখ এবং তাতে একটিমাত্র জ্বলন্ত চোখ অগ্নিশিখার মত বর্তমান। তার যোজন প্রমাণ দীর্ঘ হস্তের সাহায্যে সে সর্বদা বিবিধ পশুপক্ষী হত্যা করে ভক্ষণ করে এবং রাক্ষসরূপে বনবাসী ঋষিদের ভীতি প্রদর্শন করে। একদিন স্থূলশিরা ঋষির সংগৃহীত ফলমূল অপহরণ করায় উক্ত ঋষির অভিশাপে সে এই কদাকার রূপে পরিণত হয়। এই রাক্ষস নাকি পূর্বে রূপবান ছিল। শাপ মোচনের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে, ঋষি একদিন তাকে বলেন যে, রামচন্দ্র যেদিন তার বাহুচ্ছেদন করে বিজন বনে তাকে দগ্ধ করবেন, সেইদিন সে পূর্বরূপে রূপান্তরিত হবে। সে তখন কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে দীর্ঘায়ু হবার বরলাভে গর্বিত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তার দুই উরু ও মস্তক শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন তার অনুনয়ে, জীবন ধারণের উপায়স্বরূপ ইন্দ্র তার যোজন প্রমাণ দুই বাহু এবং উদরে তীক্ষ্ণ দন্ত ও মুখ স্থাপন করেন এবং বলেন যে, রাম-লক্ষ্মণ তার বাহুচ্ছেদন করলে তবে তার স্বর্গলাভ হবে। সীতার অন্বেষণকালে মতঙ্গাশ্রমের কাছে এক নিবিড় বনের মধ্যে কবন্ধ-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণ আক্রান্ত হলে, তাঁরা খড়্গাঘাতে তার একমাত্র বল দুই বাহু ছেদন করেন। ভূপতিত কবন্ধ তাঁদের পরিচয় পেয়ে তার শরীর অগ্নিতে সংকার করতে অনুরোধ করে। রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক অগ্নি-সংকারের পর কবন্ধ তার পূর্বরূপ ফিরে পায় ও রামলক্ষ্মণকে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পরামর্শ দেয় ও সেইস্থানে যাওয়ার উত্তম পথনির্দেশ দিয়ে হংস-সংযোজিত রথে দিব্যবসনভূষণে শোভিত হয়ে পুণ্যলোকে প্রস্থান করে।

কপালী—ব্রহ্মার সঙ্গে বিবাদ করে

মহাদেব নখাগ্র দিয়ে তাঁর একটি মস্তক ছেদন করেন এবং এই ছিন্নমুণ্ড তাঁর হস্ত-লগ্ন হয়ে থাকে। সেই জন্য তিনি কপালী নামে খ্যাত (বামন-পুরাণ)। (২) ভগবতী সর্বদা ব্রহ্মার কপাল ধারণ করেন বলে, অথবা জগৎপালন করেন বলে কপালী নামে অভিহিতা হন। (দেবীপুরাণ)

কঙ্ক—(১) যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দুর্যোধনের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে সুদীর্ঘ বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে বাধ্য হন। অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব মৎস্যরাজ বিরাটের প্রাসাদে নিজেদের প্রকৃত নাম গোপন করে ছদ্মনামে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। যুধিষ্ঠির নামগ্রহণ করেন কঙ্ক এবং পরিচয় দেন যে তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ও দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ। সর্বস্ব বিনষ্ট হওয়ায় তিনি বিবাট রাজগৃহে আশ্রয়লাভ করেন। মৎস্যরাজের কাছে তিনি এই প্রার্থনা করেন যে, দ্যূতক্রীড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে যেন তাঁর বিবাদ না হয় এবং ক্রীড়ায় পরাজিত ব্যক্তি যেন তার ধনরত্ন আটক রাখতে না পারে। কঙ্ক শব্দের অর্থ ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ; সুতরাং উক্ত নাম গ্রহণে তিনি সত্যকথাই বলেছেন। ভীম বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক, সহদেব তন্ত্রিপাল ও দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম গ্রহণ করে বিরাট রাজগৃহে বসবাস করতে থাকেন। (২) উগ্রসেনের চতুর্থ পুত্র ও কংসের সহোদর। ইনি একজন বিখ্যাত মহারথী ছিলেন। কংস নিহত হোলে এবং জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করলে, ইনি অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন। ইনি দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভায় ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে ও অশ্বমেধে নিমন্ত্রিত হন। (হরিবংশ, মহাভারত)

কমলা—সমুদ্রমন্থনে অপ্সরাদের উদ্ভব হবার পর চতুর্দিক আলোকিত করে বিদ্যুৎমালার মত দেবী কমলা সমুদ্রগর্ভ হতে উত্থিত হন। ইন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে উৎকৃষ্ট আসনে বসান। পৃথিবী তাঁকে অভিষেকোপযোগী সর্বপ্রকার ওষধি দান করেন। অতঃপর ঋষিরা এঁকে অভিষেক করেন এবং দেবী কমলা গন্ধর্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে নিজের অনুরূপ আশ্রয় না পেয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মুকুন্দকেই বরণ করেন। (শ্রীমৎভাগবত)

কল্প—পুরাণ মতে আমাদের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক আহোরাত্র। ৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন ও এই পরিমাণ কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান থাকে এবং রাত্রিতে তা লয় প্রাপ্ত হয়। এই সৃষ্টি ও লয়কে কল্প বলা হয়।

কল্পসূত্র—বেদাঙ্গ গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞ-

কর্ম সামাজিক জীবন বা লোকব্যবহার ক্রমে ক্রমে এমনই জটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে ওঠে যে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থাগুলিকে ব্রহ্মাণাদি গ্রন্থ হতে সংক্ষিপ্ত করে একত্র করবার প্রয়োজন হয় এবং সূত্রাকারে রচিত হয়। এই সংক্ষিপ্তসারকে কল্পসূত্র বলা হয়।

কল্পতরু—কল্পান্তস্থায়ী তরু। সমুদ্রমন্থন হতে উত্থিত এই বৃক্ষ কল্পান্ত হলে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এই জন্য এর নাম কল্পতরু। অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ। কল্পতরুর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করলেই তাতে অভীষ্ট লাভ হয়।

কলা—(১) মহর্ষি মরীচির স্ত্রী। মহর্ষি কর্দমের ঔরসে মনু-কন্যা দেবহুতির গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি মহর্ষি কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (ভাগবত) (২) বিভীষণের কন্যা। (৩) একজন অপ্সরা।

কলাবতি—রাধিকার মাতা। ইনি কান্যকুব্জ দেশের রাজকন্যা। কথিত আছে যে, যজ্ঞকুণ্ড হতে ইনি উৎপন্ন হন। এর সঙ্গে বৃষভানুরাজের বিবাহ হয়। রাধিকা এঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কলি—যুগপ্রবর্তক দেবতা। এঁর নামানুসারে বর্তমান যুগের নাম কলিযুগ। ৪, ৩২,০০০ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবী এই দেবতার অধিকারে থাকবে। এই যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কল্কীরূপে আবির্ভূত হবেন। দ্বাপরের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হতে, অধর্মের সৃষ্টি হয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে ও অধর্মের ঔরসে দম্ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের লোভ নামে এক পুত্র জন্মে। লোভ নিজের ভগিনী নিবৃতিকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের ক্রোধ নামে এক পুত্র ও হিংসা নামে এক কন্যা হয়। ক্রোধ নিজ ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁদের কলি নামে এক পুত্র হয়। ইনি অতি কৃষ্ণবর্ণ তৈলাভিসিক্ত, বিকট-বদন, লোলজিহ্ব, পূতিগন্ধাশবপূর্ণ। কলি নিজের ভগিনী দিরুক্তিকে বিবাহ করে ভয় নামে এক পুত্র এবং মৃত্যু নামে এক কন্যার জন্ম দেন। কলির অত্যাচরে নিষাদরাজ নল রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে স্ত্রী দময়ন্তীসহ অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেন।

কলিযুগ—চারিযুগের শেষ যুগ। কলি এর অধিষ্ঠাতা। ১২০০ দিব্য বৎসর অর্থাৎ ১২০০ × ৩৬০ = ৪, ৩২,০০০ বৎসর এর পরিমাণ। ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই যুগের আরম্ভ হয়েছে। কলিযুগ অধর্মের যুগ। এই যুগে ধর্ম মাত্র একচতুর্থাংশ থাকবে। এই যুগে ত্রিপাদ পাপ ও একপাদ পুণ্য। এই যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কল্কীরূপে জন্মগ্রহণ করে দুষ্কৃতের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। তারপর সত্যযুগের আরম্ভ হবে।

কল্কী—বিষ্ণুর দশ অবতারের শেষ অবতার। বর্তমান কলিযুগের শেষে বিষ্ণু কল্কীরূপে জন্মগ্রহণ করে কলিকে বিনাশ করলে আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। কল্কী আগমন করবেন দুই পক্ষযুক্ত শ্বেত বর্ণের অশ্বে আহোরণ করে এবং জলন্ত ধূমকেতুর মত এক হাতে তলোয়ার আর অন্য হাতে চক্র নিয়ে। তারপর ইনি বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়ে, ম্লেচ্ছ ও বিধর্মীদের অসি হস্তে নির্মূল করবেন এবং অশ্বমেধযজ্ঞ করে দক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করবেন। তখন পৃথিবী ধ্বংস হবে ও ইনি অন্তর্ধান করবেন। পুরাণ মতে ইনি শম্ভলগ্রাম নিবাসী বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতির গর্ভে পুত্ররূপে চৈত্র মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করবেন (কল্কীপুরাণ)

কলিঙ্গ—বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি বলিরাজের স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর অধিকৃত রাজ্য কলিঙ্গ নামে খ্যাত। উড়িষ্যার দক্ষিণ হতে দ্রাবিড়ের উত্তর পর্যন্ত উপকূল ভূভাগ কলিঙ্গ নামে অভিহিত।

কল্মাষপাদ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। সুদাস রাজার পুত্র বলে এঁর অপর নাম সৌদাস। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে এই মৃগয়াসক্ত রাজা একদিন মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বশিষ্ঠ মুনির পুত্র শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও তিনি শক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে বলেন। বশিষ্ঠ-পুত্র রাজাকে পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে বলেন যে, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজাদের সনাতন ধর্ম। এই কথা শুনে রাজা তাঁকে কষাঘাত করেন। তখন শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে নরমাংসভোজী রাক্ষস হবার অভিসম্পাত দেন। রাজা রাক্ষসে পরিণত হয়ে বনে গমন করেন এবং একদিন শক্তিকে দেখা মাত্রই বধ করে ভক্ষণ করেন। পরিশেষে বশিষ্ঠের শত পুত্রের সকলকেই তিনি ভক্ষণ করে ফেলেন। একদিন পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে তাঁকেও আহার করতে গেলে, বশিষ্ঠ কল্মাষপাদের গাত্রে মন্ত্রপূত জলসিঞ্চন করে তাঁকে শাপমুক্ত করেন এবং ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে বলেন এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের অপমান করতেও নিষেধ করেন। কল্মাষপাদ তখন পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য বশিষ্ঠের নিকট এক পুত্র কামনা করেন। অতঃপর রাজা অযোধ্যাপুরিতে ফিরে আসেন। বশিষ্ঠের সঙ্গে সংগমের ফলে রাজমহিষী গর্ভবতী হন। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরেরও যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, তখন মহিষী পাষাণখণ্ড দ্বারা নিজের উদর বিদীর্ণ করে এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রের নাম অশ্মক। বিষ্ণুপুরাণে

এইরূপ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। যথা—রাজা সৌদাস মৃগয়া করতে গিয়ে এক রাক্ষস বধ করেন। উক্ত রাক্ষসের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাক্ষসের ভ্রাতা নিজরূপ পরিবর্তন-পূর্বক রাজা সৌদাসের পাচক হয়। একদিন বশিষ্ঠ রাজার প্রাসাদে অতিথি হলে, পাচকরূপী রাক্ষস মুনিকে নর-মাংস রন্ধন করে আহার করতে দেয়। দিব্যজ্ঞানে তা জ্ঞাত হয়ে, বশিষ্ঠ রাজাকে রাক্ষস হবার অভিসম্পাত প্রদান করেন। বিনাদোষে এইরূপে অভিশপ্ত হওয়ায় রাজাও বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত দেবার জন্য জলগ্রহণ করেন, কিন্তু রাণী দময়ন্তী এসে রাজাকে এই অভিসম্পাত দানে নিষেধ করেন। তখন রাজা মন্ত্রপূত জল নিজের পায়ের উপর নিক্ষেপ করেন। এই জলের স্পর্শে তাঁর পদদ্বয় কল্মষ (মলিন বা কৃষ্ণবর্ণ) হয়ে যায়। সেই থেকে এঁর নাম হয় কল্মাষপাদ। বশিষ্ঠ পরে নিজের ভ্রম উপলব্ধি করে, তাঁর অভিশাপ বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী করেন। রাজা রাক্ষসভাবাপন্ন হয়ে প্রতিদিন বনে মনুষ্য ভক্ষণ ক'রে দিনাতিপাত করতে থাকেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ যখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ভক্ষণ করে ফেলেন। এই কারণে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী রাক্ষসরূপী রাজাকে শাপ দেন যে, যখনই সে স্ত্রীর সঙ্গে রতিকর্মে রত হবে, তখনই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বারো বৎসর পরে বশিষ্ঠের শাপ হতে মুক্ত হয়ে তিনি তার স্ত্রী দময়ন্তীর কাছে ফিরে যান বটে, কিন্তু পূর্ব-অভিশাপ স্মরণ করে স্ত্রীসহবাসে বিরত থাকেন। কিছুকাল পরে বশিষ্ঠ রাজা সৌদাসের অনুমতিক্রমে রাণীর গর্ভসঞ্চার করেন। তিনি সাত বৎসর গর্ভ-ধারণ করে থাকেন। যথাসময়ে সন্তান প্রসব না হওয়ায়, বশিষ্ঠ এক অশ্ম (পাথর) দিয়ে গর্ভে আঘাত করার ফলে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই জন্যই এই পুত্রের নাম হয় অশ্মক।

কশ্যপ—ইনি বিখ্যাত প্রজাপতি ঋষি। দেবদৈত্য প্রভৃতির জনক। শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা মতে ইনি হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হতে জন্মলাভ করেন। লিঙ্গপুরাণ মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র। অন্যান্য পুরাণ অনুসারে ইনি মরীচির তপোবলে সমুৎপন্ন ও ব্রহ্মার মানসপুত্র। শ্রীমদ্ভাগবত মতে এঁর জন্ম মরীচির ঔরসে ও স্ত্রী কলার গর্ভে। ইনি দক্ষ প্রজাপতির তেরোটি কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যারাই সমস্ত লোকের জননী; কারণ এঁরাই এই জগৎ প্রসব করেছিলেন। জগৎপ্রসবিনী এই ত্রয়োদশ কন্যার নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি। এই ত্রয়োদশ

দক্ষকন্যা হতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তেরটি জাতির উদ্ভব হয়। অদিতি হতে দেবগণ, দিতি হতে দৈত্যগণ, দনু হতে দানবগণ, কাষ্ঠা হতে অশ্বাদি পশুগণ, অরিষ্টা হতে গন্ধর্বগণ, সুরসা হতে রাক্ষসকুল, ইলা হতে বৃক্ষ-উদ্ভিদ-সমূহ, মুনি হতে অপরাগণ, ক্রোধবশা হতে পিশাচকুল, তাম্রা হতে পক্ষীসমূহ সুরভি হতে গো-মহিষাদি চতুষ্পদ জন্তু, সরমা হতে শ্বাপদসমূহ এবং তিমি হতে জলজন্তু প্রসব করেন। অবশ্য বিভিন্ন পুরাণে এ বিষয় মতান্তর আছে।

রামায়ণ মতে ইনি ব্রহ্মপুত্র মরীচির তনয়। এর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বামনরূপে এর পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ইনি প্রজাপতি দক্ষের ৮টি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কলকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অলকা। বিবাহের পর কশ্যপ স্ত্রীদের বলেন, এখন তোমরা আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র প্রসব কর। অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা এতে সম্মত হলে এঁরা যথাক্রমে কশ্যপকে কয়টি পুত্র দান করেন—অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার ; ৩৩ টি দেবতা ; দৈত্য সকল ; অশ্বগ্রীব ; নরক ও কালক। যে চারজন স্ত্রী পুত্র প্রসবে সম্মত হোল না, তাঁরা এই সকল প্রাণীর জননী—ক্রোধী, ভাষা, পুতনা, ধৃতরাষ্ট্র সুকী, মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সরভী, সুরসা, কদ্রু, মনুষ্য, পবিত্র ফল সকল।

কংস—ভোজবংশীয় রাজা। ইনি মথুরার রাজা উগ্রসনের ক্ষেত্রজপুত্র ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। হরিবংশে কংসের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে—এক সময়ে উগ্রসেনের ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে দেখে সৌভপতি দ্রুমিল অত্যন্ত কামাতুর হয়ে পড়েন এবং স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে উগ্রসেনের মূর্তি ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করেন। কিন্তু পরে স্ত্রীর সন্দেহ হওয়ায় 'কস্ত ত্বং' বলে এঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রকৃত পরিচয় পেয়ে দ্রুমিলকে তিনি তীব্র তিরস্কার করলে দ্রুমিল উত্তরে বলেন যে অনেক মানব-স্ত্রী ব্যাভিচার করেই দেব সদৃশ পুত্র উৎপাদন করেছেন, অতএব এতে কোন দোষ হতে পারে না। এরপর দ্রুমিল আরও বলেন যে, তুমি আমাকে 'কস্ত ত্বং' বলে প্রশ্ন করেছিলেন, সে কারণ তোমার 'কংস' নামে এক শত্রু-বিজয়ী পুত্র হবে। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করেন। জরাসন্ধের সহায়তায় উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনি নিজে রাজা হন। এই সময় তাঁর ভগিনী দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ হয়। বিবাহে উপস্থিত থাকাকালে তিনি দৈববাণী শুনতে পান

যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে বধ করবে। কংস এই দৈববাণী শুনে বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। কারাগারে এঁদের পর পর যে সাতটি সন্তান হয়, তাদের সকলকেই কংস হত্যা করেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ নামে অষ্টম পুত্রের জন্ম হয়। বংশ লোপের ভীতিতে বসুদেব তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে গোকুলে গোপরাজ নন্দের ঘরে রেখে আসেন। সেই রাত্রেই নন্দের স্ত্রী যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; সেই কন্যাই স্বয়ং যোগমায়া। যোগমায়ার মায়াতে সেই রাত্রে গোকুলের সকলেই অচেতন অবস্থায় ছিল। সেইজন্য সন্তান পরিবর্ত্তনে কোন বাধা বা অসুবিধা ছিল না। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার ঘরে রেখে, তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করেন। কংস তখন প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করে এই কন্যাকে হত্যা করতে আদেশ দেন, কিন্তু এই কন্যা নিক্ষিপ্ত অবস্থা হতে আকাশে উত্থিত হবার সময় ভবিষ্যদ্বাণী করে যান যে, কংসের হত্যাকারী গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর বসুদেব ও দেবকী কারামুক্ত হন। কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করে হত্যা করার জন্য কংস চতুর্দিকে চর পাঠান, কিন্তু সকল চরই কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়। এরপর কংস ধনু-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কৌশলে কৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে কংসের মল্লযোদ্ধারা কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়। এতে কংস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভ্রাতা কৃষ্ণ ও বলরামকে নির্বাসিত করার আদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত নন্দকে বন্দী এবং উগ্রসেন ও বসুদেবকে হত্যা করার আদেশও দেন। এই আদেশ শ্রবণমাত্র কৃষ্ণ কংসকে আক্রমণ করেন এবং সিংহাসন হতে নিক্ষেপ করে নিহত করেন। কংসের আট ভ্রাতা বাধা দিতে এলে বলরাম কর্তৃক নিহত হন। (শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ)

কংসবতি—কংসের ভগিনী ও উগ্রসেনের কন্যা। বসুদেবের কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত এঁর বিবাহ হয়।

কয়াধু—প্রহ্লাদের মাতা, রাজা হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা। অন্য নাম কমলা। এঁর গর্ভে চারিটি পুত্র হয়—হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ সর্বকনিষ্ঠ।

কপিঞ্জল—অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে ও বশিষ্ঠের ঔরসে এঁর জন্ম হয়। ইনি ত্রিমূর্তি ও ইন্দ্রপ্রমতি নামে অভিহিত হন। ইনি পৈলের শিষ্য ও বাস্কলীর সতীর্থ। পৈল ঋক্‌বেদ দুই ভাগে বিভক্ত করে ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলীকে শ্রবণ করান (ভাগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণ)

কপিল—বিখ্যাত ঋষি। ইনি সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা। কর্দম প্রজাপতির

ঔরসে দেবহুতির গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা এবং সাংখ্যদর্শনে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন। এই দর্শনে ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবের কথা স্পষ্ট ভাবে সাংখ্যদর্শনে লেখা আছে। তাঁর মতে জগৎ জড়-প্রকৃতি হতে উদ্ভুত। সাংখ্যমতে প্রকৃতি অনাদি, প্রকৃতির ন্যায় পুরুষও (আত্মা) অনাদি। আত্মা সৃষ্টি করে না, সে দ্রষ্টা মাত্র। মানুষের কর্মফল অনুসারে আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন কর্মক্ষয় হয়, তখন আত্মা আর দেহান্তরে প্রবেশ করে না। এই দর্শনের মতে বস্তু মাত্রই সৎ। সৎ হতেই যে সৎ-এর উৎপত্তি, ইহাই এই দর্শনে প্রতিপন্ন হয়েছে। ইনি মাতাকে সাংখ্যতত্ত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, কলা, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। একাগ্রচিত্তে তপস্যার জন্য কপিল পৃথিবীর নিম্নভাগ পাতালে আশ্রম স্থাপন করেন। একবার সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, ইন্দ্র রাক্ষসের বেশে তথায় আগমনপূর্বক যজ্ঞাশ্ব হরণ করে পাতালে তপোনিমগ্ন কপিলের আশ্রমে রেখে যান। সগরের ষাট হাজার সন্তান যজ্ঞাশ্ব অন্বেষণে পাতালে এসে মুনির নিকট অশ্বকে দেখে; তাঁকেই অশ্ব-অপহরণকারী মনে করে আক্রমণ করে। মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ষাট সহস্র সন্তানকে ভস্ম করেন। অতঃপর সগর রাজার পৌত্র অংশুমান পাতালে গমন করত মুনিকে সন্তুষ্ট করে অশ্ব আনয়ন করেন। সেই সময়ে কপিল অংশুমানকে বলেন যে, জাহ্নবীর জলস্পর্শে সগর-সন্তানেরা উদ্ধার হবে। পরে সগরবংশের ভগীরথ স্বর্গ হতে গঙ্গাকে আনয়ন করে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেন।

কপিলা—দক্ষ প্রজাপতির ষাট জন কন্যার অন্যতমা। মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ইনি তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি কন্যা ও অতিবাহু, হাহা, হুহু, গো ও গন্ধর্ব প্রভৃতি বহুজনের জননী।

কমলযোনি—অতীতকালের শেষে ত্রিজগত তমোময় ও বিরাট সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ে দেবতা, ঋষি, স্থাবর, জঙ্গম, কিছুই ছিল না। একমাত্র নারায়ণ শেষ শয়নে নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ ও সহস্র বাহু ছিল। এই অবস্থায় কিছুকাল অবস্থান করার পর, তাঁর নাভি হতে শত যোজন বিস্তীর্ণ এক পদ্ম উৎপন্ন হয় এবং এই কমল-মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। এজন্য ব্রহ্মার অপর নাম কমলযোনি। (কূর্মপুরাণ)

কঠোপনিষদ—ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক পূর্ণ এই উপনিষদ দুই অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে

নচিকেতা ও তাঁর পিতা বিশ্বজিৎ সংবাদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যম ও নচিকেতা সংবাদ।

এই উপনিষদে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য নচিকেতার যমালয়ে গমন, যমের নিকট আত্মজ্ঞান শ্রবণ প্রার্থনা, যমের আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা, যোগবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

ককুৎস্থ—সূর্যবংশীয় পুরঞ্জয় নামক রাজা। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর পুত্র শশাদ এবং শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়। এই পুরঞ্জয় ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, ত্রেতাযুগে যখন দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন দেবতারা অসুরদের হস্তে পরাজিত হয়ে বিষ্ণুর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন। বিষ্ণু দেবতাদের পুরঞ্জয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে বলায়, দেবতারা উক্ত রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কথা ব্যক্ত করেন। পুরঞ্জয় বলেন যে, যদি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বাহন হন, তবেই তিনি দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হবেন। প্রথমে ইন্দ্র লজ্জায় এ প্রস্তাবে অসম্মত হন, কিন্তু পরে বিষ্ণুর অনুরোধে সম্মত হন। রাজা তখন মহাবৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে (ষাঁড়ের ঝুঁটিতে) আরোহণ করে যুদ্ধে গমন করেন, এবং অসুরদের বিনাশ করে দেবতাদের রক্ষা করেন। সেই থেকে পুরঞ্জয় রাজার নাম হয় ককুৎস্থ, আর দৈত্যপুরী জয় করেছিলেন ব'লে নাম হয় পুরঞ্জয়। (শ্রীমদ্ভাগবত)

কহোড়—একজন মুনি। ইনি উদ্দালক ঋষির শিষ্য ও অষ্টাবক্র ঋষির পিতা। উদ্দালক নিজ কন্যা সুজাতার সঙ্গে কহোড়ের বিবাহ দেন। সুজাতা গর্ভবতী হলে, গর্ভস্থ বালক গর্ভে থেকেই সমূহ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। গর্ভবাসকালেই পুত্র একদিন পিতা কহোড়ের বেদপাঠে ত্রুটি দেখিয়ে দেন। সেইজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কহোড় নিজ পুত্রের দেহ আট জায়গায় বক্র হবে বলে অভিসম্পাত দেন। তার ফলে অষ্টাবক্র মুনির জন্ম হয়। গর্ভের দশম মাসে সুজাতা তাঁর স্বামীকে বলেন যে, তাঁরা নিঃস্ব, সন্তানপালন করবার উপযুক্ত অর্থ তাঁদের নেই। সেজন্য কহোড় জনক রাজার কাছে ধনপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হন। সেখানে জনক রাজার সভাপণ্ডিত বন্দী তর্কে কহোড়কে পরাস্ত করে জলে নিমজ্জিত করে রাখেন। জন্মের পর অষ্টাবক্র পিতার বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকেন। বার বৎসর পরে কোন এক ঘটনায় অষ্টাবক্র পিতার পূর্ব-বিবরণ তার কাছে জ্ঞাত হন। তখন তিনি আবার এক সভায় বন্দীকে তর্কে পরাস্ত করে পূর্বের সমস্ত পরাজিতদের সমভিব্যাহারে

পিতাকেও মুক্ত করে আনেন।

কাত্যায়ন—একজন মুনি। মহর্ষি কাত্যের পুত্র। মহিষাসুর এঁর শিষ্য। রৌদ্রাশ্বের তপোভঙ্গ করায় মহর্ষি শাপ দেন যে, সে নারী-হস্তে নিহত হবে। এর ফলে, ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রত্যেকের দেহে হতে পৃথক পৃথক তেজ-বহির্গত হয়ে যে দেবী সৃষ্ট হন, তাঁরই নাম হয় কত্যায়নী, কারণ মুনি কাত্যায়ন কর্তৃক ইনি পূজিতা হন। (কালিকা ও বামণপুরাণ)

কাত্যায়নী—ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। মহর্ষি কাত্যায়ন এই দেবীর প্রথম অর্চনা করেন বলে এঁর নাম কাত্যায়নী। দেবতারা নিজ নিজ দেহের তেজ দ্বারা এই দেবীকে সৃষ্টি করেন। মহিষাসুর নিজের সৈন্য ও সেনাপতিসহ এই দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে সদলবলে নিহত হন। দশভুজা সিংহ-বাহিনী দেবী আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সৃষ্ট হন ও শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়নের পূজা নিয়ে দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন। বাংলায় ও বাংলার বাহিরে যে দুর্গাপূজা হয়, তা এই দেবীরই পূজা।

কার্তিকেয়—মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। দেবতাদের সহিত যুদ্ধে দানবরা সর্বদা জয়ী হয় দেখে, ইন্দ্র একজন উপযুক্ত সেনাপতির অনুসন্ধান করতে থাকেন। একদিন মানস পর্বতে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে ইন্দ্র দেখেন যে, কেশী দানব প্রজাপতির কন্যা দেবসেনাকে হরণ করতে চেষ্টা করছে। ইন্দ্র উক্ত দানবের হাত হতে তাঁকে রক্ষা করে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা তাঁকে দেখে বলেন যে, এক মহা-বিক্রমশালী পুরুষ এই কন্যার পতি হবেন, আর তিনিই হবেন দেবসনাপতি। দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। একদিন অগ্নি সপ্তর্ষিদের পত্নীগণকে দেখে কামাতুর হয়ে পড়েন। স্বাহা মহর্ষি অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণপূর্বক অগ্নির কাছে এসে সহবাস করেন এবং অগ্নির শুক্র নিয়ে গরুড়পক্ষিণী হয়ে এক কাঞ্চন কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। এতেও তৃপ্ত না হয়ে তিনি সপ্তর্ষিদের প্রত্যেকের স্ত্রীর রূপ ধারণ করে পূর্বের মত অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। কেবলমাত্র বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে স্বাহা তাঁর রূপ ধারণ করতে অক্ষম হন। এইভাবে স্বাহা ষষ্ঠবার কাঞ্চন কুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করেন। সেই সম্মিলিত শুক্র থেকে স্কন্দ, অর্থাৎ কার্তিকেয়র জন্ম হয়। তাঁর ছয়টি মস্তক, একটি গ্রীবা এবং একটি উদর হয়। কার্তিকেয়র জন্মের পর সপ্তর্ষিরা তাঁদের স্ত্রীদের ত্যাগ করেন। তাঁরা ভাবলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরাই স্কন্দের জননী; কিন্তু স্বাহা বারংবার বললেন যে, স্কন্দই তাঁর পুত্র। মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রকৃতি ঘটনা জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু

সপ্তর্ষিরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। স্কন্দের বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে দেবতারা এঁকে বধ করবার জন্য ইন্দ্রকে বললেন, কারণ, এঁর অমিত বল তাঁদের অসহ্য। কিন্তু ইন্দ্র এই কার্যে সাহসী হলেন না। তখন দেবতারা এঁকে মারবার জন্য লোক-মাতাদের (শিবের অনুচরী—মাতৃকা) প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা গিয়ে বালককে নিজেদের পুত্রজ্ঞান করে তাঁদের স্তন্যপান করালেন। পরে স্কন্দকে পরাজিত করবার জন্য ইন্দ্র সদলবলে অগ্রসর হলেন, কিন্তু অগ্নিপুত্র স্কন্দ মুখ-নির্গত অগ্নিশিখায় দেবসৈন্যদের দগ্ধ করে ফেললেন। তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলে, কার্তিকেয়র দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হয়ে বিশাখ নামে (কার্তিকেয়র অপর নাম) এক কাঞ্চনবর্ণ যুবার আবির্ভাব হ'ল। তখন দেবরাজ ভীত হয়ে কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে বরণ করলেন। রুদ্রকে অগ্নি বলা হয়, সেজন্য কর্তিকেয় মহাদেবের পুত্র। মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হবার পর ইন্দ্র এঁর হাতে সকল দেবসেনাকে সমর্পণ করেন। তারপর দেবাসুরের যুদ্ধে কাতিক সেনাপতি রূপে যুদ্ধে অগ্রসর হন। প্রায় সমস্ত দানবই তাঁর শরাঘাতে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধশেষে সমস্ত দানবকে নিহত করে তিনি দেবতাদের রক্ষা করেন। (মহাভারত)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কর্তিকেয়র জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কার্তিকেয় মহাদেবের তেজে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বতীর সহিত বিহারকালে মহাদেবের তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী এই তেজ ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভয়ে এই তেজ শরবনে ত্যাগ করেন। শরবনে পতিত এই বীর্য একটি সুন্দর বালকের সৃষ্টি করে। কৃত্তিকারা এই বালককে দেখে স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করেন। পার্বতী দেবতাদের কাছ থেকে এই বিষয় জ্ঞাত হয়ে কার্তিকেয়কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

কাক্ষীবতী—রাজর্ষি কাক্ষীবানের কন্যা। পুরুবংশীয় রাজা ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী। এঁর অন্য নাম ভদ্রা। দৈবক্রমে এঁর স্বামী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তখন পতিপরায়ণা স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করে বিলাপ করতে থাকেন। উক্ত সময় আকাশবাণী হয় যে, তুমি গৃহে ফিরে যাও, তোমাকে বর প্রদান করছি; আমি তোমাতে সন্তান উৎপাদন করব। তুমি ঋতু-স্নাতা হয়ে নিজের শয্যায় শয়ন করবে। যথাকালে শবের ঔরসে কাক্ষীবতীর গর্ভে সাত সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। (মহাভারত)

কার্তবীর্য—কৃতবীর্যরাজের পুত্র। ইনি

নর্মদা-তীরবর্তী হৈহয়রাজ্যের রাজা। এঁর আর একটি নাম অর্জুন। মাহিষ্মতী নগরী হৈহয়রাজ্যের রাজধানী ছিল। পিতা কৃতবীর্যের নামানুসারে এঁর নাম হয় কার্তবীর্য এবং কার্তবীর্যার্জুন নামেই ইনি সমধিক পরিচিত। দত্তাত্রেয় মুনির বরে কার্তবীর্য সহস্র বাহু লাভ করেন। একবার দিগ্বিজয় কালে রাবণ হৈহয় রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে নর্মদাতীরে শিবপূজায় রত হন। অদূরে জলক্রীড়ারত কার্তবীর্যার্জুন সহস্র বাহু দিয়ে নর্মদার জল রুদ্ধ করায় রাবণের পূজার ব্যাঘাত হয়। তখন ক্রুদ্ধ রাবণ কার্তবীর্যকে আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু তাঁর হস্তে রাবণ পরাজিত ও বন্দী হন। রাবণের পিতামহ স্বর্গস্থ পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্তবীর্য রাবণকে মুক্তি প্রদানপূর্বক তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন।

একবার মৃগয়াকালে ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত কার্তবীর্য জমদগ্নি ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। জমদগ্নি তাঁর দৈবশক্তিসম্পন্না কপিলা নামে কামধেনুর প্রভাবে কার্তবীর্যের সমস্ত সৈন্যদের প্রচুর আহার্য বস্তু দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন। কার্তবীর্য জমদগ্নির কাছে এই কামধেনু প্রর্থনা করলে, ঋষি এই গাভী দান করতে অসম্মত হন। তখন রাজা বলপূর্বক সেই কামধেনু হরণ করতে গেলে কপিলা দৈবশক্তিপ্রভাবে প্রভূত সৈন্য ও অস্ত্র সৃষ্টি করে সসৈন্য কার্তবীর্যকে পরাস্ত করে। পরাজিত কার্তবীর্য রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে আবার কার্তবীর্যের আক্রমণে জমদগ্নি নিহত হন। কপিলাও যুদ্ধক্ষেত্র হতে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করে। উক্ত সময় জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন। পরশুরাম গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতার মৃত্যুর কারণ শুনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, কার্তবীর্যকে তিনি নিহত করবেন। দত্তাত্রেয়র বরে সহস্র বাহুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরশুরামের কুঠারে নিহত হন ও তাঁর সহস্র বাহু কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়। এর পর পরশুরাম একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।

কাক্ষীবান—বলিরাজার স্ত্রী সুদেষ্ণা হতে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে এবং সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কাক্ষীবান নামে এক পুত্র হয়। বলিরাজা সন্তান উৎপাদনের জন্য মহিষী সুদেষ্ণাকে মহর্ষি দীর্ঘতমার সমীপস্থ হতে বলেন। সুদেষ্ণা অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে নিজে না গিয়ে, তাঁর ধাত্রীকন্যাকে পাঠিয়ে দেন। এই শূদ্রকন্যার গর্ভে কাক্ষীবান প্রভৃতি এগার জন ঋষি উৎপন্ন হন। তারপর রাজার নির্বন্ধে সুদেষ্ণা স্বয়ং যান। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণার অঙ্গ স্পর্শ করলে অঙ্গ, বঙ্গ,

কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মের জন্ম হয় এবং তাদের এই নামেই পঞ্চ দেশ স্থাপিত হয়। কাক্ষীবান দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। কাক্ষীবানের অনেক পুত্র হয়। তারা কৌষ্মাণ্ড ও গৌতম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কাণ্ডর্ষি—বেদভাগ বিশেষের মীমাংসক ঋষি। যেমন, কর্মকাণ্ডের মীমাংসক জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ডের মীমাংসক বেদব্যাস, তেমনি ভক্তিকাণ্ডের মীমাংসক শাণ্ডিল্য।

কামদেব—প্রেমের দেবতা। কামের জন্ম সম্বন্ধে অথর্ববেদে দেখা যায় যে, সেখানে কাম অর্থে যৌনাকাঙ্ক্ষা নহে—সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। কাম সেখানে শ্রেষ্ঠ দেবতা বা স্রষ্টা বলে পূজিত হয়েছেন। বিভিন্ন পুরাণে কাম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে আছে, ব্রহ্মার হৃদয় হতে কামদেবের জন্ম। ব্রহ্মা নিজে তাঁর শরে জর্জরিত হয়ে নিজ কন্যা শতরূপাকে গ্রহণ করেন; এই জন্য ব্রহ্মা কামদেবের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে, তিনি মহাদেব কর্তৃক ভস্মীভূত হবেন। পরে কামদেবের কাতর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা বলেন যে, কাম প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও পরে ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করবেন। তারপরে বিদ্যাধরদের পিতা হবেন ও সর্বশেষে দেবত্বলাভ করবেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কাম ধর্ম ও শ্রদ্ধার পুত্র এবং হরিবংশে লক্ষ্মীর পুত্র মায়ী বলে উল্লিখিত (মায়া সুত শ্রীনন্দন)। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন। এই সময় মহাদেব হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। পার্বতী সে কথা জ্ঞাত হয়ে প্রতিদিন তাঁর পূজা করতে থাকেন। ইন্দ্র তা অবগত হয়ে কামদেবকে সেখানে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে বলেন। বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট মহাদেবের উপর পুষ্পশর নিক্ষেপ করতেই ক্রুদ্ধ মহাদেবের ললাটস্থ তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হন। পরে মহাদেব অনুতপ্ত হয়ে কামদেবকে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ ও কন্যা তৃষ্ণা। রতি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার দেবী কামদেবের স্ত্রী। কামদেবের নাসিকা সুচারু; উরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত; কেশ নীল ও কুঞ্চিত; বক্ষ সুবিশাল, এবং চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখ আরক্তবর্ণ; গাত্রে বকুলের সৌরভ। মকর এঁর বাহন, ইনি পুষ্পময় পঞ্চশর ও কুসুম-কর্মুকে শোভিত। কামদেবের নামের বিবরণ এইরূপ—ব্রহ্মা ও অন্যান্য মুনিদের চিত্ত মথিত করিতে ছিলেন বলে এঁর নাম 'মন্মথ'।

জগতের সমস্ত লোককে মত্ত করতেন বলে ইনি 'মদন' নামে অভিহিত। মহাদেবের দর্প চূর্ণ করেছিলেন বলে এঁর অপর নাম 'কন্দর্প'। মহাদেব কর্তৃক ভস্মে পরিণত হওয়ায় এঁর নাম 'অনঙ্গ'। ইনি 'অভিরূপ' অর্থাৎ সুন্দর। অন্য নাম 'কলকেলী', কারণ তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক, শৃঙ্গারযোনি। কামদেবের তীর ও ধনুকের নাম 'কুসুমায়ুধ, ও 'পুষ্পশর'। পতাকা হতে এঁর নাম হয়েছে 'মকরকেতু'। হস্তে পুষ্প আছে বলে এঁর নাম 'পুষ্পকেতন'। এতদ্‌ব্যতীত এঁর আরো নাম আছে, যথা—আজ, অনন্যজ, ইষ্ম, কঞ্জন, কিঙ্কিন, মদ, রম, রমণ, স্মর, মনোজ, দর্পক, দীপক, মার, মধুদীপ।

কামধেনু—যে গাভী ইচ্ছা পূরণ করে। এই গাভীর কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা সুরভির গর্ভে রোহিণীর জন্ম হয়। শূরসেন হতে রোহিণীর ক্ষেত্রে কামধেনুর উৎপত্তি। বশিষ্ঠের 'সবলা' কামধেনু ছিল। রাজা বিশ্বামিত্র একে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে অবশেষে পরাজিত হন।

কামাক্ষ্যা—কালিকাদেবীর অন্য নাম। ইনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে, বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা তাঁর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করেন। সতীর যোনীমণ্ডল কামাক্ষ্যায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐস্থান একটি মহাতীর্থস্থানে পরিণত হয়। কামাক্ষ্যা একান্ন পীঠের অন্যতম।

কালকা—কশ্যপের স্ত্রী। রামায়ণ ও মহাভারত মতে ইনি দক্ষের কন্যা, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি ওঁর ভগিনী এবং পুলোমা দানব বৈশ্বানরের কন্যা। কশ্যপের সঙ্গে এঁদের দুইজনেরই বিবাহ হয় এবং ফলে এঁদের ৬০,০০০ দানবপুত্র জন্মগ্রহণ করে, এই পুত্রদের বলা হোত পৌলম এবং কালঞ্জয়। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্দান্ত ছিল। মহাভারত মতে কঠিন তপস্যা ও পূজার জন্য কালকা দেবতার এই বরলাভ করেন যে, কোন প্রকার গর্ভযন্ত্রণা না পেয়েই এর সন্তান প্রসব হবে। তাঁর এই সন্তানদের বলা হত কালকেয়।

কালকেতু—জনৈক ব্যাধপুত্র। ইনি ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর নামেও পরিচিত। মহাদেবের শাপে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কালকেয়—কালকেয় নামক দানবগণ। এরা বৃত্রাসুরের অনুচর। কশ্যপ ও কালকার সন্তান। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করবার পর, তার অনুচর কালকেয়রা প্রাণভয়ে সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে উত্থিত হয়ে আশ্রমে এসে আশ্রমবাসীদের বিনাশ করত। তখন

দেবতারা এই উৎপীডনের প্রতিকারকল্পে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের শরণাপন্ন হন। নারায়ণের পরামর্শে দেবতারা মহর্ষি অগস্ত্যের কাছে এসে তাঁকে সমুদ্র পান কবতে অনুরোধ করেন। অগস্ত্য সমুদ্র পান করার পর দেবতারা অনায়াসে কালকেয়দের বিনাশ করতে সমর্থ হন।

মহাভারতে উল্লিখিত আছে, কালকা নামে এক মহাসুরী বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করবার পর ব্রহ্মার কাছে বর লাভ কবে যে তার কালকেয় নামক পুত্রগণ দেব-রাক্ষস-নাগদের অবধ্য হবে এবং ব্রহ্মা-নির্মিত হিরণ্যপুর নামে দিব্যনগবে বাস করবে। দেবলোকে অস্ত্রশিক্ষার পর ইন্দ্রের অনুরোধে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ অর্জুন রৌদ্র নামে খ্যাত পাশুপত অস্ত্রের প্রয়োগে এই অসুরদের বিনাশ করেন। (মহাভারত-বনপর্ব)

কালনেমি—(১) রাবণের মাতুল। শক্তিশেলে হতচেতন লক্ষ্মণকে পুনর্জীবন দান করার জন্য হনুমান গন্ধমাদনপর্বত হতে ওষধি আনতে গেলে, বাবণ মাতুল কালনেমিকে পথিমধ্যে হনুমানকে নিহত করার জন্য পাঠান এবং তার পুরস্কারস্বরূপ মাতুলকে অর্ধেক লঙ্কারাজ্য দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। হনুমানকে নিহত করার পূর্বেই কালনেমি লঙ্কার কোন্ অর্ধাংশ গ্রহণ করবেন, তা মনে মনে স্থির করেন। ওষধির জন্য হনুমান গন্ধমাদনপর্বতে গেলে, কালনেমিও রাক্ষসের বেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজেব আশ্রমে হনুমানকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু হনুমান তাঁর আতিথ্য গ্রহণ না করে নিকটবর্তী জলাশয়ে স্নান করতে যান। জলে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই এক নক্র (কুম্ভীর) হনুমানের পা আক্রমণ করে। তারপর হনুমান উক্ত নক্রকে হত্যা করেন। এই কুম্ভীর দক্ষ কর্তৃক অভিশপ্ত এক অপ্সরা। হনুমানের হাতে নিহত হয়ে সে মুক্তিলাভ করে এবং নিজের স্বরূপ ফিরে পেয়ে হনুমানকে কালনেমি সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়। হনুমান কালনেমির প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত হয়ে কালনেমিকে ধরে সজোরে শূন্যে নিক্ষেপ করেন। নিক্ষিপ্ত কালনেমির দেহ তীরবেগে ঘুরতে ঘুরতে রাবণের সিংহাসনের উপর এসে পতিত হয়।

(২) একজন দানব—পুরাকালে কালনেমি দেবাসুরের যুদ্ধে বিজয়ী হয়। শেষে বিষ্ণু চক্র দ্বারা এর মস্তক ছেদন করেন।

(৩) এক রাক্ষস, বিষ্ণু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে রাবণের মাতামহ সুমালীর সহিত পাতালে গিয়ে বসবাস করে।

কালপুরুষ—ইনি ব্রহ্মার পৌত্র ও সূর্যের পুত্র।. যমের অন্য নাম। একদিন

ইনি তাপস বেশে রামের নিকট উপস্থিত হন এবং নিভৃতস্থানে নিজ-মূর্তি ধারণ করে রামকে বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমনের জন্য ব্রহ্মার অনুরোধ জানান। নিভৃতে কথা বলার সময় তিনি রামকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, তাঁদের আলাপের সময় সম্মুখে যে উপস্থিত হবে, তাকেই রাম বর্জন করবেন। উক্ত সময় লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন; এমন সময় দুর্বাসা রামের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন। দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণ রামকে দুর্বাসার আগমন সংবাদ দেন। কালপুরুষের সঙ্গে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করতে বাধ্য হন। লক্ষ্মণ সরযূ নদীর তীরে যোগাবলম্বনপূর্বক দীর্ঘদিন স্থির হয়ে থাকেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সাধনায় মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়ে, লক্ষ্মণকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যান।

কালভৈরব—শিবের একজন অনুচর। মহাদেব আপনার অংশ হতে কালভৈরবকে সৃষ্টি করে কাশীধাম রক্ষার ভার এর উপর ন্যস্ত করেন। দুষ্টমতি লোকেদের শাস্তি দেওয়াই এর একমাত্র কাজ ছিল। ব্রহ্মা নিজ কন্যাভিগমন পাপ করার জন্য কাশীতে শিবতত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আসেন। মহাদেবের আদেশে কালভৈরব ব্রহ্মার এক মুখ ছেদন করেন। সেই হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। কাশীর যে স্থানে এই মুণ্ড পতিত হয়েছিল, সেই স্থানের নাম কপালমোচন।

কালযবন—যবনরাজ। ইনি মহর্ষি গার্গ্যের ঔরসে ও গোপালী নাম্নী শাপ-ভ্রষ্টা এক অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র কামনায় গার্গ্য বারো বৎসর যাবৎ কেবলমাত্র লৌহচূর্ণ আহার করে এবং কঠোর তপস্যায় নিরত থেকে মহাদেবের আরাধনা করেন। এই আরাধনার ফলে যাদবদের প্রবল শত্রু কালযবনের জন্ম হয়। জন্মের পর এক অপুত্রক যবন-রাজ এঁকে পালন করেন এবং উক্ত যবনরাজের মৃত্যুর পর কালযবন রাজা হন; মগধরাজ জরাসন্ধ পরাক্রান্ত রাজা কালযবনকে যাদবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করেন। যাদবরা জরাসন্ধ ও কালযবনের ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় গমন করে। কৃষ্ণ জানতেন যে, যাদবরা কালযবনকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সমর্থ হবে না। তাই কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য কৃষ্ণ নিজেই মথুরায় উপস্থিত হন। কালযবন কৃষ্ণের সম্মুখীন হলে, কৃষ্ণ পলায়নের ছল করে হিমালয়ের গুহায় নিদ্রিত রাজা মুচুকুন্দের কাছে উপস্থিত হন। কালযবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে সেই গুহায় উপস্থিত হয়ে ভুলক্রমে নিদ্রিত মুচুকুন্দকেই কৃষ্ণ মনে করে পদাঘাত করেন। পদাঘাতে নিদ্রাভঙ্গ

হওয়া মাত্র মুচুকুন্দ কালযবনের দিকে দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভস্ম হয়ে যায়। (হরিবংশ)

কালিকাপুরাণ—আঠারো খানি উপপুরাণের মধ্যে অন্যতম। দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ; যথা—গিরিজা, দেবী, ভদ্রকালী, কালী, মহামায়া প্রভৃতির পূজা এই পুরাণে লিখিত আছে। আদ্যাশক্তির পূজা এই পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কালীয়—বিষধর সর্পরাজ। গরুড়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ও গরুড়ের ভয়ে সমুদ্র ত্যাগ করে কালীয় হ্রদে আশ্রয় নেয়। গরুড় কালীয়র প্রতীক্ষায় তীরে অপেক্ষারত থাকত ও ক্ষুধার্ত হলে মৎস্য শিকার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তীরস্থ সৌভরি ঋষির শাপে ঐ জল বিষাক্ত হয়ে ওঠে ও গরুড়ের অপেয় হয়। অন্যদিকে এই কালীয়র ভয়ে কেহ এই হ্রদে স্নান করতে সক্ষম হ'ত না। তার মুখ থেকে ক্রমাগত অগ্নি ও ধূম নির্গত হ'ত। তীরবর্তী সমূহ দেশ তার ভয়ে জনশূন্য হয়ে যায়। একদিন তৃষ্ণার্ত রাখালরা ও তাদের গাভীগুলি এই হ্রদের জলপান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ এই কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দেন। সহস্র ফণায় কালীয় তাঁকে বেষ্টন করলে শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে তার ফণার উপর উঠে দাঁড়ান এবং সে তখন রক্ত বমন করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রাণভিক্ষা করতে থাকে। কৃষ্ণ কালীয়কে হ্রদ ত্যাগ করে সমুদ্রে যেতে আদেশ দেন এবং বলেন যে, তোমার মাথার উপর আমার পদচিহ্ন দেখলে গরুড় আর তোমাকে আক্রমণ করবে না।

কালী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা। শক্তি-উপাসকরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন। এঁর চারিটি হাত আছে। দুই দক্ষিণ হস্তে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস, আর দুই বাম হস্তে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, দেহ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। দীঘ্রদন্তী, রক্তচক্ষু, বিস্তৃত মুখ ও স্থূল কর্ণ। এঁর বাহন কবন্ধ (মস্তক বিহীন শব)।

দেবাসুরের যুদ্ধে, বিশেষতঃ শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে, দেবতারা পরাজিত হয়ে স্বর্গ হতে বিতাড়িত হন ও দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করতে থাকেন। তখন দেবীর শরীর-কোষ হতে অপর এক দেবী আবির্ভূতা হন। সেই দেবী কৌষিকী নামে খ্যাত। দেবী কৌষিকী শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হলে, ভগবতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন এবং সেই থেকে ইনি কালিকা বা কালী নামে পরিচিতা। এরপরে দেবী পুনরায় মনোহর রূপ ধারণ করেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের দুই সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড এই সুন্দর মূর্তির বিষয় শুম্ভাসুরকে জানান। তখন শুম্ভাসুর দেবীকে তার নিজের সম্মুখে

আনয়নের জন্য সুগ্রীব নামে এক দূতকে প্রেরণ করেন। দূত দেবীর সম্মুখে এসে শুম্ভ বা নিশুম্ভের স্ত্রী হবার জন্য তাঁকে আহ্বান করেন। দূতের উত্তরে দেবী বলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করবে, তিনি তাঁকে পতিত্বে বরণ করবেন। দূতমুখে এই গর্বিত-বাক্য শ্রবণ করে শুম্ভ প্রথমে ধূম্রলোচন নামে এক সেনাপতিকে পাঠালেন দেবীকে কেশাকর্ষণ করে তাঁর সম্মুখে আনতে। তাঁর সম্মুখে এলে দেবী সানুচর ধূম্রলোচনকে ভস্মীভূত করে ফেলেন। শুম্ভ এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্ড ও মুণ্ডকে দেবীর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। হিমালয়ের শিখরে সিংহবাহিনী দেবীকে আক্রমণ করলে, তাঁর ললাট থেকে নরমুণ্ডমাল্যভূষিতা, করালবদনা, কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী বেরিয়ে আসেন। তাঁর জিহ্বা লেলিহান, মাংস শুষ্ক, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ। এই মহাভয়ঙ্করী দেবীমূর্তিকে চণ্ড ও মুণ্ড চেলা-চামুণ্ডাসহ আক্রমণ করে। দেবী অসি ও খড়্গাঘাতে তাদের নিহত করেন। চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত করেছিলেন বলে এই দেবীর নাম হয় চামুণ্ডা। অতঃপর দেবী চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন মস্তক কৌষিকী দেবীকে উপহার দিয়ে, তাঁকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ বরতে বলেন। দেবী কালী (পার্বতী) ও চণ্ডিকা (কৌষিকী) শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই ভীষণ দেবাসুরের যুদ্ধে দেবীদ্বয়কে সাহায্য করবার জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর, কার্তিকেয় ও বিষ্ণুর শরীর হতে পৃথক্ পৃথক্ শক্তিগণ আবির্ভূত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে দেবীরা সমস্ত অসুরকে নিধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কাশ্যপ—(১) মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। (২) জনৈক মুনি; এঁর পুত্র বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। (৩) কশ্যপের পুত্র মহর্ষি কাশ্যপ একজন যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। (৪) বিষবিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ চিকিৎসক। অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে একটি মৃগকে বানবিদ্ধ করে তার অনুসরণ করেন এবং গভীর বনের ভিতর মৌনব্রতধারী শমীক নামে এক মুনিকে দেখতে পান। এই মৃগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় পরীক্ষিৎ মুনির কাছ থেকে কোন উত্তর পান না। ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা মুনির গলায় এক মৃত সর্প স্থাপন করে নিজ প্রাসাদে, ফিরে আসেন। তপোরত মুনির পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিতের হস্তে পিতার এই অপমানের কথা শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে, এই পাপী রাজা মৃগয়ার দিন হতে সাত রাত্রির মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক নাগ কর্তৃক দংশিত হয়ে মারা যাবে। শমীক এই কথা শ্রবণান্তে পুত্রকে

ভৎর্সনা করে বলেন যে, পরীক্ষিৎকে শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই, কারণ পরীক্ষিৎ মুনির মৌনব্রতের কথা অবগত ছিলেন না। পুত্র তাঁর শাপ প্রত্যাহার করলেন না বটে, কিন্তু পরীক্ষিৎকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা ব্যাক্ত ক'রে আত্মরক্ষা করতে বললেন। সপ্তম দিবসে কাশ্যপ নামে এক ব্রহ্মণ পরীক্ষিতের বিষ-চিকিৎসার জন্য রাজার নিকট গমনকালে পথে ব্রাহ্মণ বেশধারী তক্ষকের সঙ্গে কাশ্যপের সাক্ষাৎ হয়। কাশ্যপের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে, তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য তক্ষক এক বটবৃক্ষ দংশন ক'রে কাশ্যপকে সেই বৃক্ষ রক্ষা করতে বলেন। তক্ষক-দংশনে সঙ্গে সঙ্গে বটবৃক্ষ দগ্ধ হলেও, কাশ্যপের মন্ত্রবলে সে আবার সজীবত্ব লাভ করে। ব্রাহ্মণের এই অসাধারণ শক্তি দর্শনে তক্ষক তাঁকে বললেন ঃ রাজার নিকট হতে যে ঐশ্বর্য তিনি আশা করেন, তাহা অপেক্ষা অধিক ধনৈশ্বর্য আমি দান করব, আপনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। কাশ্যপ ধ্যানযোগে জ্ঞাত হন যে পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। তাই তক্ষকের কাছ থেকে অভীষ্ট ধন গ্রহণ করে তিনি অগত্যা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

কাশীরাজ—চন্দ্রবংশীয় রাজা কাশের অন্যতম পুত্র কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়। দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরী। কাশিরাজের কন্যা গান্ধিনীকে যদু বংশের রাজা শ্বফল্ক বিবাহ করেন। গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুরের জন্ম। কাশিরাজ তাঁর বন্ধু পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে সাহায্য করতে গিয়ে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। (বিষ্ণুপুরাণ)

কাশ্যা—কাশীরাজের কন্যা কাশ্যা কুরুবংশের রাজা জনমেজয়ের স্ত্রী ছিলেন। এঁর আর একটি নাম বসুষ্টমা। কাশ্যা হতে চন্দ্রাপীড় ও সূর্যাপীড় নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে স্ত্রীকে সংযতা হয়ে থাকতে বলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইন্দ্র গোপনে বসুষ্টমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেন। এতে যজ্ঞে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জনমেজয় স্ত্রীকে ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হলে বিশ্বাবসুর পরামর্শে স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। (হরিবংশ)

কিন্নর—(১) কুৎসিত নর। কিন্নর দুই প্রকারের ঃ এক প্রকারের শরীর মানুষের মত এবং মুখ অশ্বের তুল্য আর এক প্রকারের শরীর অশ্বের ন্যায় আর মুখ মানুষের তুল্য। এদের অন্য নাম কিংপুরুষ। দেবযোনি বিশেষ। এদের রাজা কুবের। এরা স্বর্গের গায়ক। ব্রহ্মার ছায়া হতে এরা উৎপন্ন হয়েছে। কৈলাসে এরা বিচরণ করে। (শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ)

(২) কশ্যপ ও অরিষ্ট হতে এদের জন্ম। চিত্ররথ এদের শাসনকর্তা।

হিমালয়ে এদের বাসস্থান ছিল। (মৎস্যপুরাণ)

(৩) এরা অশ্বমুখের সন্তান এবং অনেক 'গণে' বিভক্ত। এদের অবয়ব অর্ধ-মনুষ্যাকৃতি এবং অর্ধ-অশ্বাকৃতি। সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য এরা প্রসিদ্ধ। (বায়ুপুরাণ)

কিম্পুরুষ—(১) কুৎসিত পুরুষ—দেবযোনি বিশেষ। এক শ্রেণীর স্বর্গের অধিবাসী। কিন্নরদের মত ব্রহ্মার ছায়া হতে এদের জন্ম। কৈলাস পর্বতে এরা বিচরণ করত। কুবের এদের অধিপতি। (শ্রীমদ্ভাগবত)

(২) জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত হেমকূট পর্বত দ্বারা বেষ্টিত একটি দেশ।

কিমিন্দম—মহর্ষি কিমিন্দম মৃগরূপ ধারণ করে নিজের স্ত্রীর সহিত বিহার করছিলেন, এমন সময় রাজা পাণ্ডু মৃগভ্রমে তাঁকে নিহত করেন। এই অপরাধে মুনির শাপে রাজা পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে বিহার কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (মহাভারত)

কিরীটী—(১) অর্জুনের অন্য নাম। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র অর্জুনকে সূর্যপ্রভ এক কিরীট (মুকুট) দিয়েছিলেন।

(২) দেবাসুরের যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দকে সাহায্য করবার জন্য যক্ষগণ যে সব অনুচর প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে জনৈক অনুচরের নাম কিরীটী।

কির্মীর—বকরাক্ষসের ভ্রাতা এবং হিড়ম্বের বন্ধু। এই রাক্ষস কাম্যক বনে বসবাস করত। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবরা এই বনে বাস করবার জন্য প্রবেশ করলে, কির্মীর মায়া বিস্তার করে এঁদের পথ রোধ করে, কিন্তু ভীম ভীষণ যুদ্ধ করে এই রাক্ষসকে নিহত করেন। (মহাভারত-বন)

কিরাত—(১) ভারতের পূর্বদিকস্থ পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসী অনার্য জাতি। রামায়ণে বর্ণিত আছে, এরা দ্বীপবাসী, অদগ্ধ মাংস ভক্ষণ করে। পর্বতগুহাভ্যন্তরে ও পর্বতগাত্রে এদের বাসস্থান ছিল।

(২) শিবের রূপান্তর। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে পরীক্ষা করবার জন্য কিরাত মূর্তি ধারণ করে শিব অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। (মহাভারত; লিঙ্গপুরাণ)

কিষ্কিন্ধ্যা—মহীশূরের উত্তরে পম্পার নিকট বানররাজ বালীর রাজ্য। রাজধানীর নামও কিষ্কিন্ধ্যা।

কীচক—মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও প্রধান সেনাপতি। বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণা কীচকের ভগিনী। অজ্ঞাতবাসকালে ছদ্মবেশী পাণ্ডবরা দ্রৌপদীসহ বিরাট ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিতা হন। ইনি পরিচারিকার কর্ম এবং ভীম বল্লভ নামে পাচকের কর্ম গ্রহণ করেন। সৈরিন্ধ্রীর রূপে মুগ্ধ, কামাবিষ্ট কীচক তাঁর পাণিগ্রহণে প্রলুব্ধ হলে, তিনি

ষ্ণার সঙ্গে কীচককে প্রত্যাখ্যান করেন। কীচকের অনুনয়ে সুদেষ্ণা একদিন মদ্য আনয়নের অছিলায় দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ করেন। তখন কীচক দ্রৌপদীর উপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলে, তিনি কীচককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন ও দ্রুতবেগে বিরাট-রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীচক এসে সর্বসমক্ষে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ-পূর্বক তাঁকে পদাঘাত করেন। সভাস্থ ছদ্মবেশী পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশের ভয়ে কীচককে কিছু বলেন না। রাত্রে দ্রৌপদী গোপনে ভীমের নিকট গিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁকে উত্তেজিত করেন। ভীমের পরামর্শমত দ্রৌপদী কীচককে সন্ধ্যাকালে নৃত্যশালায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করেন। রাত্রে কীচক নৃত্যশালায় উপস্থিত হলে, দ্রৌপদীর প্রতীক্ষারত থাকাকালীন ভীমের হস্তে নিহত হন। কীচককে হত্যা করে ভীম তাঁর হাত, পা, মাথা সমস্ত দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে তাঁকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। (মহাভারত)

কুঞ্জর—(১) বানর রাজ। ইনি কেশরী বানরের স্ত্রী অঞ্জনার পিতা ও মহাবীর হনুমানের মাতামহ। (রামায়ণ)

(২) কশ্যপ-স্ত্রী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ (মহাভারত)

কুৎস—একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। ইনি অনেক ঋক্ মন্ত্রের রচয়িতা। ইনি ইন্দ্র কর্তৃক নানা প্রকারে নির্যাতিত হয়েছিলেন, কিন্তু একবার কুৎস তাঁর শত্রু শুষ্ণ কর্তৃক কূপে নিপাতিত হয়েছিলেন। এই সময় কুৎসের স্তবে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে শুষ্ণকে বিনাশ করে এঁকে উদ্ধার করেন। ইন্দ্র এঁকে একবার তাঁর প্রাসাদে নিয়ে যান এবং এঁদের দুই জনের মধ্যে চেহারার এমন সাদৃশ্য ছিল যে, ইন্দ্রের স্ত্রী শচী তাঁর স্বামীকে চিনতে পারেন্ নি।

কুন্তী—পাণ্ডবদের জননী। যদুবংশীয় রাজা শূরের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগ্নী। এঁর প্রকৃত নাম পৃথা। রাজা শূর তাঁর পিতৃষ্বসার পুত্র নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই কন্যা দান করেন। পালক-পিতার নামানুসারে এঁর অপর নাম হয় কুন্তী। এক সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা অতিথিরূপে গৃহে এলে কুন্তী তাঁকে পরিচর্যায় সন্তুষ্ট করেন। তখন দুর্বাসা তাঁকে একটি অমোঘ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলেন যে, এই মন্ত্রের প্রভাবে কুন্তী যে দেবতাকে স্মরণ করবেন, সেই দেবতাই তাঁর সমীপস্থ হবেন এবং তাঁর প্রসাদে কুন্তীর পুত্রলাভ হবে। কৌতূহলবশে কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিলনের ফলে দেব-

কুমারের ন্যায় তিনি এক পুত্রলাভ করেন, এবং সূর্যের বরে কুমারীই থেকে যান। এই পুত্রই সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণ। কিন্তু কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী তাঁর এই পুত্রকে একটি পাত্রে স্থাপন করে জলে ভাসিয়ে দেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা এই সন্তান 'বসুষেণ' নাম দিয়ে পুত্রবৎ লালনপালন করেন।

রাজা কুন্তিভোজ তাঁর পালিতা-কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবরঅভা আহ্বান করলে, কুন্তী পাণ্ডুরাজের গলে মাল্যদান করেন। মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রীকেও পাণ্ডু বিবাহ করেন। অতপর পাণ্ডু দুই স্ত্রীর সহিত বনে গমন করত মৃগয়ায় রত হন। পাণ্ডু বনে বিচরণকালে মৈথুন-রত এক মৃগদম্পতিকে শরবিদ্ধ করেন। আহত মৃগ ভূপতিত হয়ে বলে যে, সে কিমিন্দম মুনি, পুত্র কামনায় মৃগরূপ ধারণ করে স্ত্রীর সহিত সংগম-রত ছিল। তিনি পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, তিনি যে ব্রাহ্মণ, পাণ্ডু তা অজ্ঞাত ছিলেন, সে কারণ ব্রহ্মহত্যার পাপ হতে তিনি পরিত্রাণ পাবেন, কিন্তু স্ত্রী-সংগমকালেই তাঁর মৃত্যু হবে।

পাণ্ডু এই অভিশাপের ফলে পুত্র উৎপাদন অসম্ভব মনে করে দুই স্ত্রীকে নিয়ে ইন্দ্রিয়দমন ক'রে সস্ত্রীক তপস্যা-রত হন। কিন্তু যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা দেব, ঋষি ও মনুষ্য-ঋণ থেকে মুক্ত হলেও পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃ-ঋণ থেকে পাণ্ডু মুক্ত হতে সক্ষম হন না। তিনি ঋষিদের নিকট পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হবার উপায় জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা তাঁকে বলেন যে, পাণ্ডুর দেবতুল্য পুত্র হবে। তখন পাণ্ডু নির্জনে কুন্তীকে সন্তানলাভের জন্য চেষ্টিত হতে বলেন। কারণ, আপৎকালে স্ত্রীলোক উত্তম বর্ণের পুরুষ বা দেবতা হতে পুত্রলাভ করতে পারে। কুন্তী উপমা প্রদর্শন-পূর্বক বলেন যে, রাজা ব্যুষিতাশ্ব যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর মহিষী ভদ্রা মৃত পতি-সংগমে পুত্রবতী হয়েছিলেন। পাণ্ডুও তপঃপ্রভাবে কুন্তীর গর্ভে মানসপুত্র উৎপাদন করতে পারেন। পাণ্ডু তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করতে অনুনয় করেন। কুন্তী তখন দুর্বাসার বরের বৃত্তান্ত জানিয়ে পুনর্বার বলেন যে, পাণ্ডুর অনুমতি পেলে তিনি মন্ত্রবলে যে কোন দেবতা বা ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে পুত্রলাভ করতে পারতেন। অবশ্য দেবতার কাছে সদ্য পুত্রলাভ হবে এবং ব্রাহ্মণের কাছে বিলম্ব হবে। পাণ্ডু তখন ধর্মকে আহ্বান করবার জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করেন।

পাণ্ডুর অনুমতি লাভ করে কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করেন এবং শতশৃঙ্গ পর্বতে ধর্মের সহিত কুন্তীর সংগমের

ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। পরে পাণ্ডুর ইচ্ছানুক্রমে কুন্তী, বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে ভীম ও অর্জুনকে লাভ করেন। মাদ্রী স্বয়ং কুন্তীকে কিছু বলতে সাহস করতেন না। তিনি পাণ্ডুকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে কুন্তীর কাছ থেকে পুত্রলাভের মন্ত্রলাভ করেন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্রের জননী হন। কুন্তী মাদ্রীকে কোন এক দেবতাকে স্মরণ করতে বলেন, কিন্তু মাদ্রী যুগল দেবতা আহ্বান করায় কুন্তী নিজেকে প্রতারিত মনে করেন এবং পাণ্ডুর অনুরোধেও মাদ্রীকে পুনর্বার মন্ত্র দিতে অস্বীকৃত হন।

একদা বসন্তকালে পাণ্ডু মাদ্রীকে দেখে সংযম হারিয়ে, তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁকে সবলে গ্রহণ করেন এবং সংগমকালে পূর্ববর্তী শাপের ফলে পাণ্ডুর প্রাণবিয়োগ ঘটে। স্বামী-বিয়োগ ব্যথায় কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই সহমৃতা হতে চান; কিন্তু মাদ্রী শেষ পর্যন্ত আপন পুত্রের ভার কুন্তীর হাতে অর্পণ করে পতির সহগমন কামনায় প্রাণত্যাগ করেন। কুন্তী পুত্রগণসহ হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে পর, সকলে যখন রাজসভায় অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনরত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ কর্ণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন কর্ণকে দেখে কুন্তী মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

পাণ্ডবদের শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন তাঁদের বিনাশ কামনায় যখন বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করে তাঁদের দগ্ধ করে বিনাশ করতে চান, তখন পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কুন্তীও ছিলেন। তাঁরা সকলেই সুড়ঙ্গ-পথে জতুগৃহ থেকে পলায়ন করে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে কুন্তীর ইচ্ছায় ভীম বকরাক্ষসের হাত হতে নগরবাসীদের উদ্ধার করেন। কুন্তীর পরামর্শে পাণ্ডবরা পাঞ্চাল দেশে গমন করেন এবং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভার্গব নামে এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নেন। সেখানে স্বয়ংবরসভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করার পর কুম্ভকারগৃহে এসে যখন কুন্তীকে জানান যে, তিনি ভিক্ষা করে এনেছেন তখন কুটীরের মধ্য থেকে কুন্তী দ্রৌপদীকে দর্শন না করেই বলেন যে,—'তোমারা সকলে মিলে একে ভোগ কর'। পরে নিজের ভুল জ্ঞাত হয়ে কুন্তী অপ্রতিভ হন; কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। অতঃপর এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে কুন্তীসহ পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। দ্যূতক্রীড়ায়

পরাজিত পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞানুসারে বনবাসে গেলে, কুন্তী বিদুরের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগকালে সন্ধির জন্য কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এসে কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুন্তী কৃষ্ণকে পুত্রদের নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বিক্রমার্জিত রাজ্যভোগ এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজ্যোদ্ধারের উপায় অবলম্বন করতে বলেন। তাঁদের জননী হয়ে কুন্তী পরদত্ত অন্নে জীবনধারণ করতে চান না।

যুদ্ধের প্রাক্কালে কুন্তী কর্ণের পাণ্ডববিদ্বেষে সন্ত্রস্ত হয়ে, পুত্রদের প্রতি স্নেহবশে গঙ্গাতীরে জপনিরত কর্ণকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে, তাঁকে পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করতে অনুরোধ ও প্ররোচিত করেন। কর্ণ সর্ববৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে নিজের যশ ও কীর্তি বিনষ্ট হবার ভয়ে কুন্তীকে তিরস্কার করে তাঁর অন্যায় ও অসংগত অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। কুন্তী কর্ণের হিতচিন্তা না করে, কেবলমাত্র নিজের ও পাণ্ডবদের মঙ্গলের জন্যই যে ঈদৃশ অনুরোধ করছেন তা বলেন। কর্ণ দুর্যোধনের নিকট অঙ্গীকারচ্যুত হতে অস্বীকৃত হন। তবে যুদ্ধে অর্জুন ভিন্ন অন্য চার ভ্রাতাকে তিনি মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কুন্তী কর্ণকে আশীর্বাদ ক'রে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রস্থান করেন।

যুদ্ধান্তে পাণ্ডবগণ যখন নিহত আত্মীয়দের সংকার করেন, তখন কুন্তী পুত্রদের কাছে কর্ণের জন্মরহস্য প্রকাশ করে তাঁর উদ্দেশে তর্পন করতে অনুরোধ করেন। যুধিষ্ঠির তখন অভিশাপ দেন যে, স্ত্রীজাতি কোন বিষয়কেই গোপন করে রাখতে সক্ষম হবে না। কুন্তী তখন কর্ণের সহিত পাণ্ডবদের মিলন ঘটাতে অক্ষম হয়েছিলেন বলে বিলাপ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ ও অশ্বমেধযজ্ঞের পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তীও রাজর্ষি শতযুপের আশ্রমে গমন করেন। পুত্রদের অনুরোধ উপেক্ষা করে কুন্তী বলেন যে, পুত্রদের কষ্ট দেখেই তিনি তাঁদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন। স্বামীর রাজত্বে তিনি প্রভূত সুখভোগ করেছেন, অতএব এক্ষণে পুত্রদের বিজিত রাজ্যভোগ করার স্পৃহা তাঁর নাই। পাণ্ডবগণ শতযুপের আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীকে দেখতে আসেন। তারপরে কুন্তী মাসান্তর আহার গ্রহণ করে কঠোর তপস্যায় রত হন। এই সময় বনমধ্যে দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তীরও দেহত্যাগ ঘটে।

কুন্তী মহাভারতের একজন মনস্বিনী নারী। তিনি দৃঢ়চরিত্রা, তেজস্বিনী ও আদর্শ জননী। ধার্তরাষ্ট্রদের হিংসা-দ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি কোনরূপ প্রতিবাদ না করে পুত্রদের সতর্ক ও

অহিংস হতে পরামর্শ দিতেন এবং পুত্রদের নিরুৎসাহ হতে দেখলে যথোচিত বাক্যে তাঁদের উৎসাহিত করতেন। লোকাপবাদ ভয়ে কর্ণকে ত্যাগ করলেও, তিনি কর্ণের প্রতি স্নেহশীলা ছিলেন। কর্ণার্জুনের দ্বন্দ্বে তিনি স্নেহ ও স্বার্থের দোলায় বহু মনোকষ্ট পেয়েছেন।

কুন্তিভোজ—একজন রাজা। যদুশ্রেষ্ঠ শূরষেনের পিতৃস্বসার পুত্র। শূরষেন তাঁর কন্যা পৃথাকে নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে দান করেন। তাই পৃথার নাম কুন্তী হয়। ইনি স্বয়ংবরসভা আহ্বান করে পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুন্তিভোজ পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করে যুদ্ধে নিহত হন (মহাভারত-আদি)।

কুবলাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র। বৃহদশ্ব বনগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁকে নিরত করে বলেন যে, তাঁর আশ্রমের কাছে মরুপ্রদেশে উজ্জালক নামে এক বালু-সামুদ্রের মধ্যে মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধু বাস করে। বালুমধ্যে নিদ্রিত দানব বৎসরান্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে সপ্তাহকাল ভূমিকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্যন্ত ধূলি ওড়ে, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হয়। এই দানবকে হত্যা করলে রাজার অক্ষয়কীর্তি লাভ হবে। বৃহদশ্ব তাঁর পুত্রকে এই কার্যের জন্য নির্দেশ দিয়ে বনগমন করেন। ধুন্ধু তপস্যার ফলে ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, যম, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়। সে বালুকার মধ্যে লুকিয়ে থেকে আশ্রমে এসে উপদ্রব করত। উতঙ্কের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পূর্বে বিষ্ণু তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর যোগবল অবলম্বনপূর্বক কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বধ করবেন। পরে ধুন্ধুর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে, উতঙ্কের অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ করেন এবং কুবলাশ্ব একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুন্ধু-বধে যাত্রা করেন। সপ্তাহকাল বালুকা-সমুদ্রের চতুর্দিক খনন করবার পর নিদ্রিত দানবকে দেখা যায়। সে উঠে মুখনিস্থত অগ্নিতে কুবলাশ্বের পুত্রদের দগ্ধ করে। কুবলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে ধুন্ধুর মুখাগ্নি নির্বাপিত করে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে তাকে বধ করে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। (মহাভারত—বনপর্ব)

(২) শত্রুজিৎ রাজার পুত্র; প্রকৃত নাম ঋতধ্বজ। কুবলয় নামে অশ্বে আরোহণ করে ভ্রমণ করতেন বলে এঁর এই নাম হয়। ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে পাতাল হতে এনে বিবাহ করেন এবং দানব পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য তপস্বীবেশে রাজধানীর নিকট এসে বাস করতে থাকে। একদিন সে চাতুরী করে প্রাসাদে রটনা করে যে, কুবলাশ্ব

শিকার করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। এই সংবাদ শ্রবণান্তে মদালসা শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কুবলাশ্ব কিছুদিন পরে ফিরে এসে মদালসার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এদিকে মদালসা পাতালে এক নাগ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে কুবলাশ্ব পাতালে উপস্থিত হয়ে বিরহিণী মদালসার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

কুবের—ধনাধিপতি যক্ষরাজ। ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের পৌত্র এবং পৌলস্ত্য বা বিশ্রবার ও ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র। বিশ্রবার পুত্র বলেএঁর আরএক নাম বৈশ্রবণ। কুবের মহাবনে গিয়ে দ্বিসহস্র বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মাব নিকট বরলাভ করেন যে, তিনি অমর ও উত্তর দিগন্তের দিকপাল এবং ধনাধিপতি হবেন। দেবতাদের সমান মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা এঁকে একটি পুষ্পক রথ দান করেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর আবাসস্থান নির্দেশ না করায়, নিজ পিতাকে তিনি বাসস্থান নির্দেশ করতে বলেন। বিশ্রবা বিশ্বকর্মা নির্মিত ত্রিকূটশিখরস্থ লঙ্কাপুরীতে কুবেরের বাসস্থান স্থির করে দেন। কুবেরের বৈমাত্রের ভ্রাতা রাবণ লঙ্কাপুরী অধিকার করতে চাইলে কুবের পিতৃ-উপদেশে লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক কৈলাসে প্রস্থান করেন। সেইখানেই তাঁর বাসস্থান স্থির হয়। কুবের একদা হিমালয়ে তপস্যাকালে দৈবাৎ দেবী রুদ্রাণীকে দর্শন করেন, ফলে তাঁর দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ ও বাম চক্ষু ধূলিকলুষিত ও পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে। তারপর বহুবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় মহেশ্বর প্রীত হয়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যস্থাপন করেন ও এক চক্ষু নষ্ট ও অপর চক্ষু পিঙ্গল বলে তাঁর নামকরণ করেন একপিঙ্গল। রাবণ শক্তিশালী হয়ে সকলের উপর অত্যাচার করতে সুরু করায়, কুবের দূতমুখে রাবণকে দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধর্মাচরণ করতে নির্দেশ দেন। রাবণ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে জয়চিহ্নস্বরূপ তাঁর পুষ্পক রথ হরণ করেন।

কুবের সমস্ত ধনের প্রদাতা ও অধ্যক্ষ। তিনি যক্ষ ও কিন্নরগণের অধিপতি ও দশ দিকপালের অন্যতম। এঁর দেহের গঠন অতি কুৎসিত ছিল বলে নাম হয় কুবের। এঁর তিনটি পা ও আটটি দাঁত ছিল। কুবেরের স্ত্রীর নাম আহুতি। এঁর দুই পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব এবং এক কন্যা মীনাক্ষী। ইনি বিভিন্ন নামে পরিচিত—ধনপতি, যক্ষরাজ, বৈশ্রবণ, রাক্ষসেন্দ্র, রত্নগর্ভ, কিন্নরেশ, পৌলস্ত্য, দিকপাল। কুবেরের উদ্যান চৈত্ররথ; বাসস্থান কৈলাস; পুরী অলকা; রথ পুষ্পক।

কুব্জা—মথুরা রাজবংশের পরিচারিকা

(অনুলেপন-বাহিকা)। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন অক্রূরের সহিত কংশের ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে মথুরায় গমন করেন, তখন পথিমধ্যে কুব্জার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তখন কৃষ্ণ অনুলেপন চাইলে কুব্জা কৃষ্ণকে অনুলেপন দেন। কুব্জার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কুরূপা কুব্জার বক্র পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপনপূর্বক তাঁকে অচিরাৎ স্বাভাবিক ঋজু ও সুরূপা করে দেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

কুমার—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র অন্য নাম। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দেবতাদের স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা তখন ব্রহ্মার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা বলেন যে, মহাদেবের ঔরসে কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করলে তিনি তারকাসুরকে বধ করতে সমর্থ হবেন। অতএব যাতে মহাদেবের সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি হয়, সেজন্য ব্রহ্মা দেবতাদের সচেষ্ট হতে বলেন। তখন দেবতারা কৌশলে হরগৌরীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই মিলনকার্যের সংঘটনে মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে মদন ভস্ম হন। এই বিবাহের ফলেই কার্তিকেয়র জন্ম হয়। অতঃপর কার্তিক দেবসেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে নিহত করেন। ফলে, দেবতারা স্বর্গরাজ্যের পুনরধিকার লাভ করেন। (কার্তিকেয় দেখ)।

কুম্ভী বা কুম্ভযোনী—কুম্ভ মহর্ষি অগস্ত্যের অন্য নাম। অপ্সরা উর্বশীকে দর্শনপূর্বক বরুণ কুম্ভ-মধ্যে রেতঃপাত করেন। পরে সেই কুম্ভে মিত্রও রেতঃপাত করেন। এই রেতঃ হতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অগস্ত্য কুম্ভযোনী নামে অভিহিত হন।

কুম্ভকর্ণ—দুর্দান্ত রাক্ষস। রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। বিশ্রবা মুনির ঔরসে সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর (নিকষা) গর্ভে এঁর জন্ম হয়। জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই সে ক্ষুধার্ত হয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সহস্র প্রজা ভক্ষণ করে ফেলায়, ইন্দ্র এঁকে বজ্রাঘাত করেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে কুম্ভকর্ণও গোকর্ণ আশ্রমে উগ্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অমরত্ব বর যাচ্ঞা করেন। ব্রহ্মা এই বর প্রদানে অসম্মত হন এবং বর না দিয়েই অদৃশ্য হন। দেবতারাও ব্রহ্মাকে বলেন যে, কুম্ভকর্ণ সাতটি অপ্সরা, ইন্দ্রের দশটি অনুচর এবং বহু ঋষি ও মনুষ্য ভক্ষণ করেছে। বরপ্রাপ্তির ফলে সে ত্রিভুবন গ্রাস করবে। অপরদিকে আবার কুম্ভকর্ণের কঠোর তপস্যায় পৃথিবী এমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, মনে হয় সমস্ত পৃথিবী যেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত হবে। তখন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর স্ত্রী সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে স্থান গ্রহণ করতে বললেন এবং একথাও বললেন যে, আবার যখন সে

বর প্রার্থনা করবে, তখন সরস্বতীই যেন তাঁর হয়ে উত্তর দেন। ব্রহ্মা তারপর আবার কুম্ভকর্ণের প্রার্থনা জানতে চাইলে, কুম্ভকর্ণের সরস্বতী-চালিত কণ্ঠ হতে উত্তর আসে—অনন্ত জীবনের পরিবর্তে অনন্ত নিদ্রা। 'তথাস্তু' বলে ব্রহ্মা অদৃশ্য হবার পর, চৈতন্যলাভ করে কুম্ভকর্ণ প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাত হয় এবং বহু অনুনয়-বিনয়পূর্বক পুনরায় ব্রহ্মার নিকট হতে ছয় মাসান্তে একদিন নিদ্রাভঙ্গের বর পান কিন্তু অকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে মৃত্যু হবার ভয় থেকে যায়। রাবণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রার জন্য দুই যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত এক বিচিত্র ভবন প্রস্তুত করে দেন। সেখানে ছয় মাসান্তে নিদ্রাভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণ প্রচুর পান ও ভোজন করতেন।

রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হয়ে পড়লে, রাবণ বহু অনুচর পাঠিয়ে ও সহস্র হস্তীদ্বারা ধর্ষণ করে অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করান। কুম্ভকর্ণ রাবণের এই কুকর্মের জন্য তাঁকে তিরস্কার করলেও, সসৈন্যে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বহু বানরকে নিধন করে, গিরিশৃঙ্গের আঘাতে সুগ্রীবকে সংজ্ঞাহীন করে, তিনি তাকে লঙ্কায় ধরে নিয়ে যান। রাজপথের শীতল বায়ুস্পর্শে চৈতন্যলাভ করে সুগ্রীব সহসা নখ-দন্তের সাহায্যে কুম্ভকর্ণের নাসা-কর্ণ ছেদন ও পদাঘাতে পার্শ্বদ্বয় বিদীর্ণ করে, রামের কাছে প্রত্যাবর্তন করে। তখন কুম্ভকর্ণ এক মুদ্গর নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং লক্ষ্মণের বাধা অতিক্রম করে রামের সমীপস্থ হন। রামের বাণে তাঁর গদা হস্তচ্যুত হয় এবং শরাঘাতে সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ফলে, ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ কুম্ভকর্ণ নির্বিচারে বনস্থলীর বহু বানর ও ভল্লুক ভক্ষণ করতে থাকেন। রাম পরে বায়ব্যাস্ত্রে গদাসহ কুম্ভকর্ণের বাহু বিচ্ছিন্ন করেন। কুম্ভকর্ণ তখন অপর হস্তে উৎপাটিত তালবৃক্ষ নিয়ে অগ্রসর হলে, রাম ঐন্দ্রাস্ত্রে সেই হস্ত ও অর্ধচন্দ্র বাণে তার পদদ্বয় ছেদন করেন এবং অবশেষে ঐন্দ্রশরে কুম্ভকর্ণের মস্তক ছেদনপূর্বক তাকে বধ করেন।

কুম্ভকর্ণ দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রমালাকে বিবাহ করেন। বজ্রমালার গর্ভে কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে এঁর দুই পুত্র হয়।

কুম্ভীনসী—(১) রাক্ষস বিশেষ। রাক্ষস সুমালী ও গন্ধর্বী কেতুমতীর কন্যা ও রাবণ-মাতা কৈকসীর ভগিনী।

(২) রাক্ষস মাল্যবানের কন্যা অনলা এবং বিশ্বাবসুর কন্যা কুম্ভীনসী সম্পর্কে রাবণের ভগিনী। রাবণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলে, নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ ও তপস্যারত বিভীষণের অনুপস্থিতির সুযোগে মধু দৈত্য এঁকে হরণ করে নিয়ে যায়। রাবণ মধু দৈত্যকে শাস্তি,

দিতে গেলে, কুম্ভীনসী তাঁর চরণে পতিত হয়ে আপন স্বামীকে হত্যা করতে নিরস্ত করেন ও তাঁর মধ্যস্থতায় রাবণ ও মধু দৈত্যের মধ্যে সম্ভাব স্থাপিত হয়। কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণাসুরের জন্ম হয়। শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণাসুর নিহত হয়।

(৩) গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী। অঙ্গারপর্ণ চিত্ররথ নামে বিখ্যাত। একচক্রা নগরী থেকে পাঞ্চাল যাত্রার পথে গঙ্গাস্নানরত অঙ্গারপর্ণের সহিত অর্জুনের কলহ ও যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী গন্ধর্বরাজের মুক্তির জন্য কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরকে অনুনয় করে স্বামীকে উদ্ধার করেন। চিত্ররথ সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে মায়াযুদ্ধ শিক্ষা দেন। অর্জুনের নিকট পরাজিত হলে চিত্ররথ তাঁর বিচিত্র রথখানি দগ্ধ করে নিজের নাম পরিবর্তন করে দগ্ধরথ রাখেন। (মহাভারত-বনপর্ব)।

কুম্ভাণ্ড—একজন অসুর। দৈত্যরাজ বাণাসুরের মন্ত্রী। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণকন্যা উষার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়ে বাণপুর বা শোণিতপুরে উপস্থিত হলে, রাজা বাণ তাঁকে হত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু কুম্ভাণ্ড এঁকে নিবৃত্ত করেন। পরে বাণ কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হলে কুম্ভাণ্ডই এই রাজ্যের অধিপতি হন।

কূর্ম—ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। দেব ও অসুররা অমৃতলাভের আশায় মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করেন, কিন্তু ঐ পর্বত নিরাধার হওয়ায় জলমগ্ন হয়। তখন বিষ্ণু কূর্মরূপে মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন।

কুরু—চন্দ্রবংশীয় রাজা। ইনি মহারাজ সংবরণ ও সূর্যকন্যা তপতীর পুত্র। কুরু অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন এবং বহু বৎসর কুরুজাঙ্গল নামক স্থানে কঠোর তপস্যা করেন। এইজন্য উক্ত স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। কুরুর নামানুসারেই এই বংশের নাম হয় কৌরব বংশ। কুরুর পাঁচ পুত্র। যথাক্রমে পুত্রগণের নাম—অবিক্ষিত, অবিষ্যৎ, চৈত্ররথ, মুনি ও জন্মেজয়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুইজনই এঁরা কুরুবংশজাত এবং কৌরব হিসাবে খ্যাত। সাধারণতঃ, দুর্যোধনাদিকে কৌরব ও তাদের পক্ষকে কুরুপক্ষ বলা হয়।

কুরুক্ষেত্র—কুরুপাণ্ডবের রণভূমি। এই স্থান থানেশ্বরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র চিরকালই 'ধর্মক্ষেত্র' হিসাবে খ্যাত। 'জাবাল উপনিষদ' ও 'শতপথ ব্রাহ্মণে' ইহা দেবতাদের যজ্ঞস্থান বলে উল্লিখিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে এই স্থানে পিতৃ-তর্পণ করেছিলেন। দুর্যোধনাদির পূর্বপুরুষ বিখ্যাত কুরুরাজ এই স্থানে হল চালন করে এই বরলাভ করেন যে, যে ব্যক্তি এইস্থলে তপস্যা করবে অথবা

যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে, সে স্বর্গে গমন করবে। তদবধি এই স্থানের নাম হয় কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পুরাকালে রাজর্ষি কুরু এই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র একদিন এর কারণ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে কুরু বলেন, এই ক্ষেত্রে যে মারা যাবে সে পাপবিমুক্ত হয়ে পুণ্যলোকে গমন করবে। তখন একদিন দেবতারা ইন্দ্রকে বলেন যে, তিনি রাজর্ষি কুরুকে বর দিয়ে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করুন। কারণ, মানুষ যদি কুরুক্ষেত্রে মারা গেলেই স্বর্গে যেতে পারে, তবে দেবতারা আর যজ্ঞভাগ পাবেন না। ইন্দ্র তখন কুরুর কাছে গিয়ে তাঁকে আর পরিশ্রম করতে নিষেধ করে এই কথাই বলেন যে, যে লোক এখানে উপবাস করে প্রাণত্যাগ করবে বা যুদ্ধে নিহত হবে, সেই লোকই স্বর্গগমন করবে। কুরু তখন তাতেই সম্মত হন। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র নামে বিখ্যাত; কারণ এ স্থলে কুরু সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেন।

কুশ—কুশ ও লব রামচন্দ্রের যমজপুত্র। লোকাপবাদভয়ে রাম বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে গর্ভাবস্থায় নিবাসিতা করলে, এই দুই যমজপুত্র তপোবনে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বাল্মীকি কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ ও অধোভাগ দ্বারা রচিত রক্ষা-বন্ধনে সদ্যোজাত দুই শিশুকে শিশুঘাতক পূতনাদির হস্ত হতে রক্ষা করেছিলেন বলে জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব। বাল্মীকি এই দুই ভ্রাতাকে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন ও এঁদের সুর-তান-লয় সহযোগে রামায়ণ গানে সুশিক্ষিত করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় বাল্মীকি এই দুই ভ্রাতার সহিত উপস্থিত হন। রাম নিজের পুত্রদের চিনতে পেরে সীতাকে সেখানে আনয়ন করেন। যজ্ঞসভায় সীতা অন্তর্হিতা হলে রাম কুশকে কুশাবতী নগরী ও লবকে শ্রাবস্তী নগরীর রাজা করেন। অবশেষে রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কুশ অযোধ্যার সিংহাসন অধিরোহণ করেন।

কুশনাভ—মহারাজা কুশের পুত্র এবং বিশ্বামিত্রের পিতামহ। প্রাচীনকালে প্রজাপতি ব্রহ্মার কুশ নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুশের ঔরসে রাণী বৈদর্ভীর গর্ভজাত চার পুত্রের মধ্য কুশনাভ অন্যতম। কুশনাভ মহোদয় নামে এক নগর পতিষ্ঠা করেন। রাজা কুশনাভের ঘৃতাচী নামে এক অপ্সরার গর্ভে একশত পরম লাবণ্যবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে একদিন পবন-দেব এঁদের পাণি প্রার্থনা করেন কিন্তু পিতার অমতে কন্যারা স্বয়ংবরা হতে অসম্মত হওয়ায় ক্রুদ্ধ পবনদেব তাঁদের সর্বাঙ্গ ভগ্ন ও বিকৃত করে দেন।

পরিশেষে কন্যাদের অনুনয়ে পবনদেব তুষ্ট হয়ে বলেন যে, যদি কাম্পিল্যা নগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে এই শত কন্যার বিবাহ হয়, তবেই কন্যারা পূর্বরূপ প্রাপ্ত হবে। ধর্মপরায়ণ রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজকন্যাদের শাপবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে তাঁদের বিবাহ করেন। ব্রহ্মদত্তের স্পর্শে কন্যারা পূর্বের রূপ ফিরে পান। যে স্থানে কন্যারা পবনের শাপে কুব্জ হয়েছিলেন, সেই স্থানের নাম হয় কন্যাকুব্জ—বর্তমান কনৌজ। (রামায়ণ)

কুশধ্বজ—(১) ইনি মিথিলার রাজা জনকের ভ্রাতা এবং সীতার খুল্লতাত। কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি যথাক্রমে দশরথ-পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিবাহ করেন। সাংকাশ্যা রাজ্যের রাজা সুধন্বা যুদ্ধে রাজা জনক কর্তৃক নিহত হলে কুশধ্বজ সেই রাজ্যের রাজা হন। কুশধ্বজের পূর্বপুরুষ নিমি; নিমির পুত্র মিথি। এই মিথি হতে তাঁর অধিকৃত রাজ্যের নাম হয় মিথিলা। মিথির পুত্র জনক হতে পরবর্তী সমস্ত রাজাই জনক নামে অভিহিত হন। (রামায়ণ)

(২) দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজ। কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী। বেদবতীকে রাবণ অপমান করলে তিনি তাঁকে শাপ দিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কুশধ্বজকে শুম্ভদৈত্য রাত্রিকালে বধ করেন। (রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড)

কুশিক—মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও গাধিরাজের পিতা। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল। একবার বিখ্যাত চ্যবন ঋষি জানতে পারেন যে কুশিক বংশ হতে তাঁর বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারিত হবে। এই ক্ষত্রিয়ত্ব নিজের বংশে সঞ্চারিত হওয়া উচিত নয় মনে করে তিনি রাজা কুশিকের বংশ নাশ করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গাধিরাজ কন্যাকে চ্যবনবংশীয় ঋচীক মুনির সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফলে ঋচীকের জমদগ্নি নামে পুত্র হয়। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। (মহাভারত-অনুশাসন)

কুৎস—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি। ইনি অনেক ঋক্‌মন্ত্রের রচয়িতা। একবার কুৎস তাঁর শত্রু শুষ্ণ কর্তৃক কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হন, কিন্তু ইন্দ্র এঁর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শুষ্ণকে হত্যা করে কুৎসকে উদ্ধার করেন।

কৃতবীর্য—চন্দ্রবংশের রাজা কণকের পুত্র। কণকের চার পুত্র। যথা—কৃতবীর্য, কৃতমৌজা, কৃতবর্ম, ও কৃতাগ্নি। কৃতবীর্য অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। ইনি মহর্ষি জমদগ্নিকে নিহত করেন। জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্যার্জুনকে পরাস্ত করে ও হৈহয়বংশের বহুজনকে বধ ক'রে শেষে কার্তবীর্যার্জুনকে নিহত করেন। (মহাভারত)

কৃতবর্মা—ভোজবংশীয় কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা। ইনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে কৌরবপক্ষীয় অবশিষ্ট বীরদের অন্যতম। পাণ্ডব-শিবিরে নিদ্রিত পাণ্ডব বীরদের যখন অশ্বত্থামা হত্যা করেন, তখন কৃপাচার্যের সহিত কৃতবর্মা শিবিরের দ্বার রক্ষা করেন। ইনি অভিমন্যু বধের সপ্তরথীর অন্যতম। যদুবংশ ধ্বংসের সময় সাত্যকি কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করেন। (মহাভারত)

কৃত্তিকা—(১) সপ্তর্ষির মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী ভিন্ন অবশিষ্ট ছয়জন ঋষির স্ত্রীকে 'কৃত্তিকা' বলা হয়। কৃত্তিকারা একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে অগ্নি সেবন করেন। সেই অগ্নির তেজে তাঁরা গর্ভবতী হন। পরে তাঁরা সকলেই সেই তেজ হিমালয়ের শিখরে পরিত্যাগ করেন। সেই মিলিত তেজঃপুঞ্জ হতে কুমারের (কার্তিকেয়র) জন্ম হয়।

(২) দক্ষের ৬০ জন কন্যার মধ্যে কৃত্তিকা প্রভৃতি ২৭ জন চন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। চন্দ্র যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত ছিলেন বলে তাঁদের গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। (কালিকাপুরাণ)

(৩) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রীর গর্ভে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয় জন জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

কৃপ—ঋষি গৌতমের পুত্র। গৌতমের শরদ্বান নামে এক পুত্র ছিল। শরদ্বানের ধনুর্বিদ্যায় যেমন অনুরাগ ছিল, বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। ধনুর্বিদ্যায় শরদ্বানের অসাধারণ অনুরাগ ও কৃতিত্ব দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে জানপদী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে শরদ্বানের হস্ত হতে ধনুর্বাণ চ্যুত হয় এবং কামবশে রেতঃপাত ঘটে। সেই রেতঃ একটি শরস্তম্বে পতিত হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং তা থেকেই একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাজা শান্তনু এঁদের দেখতে পেয়ে কৃপা করে সন্তানের মত পালন করতে থাকেন এবং সেই জন্যই পুত্রের নাম হয় কৃপ ও কন্যার নাম হয় কৃপী।

শরদ্বান্ তপোবলে এঁদের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে রাজভবনে আসেন এবং কৃপকে শিক্ষা দ্বারা ধনুর্বেদে পারদর্শী করেন। কৃপ নিজের পিতার ন্যায় ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন। পরে কৃপ কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে থাকেন ও কৃপাচার্য নামে পরিচিত হলেন। মহাভারত-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষে যোগদান করেন। অভিমন্যুবধের সপ্তরথীর মধ্যে কৃপাচার্য অন্যতম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে অবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয়দের তিনজনের মধ্যে ইনি একজন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের নিশীথে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেন, তখন কৃতবর্মার সঙ্গে ইনিও শিবির-দ্বারে ছিলেন।

যুদ্ধশেষে পাণ্ডবরা এঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানকালে কৃপ পরীক্ষিতের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কৃপ চিরজীবীদের অন্যতম।

কৃপী—মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা ও কৃপাচার্যের ভগিনী। ইনি এবং এঁর ভ্রাতা কৃপ শরস্তম্বে স্খলিত শরদ্বানের রেতঃ হতে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনু এঁদের কৃপা করে প্রতিপালন করেছিলেন বলে এঁদের নাম হয় কৃপ ও কৃপী। দ্রোণাচার্য কৃপীকে বিবাহ করেন। দ্রোণের ঔরসে ও কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণ—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংশ অতি দুর্দান্ত ছিলেন। বড় হয়ে তিনি পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত করে নিজেই রাজা হন। কংশ বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের সঙ্গে নিজের ভগিনী দেবকীর বিবাহ দেন। বিবাহকালে দৈববাণী হয় যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংশকে নিহত করবে। এই দৈববাণীতে ভীত হয়ে কংশ দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। কারাগারে দেবকী ও বসুদেবের ছয়টি সন্তান হয়, কিন্তু সব কয়টিকেই কংশ হত্যা করে। সপ্তম সন্তান যখন গর্ভে, তখন জানা যায় যে, এই সন্তান সুলক্ষণযুক্ত। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপেই ইনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন বলে বিষ্ণু এঁকে বসুদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করেন। জন্মের পর এই সন্তানের নাম হল বলরাম। কংশ অবশ্য সংবাদ পান যে, সপ্তম সন্তানের পর দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। দেবকীর অষ্টমবার গর্ভধারণকালে কংশ কারাগারে আরো কঠোর রক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করেন। জন্মরাত্রে বসুদেবের সম্মুখে ভগবান এসে বলেন যে, আজ দেবকীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তা গোপালক নন্দের স্ত্রী যশোদাকে দিয়ে, যশোদার সদ্যোজাত কন্যা দেবকীকে এনে দেবে। মধ্যরাত্রে মহামায়ার মায়াতে মথুরার সকলেই অচৈতন্য ছিলেন। ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বসুদেব কৌশলে কারাগার হতে অষ্টম সন্তান কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শেষনাগ পথপ্রদর্শক হিসাবে সাহায্য করে এবং যমুনার জলও শুষ্ক হয়ে যায়। বসুদেব অনায়াসে যমুনা অতিক্রম করে যশোদার অজ্ঞাতসারে সন্তান পরিবর্তন করে, কারাগারে দেবকীকে যশোদার কন্যাকে দিয়ে যান। কংশ এই কন্যার জন্মের সংবাদ পেয়ে কন্যাকে পাথরের উপর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শিশুকন্যা এই বলে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায় যে, "আমি যোগমায়া, তোমাকে যে সন্তান হত্যা করবে সে জন্মগ্রহণ করে

জীবিত আছে এবং শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।"

বসুদেব বলরামকে নন্দালয়ে প্রেরণ করে, একত্রে উভয় ভ্রাতার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পুত্রদের বিপদাশঙ্কায় বসুদেব নন্দকে মথুরা ত্যাগ করে গোকুলে গমনের নির্দেশ দেন। নন্দ কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে গোকুলে প্রস্থান করেন।

কংশ তাঁর ভবিষ্যৎ হত্যাকারীর অনুসন্ধান করা অসম্ভব দেখে মথুরার সমস্ত শিশুদের হত্যা করার আদেশ দেন। পুতনা রাক্ষসীর সাহায্যে কংশ অসংখ্য শিশুকে নিহত করেন। পুতনার বিষাক্ত স্তন পান করলেই শিশুরা মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত; কিন্তু কৃষ্ণ এই পুতনার স্তন এমন কঠোরভাবে পান করেন যে, যন্ত্রণায় পুতনা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কংশ এইবার বুঝতে পারেন যে, কৃষ্ণই তাঁর প্রধান শত্রু; সেইজন্য নানা উপায়ে কৃষ্ণকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে থাকেন। কংশ-নিয়োজিত বক, অশ্ব, অরিষ্ট প্রভৃতি দানবরা কৃষ্ণের হাতে বিনষ্ট হয়। এই সময়ে কৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করে কালিন্দীর জল বিষমুক্ত করেন। কৃষ্ণের পরামর্শে গোপগণ ইন্দ্রের পূজা ত্যাগ করে, তাদের গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্ধনগিরির পূজা করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে গোবর্ধনপর্বত নিমজ্জিত করবার জন্য দেশে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবনের সৃষ্টি করেন। তখন কৃষ্ণ আঙ্গুলের উপর সাত দিন ধরে গোবর্ধনপর্বত ধারণ করে ইন্দ্রকে পরাভূত করে গোপগণের গোধন ও দেশরক্ষা করেন।

অবশেষে কংশ কৃষ্ণ-বলরামকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য অক্রুরকে পাঠান। অক্রুর কৃষ্ণকে কংশের নিমন্ত্রণ ও গুপ্ত অভিসন্ধির কথা জানান। কৃষ্ণ ও বলরাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মথুরায় চলে যান।

মথুরায় দুই ভাই ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করলে কংশ দুইজন মল্লযোদ্ধাকে এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললেন। তাদের গোপন অভিসন্ধি ছিল যে, তারা কৃষ্ণ-বলরামকে পরাজিত করে হত্যা করবে। কংশ গোপনে একটি হস্তীকে নিযুক্ত করেন এই দুরভিসন্ধি নিয়ে যে, যেন প্রয়োজন হলে হস্তীটি এঁদের উভয়কেই পদদলিত করতে পারে। মল্লযোদ্ধারা কৃষ্ণ-বলরাম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হয় এবং হস্তীটিও তাঁদের হস্তে নিহত হয়। তারপর কংশের রক্ষীদের হত্যা করে কৃষ্ণ কংশকে নিহত করেন ও কারারুদ্ধ উগ্রসেনকে মুক্ত করে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর কৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে থাকেন। তদনন্তর সান্দীপনি নামে এক বেদজ্ঞের কাছে কৃষ্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেইখানে তিনি পঞ্চজন

নামে সমুদ্রচর দৈত্যকে বধ করে পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন।

দ্বারকায় বিদর্ভরাজ ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণী কৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে চরমুখে কৃষ্ণের নিকট সে সংবাদ পাঠান। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক তাঁর পুত্র রুক্মীর অমতে এই বিবাহে অসম্মত হন। কৃষ্ণ-বলরাম স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হয়ে তৎকালীন প্রথানুযায়ী রুক্মিণীকে হরণ করেন। রুক্মিণী রাজা শিশুপালের বাগ্‌দত্তা ছিলেন। শিশুপাল ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হয়ে স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। রুক্মিণীর গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন প্রমুখ দশ জন পুত্র ও চারুমতি নামে এক কন্যা হয়। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের জাম্ববতী, সুশীলা, সত্যভামা ও লক্ষ্মণা নামে চারটি প্রাধানা স্ত্রী এবং ষোল হাজার অপ্রধানা স্ত্রী ছিলেন।

একবার সত্যভামার সহিত স্বর্গে ভ্রমণকালে সমুদ্রমন্থনোত্থিত পরিজাত বৃক্ষ কৃষ্ণ নিয়ে আসেন। এই বৃক্ষের অধিকরিণী ছিলেন ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবী। স্ত্রীর জিনিস উদ্ধারের জন্য ইন্দ্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হন। কৃষ্ণের এই কাহিনী হরিবংশ ও ভাগবতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুলপুত্র। কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। এই স্বয়ংবর-সভাতেই পাণ্ডবদের সহিত কৃষ্ণের প্রথম আলাপ-পরিচয় ও সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পরিচয়ের সূত্র থেকেই পাণ্ডবরা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। পাণ্ডবরা ন্যায়তঃ দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন, এই অভিমত ব্যক্ত করে কৃষ্ণ সমবেত রাজাদের পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিবৃত্ত করেন। কৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই বনবাসকালে অর্জুন তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করেন। সুভদ্রার বিবাহোপলক্ষে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল বাস করেন। এই সময় অগ্নির অগ্নিমান্দ্য দূর করবার জন্য তাঁরই প্রার্থনায় কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের বাধা সত্ত্বেও খাণ্ডববন দাহন করেন। অগ্নি এই কাজের জন্য কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী নামে গদা দান করেন।

মগধরাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের মহাপরাক্রান্ত শত্রু ছিলেন। তাঁর ভয়ে কৃষ্ণকে মথুরা ত্যাগ করে রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে আশ্রয় নিতে হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পূর্বে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ছদ্মবেশে মগধে যান ও সেখানে কৃষ্ণের পরামর্শানুযায়ী ভীম মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

হিসাবে ভীষ্ম কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করায় কৃষ্ণের পিতৃষসার পুত্র চেদিরাজ শিশুপাল ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃষ্ণের নিন্দা করেন। পূর্বে কৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ মার্জনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এইবার তিনি চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদ করেন। পাণ্ডব-কৌরবদের অক্ষক্রীড়া সভায় কৃষ্ণ অনুপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি শাল্বরাজের সৌভনগর বিনষ্ট করতে ব্যস্ত ছিলেন। দ্যূতক্রীড়া সভায় বস্ত্র হরণকালে দ্রৌপদী লজ্জা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও হরিকে ডাকেন; তখন স্বয়ং ধর্ম নানা বর্ণের বস্ত্রের রূপধারণ করে তাঁকে আবৃত করেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরুপাণ্ডব উভয়পক্ষই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আসেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। প্রথমে দুর্যোধন কৃষ্ণের শিয়রে একটি উৎকৃষ্ট আসনে এসে বসেন ও পরে অর্জুন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে যুক্ত করে অপেক্ষা করতে থাকেন। কৃষ্ণ জাগ্রত হয়ে প্রথমে অর্জুন ও পরে দুর্যোধনকে দেখেন এবং উভয় কর্তৃক নিজ নিজ পক্ষে যোগদান করতে অনুরুদ্ধ হন। কৃষ্ণ তখন বললেন যে, যদিও দুর্যোধন আগে এসেছেন, তবু অর্জুকেই তিনি আগে দেখেছেন। অতএব উভয়পক্ষকেই তিনি সাহায্য করবেন। এক দিকে কৃষ্ণের দশকোটি দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা ও অপর দিকে তিনি স্বয়ং নিরস্ত্র ও যুদ্ধবিমুখ—এই দুই পক্ষের মধ্যে নির্বাচনের জন্য বয়ঃকনিষ্ঠ বলে আগে অর্জুনকেই বেছে নিতে বললেন তিনি। অর্জুন কৃষ্ণকেই বরণ করলেন ও দুর্যোধন নারায়ণী সেনা নিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডবদের অনুরোধে কৃষ্ণ একবার শান্তির দৌত্য করেন, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি অর্জুনকে যে উপদেপ দিয়েছিলেন তাই 'ভগবদ্‌গীতা'। এই যুদ্ধে তিনি বন্ধুভাবে পরামর্শ দিয়ে পাণ্ডবদের জয়ে সাহায্য করেন। দ্রোণ-বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের পরামর্শ ও অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পরামর্শ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করবার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের পরাক্রম দেখে তিনি স্বয়ং সুদর্শনচক্র হস্তে ভীষ্মকে বধ করতে অগ্রসর হন। ভীষ্ম সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন এবং অর্জুন সানুনয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। ভগদত্তের বৈষ্ণবাস্ত্র নিবারণ করে তিনি অর্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। জয়দ্রথ, দ্রোণ ও কর্ণবধ কৃষ্ণের সাহায্য ভিন্ন সম্পন্ন হ'ত না। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির নিক্ষেপে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষিৎকে নিহত

করলে, কৃষ্ণ তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করে গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন যে, এই জ্ঞাতিক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ হয়েও যখন কৃষ্ণ তা নিবারণ করেন নি, তখন এই যুদ্ধের ছত্রিশ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংস হবে ও কৃষ্ণের অপঘাত মৃত্যু ঘটবে।

যুদ্ধে জয়লাভের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে তিনি পুনরায় হস্তিনাপুরে আসেন ও যজ্ঞান্তে আবার দ্বারকায় ফিরে যান।

একবার বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদমুনি দ্বারকায় গেলে যাদবগণ কুবুদ্ধিবশতঃ কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করে ঋষিদের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন যে ইনি বভ্রুর স্ত্রী, এঁর কি সন্তান হবে। মুনিরা প্রতারণা ধরতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে শাম্ব এক লৌহমুষল প্রসব করবে, যদ্দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস হবে। পরদিন শাম্ব মুষল প্রসব করেন এবং যাদবগণ সেই মুষল চূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবশ্রেষ্ঠগণ কঠোরভাবে নগরে সুরাপান নিষিদ্ধ করেন। ক্রমে চতুর্দিকে নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখে কৃষ্ণ সকলকে সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে গিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য পূজা করতে বলেন ও মাত্র একদিনের জন্য সুরাপানের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। সেখানে প্রচুর সুরাপানে উন্মত্ত যাদবগণ পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে উত্তেজিত সাত্যকি কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করায় সকলে পানপাত্রের আঘাতে সাত্যকি ও কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে কৃষ্ণের সম্মুখেই হত্যা করেন। তখন কৃষ্ণ একমুষ্টি তৃণ হাতে নিতেই সেই তৃণ লৌহ-মুষলে পরিবর্তিত হ'ল এবং তদ্দ্বারা বহু যাদবকে হত্যা করলেন। সেখানেকার সমস্ত তৃণই মুষলে রূপান্তরিত হওয়ায় তদ্দ্বারা যাদবগণ পরস্পরকে হত্যা করে যদুবংশ ধ্বংস করেন। কৃষ্ণ বলরাম বনবাসী হবার সঙ্কল্প করে সারথি দারুককে অর্জুনের কাছে সংবাদ জানিয়ে পাঠান। ইতিমধ্যে বলরাম দেহত্যাগ করেন এবং দূর থেকে ভূমিতে উপবিষ্ট কৃষ্ণকে মৃগভ্রমে এক ব্যাধ পাদমূলে শরবিদ্ধ করায় তাঁর মৃত্যু হয়। হস্তিনাপুরে সংবাদ পেয়ে অর্জুন দ্বারকায় এসে কৃষ্ণ প্রভৃতির সংকার করেন ও যাদব-রমণীদের নিয়ে হস্তিনাপুরে আসেন। দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে লীন হয়। পথিমধ্যে অনেক যাদব রমণী দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয় এবং কৃষ্ণবিহীন অর্জুন তার প্রতিকারে অসমর্থ হন। মহাভারতে কৃষ্ণের স্থান অতি উচ্চে। তিনি বিষ্ণুর অবতার। ইনি যদুবংশের রাজা না হয়েও সর্বেসর্বা

চালক ছিলেন। নানা প্রক্ষিপ্ত ও অলৌকিক ঘটনায় কৃষ্ণচরিত্র জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কৃষ্ণ বলেছেন যে, যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। তাঁর ধর্মরাজ্য স্থাপনের অন্তরায় ছিলেন শক্তিশালী রাজা জরাসন্ধ ও শিশুপাল। এঁদের দুইজনকে নিহত করে কৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে কৌরবদের বিনাশের জন্য পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে ইনি অর্জুনের সারথি হন এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বররূপে কল্পিত হয়েছেন। তিনি পরমাত্মা ও রাধা তাঁর হ্লাদিনী-শক্তি। ভক্ত হচ্ছেন জীবাত্মা। বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ, মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধা কৃষ্ণ, গীতার দার্শনিক কৃষ্ণ, বৈষ্ণবদের প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ ও পৌরাণিক কৃষ্ণ মিলে এক অবতারের সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষ্ণা—দ্রৌপদীর অন্য নাম। রাজা দ্রুপদ দ্রোণ কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় দ্রোণকে বধ করবার জন্য তিনি একটা যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞ হতে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র এবং কৃষ্ণা নামে এক কন্যা জন্মে; এই কন্যাই দ্রৌপদী (দ্রৌপদী দেখ; ভাগবত ও মহাভারত)

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—ব্যাসদেবের নাম। দ্বৈপায়ন-দ্বীপ হয়েচে অয়ন (আশ্রয়) যার। কারণ ব্যাসদেব দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুরুবংশীয় চেদিরাজ উপরিচরবসু মৃগয়াকালে তাঁর রূপবতী স্ত্রী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাতুর হয়ে স্খলিত শুক্র এক শ্যেনপক্ষীর সাহায্যে স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণে উক্ত শুক্র যমুনার জলে নিপতিত হয়। অদ্রিকা নামে মৎস্যরূপিণী ঋষি-শাপগ্রস্তা এক অপ্সরা সেই শুক্র গ্রহণে গর্ভবতী হয় এবং ধীবর কর্তৃক ধৃত হয়ে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্মদানপূর্বক শাপমুক্ত হয়ে আকাশপথে অন্তর্হিত হয়। এই কন্যা ধীবর কর্তৃক পালিতা হয় এবং তাহার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ থাকায় নাম রাখা হয় মৎস্যগন্ধা। এই কন্যা ধীবরের খেয়া-নৌকা পারাপার করত। একদিন পরাশর মুনি নদী পারাপারের সময় এই কন্যাকে নৌকা চালনা করতে দেখে, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গম প্রার্থনা করেন। উন্মুক্ত নদীবক্ষে এই কার্যে রত হওয়ায় মৎস্যগন্ধা লজ্জা বোধ করলে, পরাশর নদীমধ্যে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেন। অতঃপর পরাশর সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধা) গর্ভসঞ্চার করেন এবং তপোবলে তাঁর গাত্রের মৎস্যগন্ধ দূর করে সুগন্ধযুক্ত করেন। মৎস্যগন্ধা যমুনার দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করেন। দ্বীপে জাত

বলে এই পুত্রের নাম হয় দ্বৈপায়ন এবং কৃষ্ণবর্ণ বলে তাঁর নাম কৃষ্ণ।

ধীবররা এই মৎস্যকন্যাকে দাসরাজ বসুর হস্তে অর্পণ করেন। ইনি কন্যাকে প্রতিপালন করে এর নাম রাখলেন সত্যবতী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর মাতা সত্যবতীর আদেশে তপস্যায় রত হন ও পরে বেদ বিভক্ত করে 'ব্যাস' (বিভাগ-কর্তা) নামে বিখ্যাত হন। ইনি মহাভারতের রচয়িতা। পুত্র শুক ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতিকে ইনি বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। ইনি আঠারোখানি পুরাণ এবং আঠারোখানি উপপুরাণ রচনা করেন।

মহারাজ শান্তনু দ্বৈপায়ন-জননী দাসরাজপালিতা সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁকে বিবাহ করেন।

ব্যাসদেব সত্যবতী ও শান্তনুর পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। শান্তনু থেকে জন্মেজয়ের রাজত্বকাল পর্যন্ত সাতপুরুষকাল ইনি বর্তমান ছিলেন ও ঐ বংশের সকলকে নানা সদুপদেশ দান করেন। ইনি মহাজ্ঞানী, মহাযোগী, সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ। দ্রৌপদীর বিবাহের বিধান ইনিই দিয়েছিলেন। কৃষ্ণবর্ণ বলে এঁর নাম ছিল কৃষ্ণ। পিঙ্গল জটা-শ্মশ্রুসম্পন্ন ব্যাসের চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত ছিল। ইনি জন্মগ্রহণের পর পরাশরের সঙ্গে চলে যান ও যাবার সময় মাতাকে বলেন যে, তিনি তাঁকে স্মরণ করলেই উপস্থিত হবেন। বৈপিত্রেয়-ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যুর পর, মাতা সত্যবতীর অনুরোধে কেবল ধর্ম-পালনের জন্য ইনি বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে দুই পুত্র (ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু) উৎপাদন করেন। শয়নগৃহে ব্যাসদেবের ভীষণ রূপ-দর্শনে অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করেন ; ফলে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং অপর এক দিন শয়নগৃহে দ্বৈপায়নকে দেখে অম্বালিকা একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যান। সে কারণ, তাঁর পুত্র 'পাণ্ডু' পাণ্ডুবর্ণ হন। এতে সত্যবতী দুঃখিত হয়ে অম্বিকাকে পুনর্বার ব্যাসের নিকট গমন করতে বলেন। অম্বিকা ঋষির রূপ ও গন্ধের ভয়ে নিজে তাঁর সমীপস্থ না হয়ে এক সুন্দরী পরিচারিকাকে নিজের বসনভূষণে সজ্জিত করে প্রেরণ করেন। এই দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। অপরের ক্ষেত্রে উৎপাদিত এই পুত্রদের সহিত ব্যাসের কোনরূপ আত্মীয়তা ছিল না। ব্যাসের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করে ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ দেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ইনি কুরু-পাণ্ডব রমণীদের চক্ষুর সমক্ষে জাহ্নবী থেকে উত্থিত মৃত আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যক্ষ করান। জ্ঞাতিবধের পাপক্ষালনের

জন্য ইনি যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করতে উপদেশ দেন।

'মহাভারত' রচয়িতারূপে তিনি বিখ্যাত। অষ্টাদশপুরাণের সৃষ্টিকর্তা রূপেও তিনি খ্যাত। বেদ-বিভাগ-কর্তা বলে তিনি 'বেদব্যাস' নামে পরিচিত।

কেকয়—চন্দ্রবংশীয় রাজা। এঁর কন্যা কৈকেয়ীর সঙ্গে সূর্যবংশীয় দশরথের বিবাহ হয়। (রামায়ণ)

কেতু—এক দানব। দানব বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে এর জন্ম। এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাহু। সমুদ্রমন্থনকালে দেবতার ছদ্মবেশে এই দানব অন্যান্য দেবতাদের সহিত অমৃতপানে প্রবৃত্ত হয়। কণ্ঠে অমৃত পৌঁছবার পূর্বেই সূর্য ও চন্দ্র একে দানব বলে চিনতে পেরে এর উপস্থিতি অন্যান্য দেবতাদের জ্ঞাত করান। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা কেতুর দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করেন; কিন্তু সামান্যমাত্র অমৃত পান করায় এই দানব অমর হয় এবং ছিন্ন-মস্তক হয়েও বিনষ্ট হয় না। এই দানবের মস্তকভাগের নাম রাহু ও দেহভাগের নাম কেতু বলে অভিহিত হয়। চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি ক্রোধবশতঃ গ্রহণের সময় রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে। হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু ও কেতু গ্রহমধ্যে পরিগণিত। উভয়েই অশুভ গ্রহ।

কেতুধর্মা—ত্রিগর্তদেশীয় রাজকুমার। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করে অর্জুনকে অশ্ব-রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। সেই সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যধর্মার আদেশে কেতুধর্মা সমস্ত অশ্বকে আবদ্ধ করেন। এই জন্য যে-যুদ্ধ হয় তাতে অর্জুনের হস্তে দুই জনই নিহত হন। (মহাভারত)

কেতুমতি—গন্ধর্বীয় সুন্দরী। কেতুমতি, বসুধা ও নর্মদা নামে তিন কন্যাকে মাল্যবান, সুমালী ও মালী নামে তিন ভ্রাতা বিবাহ করে। সুমালী হতে কেতুমতির গর্ভে প্রহস্ত, আকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সুংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ নামে দশ পুত্র এবং কুম্ভনসী, কৈকসী, পুষ্পোৎকটা ও রাকা নানে চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। (রামায়ণ—উত্তরা)

কেতুমান—(১) কলিঙ্গদেশের রাজা শ্রুতায়ুর পুত্র কেতুমান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হাতে নিহত হন। (মহাভারত—ভীষ্ম)। (২) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে কেতুমান অন্যতম।
(মহাভারত—আদি)

কেশব—কেশী নামক দানবকে বধ করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ কেশব নামে বিখ্যাত হন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

কেশরী—বানররাজ। পুঞ্জিকাস্থলী নামে অপ্সরা এর রূপে মোহিত হয়ে একে বিবাহ করে। ঐ অপ্সরা কোন

ঋষির শাপে বানরীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং কেশরীর সঙ্গে বিবাহ হবার পর এর নাম হয় অঞ্জনা। কেশরীর ক্ষেত্রে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। হনুমান সুগ্রীবের অধীনে রামকে সাহায্য করবার জন্য লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। (রামায়ণ)

কেশিনী—(১) সগররাজার অন্যতমা স্ত্রী। ইনি বিদর্ভরাজের কন্যা। এঁর গর্ভে অসমঞ্জের জন্ম হয়।

(২) নলরাজার স্ত্রী দময়ন্তীর পরিচারিকা। এর সাহায্যে দীর্ঘ বনবাসের পর নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন হয়। (মহাভারত—বন)

(৩) কশ্যপের অন্যতমা কন্যা। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের স্ত্রী কপিলার গর্ভে এঁর জন্ম হয়।

(৪) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা স্ত্রী কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগবত)

কেশী—কংশের অনুচর কেশী দানব। শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করবার জন্য কংশ একে বৃন্দাবনে পাঠালে সে অশ্বরূপ ধারণ করে গোপগণের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। তাদের গাভীদের বধ করে মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ তার কাছে গেলে সে কৃষ্ণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ তার মুখের মধ্যে বিশাল বাহু প্রবেশ করিয়ে, শ্বাসরোধ করে কেশীকে হত্যা করেন।

কৃশাশ্ব—রাজর্ষি কৃশাশ্ব দক্ষের জয়া ও সুপ্রভা নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী জয়া মহাতেজস্বী মন্ত্ররূপ পঞ্চাশটি পুত্র প্রসব করেন এবং সুপ্রভার গর্ভে সংহার নামে শাস্ত্ররূপ পঞ্চাশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এরা জৃম্ভকাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। (রামায়ণ)

কৈকেয়ী—কেকয়-রাজকন্যা। অযোধ্যার রাজা দশরথের মধ্যমা স্ত্রী ও ভরত-জননী। দেবাসুরের যুদ্ধে আহত হয়ে কৈকেয়ীর সেবায় সত্বর আরোগ্যলাভ করায়, রাজা দশরথ তাঁকে একই সময়ে দুইটি বরদানে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু কোন অভাব না থাকায়, কৈকেয়ী পরে বর গ্রহণ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দশরথ যখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে নিজে রাজ্যভার থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেন, তখন দাসী মন্থরার কু-পরামর্শে ও প্ররোচনায় কৈকেয়ী পূর্বপ্রতিশ্রুত সেই দুই বর প্রার্থনা করেন। এক বরে তিনি রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস এবং অপর বরে ভরতের সিংহাসন গ্রহণ প্রার্থনা করেন। এই দুই বর ব্যতীত অন্য কোন বর চাইবার জন্য অনুরোধ করলে, দশরথের সমস্ত কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হয়। কৈকেয়ী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বলেন যে, এই বর তাঁর চাই-ই, অন্যথায় তিনি আত্মহত্যা করবেন।

রাম বিমাতার মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্রই পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনগমন করেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁর অনুগামী হন। ভরত তখন মাতুলালয়ে। দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু হয়। ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত হতেই পটপরিবর্তন হয়; তিনি স্থির করেন যে, রামকে ফিরিয়ে আনবেন এবং মাতা কৈকেয়ীকে এজন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। কৈকেয়ী তখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি কত বড় অন্যায় করেছেন। তিনিও ভরতের অনুগমন করেন রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য। (রামায়ণ)

কৈকসী—রাবণাদির মাতা। রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে কৈকসীর জন্ম হয়। এঁর অন্য নাম নিকষা। একবার সুমালী তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যলোকে এসে কুবেরের ধনৈশ্বর্য দেখে কুবেরের পিতা বিশ্রবা মুনিকে পতিত্বে বরণ করতে বলেন। কৈকসী তপস্যারত বিশ্রবার কাছে গিয়ে অধোমুখে মাটিতে আঙুল দিয়ে অঙ্কন করতে থাকেন। বিশ্রবা তাঁর পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে, তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে মুনিকে তপোবলে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিতে বলেন। বিশ্রবা তখন ধ্যানে তাঁর উপস্থিতির উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে বলেন যে, তুমি পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে এসেছ, কিন্তু প্রদোষকালে উপস্থিত হয়েছ ব'লে তোমার পুত্রগণ রাক্ষস হবে। কৈকসীর অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ধার্মিক হবে। যথাসময়ে বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণের জন্ম হয়।

কৈটভ—প্রলয়-সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্তনাগের দেহের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। বিষ্ণুর কর্ণমল হতে দুই অসুর নির্গত হয়ে কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল অবস্থায় বাস করতে থাকে। ব্রহ্মা এদের দু'জনের মধ্যে বায়ু চালনা করে জীবনের সঞ্চার করেন। এদের একজনের শরীর কোমল বলে নাম হয় মধু ও অপরের শরীরের গঠন কঠিন বলে নাম হয় কৈটভ। এই দুই দানব বলদীপ্ত হয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। ব্রহ্মা সন্ত্রস্ত হয়ে পদ্মনাল কম্পিত করে বিষ্ণুকে জাগরিত করেন। বিষ্ণু দুই দানবকে স্বাগত জানিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সহস্র বৎসর যুদ্ধ করেও তারা ক্লান্ত হন না। তখন তারা বিষ্ণুর উপর প্রীত হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলে। বিষ্ণু বলেন লোকহিতার্থে আমি এই বর চাই যে, তোমরা আমার বধ্য হও। এই বাক্য শ্রবণান্তে মধু ও কৈটভ বলে যে, তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং

এই বর দান কর, আমরা যেন তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলে স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও অনাবৃত স্থান না পেয়ে, আপন অনাবৃত জানুর উপর মধু ও কৈটভের মস্তক সুদর্শনচক্রে ছিন্ন করেন। এই দুই দৈত্যের শরীর-নিঃসৃত মেদ সাগর-জল আবৃত করে পৃথিবীর সৃষ্টি করে। সেইজন্য পৃথিবীর নাম হয় মেদিনী।

কৈলাস—পর্বত। মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। মানস সরোবরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হিমালয়ের চূড়া।

কোজাগর—শরৎকালে দুর্গাপূজার পর যে পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা হয়, তাকে কোজাগরী পূর্ণিমা বলে। 'কো জাগর্তী' হতে এই কথার উৎপত্তি; অর্থাৎ কে জেগে আছে। পুরাণের মতে ঐদিন রাত্রে লক্ষ্মীদেবী এসে বলেন, কে জেগে আছ, আজ আমি তোমাকে ধন দেব। এইজন্য কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে জাগরণের প্রথা আছে।

কোশল—কাশীর উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশের সন্নিহিত সমস্ত ভূ-ভাগ। কোশল রাজ্য 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' নামে দুই ভাগে বিভক্ত। রামের রাজধানী অযোধ্যার নাম দক্ষিণ কোশল এবং অযোধ্যার উত্তর প্রদেশের নাম উত্তর কোশল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজার রাজ্য।

কৌন্তেয়—যুধিষ্ঠিরাদি কুন্তীপুত্রদের সকলকেই বলা হয়। এতদ্ব্যতীত অর্জুনকেও বিশেষভাবে কৌন্তেয় বলা হয়।

কৌমোদকী—অগ্নি-প্রদত্ত কৃষ্ণের গদা। খাণ্ডবদাহন কালে অগ্নি বরুণের নিকট হতে যাঞ্ঞা ক'রে কৃষ্ণার্জুনকে যে সকল অস্ত্র দেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণকে কৌমোদকী গদা ও সুদর্শনচক্র দান করেন।

কৌরব—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু—দুইজনই কুরুবংশজাত, সেই জন্য এই দুজনই কৌরব। কিন্তু সাধারণতঃ দুর্যোধনদের বংশকেই কৌরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুরুপক্ষ বলা হয়ে থাকে।

কৌরব্য—(১) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষকন্যা কদ্রু হতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করে, কৌরব্য তাদের মধ্যে অন্যতম। (মহাভারত—আদি)। (২) বশিষ্ঠ-বংশীয় মহর্ষি কৌরব্য একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

কৌশল্যা—অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা স্ত্রী, রামের জননী। ইনি কোশলাধিপতির কন্যা। দীর্ঘকাল নিঃসন্তান থাকায় দশরথ পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করেন এবং তারই ফলে কৌশল্যার গর্ভে রামের জন্ম হয়। তিনি চিরনম্র, মধুরস্বভাবা ও স্নেহশীলা ছিলেন। তাঁর ধৈর্যের চরম পরীক্ষা হয় পুত্র রামের বনবাসকালে। তিনি প্রথমে পুত্রকে বনগমনে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পিতৃসত্যপালনে নিষ্ঠা

ও অপূর্ব ধর্মপ্রাণতা দর্শনে তিনি পুত্রবিরহ-দুঃখতুচ্ছ করে রামকে সম্মতি দেন ও আশীর্বাদ করেন। চৌদ্দ বৎসর পরে রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে অশ্বমেধযজ্ঞের পর কৌশল্যার মৃত্যু হয়। (রামায়ণ)

কৌশিক—(১) একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ। ইনি একদিন বৃক্ষের তলদেশে উপবেশনপূর্বক শাস্ত্রপাঠে রত থাকাকালীন এক বলাকা (স্ত্রী-বক) এঁর মস্তকোপরী পুরীষ ত্যাগ করে। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করা মাত্র উক্ত বলাকা ভস্মীভূত হয়। কৌশিক নিজের কৃতকর্মের জন্য অতিশয় দুঃখিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় ভিক্ষার জন্য এক গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়। কর্মব্যস্ত গৃহিণী তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু সেই সময় গৃহপ্রত্যাগত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত স্বামীকে দেখে সাধ্বী স্ত্রী ভিক্ষাদান না করেই স্বামীর সেবায় রত হন। অতঃপর ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে স্মরণ করে উক্ত নারী লজ্জিত হয়ে ভিক্ষা দিতে যান। কৌশিক ভিক্ষাদানে এই বিলম্ব দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তখন গৃহিণী বলেন যে, স্বামীই আমার পরম দেবতা, সেইজন্য তাঁকেই আমি সর্বাগ্রে সেবা করেছি। উত্তরে কৌশিক বলেন যে, তুমি স্বামীকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে ব্রাহ্মণকে অপমান করলে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যে পৃথিবী দগ্ধ করতে সক্ষম তা কি তুমি জান? তখন গৃহিণী তাঁকে বললেন যে, পতিসেবাই তাঁর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই তিনি এই ধর্মের ফলে বলাকার মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরেছেন বটে, কিন্তু তিনি যথার্থরূপে ধর্মের মর্ম জানতে পারেন নি। মানুষের ক্রোধই তার পরম শত্রু—যিনি অক্রোধ ও মোহহীন—দেবতারা তাঁকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ মনে করেন। এরপর গৃহিণী কৌশিককে মিথিলাবাসী ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে ধর্মশিক্ষা করতে নির্দেশ দেন। তখন কৌশিক ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ ও পিতামাতার সেবার ফল সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হন। তারপর গৃহে ফিরে গিয়ে কৌশিক পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হন। (মহাভারত—বনপর্ব)

(২) জনৈক ব্রাহ্মণ-তপস্বী। গ্রামের কাছে নদীর নিকট বাস করতেন। সদা সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে তিনি সত্যবাদী নামে বিখ্যাত হন। একদা দস্যুর ভয়ে কতিপয় ব্যক্তি তাঁর তপোবনে আশ্রয় নেয়। তাদের সন্ধানে দস্যুরা কৌশিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কয়েকজন লোককে এদিকে আসতে দেখেছেন কিনা? কৌশিক তখন প্রতিজ্ঞানুসারে বলেন যে, সেই লোকেরা এই বনে আশ্রয় নিয়েছে। তখন দস্যুদল সেই ব্যক্তিদের খুঁজে তাদের হত্যা করে। ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব

জানার জন্য কৌশিক নরকে গিয়েছিলেন। (মহাভারত)

কৌশিকী—উমার দেহসম্ভূতা দেবীবিশেষ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বসুদেব কর্তৃক যশোদার কাছ থেকে অপহৃত হয়ে কংস হস্তে নিহত হবার জন্য নীত হলে, কংসের হাত হতে চ্যুত হয়ে আকাশমার্গে উঠে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কংসের হত্যাকারী জন্মগ্রহণ করেছে। ইনি ইন্দ্র কর্তৃক পূজিত হয়ে বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীরূপে স্থাপিত হন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে ইনি শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধকালে কাত্যায়নীর শরীর হতে বহির্গত হন। কোষ হতে নির্গত হওয়ায় এঁর নাম হয় কৌশিকী। নিশুম্ভ হিমালয়ে এঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করেন। কৌশিকী বলেন—যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবে তাকে আমি বিবাহ করবো। এই ঘটনা অবলম্বন করে, শুম্ভ-নিশুম্ভর সঙ্গে কৌশিকীর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কৌশিকী নিজের দেহ হতে মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন এবং ঐ যুদ্ধে শুম্ভ-নিশুম্ভ অনুচরসহ নিহত হয়।

কৌস্তুভ—সমুদ্রমন্থনের সময় উত্থিত উজ্জ্বল মণি। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এই মণি বক্ষে ধারণ করতেন।

ক্রতু—একজন প্রজাপতি। ইনি একজন মহর্ষি এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে সর্বত্র পূজিত। এঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা সন্নতি। কয়েকটি পুরাণ মতে ইনি ব্রহ্মার কোন না কোন অঙ্গ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। মহাভারত মতে এঁর স্ত্রী সন্নতি বালখিল্য নামে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম দেন। মহর্ষি ক্রতু যজ্ঞাদি কাজে ও বিষম বিপদের সময় অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে উপস্থিত হতেন।

ক্রোধ—লোভের পুত্র। ইনি নিজের ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। পুত্রের নাম কলি ও কন্যার নাম দুরুক্তি। (ভাগবত)

ক্রোধবশা—দক্ষের কন্যা। প্রজাপতি কশ্যপের স্ত্রী। ক্রোধবশার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে ক্রোধবশ নামে পুত্রগণ ও জলচর মাংসাশী পক্ষী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে।

ক্ষমা—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। দক্ষের চব্বিশটি কন্যার মধ্যে ইনি একটি। ইনি প্রজাপতি পুলহের স্ত্রী। এঁর গর্ভে ও পুলহের ঔরসে কর্দম, চার্ব্বীর ও সহিষ্ণু নামা তিন পুত্র হয়। (গরুড়, কূর্ম ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

খ

খগম—তপোবলসম্পন্ন এক সত্যবাদী তপস্বী। সহস্রপাদ নামে এক ঋষিপুত্রের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধু উপহাস করে একবার তৃণনির্মিত এক কৃত্রিম সর্প তৈরী করে খগমকে ভয় দেখান এবং তাতে তিনি মূর্ছিত

হয়ে পড়েন। পরে জ্ঞানলাভ করে সহস্রপাদকে শাপ দেন যে, সে বিষহীন ডুণ্ডুভরূপে (ঢোঁড়া) পরিণত হবে। পরে বন্ধুর কাতরতায় ও অনুনয়ে তুষ্ট হয়ে খগম বর দেন যে, প্রমতি-পুত্র রুরু মুনির দর্শনে সে শাপমুক্ত হবে। রুরু কর্তৃক শাপমুক্ত হয়ে ইনি আবার সশরীর প্রাপ্ত হন।

খট্টাঙ্গ—সূর্যবংশের রাজা। ইনি দিলীপ নামেও খ্যাত ছিলেন। দেবদানবের যুদ্ধে ইনি দেবতাদের সাহায্য করেন। সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা এঁকে কোন বর প্রার্থনা করতে বলেন। তখন খট্টাঙ্গ নিজের পরমায়ু কত জানতে চান। দেবতারা উত্তরে তাঁর পরমায়ু আর মুহূর্তমাত্র বলায়, তিনি সমস্ত কাজ ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ আনন্দিত মনে বিষ্ণুকে ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

খর—এক রাক্ষস। এর অন্য ভ্রাতার নাম দূষণ। এরা রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। সুমালী রাক্ষসের কন্যা রাকার সহিত বিশ্রবার বিবাহ হয়। রাকার গর্ভে খরের জন্ম হয়। খরের পুত্রের নাম মকরাক্ষ। রাবণের অনবধানতার ফলে ভগিনী শূর্পণখার স্বামী নিহত হলে, বিধবা ভগিনীকে খরের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। রাবণের আদেশে খর চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রভু এবং শূর্পণখার রক্ষক ও আজ্ঞাবহ হয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে থাকে। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাসকালে পঞ্চবটীতে কামাতুরা শূর্পণখার দুর্বিনীত ও অবৈধ আচরণের ফলে লক্ষ্মণ খড়্গদ্বারা শূর্পণখার নাসা ও কর্ণ ছেদন করেন। শূর্পণখার এই দুর্দশায় ক্রুদ্ধ হয়ে খর তার সেনাপতি দূষণের অধীনে এক রাক্ষসবাহিনী পাঠান রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করতে। যুদ্ধে রামের হাতে সসৈন্য দূষণ নিহত হয়। অতঃপর খরও রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়। (রামায়ণ—অরণ্য)

খসা—কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা। খসা হতে যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে। (অগ্নিপুরাণ)

খ্যাতি—মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রী। ইনি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। এঁর সঙ্গে ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভৃগুর বিবাহ হয়। খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মী নামে কন্যা এবং ধাতৃ ও বিধাতৃ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। (বিষ্ণুপুরাণ)

খাণ্ডবদাহ—পাণ্ডবগণ যমুনাতীরস্থ খাণ্ডবপ্রস্থে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। একদিন কৃষ্ণার্জুন যমুনায় জলবিহারের পরে যমুনাতীরস্থ খাণ্ডববনের সন্নিকটে পানভোজনে রত ছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশে অগ্নি তাঁদের কাছে এসে খাণ্ডববন দগ্ধ করার জন্য তাঁহাদের সাহায্যাভিলাষী হলেন। শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে দ্বাদশ বৎসর ঘৃতপান করার

তাঁর অগ্নিমান্দ্য হয়। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন যে, খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করলে তাঁর অজীর্ণ রোগ দূর হবে। খাণ্ডববন ইন্দ্রের প্রিয় ছিল। অগ্নি এর আগে সাতবার এই বন দগ্ধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সহস্র সহস্র হস্তী শুণ্ড ও নাগগণ মস্তক সাহায্যে জলসেচন করার ফলে তিনি ব্যর্থ হন। কৃষ্ণার্জুন অগ্নির সাহায্য করতে সম্মত হন, কিন্তু তাঁরা নিরস্ত্র বলে অগ্নি বরুণের নিকট থেকে অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে কৌমোদকী গদা ও সুদর্শন চক্র দান করেন। সশস্ত্র কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাণ্ডবনন দহন করতে সাহায্য করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেন। পনের দিন ধরে অগ্নি এই খাণ্ডববন দগ্ধ করেন। সেখানকার সমস্ত জীবের মধ্যে ময় নামক দানব, তক্ষক নাগের পুত্র অশ্বসেন ও চারিটি মাত্র শার্ঙ্গক পক্ষী রক্ষা পায়। (মহাভারত)

গ

গঙ্গা—(১) পুরাকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক রাজা ছিলেন। বিদর্ভরাজ-কন্যা কেশিনী ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা রানী এবং কশ্যপের কন্যা ও গরুড়ের ভগিনী সুমতি ছিলেন কনিষ্ঠা রানী। পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে তিনি হিমালয়ে সস্ত্রীক শতবর্ষ তপস্যা করে মহর্ষি ভৃগুর নিকট হতে বর লাভ করেন যে, এক স্ত্রীর বংশধর এক পুত্র হবে এবং অন্যের হবে কীর্তিমান ষাট হাজার পুত্র। কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক পুত্রের জন্ম দেন এবং সুমতি-প্রসূত একটি তুম্বাকার পিণ্ড হতে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হয়। পুত্ররা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, সগররাজা অশ্বমেধযজ্ঞ করতে উদ্যত হন। যজ্ঞাশ্ব বহির্গত হলে ইন্দ্র রাক্ষসরূপে ধারণ করে অশ্বটি অপহরণ করেন। সগরের আদেশে তাঁর ষাট হাজার পুত্র সর্বত্র অনুসন্ধান করেও যখন অশ্বের কোন সন্ধান পেল না, তখন তারা ধরিত্রীকে খনন করতে লাগল। তাতেও অশ্বের সন্ধান না পাওয়ায় বিফল মনোরথ হয়ে তারা সগরের কাছে প্রত্যাবর্তন করল। সগর ক্রুদ্ধ হয়ে পুনর্বার পৃথিবী খনন করতে বললেন। তখন সগর-পুত্রগণ বহু কষ্টে পৃথিবী খনন করে পাতালে কপিলরূপী বাসুদেবের আশ্রমে গিয়ে অশ্বটি দেখতে পেয়ে তাঁকে অশ্বাপহারক মনে করে শাস্তি দিতে গেল। তাতে কপিল সক্রোধ হুংকার দিতে ষাট হাজার সগর-সন্তান ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুত্রদের প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব দেখে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে অশ্ব ও তাঁর পুত্রদের অনুসন্ধানে পাঠান। কপিলমুনির আশ্রমে তিনি পিতৃব্যদের

ভস্মস্তূপ ও যজ্ঞাশ্বের সন্ধান পান। তিনি পিতৃব্যদের ধ্বংসের বিবরণ জ্ঞাত হন এবং আরো জ্ঞাত হন যে, স্বর্গ হতে গঙ্গাবতরণকালে গঙ্গার জল এই ভস্মের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তাঁরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্বর্গে যাবেন। অতঃপর অংশুমান অযোধ্যা হতে অশ্ব এনে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। সগররাজা গঙ্গা আনয়নের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন, কিন্তু ত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্বের পরও তিনি উক্ত কর্মে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন না। তাঁর পৌত্র অংশুমান ও অংশুমানের পুত্র দিলীপও এই কার্যে অকৃতকার্য হন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ নানা প্রকার কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে স্বর্গ হতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নের অনুমতি পান; কিন্তু গঙ্গার অবতরণকালে তাঁকে ধারণ করবার ক্ষমতা একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর পৃথিবীতে কাহারও তো ছিল না। ভগীরথ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে, মস্তকোপরি গঙ্গার স্রোত ধারণে তাঁকে সম্মত করান। ব্রহ্মার আদেশে গঙ্গা ভীষণ বেগে শিবের মস্তকে পতিত হয়ে তাঁকে পাতালে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হন। এতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর জটাজালের মধ্যে গঙ্গাকে অবরুদ্ধ করেন। ভগীরথ তখন পুনরায় তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলে, মহাদেব জটা থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করে বিন্দু সরোবরে ত্যাগ করেন। গঙ্গা তখন পশ্চিমে হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, পূর্বে সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু ও ভাগীরথের পশ্চাতে এক স্রোত—এই সাতটি স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকেন। গঙ্গার গতিপথে জহ্নুমুনির আশ্রম ও যজ্ঞের উপকরণাদি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ জহ্নু তাঁর সমস্ত জল পান করে ফেলেন। তখন দেবতারা পুনর্বার তপস্যা প্রভাবে জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করায় তিনি কর্ণদ্বারা গঙ্গাকে মুক্ত করেন। সেই থেকে গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যা জাহ্নবী নামে খ্যাত। অতঃপর সহজ সরল গতিতে গঙ্গা সমুদ্র অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সমুদ্রে পতিত হওয়ার পর ভগীরথকে অনুগমন করে পাতালে প্রবেশের পর সগরের ষাট হাজার সন্তানের ভস্মরাশি প্লাবিত করে গঙ্গা তাঁদের মুক্তি আনয়ন করেন। ব্রহ্মার বরে গঙ্গা ভগীরথের জ্যেষ্ঠা দুহিতা ও তাঁর নাম ভাগীরথী হয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম ত্রিপথগা।

(২) দেবর্ষি নারদ নানা রাগ-রাগিণীযুক্ত সঙ্গীতে অভিজ্ঞ; কিন্তু তাঁর ত্রুটির জন্য সঙ্গীতের তাল ভঙ্গ হয়ে যায়। নারদ নিজের অনভিজ্ঞতা বুঝতে পারেন না। তাই নারদের গর্ব খর্ব করবার জন্য রাগ-রাগিণীরা

বিকলাঙ্গ নরনারীর আকারে পথে পড়ে থাকে। নারদ এই পথে গমনকালে তাদের এই বিকলাঙ্গতার কারণ জিজ্ঞাসা করে নিজের অনভিজ্ঞতা ও ত্রুটির কথাই জানতে পারেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কি উপায়ে তোমাদের বিকলাঙ্গতা দূর হবে? উত্তরে তারা দেবর্ষিকে জানায় যে, মহাদেব স্বয়ং এসে সঙ্গীত শোনালে তারা আবার তাদের পূর্ব-দেহ ফিরে পাবে। তখন নারদ মহাদেবের নিকট এই কথা জ্ঞাপন করেন। মহাদেব এতে সম্মত হন, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাঁর সঙ্গীতের জন্য প্রকৃত শ্রোতা চাই। তা না হলে তিনি সঙ্গীতচর্চা করবেন না। নারদ অবগত হলেন যে, তিনি প্রকৃত শ্রোতা হবার উপযুক্ত নন। তখন মহাদেবকে প্রকৃত শ্রোতার নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নাম করেন। তপস্যার পুণ্যবলে নারদ মহাদেবের সঙ্গীত শোনবার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে নিয়ে আসেন। মহাদেবের সঙ্গীত কিছুকাল শ্রবণ করার পর রাগ-রাগিণীরা সুস্থতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মা মহাদেব কর্তৃক সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে অসমর্থ হন। বিষ্ণু তাঁর সঙ্গীতের মর্ম কিছুটা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সে কারণ তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা সঙ্গীতে একাগ্র হতে পারেন নি, সে জন্য তিনি তাঁর কমণ্ডলুতে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। তার পরে ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে গঙ্গা কেমন করে মর্ত্যে নেমে এলেন, সে কাহিনী নিয়ে প্রদত্ত হ'ল।

(৩) পর্বতরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী সুমেরু-দুহিতা মেনকার দুই কন্যা উমা ও গঙ্গা। কোন বিশেষ কারণে দেবতারা হিমালয়ের নিকট হতে গঙ্গাকে ভিক্ষা করে নেন। এই গঙ্গায় মহাদেবের বীর্য নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু গঙ্গা তা ধারণ করতে অসমর্থ হওয়ায় হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে শরবনে মহাদেব তা নিক্ষেপ করেন। দেবতা ও ঋষিরা এই রেতঃরক্ষার জন্য ছয়টি কৃত্তিকাকে প্রেরণ করেন। কৃত্তিকারা এই রেতঃ পান করে গর্ভধারণ করে, গর্ভস্থ ভ্রূণকে পোষণ করতে থাকেন ও তাঁরা ছয়টি পুত্র প্রসব করেন। ছয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এক হয়ে যায়। এই পুত্র কৃত্তিকাগণ কর্তৃক পালিত হন ও এঁর নাম হয় কার্তিকেয়। নিজের গর্ভ নিক্ষেপের পর গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান গ্রহণ করেন। সগরবংশীয় ভগীরথ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট ক'রে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন।

(৪) গঙ্গা কুরুরাজ শান্তনুর স্ত্রী ও দেবব্রত ভীষ্মের মাতা। একবার মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মহাতেজা বসুগণের পক্ষে মানবরূপে জন্মগ্রহণ

করা-অনিবার্য হয়ে উঠলে তাঁরা গঙ্গার কাছে তাঁদের জন্ম ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা পূরণ করবার জন্য গঙ্গা অপূর্ব নারীমূর্তিতে রাজা শান্তনুকে আকৃষ্ট করে তাঁর অনুনয়ে এক সর্তাধীনে শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেন। সর্ত এই ছিল যে, রাজা শান্তনু গঙ্গার কোন কার্যে বাধা দিলে সেই মুহূর্তেই গঙ্গা তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করবেন। এই সর্তে গঙ্গা শান্তনুর স্ত্রী হয়ে সাত পুত্রের জননী হন এবং জন্মমাত্রই প্রত্যেকটিকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু অষ্টম পুত্র প্রসব হতেই শান্তনু এই পুত্রের প্রাণবধে বাধা দেন। রাজার এই নিয়মভঙ্গের অপরাধে গঙ্গা বিদায় নিলেন ও বিদায়কালে তাঁর আত্ম-পরিচয় ও কর্মের হেতু জানিয়ে রাজ-আজ্ঞায় নবজাত শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং বৎসর পরে রাজোচিত শিক্ষা দিয়ে পুত্রকে শান্তনুর হস্তে অর্পণ করেন। গঙ্গার এই পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম নামে জগতে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন। (মহাভারত—আদি)

(৫) একবার গঙ্গা সোমবংশীয় রাজা জহ্নুকে পতিরূপে বরণ করার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু জহ্নুর এতে মত ছিল না। সে কারণ, গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞস্থল জলে প্লাবিত করেন। রাজা জহ্নু এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে গলাধঃকরণ করে ফেলেন। তখন মহর্ষিরা গঙ্গাকে তাঁর কন্যারূপে স্থির করে দেওয়ায় তিনি গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী। (হরিবংশ)

(৬) গঙ্গার জন্ম বিষ্ণুর দেহ থেকে হয়। তিনি বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণুর তিন স্ত্রীর নাম যথাক্রমে—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। এক সময়ে বিষ্ণু গঙ্গার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এতে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে ক্ষমা করলেও সরস্বতী তা সহ্য করতে অক্ষম হন। ফলে গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে বিরোধ ও কলহের সৃষ্টি হয়। সরস্বতী গঙ্গাকে শাপ দেন যে, তুমি নদীরূপে পরিণত হও। গঙ্গাও সরস্বতীকে অনুরূপ শাপ দেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

(৭) একবার গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাভিলাষিণী হন। শ্রীকৃষ্ণও গঙ্গার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রাধা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন ও গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করতে উদ্যত হন। গঙ্গা তা জ্ঞাত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেন। এতে সমস্ত পৃথিবী জলশূন্য হবার উপক্রম হয়। তখন দেবগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তখন গঙ্গাকে তাঁর নখাগ্র হতে নিষ্ক্রান্ত করে দেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ গঙ্গাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

গঙ্গাজ—(১)—ভীষ্ম ও কার্তিকেয়। শান্তনুর ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভজাত দেবব্রত ভীষ্ম।

(২) অগ্নিতে শিববীর্য নিক্ষিপ্ত হলে অগ্নি তা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। তা হতে কার্তিকের জন্ম হয়। সেই জন্য কার্তিকের একনাম গঙ্গাজাত।

গঙ্গাধর—গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন বলে শিবের অন্য নাম গঙ্গাধর। পিতৃপুরুষের মুক্তির জন্য ভগীরথ স্বর্গ হতে ব্রহ্মার কৃপায় গঙ্গাকে আনবার অনুমতি পেলেন, কিন্তু গঙ্গাকে ধারণ করবার ক্ষমতা এক মহাদেব ছাড়া আর কাহারও ছিল না। তাই ভগীরথের কঠোর তপস্যায় মহাদেব তাঁর মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করেন।

গদ—ইনি যদুবংশীয় বীর। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

গার্গী—বৈদিক যুগের একজন বিদুষী ঋষিকন্যা। ইনি গর্গমুনির কন্যা। বেদের অনেক সূক্ত ও মন্ত্রের রচয়িতা এই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। মিথিলার রাজা জনক একবার এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন। যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়ে এলে, দক্ষিণা দেবার সময় রাজা জনক স্থির করলেন যে, এই সুযোগে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ ও বেদজ্ঞ কে তিনি তা জেনে নেবেন। সেইজন্য তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর গোষ্ঠগৃহে সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত সহস্র গাভী বর্তমান। এই যজ্ঞসভার মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি এই সহস্র গাভী গ্রহণের অধিকারী হবেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজার দান গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেন। কারণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ঋষি। তখন রাজপুরোহিত অশ্বল প্রমুখ ঋষিগণ তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে যাজ্ঞবল্ক্যকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে থাকেন। এই সমস্ত পরীক্ষায় যাজ্ঞবল্ক্য সঠিক উত্তর দিয়ে সকলকে নিরুত্তর করে দেন।

তারপর গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচার করতে আরম্ভ করেন। রাজসভায় গার্গী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তোলেন। তখন গার্গী উত্তেজনাবশে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর প্রশ্ন করতে থাকেন এবং বৈদিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজের জন্য ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গার্গীকে প্রশ্ন করা বন্ধ করতে বলেন, নতুবা বেদবিধি অন্যায়ভাবে অতিক্রম করার অপরাধে তৎক্ষণাৎ গার্গীর মাথা খ'সে পড়বে—একথাও জানান। এর পরেও গার্গী দুইটি প্রশ্ন করেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল—আকাশ কি কারণে

ওতপ্রোত হয়ে আছে। এই প্রশ্নের উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য সহজেই দিতে সক্ষম হন। তিনি বলেন যে, সেই অনাদি অনন্ত অক্ষয় পুরুষের সঙ্গে আকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়, কিন্তু গার্গী যে বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি প্রাচীন ভারতের একজন মহীয়সী, শক্তিমতী ও ব্রহ্মবাদিনী নারী বলে পরিগণিত হন।

গর্গ্য—বৃহস্পতির বংশজাত এক মুনি বিতথের পুত্র। ইনি শিবের আরাধনা করে চৌষট্টি অঙ্গ জ্যোতিষাদিতে জ্ঞান লাভ করেন। ইনি যাদবগণের কুলগুরুরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁর পুত্র গার্গ্য ও কন্যা গার্গী। (ভাগবত) বিষ্ণুপুরাণ মতে গর্গ্য হতে শিনির জন্ম হয়। এই শিনি হতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণরা জন্মগ্রহণ করে।

গার্গ্য—মহাতপা মহর্ষি। ইনি অন্ধক ও বৃষ্ণিদের গুরু ছিলেন। ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতেন না; চিরকাল উর্ধ্বরেতা হয়ে কালক্ষেপ করতেন। ইনি বৃষ্ণিদের কুলগুরু ছিলেন এবং ঐ বংশেই বিবাহ করেন। একবার তাঁর শ্যালক গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষার জন্য তার পুরুষাঙ্গ চালনা করলে তাঁর দৃঢ়-ব্রতত্বের জন্য রেতঃস্খলন হয় না। তখন তাঁকে নপুংসক অপবাদ দেওয়া হয়। এতে গার্গ্য অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পুত্র কামনায় মহাদেবকে তুষ্ট করবার জন্য বারো বৎসর লৌহচূর্ণ খেয়ে ঘোরতর তপস্যায় রত হন। এঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বলেন যে, বৃষ্ণি ও অন্ধক ধ্বংসকারী অজেয় এক মহাতেজা পুত্র তুমি শীঘ্রই লাভ করবে। এরপর একজন যবনরাজা গার্গ্যের বরলাভের কথা জ্ঞাত হয়ে গোপালী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত করে দেন। তখন গোপালীর গর্ভে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের প্রবল শত্রু কালযবন নামক এক মহাতেজা পুত্রের জন্ম হয়। কালযবন কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এবং যবনরাজের মৃত্যু হলে পর নিজে রাজা হন। (হরিবংশ)

গজকচ্ছপ—বিভাবসু নামে একজন কোপনস্বভাব মহর্ষি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক ধন বিভাগের জন্য বার বার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুরোধ করায় বিভাবসু বিরক্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাপ দেন—'তুমি হস্তী হও'। সুপ্রতীকও জ্যেষ্ঠকে শাপ দেন, 'তুমি কচ্ছপ হও'। তারপর বহুকাল ধরে এক সরোবরে এই দুই ভ্রাতা পরস্পর যুদ্ধে রত হয়। অমৃত আনয়নের জন্য যখন গরুড় যাত্রা করেন, তখন পিতার পরামর্শে তিনি গজকচ্ছপকে এক

তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভোজন করেন।

গজাসুর—এক বিশালকায় দুর্ধর্ষ অসুর। মহেশ নামে এক রাজা একবার নারদকে তাঁর যোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করে, তাঁকে অতিক্রম করে চলে যান। এই দুর্বিনীত আচরণের জন্য নারদের অভিশাপে রাজা পরজন্মে গজাকার দানব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন ও দেবদ্বেষী হন। এই দানবের অত্যাচারে সকলে পীড়িত হয়ে পড়লে শিব এই গজাসুরকে বধ ক'রে এর চর্ম নিজের বসনরূপে ব্যবহার করেন। (স্কন্দপুরাণ)

গণ—প্রমথগণ, শিবের অনুচর ও শিবের ভৃত্যগণ। শিব ও পার্বতীর অনুচরদের 'গণ' বলা হয়। অনেক সময়ে শিবের বাহন নন্দীকে গণদের কর্তা বলা হয়েছে। এই গণরা সর্বদা শিব ও গণেশের কঠোর শাসনে থাকত। অন্যায় আচরণ করলে গণদের কৈলাস হতে পৃথিবীতে নির্বাসিত করা হ'ত।

গণদেবতা—মিলিত দেবতা। এই দেবতাদের শ্রেণী বিভাগ আছে। এঁরা সাধারণতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। (১) আদিত্য—বারো জন, (২) বিশ্ব বা বিশ্বদেব—দশ জন, (৩) বসু—আট জন, (৪) তুষিত—ছত্রিশ জন, (৫) আভাস্বর—চৌষট্টি জন, (৬) বায়ু বা অনিল—উনপঞ্চাশ জন, (৭) মহারাজিক—দুই শত কুড়ি জন, (৮) সাধ্য—বারো জন, (৯) রুদ্র—এগারো জন। এঁদের স্থান অবশ্য দেবতাদের চেয়ে নিম্নস্তরে।

গণেশ—দেবতা বিশেষ। শিব ও পার্বতীর পুত্র। গণেশ সিদ্ধিদাতা। সকল কর্মের প্রারম্ভে গণেশের পূজা করা হয়। খর্বাকৃতি দেহ, ত্রিনয়ন, চারি হস্ত এবং হস্তীর ন্যায় মস্তক। এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, তৃতীয় হস্তে গদা ও চতুর্থ হস্তে পদ্ম। মূষিক এঁর বাহন। কারণ, এই মূষিক বৃষরূপধারী ধর্মের অবতার; মহাবল ও পূজা-সিদ্ধির অনুকূল। গণেশ মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক বলে সকল দেবতার আগে পূজিত হন। দক্ষযজ্ঞে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় পার্বতী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুণ্যকব্রত অনুষ্ঠান করেন। এক বৎসর পুণ্যকব্রত করার পর বিষ্ণু প্রীত হয়ে পার্বতীকে পুত্রলাভের বর দেন। যথাসময়ে বিষ্ণুর বরে পার্বতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবতারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ইত্যাদি সকল স্থান হতে নবজাত শিশুকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শনিও আসেন। শনির স্ত্রী শনিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি যার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, তারই

বিনাশ হবে। সেই শাপ স্মরণ করে শনি এই নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অধোমুখে ছিলেন, কিন্তু পার্বতী শনিকে তাঁর পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বারংবার অনুরোধ করেন। উত্তরে শনি বলেন যে, আমি চিত্ররথের কন্যাকে বিবাহ করি। একদিন আমার স্ত্রী ঋতুস্নান করে আমার সঙ্গম প্রার্থনা করে, কিন্তু তখন আমি এমনই ধ্যানমগ্ন ছিলাম যে, স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করি নি। ফলে ঋতু বিফলে যাওয়ায় আমার স্ত্রী আমাকে শাপ দেন যে, আমি যার দিকে দৃষ্টিপাত করব তৎক্ষণাৎ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সমস্ত বিবরণ শুনেও পার্বতী শনিকে তাঁর নবজাতকের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে বলেন। শনি শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র শিশুর মুণ্ড দেহচ্যুত হয়। এই সংবাদ বিষ্ণুর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসেন। প্রথমে পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তী দেখে সুদর্শনচক্রের সাহায্যে তার মস্তক কেটে নিয়ে আসেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। গণেশ যাতে এই জন্য সকলের কাছে অনাদৃত না হন, সেজন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে, প্রথমে গণেশের পূজা না হলে তাঁরা কেহই কোন পূজা গ্রহণ করবেন না। তাই প্রত্যেক দেবকার্যে ও পিতৃকার্যেও প্রথমে গণেশ পূজিত হন।

(২) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে শিবের প্রতি কশ্যপের অভিশাপের ফলে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ হয়। একবার সূর্য মালী ও সুমালী নামে দুই শিবভক্তকে বধ করতে উদ্যত হলে শিব সূর্যকে ত্রিশূলাঘাত করেন। এই আঘাতের ফলে সূর্য চেতনাহীন হন। এর ফলে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়। সূর্যের পিতা মহর্ষি কশ্যপ পুত্রকে হতচেতন অবস্থায় দেখে শিবকে অভিশাপ দেন যে, তাঁর পুত্রের মস্তক ছিন্ন হবে। এই অভিশাপের ফলে গণেশ নিজের মুণ্ড হারান ও ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর মস্তক তাঁর মস্তকোপরি স্থাপন করে দেওয়া হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গণেশের একটি দাঁত সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে—পরশুরাম ত্রিসপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কৈলাসে আসেন। তখন শিব ও পার্বতী অন্তঃপুরে নিদ্রিত ছিলেন। গণেশ দ্বাররক্ষক হয়ে পরশুরামকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দেন। বাধা দেওয়ায় গণেশ ও পরশুামের মধ্যে ভীষণ -যুদ্ধ হয়। পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উৎপাটিত হয়। তাই গণেশকে একদন্ত বলা হয়।

(৩) স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে এইরূপ উপাখ্যান আছে যে, সিন্দুর নামে

এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসে প্রবেশ করে গণেশের মস্তক কর্তন করে। এতে বালকের জীবননাশ হয় না। জন্মগ্রহণ করার পর নারদ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, গণেশ এই বিবরণ জানান। তখন নারদ তাঁকে নিজেই নিজের মস্তক সংগ্রহ করতে বলেন। বালক তখন আপন তেজে গজাসুরের মাথা কেটে নিজের দেহে যোগ করেন। সেই হতে গণেশের নাম হয় গজানন।

গণেশ-জন্মের আর একটি উপাখ্যান এই যে, পার্বতীর দিব্য গাত্র-মল থেকে গণেশের জন্ম হয়। মহাদেব পার্বতীকে প্রীত করবার জন্য একটি গজমস্তক এঁর মস্তকহীন দেহে সংশ্লিষ্ট করেন। মহাদেবের করুণায় ইনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন এবং মাতা পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করে পাদবন্দনা দ্বারা আপন মহিমা ও পরম জ্ঞান-ভক্তি প্রকাশ করেন। পার্বতী ও মহাদেবের বরে ইনি গণের অধিপতি, বিঘ্ন-বিনাশক ও সর্বসিদ্ধি-দাতা রূপে গণ্য হন।

গণেশ সর্বদা তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। তুলসী এঁকে পতিরূপে পাবার জন্য আকাঙ্খা করেন; কিন্তু গণেশ তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁর বিকল-চিত্তের জন্য দানব-পত্নী হবেন বলে অভিশাপ দেন। এর প্রত্যুত্তরে তুলসী দেবীর অভিশাপে বিবাহ-বিরত গণেশকে পুষ্টি নামক এক কন্যাকে বিবাহ করতে হয়।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থের লিপিকারের অভাবে চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে গণেশের শরণাপন্ন হতে বলেন। গণেশ মহাভারতের লেখক হতে রাজী হন এক শর্তে। শর্তটি হচ্ছে—তিনি যখন মহাভারত লিখতে আরম্ভ করবেন, তখন লেখার আর কোন বিরতি ঘটতে দেওয়া হবে না। ব্যাসদেবও গণেশকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নেন যে, কোন শ্লোক লেখার পূর্বে তার সম্পূর্ণ অর্থ গণেশকে ভাল করে বুঝে তবে লিখতে হবে। এতে ব্যাসদেবের সুবিধাই হয়। তিনি দুরূহ শ্লোক সৃষ্টি করে গণেশের লেখায় মাঝে মাঝে দেরী করিয়ে দিতেন এবং সেই অবসরে নূতন নূতন শ্লোক তৈরী করে ফেলতেন। এই ভাবে সমগ্র মহাভারত লিখিত হয়।

গদাধর—বিষ্ণুর অন্য নাম। গদাসুর বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হওয়ায় বিশ্বকর্মা তার হাড় সংগ্রহ করে আদ্যগদা নির্মাণ করে বিষ্ণুকে প্রদান করেন। বিষ্ণু ঐ আদ্যগদা দিয়ে হেতি প্রমুখ রাক্ষসদের বিনাশ করে গদাধর নামে প্রখ্যাত হন। (অগ্নিপুরাণ)

গন্ধমাদন—হিমালয়ে স্বর্ণময় ঋষভ-পর্বত ও কৈলাসপর্বতের মধ্যস্থিত দীপ্তিমান ঔষধিপর্বত। এই পর্বতের

শীর্ষদেশে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী—এই চার প্রকার মহৌষধি জন্মগ্রহণ করত। হনুমান রাম-রাবণের যুদ্ধকালে দুইবার ঔষধিপর্বত উৎপাটন করে আনেন। প্রথমবার ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করে রাম-লক্ষ্মণ শল্য-মুক্ত হন ও বানরেরা সুস্থ হয়। পরে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মৃতপ্রায় হলে হনুমান ঔষধি চিনতে না পেরে ঔষধি-শৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসেন। এই ঔষধি মৃতকল্পকে জীবন দান করে। ঔষধি-বৃক্ষের গন্ধ সকলকে মত্ত করে বলে এই পর্বতের নাম গন্ধমাদন। (রামায়ণ)

গন্ধর্ব—স্বর্গীয় গায়ক। দেবযোনি বিশেষ। এদের বাসস্থান গুহ্যকলোক ও বিদ্যাধরলোকের মধ্যে। এরা অতিশয় রূপবান, স্বর্গলোকে এদের চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই। বৈদিক যুগে গন্ধর্বরা ছিল স্বর্গের উচ্চশ্রেণীর উপদেবতা; কিন্তু এরা পরে সংখ্যায় বর্ধিত হয়ে নিম্নশ্রেণীর দেবতায় পরিণত হয়। এ ছাড়া, এরা ঔষধি বিষয়েও বিশেষ অভিজ্ঞ এবং দেবতাদের বিশ্বস্ত অনুচরও ছিল। এরা সোমরসের রক্ষাকর্তা ও প্রস্তুতকারক। সোমরস সকল প্রকার ব্যাধিমুক্ত করতে সক্ষম হ'ত ব'লে এদের স্বর্গীয় বৈদ্য বলা হ'ত। এরা সূর্যের অশ্ব-চালনা করত এবং অগ্নি ও বরুণের দাস ছিল। গায়ক ও বাদক হিসাবেও দেবতাদের সর্বপ্রকার উৎসবে এরা যোগদান করত এবং অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়ও ছিল।

এদের মধ্যে নরনারীর অবাধ মেলামেশা ছিল এবং তদবস্থার পরিণতিতে স্ত্রীলোকের প্রতি এদের বিশেষ আসক্তি ছিল। পুরাণে গন্ধর্বদের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। বেদের পরবর্তী যুগে অপ্সরারা এদের স্ত্রীরূপে বা সঙ্গিনীরূপে বাস করত। ইন্দ্রসভায় অপ্সরাদের সাথে এরা স্বর্গের গায়ক হিসাবে যোগদান করত। অন্তরীক্ষে সচ্ছন্দ-গতিতে ও আনন্দে এরা বিচরণ করতে সক্ষম ছিল। কখনও কখনও সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বরা পৃথিবীতে অবরোহণ করত। তাদের নাম হ'তেই গান্ধর্ব-বিবাহের প্রথা এই মর্ত্যলোকে প্রচলিত হয়। নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিবাহ হয়, তাই গান্ধর্ব-বিবাহ। কারণ, বায়ু দেবতাই এই বিবাহের একমাত্র সাক্ষী এবং উপকরণ।

বিষ্ণুপুরাণের মতে এরা ব্রহ্মার কান্তি থেকে জন্মগ্রহণ করছে। অন্য মতে কশ্যপের দুই স্ত্রী মুনি ও প্রধার গর্ভে ষোলটি ও দশটি গন্ধর্বের জন্ম হয়। হরিবংশ মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ব জন্মগ্রহণ করে। গন্ধর্বদের সমৃদ্ধশালী নগরী ও প্রাসাদ ছিল। হাহা, হুহু, চিত্ররথ,

হংস, বিশ্ববায়ু, সোমায়ু, তুম্বুরু, নন্দি প্রভৃতি বিখ্যাত গন্ধর্ব।

গন্ধর্ববেদ—সঙ্গীতশাস্ত্র গন্ধর্ববেদ নামে কথিত হয়ে থাকে এবং সঙ্গীতবিদ্যাকে গন্ধর্ববিদ্যা বলা হয়ে থাকে।

গন্ধর্বলোক—গুহ্যকলোকের উপরে ও বিদ্যাধরলোকের নিচে অবস্থিত একটি স্থান। এই স্থানে দেবগায়ক গন্ধর্বরা বাস করে।

গন্ধবতী—মৎস্যগন্ধা, ব্যাসের মাতা। এঁর অন্য নাম সত্যবতী। মহাভারতে কথিত আছে, ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা পিতার আদেশে নদীতে নৌকা পারাপার করত। একদিন পরাশর মুনি নদী পার হবার সময় মৎস্যগন্ধাকে দেখে কামাতুর হন এবং মৎস্যগন্ধার গায়ের দুর্গন্ধে তাঁকে গ্রহণ করতে না পেরে তপোবলের সাহায্যে সুগন্ধযুক্তা করেন। সেই থেকে এর নাম হয় গন্ধবতী।

গয়—(১) সুগ্রীবের বানর অনুচর। সুগ্রীবের আহ্বানে ইনি অসংখ্য বানর সেনার সহিত সীতার অন্বেষণে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। (রামায়ণ)

(২) একজন ধার্মিক রাজা—রাজা অমূর্তরয়ের পুত্র। ইনি শতবর্ষ পর্যন্ত কেবল আহুতি-অবশিষ্ট খেয়ে অগ্নির উপাসনা করতেন। এতে অগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে গয়কে বর দিতে চান। গয় বর প্রার্থনা করেন, তিনি যেন বেদ অধ্যয়ন করবার অধিকার পান। অগ্নি তাঁকে এই বর দান ক'রে প্রস্থান করেন। অগ্নির বরে গয় পৃথিবীর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। দিন দিন তিনি ধর্মনিষ্ঠ হতে থাকেন। এর পর তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গয়ের যজ্ঞফলে যে একটি বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তা অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ।

(৩) বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত অসুর। এর নামানুসারেই গয়াতীর্থের নামকরণ হয়েছে। বিষ্ণুর নিকট হতে বরলাভের জন্য অসুর গয় কঠোর তপস্যায় রত হয়। এর কঠোর তপস্যায় দেবতারা ভীত হয়ে পড়েন, পাছে তাদের নিজ নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এর একটা বিধান প্রার্থনা করেন। ঠিক হয় যে, গয়কে একটি বর দান করে, তপস্যা হতে বিরত করানো। গয় রাজ্য ও ঐশ্বর্য না চেয়ে বললে, আমার শরীর যেন ব্রাহ্মণ, তীর্থশীলা, দেবতা, মন্ত্র, যোগী প্রভৃতি সমস্ত পবিত্র পদার্থ থেকেও পবিত্র হয়। বরলাভ করে এর দেহ দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, কর্মী ও ধর্মীদের চেয়েও পবিত্রতম হয়। এর পবিত্র দেহ দর্শন মাত্র সকলে বৈকুণ্ঠে গমন করতে থাকে, ফলে দেশ জনশূন্য হয়ে যায়। যমপুরীতে যাবার লোকের অভাব ঘটে। যম এই বিবরণ বিষ্ণুকে জ্ঞাপন করলে, দেবতারা গয়াসুরকে নিশ্চল

করবার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন। একদিন দেবতারা গয়াসুরের কাছে গিয়ে তার শরীর ভিক্ষা করেন। গয়াসুর সম্মত হওয়ায় এক প্রকাণ্ড শিলা তার উপর স্থাপন করে দেবতারা সেই শিলার উপর অবস্থান করেন। এতেও গয়াসুর নিশ্চল না হওয়ায় বিষ্ণু তার বক্ষোপরি স্থাপিত শিলায় আসীন হন। তখন গয়াসুর সমূহ ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে নিশ্চল অবস্থায় দেবতাদের বলে যে, তার সঙ্গে এ কৌশলের কোন আবশ্যক ছিল না; কারণ, সে কখনো দেবগণের অবাধ্য হয়নি। দেবতারা গয়াসুরের বিনয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রদানে সম্মত হন। তখন গয়াসুর এই বর প্রার্থনা করে যে, যে পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য বা পৃথিবী থাকবে, সে পর্যন্ত দেবতারা তার বুকের উপর স্থাপিত থাকবেন। এইরূপে গয়া অতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

গরুড়—ঋষি কশ্যপ ও তার স্ত্রী বিনতার পুত্র; পক্ষিরাজ ও বিষ্ণুর বাহন। কশ্যপ-পত্নী বিনতা যে অণ্ডদ্বয় প্রসব করেছিলেন, তার একটি অকালে ভগ্ন হওয়ায় নিম্নাঙ্গহীন অরুণের জন্ম হয়। অপর ডিম্ব অসময়ে ভগ্ন না হয়ে যথাসময়ে সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য অপেক্ষারত থাকায়, বহু শত বৎসর পরে উক্ত অণ্ড হতে গরুড়ের জন্ম হয়। নাগজননী বিমাতা কদ্রু এঁর মাতাকে কপট উপায়ে দাসী করে রাখেন বলে গরুড় সর্পদের প্রধানতম শত্রু। ইনি অর্ধপক্ষী ও অর্ধমানব। শ্বেতবর্ণ মুখ, রক্তবর্ণ পক্ষ ও স্বর্ণাভ দেহ। পক্ষীর ন্যায় চঞ্চু ও নখর। এঁর পুত্রের নাম সম্পাতি। মাতা বিনতাকে কদ্রুর দাসীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য গরুড় স্বর্গ হতে অমৃত আনয়নের জন্য গমন করেন। যাত্রাপথে ক্ষুধিত হয়ে পড়ায় পিতা কশ্যপের কাছে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রার্থনা করেন। তখন পিতা দূরে এক জলাশয়ে যুদ্ধরত দুই ভাই বিভাবসু ও সুপ্রতীক—যারা পরস্পরের অভিশাপে গজকচ্ছপে পরিণত হয়েছে, তাদের দেখিয়ে আহার করতে বলেন। পিতার আদেশে গরুড় দুই ভাইকে দুই নখে ধারণপূর্বক এক বটবৃক্ষশাখায় গিয়ে বসেন। এঁদের ভারে বটবৃক্ষের শাখা ভগ্ন হয়। উক্ত শাখায় তখন তপস্যারত অঙ্গুলিপ্রমাণ বালখিল্য ঋষিরা অধোমুখে লম্বমান ছিলেন। ভূমিতে পতিত হলে আহত ঋষিদের অভিশাপের ভয়ে গরুড় ওষ্ঠদ্বারা শাখাটি ধারণ করে পিতা কশ্যপের নিকট উড়ে গিয়ে উপদেশ চান। কশ্যপের অনুরোধে বালখিল্য ঋষিগণ শাখা ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন। কশ্যপের পরামর্শে এক নির্জন পর্বতে গরুড় সেই শাখা নিক্ষেপ করে অপর এক পর্বতশৃঙ্গে বসে গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করেন। আহারে তৃপ্ত হয়ে গরুড় যখন

স্বর্গের দিকে অগ্রসর হন, তখন সশস্ত্র দেবগণ গরুড়কে বাধা দিতে আসেন এবং তাঁকে দেখে ভয়ে পরস্পরকেই অস্ত্রাঘাত করে বসেন। অমৃতরক্ষক বিশ্বকর্মা গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভূপতিত হন। গরুড় দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্ণময় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে অমৃতের কক্ষে প্রবেশ করেন। সেখানে অগ্নিবেষ্টিত হয়ে অমৃত ছিল ও তার নিকট একটি ঘূর্ণামান ক্ষুরচক্র পথ রুদ্ধ করে ছিল। গরুড় সংকুচিত দেহে চক্রের তারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন এবং অমৃত রক্ষার জন্য যে দুই ভীষণ সর্প চক্রের নিম্নে ছিল, তাদের বধ করে অমৃত নিয়ে আকাশ-পথে বিষ্ণুর সমীপস্থ হন। অমৃত পানের লোভ সংবরণ করায় বিষ্ণু প্রীত হয়ে গরুড়কে বর দিতে চাইলে গরুড় অমৃত পান না করেই অমরত্ব প্রার্থনা করেন ও বিষ্ণুর রথের উপরে থাকার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। বিষ্ণু তথাস্তু বলায় গরুড়ও বিষ্ণুকে তাঁর নিকট বর প্রার্থনা করতে বলেন। বিষ্ণু তখন গরুড়কে তাঁর বাহন হ'তে ও তাঁর রথধ্বজে অধিষ্ঠান করতে বলেন। গরুড়ও তথাস্তু বলে প্রস্থান করেন। ইন্দ্র তখন অমৃত কেড়ে নেবার জন্য তাঁর প্রতি বজ্রাঘাত করেন। দধীচির অস্থি ও ইন্দ্রের সম্মানার্থ গরুড় একটি পালক মাত্র নিক্ষেপ করেন। গরুড়ের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করে ইন্দ্র অমৃত ফিরে চান। গরুড় তখন বলেন যে, বিশেষ কারণে তিনি অমৃত নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে অমৃত রাখা হবে সেখান থেকে ইন্দ্র ইচ্ছা করলে উহা অপহরণ করতে পারেন। তখন ইন্দ্র তাঁকে বর দিতে চাইলে গরুড় সর্পগণকে তাঁর ভক্ষ্যরূপে প্রার্থনা করেন। গরুড় অতঃপর বিনতা ও সর্পদের কাছে অমৃত আনয়নের সংবাদ দিয়ে কুশের উপর অমৃত স্থাপন করে সর্পদের স্নান করে আসতে বলেন এবং মাতার মুক্তি প্রার্থনা করেন। সর্পগণ বিনতাকে মুক্তি দিয়ে স্নান করতে গেলে ইন্দ্র অমৃত হরণ করেন এবং সর্পগণ ফিরে এসে অমৃত না পেয়ে কুশ লেহন করার ফলে তাদের জিহ্বা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। (মহাভারত—আদি)

একবার ইন্দ্র-সারথি মাতলি তাঁর কন্যা গুণকেশীর সহিত নাগবংশীয় সুমুখের বিবাহ দিতে চান; কিন্তু সুমুখ একমাস পরে গরুড়ের ভক্ষ্য হবেন জেনে মাতলি সুমুখকে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর কাছে সমুহ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। বিষ্ণু সুমুখকে অমৃত পান করিয়ে অমরত্ব দান করার জন্য ইন্দ্রকে বলেন। ইন্দ্র সুমুখকে অমৃত না দিয়েই দীর্ঘায়ু করে দেন। এই সংবাদ পেয়ে গরুড় ইন্দ্রকে বলেন যে, তিনিই নাগদের ভক্ষণ করার বর দান করে এক্ষণে বাধা দান করছেন কেন? ইন্দ্র তখন বলেন যে, বিষ্ণুই

সুমুখকে অভয় দিয়েছেন। গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুর কাছে আস্ফালন করেন যে, আমি আমার পক্ষের একাংশ দিয়েই তোমাকে ধারণ করি। বিষ্ণু তাঁর কাছে গরুড়কে অনর্থক আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করতে নিষেধ করেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি গরুড় তাঁর বাম বাহুর ভার বহন করতে সক্ষম হন তবেই তাঁর গর্ব সার্থক হবে। এই বলে তাঁর বাম বাহু গরুড়ের উপর রক্ষা করা মাত্রেই গরুড় হতচেতন হয়ে ভূমিতে নিপতিত হন এবং বিষ্ণুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তখন পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বিষ্ণু সুমুখকে গরুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করেন। সেই হতে গরুড় সুমুখকে হিংসা করা থেকে বিরত হন। (মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব)

অন্যত্র লিখিত আছে, কশ্যপ পুত্রেচ্ছু হয়ে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র, বালখিল্য মুনিগণ ও দেবতারা যজ্ঞের কাঠ আনবার জন্য নিযুক্ত হন। ইন্দ্র খুব বড় বড় পর্বত প্রমাণ কাঠ আনতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্যরা সকলে মিলিতভাবে একখানি পলাশপত্র বয়ে নিয়ে যান। এতে ইন্দ্র বালখিল্যদের উপহাস করেন। এর ফলে, বালখিল্যরা অত্যন্ত অপমানিত ও রাগান্বিত হয়ে অন্য কোন দেবতাকে ইন্দ্রত্বে অধিষ্ঠিত করার জন্য সংকল্প করেন। ইন্দ্র ভীত হয়ে কশ্যপের শরণাপন্ন হন। কশ্যপ তখন বালখিল্যদের বলেন যে, ব্রহ্মার নির্দেশে ইনি ইন্দ্র হয়েছেন, এদিকে তোমরাও অন্য এক ইন্দ্র চাও। ব্রহ্মার বাক্য অন্যথা হবার নয়, তোমাদের সংকল্পও মিথ্যা হবার নয়। তাই তোমাদের ইন্দ্র পক্ষীদের ইন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। এতে বালখিল্যরা রাজী হন। এই সময় দক্ষকন্যা বিনতা পুত্রলাভের জন্য নিজ স্বামীর কাছে এলে, কশ্যপ বলেন যে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি পৃথিবীশ্রেষ্ঠ দুই পুত্র প্রসব করবে। বালখিল্যদের তপস্যা ও আমার সংকল্পের ফলে এরা পক্ষীদের ইন্দ্র হবে। যথাকালে বিনতা অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। অরুণ বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে সূর্যদেবের কাছে যান এবং গরুড় পক্ষীদের ইন্দ্রত্বলাভ করেন।

গরুড় বিভিন্ন নামে পরিচিত। পিতামাতার নাম থেকে গরুড়ের দুই নাম কাশ্যপী ও বৈনতেয়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তিনি একটি সুন্দর স্বর্ণময় পালক ফেলে দিয়েছিলেন বলে সুপর্ণ নামেও তিনি পরিচিত। এতদ্‌ব্যতীত রক্তপক্ষ, সুবর্ণকায়, গগনেশ্বর, খগেশ্বর খগরাজ, খগপতি, কামযুধ, বিষ্ণুরথ, সুধাহর, সুরেন্দ্রজিৎ (ইন্দ্রকে জয় করার জন্য), বজ্রজিৎ (ইন্দ্রের বজ্র ভগ্ন করার জন্য) প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও গরুড়ের নাম নামাঙ্কিত।

রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগ-

পাশে বদ্ধ হলে, গরুড় এসে এঁদের মুক্ত করেন।

গরুড়পুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত সপ্তদশপুরাণ। এতে চিকিৎসাদি শাস্ত্র বিবৃত হয়েছে।

গায়ত্রী—ঋগ্বেদের পবিত্রতম মন্ত্র। দ্বিজগণের উপাস্য বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই মন্ত্র দ্বারা সূর্যকে মনে মনে ধ্যান করতে হয়। মন্ত্রটি এই—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। (ঋগ্বেদ, ৩য় মণ্ডল, ৫ম অধ্যায়, ৬২ সূক্ত)। এই মন্ত্রগুলি সাবিত্রীর (সূর্য) উদ্দেশ্যে লিখিত। গায়ত্রীর অর্থ—সর্বলোক-প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণমণ্ডল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করছেন। দেবীরূপে এই সবিতা ব্রহ্মার স্ত্রী এবং চতুর্বেদের মাতা। গায়ত্রী পাঠে মানুষ পরিত্রাণ পায়। গায়ত্রীর শক্তিতে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন। যাঁরা এই মন্ত্র পাঠ বা গান করেন, তাঁরা ত্রাণপ্রাপ্ত হন বলে এই মন্ত্রটির নাম গায়ত্রী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বেদ-পারদর্শী আচার্যের কাছে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন; তখন তাঁদের পুনর্জন্ম হয় এবং তখন তাঁরা দ্বিজ বলে অভিহিত হন। তাঁদের ত্রিসন্ধ্যায় পবিত্রভাবে গায়ত্রী জপ করে উপাসনা করতে হয়। গায়ত্রী একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও তিন বেদ। গায়ত্রী গীতকারীদের ত্রাণ করেন বলে গায়ত্রী নামে অভিহিতা।

গাধি—ইনি রাজা কুশির পুত্র, কুশনাভের পৌত্র ও বিশ্বামিত্রের পিতা। হরিবংশে লিখিত আছে—রাজা কুশি ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করলে ইন্দ্র ভীত হয়ে তাঁর কাছে এসে কিছু না বলে চলে যান। তারপর সহস্র বৎসর পরে আবার ইন্দ্র এঁকে দেখে যান। কুশির উগ্র তপস্যা দেখে ইন্দ্র এঁর পুত্রজন্মের জন্য নিজ অংশ দান করেন। কুশির স্ত্রী পৌরকুৎসীর গর্ভে ইন্দ্রের অংশে গাধি জন্মগ্রহণ করেন।

গাঙ্গেয়—কুরুবংশের রাজা শান্তনুর প্রথমা স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। সেই হতে ভীষ্মের আর এক নাম হয় গাঙ্গেয়।

গান্ধার—সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হতে আফগানিস্থানের অধিকাংশকে পুরাকালে গান্ধারদেশ বলা হ'ত। বর্তমান কান্দাহার প্রাচীন গান্ধার নগরী।

গান্ধিনী—কাশীরাজের কন্যা এবং যদুবংশের শ্বফল্কের স্ত্রী ও অক্রূরের মাতা। হরিবংশ মতে—এঁর নাম নিরুক্তি। ইনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদের গোদান করতেন বলে এঁর নাম হয়েছে গান্ধিনী। ইনি মাতার গর্ভে

বহু বৎসর বাস করেন। বহুদিন ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় এঁর পিতা এঁকে শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হতে বলেন। কন্যা উত্তর দেন, প্রতিদিন গোদান করতে পেলে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। পিতা এই কথা স্বীকার করলে পর তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। এই গান্ধিনীর গর্ভে শ্বফল্কের ঔরসে অক্রূর নামে এক পুত্র হয়। (হরিবংশ)

গান্ধারী—গান্ধার দেশের রাজা সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী ও দুর্যোধনাদির মাতা। গান্ধারদেশের কন্যা বলে এঁর নাম গান্ধারী। গান্ধার-রাজ সুবল গান্ধারীকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করতে ইচ্ছা করে যথাসময়ে বিবাহ দেন। গান্ধারী সুন্দরী ও শিক্ষিতা হলেও, মাতাপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি না করে, জন্মান্ধ স্বামীর হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। জন্মান্ধ স্বামীকে অতিক্রম করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করে গান্ধারী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সর্বদা নিজের চোখ বেঁধে রাখতেন। ব্যাসদেব বর দিয়েছিলেন যে, গান্ধারীর শত পুত্র হবে। যথাকালে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দুই বৎসরের পরেও তাঁর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। এদিকে কুন্তীর সূর্যতুল্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে শুনে দুঃখিত হয়ে, ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করেন। ফলে, তাঁর গর্ভ হতে একটি লৌহ-কঠিন মাংসপিণ্ড নির্গত হল। গান্ধারী তা অচিরাৎ বিনষ্ট করতেন, কিন্তু ব্যাসদেবের পরামর্শে তিনি সেই মাংসপিণ্ড শীতল জলে সিক্ত ক'রে একশত ভ্রূণে বিভক্ত করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘৃতপূর্ণ কলসীতে রাখা স্থির করেন। এর একবৎসর পরে দুর্যোধন এবং এক বৎসর এক মাসের মধ্যে দুঃশাসন, দুঃসহ প্রভৃতি শত পুত্র ও দুঃশলা নামে একটি কন্যার জন্ম হয়। দুর্যোধন আশৈশব পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধি ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞাদির আড়ম্বর দেখে দুর্যোধনের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। পিতা ও আত্মীয়গণের নিষেধ সত্ত্বেও মাতুল শকুনির প্ররোচনায় পিতাকে দিয়েই তিনি যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানান। কপট-দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও দ্রৌপদিকে সভামধ্যে অপমানিত করার পর গান্ধারী একাধিকবার দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেন, কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সে অনুরোধের কোন ফল হয় না। নিজ পুত্রের অন্যায় আচরণের জন্য গান্ধারী কোনদিন দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে মার্জনা করতে পারেন নি। একমাত্র দুর্যোধন হতেই যে কৌরবকুল ধ্বংস হবে, তা তিনি পূর্বেই জ্ঞাত হন এবং সেই জন্যই পুত্রকে ত্যাগ করবার

জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেন। পণ-মুক্ত পাণ্ডবদের প্রাপ্য অর্ধরাজ্য দান করে সন্ধিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন গান্ধারী। বার বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবগণ যখন তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করেন, তখন গান্ধারী রাজসভায় এসে দুর্যোধনকে সন্ধির উপদেশ দিয়ে তিরস্কার করে বলেন যে, ধর্মহীন ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির চেষ্টা পরিণামে মৃত্যু আনয়ন করে। কিন্তু দুর্যোধন মাতৃবাক্য অবজ্ঞা করে সভা ত্যাগ করেন। গান্ধারীর হিতবাক্য বৃথাই যায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন যখন মাতা গান্ধারীর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে আসেন, তখন তিনি শুধু এই কথাই বলেন যে, 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ।' অর্থাৎ যেখানে ধর্ম, যেখানেই জয়। আঠারো দিন যুদ্ধের প্রত্যেকদিন এই কথা তিনি দুর্যোধনকে শুনিয়ে এসেছেন। আঠারো দিন যুদ্ধের পর এগারো অক্ষৌহিণী কৌরব সেনা ধ্বংস হলে, এবং গদাযুদ্ধে ভগ্নজানু দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রাণ ত্যাগ করলে, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। কৃষ্ণ গান্ধারীকে বলেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গান্ধারীর মহাবাক্য 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ' সপ্রমাণ হয়েছে; সুতরাং গান্ধারী যেন শোক হতে নিবৃত্ত হন। কৃষ্ণের বাক্যে গান্ধারী কিয়ৎকাল প্রকৃতিস্থ থেকে, পরে কৃষ্ণের সম্মুখেই আপন পরিধেয় বস্ত্রে মুখ আবৃত করে পুত্রশোকে বিলাপ করতে থাকেন। শতপুত্রহারা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র ও পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে রণভূমিতে আসেন ও দিব্যচক্ষে রণভূমির ধ্বংসলীলা দেখে পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন বেদব্যাস এসে তাঁকে শান্ত করেন এবং ভীম তাঁর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। অবশেষে গান্ধারী সক্রোধে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাভিলাষী হন। কম্পিত কলেবরে যুধিষ্ঠির এসে কৃতাঞ্জলিপুটে গান্ধারীর অভিশাপ নিতে প্রস্তুত হন এবং বলেন যে, তিনিই তাঁর পুত্রহন্তা, তাঁকে শাপ দিলে তিনি তা মাথা পেতে নেবেন। এই বলে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পাদস্পর্শ করতে অবনত হলে, গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণ-বস্ত্রের অন্তরাল হতে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখতে পান। ফলে, যুধিষ্ঠিরের নখগুলি কুৎসিত হয়ে যায়। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধ নিবারণ না করায়, কৃষ্ণকে গান্ধারী এই বলে অভিশাপ দেন যে, পতিসেবা ফলে অর্জিত পুণ্যের বলে আমি তোমাকে অভিসম্পাত করছি যে, আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে তুমিও পুত্র, বন্ধু, ও স্বজন হারিয়ে বনমধ্যে নিকৃষ্টভাবে নিহত হবে এবং যাদবনারীগণও কুরু

ও পাণ্ডবপক্ষীয় নারীদের মত ক্রন্দন করবে। গান্ধারীর এই অভিসম্পাত যথাকালে কার্যকরী হয়েছিল।

পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের পর পনের বৎসরকাল ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পাণ্ডবদের আশ্রয়ে বাস করেন। পাণ্ডবগণ সর্বপ্রকারেই তাঁদের সম্মান করতেন। কেবল ভীম গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করতেন ও তাঁর অপ্রিয় কার্য করতেন। অবশেষে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে গঙ্গাতীরে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে আসেন। কুন্তি, বিদুর ও কৌরব রমণীগণও তাঁদের সঙ্গে আসেন। এইখানে আশ্রম নির্মাণ করে গান্ধারী সকলের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। ব্যাসদেব একদিন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে গান্ধারীর অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের শোক লাঘবের জন্য তিনি তাঁর অলৌকিক তপস্যা বলে কুরুক্ষেত্রের সমূহ যোদ্ধাদের একদিনের জন্য পুনর্জীবিত করে সকলকে দেখান। বনবাসকালে গান্ধারী কেবলমাত্র জল পান করে তপস্যা করতেন। অবশেষে বাণপ্রস্থের তৃতীয় বৎসরে তাঁরা অরণ্যে প্রবেশ করে বাস করতে থাকেন। একদিন অকস্মাৎ সেখানে দাবানল প্রজ্বলিত হয় এবং সেই দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তী সমভিব্যাহারে পূর্বাস্য হয়ে উপবেশনপূর্বক গান্ধারী প্রাণবিসর্জন করেন।

গালব—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য। অধ্যয়ন ও গুরুর পরিচর্যা সমাপনান্তে শিষ্য গালবকে বিশ্বামিত্র গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। তখন গালব গুরুদক্ষিণা দিতে চান এবং বার বার গুরুদক্ষিণা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করায় বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তিনি আটশত এমন অশ্ব গুরুদক্ষিণা চান, যাদের কান্তি চন্দ্রের মত শুভ্র এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ। এতে গালব চিন্তিত হয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন। তখন গালবের বন্ধু গরুড় এসে তাঁকে সাহায্য করতে চান। অবশেষে রাজা যযাতির কাছে গিয়ে গরুড় গালবের গুরুদক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করেন। পূর্বের মত তিনি এখন আর ধনবান নন বলে যযাতি এতগুলি অশ্ব গালবকে দান করতে অসমর্থ হন, কিন্তু অন্য প্রকারে রাজা গালবের এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। রাজা যযাতি গালবের হাতে তার কন্যা মাধবীকে দান করে বলেন যে, এই কন্যাকে নিয়ে রাজাদের হস্তে সমর্পণ করলে কন্যার শুল্কস্বরূপ তাঁরা আটশত অশ্ব নিশ্চয় তাঁকে দান করবেন ও তিনিও দৌহিত্র লাভ করবেন। তখন গালব মাধবীকে নিয়ে অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে যান। সন্তানার্থী রাজা হর্যশ্ব বলেন যে, শুল্কস্বরূপ দানের

মত তাঁর মাত্র দুইশত অশ্ব আছে, এবং তিনি এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করতে চান। তখন মাধবী গালবকে বলেন যে, "এক মুনি আমাকে বর দিয়েছেন, তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার কুমারী হবে। অতএব আপনি দুই শত অশ্ব গ্রহণ করে আমাকে এঁর হাতে দান করুন। এর পরে আরো তিন জন রাজার কাছে আমাকে দান করলে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ হবে এবং আমারও চার পুত্র লাভ হবে।" এই কথা শুনে গালব হর্যশ্বের হাতে মাধবীকে দান করে দুই শত অশ্ব গ্রহণ করেন। যথাকালে হর্যশ্ব বসুমনা নামে একটি পুত্রলাভ করেন। তখন রাজার কাছে এসে গালব প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করতে বলেন। হর্যশ্ব মাধবীকে প্রত্যর্পণ করলে মাধবীও পুনরায় কুমারী হন। তারপর গালব মাধবীকে একে একে কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে নিয়ে যান। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁদের পুত্রদের নাম হয় প্রতর্দন ও শিবি।

এরপর গরুড় গালবকে বলেন যে, মহর্ষি ঋচিক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এইরূপ সহস্র অশ্ব শুল্ক দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এর মধ্যে থেকে হর্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর প্রত্যেকে দুইশত ক'রে অশ্ব ক্রয় করেন। অবশিষ্ট চার শত অশ্ব পথে চুরি হয়। সে কারণ, বাকী চার শত অশ্ব আর পাওয়া যাবে না; এই ছয় শত অশ্বই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও। অতঃপর বিশ্বামিত্রের কাছে গমন করে গালব এই ছয় শত অশ্ব দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করতে বলেন এবং অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের পরিবর্তে মাধবীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনজন রাজর্ষি মাধবীর গর্ভে তিনটি ধর্মপুত্র উৎপাদন করেছেন, চতুর্থপুত্র আপিনি উৎপাদন করুন। বিশ্বামিত্র মাধবীকে গ্রহণ করেন এবং যথাকালে অষ্টক নামে মাধবীর অপর একটি পুত্র হয়। পরে বিশ্বামিত্র এই পুত্রকে ধর্ম, অর্থ ও অশ্বগুলি দান করে এবং শিষ্য গালবের হস্তে মাধবীকে দিয়ে বনগমন করেন। গালব পরে গরুড়ের পরামর্শ নিয়ে মাধবীকে তাঁর পিতা যযাতির হস্তে প্রত্যর্পণ করে বনে তপস্যা করতে প্রস্থান করেন। যযাতি মাধবীর জন্য স্বয়ংবর সভায় ব্যবস্থা করেন, কিন্তু মাধবী প্রত্যাখ্যান করে তপোবনে ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন করে ধর্মসঞ্চয় করতে থাকেন। (মহাভারত)

গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনুক। কথিত আছে, ব্রহ্মা-নির্মিত এই ধনুক প্রথমে পেয়েছিলেন চন্দ্র, পরে চন্দ্র হতে বরুণ এর কর্তৃত্ব পান। এরপর খাণ্ডববন দাহের সময় অগ্নির প্রার্থনায় বরুণ এই

ধনুক অর্জুনকে দান করেন। গণ্ডারের মেরুদণ্ড দিয়ে প্রস্তুত বলে এর নাম গাণ্ডীব। এই ধনুর অধিকারী বলে অর্জুনকে গাণ্ডীবী বলা হয়। এই ধনুর সাহায্যেই অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদি কেউ তাঁকে গাণ্ডীব ত্যাগ করে অন্যকে দান করতে বলেন, তবে তিনি তাঁর শিরশ্ছেদ করবেন। কুরুক্ষেত্রের সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধে কর্ণের হস্তে নিপীড়িত হয়ে এবং অর্জুনকে তার প্রতিকারে অসমর্থ দেখে, যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেন যে, এই গাণ্ডীব কেশব বা অন্য কোন উপযুক্ত রাজার হস্তে অর্পণ কর। তাতে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের শিরশ্ছেদের জন্য খড়্গ গ্রহণ করলে কৃষ্ণ বলেন যে, অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন করে কিঞ্চিৎ অপমান করেন, তাহলেই যুধিষ্ঠির জীবিত অবস্থাতেই মৃত হবেন ও অর্জুনের সত্য রক্ষিত হবে। অর্জুন এই ভাবে সত্যরক্ষা করেন ও ভ্রাতাকে অপমান করবার শোকে আবার আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে বলেন যে, অর্জুন যদি নিজমুখে নিজের গুণকীর্তন করেন, তা'হলেই তা আত্মহত্যার সমান হবে। অর্জুন তাই করেন ও পরে যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে উভয় ভ্রাতার পুনর্মিলন হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন যখন যাদবনারীদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে আভীর দস্যুদল তাঁদের অনেককে হরণ করে। গাণ্ডীব হস্তে অর্জুন তাদের গতিরোধ করতে অসমর্থ হন। তখন কোন দিব্যাস্ত্রই তাঁর স্মরণে আসে নি। তখন বেদব্যাস তাঁকে বলেন যে, তাঁর কাজ শেষ হয়েছে; তাই প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই দিব্যাস্ত্রগুলি স্বস্থানে প্রস্থান করেছে। মহাপ্রস্থানকালেও অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণের মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু অগ্নি স্বয়ং এসে পথরোধ করে গাণ্ডীব বরুণকে প্রত্যর্পণ করতে বলেন। তখন অর্জুন গাণ্ডীব ও দুই অক্ষয় তূণ জলে নিক্ষেপ করেন।

গিরিকা—রাজা উপরিচর বসুর স্ত্রী। পুরুবংশের রাজা উপরিচর বসু সমস্ত শত্রু পরাজিত ক'রে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। দেবতারা এঁর তপস্যায় ভীত হয়ে শান্তবাক্যে তাঁকে নিবৃত্ত করেন ও ইন্দ্র বসুরাজকে একটি আকাশগামী রথ উপহার দেন। তাঁর রাজধানীর কছে শুক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামান্ধ হয়ে শুক্তিমতীকে আক্রমণ করে। তখন বসুরাজ পর্বতের অন্যায় ব্যবহার দেখে তাকে পদাঘাত করেন এবং তাতে এই পর্বত বিদীর্ণ হয়। তখন সেই বিদীর্ণ পথ দিয়েই বেগবতী শুক্তিমতী

প্রবাহিত হয়। কোলাহল পর্বতের সঙ্গমে এই নদীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যার নাম গিরিকা। বসুরাজ লবণ্যবতী গিরিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। একদা গিরিকা ঋতুস্নাতা হয়ে স্বামীর সহবাস প্রার্থনা করেন; কিন্তু সেই সময়ে উপরিচর বসুর পিতৃগণ তাঁকে মৃগয়ার গমনের জন্য আদেশ দেন। পিতৃগণের আদেশ পালনের জন্য তিনি স্ত্রীর সহবাস ত্যাগ করে মৃগয়ায় গমন করেন। কিন্তু বসন্তকাল উপস্থিত হওয়ায় ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে স্মরণ করে তিনি বৃক্ষপত্রে রেতঃস্খলন করেন এবং একটি শ্যেন পক্ষীকে তাঁর স্খলিত রেতঃ তাঁর স্ত্রীকে পৌঁছে দিতে বলেন। এই শ্যেন চঞ্চুপুটে পত্রটি ধারণ করে রেতঃ নিয়ে যাবার সময় অন্য একটি শ্যেন কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় সেই রেতঃ যমুনার জলে পড়ে যায়। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্য হয়ে সেই জলে বাস করত। সেই পতিত রেতঃ গ্রহণ করায় অদ্রিকার গর্ভসঞ্চার হয়। কালে সেই গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। এই পুত্রটি মৎস্য নামে এবং কন্যাটি সত্যবতী নমে খ্যাত হন। (মৎস্য, অগ্নি, শিবপুরাণ, মহাভারত ও হরিবংশ)

গিরিজা—হিমালয়ের কন্যা। পার্বতীর অন্য নাম। পতিনিন্দায় দেহত্যাগের পর সতী পুনরায় হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর এই নাম হয়।

গিরিব্রজ—রাজগৃহ। কুশ নামক ধর্মাত্মার চার পুত্র—কৌশাম্বী, মহোদয়, ধর্মারণ্য ও গিরিব্রজ। তন্মধ্যে গিরিব্রজ এই নগর স্থাপন করেন। গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে এই নগর প্রতিষ্ঠিত; জরাসন্ধের সময় এই নগর মগধের রাজধানী ছিল।

গীতা—মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে ও তাঁদের বধ করতে হবে ভেবে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অর্জুনের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য যে উপদেশ দেন, তাকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলা হয়। ইহার প্রধান বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোতা অর্জুন। ইহাতে সাত শত শ্লোক আছে। এজন্য ইহার অপর নাম 'সপ্তশতী'।

গুড়াকেশ—নিদ্রা বা আলস্যবিজয়ী বলে ইহা অর্জুনের অপর এক নাম।

গুণকেশী—ইন্দ্র-সারথি মাতলির রূপবতী কন্যা। সুধর্মার মাতা। ভোগবতী নগরীর অধিপতি আর্য্যক নাগের পুত্র ও চিকুর নাগের পুত্র সুমুখের সহিত এঁর বিবাহ হয়। কন্যার যোগ্য

স্বামীর সন্ধানে নারদের সঙ্গে নানা লোক ভ্রমণান্তে মাতলি অনন্তনাগ বাসুকির পুরীতে ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের পৌত্র ও চিকুর-নাগের পুত্র সুমুখকে গুণকেশীর স্বামী বলে মনোনীত করেন ; কিন্তু গরুড় কিছুকাল পূর্বে এঁর পিতা চিকুরকে নিহত করেন ও একমাস পরে সুমুখকে ভক্ষণ করবেন বলে স্থির করেন। পিতামহ আর্যকের নিকট এই সংবাদ পেয়ে মাতলি সুমুখকে নিয়ে গরুড়কে নিবৃত্ত করবার জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। সেখানে বিষ্ণুও ছিলেন। তিনি অমৃত পান করিয়ে সুমুখকে অমর করবার পরামর্শ দেন, কিন্তু ইন্দ্র অমৃত পান না করিয়েই তাঁকে দীর্ঘায়ু লাভের বরদান করেন। গরুড় এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের নিকট অভিযোগ করেন যে, ইন্দ্র বর দিয়ে নাগ-ভোজনে বাধা দিলেন কেন ? এতে ইন্দ্র বলেন যে, তিনি বাধা দেননি, বিষ্ণুই সুমুখকে অভয়দান করেছেন। তখন গরুড় বিষ্ণুর নিকট ক্রোধ, আস্ফালন ও গর্ব প্রকাশ করায় বিষ্ণু তাঁকে বলেন যে, যদি তুমি আমার বাম বাহুর ভার সহ্য করতে সমর্থ হও, তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই বলে গরুড়ের স্কন্ধে বাম বাহু রাখা মাত্রই গরুড় অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং তাঁর দর্প চূর্ণ হয়। জ্ঞানলাভ করে গরুড় তখন বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গরুড়ের বক্ষে সুমুখকে নিক্ষেপ করেন এবং তদবধি সুমুখ দীর্ঘায়ু হয়ে রূপগুণবতী স্ত্রীকে নিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকেন। (মহাভারত)

গুণবতী—দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতি নামে দুইটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। এদের মধ্যে চন্দ্রবতীকে যদুবংশের গদ এবং গুণবতীকে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বিবাহ করেন। (হরিবংশ)

গুহক বা গুহ—নিষাদরাজ। গঙ্গার তীরস্থিত শৃঙ্গবেরপুরের এক নিষাদ-জাতির বলশালী রাজা এবং রামচন্দ্রের মিত্র। অযোধ্যা ত্যাগ করে বন-গমনকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রথমে এঁর রাজ্যে উপস্থিত হলে গুহক যথোচিত ভাবে তাঁদের অতিথিসেবা করেন। গুহক রাম-লক্ষ্মণের জটা নির্মাণের জন্য বটবৃক্ষের নির্যাস সংগ্রহ করে দেন ও ভাগীরথীর অন্য পারে যাবার জন্য নৌকা প্রভৃতি দান করে রামের পরিচর্যা করেন। সসৈন্য ভরত রামের অন্বেষণে গমনকালে গুহকের অতিথি হন এবং এঁরই সহায়তায় ভরত সকলের সঙ্গে নির্বিঘ্নে নদীর পরপারে পৌঁছতে সক্ষম হন। চৌদ্দ বৎসর পর রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবার সময় গুহকের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। (রামায়ণ)

গুহ্যক—দেবযোনি বিশেষ; কুবেরের

অনুচর। এদের আবাসস্থল পিশাচলোকের উপর ও গন্ধর্বলোকের নীচে।

গোপালী—অপ্সরার নাম। গার্গ্য মুনির ঔরসে ও এঁর গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়; গোপালী পুত্র-জন্মের পর তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান।

গোতম—দর্শনের ন্যায়শাস্ত্র বিভাগের ও ঋগ্‌বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। ইনি শতানন্দ নামেও পরিচিত। ইনি ধর্মশাস্ত্র নামে আইন পুস্তক প্রণয়ন করেন। কথিত আছে, মহর্ষি গোতম মরুভূমিতে থাকাকালীন অশ্বিদ্বয় অন্য দেশ হতে একটি কূপ উঠিয়ে তাঁর নিকট আনেন এবং তাঁর স্নান ও পানের সুবিধার জন্য এই কূপের মুখ নীচু করে ও তলদেশ উঁচু করে ধরেছিলেন। (ঋগ্‌বেদ)

গোকুল—মথুরার পূর্ব ও দক্ষিণ কোণে অবস্থিত যমুনার বামতীরবর্তী পুণ্যস্থান। নন্দ এই স্থানে বাস করতেন। কৃষ্ণ ও বলরাম এখানে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। পূতনাবধ, শকটভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কাজ এখানেই সংঘটিত হয়। কৃষ্ণলীলাক্ষেত্র বলে গোকুল বৈষ্ণবদের পুণ্যতীর্থ।

গোতমী—গোতমবংশীয়া স্ত্রী। দ্রোণাচার্যের স্ত্রী, কৃপী।

গোবর্ধন—বৃন্দাবনের একটি পর্বত। কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইরূপ আছে—একবার ব্রজধামে অনাবৃষ্টির ফলে কৃষিকার্য নষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন দেশবাসীরা ইন্দ্রকে তুষ্ট করে বৃষ্টিপাতের জন্য ইন্দ্রযজ্ঞের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজা না করে গোপদের গোবর্ধনপর্বত পূজা করতে বলেন। এর ফলে গোপরা ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করে গোবর্ধনপূজা করতে আরম্ভ করল। বৃন্দাবনে এইরূপে ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁর অনুচর মেঘদের আদেশ দিলেন, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতদ্বারা তারা যেন বৃন্দাবন ধ্বংস করে। ভীষণ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের ফলে মৃতপ্রায় হয়ে গোপগণ কৃষ্ণের কাছে এসে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন কৃষ্ণ গোকুল ও গোপদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করে ছত্রের মত খুলে এদের উপরে স্থাপন করেন। তখন সকলে পর্বতের নিচে গর্ত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণরক্ষা করেন। সাতদিন ও সাতরাত্রি প্রকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বৃন্দাবনবাসীদের কোন অনিষ্ট হল না। তখন ইন্দ্রের অনুচররা বিফল হয়ে প্রস্থান করল। (শ্রীমদ্‌ভাগবত)।

গোলোক—বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আবাসস্থান। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকের উপর একটি লোক। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে বৈকুণ্ঠের উপরে গোলোক অবস্থিত। এর আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন। বিষ্ণুর অভিপ্রায়ে এই গোলোক বায়ুর

উপর অবস্থিত। এখানে একটি বিশাল পর্বত আছে। এই পর্বত গোলোকের প্রাচীরস্বরূপ। পর্বতের বহির্দেশে একটি বন আছে। এই বন কৃষ্ণ-রাধিকার ক্রীড়ার স্থান; বৃন্দাবন নামে খ্যাত। এর পরেই গোলাকার গোলোকপুরী।

গৌতম—(১) মহাতেজা মহর্ষি। ইনি মানবের আচার, রীতিনীতিবিষয়ক সংহিতাকার। গৌতম জিতেন্দ্রিয় হয়ে কঠিন তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চায় সময় কাটাতেন। শরস্তম্বে জাত এঁর সন্তান কৃপ ও কৃপী। ব্রহ্মা এঁর অলৌকিক ব্রহ্মচর্য দেখে প্রীত হয়ে অহল্যা নামে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে এঁর কাছে রেখে যান। দীর্ঘকাল পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করলে ব্রহ্মা এঁর জিতেন্দ্রিয়তা ও তপস্যার পরিচয় পেয়ে তুষ্ট হয়ে এঁরই হস্তে অহল্যাকে পুনরায় সমর্পন করেন। অহল্যার গর্ভে এঁর লোকবিশ্রুত পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। একবার গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র গৌতমের রূপধারণ করে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেন। এর ফলে উভয়কেই মহর্ষির অভিশাপ ভোগ করতে হয়। গৌতম রুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে, ইন্দ্র নপুংসক হবেন এবং অহল্যাকে অভিশাপ দেন যে, তিনি অন্যের অদৃশ্য হয়ে অনাহারে ভূমিতলে শয়ন করে, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ভস্মশয্যায় বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত করবেন। অহল্যার অনুনয়ে গৌতম বলেন যে, যখন বিষ্ণুরূপী রাম এই বনে আগমন করবেন, তখন তাঁর পাদবন্দনা করে অতিথি হিসাবে তাঁকে তুষ্ট করলে অহল্যা পবিত্র হয়ে পূর্বরূপ ফিরে পাবেন। বহু বৎসর পরে গৌতমের আশ্রমে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ এলে অভিশপ্তা অহল্যা শাপমুক্তা হয়ে গৌতমের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন। গৌতমের রচিত সংহিতার নাম গৌতম-সংহিতা (রামায়ণ)

(২) (কৃতঘ্ন) জনৈক ব্রাহ্মণ। ভিক্ষার্থী হয়ে এক দস্যুর গৃহে উপস্থিত হলে সে তাঁকে নূতন বস্ত্রও একটি বিধবা যুবতী দান করে। গৌতম দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করে ক্রমে তাদের নিষ্ঠুর স্বভাব প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে গৌতমের এক সখা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হন এবং সদাচারবিহীনতার জন্য গৌতমকে তিরস্কার করেন। পর দিন গৌতম সেস্থান ত্যাগ করে একদল বণিকের সঙ্গে সাগরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে বন্য হস্তীর আক্রমণে বহু বণিক নিহত হয় ও গৌতম একাকী বনপথে গমনরত অবস্থায় এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মার সখা কশ্যপপুত্র পক্ষীশ্রেষ্ঠ নাড়ীজঙ্ঘ নামে বকরাজ ব্রহ্মলোক থেকে সেখানে নেমে আসেন। পৃথিবীতে ইনি রাজধর্মা নামে বিখ্যাত। তিনি গৌতমের অতিথি হন ও তাঁকে

নটরাজ

অপ্সরা

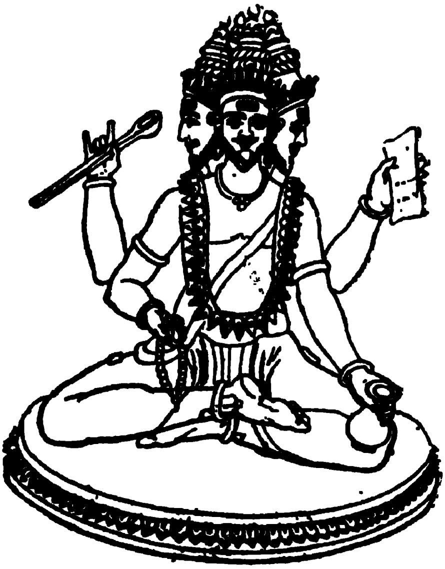

ব্রহ্মা

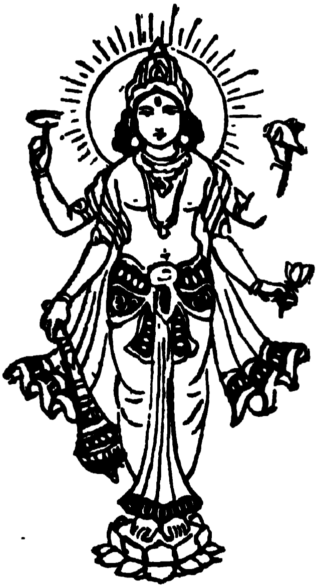

বিষ্ণু

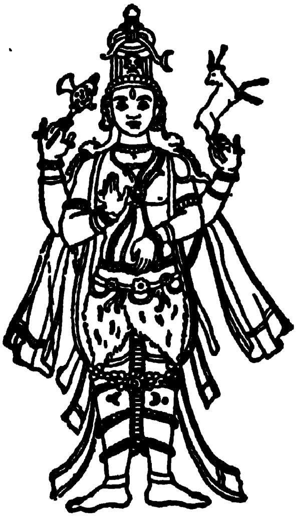

শিব

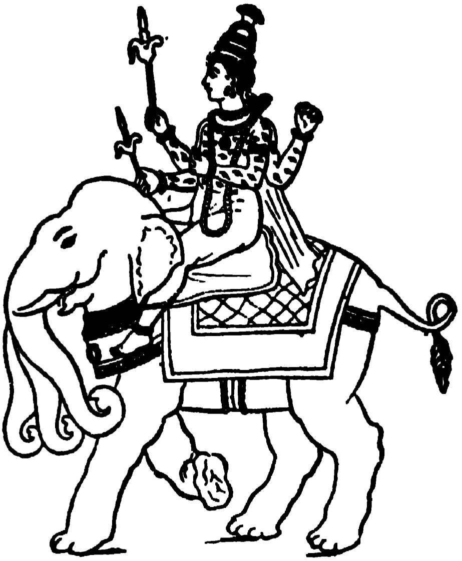

ইন্দ্র

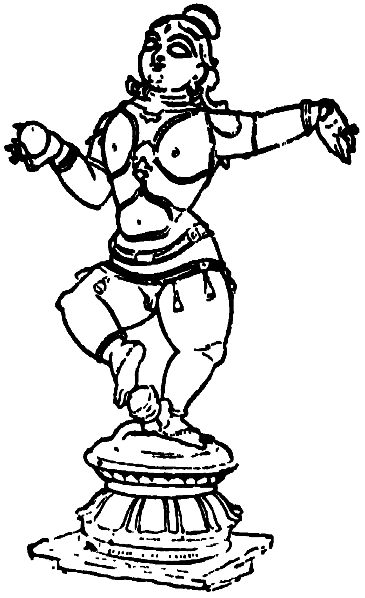

বালকৃষ্ণ

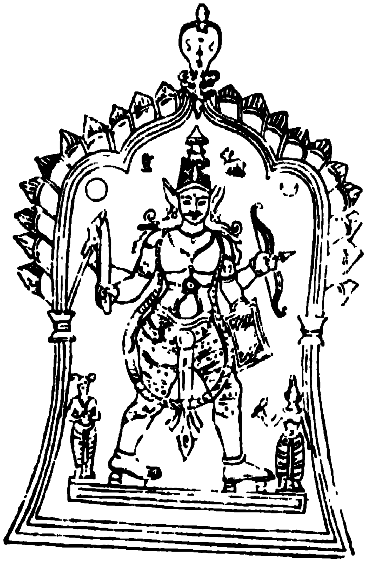

বীরভদ্র

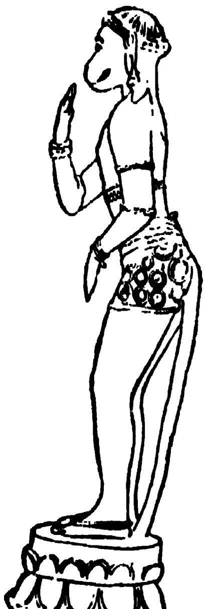

হনুমান

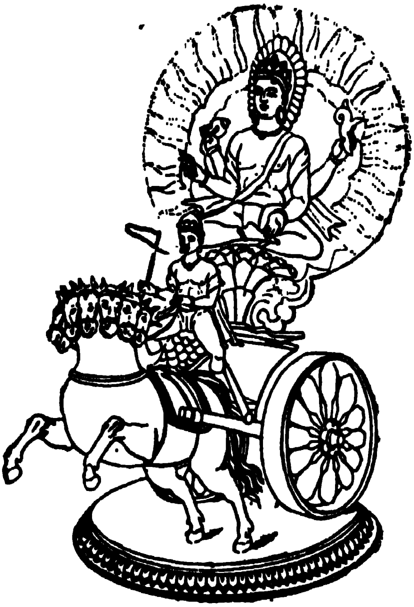

সূর্য্য

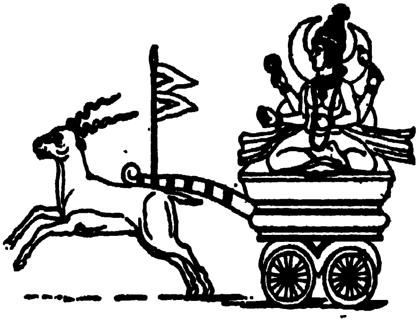

চন্দ্র

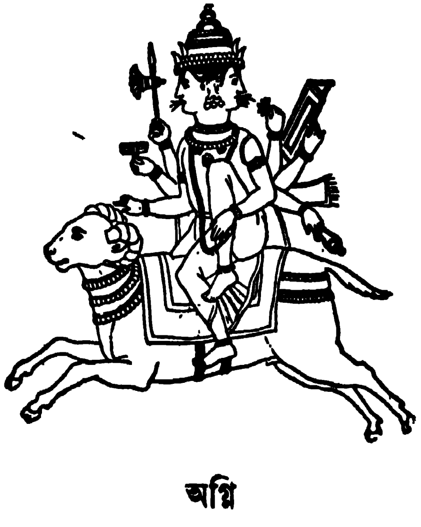

অগ্নি

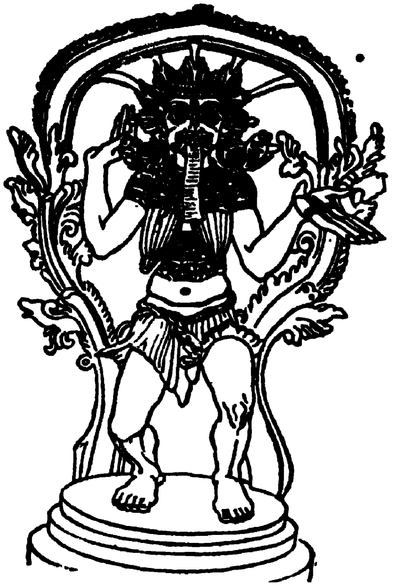

মহাকালী

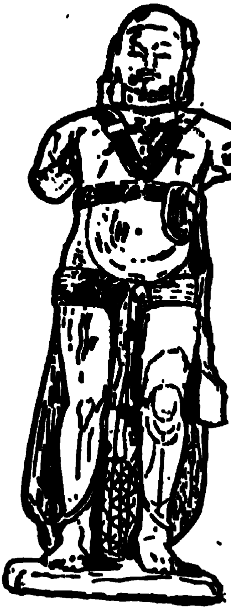

যক্ষ

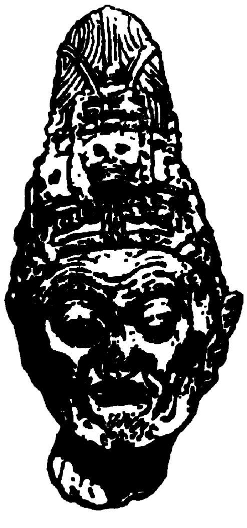

চামুণ্ডা

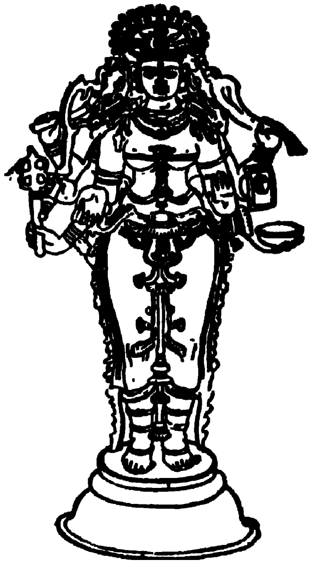

ভদ্রকালী

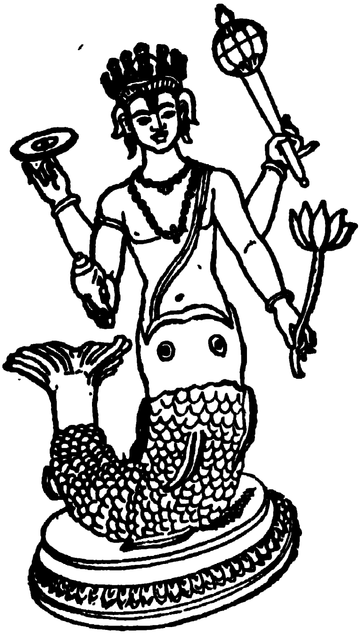

মৎস্য

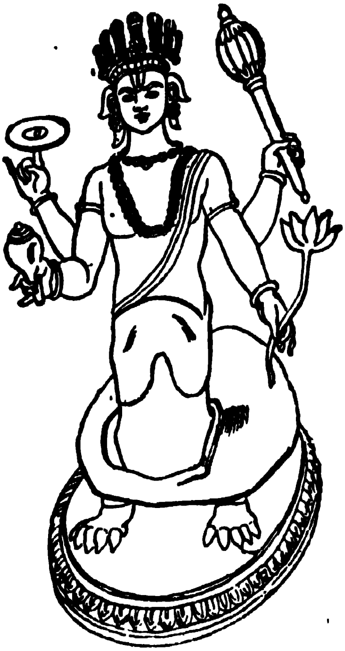

কূর্ম

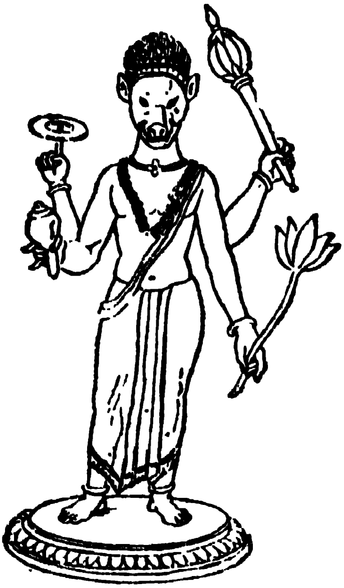

বরাহ

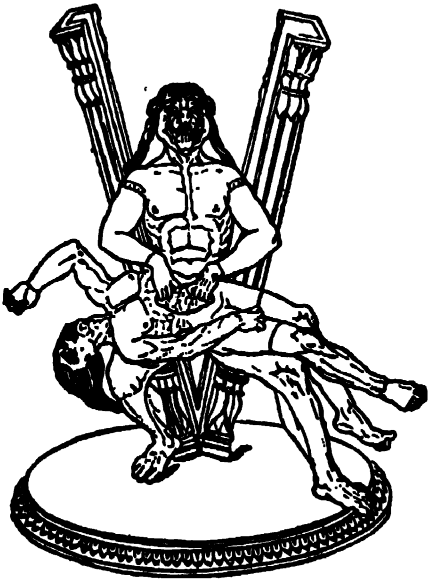

নরসিংহ বা নৃসিংহ

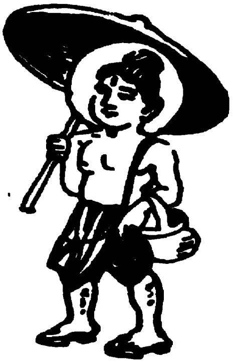

বামন

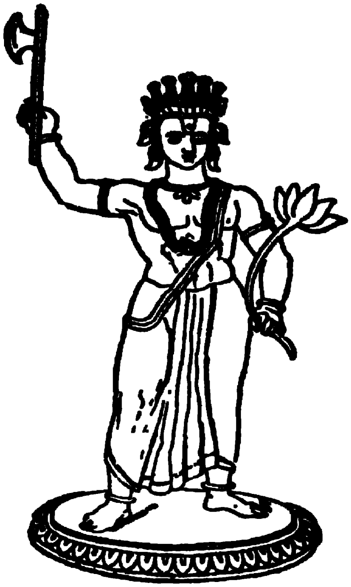

পরশুরাম

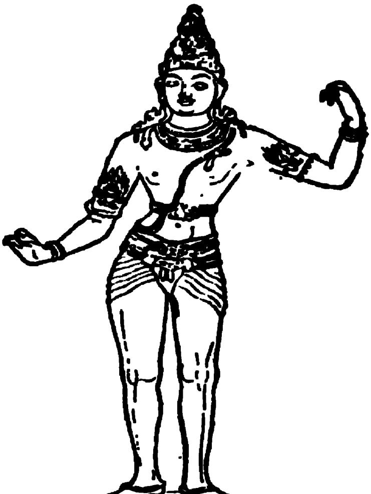

রামচন্দ্র

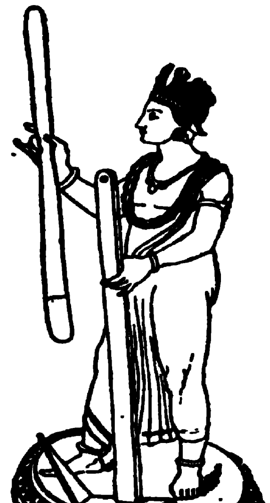

বলরাম

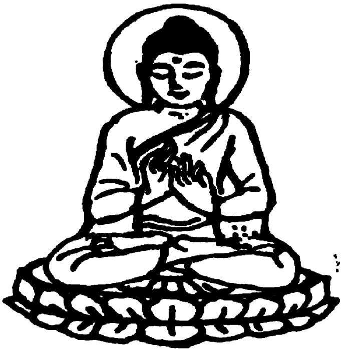

বুদ্ধ

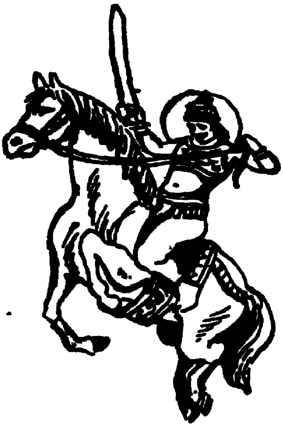

কল্কি

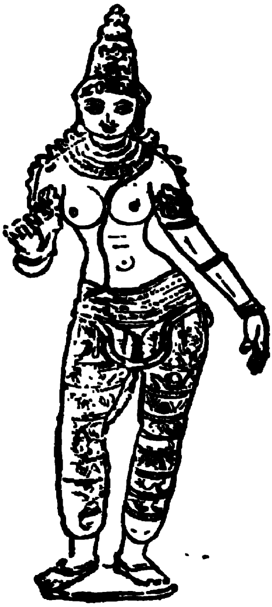

উমা

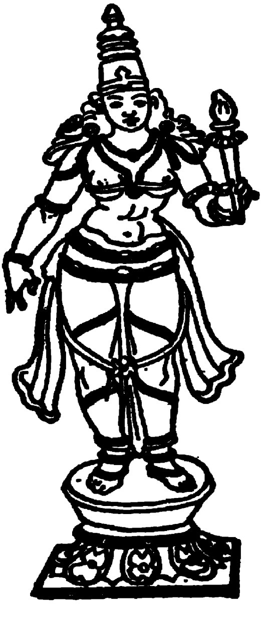

কমলা

ধনাভিলাষী জেনে তাঁর বন্ধু রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট যেতে পরামর্শ দেন। কারণ, তিনি গৌতমের সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন। কার্তিকী পূর্ণিমার দিন ঐ স্থান হতে তিন যোজন দূরবর্তী স্থান অতিক্রম করে রাক্ষসরাজের নিকট পৌছলে তিনি গৌতমের পরিচয় গ্রহণ করেন ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ জেনে দুঃখিত হন। কিন্তু সহস্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁকেও ভোজন করিয়ে স্বর্ণময় ভোজনপাত্র ও প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করেন। গৌতম বহু কষ্টে সেই ধনভার বহনপূর্বক পূর্বের বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হলে, রাজধর্মা পুনরায় গৌতমের পরিচর্যা করেন এবং রাত্রে উভয়ে একত্র শয়ন করলে, গৌতম পথের খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয়ের জন্য বকরাজকে হত্যা করে তাঁর মাংস নিয়ে প্রস্থান করেন। পরদিন রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ রাজধর্মার সন্ধানের জন্য নিজের পুত্রকে প্রেরণ করেন। তিনি রাজধর্মার অস্থি দেখে অনুচরসহ দ্রুতবেগে গিয়ে গৌতমকে ধরে মেরুব্রজ নগরে বিরূপাক্ষের কাছে নিয়ে যান। রাজধর্মার অস্থি দর্শনে শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বিরূপাক্ষ গৌতমকে ভক্ষণ করার জন্য রাক্ষসদের আদেশ দেন; কিন্তু গৌতমের পাপদেহ আহার করতে তারা অস্বীকার করে। তখন বিরূপাক্ষের আদেশে গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড করে দস্যুদের ভক্ষণ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু তারাও তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন বিরূপাক্ষ রাজধর্মার সৎকারের আয়োজন করেন। অতঃপর দক্ষকন্যা সুরভি আবির্ভূতা হন ও তাঁর মুখনিঃসৃত দুগ্ধফেন চিতার উপর নির্গত হয়, এবং তাতেই রাজধর্মা পুনর্জীবন লাভ করেন। ইন্দ্র এসে বলেন যে, একবার রাজধর্মা ব্রহ্মার সভায় না যাওয়ায় ব্রহ্মার শাপে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর রাজধর্মার অনুরোধে ইন্দ্র গৌতমকে পুনর্জীবন দান করেন ও বহু ধনরত্নের সহিত বিদায় দেন। গৌতম শবরালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার দ্বিতীয়বার বিবাহিতা শদ্রাণী পত্নীর গর্ভে বহু দুষ্ট সন্তানের জন্ম দেন। দেবগণের শাপে এই কৃতঘ্ন গৌতম নরকে গমন করেন। (মহাভারত)

গৌতমী—জনৈকা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। এঁর পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে অর্জুনক নামে জনৈক ব্যাধ সেই সর্পকে পাশবদ্ধ করে গৌতমীর সম্মুখে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন গৌতমী সর্প-বিনাশে অসম্মতা হন। কারণ, সর্পের মৃত্যুতে তাঁর পুত্রের জীবনলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই, সে নিয়তির বশেই মৃত হয়েছে। আর যাঁরা তাঁর মত ধর্মনিষ্ঠ, তাঁদের শোক হয় না। তাছাড়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্রোধ করা পাপ কারণ তাতে কেবল যাতনাই বর্ধিত হয়। ব্যাধের বার-

বার অনুরোধেও গৌতমী সম্মত হন না। তখন সর্প মনুষ্য-ভাষায় ব্যাধকে বলে যে, সে পরাধীন, মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হয়েই সে বালককে দংশন করেছে, পাপ হলে মৃত্যুই সেই পাপের জন্য দায়ী হবে। এমন সময় মৃত্যু এসে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, আমি কালের অধীন হয়েই সর্পকে প্রেরণ করেছি, সুতরাং আমি নির্দোষ। তখন কাল স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ব্যক্ত করেন যে, এই বালকের মৃত্যুর জন্য তার কর্মফলই দায়ী, আর কেউ নয়। গৌতমীও তখন একই কথা বলেন যে, কর্মবশেই এই বালকের মৃত্যু হয়েছে এবং কর্মফল বশেই তিনি পুত্রহীনা হয়েছেন, সুতরাং ব্যাধের উচিত সর্পকে মুক্তি দেওয়া। তখন কাল ও মৃত্যু প্রস্থান করেন। ব্যাধ সর্পকে মুক্তি দেয় এবং গৌতমীও শোকশূন্য হন। (মহাভারত—শান্তি)

গৌরমুখ—শমীকমুনির শিষ্য। মৃগয়াকালে রাজা পরীক্ষিৎ বাণবিদ্ধ মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করে শমীকের আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁকে মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। মৌনব্রতধারী মুনি উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ রাজা তাঁর গলায় মৃত সর্প স্থাপন করে যান। এই সংবাদে শমীকের পুত্র শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে তক্ষক দংশনে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। শমীক পুত্রকে অভিশাপ প্রত্যাহারে অনিচ্ছুক দেখে গৌরমুখকে দিয়ে রাজার কাছে এই সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে সাবধান হতে বলেন। (মহাভারত—আদি)

গৌরী—ব্রহ্মা নিজের শরীর হতে গৌরীকে সৃষ্টি করে রুদ্রকে দান করেন। রুদ্র তপস্যার জন্য জলে নিমগ্ন হলে ব্রহ্মা গৌরীকে নিজের দেহে বিলীন করেন এবং পরে গৌরীকে দক্ষের হাতে প্রদান করেন। এদিকে রুদ্র দীর্ঘকাল তপস্যা করে জল থেকে উত্থিত হয়ে পৃথিবীর সুশোভন অবস্থা ও মানুষের পরিপূর্ণতা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করতে থাকেন। ফলে, তাঁর কর্ণ হতে ভূত, প্রেত, বেতাল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে এবং দেবতাদের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে। তখন বিষ্ণু নিজেই রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন ব্রহ্মা উভয়ের মধ্যস্থ হয়ে বিবাদের মীমাংসা করে দেন এবং গৌরীকে রুদ্রের হাতে প্রদান করতে দক্ষকে আদেশ দেন। ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে রুদ্রের বাসস্থান নির্দেশ করেন। এদিকে রুদ্রের দ্বারা দক্ষযজ্ঞ ও সুধা বিনষ্ট হওয়ায় গৌরী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হন। এর ফলে তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়। তখন গৌরী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করে উমা নামে পরিচিতা হন এবং মহাদেবকেই পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে

মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার কাছে উপস্থিত হয়ে খাদ্যভিক্ষা করেন। উমা বৃদ্ধকে স্নান করে আহার গ্রহণ করতে বলেন। গঙ্গায় স্নান করতে গেলে এক মকর বৃদ্ধকে আক্রমণ করে। তখন বৃদ্ধ উমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে উমা অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, স্বয়ং মহাদেব তাঁর হস্তধারণ করেছেন। পিতা হিমালয় এই বিবরণ জ্ঞাত হয়ে উমাকে মহাদেবের হাতে সমর্পণ করেন। (বরাহপুরাণ)

(২) পার্বতীর অন্য নাম গৌরী। হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক মন্দর পাহাড়ে ভ্রমণকালে মহাদেবের স্ত্রী গৌরীকে দেখে মোহিত হন। তাঁকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে প্রহ্লাদ অন্ধককে ঐ কার্যে অগ্রসর হতে বিশেষরূপে নিষেধ করেন, কিন্তু অন্ধক সে কথায় কর্ণপাত করেন না। ফলে, গৌরী শতরূপা হয়ে অন্ধককে নির্যাতন করেন। (বামনপুরাণ)

গ্রন্থিক—চতুর্থ পাণ্ডব নকুল বিরাট রাজভবনে গ্রন্থিক নামে পরিচিত হয়ে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। (মহাভারত—বিরাট)

ঘ

ঘটোৎকচ—দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ও রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত মহাবীর রাক্ষসবিশেষ। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই সদ্য প্রসব করে; তাই হিড়িম্বারপুত্র ঘটোৎকচ জন্মাবার পরেই যৌবনলাভ করে সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ হয়। ঘট অর্থাৎ হাতীর মাথা, উৎকচ অর্থ কেশশূন্য। এর মাথা হাতীর মত কেশশূন্য ছিল বলে নামকরণ হয় ঘটোৎকচ। জন্মের পরে ঘটোৎকচ স্মরণমাত্র উপস্থিত হবে বলে পাণ্ডবদের কাছে বিদায় নেয়। বদরিকাশ্রম যাত্রাপথে ভীমের স্মরণমাত্র ঘটোৎকচ পরিশ্রান্ত দ্রৌপদীকে স্কন্ধে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করে অনেক শত্রু সংহার করে। এর মায়াযুদ্ধ ও অমিতবীর্যে বিপক্ষ দল আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে ঘটোৎকচের পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে কৌরবদের কাতর অনুরোধে কর্ণ অর্জুনবধের জন্য রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত বৈজন্তী শক্তি নিক্ষেপে ঘটোৎকচকে বধ করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ নিজের দেহ বিশালভাবে বর্ধিত করে কৌরবসৈন্যের উপর পতিত হয়ে কৌরববাহিনীর একাংশ নিষ্পেষিত করে। ঘটোৎকচের পুত্রের নাম অঞ্জনপর্বা। চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হয়। (মহাভারত)

ঘটোৎভব—কুম্ভজাত। ঘটের মধ্য হতে জন্ম হয়েছিল বলে অগস্ত্য মুনির এক নাম ঘটোৎভব।

ঘণ্টাকর্ণ—এক বিষ্ণুবিদ্বেষী পিশাচ।

হরিনাম শোনবার ভয়ে এর কর্ণে সর্বদা ঘণ্টা বাঁধা থাকত এবং তা আন্দোলন করে সর্বদা বাজাত। কারণ, পাছে কোনক্রমে বিষ্ণুর নাম তার কর্ণে প্রবেশ করে। এই জন্য এর নাম হয় ঘণ্টাকর্ণ। বিষ্ণুবিদ্বেষী হলেও ঘণ্টাকর্ণ শিবভক্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দের উপর দ্বারাবতীর ভার অর্পণ করে ও হরপার্বতীর কাছে পুত্রলাভের বর আকাঙ্ক্ষা করে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হলে ঘণ্টাকর্ণও সেখানে উপস্থিত হয়। ঘণ্টাকর্ণ মহাদেবের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করলে মহাদেব তাকে বদরিকাশ্রমে গিয়ে নারায়ণের আশ্রমে বিষ্ণুর আরাধনা করতে পরামর্শ দেন। বদরিকাশ্রমে কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর দর্শনলাভ করে ও তাঁকে স্তবে সন্তুষ্ট করে ঘণ্টাকর্ণ মুক্তিলাভ করে। (হরিবংশ)

ঘৃতাচী—স্বর্গের এক অপ্সরা। মহাভারত মতে যে ছয়টি অপ্সরা শ্রেষ্ঠা বলে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে ইনি একজন। বহু ঋষি ও মানুষের সহিত এঁর প্রণয়কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

(১) বেদ বিভাগকর্তা ব্যাস একদিন হোমাগ্নী প্রজ্বলিত করবার জন্য দুইখানি অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) ঘর্ষণে রত ছিলেন; এমন সময় তিনি ঘৃতাচীকে দেখতে পান। তাতে মহর্ষির ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হয় এবং তাঁর বীর্য অরণির মধ্যে প্রবেশ করে। ঘৃতাচী ভীত হয়ে শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণ করে ঐ স্থান হতে প্রস্থান করে। ব্যাস পূর্ববৎ অরণি ঘর্ষণ করতে থাকেন। তখন যজ্ঞকাষ্ঠ হতে প্রজ্বলিত অগ্নির মত শুকদেব নিজের তেজে তা থেকে বেরিয়ে আসেন।

(৩) চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভারত—আদি)

(৩) মহারাজ কুশের পুত্র কুশনাভের ঘৃতাচীর গর্ভে একশত কন্যা হয়। তাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে পবনদেব একদা তাঁদের সঙ্গ প্রার্থনা করলে পিতার বিনা অনুমতীতে কন্যারা অসম্মতা হন। ফলে পবনের অভিশাপে এই শত কন্যা কুব্জা হন। পরে উক্ত কন্যাদের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে পবনদেব বলেন যে, কাম্পিল্যনগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁদের পাণিগ্রহণ করলে তাঁরা পূর্বরূপ ফিরে পাবেন। এই কথা শ্রবণ করে ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদের বিবাহ করলে এঁরা পূর্বরূপে রূপান্তরিতা হন। যে স্থানে পবনদেবের শাপে কন্যারা কুব্জা হয়েছিলেন, সে স্থানের নাম হয় 'কন্যাকুব্জ'।

(৪) ভরদ্বাজ মুনি একবার ঘৃতাচীকে নদীতে স্নানরত অবস্থায় দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন, ফলে তাঁর রেতঃপাত হয়। ঋষি সেই রেতঃ তৎক্ষণাৎ দ্রোণীর (এক প্রকার পাত্র) মধ্যে ধারণ করেন। এই

দ্রোণীরক্ষিত রেতঃ হতে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রই রণগুরু দ্রোণাচার্য নামে প্রসিদ্ধ।

(৫) কুবেরের ঔরসে এঁর চিত্রা নামে এক কন্যা হয়।

ঘোষযাত্রা—কর্ণ প্রভৃতির পরামর্শে দুর্যোধন ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য ঘোষযাত্রাচ্ছলে পাণ্ডবদের অধ্যুষিত দ্বৈতবনে গমন করেছিলেন, ইহা ঘোষযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ।

ঘোষা—কাক্ষীবান ঋষির কন্যা। এই কন্যা কুমারী অবস্থায় কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়াতে কেহই তাঁকে বিবাহ করতে রাজী হন নি। তখন তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তবে সন্তুষ্ট করে তাঁদের দয়ায় পুনরায় যৌবন ও স্বামী লাভ করেন।

চ

চ্যবন—মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার পুত্র। গর্ভবাসকালে পুলোমার পূর্বেকার পাণিপ্রার্থী পুলোমা নামধারী এক রাক্ষস ভৃগুপত্নীকে হরণ করতে চেষ্টা করেন। গর্ভস্থ পুত্র মাতাকে বিপদগ্রস্তা দেখে গর্ভ হতে বের হলে তার তেজে রাক্ষস ভস্মীভূত হয়ে যায়। মাতৃগর্ভচ্যুত হওয়ার জন্য এঁর নাম হয় চ্যবন (মহা-আদি)। নর্মদার নিকট বৈদূর্য পর্বতে চ্যবন দীর্ঘকাল তপস্যা করে জরাগ্রস্ত হন ও তাঁর দেহ বল্মীকে ও লতায় আবৃত হয়। একদিন রাজা শর্যাতি তাঁর চার সহস্র স্ত্রী ও সুন্দরী কন্যা সুকন্যাকে নিয়ে সেখানে বিহার করতে আসেন। সুকন্যার রূপ দেখে চ্যবন তাঁকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকেন, কিন্তু সুকন্যা শুনতে পান না। কিন্তু বল্মীক-স্তূপমধ্যে খদ্যোতবৎ দীপ্যমান দুই চক্ষু দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশে সুকন্যা কণ্টক দিয়ে তা বিদ্ধ করেন। তাতে চ্যবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার সৈন্যদের মলমূত্রত্যাগ রুদ্ধ করেন। শর্যাতি এর কারণ ক্রমে জ্ঞাত হয়ে কন্যার জন্য চ্যবনের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। তখন চ্যবন বলেন যে, দর্প ও অজ্ঞতাবশে সুকন্যা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। এই কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন। তখন শর্যাতি তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করতে বাধ্য হন। একদিন স্নানান্তে নগ্ন সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে প্রার্থনা করেন। সুকন্যা তাঁর স্বামীর প্রতি অনুরক্ত বলে জানান। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তখন বলেন যে জরাগ্রস্ত চ্যবনকে তাঁরা পুনর্যৌবন দান করবেন। তারপর সুকন্যাকে তাঁদের তিন জনের মধ্যে একজনকে বরণ করতে হবে। সুকন্যা এই কথা চ্যবনকে জানালে তিনি তাতে সম্মত হন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ

করেন এবং পরমুহূর্তেই দিব্যরূপ ও সমান বেশ নিয়ে চ্যবন উত্থিত হন। তিনজনে তুল্য রূপধারী হলেও, সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ করেন। চ্যবন সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞে সোমপায়ী করবেন বলেন। চ্যবনের অনুরোধে শর্যাতি যজ্ঞের আয়োজন করেন। অশ্বিনীদ্বয়কে সোমপাত্র দেবার উদ্যোগ করায় ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করে বলেন যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপানে অধিকার নাই, কারণ তাঁরা দেবতাদের চিকিৎসক ও কর্মচারী মাত্র। ইন্দ্রের নিষেধ অবজ্ঞা করায় ইন্দ্র চ্যবনকে বজ্রাঘাতের উদ্যোগ করেন; তখন চ্যবন ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করে মন্ত্র পড়ে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মদ নামে এক ভীষণ শক্তিশালী দেবতা উৎপন্ন করেন। সে ইন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে তিনি চ্যবনকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানের অধিকারী বলে স্বীকার করে নেন। তারপর ইন্দ্রের বাহুদ্বয় মুক্ত করে মদকে সুরাপান, স্ত্রী, দ্যূত ও মৃগয়ায় ভাগ করে স্থাপন করেন ও শর্যাতির যজ্ঞ সমাপ্ত করে চ্যবন স্ত্রীর সহিত বনগমন করেন। চ্যবনের পুত্রের নাম প্রমতি। (মহাভারত—বনপর্ব)।

মহর্ষি চ্যবন একদা ব্রতধারী হয়ে বারো বৎসর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে জলের মধ্যে বাস করেন। জলচর প্রাণীরা তাঁর কাছে নির্ভয়ে আগমন করত। একদা তিনি মৎস্যসহ ধীবরদের জালে ধৃত হন ও মরণাপন্ন মৎস্যদের দেখে দুঃখিত হন। তখন তিনি ধীবরদের বলেন যে, তিনি মৎস্যদের সহিত প্রাণত্যাগ করবেন বা বিক্রীত হবেন। ধীবরগণের মুখে এবংবিধ সংবাদ পেয়ে রাজা নহুষ তাঁর কাছে এসে তাঁর কোন প্রিয় কার্য করতে চান। তখন চ্যবন নহুষকে এই ক্লান্ত ধীবরদের মৎস্যের মূল্য দিতে বলেন। নহুষ সহস্র মুদ্রা দিতে চাইলে চ্যবন বলেন যে, তাঁর মূল্য সহস্র মুদ্রা নয়, নহুষ যেন বিবেচনা করে উপযুক্ত মূল্য দান করেন। নহুষ সহস্র মুদ্রা হতে ক্রমে তাঁর সমগ্র রাজ্যই দিতে চান, কিন্তু চ্যবন তাতে সম্মত হন না। তখন গো-গর্ভজাত এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে নহুষ গাভী দ্বারা চ্যবনকে ক্রয় করেন; কারণ, পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ও গোধন তুল্য অন্য কোন ধন নাই। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সেই গাভী গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে চ্যবন সেই গাভী নিয়ে ধীবরদের ও নহুষকে আশীর্বাদ করে স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করেন। (মহাভারত—অনুশাসন)

চ্যবন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বংশ ব্রাহ্মণবংশ হলেও ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশ থেকে তাঁর বংশে

ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে। সেই জন্য কুশিকবংশ দগ্ধ করবেন বলে মনস্থ করে তিনি কুশিকের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করে রাজ্যের ধেনু ও ধনাদি দিতে চাইলেন। চ্যবন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এক ব্রতের অনুষ্ঠান করতে চাইলেন এবং কুশিককে সস্ত্রীক তাঁর পরিচর্যা করতে বললেন। চ্যবন নানারূপ উপদ্রব করে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করলেও তাঁরা অকুণ্ঠিতচিত্তে সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করে প্রসন্ন মনে তাঁর সেবা করে যান। এইরূপে চ্যবন কুশিকের কোন ত্রুটি ধরতে সক্ষম না হয়ে, অশ্বের পরিবর্তে রাজা ও মহিষীর দ্বারা তাঁর রথ টানাতে থাকেন। কশাঘাতে জর্জরিত হলেও তাঁরা নীরবে তা সহ্য করেন। অবশেষে চ্যবন রথ হতে নেমে তাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করে সুস্থ করে পরদিবস গঙ্গাতীরে তাঁর আশ্রমে উভয়কে উপস্থিত হতে বলে অন্তর্হিত হন।

পরদিন গঙ্গাতীরে তাঁর আশ্রমে গিয়ে কুশিক ও তাঁর মহিষী দেখেন, সেখানে গন্ধর্বপুরীর মত সুন্দর প্রাসাদ কানন ইত্যাদি বর্তমান। কিছুক্ষণ পরে সে সব অদৃশ্য হয়ে যায় এবং রাজা ও রাণী ব্রাহ্মণের তপস্যার বল জ্ঞাত হয়ে ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা করতে থাকেন। চ্যবন তখন তাঁদের বলেন যে, তিনি তাঁদের সংযমে প্রীত হয়েছেন এবং তাঁদের বর দিতে ইচ্ছুক। রাজা বলেন যে, চ্যবনের সংস্পর্শে এসে তাঁরা যে দগ্ধ হন নি, এই-ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। চ্যবনের এই অদ্ভুত কার্যের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, ব্রহ্মার কাছে তিনি জ্ঞাত হন যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ফলে কুল-সংকর হবে এবং কুশিকের এক তেজস্বী পুত্র জন্মাবে। সেইজন্য কুশিকবংশ দগ্ধ করার ইচ্ছায় চ্যবন তাঁদের নানা প্রকার উৎপীড়ন করেছেন। কিন্তু অভিশাপ দেবার মত কোন ত্রুটি দেখতে না পেয়ে চ্যবন তাঁদের প্রীতির জন্য এই স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করে তাঁদের ক্ষণকালের জন্য স্বর্গসুখ দান করেছিলেন। কুশিক যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষ করেন, তাও ঋষির অজ্ঞাত নয়। তবে ব্রাহ্মণত্ব অত্যন্ত দুর্লভ, আর তপশ্চর্যা ও ঋষিত্ব অপেক্ষাকৃত আরও দুর্লভ। তবুও চ্যবন বলেন যে, রাজার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন এবং ভৃগুবংশে ঔর্ব নামে এক ঋষি জন্মাবেন; তাঁর পুত্র ঋচীক সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত করে নিজ পুত্র জমদগ্নিকে তা দান করবেন। জমদগ্নির সহিত কুশিকের পুত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে এবং তাঁদের পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রাচারী হবেন। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র

ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। (মহাভারত—অনুশাসন)

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার প্রকার আশ্রম।

চতুর্মুখ—ব্রহ্মার অন্য নাম। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই দৈত্য ব্রহ্মার বরে অমর হয়। তাদের পরস্পরের হস্ত ব্যতীত অন্য কারো হস্তে তাদের মৃত্যু হবে না, এই ছিল ব্রহ্মার বর। তারা তখন দেবতা ও ঋষিদের উপর নানারূপ অত্যাচার করতে থাকলে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে বিপন্ন হয়ে উপস্থিত হন। তখন ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য তিল তিল করে সংগ্রহ করে এক রূপবতী নারী সৃষ্টি করতে বলেন। এই নারীরই নাম হয় তিলোত্তমা। এই তিলোত্তমাকে নিয়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ায় তারা পরস্পরের হাতে নিহত হয়। সৃষ্টির পর তিলোত্তমা ঘুরতে ঘুরতে যে দিকেই যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি করে মুখ নির্গত হয়। এইরূপে ব্রহ্মা চতুর্মুখ হন। ইন্দ্র তিলোত্তমাকে দেখবার জন্য সহস্রলোচন হন। শিব স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হন বলে তাঁর নাম হয় স্থাণু। (মহাভারত—আদি)

চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগ। সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ—এই চার অবতার আবির্ভূত হন। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ—এই দুই অবতারের আবির্ভাব ঘটে। দুই যুগের পর দ্বাপর যুগ, অর্থাৎ তৃতীয় যুগ। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসরকাল। কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কি অবতাররূপে অবতীর্ণ হবেন।

চতুর্বর্ণ—মনুস্থাপিত চতুর্বর্ণ অর্থাৎ চারি জাতি। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

চতুর্বেদ—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব—এই চারি বেদ।

চণ্ডী—(১) দেবী দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তিতে দেবী মহিষাসুর বধ করেন। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য কথা। আসলে চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত কয়েকটি অধ্যায়। ইহার শ্লোকসংখ্যা সাত শত। এতে দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ভগবতী অসুর শুম্ভের সৈন্যবাহিনী ও প্রধান সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে 'চণ্ডী' নামে অভিহিতা হন।

চণ্ড—একজন প্রসিদ্ধ দৈত্য। দৈত্য-রাজ শুম্ভের প্রধান অনুচর ও সেনাপতি। এর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুণ্ড। শুম্ভের আদেশে যুদ্ধস্থলে গিয়ে

চণ্ড ও মুণ্ড উভয়ে ভগবতীর হস্তে নিহত হন। চণ্ডকে বিনাশ করে ভগবতী চণ্ডী বা চণ্ডীকা নামে খ্যাতা হন। (দেবীমাহাত্ম্য)

চণ্ডনায়িকা—অষ্ট নায়িকার অন্যতমা। ভগবতীর এক সখী।

চণ্ডকৌশিক—(১) জনৈক ঋষি। কাক্ষীবানের পুত্র। ইনি মহাতপস্বী ও উদার প্রকৃতি ছিলেন। (২) কোপনস্বভাব বলে কুশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্রের নাম।

চন্দ্র—(১) ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি মুনির পুত্র। জন্মের পরেই চন্দ্র ত্রিচক্র রথে আরোহণ করে পৃথিবী পরিক্রমা ও আলোকদান করতে আরম্ভ করেন। দক্ষের ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তরফাল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢা, রোহিণী প্রভৃতি নামক সাতাশটি কন্যাকেই ইনি বিবাহ করেন। এঁদের মধ্যে রোহিণীই চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা হওয়ায় অন্য কন্যারা দক্ষের কাছে পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জামাতার মত পরিবর্তনে অসমর্থ হয়ে দক্ষ অভিশাপ দেন যে, চন্দ্র পুত্রকন্যাহীন ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হবেন। এতে তাঁর স্ত্রীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পিতাকে শাপ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। কন্যাদের প্রার্থনায় তিনি শাপ পরিবর্তন করে বলেন যে, যক্ষ্মারোগে চন্দ্র মাসের মধ্যে এক পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন ও অন্য পক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেন। এই দুই পক্ষই কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। (কালিকাপুরাণ)

(২) সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃত, পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে চন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি দেবতাদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হন। অমৃতপানকালে দেবতাদের মধ্যে রাহু নামে এক অসুর গোপনে অমৃতপান করতে উদ্যত হয়। চন্দ্র তাকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তা বিষ্ণুকে বলে দেন। কণ্ঠের নিম্নে অমৃত গলাধঃকরণের পূর্বেই বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করেন। সেই হতেই রাহুর সঙ্গে চন্দ্রের শত্রুতা এবং মস্তকরূপী রাহু সুযোগ পেলেই চন্দ্রকে গ্রাস করেন, কিন্তু ছিন্ন কণ্ঠ দিয়ে চন্দ্র পুনরায় নির্গত হন। একেই লোকে চন্দ্রগ্রহণ বলে থাকে।

(৩) একদা রাজসূয় যজ্ঞ করে চন্দ্র অতি অহঙ্কারী ও কামাসক্ত হন। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করার ফলে ইনি দেবতাদের বিরাগভাজন হন। এর ফলে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হয়। বহু দৈত্য, দানব ও দেব-শত্রুরা চন্দ্রের পক্ষে যোগদান করেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন। ফলে, দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মহাদেব এবং শুক্রাচার্যও বৃহস্পতির

পক্ষ নেন। বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্যের প্রিয় শিষ্য, এই জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির বিপদে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন। অবশেষে ব্রহ্মা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মহাদেব ও শুক্রাচার্যকে নিবৃত্ত করেন এবং তারাকে চন্দ্রের নিকট হতে গ্রহণ করে বৃহস্পতির নিকট প্রত্যার্পণ করেন। তারা তখন অন্তঃসত্বা ছিলেন। বৃহস্পতির আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ এই গর্ভ শরস্তম্ভে ত্যাগ করেন এবং একটি পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ কার পুত্র? তারা উত্তরে বলেন যে, চন্দ্রের। তখন চন্দ্র এই পুত্রকে গ্রহণ করে তার নাম রাখেন বুধ। আকাশে এই বুধ চন্দ্রের বিপরীত দিকে উদিত হয়। বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন ও রোগমুক্ত হবার জন্য পিতা অত্রির শরণাপন্ন হন। অত্রির অনুগ্রহে ইনি শাপমুক্ত ও পুনরায় দীপ্তিসম্পন্ন হন।

চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র। ভরতের কথায় রাম একে উত্তর দিকের চন্দ্রকান্তদেশ দান করেন।

চন্দ্রবংশ—চন্দ্র থেকে উদ্ভূত বংশের নাম। এই বংশ যাদব ও পৌরব নামে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম বংশ যদু থেকে এবং দ্বিতীয় বংশ পুরু থেকে উদ্ভূত। কৃষ্ণ যদুবংশোদ্ভূত এবং কুরুপাণ্ডব পুরুবংশোদ্ভূত।

চন্দ্রভানু—(১) কৃষ্ণপ্রিয়া চন্দ্রাবলীর পিতা। এঁর পিতার নাম মহীভানু ও মাতার নাম সুখদা। এঁর চারটি ভ্রাতা ছিল—রঘুভানু, বৃষভানু, সুভানু ও ভানু। এঁর ভগিনীর নাম ভানুমুদ্রা ও স্ত্রীর নাম বিন্দুমতী। (২) কৃষ্ণের এক পুত্র, সত্যভামার গর্ভজাত।

চন্দ্রলেখা—বাণরাজের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের কন্যা, উষার একজন সখী। এরই চেষ্টায় রূপসী উষা অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হন (উষা দেখ)।

চন্দ্রাবলী—কৃষ্ণের সখীগণের মধ্যে একজন। রাধিকার পিতা বৃষভানুর ভ্রাতা চন্দ্রভানুর কন্যা। এঁর গোবর্ধনমল্লের সঙ্গে বিবাহ হয়। রাধার ন্যায় ইনিও কৃষ্ণের প্রেমানুরাগিণী ছিলেন। একবার কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিযাপন করায় রাধিকার সঙ্গে চন্দ্রাবলীর মনোমালিন্য হয়।

চন্দ্রভাগা—পঞ্চনদের এক নদ। বর্তমান নাম চেনাব। চন্দ্র দক্ষের শাপ থেকে মুক্ত হবার সময় এই নদীতে স্নান করেন বলে এর নাম হয় চন্দ্রভাগা।

চন্দ্রহাস—একজন রাজা। বাল্যকালেই এঁর পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। একটি ধাত্রী এঁকে নিয়ে বনে পলায়ন করে; কিন্তু পরিশেষে এই ধাত্রীরও মৃত্যু হয়। এই রাজ্যের মন্ত্রী নিজেই রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করেন। রাজপুত্রকে দেশে কেউই চিনত না।

একদিন এই রাজপুত্র যখন মন্ত্রীর গৃহের সম্মুখে ভ্রমণরত ছিলেন, তখন একজন দৈবজ্ঞ মন্ত্রীকে বলেন যে, এই বালক সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবে। এই কথা শুনে মন্ত্রীর মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি এঁকে হত্যা করবার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করেন। ঘাতকরা চন্দ্রহাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে তাঁর সৌন্দর্য্য ও কাতর বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে ঘাতকরা তাঁকে অব্যাহতি দেয়। এরপর চন্দ্রহাস এক সম্ভ্রান্ত লোকের আশ্রয়ে বাস করে বড় হয়ে ওঠেন। এক সময়ে মন্ত্রী এঁকে এখানে দেখেই রাজপুত্র বলে চিনতে পেরে নিজের পুত্রের কাছে এঁকে বিনাশ করবার জন্য এক গুপ্ত চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। মন্ত্রী-ভবনের উদ্যানে মন্ত্রীর কন্যা বিষয়া এঁকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হন। রাজকুমারের নিদ্রিত অবস্থায় বিষয়া পিতার পুর্ব-পত্রের বিষয় পরিবর্তন করে নূতন পত্র রচনা করে দেন। উক্ত পত্রে কন্যার সহিত এঁর বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব লিখিত ছিল। মন্ত্রীপুত্র এই পরিবর্তিত চিঠি পেয়ে এঁর সঙ্গেই ভগিনীর বিবাহ দেন। অতঃপর মন্ত্রীবর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এই ঘটনা জ্ঞাত হলে পর একটি দেবালয়ে ঘাতক নিযুক্ত করে পূজার অছিলায় চন্দ্রহাসকে উক্ত স্থানে প্রেরণ করেন। রাজপুত্র দেবালয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্রই ঘাতক তাকে হত্যা করবে এইরূপে নির্ধারিত ছিল। দৈবক্রমে চন্দ্রহাসকে রেখে মন্ত্রীপুত্র নিজেই দেবালয়ে গমন করেন এবং ঘাতক কর্তৃক নিহত হন। তারপর কালক্রমে চন্দ্রহাস একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। (মহাভারত)

চরক—আয়ুর্বেদবেত্তা এবং বিখ্যাত চরকসংহিতার প্রণেতা। যখন নারায়ণ মৎস্যাবতাররূপে বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব অথর্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর অনন্তদেব চররূপে (গুপ্তবেশে) পৃথিবীতে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, পৃথিবীর লোক নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছে। এতে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হওয়ায় তিনি ষড়ঙ্গ বেদবেত্তা মুনিপুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মানবের রোগজনিত দুঃখের অবসান করে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি চররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে চরকরূপে খ্যাত। ইনি ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় এবং অগ্নিবেশ্যের নিকট যথাক্রমে সূত্র, শরীরস্থান, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি—এই অষ্টস্থান শিক্ষা করে চরকসংহিতা নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চরু—দেবতারা যা আহার করেন। হোমের জন্য যে অন্ন পাক করা হয়;

যজ্ঞীয় পায়সায়।

চক্রব্যূহ—মণ্ডলাকারে সেনা সন্নিবেশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করলে অভিমন্যু তা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করেন ও অন্যায় যুদ্ধে নিহত হন।

চম্পকারণ্য—তীর্থস্থান। এই তীর্থে একরাত্রি বাস করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ইহার বর্তমান নাম চম্পারণ। (মহাভারত—বন)

চম্পা—চম্পা নামক রাজা কর্তৃক স্থাপিত প্রসিদ্ধ নগরী। ইহা অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। এই নগরী বর্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত।

চার্বাক—(১) দুর্যোধনের সখা জনৈক রাক্ষস। পুরাকালে চার্বাক বদরিকাশ্রমে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট অভয় বর লাভ করে দেবগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে। তখন ব্রহ্মার নিকট দেবগণ শরণাপন্ন হলে তিনি বলেন যে, চার্বাক দুর্যোধনের সখারূপে ব্রাহ্মণদের অপমান করলে ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয়বধজনিত গ্লানিতে সংশয়াকুল যুধিষ্ঠির সকলের পুনঃপুনঃ অনুরোধে যখন সিংহাসনারোহণে গমন করেন, তখন সমবেত ব্রাহ্মণদের মধ্য হতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী চার্বাক যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, ব্রাহ্মণরা তাঁকে আত্মীয়বধের জন্য ও গুরুক্ষয়কারী বলে ধিক্কার দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন। যুধিষ্ঠির তাতে মর্মাহত হন। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাননেত্রের দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে সক্রোধে হুংকার দিয়ে ওঠেন। তাতে চার্বাক দগ্ধ হয়ে নিপাতিত হয়।

(মহাভারত—শান্তি)

(২) একজন দার্শনিক মুনি। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। এঁর মতে, সচেতন দেহ ছাড়া আত্মা নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ; প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ; পৃথিবী জল, বায়ু, অগ্নি হতে সৃষ্টি হয়েছে।

চর্মণ্বতী—মহারাজ রন্তিদেব প্রতিদিন কয়েক সহস্র বৃষ বধ করে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের ভোজন করাতেন। এই সকল বৃষের চর্মনিঃসৃত রক্ত ও ক্লেদে এই নদীর উৎপত্তি হয়। (মহাভারত—শান্তি)। এখন এই নদী বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চম্বল নামে খ্যাত।

চামুণ্ডা—দুর্গার কপাল হতে উদ্ভূতা। শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনাপতি দৈত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে নিধন করবার জন্য আগতা দেবীবিশেষ। এই দুই দৈত্যকে বধ করে চামুণ্ডা দুর্গার কাছে এদের মুণ্ড দান করেন। সেই থেকে এই দেবীর নাম হয় চামুণ্ডা।

চিকুর—ঐরাবত নাগবংশীয় আর্যকের পুত্র চিকুর। চিকুর বিনতাপুত্র গরুড় কর্তৃক নিহত হন। চিকুরের পুত্র সুমুখ। তিনি মাতলির কন্যা গুণকেশীকে বিবাহ করেন। (মহাভারত—উদ্)

চিত্রকেতু—শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বহু স্ত্রী সত্ত্বেও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। পরে তাঁর জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কৃতদ্যুতি অঙ্গীরা ঋষির যজ্ঞের চরু আহার করে এক রূপবান পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু সপত্নীরা বিষ প্রয়োগে এই শিশুকে হত্যা করে। পুত্রশোকে অভিভূত হলে অঙ্গীরা ও নারদ এঁকে তত্ত্বকথা বলে এঁর শোক দূর করেন। কিন্তু নিজেকে জিতেন্দ্রীয় মনে করে এঁর মনে একটু অহঙ্কার জন্মে। একবার শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে অঙ্কে নিয়ে সভায় বসেছিলেন। এই দৃশ্য দেখে চিত্রকেতু শিবকে উপহাস করেন। এতে পার্বতী অত্যন্ত রাগান্বিতা হয়ে অসুরযোনিতে ইনি জন্মগ্রহণ করবেন বলে অভিশাপ দেন। তাই তাঁর বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। (শ্রীমদ্ভাগবত)

চিত্রকূট—প্রয়াগ থেকে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত পর্বত বিশেষ। পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমনকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কিছুদিনের জন্য চিত্রকূট পর্বতে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে বসবাস করেছিলেন। এই চিত্রকূটে রাম ও ভরতের মিলন ঘটে।

চিত্রগুপ্ত—যমের কর্মচারী। ব্রহ্মার অঙ্গ হতে এঁর জন্ম। ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর অঙ্গ হতে নানা বর্ণে চিত্রিত এক পুরুষ মস্যাধার ও লেখনীসহ উদ্ভূত হন। জন্মের পর তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে কি কাজ করতে হবে? যোগনিদ্রা থেকে ব্রহ্মা উত্থিত হয়ে পুত্রকে আদেশ দেন যে, মানুষের পাপ-পুণ্য বিচার করবার জন্য তুমি যমালয়ে বাস কর। আমার কায়া হতে তোমার উদ্ভব হয়েছে ব'লে তুমি কায়স্থ নামে অভিহিত হবে। ইনি পাপপুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব গুপ্ত রাখেন বলে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন। চিত্রগুপ্তের অম্বষ্ঠ, মাথুর, গৌড়, সেনক, শ্রীবাস্তব্য ইত্যাদি নামে নয়টি পুত্র হয়। চিত্রগুপ্ত মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফলও লিখে থাকেন। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা হয়। অভিশপ্ত রাজা সৌদাস চিত্রগুপ্তের পূজা করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গগমন করেন। ঐ তিথিতে ভীষ্ম এই চিত্রগুপ্তের উপাসনা করে তাঁর প্রসাদে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রাপ্ত হন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাপীদের যন্ত্রণা দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

চিত্রভানু—মণিপুরের রাজা। অর্জুনের অন্যতমা স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার পিতা।

চিত্ররথ—একজন গন্ধর্ব ও কুবেরের বন্ধু। এঁর পর্ণ বা বাহন জলন্ত অঙ্গারতুল্য ছিল বলে তিনি অঙ্গারপর্ণ নামে খ্যাত। চিত্র-বিচিত্র রথের অধিকারী হিসাবে এঁর অপর নাম চিত্ররথ।

পাণ্ডবেরা পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় যাত্রাপথে রাত্রিকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। তখন গন্ধর্বরাজ সস্ত্রীক জলক্রীড়ায় রত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের জলস্পর্শ করতে বাধা দেন। ফলে, তাঁর সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুনের আগ্নেয়াস্ত্রে রথ দগ্ধ হওয়ায় গন্ধর্বরাজ অচেতন হয়ে পড়েন ও অর্জুনের হাতে বন্দী হন। তাঁর স্ত্রী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের শরণ নিলে, তাঁর অনুরোধে অর্জুন এঁকে মুক্তি দেন। গন্ধর্বরাজ তখন অর্জুনের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন করেন। গন্ধর্বরাজ যুধিষ্ঠিরকে ও তাঁরা প্রত্যেক ভ্রাতাকে এক শত বেগবান গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব উপহার দেন ও অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যার প্রভাবে ত্রিলোকের সব কিছু ইচ্ছামাত্র দেখা যায়। এর পরিবর্তে অর্জুন এঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন। ইনি অর্জুনকে পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ সংবরণ ও তপতীর কাহিনী বলেন এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইত্যাদির কাহিনী শোনান। এঁরই পরামর্শে পাণ্ডবেরা দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উৎকোচতীর্থে তপস্যাকারী ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করেন।

চিত্রলেখা—একজন অপ্সরা। অসুররাজ রাবণের কন্যা উষার সখী চিত্রলেখা। ইনি বাণরাজার মন্ত্রী কুম্মাণ্ডের কন্যা। উষা স্বপ্নে কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্তা হন। চিত্রলেখা নানা দেশের রাজকুমারদের চিত্র দেখিয়ে কৌশলে উষার প্রকৃত প্রণয়ীর কথা জেনে নেন। তখন চিত্রলেখা দ্বারকায় গিয়ে নারদ-প্রদত্ত তামসী-বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অদৃশ্য হয়ে অনিরুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেন, এবং উক্ত বিদ্যাবলে অনিরুদ্ধকে অদৃশ্য করে বাণরাজার অন্তঃপুরে আনয়ন করে উষার সঙ্গে মিলন করিয়ে দেন। চিত্রলেখা চিত্রাঙ্কনে সুনিপুণা ছিলেন।

চিত্রশিখণ্ডী—মরীচি, অঙ্গীরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্তর্ষি চিত্রশিখণ্ড বা শিখা ধারণ করতেন বলে এঁদের চিত্রশিখণ্ডী বলা হয়।

চিত্রসেন—গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেন ইন্দ্রের সভাসদ্‌ এবং সঙ্গীত ও নৃত্যবাদ্যাদির নায়ক ছিলেন। স্বর্গের নৃত্যগীতাদিরও অধ্যক্ষ ছিলেন ইনি। বনবাসকালে অর্জুন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহার্থ তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্রলোকে গমন করে চিত্রসেনের কাছে নৃত্যগীতবাদ্যাদি শিক্ষা করেন। এই চিত্রসেনই একদা উর্বশীকে বলেন যে, অর্জুন তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছেন। ফলে, উর্বশী অর্জুনের নিকট অভিসারে গমন করেন এবং অর্জুনকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন।

পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে অবস্থানকালে দুর্যোধন ঘোষযাত্রার পথে দ্বৈতবনের কাছে এলে গন্ধর্বগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। উক্ত সময় গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ক্রীড়া করার মানসে দ্বৈতবনস্থিত সরোবরের তীরে সদলবলে অবস্থান করছিলেন। গন্ধর্বরা দুর্যোধনকে দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ায় দুর্যোধন তাঁদের সসৈন্যে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরিশেষে পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁর ভ্রাতাগণ এবং কৌরব-স্ত্রীরাও গন্ধর্ব-হস্তে বন্দী হন। দুর্যোধনের মন্ত্রিগণ ও পরাজিত সৈন্যেরা পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হলে, যুধিষ্ঠির ভীমের অমত সত্ত্বেও কৌরবের রমণীদের উদ্ধার করে কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য চারি ভ্রাতাকে চিত্রসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। অর্জুনের সহিত যুদ্ধে চিত্রসেন পরাজিত হন ও অর্জুনের সখা বলে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন যে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের উপহাস করতে এসেছিলেন বলে ইন্দ্রের আদেশে তাঁকে তিনি বন্দী করেন। অর্জুনের অনুরোধে চিত্রসেন দুর্যোধনাদিকে মুক্ত করে দেন। কৌরবের কুলমর্যাদা হানি না করার জন্য যুধিষ্ঠির তাঁকে বহু ধন্যবাদ দেন। ইন্দ্র অমৃতবর্ষণ করে নিহত গন্ধর্বদের জীবনদান করেন। পরে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনপ্রভৃতিকে স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করতে বলেন। (মহাভারত)

চিত্রাঙ্গদ—শান্তনুরাজের পুত্র। মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীর গর্ভে এবং শান্তনুর ঔরসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ভীষ্মের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কনিষ্ঠ পুত্রের যৌবনলাভের পূর্বেই শান্তনুর মৃত্যু হলে সত্যবতীর মত নিয়ে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রাঙ্গদ অমিতবলশালী ছিলেন। তিনি দেবাসুর, গন্ধর্ব, মানুষ, সকলকেই নিকৃষ্ট জ্ঞান করতেন। নানাদেশ জয় করে ইনি রাজ্যবিস্তার করেন। চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বরাজ একদিন তাঁকে বলেন যে, আমাদের দুইজনের নামই এক; অতএব এসো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, নতুবা অন্য নাম গ্রহণ কর। তখন দুইজনের মধ্যে দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ হয়। অবশেষে গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের নিকট শান্তনুতনয় চিত্রাঙ্গদ পরাজিত ও নিহত হন। (মহাভারত—আদি)

চিত্রাঙ্গদা—মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা। এই বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ রাজা প্রভঞ্জন মহাদেবের তপস্যা করে বর লাভ করেন যে, তাঁর বংশের প্রত্যেক পুরুষই একটিমাত্র সন্তান লাভের অধিকারী হবে। কালক্রমে চিত্রভানুর একটি কন্যা হয় এবং সেই কন্যাকে তিনি পুত্রের ন্যায় লালনপালন করেন ও শিক্ষা দেন। দ্রৌপদীর

সঙ্গে বিবাহের নিয়মভঙ্গ করার জন্য বনবাসে গমন ক'রে অর্জুন যখন মণিপুরে উপস্থিত হন, তখন তিনি সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত সন্তান মণিপুর রাজ্যের বংশধর হবে, এই সর্তে অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিবাহ হয়। অর্জুন সেখানে তিন বৎসর কাল বসবাস করেন ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁর বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞাশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হলে, অর্জুনের অন্য পত্নী নাগকন্যা উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব আটক করে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে অর্জুন জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। তখন উলূপী সঞ্জীবনী-মণি বক্ষে স্থাপন ক'রে অর্জুনের চৈতন্য আনয়ন করেন। চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও যজ্ঞকালে হস্তিনাপুরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে থাকেন। (২) রাবণের স্ত্রী, বীরবাহুর মাতা।

চিরজীবী—বিষ্ণু, কাক, মার্কণ্ডেয় অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম—এঁরা চিরজীবী।

ছ

ছায়া—সূর্যের প্রথমা স্ত্রী। এঁর গর্ভে বৈবস্বত, শ্রাদ্ধদেব ও যম এবং যমুনার জন্ম হয়। সূর্যের অপর স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে, মায়াদ্বারা নিজের ছায়া হতে নিজের অনুরূপ এক নারীমূর্তি সৃষ্টি ক'রে তাঁকে সূর্যের কাছে রেখে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সংজ্ঞা নিজ পুত্র-কন্যা পালনের ভার সপত্নী ছায়ার উপর দিয়ে যান। পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) কন্যার এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে বলেন, কিন্তু সংজ্ঞা স্বামীর কাছে না ফিরে উত্তর কুরুবর্ষে গিয়ে এক ঘোটকীর রূপ ধারণ করে ভ্রমণ করতে থাকেন। সূর্য আপন স্ত্রী মনে করে ছায়াকে উপভোগ করেন। এর ফলে তাঁদের সাবর্ণিমনু ও শনি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ছায়া নিজ গর্ভজাত পুত্রদের সপত্নী সংজ্ঞার পুত্র যম অপেক্ষা অধিক ভালবাসায় যম একদা ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতাকে পদাঘাত করতে উদ্যত হন। তখন বিমাতা ছায়া যমকে অভিসম্পাত দেন যে, 'তোমার পা খ'সে যাক্।' যম পিতার কাছে গিয়ে বিমাতার এই ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করেন। সূর্য নিজপুত্র যমকে অভিশাপ থেকে মুক্ত না করে বলেন যে, তাঁর পায়ের মাংস নিয়ে কৃমিরা মাটিতে প্রবেশ করবে; কিন্তু সূর্য ছায়াকে যমের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন।

স্বামীর এই তিরস্কারের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়া তাঁর নিজের জন্মের কথা ও সংজ্ঞার পিতৃগৃহে গমনের সমস্ত সংবাদ সূর্যকে বলে দেন। এই বৃত্তান্ত শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্য ত্বষ্টার (বিশ্বকর্মা) কাছে স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করায় বিশ্বকর্মা তাঁকে বলেন যে, 'সংজ্ঞা তোমার তেজ সহ্য করতে না পেরে আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে ভৎ'সনা করে তোমার নিকট পুনরায় প্রেরণ করেছি।' তখন সূর্য অনুসন্ধান করে সংজ্ঞার অবস্থানের কথা জ্ঞাত হয়ে এক ঘোটকের রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে মিলিত হন। এই সঙ্গমের ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। শেষে সূর্য নিজের তেজ কিছুটা প্রশমিত করার প্রতিজ্ঞা করায় সংজ্ঞা নিজের মূর্তি ধারণ ক'রে তাঁর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। ইনিই প্রচণ্ড চণ্ডিকা নামে খ্যাত। ইনি প্রসন্ন হলে এঁর উপাসকরা শিবত্ব লাভ করে; অপুত্রক পুত্রবান, নির্ধন ধনী ও মূর্খ বিদ্বান হয়। ইনি বামহস্তে নিজের মস্তক ধারণপূর্বক লোল্য জিহ্বা দ্বারা নিজের কণ্ঠ-নিঃসৃত রক্তধারা পানে নিরত। কেশপাশ নানা প্রকার পুষ্পশোভিত। ইনি মুণ্ডমালাবিভূষিতা হয়ে রতি ও কামের উপরে দণ্ডায়মানা। বাম ও দক্ষিণ হস্তে নরকপাল ও কর্তরী; গলায় নাগযজ্ঞোপবীত ও মুণ্ডমালা।

জ

জগদ্ধাত্রী—সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দেবী। কথিত আছে—অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র—এই চারিটি দেবতা একদা স্থির করেন যে, দেবগণের মধ্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁরাই পরমেশ্বর। এই উদ্ধত বাক্য শ্রবণে শ্রীদুর্গা কোটি সূর্য-তেজসমা জ্যোতির্ময়ীরূপে এঁদের সম্মুখে উপস্থিত হন। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ এই জ্যোতির্ময়ী রূপের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে পবনদেবকে এই মূর্তির কাছে প্রেরণ করেন। জ্যোতির্ময়ী মূর্তি একগাছি তৃণ স্থাপন ক'রে পবনকে তা উত্তোলন করতে বলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পবন তৃণটি তুলতে অক্ষম হন। অতঃপর অগ্নিদেব আসেন; তাঁকে তৃণটি দগ্ধ করতে বলা হয়, কিন্তু তিনিও তা দগ্ধ করতে অসমর্থ হন। এইরূপে পরাজিত হয়ে দেবতারা এই জ্যোতির্ময়ী দেবীকে আরাধনা করতে থাকেন। ইনিই দেবী ভগবতীর অন্য রূপে জগদ্ধাত্রী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জগন্নাথ—বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশেষ। জগন্নাথ বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় ও ভারতবর্ষের নানা অংশে পূজিত হয়ে থাকেন। উড়িষ্যার পুরী শহরে এঁর মন্দির আছে। বৎসরের দুইটি

উৎসবে ইনি বিশেষভাবে পূজিত হন—একবার জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রার সময়ে এবং আর একবার আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে। প্রথম উৎসবে জগন্নাথের স্নান করানো হয় এবং দ্বিতীয় উৎসবে জগন্নাথ, তাঁর ভ্রাতা বলরাম এবং ভগিনী সুভদ্রাকে রথের উপর স্থাপন করে উপাসকরা টেনে নিয়ে যায়। জগন্নাথের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে—এক ব্যাধ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হলে, তাঁর মৃতদেহ একটি বৃক্ষের তলায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কৃষ্ণের কয়েকজন অনুরাগী এই দৃশ্য দেখে বৃক্ষতল হতে মৃত কৃষ্ণের কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে একটি বাক্সের মধ্যে স্থাপন করে। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা বিষ্ণুকে পূজা করবেন মনে করেন। কিন্তু কি মূর্তিতে বিষ্ণুকে উপাসনা করবেন সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন বিষ্ণু উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিষ্ণুর এক সনাতন মূর্তি নির্মাণ করে এই মূর্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্থি রক্ষা করতে বললেন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা এই মূর্তি প্রস্তুতের ভার নিলেন এই শর্তে যে যতদিন পর্যন্ত এই মূর্তি প্রস্তুত না হয়, ততদিন পর্যন্ত কেউই যেন তাঁকে মূর্তির জন্য বিরক্ত না করে। কিন্তু পনের দিন পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অত্যন্ত অস্থির হয়ে মূর্তি দেখবার জন্য বিশ্বকর্মার নিকটে এসে উপস্থিত হন। ফলে বিশ্বকর্মা অত্যন্ত কুপিত হয়ে এই কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে প্রস্থান করেন। মূর্তির হাত-পা তখন অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র কাঠামো অবস্থায়ই ছিল বলা চলে। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে এসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন। তখন ব্রহ্মা রাজার অনুরোধে প্রীত হয়ে ঐ অসম্পূর্ণ মূর্তির চক্ষু ও প্রাণ দান করেন এবং নিজে পুরোহিত হয়ে মূর্তি স্থাপনপূর্বক পূজা করেন।

জটাধর—(১) দেবাসুর-যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ প্রভৃতি দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ পাঠিয়েছিলেন, জটাধর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। (মহাভারত—শল্য)। (২) মহাদেবের অন্যতম নাম জটাধর।

জটায়ু—পক্ষিরাজ বিশেষ। বায়ুবেগগামী কামরূপ পক্ষী। গরুড়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য-সারথি অরুণের দুই পুত্র, সম্পাতি ও জটায়ু। জটায়ু সকল পক্ষীর উপর আধিপত্য করবার অধিকার লাভ করে। এই জন্য জটায়ুকে পক্ষীরাজ নামে উল্লেখ করা হয়। মহারাজ দশরথের সঙ্গে জটায়ুর বন্ধুত্ব ছিল। জটায়ু ও সম্পাতি ইন্দ্রকে জয় করবার ইচ্ছায় আকাশমার্গে যাত্রা করেন। মধ্যাহ্ন-সূর্যের তাপে জটায়ু অবসন্ন হয়ে পড়ায় তিনি জ্যেষ্ঠের পক্ষপুটে রক্ষিত হন। সীতাহরণকালে

সীতার ক্রন্দনে ব্যথিত হয়ে জটায়ু রাবণের গতিরোধ করেন ও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু রাবণের খড়্গাঘাতে জটায়ু ছিন্নপক্ষ ও মৃতপ্রায় হয়ে ভূপতিত হলে রাবণ সীতাকে নিয়ে পলায়ন করেন। সীতান্বেষণকালে ভূপতিত ও রক্তাক্ত জটায়ুকে প্রত্যক্ষ করে রাম তাঁকে সীতার ভক্ষণকারী মনে করে বধ করতে উদ্যত হলে জটায়ু রামের নিকট সমস্ত বিবরণ বিবৃত করেন। জটায়ুই রামকে প্রথম বলেন যে, সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে দক্ষিণ দিকে গমন করেছেন। এই বিবরণ বলার পরই জটায়ুর মৃত্যু হয় এবং রাম ও লক্ষ্মণ পিতৃসখা জেনে জটায়ুর সংকার করেন। (রামায়ণ—অরণ্য)

জটাসুর—এক রাক্ষস বিশেষ। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবরা যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে বনবাসে ছিলেন এবং অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য কিছুকাল স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন, সেই সময় এই অসুর দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে আত্মপরিচয় দিয়ে পাণ্ডবদের আশ্রমে অতিথি হয়। যুধিষ্ঠির নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে একে আশ্রয় দেন। একদিন ভীম মৃগয়ার্থ অনুপস্থিত থাকাকালীন এবং ঘটোৎকচ প্রভৃতি অন্যান্য অনুচররাও আশ্রমে উপস্থিত না থাকায় জটাসুর বিকট রূপ ধারণ করে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে এবং পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করায় সহদেব তাকে বাধা দিতে যান। এই সময় ভীম ঘটনাস্থলে গদাহস্তে উপস্থিত হয়ে বাহুযুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত, নিষ্পিষ্ট ও চূর্ণবিচূর্ণ করে নিহত করেন। জটাসুর দুর্যোধনের বন্ধু ও অলম্বুষের পিতা। অলম্বুষ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটোৎকচের হাতে নিহত হয়। (মহাভারত—বন)

জটিলা—(১) ইনি গোল নামে এক গোপের স্ত্রী ও রাধিকার স্বামী আয়ানের মাতা। আয়ান ব্যতীত দুর্মদ নামে তাঁর আর একটি পুত্র ও কুটিলা নামে একটি কন্যা ছিল। রাধিকা কৃষ্ণকে ভালবাসতেন ব'লে ইনি রাধিকার চরিত্রে নানারূপ দোষারোপ করেন।

(২) ধর্মপরায়ণা গৌতমবংশীয়া এক নারী। কথিত আছে, সাতজন ঋষি এঁর স্বামী ছিলেন। (মহাভারত—আদি)

জড়ভরত—পুরাকালে ভরত নামে এক রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করতেন। সর্বদা ভগবানের পূজার্চনার দ্বারা তিনি উন্নতিলাভ করেন। একদিন তিনি স্নানার্থ নদীর তীরে গিয়ে দেখেন যে, একটি জলপানরতা ও আসন্নপ্রসবা হরিণী সিংহদ্বারা আক্রান্ত হয়ে জলে

পড়ে জল থেকে লাফ দিয়ে তীরের উপর উঠতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তীরভূমি অত্যন্ত উঁচু হওয়ায় হঠাৎ সে পতিত হয় এবং তার গর্ভপাত হয়। এই গর্ভপাতের ফলে হরিণী তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে প্রাণত্যাগ করে। সদ্যোজাত মৃগশিশুটিকে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখে ভরত তাকে উদ্ধার করে নিজ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সযত্নে লালনপালন করতে থাকেন। অল্পকালের মধ্যেই হরিণশিশুটির উপর তিনি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন ও জপতপ বিস্মৃত হয়ে সর্বদা মৃগের চিন্তায় ও তার লালনপালনে অযথা কালক্ষেপ করতে থাকেন। সমস্ত ভোগ্যবস্তু ত্যাগ এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেও কালক্রমে তিনি মৃগশিশুর প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁর ধর্মকর্ম সমস্তই লোপ পেয়ে যায়। মৃত্যুকালেও মৃগশিশুর প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করে, তারই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে কেবল মৃগচিন্তা করেছিলেন বলে রাজা ভরত এক জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর পূর্বের আশ্রমে এসে দিনাতিপাত করতে থাকেন। অতঃপর যথাকালে আবার দেহত্যাগ করে জাতিস্মর হয়ে তিনি এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। আবার যাতে তাঁর অধোগতি না হয়, সেজন্ত তিনি সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে বনবাস করতে থাকেন। কিন্তু সর্বদা জড়বুদ্ধি উন্মত্তের মত অবস্থান করতেম, জড়িত স্বরে কথা বলতেন এবং কাজকর্মে বিমুখ ছিলেন বলে এঁর নাম জড়ভরত হয়। সর্বদা মলিন বসন পরিহিত অপরিষ্কৃত দেহ ও মন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও, শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সকলে তাঁকে বড়বুদ্ধিসম্পন্ন ভেবে অপমান করত এবং আহার্য মাত্র দান করে তাঁর দ্বারা সর্বপ্রকার কাজ করিয়ে নিত। একসময় রাজা সৌবীর তাঁকে শিবিকা-বহনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। দর্শন ও পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নানা রকম উপদেশ দিতেন, শেষে এই জড়ভরত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করে সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করেন (বিষ্ণুপুরাণ)

জতুগৃহ—দুর্যোধনের চক্রান্তে বারণাবত নগরে লাক্ষাদি দাহ্য পদার্থ দিয়ে এক গৃহনির্মাণ করে তাতে পাণ্ডবদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। স্থির হয় যে পাণ্ডবদের অগোচরে দুর্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন গৃহে অগ্নিসংযোগ করে তাদের হত্যা করবেন। বিদুর পূর্বেই কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে এ বিষয়ে সাবধান করে দেন। বিদুরের প্রেরিত খননকারীর সাহায্যে পাণ্ডবরা গৃহমধ্যে পলায়নের জন্ত নদী-তীর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ খনন করান। + এখানে এক বৎসর বাস করবার পর, একদিন কুন্তী

ব্রাহ্মণ ও অভ্যাগতদের ভোজন করান এবং গভীর রাত্রে পাণ্ডবেরা গৃহে অগ্নিসংযোগ করে সুড়ঙ্গপথে নদী-তীরে এসে বিদুর প্রেরিত নৌকায় পার হয়ে পলায়ন করেন। জতুগৃহে পুরোচন ও পাঁচ পুত্রসহ নিমন্ত্রিত এক নিষাদী (মাহুত) অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নিদ্রিত অবস্থাতেই দগ্ধ হয়, ফলে পাণ্ডবরাই দগ্ধ হয়েছেন বলে রটনা হয়। (মহাভারত—বনপর্ব)

জনক—মিথিলার ধার্মিক রাজা। এই বংশে নিমি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। একদা ধর্মাত্মা রাজা নিমি বশিষ্টকে ত্যাগ করে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাপ দেন। তখন ঋষিরা গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দিয়ে নিমির দেহ পূজা করে মন্থন করেন। সেই মথিত দেহ হতে এক পুত্র জন্মায়। সেই জন্য এই পুত্রের নাম হয় মিথি। এঁর অন্য নাম জনক। বিচেতন দেহ থেকে উৎপন্ন বলে এঁর আর এক নাম হয় বৈদেহ। এই মিথি থেকে আরম্ভ করে তার অধস্তন সকল পুরুষ জনক নামে খ্যাত হন। রামায়ণে কথিত আছে, মিথির পুত্র জনকই প্রথম জনক। মিথি রাজার নাম হতে রাজ্যের নাম হয় মিথিলা।

রামায়ণে দুই জনকের নাম পাওয়া যায়। একজন মিথির পুত্র ও উদাবসুর পিতা এবং অন্যজন হ্রস্বরোমার পুত্র ও সীতার পিতা। (রামায়ণ-আদি)

মিথিলার রাজা জনক সীতার পিতারূপে পরিচিত। এঁর প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। জনক যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণকালে লাঙলের রেখা থেকে যে অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যা পান, তাঁকেই সীতা নামে নামাঙ্কিত করে কন্যারূপে পালন করেন। সীতা বিবাহযোগ্যা হলে জনক তাঁকে বীর্য্য-শুল্কা করবেন বলে স্থির করেন। সাংকাস্যার রাজা সুধন্বা সীতাকে প্রার্থনা করেন, কিন্তু জনক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে মিথিলা অবরোধ করেন। সীরধ্বজ যুদ্ধে সুধন্বাকে নিহত করে আপন ভ্রাতা কুশধ্বজকে তার রাজ্য দেন। হরধনু ভঙ্গকারীর হাতে সীতাকে অর্পণ করবেন, জনকের এই পণ ছিল। রামচন্দ্র এই হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন। সীরধ্বজের অপর কন্যা ঊর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের ও কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

জনকবংশ—ইক্ষ্বাকুবংশের একটি শাখা। এই বংশের সকলেই জনক উপাধিধারী। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই বংশে ৫৬ এবং ভাগবত মতে ৫৩ জন রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জনমেজয়—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রপৌত্র। ইনি অভিমন্যুর পৌত্র ও রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। [illegible]ই

পিতার মৃত্যুর পর জনমেজয় রাজপুরোহিত এবং মন্ত্রিগণদ্বারা রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন। যথাকালে কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার কন্যা বপুষ্টমার সহিত এঁর বিবাহ হয়। একবার মৃগয়াকালে রাজা পরীক্ষিৎ মৌনব্রত-শমিকমুনির স্কন্ধে মৃত সর্প অর্পণ করায় শমিকের পুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে তক্ষকনাগের দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। জনমেজয় রাজ্যলাভের পর মন্ত্রিদের নিকট পিতার মৃত্যুর বিবরণ জ্ঞাত হয়ে জলস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেন যে, পিতৃহন্তা তক্ষকের উপর প্রতিশোধ অবশ্যই তিনি গ্রহণ করবেন। পুরোহিতদের নিকট পরামর্শ নিয়ে সর্পকুল বিনাশের জন্য জনমেজয় সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞ করেন। যজ্ঞভূমি পরিমাপ কালে সূত নামে এক পুরাণ-কথক ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, কোন ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন। তখন জনমেজয় যজ্ঞরক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঋত্বিকরা মন্ত্র উচ্চারণ করে সর্পগণের উদ্দেশে আহুতি দান করলে সর্পগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যজ্ঞকুণ্ডে এসে পতিত হতে থাকে। অবশেষে ভীত তক্ষকনাগ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। নাগরাজ বাসুকি তার ভগ্নী জরৎকারুকে অনুরোধ করেন যে, তাঁর পুত্র আস্তীক যেন সর্পকুল রক্ষা করে। মাতার আদেশে আস্তীক যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে জনমেজয়কে নানারূপে স্তুতি করে সন্তুষ্ট করেন। সকলেই আস্তিকের গুণে অত্যন্ত প্রীত হন। জনমেজয় তাঁকে বর দিতে ইচ্ছুক হলে রাজ-সদস্যগণ ও হোতারা বাধা দিয়ে বলেন যে তক্ষক তখনো যজ্ঞে আসেনি। ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রই তক্ষকের আশ্রয়দাতা জানতে পেরে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। ইন্দ্র যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলে পর তক্ষক তার উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। জনমেজয় ক্রুদ্ধ হয়ে তক্ষকসহ ইন্দ্রকেই যজ্ঞে নিক্ষেপ করতে বলায় ইন্দ্র ভয়ে তক্ষককে ত্যাগ করে পলায়ন করেন। মন্ত্র-প্রভাবে মোহগ্রস্ত তক্ষক যজ্ঞাগ্নি অভিমুখে আত্মাহুতি প্রদান মানসে অগ্রসর হতে থাকেন। ঋত্বিকগণ কার্যসিদ্ধি হয়েছে মনে করে জনমেজয়কে অনুমতি করলেন ব্রাহ্মণকে বর দিতে। রাজা আস্তীককে অভিপ্রেত বর চাইতে বললে, আস্তীক তক্ষকের উদ্দেশে 'তিষ্ঠ' বলায় তক্ষকের চলৎশক্তি রহিত হ'ল। তখন আস্তীক রাজাকে যজ্ঞে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। রাজা প্রথমে অসম্মত হন; কিন্তু পরে সদস্যগণের অনুরোধে আস্তীককে অভীষ্ট বর দান করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পর তক্ষক ও অবশিষ্ট সর্পরা নিষ্কৃতি পায়। এর পর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে

উদ্যত হন। কলিযুগে অশ্বমেধ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই যজ্ঞ করা স্থির করেন। যজ্ঞস্থলে এক ব্রাহ্মণকুমারকে কোন কারণে জনমেজয় সর্প করে দেন এবং ফলে সে হত হয়। এই ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হতবুদ্ধি জনমেজয় বেদব্যাস রচিত মহাভারত ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের কাছে শ্রবণ করে এই মহাপাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন। (মহাভারত—আদি)

জনা—মাহিষ্মতীরাজ নীলধ্বজের স্ত্রী। জনা অত্যন্ত গঙ্গাভক্ত ছিলেন। গঙ্গার কৃপায় শিবের এক অনুচর জনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রবীর নামে খ্যাত হন। জনার কন্যা স্বাহার সঙ্গে অগ্নিদেবের বিবাহ হয়। পাণ্ডবদের অশ্বমেধের অশ্ব মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হলে প্রবীর এই অশ্ব বন্ধন করেন। নীলধ্বজ পুত্রকে এই অশ্ব ফিরিয়ে দিতে বললে, জনা বাধা দিয়ে পুত্রকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং নিজে সৈন্যদের সাহস দিয়ে উৎসাহিত করতে থাকেন। এই যুদ্ধে কৃষ্ণের সাহায্যে অনেক কষ্টে পাণ্ডবরা জয়লাভ করে এবং প্রবীর নিহত হয়। যুদ্ধের পর অগ্নিদেবের পরামর্শে কৃষ্ণভক্ত নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করলে তেজস্বিনী পুত্রশোকার্তা জনা রাজাকে ভর্ৎসনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তার তেজে সকলেই ভস্মীভূত হয়। কোনক্রমে কৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবরা রক্ষা পান। জনা পুত্রশোকে কাতর হয়ে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। (জৈমিনি—ভারত)

জনার্দন—বিষ্ণুর অপর নাম। 'জন' নামক অসুরকে বধ করে ইনি জনার্দন নামেও অভিহিত হন। (মহাভারত—আদি)

জবালা—মহর্ষি সত্যকামের মাতা। যৌবনে জবালা বহুচারিণী ছিলেন। সেই সময় তার গর্ভে সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকাম বিদ্যার্থীরূপে মহর্ষি গৌতমের নিকট উপস্থিত হলে, গৌতম তার গোত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন. কিন্তু সত্যকাম মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করেও নিজ গোত্র জানতে পারেন নি এবং না জানতে পারার কারণও তিনি মহর্ষিকে বলেন। মহর্ষি গৌতম সত্যকামের এই সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, 'ব্রাহ্মণ, তুমি সত্য হতে ভ্রষ্ট হও নি। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কারও পক্ষে এরূপ সত্যাচরণ কখনও সম্ভব নয়।' (ছান্দোগ্য—৪র্থ প্রপাঠক, ৪র্থ খণ্ড)

জমদগ্নি একজন বৈদিক ঋষি। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব—এই চারি বেদেই ইহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ভৃগুপুত্র ঋচীকের ঔরসে ও কান্যকুব্জরাজ গাধির কন্যা সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। একদা স্ত্রীসহ ভৃগু তার পুত্র

জমদগ্নি ও পুত্রবধূ সত্যবতীকে দেখতে এসে বর দিতে উদ্যত হলে, সত্যবতী নিজের ও তার মাতার জন্য পুত্র ভিক্ষা করেন। ভৃগু ঋতুস্নানের পর সত্যবতীর মাতাকে অশ্বত্থবৃক্ষ ও সত্যবতীকে উডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করতে উপদেশ দেন, এবং দুই জনের জন্য দুই চরু ভক্ষণার্থ দিয়ে যান। সত্যবতী ও তার মাতা (গাধির স্ত্রী) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে বিপর্যয় ঘটান। ভৃগু যোগবলে এই ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সত্যবতীকে বলেন যে, 'তোমরা বিপরীত কাজ করেছ। তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করেছেন! আমি চরু প্রস্তুতকালেই তোমার গর্ভে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার মাতার গর্ভে মহাবল ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মগ্রহণ করবে স্থির করেছিলাম। কিন্তু চরু আহারে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ায় তোমার গর্ভস্থ পুত্র ব্রাহ্মণ হলেও ক্ষত্রিয়ধর্মী হবে ও তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হলেও আচারে ব্রাহ্মণ হবে।' সত্যবতীর বহু অনুনয়ে ভৃগু বলেন যে, তার পুত্রের পরিবর্তে পৌত্র ক্ষত্রিয়াচারী হবে। জমদগ্নি নামে তার পুত্র কালক্রমে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠলেন। ঋচীক এঁর সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ দেন। তার গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়; তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্র পরশুরাম বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিন স্নানকালে মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথকে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে জলক্রীড়ারত দেখে রেণুকার মনে কামভাবের উদয় হয়। চিত্তবিকারের জন্য দ্রুতবেগে রেণুকা বিহ্বল ও ত্রস্তভাবে আর্দ্রগাত্রে আশ্রমে ফিরে আসেন। গৃহে-প্রত্যাগতা স্ত্রীকে অধীর অবস্থায় ও শ্রীবর্জিত দেখে সন্দিহান হয়ে জমদগ্নি একে একে তাঁর চার পুত্রকে মাতৃহত্যায় আদেশ দেন। মাতৃস্নেহবশে চারিপুত্র অনুরূপ আদেশ পালন করতে অসম্মত হওয়ায়, পিতার অভিশাপে তাদের জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে। পরশুরাম আশ্রমে এসে পিতার আদেশ শ্রবণমাত্র কুঠারাঘাতে মাতার শিরশ্ছেদ করেন। জমদগ্নি প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলে পরশুরাম মাতার পুনর্জন্ম, নিজের মাতৃহত্যার পাপমুক্তি, হত্যার বিস্মৃতি, ভ্রাতাদের জড়ত্ব-মুক্তি, নিজের যুদ্ধে অজেয়ত্ব ও দীর্ঘায়ুলাভের বর প্রার্থনা করেন। পিতা পরশুরামের মনস্কাম পূর্ণ করেন।

একবার হৈহয়রাজ সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন অনুচরগণসহ পুত্রগণের অনুপস্থিতিকালে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হন। স্ত্রী রেণুকা তাঁদের যথোচিত অতিথিসৎকার করা সত্ত্বেও তাঁরা আশ্রমের বৃক্ষাদি ভগ্ন করেন ও

কামধেনু সুরভীকে হরণ করে নিয়ে যান। পরশুরাম ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে কার্ত্তবীর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করে কার্ত্তবীর্যকে বধ করেন। পরে একদিন কার্ত্তবীর্যের পুত্রগণ আশ্রমে এসে পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে হত্যা করেন। আশ্রমে প্রত্যাগত পরশুরাম পিতাকে নিহত দেখে কার্ত্তবীর্যের পুত্রদের সানুচর নিহত করেন ও একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে স্যমন্তপঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রক্তময় হ্রদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তর্পণ করেন। (মহাভারত—বন)

জয় ও বিজয়—(১) এই দুই ভ্রাতা স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক ছিলেন। দ্বাররক্ষাকালে একদিন সনকাদি ঋষিরা বিষ্ণু-দর্শনে আসেন। ভ্রাতারা তাদের প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত না হওয়ায় ঋষিরা এদের মর্ত্যে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। কিন্তু পরে এঁদের অনুনয়ে প্রীত হয়ে বলেন যে “আমাদের শাপ ব্যর্থ হবে না; তবে তোমরা দ্বিবিধ উপায়ে মুক্তি পেতে পারো। প্রথমতঃ, মর্ত্যলোকে ঈশ্বরকে মিত্রভাবে ভজনা করলে সাত জন্মে এবং দ্বিতীয়তঃ, বৈরীভাবে ভজনা করলে তিন জন্মে স্বর্গে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করবে।' জয় ও বিজয় আশু মুক্তিলাভের আশায় ঈশ্বরকে শত্রুভাবে ভজনা করে মুক্তি প্রার্থনা করলেন। মুনিদের শাপে জয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও দ্বাপরে শিশুপালরূপে এবং বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এঁরা বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয়ে স্বর্গগমন করেন।

(২) বিরাট-গৃহে অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের গৃহীত গুপ্ত নাম। উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে শ্মশানে দগ্ধ করবার জন্য হরণ করলে তিনি পঞ্চভ্রাতার পঞ্চ গুপ্ত নাম গ্রহণ করে তাদের আহ্বান করেন। ভীম উপকীচকদের হত্যা করে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করেন।

জয়সেন—বিরাট ভবনে ছদ্মবেশী নকুলের গুপ্ত নাম।

জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ। পিতা বৃদ্ধক্ষত্র। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার স্বামী। পুত্রের নাম সুরথ। পাণ্ডবদের কাম্যকবনে অবস্থানকালে জয়দ্রথ বিবাহকামনায় শাল্বরাজ্যে গমনরত অবস্থায় দৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং আশ্রমে পাণ্ডবদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দ্রৌপদীকে হরণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত সময় পাণ্ডবরা মৃগয়া সমাপনান্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে দৌপদীর ধাত্রীকন্যার নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে জয়দ্রথের পশ্চাধাবন করেন

জয়দ্রথের সৈন্যরা পরাস্ত ও নিহত হওয়ায় তিনি দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে পলায়ন করতে থাকেন। ভীম ও অর্জুন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে পরাস্ত করেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের অনুরোধে ভীম তাঁকে হত্যা না করে তাঁর মস্তকের মধ্যে মধ্যে ক্ষৌরকার্য করে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে লাঞ্ছিত করে মুক্তি দান করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইনি মহাদেবের তপস্যা করে, অর্জুন ভিন্ন সমস্ত পাণ্ডবকে অন্ততঃ একদিনের জন্যও জয় করতে পারার বর লাভ করেন। ফলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু-বধের জন্য দ্রোণ যে চক্রব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন, তার ব্যূহদ্বার রক্ষকরূপে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে পরাজিত করেন। এই চক্রব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট অভিমন্যু নিহত হন। অর্জুন সংসপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত থাকার জন্য ব্যূহমুখে উপস্থিত হতে সক্ষম হন নি। সন্ধ্যাকালে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে অভিমন্যুবধের বার্তা শুনে অর্জুন প্রতীজ্ঞা করেন যে, পরাহ্নে সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করবেন অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করবেন। এই প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত হয়ে জয়দ্রথ স্বগৃহে পলায়ন করতে উদ্যত হলে দুর্যোধন ও দ্রোণ তাঁকে আশ্বস্ত করেন।

পর দিন দ্রোণ শকটব্যূহ রচনা করেন। তার পশ্চাতে পদ্মব্যূহ ও গর্ভব্যূহের মধ্যে সূচীব্যূহ নির্মিত হয়। উক্ত সূচীব্যূহের মধ্যে বিশাল সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে জয়দ্রথ গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। শ্রেষ্ঠ কৌরববীরগণ কর্তৃক রক্ষিত জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হবার পূর্বেই সূর্যাস্ত আসন্ন দেখে কৃষ্ণ যোগবলে (চক্রদ্বারা) সূর্যকে আচ্ছাদিত করে দিবসেই সন্ধ্যা সৃষ্টি করেন। কৌরবগণ অর্জুনের অগ্নিপ্রবেশের সম্ভাবনায় আশান্বিত হন এবং জয়দ্রথ নির্ভয়ে সূর্য দেখতে থাকেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে, জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র তাঁর পুত্রের জন্মকালে দৈববাণী শুনেছিলেন যে, রণস্থলে জয়দ্রথের মুণ্ডচ্ছেদ হবে। তাতে তিনি এই অভিসম্পাত করেন যে, যে তাঁর পুত্রের মস্তক ভূলুণ্ঠিত করবে তাঁর মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। যুদ্ধকালে বৃদ্ধক্ষত্র স্যমন্তপঞ্চকদেশের বহির্ভাগে তপস্যায় রত ছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন কৌতূহলী ও অসতর্ক জয়দ্রথের মস্তক এক শরাঘাতে ছেদনপূর্বক তা মাটিতে নিপতিত হবার পূর্বেই আরো কয়েকটি বাণে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা-বন্দনারত রাজা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে ফেলেন। সন্ত্রস্ত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র দণ্ডায়মান হতেই মস্তকটি তাঁর ক্রোড় হতে ভূপতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ

হয়। (মহাভারত—বন)

জয়বল—বিরাট-ভবনে ছদ্মবেশী সহদেবের গুপ্ত নাম।

জয়ন্ত—ইন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী শচীর গর্ভজাত পুত্র। রাবণের স্বর্গাভিযানকালে জয়ন্ত বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাক্ষসসেনাদের পরাস্ত করেন। কিন্তু মেঘনাদ মায়াবলে দশ দিক তমসাচ্ছন্ন করে অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করে জয়ন্তকে পরাস্ত করেন। তখন শচীর পিতা ও জয়ন্তের মাতামহ দৈত্যরাজ পুলোমা জয়ন্তকে পাতালে নিয়ে রক্ষা করেন। (রামায়ণ)

(২) অযোধ্যার রাজা দশরথের মন্ত্রী।

(৩) বিরাট রাজভবনে ছদ্মবেশী মধ্যমপাণ্ডব ভীমের গুপ্ত নাম।

জয়ন্তী—ইন্দ্রের কন্যা ও জয়ন্তের ভগিনী। শুক্রাচার্যের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন।

জয়া—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করার জন্য মহাদেব যে মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, জয়া তাঁদের অন্যতমা।

(২) লক্ষ্মীর অন্য সহচরীর নাম।

(৩) গৌতমের স্ত্রী অহল্যা হতে জয়, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা নামে চার কন্যার জন্ম হয়। তাঁরা সকলেই সতীর সহচরী ছিলেন। শিবের স্ত্রী সতী জয়ার কাছে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ শ্রবণ করেন। (বামনপুরাণ)

(৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর একজনের নাম। (অগ্নিপুরাণ)

জরৎকারু—ভৃগুবংশীয় মুনি। জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। কঠোর তপস্যার দ্বারা ইনি শরীরকে ক্ষয় করেছিলেন বলেই এঁর নাম হয় জরৎকারু।

(১) যাযাবর নামে ঋষি বংশীয়ের পুত্র। ঊর্ধ্বরেতা, ব্রহ্মচারী, মহাতপা পরিব্রাজক মুনি। ইনি বায়ু মাত্র ভক্ষণ করে কঠোর তপস্যা ও ব্রতানুষ্ঠান করতেন। একদা ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি কতকগুলি লোককে বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্বক ঊর্ধ্বপাদ ও অধোমুখ হয়ে লম্বমান দেখেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন যে, জরৎকারু নামে তাঁদের এক পুত্র বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন না করায় তাঁরা বংশলোপের আশঙ্কায় এইরূপ অবস্থায় লম্বমান আছেন। জরৎকারু তাঁদের আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন যে, কেবলমাত্র পিতৃপুরুষদের মুক্তির জন্যই তিনি তাঁরই সমনামা কোন কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন, অবশ্য যদি সেই কন্যার আত্মীয়গণ স্বেচ্ছায় তাঁকে দান করেন, তবেই তিনি তাঁকে ভিক্ষা স্বরূপ গ্রহণ করে তাঁহাতে সন্তানোৎপাদন করবেন। বিবাহার্থী জরৎকারু ভ্রমণরত অবস্থায় বনগমন করে উপর্যুপরি তিনবার উচ্চৈঃস্বরে কন্যাভিক্ষা করেন। তখন বাসুকি ঐ বাক্য শ্রবণ করে তার ভগিনী জরৎকারুকে নিয়ে এসে মুনি জরৎকারুকে

তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কন্যার নামের সঙ্গে তার নামের একত্ব লক্ষ্য করে জরৎকারু মুনি তাকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় স্থির হয় যে, ইনি স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন না এবং স্ত্রী অন্যায় কোন আচরণ করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। কিছুদিন পরে জরৎকারু সন্তানসম্ভবা হন। একদিন মহর্ষি স্বীয় স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে নিদ্রিত আছেন, এমত অবস্থায় সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদির সময় অতিক্রান্তপ্রায় লক্ষ্য করে আশঙ্কিত স্ত্রী স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করেন। মহর্ষি জরৎকারু এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ করে স্ত্রীকে ত্যাগে করে চলে যান। যাবার সময় বলে যান যে, তার এক তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এবং এই পুত্রই আস্তীক নামে অভিহিত হবে।

(২) নাগরাজ বাসুকির ভগিনী। ইনিই মনসা দেবী, জরৎকারু মুনির স্ত্রী। মাতা কদ্রু সপত্নী বিনতার সহিত উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের বর্ণ শ্বেত কি কৃষ্ণ এই বিষয় নিয়ে তর্ক করেন ও মীমাংসায় বিজয়িনীর দাসীত্ব স্বীকার করতে অঙ্গীকার করেন। কদ্রু তার সর্পপুত্রদের আদেশ করেন যে, তারা যেন উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছলগ্ন হয়ে থাকে, যাতে পুচ্ছটি কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। যে সকল সর্প এই কাজ করতে অস্বীকার করে, তাদের তিনি অভিশাপ দেন যে, তারা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনষ্ট হবে। কদ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুকি সর্পকুল রক্ষার উপায় চিন্তা করতে থাকেন। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে বলেন যে, অভিশাপদানকালে তিনি মাতৃক্রোড় হতে শ্রবণ করেছিলেন যে, ব্রহ্মা দেবগণকে বলছেন, জরৎকারু মুনির ঔরসে বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভজাত সন্তান আস্তীক মুনি সর্পদের রক্ষা করবেন। বাসুকি জরৎকারু মুনির সন্ধান করে তাঁর সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ দেন। বিবাহকালে মুনি সর্ত করেন যে, যদি তাঁর স্ত্রী তাঁর কোন অপ্রিয় কার্য করেন, তবে তিনি স্ত্রী ও গৃহ উভয়ই পরিত্যাগ করবেন। একদা মুনি তাঁর স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্বক নিদ্রিত ছিলেন। সূর্যাস্তকাল উপস্থিত হলে সায়ংকৃত্যের সময় উত্তীর্ণ হবার আশঙ্কায় জরৎকারু স্বামীকে জাগ্রত করেন। মহর্ষি এতে অপমানিত বোধ করেন এবং বলেন যে, তিনি সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন সূর্যেরও অস্ত যাবার সামর্থ্য ছিল না। এই বলে, তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে প্রস্থান করেন। তখন জরৎকারু গর্ভবতী ছিলেন। তাঁর বহু অনুরোধেও মুনি নিবৃত্ত হন না। গমনকালে তিনি কেবল স্ত্রীর উদরে তিনবার হস্ত স্পর্শ করে বলেন যে, 'অস্তি' অর্থাৎ গর্ভে আছে। সেকারণেই জরৎকারুর গর্ভ-

জাত পুত্রের নাম হয় আস্তীক। ইনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ নষ্ট করে নির্বংশপ্রায় সর্পকুলকে রক্ষা করেন।

জরা—রাক্ষসী বিশেষ। এই রাক্ষসী জরাসন্ধের জন্মকালে তাঁর অর্ধশরীর যুক্ত করে তাঁকে জীবিত করেন। জরা প্রতি গৃহে ভ্রমণ করত বলে ব্রহ্মা এর নাম রেখেছিলেন গৃহদেবী। কথিত আছে, ভক্তিভরে গৃহদেবীকে কক্ষগাত্রে অঙ্কিত করে রাখলে গৃহস্বামীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই রাক্ষসীই ষষ্ঠি নামে খ্যাত। (মহাভারত—আদি)

(২) কৃষ্ণ যখন যদুবংশ ধ্বংসের পর বৃক্ষতলে মৌনভাবে অবস্থান করছিলেন, উক্ত সময় এই ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁকে বধ করে। কথিত আছে, এই ব্যাধ দ্বাপরে অঙ্গদের অবতার।

জরাসন্ধ—চন্দ্রবংশীয় মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র। বৃহদ্রথ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন। ইনি কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন, কিন্তু যৌবন গত হওয়ায় পুত্রলাভে বঞ্চিত হন। পরে পুত্রকামনায় মহর্ষি চণ্ডকৌশিককে আরাধনা করলে তিনি মহর্ষির কাছ থেকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম্রফল পান। চণ্ডকৌশিক বলেন যে, এই ফল খাওয়ার পর রাণীরা গর্ভবতী হবেন ও তাঁদের গর্ভে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। বৃহদ্রথ উভয় স্ত্রীর নিকটেই সমানভাবে প্রতিশ্রুত ছিলেন; সে কারণ উভয়কেই সমান দুইভাগে বিভক্ত করে ফলটি খেতে দেন। যথাকালে দুই রাণীই গর্ভিণীহয়ে অর্ধ অর্ধ অঙ্গবিশিষ্ট দুই পুত্র প্রসব করেন। উক্ত বিকৃত পুত্র দর্শনে ভীত ও দুঃখিত হয়ে দুই রাণীই ধাত্রীর সাহায্যে সেই সজীব দেহার্ধদ্বয় শ্মশানে পরিত্যাগ করে আসেন। উক্ত সময় জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুই খণ্ড দেহ দেখে তাকে পূর্ণাঙ্গ করবার অভিলাষে দুটিকে সংযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই এক সম্পূর্ণাঙ্গ বীর রাজকুমার সৃষ্টি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকে। সেই রোরুদ্যমান শিশুর স্বর শ্রবণ করে রাজা সস্ত্রীক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে নারীমূর্তিধারিণী উক্ত রাক্ষসী বৃহদ্রথকে সেই পুত্র দান করে বলে যে এই পুত্র ভুবনবিজয়ী বীর হবে এবং জন্মকালীন অবস্থার ন্যায় দ্বিধাবিভক্ত না হলে এর কখনো মৃত্যু হবে না। জরা রাক্ষসী কর্তৃক যোজিত বলে এর নাম হ'ল জরাসন্ধ।

যথাকালে জরাসন্ধকে রাজপদে প্রতিষ্ঠীত করে বৃহদ্রথ তাঁর দুই স্ত্রীর সঙ্গে তপোবনে গমন করেন। কালক্রমে জরাসন্ধ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। জরাসন্ধ তাঁর দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে কংসের হাতে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হলে জরাসন্ধ জামাতাবধের জন্য শত্রুনির্যাতন মানসে অষ্টাদশবার মথুরা

আক্রমণ করেন। কংসবধের সংবাদ পেয়ে জরাসন্ধ কৃষ্ণকে বধ করবার মানসে একটি গদা ঊনশততম বার প্রদক্ষিণান্তে গিরিব্রজ থেকে মথুরার অভিমুখে নিক্ষেপ করেন। সেই গদা ঊনশততম যোজন দূরস্থানে পতিত হয়। এরপর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধবধের জন্য প্রস্তুত হন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণবেশ ধরে মগধ যাত্রা করেন। রাজধানীতে প্রবেশ করে এরা তিনজন জরাসন্ধের সম্মুখে আসেন। এঁদের বেশ ব্রাহ্মণদের মত, কিন্তু বাহুতে ধনুর্গুণের আঘাত দেখে রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, এঁরা কে? কৃষ্ণ বলেন যে, যে সব ক্ষত্রিয়কে জরাসন্ধ বলি দেবার জন্য অবরুদ্ধ করে রেখেছেন, নানাপ্রকার হত্যা করে পাপসঞ্চয় করছেন, তা নিবারণকল্পে এঁরা তিনজন—কৃষ্ণ ও দুই পাণ্ডুপুত্র—তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন। ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের অনেকদিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে ভীম জরাসন্ধকে দুই হাতে তুলে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করেন এবং দুই পা ধরে টান দিয়ে তাঁর দেহ দ্বিধাবিভক্ত করার ফলে জরাসন্ধের মৃত্যু হয়। (মহাভারত)

জলন্ধর—দৈত্য বিশেষ। একদিন ইন্দ্র কৈলাসে শিবের সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এক ভীষণাকার পুরুষ দেখেন। শিবের কথা জিজ্ঞাসা করায় তার কোন উত্তর না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র তার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। সেই বজ্রাহত পুরুষের মস্তক হতে এক ভীষণ অগ্নি নির্গত হয়ে ইন্দ্রকে ভস্ম করতে উদ্যত হয়। তখন ইন্দ্র উপলব্ধি করেন যে, তিনি স্বয়ং রুদ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত করেছেন। নানারকম স্তব-স্তুতিতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলে পর মহাদেব তুষ্ট হয়ে সেই অগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তা থেকে তখন এক বালক আবির্ভূত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকে। এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে ব্রহ্মা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হন। তখন সমুদ্র ব্রহ্মাকে বলেন যে, 'এ আমার পুত্র, একে আপনি পালন করুন।' ব্রহ্মা তাকে নিজক্রোড়ে স্থাপন করেন। এই শিশু ব্রহ্মার শ্মশ্রু এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, ব্রহ্মার চক্ষু দিয়ে জলধারা নির্গত হতে থাকে। ব্রহ্মা সেই বালকের নাম রাখেন জলন্ধর এবং তাকে এই বর দেন যে, এক রুদ্র ছাড়া সে সকলেরই অবধ্য হবে। তাকে তিনি অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কালনেমির কন্যা বৃন্দার সহিত জলন্ধরের বিবাহ হয়। জলন্ধরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গচ্যুত হয়ে শিবের আশ্রয় নেন। মহাদেব জলন্ধরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দা

স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুর পূজা আরম্ভ করেন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ গ্রহণ করে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। স্বামী অক্ষত দেহে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন মনে করে পূজারতা বৃন্দা অসমাপ্ত পূজা ত্যাগ করেই চলে আসেন। এরই ফলে জলন্ধরের মৃত্যু হয়। বৃন্দা বিষ্ণুর এই কপট ব্যবহারে তাঁকে শাপ দিতে যান। তখন বিষ্ণু বললেন যে, 'তুমি সহমৃতা হও। তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ—এই চারি প্রকার বৃক্ষ জন্মলাভ করবে।' (পদ্মপুরাণ)

জম্ভ—জনৈক দৈত্য। মহিষাসুরের পিতা। কোন এক সময় জম্ভ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়। পরে তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে বর লাভ করে যে, সে পৃথিবীবিজয়ী পুত্রের অধিকারী হবে। বরপ্রাপ্তির পর প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তার ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং সে ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে। স্নান করবার অছিলায় জম্ভ সরোবরে গমন করে এবং সে স্থলে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পেয়ে তার গর্ভোৎপাদন ক'রে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ফিরে আসে এবং ইন্দ্রের হস্তে নিহত হয়। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

জন্তু—রাজা সোমকের শত স্ত্রী ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর এক পুত্র হয়। একদা সেই পুত্র পিপীলিকাদংশনে রোদন করলে রাণীগণ ও রাজা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। রাজা একটিমাত্র পুত্রলাভের জন্য রাজপুরোহিতকে আদেশ করলে তিনি বলেন যে, জন্তুকে যদি এক যজ্ঞে আহুতি দানে সম্মত হন তবে তিনি শতপুত্র লাভ করবেন। জন্তুও বামপার্শ্বে কনক-বর্ণ চিহ্নিত হয়ে তাঁর মাতৃগর্ভেই পুনর্জন্ম লাভ করবেন। রাজা যাজকের সহায়তায় জন্তুকে বলি দিয়ে যথাবিধি যজ্ঞ করলে শতপুত্র ও জন্তুকে পুনরায় লাভ করেন। মৃত্যুর পর সোমক ও পুরোহিত পরলোকে গমন করলে উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করবার জন্য পুরোহিতের নরকভোগ হয়। তখন সোমক তাঁকে পরিত্যাগ করতে অসম্মত হয়ে তাঁর সঙ্গেই স্বেচ্ছায় নরকভোগ করেন এবং পাপক্ষয় হলে উভয়েরই মুক্তিলাভ হয়।

জম্বুমালী—প্রহস্তের পুত্র। সীতার সন্ধানে হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করে প্রথমেই সীতার সঙ্গে পরিচিত হন। পরে সীতার অভিজ্ঞান নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবার আগে অশোকবন ধ্বংস করেন। জম্বুমালী রাবণ কর্তৃক হনুমানকে বধ করবার জন্য প্রেরিত হয়ে হনুমানের হাতে নিহত হয়। (রামায়ণ—লঙ্কা)

জম্বুদ্বীপ—পৃথিবীর সপ্তদ্বীপান্তর্গত একটি দ্বীপ। এর চারিদিকে লবণসমুদ্র। জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে ও অন্য ছয় দ্বীপ এর চারিদিকে পদ্মফুলের মত অব-

স্থিত। এই দ্বীপ নয় বর্ষে বিভক্ত। এই নয় বর্ষের নাম—ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষ, ভারত, কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ব।

জহ্নু—(১) একজন বিখ্যাত রাজর্ষি। এঁর পিতার নাম সুহোত্র ও মাতার নাম কেশিনী। উর্বশীর গর্ভে রাজা পুরূরবার সাত পুত্র হয়। অমাবসু এই সাত পুত্রের একজন। অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নাজিত। ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভ, কাঞ্চনপ্রভের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র জহ্নু। জহ্নু সর্বমেধ নামে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে জগতে খ্যাতিলাভ করেন। গঙ্গা পতিরূপে পাবার জন্য অভিসারিকা বেশে এঁর নিকট গমন করলে, জহ্নু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন। তখন গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞস্থল জলপ্লাবিত করায় রাজা জহ্নু রুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করে ফেলেন। মহর্ষিরা তখন গঙ্গাকে তাঁর কন্যাস্বরূপা বলে স্থিরীকৃত করেন। সেই থেকে গঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত হন। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। কাবেরীর গর্ভে জহ্নুর সুনহ নামে এক পুত্র জন্মে। (হরিবংশ)

(২) রাজা ভগীরথের পিতৃপুরুষদের উদ্ধারার্থ গঙ্গাকে পাতালে আনয়নকালে মর্তে রাজা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞভূমি প্লাবিত করে যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য ভাসিয়ে নিয়ে যান। জহ্নু ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে তপঃপ্রভাবে পান করে ফেলেন। অতঃপর দেব, গন্ধর্ব, ঋষি ও ভগীরথের স্তবে প্রসন্ন হয়ে জহ্নু গঙ্গাকে কর্ণপথে (মতান্তরে জানুদেশ দিয়ে) প্রবাহিত করে মুক্ত করে দেন। সেই হতে গঙ্গা জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী নামে অভিহিতা হন।

জহ্নুকন্যা—ভগীরথ আনীত গঙ্গা-প্রবাহে তপোবন প্লাবিত হলে মহর্ষি জহ্নু গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করে ফেলেন। পরে ভগীরথ স্তবস্তুতি দ্বারা জহ্নুকে তুষ্ট করলে মুনি তাঁর জানুদেশ বিদীর্ণ করে গঙ্গাকে মুক্তি দান করেন। সেই হতে গঙ্গা তাঁর কন্যাপদবাচ্যা।

জানপদী—একজন অপ্সরী। মহর্ষি শরদ্বানের (অন্য নাম গৌতম) কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র একে প্রেরণ করেন। এই অপ্সরা দর্শনে চিত্তবিকারের জন্য মুনির রেতঃপাত হয়। এই রেতঃ একটি শরস্তম্বে পড়ে দুইভাগে বিভক্ত হলে, তা হতে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। রাজা শান্তনু তাদের প্রত্যক্ষ করে কৃপাপরবশ হয়ে তাদের লালন-পালন করেন এবং নামকরণ করেন কৃপ ও কৃপী। কৃপী দ্রোণাচার্যকে বিবাহ করেন। (মহাভারত—আদি)

জাজলি—একজন ঋষি; অথর্ববেদবেত্তা পথ্যের শিষ্য। এক সময় ইনি ভীষণ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। ক্রমে

তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করার ক্ষমতা লাভ করে মনে মনে ধারণা করেন যে, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় তপস্বী। অন্তরীক্ষবাসী রাক্ষসরা তাঁর এই গর্বভাব জ্ঞাত হয়ে এঁকে বলেন যে, এইরূপ গর্ব প্রকাশ করা তাঁর অন্যায়। বারানসীবাসী বণিক্ তুলাধারও তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বণিকের নিকট গমনপূর্বক জ্ঞান ও উপদেশ গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য। তুলাধারের কাছে গিয়ে ঋষি জাজলি নানাবিধ সনাতন ধর্ম বিষয়ের উপদেশ শ্রবণান্তে শান্তিলাভ করেন (মহাভারত—শান্তি)।

জাবালি—(১) একজন ব্রহ্মর্ষি। অযোধ্যার রাজা দশরথের এক ব্যবহার-দ্রষ্টা ও যাজক ব্রাহ্মণ। রামের বনবাসকালে দশরথের মৃত্যুর পর ভরত যখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে যান, সেই সময় জাবালিও তাঁদের সঙ্গী হন। ভরতের শত অনুরোধসত্ত্বেও রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে অসম্মত হলে, জাবালি রামকে ধর্মবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়ে বলেন যে, রাজ্যত্যাগ করে রামের বনবাস গমন উচিত হয় নি। পিতামাতার প্রতি অন্ধভক্তি থাকাও যেমন উচিত নয়, তেমনি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহেলাপূর্বক বৃথা ধর্মপরায়ণ হয়ে ইহলোক ও পরলোকে কষ্ট পাওয়াও নিরর্থক। পরলোক প্রভৃতিও নেই; অতএব রামের উচিত রাজ্যভার গ্রহণ করা। এই উক্তির উত্তরে রাম জাবালিকে বেদ-বিরোধী নাস্তিক বলে ভর্ৎসনা করেন। তখন জাবালি রামকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেন, যে তিনি নাস্তিক নন, তবে সময় বুঝে নাস্তিক বা আস্তিক হয়ে থাকেন। বনবাস হতে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি রামকে নাস্তিকবাক্য বলেন, আবার তাঁর প্রসন্নতার জন্য অন্য কথাও বলেন। উক্ত সময় বশিষ্ঠও রামকে শান্ত করে বলেন যে, জাবালি সমস্তই জ্ঞাত আছেন, কেবলমাত্র রামকে বনবাস হতে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যই এই সকল বাক্য ব্যবহার করেন। জাবালি ব্যবহারবুদ্ধিযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ মহাতপস্বী ব্রাহ্মণোত্তম ছিলেন।

(২) জাবালা নাম্নী নারীর গর্ভজাত মহর্ষি সত্যকাম নিজের গুরু গৌতম কর্তৃক জাবালি নামে অভিহিত হয়েছিলেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ)।

জামদগ্ন্য—পরশুরামের অন্য নাম। ঋষি জমদগ্নির পুত্র বলে একে জামদগ্ন্য বলা হয়। বিষ্ণু জামদগ্ন্য অবতারে কার্তবীর্যার্জুনকে হত্যা ও পৃথিবী একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় কবার জন্য যে পাপ হয় তা মোচন করার জন্য জামদগ্ন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ পৃথিবী দান করেন। মহাদেবের নিকট পরশু অস্ত্র লাভ

করে ইনি পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন (পরশুরাম দেখ)।

জারিতা—(১) মন্দপাল নামে এক তপস্বী অপুত্রক ছিলেন বলে মৃত্যুর পর পিতৃলোকে স্থান লাভে সক্ষম হন না। দেবগণ তাকে পুত্রউৎপাদন করতে উপদেশ দেন। সন্তানলাভের আশায় মন্দপাল শার্ঙ্গক পক্ষী হয়ে জারিতা নাম্নি এক শার্ঙ্গিকার সঙ্গে সঙ্গম করেন। এর ফলে জারিতার গর্ভে চারিটি পুত্র হয়। পুত্রেরা অণ্ডের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থাতেই মন্দপাল তাদের ত্যাগ করে লপিতার নিকট গমন করেন। জারিতা এই পুত্রদের খাণ্ডব বনে প্রতিপালন করতে থাকেন। খাণ্ডববন দাহনকালে জারিতা পুত্রদের ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান এবং পরে অগ্নির কৃপায় তারা রক্ষা পেলে মন্দপাল ও জারিতা এসে এদের সঙ্গে মিলিত হন (মহাভারত—আদি)।

(২) পক্ষীবিশেষ। অগ্নি সম্বন্ধে এঁর রচিত কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র আছে।

জাম্ববান—ব্রহ্মার পুত্র ভল্লুকরাজ জাম্ববান ত্রেতাযুগে সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন ও রাম-রাবণের যুদ্ধকালে সুগ্রীব ও রামকে সাহায্য করেছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানের যুদ্ধ হয়। সত্রাজিত নামে এক যাদবরাজা কঠোর তপস্যা করে সূর্যের নিকট হতে স্যমন্তক মণি লাভ করেন। কৃষ্ণ এই মণি দর্শনে তা হস্তগত করারজন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে একদিন সত্রাজিতের ভাই প্রসেনজিৎ এই মণি ধারণপূর্বক মৃগয়ায় গমন করলে, বনের মধ্যে এক সিংহ প্রসেনজিতকে নিহত ক'রে এই মণি নিয়ে পলায়ন করে। উক্ত সময় জাম্ববান নিকটেই এক গুহায় বসবাস করত। সিংহের নিকট স্যমন্তক মণির সন্ধান লাভ করে জাম্ববান সিংহকে হত্যা করে মণিটি করায়ত্ত করে। দ্বারকায় জনরব রটে যে, কৃষ্ণ যখন একবার এই স্যমন্তক মণি সত্রাজিতের নিকট যাচ্ঞা করেছিলেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁরই চক্রান্তে প্রসেনজিতের মৃত্যু ঘটেছে। কৃষ্ণ নিজেকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রকৃত ব্যাপার অনুসন্ধান করতে রত হন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি জাম্ববানের গুহার নিকটে এসে স্যমন্তক অপহরণকারীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। একুশ দিন যুদ্ধ হবার পর জাম্ববান পরাজিত হয়ে এই মণি কৃষ্ণকে সমর্পণ করেন। জাম্ববান উপলব্ধি করেন যে, রামই কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরে তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দেন এবং বিষ্ণুর আরাধনায় রত হয়ে দেহত্যাগ করেন।

জাম্ববতী—কৃষ্ণের স্ত্রী। ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তক মণিসন্ধানে অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জাম্ববানভবনে উপস্থিত হন। সেখানে মণির

সন্ধান পেয়ে জাম্ববানকে যুদ্ধে পরাজিত করে মণিসহ জাম্ববতীকে স্ত্রীরূপে অধিকার করেন। জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণের শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবীণ ও কেতু প্রভৃতি নামে পুত্রের জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জুন কর্তৃক হস্তিনাপুরে নীত হলে ইনি কৃষ্ণের উদ্দেশে জ্বলন্ত অগ্নিতে মৃত্যুবরণ করেন।

জাম্বুমালী—প্রহস্তের পুত্র। সীতা অন্বেষণের সময় যখন হনুমান রাবণের উদ্যান ভঙ্গ করতে আরম্ভ করেছিল, সেই সময় রাবণ জাম্বুমালীকে অন্যান্য বীরদের সঙ্গে হনুমানের বিরুদ্ধে পাঠান। জাম্বুমালী হনুমানের হাতে স্তম্ভাঘাতে নিহত হয় (রামায়ণ)।

জাহ্নবী—ভগীরথের গঙ্গা আনয়নকালে গঙ্গা জহ্নু মুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করে তাঁর যজ্ঞোপকরণাদি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষে পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হয়ে জানু বিদীর্ণ করে (মতান্তরে কর্ণপথে) গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সেই হতে গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয়া—জাহ্নবী নামে খ্যাতা।

জিষ্ণু—অর্জুন। যুদ্ধকালে সাহসের সহিত অর্জুনের সমীপস্থ হতে কেহ সাহসী হত না, কারণ অত্যন্ত দুর্ধর্ষ শত্রুকেও ইনি সহজে জয় করতেন—এজন্য অর্জুনের অপর নাম জিষ্ণু।

জীমূত—বিরাটরাজ-ভবনে মহোৎসবকালে বল্লভ নামে পরিচিত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম বিখ্যাত মল্ল জীমূতকে পরাস্ত করেছিলেন (মহাভারত—বিরাট)।

জীমূতবাহন—মেঘবাহন ইন্দ্র।

জৃম্ভিক—অস্ত্রবিশেষ। রাম কর্তৃক তাডকা প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসী হত হলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এই অস্ত্র তাঁকে দান করেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার দ্বারা এই অস্ত্র অগ্নির নিকট হতে প্রাপ্ত হন। এই অস্ত্রপ্রয়োগে লোকে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ত। বিশ্বামিত্রের বরে লব ও কুশ এই অস্ত্র আপনা হতেই আয়ত্ত করেছিলেন (রামায়ণ)।

জৈগীষব্য—তপস্বী অসিত দেবল সকল সময়ে ব্রহ্মচর্য ও ধর্মকার্যে নিযুক্ত হয়ে দিনাতিপাত করতেন। এমন সময় একদিন জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি দেবলের আশ্রমে এসে যোগনিরত হয়ে বসবাস করতে থাকেন। তিনি কেবলমাত্র দেবলের ভোজনের সময় তাঁর সমীপস্থ হতেন। একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সমুদ্রে গিয়ে দেখলেন যে, জৈগীষব্য পূর্বাহ্ণেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্নানের পরও আশ্রমে ফিরে এসে দেবল দেখেন যে, তাঁর পূর্বেই জৈগীষব্য নীরবে সেখানে উপবিষ্ট আছেন। জৈগীষব্যের শক্তি-

পরীক্ষা করবার জন্য মন্ত্রজ্ঞ দেবল ব্যোমমার্গে উত্থিত হয়ে দেখলেন, অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের পূজারত রয়েছেন। অতঃপর তিনি আরও দেখলেন যে, জৈগীষব্য স্বর্গলোক, পিতৃলোক, যমলোক ও চন্দ্রলোক প্রভৃতি বহু ঊর্ধ্ব লোক বিচরণ করে অন্তর্হিত হলেন। সিদ্ধরা দেবলকে জানালেন যে, জৈগীষব্য শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন, সেখানে দেবলের যাবার শক্তি নেই। তখন দেবল আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে জৈগীষব্যকে দেখে তাঁর কাছে মোক্ষধর্ম শিক্ষা করার অভিলাষ জ্ঞাপনকরলেন। দেবল ভেবে দেখেছিলেন, মোক্ষধর্ম ও গার্হস্থধর্মের মধ্যে মোক্ষধর্মই শ্রেষ্ঠ; তখন তিনি জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষধর্ম শিক্ষা ও গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন (মহাভারত—শল্যপর্ব)।

জৈমিনী—পূর্ব-মিমাংসাদর্শন প্রণেতা ঋষি। ইনি বেদব্যাসের কাছে সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। এঁর রচিত ভারতসংহিতা জৈমিনিভারত নামে বিখ্যাত। এঁর পূর্বমীমাংসা ষড়দর্শনের অন্যতম। ইনি এবং বৈশম্পায়ন প্রভৃতি পাঁচজন বজ্রবারক নামে প্রসিদ্ধ। এই জন্য কারও কারও মতে এঁরা তড়িৎ-বিদ্যায় প্রভূত উন্নতিলাভ করেছিলেন। ইনি দ্রোণপুত্রদের নিকট মার্কণ্ডেয় পুরাণ শ্রবণ করেন। এঁর পুত্রের নাম সুমন্ত ও পৌত্রের নাম সুত্বান্।

জ্বর—দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে মহাদেবের ঘর্মবিন্দু হতে উৎপন্ন একপুরুষ। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব জ্বরকে নানাভাগে বিভক্ত করেন। হস্তি-মস্তকের তাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের শৈবাল, সর্পের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, ভূমির ঊর্বরতা, পশুর দৃষ্টিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখোদ্‌ভেদ, কোকিলের চক্ষুরোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা এবং শার্দূলের শ্রমকে জ্বর বলা হয়। বৃত্রবধকালে মহাদেব ইন্দ্রের দেহে তেজ ও বৃত্রের দেহে জ্বররোগ সংক্রামিত করে বৃত্রকে বজ্রাঘাতে বধ করবার জন্য ইন্দ্রকে আদেশ দেন। ইন্দ্রও সেই ভাবে বৃত্রকে বধ করেন (মহাভারত—শান্তি)।

জ্যামঘ—পুরুবংশীয় একজন রাজা। এঁর স্ত্রীর নাম শৈব্যা। জ্যামঘ অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে সাহসী হন নাই। একদিন ঘটনাচক্রে কোন এক শত্রুকে পরাজিত করে জ্যামঘ তাঁর গৃহ হতে ভোজ্যা নামে এক কন্যাকে হরণ করে নিয়ে এলেন। রথের পার্শ্বে এক অপরিচিতা সুন্দরী নারীকে দেখে স্ত্রী শৈব্যা কুপিতা হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই নারী কে?' রাজা উত্তর দিলেন, 'এই মেয়েটি তোমার পুত্রবধূ।' শৈব্যা জিজ্ঞাসা

করলেন, 'বন্ধ্যা স্ত্রীর আবার পুত্রবধূ কি করে হয়?' তখন রাজা উত্তর দিলেন, 'তুমি যে পুত্র প্রসব করবে, এই কন্যা তার স্ত্রী হবে।' তখন শৈব্যা পুত্র প্রসব করবেন—এই আশায় নির্বাক হয়ে রইলেন। পিতৃগণ ও দেবগণের আশীর্বাদে শৈব্যা গর্ভধারণ করে এক সুন্দর পুত্রের জন্ম দিলেন। বিদর্ভ নামে এই কুমার ভোজ্যাকে বিবাহ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

ড

ডাকিনী—পিশাচীবিশেষ। এরা হর-পার্বতীর অনুচরী।

ডিম্বক—শাল্ব নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। এঁর দুই রূপবতী স্ত্রী। পুত্রলাভের জন্য ব্রহ্মদত্ত দশ বৎসর যাবৎ মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি প্রীত হয়ে স্বপ্নে রাজাকে বর দেন যে, তাঁর দুই রাণীর গর্ভে দুইটি পুত্রলাভ হবে। কালক্রমে দুই রাণীর দুই মহাবীর্য পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম হংস ও কনিষ্ঠপুত্রের নাম ডিম্বক। ক্রমে এই হংস ও ডিম্বক হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেব এঁদের আরাধনায় প্রীত হয়ে বর দান করেন যে, এই দুই ভ্রাতা দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও দানবদের অবধ্য হবে ও সমস্ত রুদ্রাস্ত্র এঁদের করতলগত হবে। সেই বরে এঁরা দেব-দানবদের অজেয় হয়ে উঠলেন। এই দুই ভ্রাতা একবার মৃগয়ার্থ বনগমন করে দুর্বাসার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করলে, দুর্বাসা এঁদের অভিশাপ দেন। এর ফলে, এঁরা দুইজন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসার সমূহ দ্রব্যাদি ছিন্ন ভিন্ন করে তাঁকে বিশেষ অপমানিত করেন। তখন দুর্বাসা কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে এর প্রতিবিধান প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ এতে রাজী হন। এর পর হংস ও ডিম্বক রাজসূয় যজ্ঞের জন্য কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তাঁদের ঔদ্ধত্যের প্রতিকার করবার জন্য কৃষ্ণ এঁদের যুদ্ধে আহ্বান করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে হংসের কালীয় হ্রদে ও সাত্যকির সঙ্গে ডিম্বকের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অবশেষে ডিম্বক যখন জ্ঞাত হন যে, হংস কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়েছেন, তখন তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক যমুনায় প্রাণবিসর্জন দেন (হরিবংশ)।

ডুণ্ডুভ—একদা সহস্রপাদ নামে এক ঋষি খগম নামে তাঁর ব্রাহ্মণ-সখার অভিসম্পাতে ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) দশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। খগমের বাক্য অব্যর্থ ছিল। একবার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকার সময় খগমকে তৃণনির্মিত সর্প নিয়ে সহস্রপাদ ভয় দেখান। ফলে ভয়ে খগম মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞানলাভ করে খগম বলেন যে, তাঁকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য যেমন সহস্রপাদ নির্বিষ সর্প তৈরি

করেছিলেন, খগমের শাপে সহস্রপাদও স্বয়ং সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হবেন। বহু অনুনয়ের পর খগম বলেন যে, তাঁর কথা মিথ্যা হবে না; তবে প্রমতীর পুত্র রুরুর দর্শনলাভ করলে সহস্রপাদ মুক্তিলাভ করবেন। রুরুর স্ত্রী প্রমদ্বরা দুর্দৈবক্রমে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করলে, দেবদূতের পরামর্শে রুরু তাঁর অর্ধায়ু দান করে প্রমদ্বরাকে জীবিত করেন বটে, কিন্তু সর্পকুল বিনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি সকল প্রকার সর্প বধ করতে করতে একবার বনমধ্যে গিয়ে এক ডুণ্ডুভকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, সে বলে ওঠে যে, মনুষ্যদংশনকারী সর্পরা এক জাতি আর সে অন্য জাতি, অতএব ডুণ্ডুভ বধ করা তাঁর উচিত নয়। রুরু তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, ডুণ্ডুভরূপী সহস্রপাদ পূর্ব-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন ও পূর্বরূপ ফিরে পেয়ে রুরুকে অহিংসাধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হন (মহাভারত—আদি)।

ত

তন্ত্র—শিব ও শক্তির উপাসনা যে শাস্ত্রদ্বারা বিস্তার করা হয়েছে, তাকে তন্ত্র বলে। সর্বসুদ্ধ ১৯২টি তন্ত্র আছে, তার মধ্যে ৬৪টি বাংলা দেশের। মহাতন্ত্র ছাড়া কতকগুলি উপতন্ত্রও আছে। বিশেষজ্ঞের মতে পুরাণের পর এই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। স্ত্রী-শক্তির উপাসনা হিন্দুধর্মে প্রথম হতেই নিহিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তন্ত্র এই শক্তিপূজাকে বিশেষভাবে প্রচারিত করে। তন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই—প্রত্যেক দেবতার মধ্যে একটি জাগ্রত বামাশক্তি আছে। দেবতার এই জাগ্রত প্রকৃতি তাঁর শক্তি বা স্ত্রী রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক তন্ত্রে দেবীর বা শিবশক্তির বিভিন্ন রূপকে পূজা করা হয়েছে। দেবতাদের কথোপকথনচ্ছলে এই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারিত হয়েছে। তন্ত্রকে একটি গুহ্যশাস্ত্র (mystic doctrine) বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ছাড়া কারো কাছে এই শাস্ত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে: ধন দেবে, স্ত্রী দেবে, আপন প্রাণ পর্যন্ত দেবে কিন্তু গুহ্যশাস্ত্র কারো কাছে প্রকাশ করবে না। শিবের স্ত্রী বা দেবী একটি বিশেষ শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়ে যৌন সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে তন্ত্রশাস্ত্রকে কার্যকরী করেছে। এই দুটি জিনিষই তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ অবলম্বন। তন্ত্রপূজায় পাঁচটি জিনিসের বিশেষ আবশ্যকতা আছে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মিথুন। প্রত্যেক শক্তির দুই প্রকৃতি বা স্বভাব আছে—শ্বেত বা কৃষ্ণ, অর্থাৎ নম্র বা উগ্র স্বভাব। উমা ও গৌরী শিবের নম্রশক্তির প্রতীক এবং দুর্গা ও কালী

রুদ্রশক্তির প্রতীক। শক্তির উপাসক বা শাক্তরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। দক্ষিণাচারী শাক্তরা উগ্র তন্ত্রপূজার বিরোধী আর বামাচারীরা উগ্র তন্ত্র-পূজারী ও নানাবিধ যৌন ও উদ্ভট পদ্ধতির সমর্থনকারী। এই বামাশক্তিকে কল্পিতরূপে নয়, বাস্তবরূপে পূজা করা হয়। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে নারীর সহিত যৌনসম্বন্ধ সূচিত করে শক্তিপূজা করা হয়। দক্ষিণাচারীরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে অর্চনা করে থাকেন। তারা বামাচারীদের ন্যায় মদ্য, মাংস বা কারণ ব্যবহার দ্বারা শক্তিসাধনা করেন না। বাংলায় তান্ত্রিক অর্থে প্রধানতঃ বামাচারীদেরই বুঝায়। আবার কোন কোন স্থলে দক্ষিণাচার ও বামাচারের মিশ্রণও দেখা যায়। হিন্দুদের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হয়েছিল।

তক্ষ—দশরথের পৌত্র। ভরতের অন্যতম পুত্র। ভরত গান্ধার দেশ জয় করে নিজের পুত্র তক্ষের নামানুসারে তক্ষশীলা ও পুষ্কলের নামানুসারে পুষ্কলাবত নগর স্থাপন করেন (রামায়ণ)।

তক্ষক—প্রধান অষ্টনাগের মধ্যে তক্ষক অন্যতম। পুরাণমতে অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক—এই তিনজন প্রধান। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতা এবং অনন্তনাগ নামেও প্রসিদ্ধ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও তাঁহার স্ত্রী দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইন্দ্রের সহিত তক্ষকের বন্ধুত্ব ছিল। এঁর বাসস্থান ছিল খাণ্ডববনে। মন্দাগ্নির জন্য কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় অগ্নির খাণ্ডবদাহনকালে তক্ষক উক্ত স্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র পলায়নকালে অর্জুনের শরে বিদ্ধ হন। ফলে, অর্জুন তাঁর শত্রুপদবাচ্য হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ মৃগয়াকালে মৌনী তপোরত মহর্ষি শমীকের স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করে অপমান করলে, শমীকের পুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক অভিশপ্ত হন যে, সপ্তরাত্রির মধ্যে তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। শমীক পরীক্ষিতকে অভিশাপের বিষয় জ্ঞাত করে সতর্ক করে দেন। পরীক্ষিৎ একটিমাত্র স্তম্ভের উপর এক সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করে, বিষ-চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সাবধানে বসবাস করতে থাকেন। সপ্তম দিবসে কাশ্যপ নামে এক দক্ষ বিষ-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের নিকট গমনরত ছিলেন। তক্ষকও উক্ত দিবসে অভিশাপের বিবরণ জ্ঞাত হয়ে অর্জুনের বংশধরকে দংশনেচ্ছায় যাত্রা করেন। পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কাশ্যপের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তাঁর শক্তি পরীক্ষার্থে তক্ষক এক বটবৃক্ষকে দংশন করে

ভস্মীভূত করলে, কাশ্যপ মন্ত্রবলে তাকে পুনরায় জীবিত করেন। এতৎদৃষ্টে তক্ষক কাশ্যপকে বলেন যে, রাজার আয়ু ক্ষয় হয়ে এসেছে; অতএব তাঁকে এখন চিকিৎসা করা বৃথা; সুতরাং কাশ্যপ যেন আশাতিরিক্ত ধন তক্ষকের নিকট হতে গ্রহণ করে বিদায় হন। কাশ্যপ ধ্যানবলে তক্ষকের কথা সত্য বলে জ্ঞাত হয়ে তাঁর কাছ হতে অভীষ্ট ধন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তক্ষক কয়েকজন ব্রাহ্মণবেশী নাগের সাহায্যে রাজার নিকট কিছু ফলমূলাদি প্রেরণ করেন। রাজা উক্ত ফল গ্রহণ করে খাবার উপক্রম করলে, ফলমধ্যে তিনি একটি কৃষ্ণবর্ণ কীট দর্শনে বলেন যে তাঁর আর কোন ভয় বা দুঃখ নেই—শৃঙ্গীর বাক্যই সত্য হোক। এই কীট তক্ষকরূপ ধারণপূর্বক তাঁকে দংশন করুক। এই উক্তি করে তিনি সহাস্যে কণ্ঠদেশে সেই কীটটি স্থাপন করেন। তখন তক্ষক নিজমূর্তিধারণপূর্বক পরীক্ষিতকে দংশন করে প্রস্থান করেন। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জনমেজয় রাজা হন।

উপাধ্যায় বেদের শিষ্য উতঙ্ক যখন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রাজা পৌষ্যের রাণীর নিকট হইতে উপাধ্যায়ানীর জন্য মণিকুণ্ডল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তক্ষক ঐ কুণ্ডল হরণ করেন। পরে উতঙ্ক নাগলোকে গিয়ে সেই কুণ্ডল তক্ষকের নিকট হতে উদ্ধার করেন। উতঙ্ক তক্ষকের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বিনাশ করার জন্য রাজা জনমেজয়কে উত্তেজিত করেন। জনমেজয় উতঙ্ক এবং তাঁর মন্ত্রিদের নিকট পিতার মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণ করে সর্পসত্রের আয়োজনের দ্বারা সর্পকুল বিনাশের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে, বহু সর্প বিনষ্ট হয়। তক্ষক তখন ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় নেন, কিন্তু তক্ষকযজ্ঞের হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। বস্ত্রাঞ্চলে তক্ষককে গোপন করে ইন্দ্র যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন। রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকসহ ইন্দ্রকেই যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে, ইন্দ্র তক্ষককে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন। পরিশেষে বাসুকির ভগিনী মনসাদেবীর পুত্র আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে জনমেজয়কে তুষ্ট করে অগ্নিতে পতনোন্মুখ তক্ষক ও অবশিষ্ট সর্পকুলকে রক্ষা করেন।

তক্ষশীলা—রাজা জনমেজয় এই নগরীতে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। ভরতের পুত্র তক্ষের নামানুসারে এইস্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। এই নগরীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। বর্তমানে ইহা পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। এইস্থানে এখনও বহু বৌদ্ধমন্দির ও ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হয়।

তন্তিপাল—বিরাট গৃহে গুপ্তভাবে

অবস্থানকালে সহদেব তন্তিপাল নামে পরিচিত ছিলেন (মহাভারত)।

তপতী—সূর্যের রূপবতী কন্যা। সাবিত্রীর কনিষ্ঠা। সূর্যের স্ত্রী ছায়ার গর্ভে এঁর জন্ম। সূর্য এই কন্যার উপযুক্ত একটি পাত্র বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাপ্ত হন না। উক্ত সময় কুরুবংশীয় ঋক্ষ নামধারী এক রাজার পুত্র সূর্যভক্ত সংবরণ প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতেন। এই রূপবান্ ধার্মিক রাজার হাতে নিজের কন্যাকে দান করবেন বলে সূর্য স্থির করেন। একদা সংবরণ বনে মৃগয়া করতে গেলে তার অশ্ব তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পড়ে। তখন সংবরণ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে এক রূপবতী কন্যাকে দেখতে পান। তিনি মুগ্ধ হয়ে কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গেলে সে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাতে রাজা কামমোহিত হয়ে ভূমিতেপতিত হন। তখন তপতী পুনরায় ফিরে এসে তাঁকে উত্থিত হতে ও তাঁর পিতা সূর্যকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে বলেন। রাজা পুরোহিত বশিষ্ঠকে স্মরণ করেন। বশিষ্ঠের মধ্যস্থতায় তপতী ও সংবরণের বিবাহ হয়। বিবাহান্তে সংবরণ মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে দ্বাদশ বৎসর উপবনে পত্নীসহ সুখে বিহার করতে থাকেন। এই বার বৎসর তাঁর রাজ্যের প্রজারাও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করতে থাকে। অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্দশার অবধি থাকে না। বশিষ্ঠ তখন সংবরণ ও তপতীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনলে ইন্দ্র আবার বারিবর্ষণ করে রাজ্যরক্ষায় সহায়তা করেন। তপতীর গর্ভে কুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই কুরুই কৌরববংশের প্রতিষ্ঠাতা (মহাভারত – আদি)।

তমসা—এই নদীর নিকট আশ্রমে মহামুনি বাল্মীকির কণ্ঠ হতে বীণাযন্ত্রের লয়যুক্ত ছন্দোবদ্ধ প্রথম শ্লোকের উৎপত্তি হয়েছিল। শ্লোকটি হচ্ছে—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ
শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ
কামমোহিতম্॥

বনগমনের সময় এই তমসানদীরতীরে রামচন্দ্র রাত্রিযাপন করেছিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে এই নদী পর্যন্ত অনুগমন করেছিলেন (রামায়ণ)।

তরণীসেন—বিভীষণের স্ত্রী সরমার গর্ভজাত পুত্র। ইনি পিতার ন্যায় ধার্মিক ও রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু রাবণের আদেশে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণবিসর্জন দেন।

তাড়কা—রাক্ষসীবিশেষ। সুকেতু নামে এক যক্ষের কন্যা। সুকেতু তপস্যার প্রীত হয়ে ব্রহ্মা বরদান করেন। তার ফলে, সুকেতু সহস্র হস্তীতুল্যা বলশালিনী এক কন্যা

প্রাপ্ত হন। এই কন্যার নাম তাড়কা। জম্ভ-দৈত্যের পুত্র সুন্দ অসুরের সহিত তাড়কার বিবাহ হয়। এর ফলে, তাড়কার বলশালী পুত্র মারীচের জন্ম হয়। কোন এক অপরাধের জন্য অগস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে সুন্দকে বিনাশ করেন। এই কারণে তাড়কা ও মারীচ উভয়েই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অগস্ত্যকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। তখন তাঁর শাপে তাড়কা বিকৃতাননা রাক্ষসী ও মারীচ ভীষণ রাক্ষসে পরিণত হয়। পরে সেখানকার মলদ ও করূষ নামধেয় দুইটি সমৃদ্ধ জনপদ তাড়কা বিনষ্ট করে। তারপর এই রাক্ষস-রাক্ষসী মাতা ও পুত্র উভয়ে গো, ব্রাহ্মণ ও আশ্রমবাসীদের উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করে। অগস্ত্যের আশ্রমস্থ তপস্বীরা এদের উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করেন। মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবন ক্রমে তাড়কা রাক্ষসীর বনে পরিণত হয়। শেষে এমন অবস্থা উপনীত হয় যে, এঁদের অত্যাচারে কেহই আর যজ্ঞাদি করতে সমর্থ হয় না। পরে বিশ্বামিত্র এদের দমন করার অভিলাষে অযোধ্যায় গিয়ে তাড়কাবধের জন্য রাজা দশরথকে অনুনয় করে তার দুই পুত্র রাম-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সেই বনে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে রামের হাতে তাড়কা নিহত এবং মারীচ রামের বাণে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। সীতাহরণকালে রাবণকে সাহায্য করে মারীচ মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয় (রামায়ণ)।

তামস—চতুর্দশ মনুর অন্যতম। ইনি চতুর্থ-মনু। বিভিন্ন পুরাণে এই মনুর বিভিন্ন পুত্রসংখ্যা, বিভিন্ন দেবতা, বিভিন্ন সপ্তর্ষির নাম পাওয়া যায়।

তামসী—(১) এক প্রকার মায়াবিদ্যা। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে মহাদেব মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যাপ্রভাবে মেঘনাদ অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতেন (রামায়ণ)। (২) মহাকালী।

তারকাক্ষ—ত্রিপুর দেখ।

তারকাসুর—দেবতা-বিদ্বেষী এক অসুর। তারকা দেবতাদের জয় করবার জন্যে সহস্র বৎসর তপস্যা করেও কোন ফল লাভ করতে পারে না। তখন তার মস্তক হতে এক তেজ নিঃসৃত হয়ে দেবতাদের দগ্ধ করতে থাকে। এতে সমস্ত দেবতারা অতিশয় ভীত হয়ে ব্রহ্মার কাছে এসে সমস্ত বিবৃত করে তাঁকে বর প্রদান করতে বলেন। তখন ব্রহ্মা তারকাসুরের কাছে গিয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। তারকা ব্রহ্মার কাছে দুইটি বর প্রার্থনা করেন। এক বরে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না, আর দ্বিতীয় বরে একমাত্র মহাদেবের বীর্যসম্ভূত পুত্রের হস্তে ভিন্ন তার মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার এই দুই বরে বলীয়ান হয়ে তারকা

দেবতাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। দেবতারা তখন বাধ্য হয়ে আবার ব্রহ্মা'র শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা দেবতাদের জানান যে, তাঁর পক্ষে তারকাকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, একমাত্র শিবের বীর্য থেকে উদ্ভূত পুত্রই তারকাকে হত্যা করতে পারে। ব্রহ্মা দেবতাদের উপদেশ দেন যে, যাতে মহাদেবের সন্তান হবার ইচ্ছা হয়, তার চেষ্টা করতে। তখন দেবতারা কামদেবের সহিত হিমালয়ে যোগমগ্ন মহাদেবের কাছে আসেন। সেই সময়ে হিমালয়-দুহিতা উমা শিবের আরাধনায় মগ্ন হয়ে তাঁর সম্মুখেই ধ্যানরতা ছিলেন। কামদেব তাঁর পুষ্পধেনু হতে শর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়। মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতেই কন্দর্পের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। কাম-দেব তৎক্ষণাৎ তাঁর নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হন। এর পর পার্বতী মহাদেবকে লাভ করার জন্য আরো কঠোর তপস্যায় রত হন এবং তপস্যার ফলে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। কিন্তু পতি-পত্নীরূপে দীর্ঘকাল সম্ভোগের পরেও এঁদের কোনো সন্তান না হওয়ায় দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন; কারণ, তারকার উৎপীড়ন তখন একেবারে অসহ্য হয়ে পড়েছিল। তখন অগ্নি কপোতের রূপ ধারণ করে মহাদেবের নিকট আসেন। মহাদেব কপোতকে দেখে তাঁর শুক্র ধারণ করতে আদেশ দিয়ে সম্ভোগে বিরত হন। কপোত-রূপী অগ্নি শিববীর্য ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় বীর্য নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা সে বীর্য ধারণে অশক্ত হয়ে তা হিমালয়ের পার্শ্বস্থ শরবনে ত্যাগ করেন। এতে বিপদ উপস্থিত হবে ভেবে দেবতারা ছয়জন কৃত্তিকাকে ঐ বীর্য রক্ষা করার জন্য বনে প্রেরণ করেন। কৃত্তিকারা এই বীর্যপানের পর গর্ভধারণ করেন ও এই ছয় কৃত্তিকা সকলেই একত্রে ছয় সন্তান প্রসব করেন।

এদের ছয় পুত্রকে একত্র মিলিত করে এক (ষড়ানন) পুত্র সৃজিত হয়। পরে দেবী বসুন্ধরা এই পুত্রকে গ্রহণ করেন এবং শরবনে ঐ পুত্র ক্রমে বর্ধিত হতে থাকে। এই পুত্রের নাম হয় কার্তিকেয়। কার্তিকেয় বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর, দেবতাদের নিকট হতে তারকাসুরের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করে দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হন এবং তারকাকে নিহত করেন (শিবপুরাণ ও দেবীভাগবত)।

তারা—(১) দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী। চন্দ্র একবার তারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করেন। বৃহস্পতি চন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য দেবতাদের সাহায্য ভিক্ষা করেন। দেবতা ও ঋষিগণ তারাকে প্রত্যর্পণের

জন্য চন্দ্রকে অনুরোধ করলে, চন্দ্র অসম্মত হন এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সাহায্য কামনা করেন। রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পুনরায় দেবাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে ব্রহ্মা মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন ও তারাকে বৃহস্পতির হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। ইতিমধ্যে তারা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় বৃহস্পতি তাকে গর্ভ ত্যাগ করে তাঁর নিকট আসতে বলেন। তারা গর্ভ ত্যাগ করে প্রত্যবর্তন করার পর এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম দস্যু সুন্তম। ব্রহ্মা তারাকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, এই পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত। তখন চন্দ্র এই পুত্রকে গ্রহণ করে তার নামকরণ করেন বুধ।

(২) কিষ্কিন্ধ্যার বানরাধিপতি বালীর স্ত্রী। ইনি সুষেণ নামে বানর-রাজের কন্যা ও অঙ্গদের মাতা। বালী রামচন্দ্রের হাতে নিহত হলে রামের আদেশে ইনি দেবর সুগ্রীবকে বিবাহ করেন। প্রাতঃকালে উঠে এঁর নাম করলে সেদিন মঙ্গলে যায়। ইনি পঞ্চকন্যাদের অন্যতমা।

(৩) দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। সতী দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্য মহাদেবের নিকট বারবার অনুমতি চেয়েছিলেন ; কিন্তু মহাদেব অনুমতি না দেওয়াতে সতী মহাদেবকে ভয় দেখানোর জন্য দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেন—এর মধ্যে একটি 'তারা' রূপ।

তিলোত্তমা—দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করে, কিন্তু ব্রহ্মা এদের অমরত্বের বরদানে সম্মত হন না। তবে তিনি বলেন যে, স্থাবর-জঙ্গম কোন প্রাণী হতেই এদের কোনো ভয় থাকবে না। যদি এদের কখনো মৃত্যু হয়, তবে পরস্পরের হাতেই হবে। এই বর পাবার পর তারা যখন আবার দেবতাদের পীড়নে রত হলো, তখন দেবতা, ঋষি, যক্ষ ইত্যাদি প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন দেবতা ও মহর্ষিদের প্রার্থনায় এদের বধের জন্য ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বললেন। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মা এক অতুলনীয়া নারী সৃষ্টি করেন। তিল তিল করে সুন্দর বস্তু মিলিত হয়ে এই সুন্দরীর সৃষ্টি হয়েছিল বলে এর নাম হয় তিলোত্তমা। সৃষ্টির পরে তিলোত্তমা দেবতাদের প্রদক্ষিণ করেন। তাঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখের সৃষ্টি হয় এবং ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হয়। সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্রহ্মা একে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিলোত্তমা তাদের সম্মুখে গিয়ে নৃত্য

করতে থাকে। সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্যে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করে ও একে অন্যকে নিহত করে।

একবার তিলোত্তমা বলির পুত্র সাহসিকের সহিত খেলায় মত্ত হয়ে ঋষি দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করেন। ফলে, তিনি দুর্বাসার শাপে বাণের কন্যা উষা রূপে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ)।

তুলসী—ইনি কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী। একদিন গোলোকে (স্বর্গে) তুলসীকে কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখে রাধিকা এঁকে অভিশাপ দেন যে, 'তুমি মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করবে।' এতে কৃষ্ণ দুঃখিত হয়ে তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, 'মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যাদ্বারা তুমি আমার এক অংশ লাভ করবে।' রাধিকার শাপে ইনি পৃথিবীতে রাজা ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুলসী নামে অভিহিত হন। অতঃপর তুলসী বনগমন করে ব্রহ্মার তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা স্থির থাকতে না পেরে তুলসীকে ঈপ্সিত বর দিতে সম্মত হন। তুলসী বলেন যে, তিনি নারায়ণকে স্বামীরূপে কামনা করেন। একথা শ্রবণ করার পর ব্রহ্মা বলেন যে, 'এখন তুমি কৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূত সুদামের স্ত্রী হও, পরে কৃষ্ণকে লাভ করবে। রাধিকার শাপে সুদাম দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করবে। তার নাম হবে শঙ্খচূড়। নারায়ণের শাপে তুমি বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর অতি প্রিয় হবে। তুমি না জন্মগ্রহণ করলে তাঁর সকল পূজাই ব্যর্থ হবে।' যথা-সময়ে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে রাজা ধর্মধ্বজের কন্যা তুলসীর বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে, তার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হলেই তার মৃত্যু হবে। শঙ্খচূড়ের অত্যাচার ও উৎপাত সহ্য করতে না পেরে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মার সহিত শিবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। শিব তখন সকলের সঙ্গে নারায়ণের সমীপস্থ হন। দেবতাদের দুর্দশা দর্শনে নারায়ণ বললেন যে, আমার শূলদ্বারা শিব শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধে রত হলে পর, আমি এর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করব। শিব শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করেন। তখন শিবের হাতে শঙ্খচূড় নিহত হয়। তার অস্থি লবণ-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে এই অস্থি হতে দেবপূজার জন্য নানাপ্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হয়। নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ গ্রহণপূর্বক তাঁর সতীত্ব নষ্ট করছেন জ্ঞাত হয়ে তুলসী নারায়ণকে অভিশাপ দেন যে, 'তুমি পাষাণে পরিণত হও।' স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তুলসী নারায়ণের চরণে পতিত

হন। তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে নারায়ণ বললেন যে, 'তোমার দেহ থেকে গণ্ডকী নদী উৎপন্ন হবে, আর তোমার কেশ থেকে উৎপন্ন হবে তুলসীবৃক্ষ।' তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয়া হবে।' সেই হতে নারায়ণ শিলারূপে অবস্থিত হয়ে সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

পদ্মপুরাণে তুলসী সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত কথিত আছে—জলন্ধর নামে এক অসুরের স্ত্রী ছিলেন বৃন্দা। জলন্ধর ইন্দ্রকে পরাস্ত করে অমরাবতী অধিকার করলে, ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হন। শিব জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে পতিপরায়ণা বৃন্দা স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার নিকটে এলে স্বামীকে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে দেখে, বৃন্দা অসমাপ্ত বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করে আসায় জলন্ধরের মৃত্যু হয় (অন্য মতে বৃন্দার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে জলন্ধরের মৃত্যু হবে না জেনে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন)। বৃন্দা সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। সতীর শাপ অমোঘ জেনে বিষ্ণু ভীত হন এবং বৃন্দাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, 'তুমি সহমৃতা হও, তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ, এই চারিপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। বৃন্দা হতেই তুলসীর জন্ম।

তুলাধার—বারাণসী নিবাসী ধর্মপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন এক বণিক। মহর্ষি জাজলি বহু তপস্যা করেও সফল হতে না পেরে শেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য এঁর কাছে আসেন এবং উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন (মহাভারত)।

তুর্বসু—রাজা যযাতির এক পুত্র। যযাতির ঔরসে ও দেবযানীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। যযাতি তুর্বসুকে একদিন বলেন যে, বিষয়ভোগে তাঁর পরিতৃপ্তি হয়নি। তিনি পুত্রের যৌবন কামনা করেন এবং তার পরিবর্তে পুত্রকে নিজের জরা দিতে চান। চার সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন ভোগ করার পর তিনি তা পুত্রকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। পুত্র এতে অস্বীকার করায় তিনি পুত্রকে অভিশাপ দেন (মহাভারত—আদি)।

তুম্বুরু—একজন গন্ধর্ববিশেষ। এই গন্ধর্ব চৈত্রমাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করে সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন।

রম্ভাতে আসক্ত হয়ে অনুপস্থিত ছিল বলে প্রভু কুবের একে অভিশাপ দেন। এর ফলে, সে বিরাধ নামে এক ভীষণ রাক্ষসে পরিণত হয়। এই রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট হতে অবধ্য

হবার বর লাভ করে। সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী ভয়াবহ ছিল তার দেহ—প্রকাণ্ড মুখ, বৃহৎ উদরগহ্বর, রক্তাক্ত কলেবর, বিকলাঙ্গ ও ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ছিল তার শরীর। দণ্ডকারণ্যে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ হয়। দুই ভ্রাতার সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে এই রাক্ষস পরাজিত হয় বটে, কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণ একে নিহত করতে সক্ষম হন না। জীবিত অবস্থাতেই একে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়। সেই মাটি হতে এক সুন্দর পুরুষ উত্থিত হয়ে বলে যে, সে পূর্বে এক গন্ধর্ব ছিল, কিন্তু কুবেরের অভিশাপে রাক্ষসে পরিণত হয় এবং এক্ষণে রামের অনুগ্রহে শাপমুক্ত হল (রামায়ণ)।

তৃণাবর্ত—কংসের অনুচর এক অসুরবিশেষ। কংস কৃষ্ণকে বধ করার জন্য একে গোকুলে পাঠিয়েছিলেন। তৃণাবর্ত ঘূর্ণিবায়ুরূপ ধারণপূর্বক কৃষ্ণকে উপরে উত্তোলন করে। কিন্তু কৃষ্ণ নিজের শরীরের ভার এত বৃদ্ধি করেন যে তৃণাবর্ত্ত তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে অসমর্থ হয় এবং কৃষ্ণ তার গলা সজোরে ধারণ করায় সে পলায়ন করতে অসমর্থ হয়। তখন এই দানব আকাশ হতে শিলাতলে পতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করে (শ্রীমদ্ভাগবত)।

তৈত্তিরীয়—যজুর্বেদের শাখাবিশেষ। কৃষ্ণযজুর্বেদ। একদা বৈশম্পায়ন ব্রহ্ম নামে খ্যাত জনৈককে হত্যা করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিষ্যদের যজ্ঞানুষ্ঠান করতে আদেশ দেন। শিষ্যদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অসম্মত হলে বৈশম্পায়ন বলেন যে, 'তুমি আমার শিষ্যত্ব ত্যাগ কর।' যাজ্ঞবল্ক্য তাই করেন এবং গুরুর নিকট হতে পূর্বশিক্ষিত বাক্যগুলি উদ্‌গীরণ করে ফেলে দেন। অন্যান্য শিষ্যেরা তাহা তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণপূর্বক গ্রহণ করায় তৈত্তরেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। বুদ্ধির মালিন্য হেতু এই যজুঃসমূহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করায় এর অন্য নাম কৃষ্ণযজুর্বেদ।

ত্রিকূট—সুমেরুপর্বতের পুত্র 'ত্রিকূট' ক্ষীরোদসাগর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই পর্বতে দেবর্ষিরা বাস করতেন এবং ইহা অপ্সরা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব ও কিন্নর ইত্যাদির ক্রীড়াভূমি। এর তিনটি শৃঙ্গ—প্রথম স্বর্ণময়, দ্বিতীয় রজতময়, তৃতীয় সর্বদা বৈদুর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণির কিরণেপ্রদীপ্ত—এই শৃঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ (বামনপুরাণ)।

(২) ত্রিশৃঙ্গ পর্বতবিশেষ। এই পর্বত লবণসমুদ্রের মধ্যস্থিত ও লঙ্কা এখানে অবস্থিত।

ত্রিজট—পিঙ্গলবর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ইনি বনমধ্যে ভূমি খনন করে বাস করতেন। রাম বনগমনকালে ধন বিতরণ করছেন শুনে কিছু ভিক্ষা করবার জন্য ইনি রামের কাছে এলেন। রাম বললেন, 'যত দূর তুমি

তোমার লাঠি নিক্ষেপ করতে পারবে ততদূর পর্যন্ত ধেনু তোমার হবে।' তখন ত্রিজট এমন জোরে লাঠি নিক্ষেপ করলেন যে, সেটা সরযূর অপর পারে গিয়ে পড়ল। সেই পর্যন্ত সমস্ত ধেনু সেই ব্রাহ্মণ পেল (রামায়ণ)।

ত্রিজটা—রাবণের অন্তঃপুরস্থ রাক্ষসী। রাবণের আদেশে বৃদ্ধা ত্রিজটা অশোকবনে সীতাকে রক্ষা করত। এই রাক্ষসী সরমার ন্যায় সীতার প্রতি সদয়া ছিল। রাবণের আদেশে সে সীতাকে ভয় দেখিয়ে রাবণকে বিবাহ করার জন্য বাধ্য করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সীতা তা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করলে অন্যান্য রাক্ষসীরা সীতার অঙ্গহানি করে কষ্ট দেবার ভয় দেখায়। সেই সময় ত্রিজটা রাক্ষসীদের নিবৃত্ত করে এবং তার ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কথা বিরত করে বলে যে, 'আমি দেখলাম, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সীতা দিব্যরথে আরূঢ়া। সীতা রামের সহিত মিলিত হয়েছেন, রাবণ খরবাহিত রথে চড়ে দক্ষিণে যাচ্ছেন। রাক্ষসগণও দক্ষিণে যাত্রা করছেন এবং লঙ্কাপুরী চূর্ণ ও ভস্মীভূত হয়েছে। তোমরা সীতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর।' ত্রিজটার বাক্যে রাক্ষসীরা ভীত হয়ে পড়ল। ইন্দ্রজিতের শরজালে রাম ও লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হলে রাবণ সীতাকে পুষ্পকরথে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য ছিল এঁদের মৃতপ্রায় দেখে সীতা রাবণকে পতিত্বে বরণ করবেন। ত্রিজটা তখন সান্ত্বনা দিয়ে সীতাকে বলে যে, এঁরা শরাঘাতে মুহ্যমান হয়েছেন মাত্র, এখনো এঁদের মৃত্যু হয়নি। এই কথা শুনে সীতা আশ্বস্ত হন। (রামায়ণ)।

ত্রিত—গৌতম মুনির পুত্র। গৌতমের তিন পুত্র—একত, দ্বিত, ও ত্রিত। এই তিন ভ্রাতা স্থির করেন যে, বহু পশু সংগ্রহ করে তাঁরা মহাফলপ্রদ যজ্ঞ করবেন ও সোমরস পান করবেন। বন থেকে বহু পশু লাভ করে ফিরবার সময় দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত স্থির করেন যে, ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদজ্ঞ বলে যজ্ঞে তাদের চেয়ে সে বেশী পশু লাভ করবে। তাই দু'জনে সমস্ত পশু নিয়ে ত্রিতকে একাকী বনমধ্যে ত্যাগ করে পলায়ন করেন। ত্রিত রাত্রিকালে একাকী গমনরত অবস্থায় এক বৃক (নেকড়ে বাঘ) দেখে ভীত হয়ে এক গভীর কূপের মধ্যে পতিত হন। অপর দুই ভ্রাতা তাঁকে কোনরূপ সাহায্য করেন না। তখন ত্রিত কূপ-মধ্যেই যজ্ঞ আরম্ভ করেন। বৃহস্পতি তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে দেবগণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরা ত্রিতের যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করে তাঁকে বর দিতে মনস্থ করেন। তখন ত্রিত এই বর চান যে—'আমাকে উদ্ধার করুন এবং যে এই কূপের জল স্পর্শ করবে, সেই যেন সোমপায়ীর

গতি লাভ করে।' তখন কূপ হতে সরস্বতী নদী আবির্ভূতা হন। ত্রিত তখন কূপ থেকে উত্থিত হয়ে লোভী ভ্রাতাদের শাপ দেন যে, তারা নেকড়ে বাঘের ন্যায় ভীষণ পশুতে পরিণত হবে এবং তাঁদের সন্তানরা ভল্লুক ও বানররূপে জন্মগ্রহণ করবে (মহাভারত—শল্য)।

ত্রিপুর—দেবগণের সহিত যুদ্ধে দৈত্যগণ পরাজিত হওয়ার পর তারকাসুরের তিন পুত্র—তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, ও বিদ্যুন্মালী কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এই বর প্রার্থনা করে যে, তারা তিনজন যেন এমন পৃথক পুরে (নগর) বাস করতে পারে, যে স্থলে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু থাকবে, যা দানব, যক্ষ বা রাক্ষসরা ধ্বংস করতে পারবে না এবং ব্রহ্মশাপেও বিনষ্ট হবে না। সহস্র বৎসর পরে তারা মিলিত হলে তাদের এই ত্রিপুর যখন একত্র হয়ে যাবে, তখন যে দেবশ্রেষ্ঠ এই সম্মিলিত ত্রিপুরকে এক বাণে ভেদ করতে পারবেন, তিনিই তাদের নিহত করবেন। ব্রহ্মা তাদের এই প্রার্থিত বর দান করেন। তারকাসুরের এই পুত্ররা ময়দানবের দ্বারা তিনটি পুর নির্মাণ করেন—তারকাক্ষের জন্য স্বর্গে স্বর্ণময়পুর, কমলাক্ষের জন্য অন্তরীক্ষে রৌপ্যময়পুর এবং বিদ্যুন্মালীর জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণলৌহপুর। তারকাক্ষের পুত্র হরি কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার বর পেয়ে পূর্বোক্ত তিন পুরে এক একটি মৃতসঞ্জীবনী সরোবর নির্মাণ করেন। সরোবরের এই গুণ ছিল যে, এতে মৃত দৈত্যদের নিক্ষেপ করলে তারা পুনর্জীবিত হয়ে উঠত। এই পুনর্জীবিত দৈত্যরা চারিদিকে বিচরণ করে সকলকে উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে। তখন দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা শিবের নিকট দেবতাদের গমন করতে বলেন। দেবতাদের স্তবে শিব তুষ্ট হয়ে এই দৈত্যদের বধ করতে সম্মত হন এবং নিজে দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করেন। এর ফলে, তাঁর বল সকলের অপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। মহাদেব তখন দেবতাদের রথ ও ধনু প্রস্তুত করতে বলেন। বিশ্বকর্মা পৃথিবী, দেবী, মন্দর পর্বত, দিগ্‌বিদিক, নক্ষত্রমণ্ডল, বাসুকি, হিমালয়, বিন্ধ্যপর্বত, সপ্তর্ষিমণ্ডল, সিন্ধু, গঙ্গা সরস্বতী, দিনরাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতির অংশ নিয়ে রথ নির্মাণ করেন। চন্দ্র ও সূর্য তাঁর রথচক্র হন এবং ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের—এই চার দেবতা লোকপাল অশ্ব হন। রথের ধ্বজদণ্ড হয় সুমেরুপর্বত এবং বিদ্যুন্ময় মেঘ হয় পতাকা। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু এবং কালরাত্রিকে জ্যা করেন। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হন।

দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে সারথি করে মহাদেব ত্রিপুরাসুরের অভিমুখে অগ্রসর হন। মহাদেবের ধ্বজাস্থিত বৃষের গর্জনে ত্রিভুবন কম্পিত হয় এবং শরস্থিত বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র এবং ব্রহ্মা ও মহাদেবের ভারে রথ ভূমিতে প্রবিষ্ট হয়। তখন শরভাগ থেকে নির্গত হয়ে নারায়ণ বৃষরূপ ধারণ করে রথকে ভূমি থেকে উত্তোলন করেন। মহাদেব তখন অশ্বপৃষ্ঠে এক পদ ও বৃষরূপী নারায়ণের পৃষ্ঠে আর এক পদ স্থাপন করে দানবপুর দর্শন করতে থাকেন এবং অশ্বের স্তনচ্ছেদ ও বৃষের ক্ষুর দ্বিধা-বিভক্ত করেন। তদবধি অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত হয় এবং গোজাতীয় খণ্ডিত খুর হয়। অতঃপর মহাদেব ধনুতে পাশুপত অস্ত্র যোজন করে ত্রিপুরের একত্র হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। এমন সময় দানবদের তিন পুর একত্র হয় এবং মহাদেবও অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তখন এই তিন পুর অস্ত্রাঘাতে দানবদের সহিত দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সাগরে নিক্ষিপ্ত হয় (মহাভারত—কর্ণপর্ব ও হরিবংশ)।

ত্রিপুরারি—মহাদেবের অন্য নাম। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর তিন পুর পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপে বিনষ্ট করার জন্য মহাদেবের এই নাম হয় (ত্রিপুর দেখ)।

ত্রিপাদ—বিষ্ণুর এক নাম। দৈত্যরাজ বলি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হয়ে দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করেন; তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বলিকে শাস্তি দেবার জন্য বিষ্ণু বামনরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দানস্বরূপ ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সম্মত হতেই ভগবান্ বিষ্ণু একপাদ দিয়ে স্বর্গ ও অন্য পাদ দিয়ে মর্ত্য অধিকার করেন, আর নাভি হতে উত্থিত তৃতীয় পাদের জন্য বলিকে স্থান নির্দেশ করতে বলেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলি নিজের মাথা পেতে দিয়ে বিষ্ণুকে তৃতীয় পাদ ঐ স্থানে স্থাপন করতে বলেন, তখন বলির মস্তকে তৃতীয় পাদ স্থাপন করে বিষ্ণু বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এই তিন দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের প্রতীকস্বরূপ।

ত্রিলোচন—শিবের অন্য নাম। মহাভারতে দেখা যায় যে, মহাদেব হিমালয়ে যখন ঘোর তপস্যায় নিরত ছিলেন, তখন পার্বতী ক্রীড়াচ্ছলে মহাদেবের দুইচক্ষু হস্তদ্বারা আবৃত করেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর কপালে একটি জলন্ত নেত্রের উদ্ভব হয়। ইহা মহাদেবের ধ্বংসকারী নেত্র। কামদেব এই চক্ষুর অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হন।

ত্রিশির—রাবণের পুত্র।

ত্রিশিরা—(১) রাক্ষস খরের সেনাপতি। দণ্ডকারণ্যে শূর্পণখার নাসিকা,

ও কর্ণচ্ছেদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খর রাম-লক্ষ্মণকে বধ করার নিমিত্ত একে পাঠায়। ত্রিশিরা রামের হাতে নিহত হয়।

(২) রাবণের এক পুত্র। এর তিন মুণ্ড। কুম্ভকর্ণ নিহত হবার পর আপন ভ্রাতা দেবান্তক, নরান্তক ও মহোদরের সহিত রামের বিরুদ্ধে সদর্পে যুদ্ধযাত্রা করে। হনুমানের সহিত যুদ্ধকালে হনুমান চপেটাঘাতে ত্রিশিরাকে ভূতলে ফেলে এর খড়্গ কেড়ে নিয়ে তার তিনমুণ্ড ছেদন করেন।

(৩) কুবেরও ত্রিশিরা নামে পরিচিত ছিলেন।

(৪) ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ত্রিশিরা নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। ত্রিশিরার সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তিন মুখ। তিনি এক মুখে বেদ অধ্যয়ন, এক মুখে সুরাপান, আর এক মুখে সর্বগ্রাসী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রত্বলাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যা করলে ইন্দ্র ভয় পেয়ে এর তপোভঙ্গের জন্য বহু অপ্সরাকে পাঠান। কিন্তু তারা অকৃতকার্য হলে তাঁকে নিহত করার জন্য ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। ত্রিশিরা নিহত হন বটে, কিন্তু তাঁর মস্তক জীবিত থাকে। তখন ইন্দ্র এক সূত্রধরকে এই মস্তক ছেদন করতে বলেন। সূত্রধর ত্রিশিরার তিন মুণ্ড খণ্ডিত করে ফেলেন। প্রথম মুণ্ড হতে চাতকপক্ষিদল, দ্বিতীয় মুণ্ড হতে শ্যেনপক্ষিদল ও তৃতীয় মুণ্ড হতে তিত্তিরপক্ষিদল নির্গত হয়। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বিনাশ করার জন্য অগ্নিতে আহুতি দান করে বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করেন (মহাভারত—উদ্‌যোগ)।

ত্রিশঙ্কু—(১) সূর্যবংশীয় রাজা। কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট ইনি যজ্ঞের প্রভাবে সশরীরে দেবলোকে যাবার বাসনা জানালে, তিনি তা অসাধ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের তপস্যারত শত পুত্রের নিকট গিয়ে স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করলে তাঁরা বলেন যে, তাঁদের পিতা যা অসাধ্য বলেছেন, তা তাঁরাও করতে সক্ষম হবেন না। বশিষ্ঠের বাক্য অমোঘ। ত্রিশঙ্কু তখন বলেন যে, গুরু ও গুরুপুত্রগণ যখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তিনি অন্যত্র গমন করবেন। তাতে ঋষিপুত্রগণ ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হবার অভিশাপ দেন। ত্রিশঙ্কু তখন চণ্ডালে পরিণত হয়ে ভ্রমণ করতে থাকেন। তারপর তিনি বিশ্বামিত্রকে তাঁর প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে স্বয়ং যাজক হয়ে যজ্ঞের আয়োজন করেন। সকল ঋষিই এই যজ্ঞে এসে উপস্থিত হন। কেবল বশিষ্ঠপুত্ররা এবং মহোদয় নামে এক

ঋষি আসেন না। কিন্তু বহুকাল যজ্ঞ করার পরও যখন কোন দেবতা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন না, তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে আপন তপস্যার প্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করাতে লাগলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁকে স্বর্গে স্থান দিতে অস্বীকৃত হন। তারপর ইন্দ্র তাঁকে বলেন যে, যেহেতু তিনি গুরুশাপে অভিশপ্ত, সেহেতু তিনি স্বর্গে বাস করতে পারেন না, এবং তাঁকে অধোমুখে ভূমিতে অবরোহণ করতে বলেন। এর ফলে, ত্রিশঙ্কু মর্ত্যে অবতরণ করতে থাকেন। বিশ্বামিত্র তখন পতনোন্মুখ ত্রিশঙ্কুকে "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ" বলে ঊর্ধ্বলোকে স্থান করে দেন, এবং দক্ষিণ আকাশে অন্য এক সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেন। তাঁর সৃষ্ট জগতে তিনি নূতন দেবতা ও নূতন ইন্দ্রের সৃষ্টিতেও তৎপর হন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে স্বীকার করে নেন যে, বিশ্বামিত্র কর্তৃক সৃষ্ট আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল থাকবে এবং তার মধ্যে নিম্নশির ত্রিশঙ্কুও দেবতুল্য হয়ে অবস্থান করবেন (রামায়ণ—বালকাণ্ড)।

(২) হরিবংশে অন্য এক ত্রিশঙ্কুর কাহিনী বর্ণিত আছে। ইনি মহারাজ ত্রয্যরুণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র। সত্যব্রত অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে হরণ করে পিতার অসন্তোষভাজন হন এবং পিতা তাকে গৃহ হতে বারো বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত করেন। পুত্র তখন পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে,সে কোথায় বাস করবে? পিতা তাঁকে চণ্ডালদের সঙ্গে বাস করতে বলেন। ঋষি বশিষ্ঠ ত্রয্যরুণের কুলপুরোহিত হয়েও পিতার এই আদেশের বিরুদ্ধে সত্যব্রতকে কিছু বলেন নি। এই সময় সত্যব্রত যেখানে বাস করছিলেন, ইন্দ্র সেখানে বারো বৎসর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ করে সে দেশে মহাদুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেন। এই দেশে বিশ্বামিত্র নিজের স্ত্রীকে রেখে অন্যত্র কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। সত্যব্রত অন্নাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গকে অন্ন সাহায্য করে প্রাণরক্ষা করেন। বারো বৎসর নির্বাসনের সময় পূর্ণ হলে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় সত্যব্রত বাধ্য হয়ে বশিষ্ঠের কামধেনুকে হত্যা করে আহার করেন ও কিছু মাংস বিশ্বামিত্রের পুত্রগণকে দেন। এতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত করেন। কারণ, সে তিনটি পাপ করেছে। প্রথম পাপ, পিতার অসন্তোষ উৎপাদন, দ্বিতীয়, গুরুর গাভী হত্যা ও তৃতীয়, গোমাংস ভক্ষণ। দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর পরিবারকে খাদ্য পরিবেশন করে সাহায্য করেছিলেন বলে বিশ্বামিত্র সত্যব্রতকে বর প্রদানে ইচ্ছুক হন। তখন সত্যব্রত সশরীরে স্বর্গবাসের জন্য প্রার্থনা করেন। বিশ্বামিত্র

এই বর দানে সম্মত হন। পরে বিশ্বামিত্র এঁকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এর পর বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করলে দেবতারাও বশিষ্ঠকে অনাদর করে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ অনুমোদন করেন। ত্রিশঙ্কুর স্ত্রীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয় (হরিবংশ)।

ত্রেতাযুগ—দ্বিতীয় যুগ। ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ এবং পাপ এক পাদ। মানবদেহ চতুর্দশ হস্তপরিমিত। প্রাণ অস্থিগত। মানব-পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর। এই যুগের বামন, পরশুরাম ও রাম—এই তিন জন অবতার। এই যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। সূর্যবংশীয় বাহুক, ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনর‍্যণ, সগর, অংশুমান্, রঘু, অজ, দশরথ ও রামচন্দ্র প্রমুখ রাজারা এই যুগে রাজত্ব করেন।

ত্র্যম্বক—(১) ত্রিলোচন, শিব। ত্রি (তিন) অম্বক (চক্ষু) যাহার।

(২) অষ্টবসুর রক্ততম।

দ

দক্ষ—একজন প্রজাপতি। এঁর জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষ সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে—দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হতে জন্ম বলে এঁর নাম দক্ষ। ইনি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতির গর্ভে এর ষোড়শ কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাদের মধ্যে ত্রয়োদশটি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি মিলিত পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট সতী নাম্নী কন্যাটিকে মহাদেবের হস্তে দক্ষ সম্প্রদান করেন। একবার বিশ্বস্রষ্টাগণ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে সমস্ত দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হন। দক্ষ প্রজাপতি এই যজ্ঞে উপস্থিত হলে সকল দেবতাই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন, কেবল মহাদেব ও ব্রহ্মা নিজেদের আসন ইতে উত্থিত হন না। এতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবনিন্দা আরম্ভ করেন এবং শিবকে অভিসম্পাত দেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে মহাদেব যজ্ঞের ফলভাগ গ্রহণে বঞ্চিত হবেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির উপর আধিপত্য করার অধিকার দান করেন: এতে দক্ষ গর্বিত হয়ে বৃহস্পতি নামে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, কেবলমাত্র মহাদেব ও সতীকে এই আমন্ত্রণ থেকে বাদ দেন। সতী যজ্ঞের কথা শুনে বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হবার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহাদেব অনুমতি না দিলেও সতী স্বামীর বাক্য উপেক্ষা করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। তখন

সতীর সম্মুখেই দক্ষ জামাতা মহাদেবের নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। স্বামী-নিন্দায় অপমানিতা হয়ে সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। মহাদেব সতীর প্রাণত্যাগের কথা শ্রবণকরতঃ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ মস্তকস্থিত একটি জটা ছিন্ন করে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। ফলে উক্ত ছিন্ন-জটা হতে বীরভদ্রের উদ্‌ভব হয়। বীরভদ্র শিবের অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করতে যাত্রা করেন। সে ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষণের দন্ত উৎপাটন এবং অস্ত্রাঘাতে দক্ষের শিরশ্ছেদ করে। পরে দক্ষের ছিন্ন শির যজ্ঞেব অগ্নিতে ভস্ম করা হয়। ব্রহ্মা দক্ষের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাত হয়ে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে কৈলাস গমনপূর্বক নানাপ্রকারে শিবকে তুষ্ট করে দক্ষের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। তখন শিব বলেন যে, দক্ষের মুণ্ড যখন দগ্ধ হয়েছে, তখন তার পরিবর্তে ছাগের মুণ্ড দক্ষের শিরস্থানে স্থাপিত হউক। মহাদেবের কথানুসারে ব্রহ্মা দক্ষের শিরস্থানে এক ছাগমুণ্ড সংযুক্ত করেন। দক্ষ জীবিত হয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে মহাদেবের স্তবগান করতে থাকেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

মহাভারত মতে দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হতে এবং তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ হতে উৎপন্ন হন। দক্ষের স্ত্রী ৫০টি কন্যাকে প্রসব করেন। এই-সকল কন্যার মধ্যে দক্ষ ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে ত্রয়োদশটি ও চন্দ্রকে ২৭টি প্রদান করেন। এই ২৭ জন ২৭টি নক্ষত্র হয়। পুরাণে দক্ষের জন্ম সম্বন্ধে এই মত গৃহীত হলেও কথিত আছে যে, দক্ষ প্রিয়ব্রতের কন্যা ও মনুর পৌত্রী প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতীর ঔরসে দক্ষের ২৪, ৫০ কিংবা ৬০টি কন্যা হয়। দক্ষের একটি কন্যা সতী শিবকে বিবাহ করেন; কিন্তু শ্বশুর-জামাতার মধ্যে বিরোধের ফলে সতী আত্মহত্যা করেন।

মহাভারত ও পুরাণের অন্য কাহিনী অনুসারে অন্য এক মন্বন্তরে দক্ষ দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টা ও মারিকার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁর সাতটি পুত্র হয়—ক্রোধ তামস্, দম, বিকৃত, অঙ্গীরা, কর্দম ও অর্শ্ব। দক্ষকে এই দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করতে হয় জামাতা শিবের অভিশাপ-হেতু। একদিক দিয়ে তাঁর পুত্র চন্দ্রসোম হতে দক্ষ প্রসূত; কারণ চন্দ্র দক্ষের ২৭টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সেইজন্য দক্ষ সাধারণতঃ চন্দ্রর পিতা ও পুত্র বলে কথিত হন।

হরিবংশে দক্ষকে আমরা অন্য মূর্তিতে দেখতে পাই। এই পুরাণ মতে বিষ্ণু নিজেই দক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্তা হন। যোগবলে এই প্রথম মানব-পুরুষ দক্ষ নিজেকে সুন্দরী নারীরূপে

সৃষ্টি করে এই নারীর ক্ষেত্রে অনেক সুন্দরী কন্যার জন্ম দেন এবং এইসব কন্যার পরে বিবাহ দেন।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। বরুণ হতে এর জন্ম। এই মন্বন্তরে মরীচি, গর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত, ইন্দ্র ও দ্যুতিমান প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। আয়ুষ্মান হতে অম্বুধ্বরার গর্ভে ভগবান বিষ্ণু ঋষভন্দের নামে জন্মগ্রহণ করেন।

দগ্ধরথ—এক গন্ধর্ব বিশেষ। এঁর অন্য নাম অঙ্গারপর্ণ। বিচিত্র বর্ণের একটি রথের অধিকারী হিসাবে ইনি চিত্ররথ নামেও পরিচিত ছিলেন। একদা যে সময় দগ্ধরথ গঙ্গায় অপ্সরাদিগের সহিত জলবিহারে রত ছিলেন, সেই সময় পাণ্ডবরা একচক্রা নগরী হতে এই পথে গমন করেন। চিত্ররথ তাঁদের ঐ পথে গমন করতে দেখে সগর্বে বলেন যে, তাঁর জলবিহারকালে দেবতারাও তাঁর সমীপস্থ হতে সাহস করেন না; অতএব তাঁরা এই পথে গমন করেছেন কেন? এই কথা শ্রবণান্তে অর্জুনের সঙ্গে এঁর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং অর্জুন আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে এঁর রথ দগ্ধ করেন। সেই থেকে এঁর নাম হয় দগ্ধরথ। পরবর্তীকালে অর্জুনের সঙ্গে এঁর সখ্য স্থাপিত হয় (মহাভারত—আদি)।

দত্তাত্রেয়—এক বিখ্যাত ঋষি। অত্রির স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে বিষ্ণু দত্তাত্রেয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি অত্রি পুত্রকামনা করে উপাসনা করলে বিষ্ণু তাঁকে বলেছিলেন, “আমি পুত্ররূপে তোমাকে দত্ত হলাম।” সেই জন্য তাঁর পুত্র দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত হন। কুশিকবংশে এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী সমস্ত ক্লেশ সহ্য করে স্বামীর সেবা করতেন। উক্ত ব্রাহ্মণ একদিন এক পতিতা নারীকে দর্শনপূর্বক কামাসক্ত হয়ে স্বীয় স্ত্রীকে উক্ত নারীর নিকট তাঁকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে স্কন্ধে করে ঐ পতিতার গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অন্ধকার রাত্রে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য ঋষির দেহে উক্ত ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ হওয়ায়, ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন, “সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।” ব্রাহ্মণের সতীসাধ্বী স্ত্রী এই নিদারুণ অভিশাপ শ্রবণান্তে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেন যে, সূর্যের আর উদয় হবে না। সাধ্বী স্ত্রীর অব্যর্থ বাক্যে প্রভাতকাল উপস্থিত হলেও সূর্যোদয় আর হলো না। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রইল। সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে পৃথিবী বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখে দেবতারা ব্যস্ত হয়ে ব্রহ্মার সমীপস্থ হলেন। ব্রহ্মা বললেন, “পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যেই সূর্যের উদয় হয়নি। তোমরা তাঁর

কাছে গমন কর। তাঁর সাহায্যেই আবার সূর্যের উদয় সম্ভব হবে।" ব্রহ্মার পরামর্শে দেবতারা অত্রির স্ত্রী অনসূয়ার কাছে গমন করলেন। অনসূয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীর কাছে গমনপূর্বক বললেন যে, সূর্যোদয়ের জন্য তিনি অনুমতি প্রদান করুন। যদি সূর্যোদয় হেতু তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে তিনি তাঁর স্বামীকে পুনর্জীবিত করে নূতন দেহসম্পন্ন করে দেবেন। তখন ব্রাহ্মণপত্নীর অনুমতি-ক্রমে পুনর্বার সূর্যের উদয় সম্ভব হয়। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে অনসূয়াকে বর দিতে চান। তখন অনসূয়া বলেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে তিনি যেন পুত্ররূপে লাভ করেন। অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা সোমরূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয়রূপে ও মহেশ্বর দুর্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুনকে বর দেন, "তোমার বাহুদ্বয় আমার বরপ্রভাবে সহস্রবাহু হবে।" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

দধীচি—অথর্ব মুনির ঔরসে এবং কর্দমকন্যা শান্তির গর্ভে এর জন্ম হয়। ইন্দ্র দধীচিকে কয়েকটি বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি তিনি এই বিদ্যা অন্য কাউকেও শিক্ষা দেন, তবে তাঁর শিরশ্ছেদ অনিবার্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির নিকট হতে এই বিদ্যা শিক্ষা করবেন সঙ্কল্প করে দধীচির শিরশ্ছেদ করেন ও তাঁর মস্তক অন্যত্র রেখে দিয়ে সেই স্থানে অশ্বের মস্তক স্থাপনকরতঃ এই বিদ্যা অধ্যায়ন ও শিক্ষা করেন।

ইন্দ্র সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হয়ে যখন দধীচির অশ্বমস্তক কর্তন করেন, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় অন্যত্র রক্ষিত দধীচির মস্তক তাঁর মস্তকস্থানে সংযুক্ত করে দেন।

মহাভারতে কথিত আছে যে, অথর্বের ঔরসে ও তাঁর সহধর্মিণী শান্তির গর্ভে দধীচির জন্ম হয়। ইনি কঠোর তপস্যায় সকল সময়েই নিমগ্ন থাকতেন। শিবভক্ত ছিলেন বলে দধীচি দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেন। দক্ষ এঁর উপদেশ উপেক্ষা করায় ইনি দক্ষযজ্ঞে অনুপস্থিত থাকেন। বৃত্রাসুরের আক্রমণে উৎপীড়িত ও স্বর্গচ্যুত দেবগণ যখন জ্ঞাত হন যে, দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্রে বৃত্রের নিধন অবশ্যম্ভাবী, তখন দেবরাজ ইন্দ্র দধীচির নিকট গমনপূর্বক তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। পূর্বে একবার তপোভঙ্গকরায় ইন্দ্র দধীচির বিরাগভাজন হন। এই সময় দধীচির উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে, তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র অলম্বুষা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। তাঁর দর্শনেই দধীচির শুক্র সরস্বতীর জলে পতিত হয়। সরস্বতী নদী তা উদরস্থ করে সারস্বত নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। উদারচেতা দধীচি ইন্দ্রের

পূর্ব-শত্রুতা বিস্মৃত হয়ে দেবতাদের উপকারসাধনে প্রাণবিসর্জন দেন। ইন্দ্র সেই অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করে নিরানব্বইবার বৃত্রদের নিহত করেন।

অগ্নিপুরাণ মতে দধীচির অস্থিতে অনেক প্রকার অস্ত্র নির্মিত হয়েছিল।

দধিমুখ—সুগ্রীবের মাতুল। ইনি মধুবন নামে এক রমণীয় কানন রক্ষা করতেন। সীতার সংবাদ নিয়ে হনুমান প্রত্যাবর্তন করলে, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরদের এত আনন্দ হয় যে, তাঁরা মধুবন ধ্বংস করে মধুপানে মত্ত হন (রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড)।

দনু—প্রজাপতি দক্ষের এক কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী। এঁর গর্ভজাত বিপ্রচিত্তি, সম্বর, বৃষপর্বা, নিকুম্ভ, প্রলম্ব, বনায়ু, কেতুমান, বিরূপাক্ষ, কেশী, নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি ৪০টি পুত্রই দনুজ বা দানব নামে পরিচিত।

দন্তবক্র—জনৈক রাজা। ইনি রাজা সুরের কন্যা পৃথুকীর্তির গর্ভে ও রাজা বৃদ্ধশর্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি করূষ দেশের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন (হরিবংশ)। কৃষ্ণ দ্বারকায় থাকবার সময়ে এঁকে বিনাশ করেন। ইনি শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল নিহত হ'লে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃষ্ণের গদায় ইনি নিহত হন।

দণ্ডকারণ্য—দণ্ডকবন গোদাবরী ও নর্মদার মধ্যে অবস্থিত ছিল। পূর্বে এখানে দণ্ডক নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। শুক্রাচার্যের শাপে এই রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়। রাম বনবাসকালে এই অরণ্যে ১৪ বৎসর বাস করেছিলেন। এই স্থানেই রাবণ সীতাকে হরণ করে (রামায়ণ)।

দণ্ডপাণি—(১) যম; যিনি সর্বদা দণ্ডহস্তে বিরাজ করেন।

(২) কাশীস্থিত একজন ভৈরব। পূর্ণভদ্র নামে এক যক্ষ মহাদেবের আরাধনা করে হরিকেশ নামে এক পুত্রলাভ করে। এই পুত্র মহাদেবের অনুরক্ত ছিল। মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করলে মহাদেব প্রীত হয়ে তপস্যাস্থলে উপস্থিত হয়ে এর গাত্রস্পর্শ করলেন। হরিকেশ অভীষ্ট দেবতাকে দেখতে পেয়ে মহাদেবের স্তব করতে লাগল। মহাদেব একে বললেন, "তুমি এই স্থানে দণ্ডধর হও। আজ হতে তুমি কাশীতে দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক হবে এবং তোমার নাম হ'ল দণ্ডপাণি। আমার আদেশে সম্ভ্রম ও উদ্ভ্রম নামে দুইজন যক্ষ সর্বদা তোমার অনুগামী হবে। যিনি আমাতে ভক্তিমান হবেন, তিনি প্রথমে তোমার পূজা করবেন। তুমি আমার সম্মুখে দক্ষিণদিকে বাস কর।" সেই থেকে দণ্ডপাণি কাশী শাসন করছেন (কাশীখণ্ড)।

দণ্ডী—জনৈক রাজা। উর্বশী একবার অভিশপ্ত হয়ে যখন ঘোটকীতে পরিণত

হয়, তখন রাজা দণ্ডী এই অশ্বরূপী অভিশপ্তা উর্বশীকে গ্রহণ করে; কিন্তু কৃষ্ণ এই অশ্বাকে গ্রহণ করতে চাইলে দণ্ডী ঘোটকীকে দিতে অস্বীকৃত হন এবং কৃষ্ণের ভীতিতে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেও সর্বত্র আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হন। অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদের অসম্মতিসত্ত্বেও ভীম দণ্ডীকে আশ্রয় দেন। এইজন্য কৃষ্ণের সঙ্গে ভীম ও তাঁর অন্যান্য ভ্রাতাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কৌরবরা পাণ্ডবদের পক্ষ এবং দেবতারা কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। শেষে অশ্বারূপী উর্বশী শাপমুক্তা হয়ে স্বর্গে গমন করলে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। দণ্ডিও নিজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

দম—সূর্যবংশীয় রাজা মরুত্তের পৌত্র। মাতার গর্ভে ইনি নয় বৎসর অবস্থান করেছিলেন। এইরূপে মাতৃগর্ভে থাকার জন্য মাতাকে দম অবলম্বন করতে হয় এবং ইনিও নিজে দমশীল হবেন—পুরোহিতরা ইহা জ্ঞাত হয়ে এঁর নাম রাখেন দম। ইনি দুষ্টদের দমনকারী এবং অশেষ গুণসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ দম বৃষপর্বার কাছে ধনুর্বেদ ও দুন্দুভির কাছে নানা প্রকার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও বেদাঙ্গও এঁর বিশেষ অধিগত ছিল (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

দমন—বিদর্ভরাজ ভীমের পুত্র। সন্তান না হওয়ায় ভীম বহুদিন মনঃকষ্টে কালাতিপাত করেন। উক্ত সময় দমন নামে এক মহর্ষি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই মহর্ষির বরে ভীম তিন পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। মহর্ষি দমনের নামানুসারে তিনি তিন পুত্রের নামকরণ করেন—দম, দন্ত ও দমন এবং কন্যার নাম রাখেন দময়ন্তী। নিষধরাজ নল এই দময়ন্তীকে স্বয়ংবর-সভায় লাভ করেন।

দমঘোষ—চেদিরাজ্যের রাজা। দমঘোষ যদুবংশজাত বসুদেবের দ্বিতীয়া ভগিনী শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেণ। বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের বিশেষ অনুগত ছিলেন। সেইজন্য এঁকে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল।

দম্ভোভব—মহাভারতে উক্ত জনৈক রাজা। নিজের শক্তি বিষয়ে তাঁর অসম্ভব অহংকার ছিল। ব্রাহ্মণরা একবার তাঁকে বলে যে গন্ধমাদন পর্বতে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে যে নর ও নারায়ণ বাস করেন, তাঁদের শক্তির তুলনায় দম্ভোভবের শক্তি কিছুই নয়। তখন দম্ভোভব নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। নর ও নারায়ণ এঁকে যুদ্ধ

হতে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে এঁরা একমুষ্টি ঘাস নিয়ে তীরের মত নিক্ষেপ করলেন। এই নিক্ষিপ্ত খাসে সমস্ত আকাশ সাদা হয়ে গেল এবং শত্রুদের চোখ, কান ও নাকে প্রবেশ করতে লাগল। তখন দম্ভোভব এঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে গেলেন। মহাভারতে দাম্ভিকতার পতন হিসাবে এই গল্প কথিত হয়।

দময়ন্তী—বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। বিদর্ভরাজ ভীম ও তাঁর স্ত্রী ঋষি দমনকে সেবায় তুষ্ট করে দময়ন্তী নামে এক কন্যা এবং দম, দন্ত ও দমন নামে তিন পুত্র লাভ করেন। দময়ন্তী পরম রূপবতী ছিলেন। লোকমুখে পরস্পরের রূপ ও গুণের কথা জ্ঞাত হয়ে নল ও দময়ন্তী পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। পরে নল-প্রেরিত কনকবর্ণ নামে এক হংসদূতের নিকট দময়ন্তী নলের রূপ ও গুণের বর্ণনা শুনে, সেই হংসকেই পুনরায় নলের নিকট নিজের মনোভাব জানিয়ে প্রেরণ করেন। অতঃপর বিদর্ভরাজ দময়ন্তীর বিবাহের জন্য এক বিরাট স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করেন। বিভিন্ন দেশের রাজপুরুষ ও রাজপুত্রগণ, এমনকি, ইন্দ্রাদি দেবগণও দময়ন্তীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হন। পথে নলের সঙ্গে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যমের সাক্ষাৎ হলে, দেবতারা নলের সৌন্দর্য দেখে তাঁকে তাঁদের দূত হতে অনুরোধ করেন। নল সম্মত হলে, দেবতারা তাঁকে দময়ন্তীকে জানাতে বলেন যে, দময়ন্তী যেন দেবতাদের মধ্যে একজনকে পতিরূপে বরণ করেন। নল নিজেই স্বয়ংবর-প্রার্থী বলে প্রথমে এই কাজ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে তিনি দেবতাদের বরে অদৃশ্য হয়ে, দময়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্বক তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু দময়ন্তী দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করে নলকেই পূর্বে পতিত্বে বরণ করেছেন বলেন। দেবতারা এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে, নলের প্রকৃত রূপ ধারণকরতঃ স্বয়ংবর-সভায় আসন গ্রহণ করেন। দময়ন্তী স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, পাঁচজন প্রার্থীর আকৃতি এক প্রকার। কিন্তু প্রত্যেকের আকৃতি এক প্রকার হলেও দময়ন্তীর পূর্বেই জানা ছিল যে, দেবতারা স্বেদ-বিরহিত ও স্তব্ধনেত্র; সে কারণ নলকে নির্বাচন করতে দময়ন্তীর আর কোন কষ্ট হলো না। তিনি নলের কণ্ঠেই বরমাল্য দান করলেন।

স্বয়ংবর-সভা হতে প্রত্যাবর্তনের পথে দেবতাদের সঙ্গে কলির সাক্ষাৎ

হয়। তিনি তখন দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হয়ে স্বয়ংবর-সভায় চলেছেন। দেবতাদের নিকট দময়ন্তীর নলরাজাকে বরণ সংবাদ পেয়ে কলি ক্রুদ্ধ হয়ে নলকে দণ্ড দিতে মনস্থ করেন। কলির কোপদৃষ্টি নলের উপর পতিত হল। তিনি স্থির করেন যে, নলের দেহে প্রবেশ করে তাঁকে রাজ্যভ্রষ্ট করবেন। তিনি দ্বাপরকে পাশার মধ্যে প্রবেশ করতে বলেন এবং নলের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। একদিন নল মূত্রত্যাগের পর পদদ্বয় ধৌত না করেই সন্ধ্যা করতে বসেন। সেই সুযোগে কলি নলের দেহে প্রবেশ করেন এবং অক্ষক্রীড়ায় নলকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যলাভ করার জন্য নলের ভ্রাতা পুষ্করকে প্ররোচিত করেন। নল পুষ্করের সঙ্গে দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়ে কালক্রমে সমস্ত ধনরত্ন হারান। পুষ্কর নলের রাজ্য ও সমুহ ঐশ্বর্য এই খেলায় জয় করেন। দময়ন্তী যথাসাধ্য নলকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অক্ষম হয়েও সর্বনাশ আসন্ন জেনে সারথি বার্ষ্ণেয়কে দিয়ে নিজের পুত্র ইন্দ্রসেনকে তাঁর মাতামহের কাছে পাঠিয়ে দেন। পুষ্কর দ্যূতক্রীড়ায় নলের সর্বস্ব হরণ করে অবশেষে দময়ন্তীকে পণ রাখতে বলেন। নল তখন তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে এক বস্ত্রে রাজ্যত্যাগ করেন। দময়ন্তীও একবস্ত্রে স্বামীর অনুগমন করেন। একদিন নল ক্ষুধার্ত হয়ে স্বর্ণবর্ণের কতকগুলি পাখী দর্শনপূর্বক আপন পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাদের আবৃত করে ধরতে যান। পক্ষীকুল উক্ত বস্ত্র নিয়ে উড়ে চলে যাবার সময় বলে যায়, "অক্ষক্রীড়ায় যে পাশা নিয়ে তুমি খেলছিলে আমরাই সেই পাশা।" নল ও দময়ন্তী তখন একই বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে থাকেন। একদিন এক বিশ্রামস্থানে দময়ন্তী নিদ্রিত হলে কলির দুষ্ট প্রভাবে নল নিকটে পতিত এক খড়্গ দ্বারা তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করে দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করেন। দময়ন্তী জাগ্রত হয়ে নলের অন্বেষণে অরণ্যে প্রবেশ করে এক ক্ষুধার্ত অজগরের কবলিত হন। তাঁর আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে এক ব্যাধ অজগরকে বধ করে দময়ন্তীকে উদ্ধার করে। পরে এই ব্যাধ দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে গেলে দময়ন্তীর শাপে প্রাণত্যাগ করে। তারপর নলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এক বণিকসঙ্ঘের সঙ্গে দময়ন্তী চেদিরাজ্যে যাত্রা করেন। পথে হস্তীর আক্রমণে বণিকদলের বহু লোক নিহত হয়। দময়ন্তীই এই দুর্ভাগ্যের হেতু মনে করে তারা তাঁকে হত্যা করতে সঙ্কল্প করে। এই দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হয়ে তিনি বন-

মধ্যে পলায়ন করেন এবং বণিকদলের হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে চেদিরাজ সুবাহুর রাজধানীতে উপস্থিত হন। দময়ন্তীর রূপদর্শনে বিমুগ্ধ রাজমাতা তাঁকে সৈরিন্ধ্রি রূপে নিযুক্ত করেন ও নিজ কন্যা সুনন্দাকে তাঁর সঙ্গে সখীবৎ আচরণ করতে বলেন।

এদিকে নল বনমধ্যে প্রবেশ করে নারদ-শাপগ্রস্ত কর্কোটক নাগকে দাবাগ্নির মধ্য হতে উদ্ধার করেন। নারদকে প্রতারিত করার জন্য তাঁর শাপে কর্কোটক অচল স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। শাপমোচনের সময় এরূপ নির্দেশ ছিল যে, নল কর্তৃক স্থানান্তরিত হলে তবে সে শাপমুক্ত হবে। এইরূপে উদ্ধার পাবার পর কর্কোটক নলকে দংশন করে তাঁর রূপের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজ-মূর্তি ধারণ করে বলে যে, যাতে লোকে নলকে চিনতে না পারে সেইজন্য সে তাঁর রূপ বিকৃত করে দিয়েছে। এ ছাড়া, তার বিষে আক্রান্ত হয়ে নলের দেহাশ্রিত কলি যন্ত্রণা পাবে। কর্কোটক নলকে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজা ঋতুপর্ণের নিকট বাহুক নাম গ্রহণপূর্বক সারথ্য গ্রহণ করতে উপদেশ দেয়, এবং ঋতুপর্ণকে অশ্বচালনায় নৈপুণ্য শিখিয়ে তাঁর কাছ থেকে অক্ষক্রীড়ায় কৌশল শিখে নিতে পরামর্শ দেয়। অতঃপর নলকে এক দিব্যবস্ত্র দান করে কর্কোটক বলে যে, পূর্বরূপ ধারণ করবার দরকার হলে, এই বস্ত্র পরিধানান্তে কর্কোটককে স্মরণ করলেই সে উপস্থিত হবে। এই কথা বলে উক্ত নাগ অন্তর্হিত হয়। নল তখন তার পরামর্শমত রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন।

বিদর্ভরাজ ভীম নল-দময়ন্তীর অনুসন্ধানে নানাদেশে লোক প্রেরণ করেন। দময়ন্তীর বাল্যসখা সুদেব চেদিরাজ্যে এসে রাজভবনে যজ্ঞকালে দময়ন্তীকে চিনতে পারেন। রাজমাতা ও সুনন্দা সুদেবের কাছে দময়ন্তীর পরিচয় পেয়ে জানলেন যে, তিনি চেদিরাজমাতার ভগিনীর কন্যা। দময়ন্তীর অনুরোধে তাঁরা তাঁকে সমাদরে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন। বিদর্ভরাজের লোকগণ নলের সন্ধানে তখন চতুর্দিকে ভ্রমণরত। তাদের মধ্য হতে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজা ঋতুপর্ণের সারথি বাহুককে নল বলে সন্দেহ করেন। এই সংবাদ পেয়ে দময়ন্তীর বাল্যসখা সুদেবকে দিয়ে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, নল জীবিত আছেন কিনা সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত না হওয়ায় পরদিন প্রাতেই দময়ন্তী পুনর্বার স্বয়ংবরা হয়ে দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন। ঋতুপর্ণের আদেশে নল একদিনের মধ্যে রাজাকে বিদর্ভরাজপুরী কুণ্ডিননগরীতে নিয়ে যান। পথে তিনি ঋতুপর্ণের নিকট

হতে হস্তগণনাবিদ্যা ও অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করেন। এর ফলে, কলি তাঁর দেহ থেকে পলায়ন করেন। এই শিক্ষার পরিবর্তে নল ঋতুপর্ণকে অশ্বচালনবিদ্যা শিক্ষায় পারঙ্গম করে দেন। কুণ্ডিনগরীতে এসে ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোন আয়োজন না দেখে বিস্মিত হন। দময়ন্তী কেশিনী নামে এক দূতীকে পাঠিয়ে নানাভাবে বাহুকরূপী নলকে পরীক্ষা করেন। কেশিনী দময়ন্তীকে জানান যে, বাহুকের দৃষ্টিমাত্র শূন্য কলস জলপূর্ণ হয় এবং সূর্যকিরণে তৃণমুষ্টি ধরলেই তাহা প্রজ্বলিত হয়। অবশেষে তাঁর রন্ধিত মাংস ভক্ষণ করে দময়ন্তীর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই বাহুকই ছদ্মরূপী নল। তখন পিতামাতার সম্মতি নিয়ে বাহুককে গৃহে আনিয়ে দময়ন্তী আত্মপরিচয় দেন এবং দীর্ঘদিন নানা প্রকার যন্ত্রণাভোগের পর তাঁদের পরস্পরের মিলন হয়। কর্কোটকদত্ত বস্ত্র পরিধান করে নল তাঁর পূর্বরূপে রূপান্তরিত হন। নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে, নল ভ্রাতা পুষ্করকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেন ও বিজয়ী হয়ে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ পুষ্করকে অর্ধরাজ্য দান করে দময়ন্তীসহ সুখে রাজ্যভোগ করতে থাকেন (মহাভারত—বন)।

দশমহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ দেবী মহাশক্তির দশ মূর্তি। এই মহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে, তবে এইটি প্রচলিত—মহাদেব সতীকে দক্ষযজ্ঞে যেতে নিষেধ করেন; এতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্তি ধারণপূর্বক শিবের ভয়োৎপাদন করেন, কিন্তু তাতেও মহাদেব ভীত না হলে ভগবতী দশ দিকে দশ মূর্তিতে আবির্ভূতা হন এবং মহাদেবের পথরোধ করেন। এই দশ মূর্তিতে তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেম বলেই এঁদের নাম দশমহাবিদ্যা।

দল—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। সুশোভনা পিতৃশাপে শল, দল ও বল নামে তিন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী পুত্র প্রসব করেন। শল মহর্ষি বামদেবের অশ্বদ্বয় গ্রহণ করে প্রত্যর্পণ না করায় রাক্ষসহস্তে নিহত হন। শলের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দল রাজা হলেও বামদেবের প্রার্থনায় অশ্বদ্বয় ফিরিয়ে দেননি। উপরন্তু তিনি বামদেবকে নিহত করার জন্য বাণ নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সেই বাণে দলের পুত্র শ্যেনজিৎ নিহত হয়। দল পুনর্বার বাণ নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলে তাঁর হস্ত উত্থিত হয় না। বাণ নিক্ষিপ্ত হল না দেখে তিনি বামদেবের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর আদেশে তাঁর স্ত্রীকে স্পর্শ করে

পাপমুক্ত হন (মহাভারত—বন)।

দশরথ—সূর্যবংশীয় নৃপতি দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ ও অজের পুত্র দশরথ। ইনি অযোধ্যার রাজা ও রামলক্ষ্মণাদির পিতা। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে এঁর তিনটি প্রধানা মহিষী ছিলেন। বহু বৎসর এঁর কোন পুত্র হয়নি। শান্তা নামে এঁর এক কন্যাও ছিল। দশরথ এই কন্যাকে পরম মিত্র অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের নিকট পোষ্যপুত্রিকা রূপে অর্পণ করেন। লোমপাদ শান্তাকে বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত বিবাহ দেন। যৌবনে দশরথ একবার মৃগয়াকালে গভীররাত্রে কলসে জলপূর্ণরত এক মুনিকুমারকে জলপানরত হস্তীভ্রমে শব্দভেদী বাণের সাহায্যে নিহত করেন। উক্ত মুনিকুমারের অন্ধ পিতা দশরথকে অনুরূপ পুত্রশোকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। অপুত্রক দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করেন ও সেই যজ্ঞের পায়স কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে পুত্রলাভার্থে আহার করতে দেন। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী এই পায়সের অংশ অন্য সপত্নী সুমিত্রাকেও আহার করতে দেন। এর ফলে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার দুইভাগ পায়স ভক্ষণের ফলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কৌশল্যার গর্ভে শান্তা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। একবার দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্য করতে গিয়ে দশরথ দুইবার ভীষণরূপে আহত হন এবং কৈকেয়ীর সেবায় ও যত্নে আরোগ্যলাভ করেন। সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বরদানে প্রতিশ্রুত হন। পুত্রদের বিবাহ হয়ে গেলে দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার আয়োজন করেন, তখন ক্রূরমতি দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী দশরথের নিকট প্রতিশ্রুত এক বরে ভরতের রাজ্যলাভ ও অন্য বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করেন। পিতৃসত্য পালনার্থ রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে গেলে পুত্রশোকে কাতর হয়ে দশরথ প্রাণত্যাগ করেন। রামের প্রতিনিধিরূপে ভরত রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপনকরতঃ রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। রাবণবধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দশরথ ইন্দ্রলোক হতে এসে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করে যান এবং রামের বিরহে স্বর্গও তাঁর কাছে সুখকর হয়নি বলেন। রামের অনুরোধে দশরথ কৈকেয়ী ও ভরতকে ত্যাগ করার অভিশাপ প্রত্যাহার করেন ও সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার অপমানের জন্য সান্ত্বনা না দিয়ে সুরলোকে গমন করেন।

দশদিক্‌পাল—দশ দিকের অধীশ্বর।

এই দেবতারা দশ দিক্ রক্ষা করেন। ইন্দ্র পূর্বদিক্ ; অগ্নি অগ্নিকোণ ; যম দক্ষিণদিক ; নির্ঋত নৈর্ঋতকোণ ; বরুণ পশ্চিমকোণ ; মরুৎ বায়ুকোণ ; কুবের উত্তরদিক্ ; ঈশ ঈশানকোণ ; ব্রহ্মা উর্ধ্বদিক্ ; অনন্ত অধোধিক।

দশানন—রাবণের অন্য নাম।

দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশাবতার। এই দশটি অবতার পৃথিবীর অত্যন্ত সঙ্কটসময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে দশাবতার বললে এঁদেরই বোঝায়। এই দশাবতারের কাহিনী এইরূপ বর্ণিত আছে—

মৎস্যাবতার — প্রলয়কালে পয়োধিজলে বেদ নিমগ্ন থাকায় ভগবান মৎস্যরূপে তার উদ্ধার করেন ; এইজন্য এঁর নাম মৎস্যাবতার। কূর্ম অবতার—ভগবান্ ভাসমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করে রক্ষা করেন। বরাহ অবতার—ভগবান্ নিমজ্জমানা পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার করেন এবং হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন। নৃসিংহ অবতার—প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করবার জন্যে ভগবান্ নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হন। বামন অবতার—ভগবান দৈত্যরাজ বলিকে দমন করেন। পরশুরাম অবতার—ভগবান পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করেন। রামচন্দ্র অবতারে—ভগবান রামচন্দ্ররূপে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করেন। বলরাম অবতারে—ভগবান প্রলম্ব অসুরকে বিনাশ করেন। বুদ্ধ অবতারে—ভগবান জীবহিংসা নিরোধ করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত আছে যে, শেষ কল্কি অবতারে—কলির শেষে ভগবান কল্কিরূপে ম্লেচ্ছাদি দুষ্কৃতদের দমন ও সত্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে মঙ্গলবারে হস্তানক্ষত্রে গঙ্গা স্বর্গ হতে মর্তলোকে আসেন ; সেই জন্য এই দিন অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্য। এই তিথি নানারকম পাপ ক্ষয় করে এবং এই তিথিতে স্নান ও দান করলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই তিথিতে গঙ্গা দশবিধ পাপ ও দশজন্মার্জিত পাপ হরণ করেন বলে এর নাম দশহরা।

দশাশ্বমেধ—কাশীর তীর্থস্থান। ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কাশীর যে স্থানে এই যজ্ঞ হয়েছিল তার নাম দশাশ্বমেধ।

দংশ—জনৈক অসুর। সত্যযুগে দংশ নামে এক প্রবল মহাসুর ছিল। এক দিন ভৃগুর স্ত্রীকে এই অসুর বলপূর্বক হরণ করে। এতে ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন যে, সে মূত্রভোজী কীট হবে।

তখন দংশ বার বার ভৃগুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ভৃগু বলেন, "আমার বংশোদ্ভূত পরশুরাম হতে তুমি মুক্তিলাভ করবে।" দংশ তখন কীটযোনি প্রাপ্ত হয়। কর্ণ পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করার সময়ে একদিন পরশুরাম কর্ণের কোলে মস্তক রক্ষণপূর্বক নিদ্রাভিভূত ছিলেন। উক্ত সময় এক ভীষণ কীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করে উর্ধ্বে উত্থিত হতে থাকে। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হবে, এই ভীতিতে কর্ণ কীটের ভীষণ দংশন সহ্য করতে থাকেন। পরে কর্ণের উরুদেশ হতে শোণিত পরশুরামের কর্ণে প্রবেশ করলে, পরশুরাম জাগ্রত হয়ে উঠেন এবং সমূহ বৃত্তান্ত জানতে চান। তখন কর্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত গুরুকে জানান। কর্ণের কথা শ্রবণ করে পরশুরাম সেই কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এর ফলে উক্ত কীট তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে ও শাপমুক্ত হয়ে পরশুরামকে প্রণাম করে যথাস্থানে প্রস্থান করে (মহাভারত—শান্তি)।

দানব—কশ্যপ এবং তাঁর অন্যতমা স্ত্রী দনুর গর্ভজাত সন্তানরা দানব নামে প্রসিদ্ধ। এরা দেবতাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত ছিল।

দাক্ষায়ণী—দক্ষের সমস্ত কন্যাকে দাক্ষায়ণী বলা হয়; তবে দাক্ষায়ণী নামে অদিতিই বিশেষভাবে অভিহিতা হতেন (মহাভারত—আদি)।

দ্বারুক—কৃষ্ণের সারথি। সুভদ্রাহরণের সময় যাদবদের বিপক্ষাচরণ করতে অরাজী হয়ে এই সারথি কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিল যে, তাকে বেঁধে রেখে কৃষ্ণ যেন নিজে রথ চালনা করে অভীষ্টস্থানে যান। দ্বারুক কৃষ্ণের আদেশে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে কৃষ্ণের রথে সাত্যকির সারথি হন। যদুবংশ ধ্বংস হলে ইনি কৃষ্ণের আদেশে হস্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে যান (মহাভারত)।

দ্বাপর—তৃতীয় যুগ। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪০,০০০ বৎসর। দ্বাপরে অর্ধপুণ্য ও অর্ধপাপ; মানবদেহ সপ্ত হস্তপরিমিত এবং মানবের পরমায়ু সহস্রবর্ষ; তাম্রপাত্রে ভোজন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন বৃহস্পতিবারে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়েছিল। এই যুগের অবতার কৃষ্ণ ও বলরাম। এই যুগে শাল্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, কংস, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, রুক্মাঙ্গদ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, বিষ্ককসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন ইত্যাদি রাজা ছিলেন।

দ্বারকা - গুজরাটের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। কৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মা এই শহর নির্মাণ করেন। কংসবধের পর কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ ও অসুর কালযবনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে নিয়ে এই দ্বারকায় আসেন। যদুবংশ

ধ্বংসের পর যাদব নারীদের নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারকা সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। দ্বারকা হিন্দুদের পরম তীর্থস্থান।

দিগ্‌গজ—অষ্টদিক্ রক্ষাকারী হস্তিগণ। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতীক—এই অষ্টদিকের হস্তী। ঐরাবত পূর্বদিক্, পুণ্ডরীক অগ্নিকোণ, বামন দক্ষিণদিক্, কুমুদ নৈঋর্তকোণ, অঞ্জন পশ্চিমদিক্, পুষ্পদন্ত বায়ুকোণ, সার্বভৌম উত্তরদিক্ ও সুপ্রতীক ঈশানকোণ রক্ষা করেন।

দিতি—ইনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের স্ত্রী ও দৈত্যদের মাতা। এঁর গর্ভে যারা জন্মগ্রহণ করেছিল, তারাই দৈত্য নামে বিখ্যাত। দেবতাদের আক্রমণে সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হলে দিতি স্বামীর নিকট ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ স্ত্রীর প্রার্থনা পূরণ করে বলেন, "তোমাকে সহস্র বৎসর গর্ভধারণ করে, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা দেহে ও মনে শুচি হয়ে থাকতে হবে।" দিতি যথাসাধ্য স্বামীবাক্য পালন করতে লাগলেন। অপর দিকে ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করে ইন্দ্র দিতির গর্ভ নষ্ট করার জন্য সর্বদা ছিদ্রানুসন্ধান করতে থাকেন, শেষে একদিন দিতিকে অধৌত পদে শয়ন করতে দেখে সেই সুযোগে ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করে বজ্রদ্বারা তাঁর জরায়ুকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করেন। গর্ভের এই বিভক্ত সন্তানেব ক্রন্দনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইন্দ্র এই প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত খণ্ডে বিভক্ত করেন, এবং এই পুত্রদের 'মরুৎ' বলে সান্ত্বনা দেন। এইরূপে প্রসূত সন্তানেরা মরুৎ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন (বিষ্ণুপুরাণ)।

রামায়ণে এইরূপ কথিত আছে যে, দিতি কশ্যপের কাছে ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রার্থনা করলে কশ্যপ বলেন যে, দিতি যদি সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকতে পারেন, তবেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এই বলে, কশ্যপ দিতির অঙ্গ স্পর্শ করে তপস্যার জন্য গমন করেন। তখন দিতি কুশপ্লব নামক স্থানে তপস্যা আরম্ভ করেন। ইন্দ্র তাঁকে নানাভাবে পরিচর্যা করতেন। ৯৯০ বৎসর অতিক্রান্ত হলে দিতি সানন্দে ইন্দ্রকে বলেন "আর দশ বৎসর পরে তোমার নিধনের জন্য যে পুত্র চেয়েছিলাম তার জন্ম হবে, এবং তুমি তার সঙ্গেই নিশ্চিন্তে ত্রিলোক শাসন করবে।" ইন্দ্র তখন তাঁর ছিদ্রানুসন্ধানে রত হন। একদিন মধ্যাহ্নকালে দিতি মাথার দিকে পা ও পায়ের দিকে মাথা রেখে নিদ্রা যাওয়ায় ইন্দ্র তাঁকে অশুচিজ্ঞানে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভস্থ সন্তান বজ্রদ্বারা সপ্তধা বিভক্ত করলে, গর্ভস্থ শিশুর রোদনে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হয়।

ইন্দ্র ‘মা রুদ’ (কেঁদো না) বলে শিশুকে কাটতে থাকেন। দিতি ‘মেরো না’ বলায় ইন্দ্র বয়িয়ে এসে সবিনয়ে বলেন যে, দিতি অশুচি হয়ে শুয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁর ভাবী হত্যাকারীকে কর্তন করেছেন। দিতি তখন আত্মদোষ স্বীকার করেন ও বলেন যে, ইন্দ্র ‘মা রুদ’ বলেছেন বলে এই সপ্ত খণ্ড গর্ভ সপ্ত পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করুক ও মরুৎ নামে খ্যাত হয়ে সপ্তলোকে বিচরণ করুক। তাহাই স্থির করে ইন্দ্র ও দিতি স্বর্গে প্রস্থান করেন।

দিবোদাস—(১) ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত একজন ধর্মভীরু ন্যায়বান্ রাজা। এঁর জন্য ইন্দ্র একশত প্রস্তরপুরী বিদীর্ণ করেন।

(২) কাশীর বাজা হর্যশ্বের পুত্র সুদেব, সুদেবের পুত্র দিবোদাস। দেবগণ আকাশ হতে পুষ্প, রত্ন ইত্যাদি এঁকে দান করতেন বলে এঁর এই নাম। হর্ষশ্ব ও তাঁর পুত্র সুদেব দুইজনেই হৈহয় বা বীতহব্যের পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পর দিবোদাস রাজা হন। বীতহব্যের পুত্ররা আবার কাশী আক্রমণ করে দিবোদাসকে পরাজিত করে ও তাঁর পুত্রদের বধ করে। অন্য উপায় না দেখে দিবোদাস পলায়ন করে মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হন। ভরদ্বাজ এঁকে আশ্বাস দিয়ে এক যজ্ঞ করেন। তার ফলে দিবোদাসের প্রতর্দন নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র ভরদ্বাজের যোগবলে পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দিবোদাস তাঁর পুত্রকে পরাক্রান্ত দেখে হৃষ্টচিত্তে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তারপর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন বীতহব্যের শত পুত্র বিনাশ করেন। বীতহব্য প্রতর্দনের ভয়ে পলায়ন করে ভৃগু মুনির শরণাপন্ন হন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসরণ করে ভৃগুর আশ্রমে এসে বীতহব্যকে ত্যাগ করবার জন্য ভৃগু মুনিকে অনুরোধ করেন। মুনি তার কারণ জানতে চাইলে প্রতর্দন সমস্ত ঘটনা বলেন এবং আরও বলেন যে, তাঁকে বধ কবলে প্রতর্দন পিতৃঋণ হতে মুক্ত হবেন। তখন শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য ধর্মাত্মা ভৃগু বীতহব্যকে ব্রাহ্মণ করে দিয়ে বলেন যে, এখানে কোন ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রতর্দন তখন বীর্যবান বীতহব্যকে জাতিত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন জেনে প্রসন্নমনে ফিবে যান (মহাভারত—অনুশাসন)।

(৩) ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন (বিষ্ণুপুরাণ)

(৪) পুরুবংশীয় রাজা হর্যশ্বের পুত্র মুদ্গল। এই মুদ্গল হতে জাত ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়ে মৌদ্গল্য নামে খ্যাত হন। মুদ্গলের পুত্র

বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের পুত্র দিবোদাস ও কন্যা অহল্যা। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর পুত্র রাজা চ্যবন (বিষ্ণু-পুরাণ)।

দিলীপ—ইনি সগরবংশীয় অংশুমানের পুত্র ও ভগীরথের পিতা এবং রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। কথিত আছে, দিলীপ একবার স্বর্গ হতে প্রত্যাবর্তনকালে সুরভী গাভীকে অতিক্রম করেন। সুরভী এইরূপে দিলীপ কর্তৃক অপমানিত হলে দিলীপকে অভিশাপ দেয় যে, সেবাদ্বারা তার কন্যা নন্দিনীর প্রীতিসাধন না করতে পারলে দিলীপের কোন সন্তান হবে না। রাজা বহুদিন নিঃসন্তান থেকে বশিষ্ঠ ঋষির পরামর্শে স্ত্রী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনীর সেবা করতে আসেন। নন্দিনী দিলীপের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদান করেন। নন্দিনীর বরে দিলীপের পুত্র রঘুর জন্ম হয় (কালিদাস—রঘুবংশ)।

দীর্ঘতমা—ঋষি উতথ্য ও মমতার পুত্র। মমতা যখন গর্ভিণী ছিলেন, তখন তাঁর দেবর ও দেবতাদের পুরোহিত বৃহস্পতি তাঁর সহিত সংগমেচ্ছু হন। তখন মমতা বলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতেই আমি গর্ভিতা হয়েছি, তোমার বীর্য অমোঘ।" গর্ভস্থ শিশুও বৃহস্পতিকে রেতঃপাত করতে নিষেধ করেন; কারণ একই গর্ভমধ্যে দুইজনের স্থিতি সম্ভব নয়। কিন্তু বৃহস্পতি শিশুর কথায় কর্ণপাত না করে মাতার অসম্মতিতে রেতঃপাত করেন। তখন শিশু নিজের পদদ্বারা শুক্র প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেন। এতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ পুত্রকে এই বলে অভিসম্পাত দেন, "তুমি দীর্ঘ তামসে প্রবিষ্ট হবে, অর্থাৎ অন্ধ হবে।" উতথ্যের এই পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং এঁর নাম হয় দীর্ঘতমা। প্রদ্বেষী নামে এক কন্যার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। দীর্ঘতমা ধার্মিক ও বেদজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সুরভী-সন্তান কামধেনু হতে গোধর্ম শিক্ষা করে যত্রতত্র সংগম করার জন্য প্রতিবেশী ক্রুদ্ধ মুনিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এঁর স্ত্রীও স্বামীর এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে অন্ধ স্বামীকে ভরণপোষণ করতে অস্বীকার করেন। দীর্ঘতমার পুত্ররা মাতার আদেশে তাঁকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। বলিরাজা স্নানের জন্য গঙ্গায় এসে তাঁকে এই ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান এবং তেজস্বী দেখে সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যান ও নিজ স্ত্রী সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার কাছে গমন করতে বলেন। সুদেষ্ণা তাঁকে বৃদ্ধ ও অন্ধ দেখে অবজ্ঞাভরে স্বয়ং না গিয়ে তাঁর শূদ্রা দাসীকে বৃদ্ধ ঋষির কাছে পাঠিয়ে দেন। ফলে, শূদ্রযোনিতে দীর্ঘতমা কাক্ষীবানাদি একাদশ পুত্রের জন্ম দেন। রাজা এই

ঘটনা জ্ঞাত হয়ে পুনরায় স্ত্রী সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার কাছে প্রেরণ করেন। তখন দীর্ঘতমা রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করে বলেন যে, তাঁর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি তেজস্বী পুত্র হবে এবং তাদের নামে এক একটি দেশ নামাঙ্কিত হবে। যথা—অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ এবং সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ হবে (মহাভারত—আদি)।

দীর্ঘরোমা—(১) ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। শিবের এক অনুচরও বটে।

দুর্গা—পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বের আদি কারণ ও শিবপত্নী। মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ হতে বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। দেবতারা বিপন্ন হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা শিব ও দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেন ও তাঁদের বিপদ হতে রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। কারণ, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হয়েছে। বিষ্ণু তখন বলেন যে, এই অসুরকে বধ করতে হলে নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, স্ব স্ব তেজের কাছে এই প্রার্থনা করতে হবে যে, এই সমবেতভাবে উৎপন্ন তেজ হতে যেন এক নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। এই নারীই অসুরকে বিনাশ করবেন। এই শুনে ব্রহ্মা শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের দেহ হতে তেজ নির্গত হয় এবং এই সমবেত তেজরাশি হতে এক নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ এঁকে দান করেন। এই দেবী মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন। প্রথম বার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গারূপে। রাত্রে ভদ্রকালীর মূর্তি স্বপ্নে দেখে মহিষাসুর এই মূর্তির আরাধনা করেছিলেন। দেবী মহিষাসুরের কাছে এলে মহিষাসুর বলেন, "আপনার হাতে মৃত্যুর জন্য কোন দুঃখ নেই; কিন্তু আপনার সঙ্গে আমিও যাতে সকলের পূজিত হই, তারই ব্যবস্থা করুন।" দেবী তখন বললেন "উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা—এই তিন মূর্তিতে তুমি সব সময় আমার পদলগ্ন হয়ে দেবতা, মানুষ ও রাক্ষসদের পূজ্য হবে" (দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও কালিকাপুরাণ)।

সত্যযুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দুর্গামূর্তি প্রস্তুত করে তিন বৎসর পূজার্চনা করেছিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণ চৈত্রমাসে বসন্তকালে এঁর পূজা করতেন। সে জন্য এই পূজা বাসন্তী-পূজা নামে বিখ্যাত। রামচন্দ্র অকালে বোধন করে রাবণবধের জন্য এই পূজা করেছিলেন।

দুন্দুভি—মহিষরূপী দানব। বালী একে বধ করে এর দেহ ঋষ্যমুখ পর্বতে নিক্ষেপ করে। সেই হতে মহর্ষি মতঙ্গের শাপে বালী আর ঋষ্যমুখে যেতে পারত না (রামায়ণ)।

দুর্বাসা—মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসার জন্ম হয়। তপঃপ্রভাবে ইনি তেজের আধার ছিলেন বটে, কিন্তু অতি কোপনস্বভাব ছিলেন বলে অনেকেই তাঁর কোপানলে দগ্ধ হন। ঔর্বমুনির কন্যা কন্দলীকে ইনি বিবাহ করেন। বিবাহের সময় দুর্বাসা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, স্ত্রীর শত অপরাধ পর্যন্ত তিনি মার্জনা করবেন। সেই অনুসারে ইনি শত অপরাধের পর স্ত্রীকে শাপ দিয়ে ভস্ম করেন। কন্যাশোকাতুর হয়ে ঔর্ব শাপ দেন যে, দুর্বাসার দর্প হত হবে। এর ফলে ইনি মহারাজ অম্বরীষের কাছে হতদর্প হন। দুর্বাসার সন্তোষে অনেকের সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। পাণ্ডবজননী কুন্তী যখন কুন্তীভোজের গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা তাঁকে আহ্বান-মন্ত্র দান করেন; যার ফলে সূর্য, ধর্ম, পবন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করে কুন্তী কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। একবার দুর্বাসা ভ্রমণ করতে করতে এক অপ্সরার হাত হতে 'সন্তানক' পুষ্পমাল্য লাভ করেন। ঐ মালা তিনি ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের মাথায় স্থাপন করলে ঐরাবত উহা ছিন্নভিন্ন করে মাটিতে নিক্ষেপ করে। এইজন্য দুর্বাসার শাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হন। এঁরই শাপে শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। বনবাসকালে পাণ্ডবদের বিপন্ন করবার জন্য একবার দুর্যোধনের অনুরোধে অসময়ে দশ সহস্র শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা পাণ্ডবদের অতিথি হন; কিন্তু কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির বলে পাণ্ডবরা দুর্বাসার আসন্ন অভিশাপ থেকে রক্ষা পান। দুর্বাসা অনেক সময় উন্মত্তের মত কাজ করতেন। একদিন উত্তপ্ত পায়স ভক্ষণ করতে করতে দুর্বাসা কৃষ্ণকে তাঁর সর্বশরীরে সেই পায়স লেপন করতে বলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিবশতঃ কৃষ্ণ পায়ের তলা ভিন্ন সর্বত্র পায়স লেপন করলেন। তখন দুর্বাসা রুক্মিণীর দেহে পায়স লেপন করে, তাঁকে রথে যোজনা করে, সেই রথে আরোহণ করে রুক্মিণীকে কশাঘাত করতে থাকেন। রুক্মিণী যথাশক্তি রথ আকর্ষণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে রথ থেকে নেমে দক্ষিণ দিকে যাবার উদ্‌যোগ করেন। পরে কৃষ্ণ এঁকে সন্তুষ্ট করলে দুর্বাসা তাঁকে বললেন যে, কৃষ্ণ ক্রোধজিত, তাঁর ক্রোধ জয় করেছেন বলে তাঁর বরে তিনি ও রুক্মিণী সর্বলোকের প্রিয় হবেন। তিনি আরও বললেন যে, পদ-

তলে কৃষ্ণ পায়স লেপন করেন নাই বলে তিনি দুঃখিত হয়েছেন; তাই পদতল ব্যতীত কৃষ্ণের সর্বদেহ অভেদ্য হয়ে থাকবে। এই জন্যই পরে এক ব্যাধের বাণ পদতলে বিদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। একবার দুর্বাসা রাজা অম্বরীষের আতিথ্য স্বীকার করে অনুপস্থিত হন। উপবাসী অম্বরীষ পারণের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় দেখে, ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে পারণ আরম্ভ করতেই ক্রুদ্ধ দুর্বাসা সেখানে উপস্থিত হন ও নিজের জটা ছিন্ন করে এক ভীষণাকার পুরুষ সৃষ্টি করেন রাজাকে বিনাশ করার জন্য। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা ঐ পুরুষকে নিহত করে দুর্বাসাকেও হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন দুর্বাসা অম্বরীষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে রক্ষা পান।

রামচন্দ্র মর্ত্যধাম ত্যাগের পূর্বে যখন নির্জনে কালপুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় দুর্বাসা রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান; কিন্তু কালপুরুষের কাছে রাম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁদের আলাপকালে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এদিকে দুর্বাসার অভিশাপের ভয়ে লক্ষ্মণ পরামর্শস্থানে উপস্থিত হয়ে রামকে সংবাদ দেওয়াতে সরযূ-সলিলে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়।

দুর্বাসার শাপে শাম্ব যদুবংশনাশক মুষল প্রসব করেন। তারই ফলে যদুবংশ ধ্বংস হয় (মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবত)।

দুর্মুখ—(১) রামের গুপ্তচর। এর সাহায্যে রাম প্রজাদের মতামত জ্ঞাত হতেন। রামচন্দ্র এই চরের কাছে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাদের আলোচনা শ্রবণকরতঃ সীতাকে নির্বাসিত করেন।

(২) ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্রের নাম।

দুর্যোধন—ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্রের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। মহাভারতের যুদ্ধে ইনিই ছিলেন কৌরবদের নেতা। ব্যাসদেব গান্ধারীকে শতপুত্রবতী হওয়ার বর দেন। দুই বৎসর পর্যন্ত গর্ভধারণের পরও পুত্র প্রসব না হওয়ায় ও কুন্তীর পুত্রলাভের সংবাদে ঈর্ষান্বিতা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে নিজের গর্ভপাত করেন। ফলে, একটি লৌহ-কঠিন মাংসপিণ্ড প্রসূত হয়। গান্ধারী তা' ফেলে দেবার সময় ব্যাসদেব উপস্থিত হয়ে গান্ধারীকে সেই পিণ্ডকে শীতলজলে সিক্ত করে রাখতে বলেন। তা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একশত ভ্রূণ পৃথক হলে তাদের পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখা হয়। একবৎসর পরে একটি কলসে প্রথমে দুর্যোধনের জন্ম হয়। ভীম ও দুর্যোধন একই দিনে

জন্মগ্রহণ করেন। জন্মমাত্রই দুর্যোধন গর্দভের ন্যায় চীৎকার শুরু করেন। ব্রাহ্মণগণ ও বিদুর ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, দুর্যোধন হতে কুরুবংশ ধ্বংস হবে। তাকে পরিত্যাগ করবার জন্য তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক হস্তিনাপুরে নীত হয়ে তাঁর আশ্রয়ে দুর্যোধনাদি একশত ভ্রাতার সহিত শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হতেথাকেন। ভীমের বলবীর্যে কৌরবগণ তাঁর হাতে ক্রীড়াচ্ছলে নানাভাবে নিগৃহীত হতেন বলে বাল্যকাল থেকেই দুর্যোধন পাণ্ডবদেব মধ্যে বিশেষ করে ভীমকেই সর্বাপেক্ষা ঘৃণা ও ঈর্ষার চক্ষে দেখতেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামেব কাছে শিক্ষালাভ করে দুর্যোধন গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হন। ভীমের সমকক্ষ না হতে পেরে ভীমকে বিনষ্ট করবার জন্য খেলার ছলে একদিন দুর্যোধন ভীমকে বিষপান কবিয়ে মূর্ছিতাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ কবেন। সেই অবস্থায় নদীগর্ভে পড়ে থাকার পর ভীম বাসুকি কর্তৃক নাগলোকে নীত হন ও বিষজ্বর হতে আরোগ্যলাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যকে নিযুক্ত করেন। তাঁর নিকট শিক্ষায় ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কৌরবগণের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনকালে রঙ্গভূমিতে ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরকে ক্রুদ্ধভাবে গদাহস্তে আক্রমণ করেন। দ্রোণের আদেশে অশ্বত্থামা তাঁদের নিবারণ করেন। রঙ্গস্থলে অনাহূত কর্ণের বংশপরিচয় নিয়ে কৃপাচার্য ও পাণ্ডবপক্ষীয়গণ অপমান করলে দুর্যোধন সেখানেই তাঁকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। দ্রোণের গুরুদক্ষিণারূপে দ্রুপদকে ধরে নিয়ে আসার সময় যুদ্ধে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ নিপীডিত হন এবং পাণ্ডবদের চেষ্টায় জয়লাভ করেন। পাণ্ডবদের ক্রমবর্ধমান শ্রী ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন মাতুল শকুনি ও কর্ণের পবামর্শে ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে কৌশলে তাঁদের বারণাবতে পাঠান। সেখানে পূর্ব হতেই পুরোচন নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে এক জতুগৃহ নির্মাণ করিয়ে পাণ্ডবদের দগ্ধ করবাব ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিদুরের সহায়তায় তাঁর সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে তাঁকে লাভ করেন ও দুর্যোধনাদি কৌরবগণ লজ্জিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। দ্রুপদের সহিত আত্মীয়তা করায় পাণ্ডবদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্যরূপে খাণ্ডবপ্রস্থ দান করেন। পাণ্ডবরা বনভূমি উৎপাটন করে সে-স্থলে ইন্দ্রপ্রস্থ নগব প্রতিষ্ঠা করেন ও নানাদেশ জয় করে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। পাণ্ডবদের

রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে নিমন্ত্রিত দুর্যোধন পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দর্শনে অতীব ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মাতুল শকুনির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনির কপট-দ্যূতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে হারিয়ে তাঁদের সমূহ রাজ্য ও দ্রৌপদীকে জয় করেন। দুর্যোধন জয়ে প্রফুল্ল হয়ে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে উপস্থিত করতে আদেশ দেন। তিনি আসতে অস্বীকৃতা হলে, দুঃশাসন তাঁর কেশাকর্ষণ করে নিয়ে আসেন। দুর্যোধন তখন তাঁকে নিজের উরুদেশে বসবার জন্য আহ্বান করেন। ভীম এই অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। একদা মহাদেব দুর্যোধনকে বর দিতে উদ্যত হয়ে তাঁর কাছে নগ্নগাত্রে উপস্থিত হতে বলেন। দুর্যোধন কৌপীনমাত্র পরিধান-পূর্বক তাঁর সমীপস্থ হতে রাজী হন না।

মহাদেবের দৃষ্টি তাঁর গাত্রে পতিত হতেই দুর্যোধনের দেহ অভেদ্য হয়। কেবল উরুদ্বয় কৌপীনাবৃত থাকায় সে-স্থান অস্ত্রের অভেদ্য হয় নি। প্রথম দ্যূতক্রীড়ার পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের মুক্তি দেন। আবার ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেন। এবারও শকুনি কপট-দ্যূতে জয়লাভ করেন এবং দ্যূতের সর্তানুযায়ী পাণ্ডবগণ বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে প্রতিশ্রুত হয়ে রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক চলে যান। অজ্ঞাতবাসকালে কেউ তাঁদের সন্ধান পেলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসের সর্ত হয়। দ্বৈতবনে পাণ্ডবরা যখন বাস করছিলেন, তখন দুর্যোধন তাঁর গোপপল্লী দর্শন ও মৃগয়ার অছিলায় সদলবলে পাণ্ডবদের দুর্দশা পরিদর্শনে এসে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হস্তে সপরিবারে নিগৃহীত হন ও অবশেষে পাণ্ডবদের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর দুর্যোধন আত্মগ্লানিতে প্রায়োপবেশন করেন। পাতালবাসী দানবগণ তাঁকে জীবিত রাখার জন্য পাতালে নিয়ে গিয়ে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে জয়লাভের ভরসা দিয়ে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করানোর পর, পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞের অনুকরণে দুর্যোধন বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিরাটগৃহে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে ভীম কর্তৃক কীচক নিহত হওয়ায় দুর্যোধনাদি কৌরবগণ বিরাটকে দুর্বল মনে করে তাঁর গোধন হরণ করেন। কিন্তু বৃহন্নলারূপী অর্জুনের নিকট দুর্যোধনাদি কৌরবরা পরাজিত হন। সম্মোহন-অস্ত্রে তাঁদের জ্ঞানহীন করে অর্জুন বিরাটপুত্র উত্তরকে দিয়ে তাঁর শিষ্যা উত্তরার জন্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি হরণ করান। যুদ্ধজয়ের পর পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়ে বিরাট আপন

কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা রাজ্যোদ্ধারের পরিকল্পনা করতে থাকেন। সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ আয়োজন সুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য লাভের আশায় দুর্যোধন ও অর্জুন প্রায় একই সময়ে দ্বারকায় যাত্রা করেন। তাঁদের আগমনবার্তা পূর্বে জ্ঞাত হয়ে কৃষ্ণ নিদ্রাব ভান কবে শুয়ে থাকেন। দুর্যোধন পূর্বাহ্নে এসে কৃষ্ণের শিয়রে এক উৎকৃষ্ট আসনে বসে নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করেন। পরে অর্জুন কৃষ্ণের পাদদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা কবতে থাকেন। নিদ্রাভঙ্গের পব উভয়েই আসন্ন যুদ্ধে তাঁকে স্বপক্ষ অবলম্বন করতে বলায় কৃষ্ণ বলেন যে, দুর্যোধন আগে এসে থাকলেও অর্জুনকেই তিনি প্রথমে দেখতে পান, কিন্তু দু'জনকেই তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। একপক্ষে তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না; অপরপক্ষে তাঁর প্রায় দশ লক্ষ নারায়ণী সেনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। তাঁরা কে কোনটি চান, সেই কথাই জানতে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন অর্জুন স্বয়ং কৃষ্ণকে প্রার্থনা করলেন ও দুর্যোধন নারায়ণী সেনা গ্রহণ করলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধ নিবারণার্থ ও পাণ্ডবদের ন্যায্য রাজ্যভাগ প্রার্থনা করতে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দৌত্য করতে যান। দুর্যোধন সূচ্যগ্র ভূমিও ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন না। এই সভাতেই দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী কববার অভিসন্ধি কবেন, কিন্তু কৃষ্ণ সেই অভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে দুর্যোধনকে নিরস্ত কবেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচখানি গ্রামমাত্র প্রার্থনা কবলে, দুর্যোধন তা'তেও কর্ণপাত করেন না। যুদ্ধের পূর্বে শকুনিপুত্র উলূককে দিয়ে দুর্যোধন পাণ্ডবদেব প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধ হয়। দশদিন যুদ্ধেব পর কৌরব সেনাপতি ভীষ্মের পতন ঘটে। পাঁচদিন যুদ্ধের পর সেনাপতি দ্রোণ, আড়াই দিনে কর্ণ ও অর্ধদিনে শল্যের পতন হয়। যুদ্ধকালে দুর্যোধন কর্ণ ভিন্ন আর সকল সেনাপতিকেই সময়ে সময়ে পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে ব্যক্যবাণে বিদ্ধ করেন।

অভিমন্যু-বধের সপ্তরথীর মধ্যে দুর্যোধন অন্যতম। দ্রোণবধের দিন প্রভাতে সাত্যকিকে দেখে দুর্যোধন হঠাৎ এই মহাযুদ্ধ ও আত্মীয়বধের জন্য বিলাপ করেন। কর্ণবধের পর কৃপাচার্য দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে পরামর্শ দিলে দুর্যোধন বলেন যে, আত্মীয়-বন্ধুদের বধ করে

তিনি নিজের জীবন রক্ষা করতে চান না। পূর্বে যে পাণ্ডবদের তিনি নানাভাবে লাঞ্ছিত করেছেন, তাঁদের নিকট সন্ধি-ভিক্ষা করা অপেক্ষা ন্যায়যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ তাঁর নিকট অধিক শ্রেয়। অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে সমস্ত কৌরবসেনা নিহত হলে, দুর্যোধন একাকী পলায়ন করে কুরুক্ষেত্রের বাহিরে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়ে, মায়াদ্বারা তার জল স্তম্ভিত করে জলমধ্যে প্রবেশ করেন। কৌরবপক্ষের হতাবশিষ্ট তিনজন বীর—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা—দুর্যোধনের সহিত পুনরায় যুদ্ধের পরামর্শ করতে আসেন। দুর্যোধন পরদিন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের বিদায় করেন। কয়েকজন ব্যাধ এই আলোচনা শ্রবণ করে পাণ্ডবদের নিকট দুর্যোধনের আত্মগোপনক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। সই সন্ধান অনুসারে পাণ্ডবরা দ্বৈপায়ন হ্রদে আসেন ও যুধিষ্ঠিরের তীক্ষ্ণবাক্যে উত্তেজিত হয়ে দুর্যোধন হ্রদ থেকে উঠে ভীমকেই যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বরণ করেন। কারণ ভীমকে বধ করবার জন্য তিনি তের বৎসর এক লৌহ মূর্তির উপর গদা-প্রহার অভ্যাস করেন। উভয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলে, উভয়েরই শিক্ষাগুরু বলরাম তীর্থভ্রমণরত অবস্থায় যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন। তাঁর পরামর্শক্রমে কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্তী সমস্তপঞ্চকে সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে এক পবিত্র স্থানে যুদ্ধ হয়। গদাযুদ্ধে ভীম অধিক বলশালী হলেও দুর্যোধন কৌশলী ও সুদক্ষ ছিলেন এবং ন্যায়যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করা অসম্ভব ছিল। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুন নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করে ভীমকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যুদ্ধকালে ভীমের প্রহার ব্যর্থ করার জন্য দুর্যোধন লম্ফ দিয়ে উঠতেই ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে কটিদেশের নীচে গদাঘাত করে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। এতদ্ব্যতীত ভূপতিত দুর্যোধনের মস্তকও বাম পদে নিষ্পিষ্ট করেন। অন্যায় যুদ্ধ দেখে বলরাম ভীমকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, কৃষ্ণ তাঁকে নিবারণ করেন। ভগ্নোরু দুর্যোধন কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন। পাণ্ডবগণ মৃতপ্রায় দুর্যোধনকে ত্যাগ করে প্রস্থান করলে, তাঁর উরুভঙ্গের সংবাদ পেয়ে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা তাঁর সমীপবর্তী হন। দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করে পাণ্ডববিনাশে নিযুক্ত করেন এবং ভীমের ছিন্নমুণ্ড আনবার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁরা তিনজনেই রাত্রিকালে পাণ্ডবশিবিরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদি সকলকেই সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেন।

কৃষ্ণসহ পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি অন্যত্র ছিলেন বলে সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যান। অশ্বত্থামাদি এই সংবাদ দুর্যোধনকে দেওয়ার পর তিনি উৎফুল্ল হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুর জন্য তাঁর স্বর্গলাভ হয়।

বাল্যকাল হতেই দুর্যোধন নিয়ামক, প্রভুত্বশালী, আদেশদাতারূপে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ ইনি ছিলেন রাজ্যলোলুপ, ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন, দুর্মুখ, ক্রূর ও দুরাত্মা। আজীবন পাণ্ডবদের অনিষ্টসাধনেই ইনি তৎপর ছিলেন। নিজেও নিয়ত দগ্ধ হয়েছেন ঈর্ষা ও বিদ্বেষের আগুনে। আর তাঁর কুকর্মে পরামর্শদাতা ছিলেন কর্ণ ও শকুনি। ফলে, পাণ্ডবদের নানা উপায়ে ধ্বংস করার তিনি চেষ্টা করেন। বহু হীনকার্যে ইনি উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু দাম্ভিক, দৃঢ়চেতা ও উদ্যোগী পুরুষ হিসাবেই তিনি খ্যাত ছিলেন। উপযুক্ত সুযোগের সাহায্যে সর্বাগ্রে কার্যসিদ্ধি করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। চারিত্রিক নানা দোষ সত্ত্বেও দুর্যোধন কয়েকটি গুণের অধিকারী ছিলেন। অস্ত্র-পরীক্ষার দিন নীচবংশজাত বলে কর্ণ হেয় প্রতিপন্ন হলে, তিনি তাঁকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। দুর্যোধন কর্ণকে চম্পানগরী পালনের ভার দিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হলেও, দুর্যোধন প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনকালে শাম্ব নামে এক ব্রাহ্মণ বলেন যে, দুর্যোধনের প্রতি প্রজাদের পিতার ন্যায় বিশ্বাস ছিল।

দূষণ—রাবণের সেনাপতি। এর অন্য ভ্রাতা খর। রাবণের রাজ্য গোদাবরী তীরস্থ দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খর-দূষণ উভয়েই রাবণের সেনাপতিরূপে ১৪ সহস্র সৈন্যসহ জনস্থান হতে এই রাজ্যের প্রান্তদেশ রক্ষা করত। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এই স্থানে পঞ্চবটীতে বনবাস করবার সময়ে রাবণ ভগিনী শূর্পণখা রামকে ও পরে লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করে এবং সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদ করেন। শূর্পণখা এই দুর্ঘটনা খর ও দূষণকে বিবৃত করলে, তারা সসৈন্যে রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করে। রাম-লক্ষ্মণের হাতে সসৈন্যে প্রথমে খর ও পরে দূষণ নিহত হয়।

দুষ্মন্ত—পুরুবংশের একজন বিখ্যাত রাজা। একদিন ইনি মৃগয়াকালে মৃগের অনুসন্ধানে মালিনী নদীর তীরে কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে অনুচরদের দূরে রেখে আশ্রমে প্রবেশ করেন। কণ্বমুনি আশ্রমে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলা রাজাকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। দুষ্মন্ত তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে শকুন্তলা বলেন যে, বিশ্বামিত্রের

তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র মেনকাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তপস্যা ভঙ্গ করে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে, মেনকার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। সদ্যোজাত কন্যাকে মালিনীর তীরে ত্যাগ করে মেনকা স্বর্গে প্রস্থান করেন। স্নান করতে গিয়ে কণ্বমুনি এই পরিত্যক্তা কন্যাকে শকুন্ত (পক্ষী) কর্তৃক রক্ষিত হতে দেখে, গৃহে নিয়ে এসে কন্যার মত পালন করেন। শকুন্ত-রক্ষিত কন্যা বলে তাঁর নাম হয় শকুন্তলা। দুষ্মন্ত কণ্বমুনির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা না করেই শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করতে চাইলেন। বিবাহে সম্মতি দেবার পূর্বে শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট হতে এই প্রতিশ্রুতি চান যে, তাঁর পুত্রই যেন রাজ্যলাভ করে। দুষ্মন্ত এই প্রতিজ্ঞা করেই তাঁকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। আশ্রম পরিত্যাগ করবার পূর্বে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলে যান যে, তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য পাঠাবেন। এর পর শকুন্তলার গর্ভে বলশালী এক পুত্রের জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়সেই তিনি সবপ্রকার জন্তুকে দমন করতে সক্ষম হতেন বলে, আশ্রমবাসীরা তাঁকে সর্বদমন বলে ডাকতেন। সর্বদমনের যৌবনকাল উপস্থিত হলে কণ্ব বলেন যে, এঁর এখন যুবরাজ হবার সময় উপস্থিত, সুতরাং শকুন্তলার আর অধিককাল পিত্রালয়ে থাকা উচিত নয়। এই বলে তিনি শিষ্যদের দিয়ে শকুন্তলাকে পুত্রসহ দুষ্মন্তের নিকট পাঠিয়ে দেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট আত্ম-পরিচয় দিয়ে পূর্ব-প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করেন; কিন্তু দুষ্মন্তের পূর্ব কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি বলেন যে, তাঁর কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। অধিকন্তু তিনি শকুন্তলাকে যথা ইচ্ছা যেতে বলেন। শকুন্তলা ক্রোধে ও দুঃখে দুষ্মন্তকে তিরস্কার করে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যেতেই দৈববাণী হয় যে, দুষ্মন্তই শকুন্তলার পুত্রের পিতা এবং তিনি যেন এই পুত্রকে ভরণ-পোষণ করেন আর এই পুত্রের নাম রাখেন ভরত। তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তাঁর পুত্রকে গ্রহণ করে বলেন যে, যদিও তিনি এই বালককে তাঁর পুত্র বলেই জানতেন, তবু কেবলমাত্র শকুন্তলার কথায় তাঁকে গ্রহণ করলে লোকে পাছে দোষারোপ করে, এই জন্যই তিনি বিস্মৃতির ভাব প্রকাশ করেন। এই ভরতের নাম অনুসারেই এদেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। দুষ্মন্তের অপর স্ত্রী লক্ষ্মণার গর্ভজাত পুত্রের নাম জনমেজয় (মহাভারত—আদি)।

দ্যু—অষ্ট বসুর অন্যতম। ইনি বশিষ্ঠের শাপে পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বসুগণ কোন সময়ে নিজ

স্ত্রীদের নিয়ে ক্রীড়া করতে করতে বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। দ্যু স্ত্রীর কথা-অনুসারে কামধেনু নন্দিনীকে হরণ করেন। বশিষ্ঠ তা জানতে পেরে এঁকে অভিশাপ দেন। সেই শাপে ইনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন (দেবী ভাগবত ও মহাভারত)।

দ্যুমৎসেন—শাল্বদেশের একজন রাজা। এঁর স্ত্রীর নাম শৈব্যা। এঁর পুত্র সত্যবান্ অতি ধার্মিক বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পুত্রের বাল্যকালে ইনি অন্ধ হয়ে যান। ফলে, শত্রুগণ ষড়যন্ত্র করে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে। তখন স্ত্রী-পুত্রসহ তিনি অরণ্যে আশ্রম নির্মাণ করে তপস্যা করতে থাকেন। মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী স্বামী স্বল্পায়ু হবে জেনেও মনে মনে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করায় মদ্ররাজ দ্যুমৎসেনের আশ্রমে এসে কন্যা সম্প্রদান করে যান। বৎসরকাল পরে সত্যবান্ একদিন অরণ্যে কাষ্ঠ-সংগ্রহ করতে যাত্রা করেন। সাবিত্রীও তাঁর সঙ্গে অরণ্য-গমন করেন। সহসা শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করেন। যম তাঁর সূক্ষ্মশরীর নিয়ে প্রস্থান করলে সাবিত্রী যমের পশ্চাৎগমন করেন ও তাঁকে তুষ্ট করে কয়েকটি বর লাভ করেন। এক বরে তিনি পুনরায় দ্যুমৎসেনের চক্ষু ও রাজ্য ও অন্য বরে সত্যবানের পুনর্জীবন লাভ করেন। যথাকালে দ্যুমৎসেন সত্যবানের উপর রাজ্যভার দিয়ে সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (মহাভারত—বন ও শান্তিপর্ব)।

দ্রুহ্যু—রাজা যযাতির পুত্র। ইনি শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি সকল দিক জয় করে পুত্রদের ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রতীচী দিকের শাসনভার দ্রুহ্যুর উপর অর্পিত হয়। যযাতি এই পুত্রকে নিজের বার্ধক্য দিয়ে এঁর যৌবন চেয়েছিলেন, কিন্তু তা দিতে অস্বীকার করায় যযাতি পুত্রকে অভিশাপ দেন, "তোমার কোন প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ হবে না।" এর ফলে দ্রুহ্যুর বংশে কোন রাজা হয় নাই (মহাভারত)।

দ্রুপদ—ইনি পাঞ্চাল দেশের রাজা ও রাজা পৃষতের পুত্র। এর অন্যনাম যজ্ঞসেন। দ্রুপদ পাণ্ডব ও কৌরবদের শিক্ষাগুরু দ্রোণের বাল্যসখা ছিলেন। দ্রোণ ও দ্রুপদ প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে ক্রীড়া করতেন। পৃষতের মৃত্যুর পর দ্রুপদ পাঞ্চাল দেশের রাজা হন এবং ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণও তপস্যা ও ধনুর্বেদের চর্চায় মগ্ন থাকেন। বাল্যসখা দ্রুপদ একদা দ্রোণকে বলেছিলেন যে, তিনি রাজ্যলাভ করলে সে রাজ্য তিনি দ্রোণকে দেবেন। রাজ্যলাভের পর একদিন দ্রোণ দ্রুপদের কাছে এসে তাঁর সখ্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু দ্রুপদ বলেন যে,

দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার সখ্য সম্ভব নয়। ঐশ্বর্যগর্বিত বাল্যসখা দ্রুপদের কাছে অপমানিত দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বসবাস করতে থাকেন। কিছুকাল পরে দ্রোণ কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষকের পদে ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁদের যথারীতি শিক্ষিত করে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তিনি শিষ্যদের পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করে দ্রুপদকে বন্দী করে আনতে বলেন। অর্জুন যুদ্ধে দ্রুপদকে বন্দী করে দ্রোণের নিকট উপস্থিত করেন। তখন দ্রুপদ গঙ্গার উত্তরস্থ অহিচ্ছত্র দেশ দ্রোণকে দান করে তাঁর সঙ্গে সখ্য-স্থাপন করেন। কিন্তু বলপূর্বক বন্ধুত্ব-স্থাপন দ্রুপদের পক্ষে অপমানজনক হয়। প্রতিশোধেচ্ছু দ্রুপদ দ্রোণহন্তা পুত্রলাভের জন্য যাজ ও উপযাজ নামে দুই স্নাতক তপস্বী ব্রাহ্মণের সাহায্যে এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞাগ্নি হতে খড়্গ-ধনুর্ধারী বর্মভূষিত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র ও যজ্ঞবেদী থেকে শ্যামাঙ্গী দ্রৌপদী নামে এক কন্যা (যাজ্ঞসেনী বা কৃষ্ণা) উত্থিতা হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনের প্রত্যুষে তিন পৌত্রসহ দ্রুপদ দ্রোণের হস্তে নিহত হন এবং সেই দিনই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিহত করেন। দ্রুপদের অন্য নপুংসক সন্তান শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হন (মহাভারত—আদি, দ্রোণ)।

দুঃশলা—ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একমাত্র কন্যা ও দুর্যোধনের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্ত্রী। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুন-হস্তে জয়দ্রথের মৃত্যু হলে, দুঃশলা শিশুপুত্র সুরথকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হলে, পিতৃহন্তা অর্জুনের আগমনে ভীত হয়ে সুরথ মূর্চ্ছিত হন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন অর্জুন সুরথের নাবালক পুত্রকে সিন্ধুদেশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রস্থান করেন (মহাভারত)।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র ও দুর্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি দুর্যোধনের অতি প্রিয় ছিলেন এবং এঁর পরামর্শ অনুসারেই দুর্যোধন সমস্ত কর্ম সমাধা করতেন। যুধিষ্ঠির যখন কৌরবদের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ায় ভ্রাতাগণ ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে পরাজিত হন, তখন দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন একবস্ত্রা এবং রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে এসে কর্ণের পরামর্শমত দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতে চেষ্টা করেন। দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্ররূপে তাঁকে আবৃত করে রাখতে থাকেন। দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের ফলে নানাবর্ণে রঞ্জিত শত শত বস্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্গত

হওয়ায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতে অসমর্থ হন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাণ্ডবদের বনগমনের সময় ভীম দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান ও সেই রক্তে দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দ্রৌপদীও বেণীবন্ধন না করে আলুলায়িত কেশে থাকেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুঃশাসন অভিমন্যু ও সহদেবের নিকট পরাজিত হন। দুঃশাসনের পুত্র গদাঘাতে অভিমন্যুকে বধ করেন। যুদ্ধের ষষ্ঠদশ দিবসে ভীমসেন গদাঘাতে দুঃশাসনকে ভূপতিত করে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তপান করেন ও পরে তাঁর শিরশ্ছেদ করে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। তখন দ্রৌপদীও বেণীবন্ধন কবেন (মহাভারত)।

দেবকী—বিদর্ভরাজ আহুকের দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত কন্যার মধ্যে কৃষ্ণের মাতা দেবকী অন্যতমা। বসুদেব এই সাত কন্যাকেই বিবাহ করেছিলেন। উগ্রসেনের নয় পুত্র, তার মধ্যে কংস কৃষ্ণের বিরোধী। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আটটি পুত্র হয়; অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। দেবকীর বিবাহের পর নারদ এসে কংসকে সংবাদ দেন যে, কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হস্তে নিহত হবেন।

এই সংবাদ পেয়ে কংস দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হন, কিন্তু বসুদেব প্রতিশ্রুতি দেন যে, দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকে জন্মমাত্র কংসের হাতে সমর্পণ করবেন। সেই দিন হতে বসুদেব ও দেবকী কংসের কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকেন। এক এক করে তাঁদের সাতটি সন্তানকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কংস হত্যা করেন। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মালে বসুদেব সদ্যোজাত শিশুকে যমুনাপারে ব্রজধামে নন্দের গৃহে রেখে, নন্দের স্ত্রীর সদ্যোজাতা কন্যাকে এনে দেবকীর নিকট রেখে কংসকে প্রতারিত করেন। কংস উক্ত কন্যাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান মনে করে, পাথরের উপর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেন। তখন মহামায়ার অংশীভূতা এই কন্যা স্বর্গে অদৃশ্য হয়ে যান। যাবার সময় মহামায়া বলে যান, যে কংসকে নিহত করবে, সে অন্যস্থানে আছে। পরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হন এবং বসুদেব ও দেবকী কারাগার হতে মুক্তিলাভ করেন। যদুবংশের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর সময়ে বসুদেব ও দেবকী জীবিত ছিলেন। অর্জুনের হাতে যাদব-নারীদের রক্ষার ভার দিয়ে বসুদেব যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন এবং দেবকী তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের সহিত স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন।

দেবতা—দেবতা অর্থে সমস্ত দেবতাকেই বোঝায়।

দেববর্ণিনী—ভরদ্বাজ মুনির কন্যা ও বিশ্রবার স্ত্রী। বিশ্রবা এঁর গর্ভে বৈশ্রবণ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বৈশ্রবণের অন্য নাম কুবের। ইনি দেবগণের ধনাধ্যক্ষ। প্রথমে লঙ্কা এঁর রাজধানী ছিল. পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণকে লঙ্কার অধীশ্বর করে হিমালয়ের উত্তরে অলকাপুরীতে কুবের রাজধানী স্থাপন করেন।

দেবযানী—দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্যের প্রথমা কন্যা। ইনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। দেবাসুরের মধ্যে যখন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন দেবতারা বৃহস্পতিকে এবং অসুরেরা শুক্রাচার্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। এই দুই আচার্যের মধ্যে পূর্ব হতেই গুরুতর বিরোধ ছিল। শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত অসুরদের জীবিত করতেন, কিন্তু এই মন্ত্র বৃহস্পতির পক্ষে অধিগত না থাকায়, দেবতাপক্ষের মৃত সৈনিকদের তিনি বাঁচাতে সক্ষম হতেন না। এই জন্য দেবতারা বৃহস্পতি-পুত্র কচকে এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য শুক্রাচার্যের ভবনে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, কচ যদি শুক্রাচার্যের প্রিয়কন্যা দেবযানীর প্রিয় হতেপারেন, তবেই তিনি এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করতে সক্ষম হবেন। কচ শুক্রাচার্যের কাছে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর সেবা করতে থাকেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি গুরুকন্যারও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বহু বৎসর গত হলে অসুরেরা কচের অভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে তাঁকে হত্যা করে। তখন কচের প্রতি প্রণয়াসক্ত দেবযানীর কাতর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা তাঁকে পুনর্জীবিত করেন।

দ্বিতীয় বারে অসুরেরা পুনরায় কচকে হত্যা করলে শুক্রাচার্য আবার তাঁকে প্রাণদান করেন। তৃতীয় বার অসুরেরা কচকে দগ্ধ করে তাঁর ভস্ম সুরার সঙ্গে মিশ্রিতকরে শুক্রাচার্যকে পানকরায়। দেবযানী পুনরায় কচকে জীবিত করবার জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা জানালে, যোগবলে শুক্রাচার্য কচের অবস্থান জানতে পেরে তাঁকে পুনর্জীবিত করার বিপদ বুঝতে পারেন। কারণ, কচ পুনর্জীবিত হলে গুরুর উদর বিদীর্ণ করে তিনি নির্গত হবেন, এবং সেই সময়ে শুক্রাচার্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আপন উদরস্থ কচকে শুক্রাচার্য আগে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে তাঁর প্রাণদান করেন। কচ গুরুর দেহ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসে গুরুর নিকট লব্ধ বিদ্যাবলে পুনরায় শুক্রাচার্যকে জীবিত করেন।

এইরূপে শুক্রাচার্যের নিকট মৃত-

সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করে কচ স্বর্গলোকে প্রস্থানোদ্যত হলে, কচের প্রতি প্রণয়াসক্ত দেবযানী তাঁকে বিবাহ করতে চান। কিন্তু পূজনীয়া গুরু-কন্যাকে কচ বিবাহ করতে অসম্মত হলে দেবযানী তাঁকে অভিসম্পাত দেন, যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কচ শিক্ষা করেছেন, তা' কার্যকালে বিস্মৃত হয়ে নিজের উপর প্রয়োগ করতে অসমর্থ হবেন। এর উত্তরে কচও তখন দেবযানীকে অভিশাপ দেন যে, কোন ব্রাহ্মণ-তনয় দেবযানীকে বিবাহ করবে না, আর নিজের অর্জিত বিদ্যা নিষ্ফল হলেও তিনি যাকে এ-বিদ্যা শিক্ষা দেবেন তার বিদ্যা বলবতী হবে। এরপর কচ দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর বন্ধুত্ব ছিল। একবার এঁরা দুজনে সহচরীদের সঙ্গে যখন জলক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণপূর্বক সরোবরতীরস্থ দুই বান্ধবীর বস্ত্রগুলি মিশ্রিত করে দেন। ফলে, স্নানান্তে শর্মিষ্ঠা ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এমত অবস্থায় দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে সদাচারহীনা অসুরী বলে তিরস্কার করেন, এবং শর্মিষ্ঠাও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্যকে শর্মিষ্ঠার পিতার স্তাবক বলেন এবং দেবযানীকে ভিক্ষুকী বলে কটূক্তি করেন। তখন দেবযানী তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করায় শর্মিষ্ঠা তাঁকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে স্বগৃহে প্রস্থান করেন। সেই সময় মৃগয়ারত রাজা যযাতি নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। কূপমধ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে তিনি দেবযানীকে উদ্ধার করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। দেবযানীর দাসীর মুখে এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে শুক্রাচার্য কন্যার কাছে উপস্থিত হন। শর্মিষ্ঠার অপমানের কথা বিবৃত করে দেবযানী পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে এর প্রতিকার প্রার্থনা করলে শুক্রাচার্য বৃষপর্বার সমীপস্থ হয়ে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করে তাঁর রাজ্য ত্যাগ করতে উদ্যত হন। তখন বৃষপর্বা তাঁকে বহু অনুনয়-বিনয়ে সন্তুষ্ট করেন। তখন শুক্রাচার্য বৃষপর্বাকে বলেন দেবযানীকে প্রসন্ন করতে। বৃষপর্বা দেবযানীকে প্রসন্ন হতে বললে, তিনি বলেন, সহস্র কন্যাসহ শর্মিষ্ঠা যদি দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করেন ও পিতা যেখানে তাঁর বিবাহ দেবেন, সেখানে শর্মিষ্ঠা তাঁর অনুগামিনী হন, তবেই তিনি প্রসন্ন হবেন। শুক্রাচার্যের প্রসন্নতার জন্য শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করেন। একদিন দেবযানীর শর্মিষ্ঠা ও সহস্র দাসী সমভিব্যাহারে বনে বিচরণকালে মৃগয়ারত রাজা যযাতির সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। দেবযানী তখন যযাতির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন।

যযাতি শুক্রাচার্যের বিনা অনুমতিতে এই অসবর্ণ বিবাহে সম্মত হ'তে চান না। তখন দেবযানী পিতাকে যযাতির পূর্ব-উপকার স্মরণ করিয়ে এই বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কচের অভিশাপ স্মরণ করে শুক্রাচার্য বিবাহের অনুমতি দেন ও বলেন যে, এই বিবাহের ফলে কোন সাংকর্যদোষ হবে না। পরে যযাতি ও দেবযানীর বিবাহ হয়। দেবযানীর সহিত সহস্র কন্যাসহ শর্মিষ্ঠাও তাঁর দাসীরূপে যযাতির গৃহে যান। শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে যযাতিকে সসম্মানে তাঁকে রাখতে বলেন, কিন্তু শয্যায় আহ্বান করতে নিষেধ করেন। কিছুকাল পরে দেবযানীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শর্মিষ্ঠা তখন পুত্রকামনায় যযাতিকে আহ্বান করেন। শুক্রাচার্যের নিষেধ স্মরণ করে যযাতি অসম্মত হলে শর্মিষ্ঠা বলেন যে, দেবযানীকে বিবাহ করে যযাতি তারও স্বামী হয়েছেন। তখন যযাতি তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন। এইরূপে ক্রমে যযাতির ঔরসে ও দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবযানী একদিন এই পুত্রদের পিতৃ-পরিচয় জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের নিকট যযাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন; শুক্রাচার্য তখন যযাতিকে অভিশাপ দেন যে, এর ফলে তিনি অকালে জরাগ্রস্ত হবেন। যযাতির অনুনয়ে শেষে তিনি বলেন যে, যযাতি ইচ্ছা করলে অন্যকে তাঁর এই জরা দান করতে পারবেন। যযাতি তখন শুক্রাচার্যের নিকট এইরূপ অনুমতি নেন যে, তাঁর যে পুত্র তাকে তার যৌবন দান করে তাঁর জরা গ্রহণ করবে, সেই রাজ্যাধিকারী হবে। যযাতি নিজ রাজ্যে ফিরে এসে একে একে তাঁর পুত্রদের তাঁর জরা নিতে বলেন; কিন্তু এক শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ছাড়া সকলেই অসম্মতি প্রকাশ করেন। যযাতি তখন অন্যান্য পুত্রদের অভিশাপ দিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন।

দেবযোনি—দেবতা হতে যাদের জন্ম। সংখ্যায় দেবযোনি দশটি। বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত—এরাই দেবযোনি; দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণী।

দেবরাত—(১) অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ। উত্তরার গর্ভবাসকালে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্রের বলে গর্ভস্থ শিশুকে বধ করতে উদ্যত হন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করেন। এইজন্য পরীক্ষিৎ 'দেবরাত' নামে পরিচিত হন।

(২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করবার জন্য

মহাদেব একখানি ধনু আকর্ষণপূর্বক দেবতাদের শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হন। কারণ তাঁরা মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দিতে অস্বীকৃত হন। দেবতারা ভীত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, তাঁর ক্রোধের উপশম হয়। তখন তিনি সেই ধনু দেবতাদের কাছে গচ্ছিত রাখেন। দেবতারা তাহা নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন। এই হর-ধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে বিবাহ করেন।

দেবল—মুনিবিশেষ। মহর্ষি অসিতের পুত্র। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য এবং পাণ্ডবদের কুলপুরোহিত ধৌম্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রম্ভার অভিশাপে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ও অষ্ট অঙ্গ বক্র হয়ে 'অষ্টাবক্র' নামে অভিহিত।

দেবর্ষি—স্বর্গীয় ঋষি। এঁদের স্থান স্বর্গে। এই সব ঋষি পৃথিবীতে উন্নত জীবনযাপন করে প্রায় দেবতা-শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। যেমন, নারদ ইত্যাদি।

দেবসেনা—সাবিত্রী-গর্ভজাত প্রজাপতির কন্যা। এঁর অন্য নাম ষষ্ঠী। ইনি মাতৃকাশ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। এঁর ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা। একদা কেশীদানব এঁকে হরণ করে। ইন্দ্র তখন এঁকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র দেবসেনাপতি কার্তিককে বলেন যে, এই কন্যার জন্ম না হতেই স্বয়ম্ভু এঁকে আপনার স্ত্রী বলে নির্দিষ্ট করেছেন। কার্তিক এঁকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণরা এঁকে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন।

দেবহুতি—ইনি স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যা ও প্রজাপতি কর্দমের স্ত্রী। মহর্ষি কর্দম এঁর পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে এঁকে দিব্যজ্ঞান দান করেন। ইনি অরুন্ধতী প্রভৃতি নয়টি কন্যা ও মহর্ষি কপিলের মাতা।

দেবব্রত—রাজা শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে বশিষ্ঠের শাপজাত দ্যু নামক বসু। পরবর্তীকালে ইনিই ভীষ্ম নামে পরিচিত হন।

দেবী—মহাদেবের স্ত্রীকে দেবী বা মহাদেবী আখ্যা দেওয়া হয়। ইনি হিমালয়ের কন্যা। শিবের শক্তিরূপে দেবীর চরিত্র দ্বিবিধ—একদিকে তিনি নম্র ও স্নিগ্ধ এবং অপর দিকে উগ্র। উগ্রভাবের জন্যই দেবী অধিক পূজিতা হন। নানাপ্রকার কর্ম, বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন আকারের জন্য দেবী বিভিন্ন নামে পরিচিতা। নম্র ও স্নিগ্ধ ভাবের জন্য দেবীর নাম উমা, গৌরী, পার্বতী, হৈমবতী, জগন্মাতা ও ভবানী। উগ্রমূর্তির জন্য এঁর অন্য নাম—কালী, শ্যামা, চণ্ডী, চণ্ডিকা ও ভৈরবী। এই উগ্রমূর্তিতে দেবী নানাপ্রকার আসুরিক পদ্ধতিতে পূজিতা হয়ে থাকেন।

চণ্ডীতে আমরা দেবীকে বিভিন্ন মূর্তিতে দেখতে পাই। চণ্ডীতে

দেবীর বিভিন্ন মূর্তিতে অসুরদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের কথা বর্ণিত আছে। চণ্ডীতে দেবী বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিতা হয়েছেন ; যথা—দুর্গা, দশভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী, কালী, মুক্তকেশী, তারা, ছিন্নমস্তা ও জগদ্গৌরী। স্বামী হতে দেবী এই সকল নাম প্রাপ্ত হয়েছেন ; যথা—ভগবতী, ঈশানী, ঈশ্বরী, কপালিনী, কৌশিকী, কিরাতী, মহেশ্বরী, রুদ্রাণী, সর্বাণী, শিবা, ত্র্যম্বকী। দেবীর জন্ম ও গুণসূচক নাম—অদ্রিজা, গিরিজা, দক্ষজা, কন্যা, কন্যাকুমারী, সতী, অনন্তা, আর্যা, বিজয়া, ঋদ্ধি, ভ্রামরী, কর্ণমোতি, শিবদূতি, দক্ষিণা, সর্বমঙ্গলা, সিংহরথী, অম্বিকা ইত্যাদি। নানারূপ তপস্যায় রতা বলে দেবীকে অপর্ণা ও কাত্যায়নী বলা হয়। ভূত ও প্রেতের নায়িকারূপে এঁর নাম ভূত-নায়কী ও গণ-নায়কী। ভীষণ মূর্তির জন্য দেবী এই সকল নামেও আখ্যাত হয়েছেন ; যথা—ভদ্রকালী, ভীমাদেবী, চামুণ্ডা, মহাকালী, মহামারী, মহাসুরী, মাতঙ্গী ও রক্তদন্তী।

দৈত্য—কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা দিতির গর্ভজাত বংশধরগণ দৈত্য নামে পরিচিত। দেবতাদের সঙ্গে এদের চিরন্তন বিরোধ ও যুদ্ধ চলেছিল। এদের প্রধান কাজ ছিল দেবতাদের যজ্ঞ ও পূজা নষ্ট করা। দেবতাদের সঙ্গে অসংখ্য যুদ্ধের কাহিনী ও জয়পরাজয়ের বিবরণ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। দৈত্য ও দানব প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত।

দৈত্যসেনা - ব্রহ্মার কন্যা ; দেবসেনার ভগিনী ও কেশীদানবের স্ত্রী। একবার দেবসেনা ও দৈত্যসেনা প্রমোদার্থে মানসসরোবরে উপস্থিত হন। তখন সেখানে উপস্থিত কেশীদানবকে দেখে দৈত্যসেনা তাঁর প্রতি অনুরক্তা হন। এঁকে কেশী বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করেন (মহাভারত—বন)।

দ্বৈতবন—পঞ্চনদের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে বিখ্যাত পবিত্র অরণ্যভূমি। দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, ঋষি ও ধার্মিক এবং তপস্বিগণ কর্তৃক এই বন অধ্যুষিত ছিল। বনবাসকালে পাণ্ডবরা এই বনে আশ্রম নির্মাণ করে বহুকাল বাস করেন। এই বনে যাঁরা বাস করতেন, তপো-মাহাত্ম্যে তাঁদের শোক ও মোহ নাশ হোত। এই জন্য এর নাম হয় দ্বৈতবন।

দ্বৈপায়ন—(১) মহর্ষি ব্যাসদেবের অন্য নাম দ্বৈপায়ন। তিনি যমুনার কোন এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এই নামে অভিহিত হন।

(২) কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী হ্রদ। অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে উভয়পক্ষের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হলে দুর্যোধন একাকী সেই হ্রদমধ্যে আত্মগোপন করেন। অবশেষে যুধিষ্ঠিরের তীক্ষ্ণবাক্যে উত্তে-

জিত হয়ে উঠে এসে ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে ভগ্নোরু হয়ে প্রাণত্যাগ করেন (মহাভারত)।

দ্রোণ—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। একদিন গঙ্গাস্নানকালে আর্দ্রবক্ষে প্রায়-নগ্ন অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামার্ত ভরদ্বাজের শুক্রপাত হয়। সেই শুক্র দ্রোণ নামে এক যজ্ঞীয় পাত্রে তিনি রক্ষা করেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র হতে এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্রোণ বা পরিমাপক পাত্রে এই পুত্রের জন্ম হয় বলে এঁর নামকরণ হয় দ্রোণ। দ্রোণ ভরদ্বাজের শিষ্য ও অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্য মুনির কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে দ্রোণ পিতৃআজ্ঞায় বিবাহ করেন। এঁদের একমাত্র পুত্র জন্মমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব করায় অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন। এই সময়ে দ্রোণ পরশুরামের কাছে মহাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করবার জন্য মহেন্দ্রপর্বতে যান এবং তাঁর কাছে প্রথমে ধনরত্ন প্রার্থনা করেন। পরশুরাম বলেন, "আমার সমস্ত ধনরত্ন ব্রাহ্মণদের ও পৃথিবী কশ্যপকে দান করেছি, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও এই শরীর ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এর মধ্যে আমার শরীর ছাড়া তোমার ইচ্ছামত জিনিস প্রার্থনা কর।" তখন দ্রোণ তাঁর কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করেন। পাঞ্চালরাজ পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন। তাঁর পুত্র দ্রুপদ ছিলেন দ্রোণের ক্রীড়াসঙ্গী। দ্রুপদ দ্রোণকে শৈশবে বলেছিলেন যে, রাজ্যলাভ করলে তিনি দ্রোণকে অর্ধরাজ্য দান করবেন। দ্রোণ অতি দরিদ্র ছিলেন। এমন কি, নিজপুত্র অশ্বত্থামা দুগ্ধপানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, তা'ও দিতে তিনি অক্ষম হন। অশ্বত্থামার সমবয়সী বালকরা তাকে পিটুলিগোলা জল দুধ বলে পান করিয়ে প্রতারিত করে। এই ঘটনা জেনে দরিদ্রতার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দ্রোণ বাল্যবন্ধু দ্রুপদের নিকট পূর্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে উপস্থিত হন। দ্রুপদ তাঁর সখ্য অস্বীকার করে দ্রোণকে একদিনের মত ভিক্ষা দিতে চেয়ে অপমানিত করেন। দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে এসে হস্তিনাপুরে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বসবাস করতে থাকেন। এই সময় একদিন দ্রোণ ক্রীড়ারত কৌরব রাজকুমারদের কূপমধ্যে পতিত বীটার (এক প্রকার ছোট বল) পশ্চাতে ঈষিকা বিদ্ধ করে উহা উত্তোলন করেন। ভীষ্ম এই বিবরণ শুনে তাঁর পরিচয় জানতে পারেন ও তাঁকে কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার আচার্যপদে বরণ করেন। সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জুনই এঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করবার জন্য তিনি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের

দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করেন। অস্ত্রশিক্ষার পর দ্রোণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রাজকুমারদের দিয়ে দ্রুপদের রাজ্য অধিকার করে তাঁকে বন্দী করেন। পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে ক্ষমাশীল দ্রোণ দ্রুপদের কোন অনিষ্ট করলেন না। দ্রোণ তাঁর অর্ধরাজ্য গ্রহণ করে বাকী অর্ধ-রাজ্য ফিরিয়ে দেন। রাজা না হলে রাজার সঙ্গে সখ্যস্থাপন করা যায় না। তাই তিনি অর্ধরাজ্য গ্রহণ করে পূর্বসখার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন ও তাঁকে অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। তখন দ্রুপদ বুঝতে পারেন যে, ব্রাহ্মণ না হলে দ্রোণাচার্যের ধ্বংস অসম্ভব। সেইজন্য তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এরই ফলে দ্রোণ-হন্তা পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ কৌরবান্নে প্রতিপালিত বলে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। অর্জুন গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে দ্রোণ অর্জুনকে বলেন, "আমি যদি কখনো তোমার সঙ্গে যুদ্ধে রত হই, তখন তুমিও আমার সঙ্গে প্রতিযুদ্ধে লিপ্ত হবে। গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে কোনরূপ সঙ্কোচ প্রকাশ করবে না।" অর্জুনের এই প্রতিশ্রুতিই দ্রোণের গুরুদক্ষিণা ছিল। এই প্রতিশ্রুতির জন্যই কৌরবগণ কর্তৃক বিরাট রাজ্যের গোহরণকালে বৃহন্নলারূপী অর্জুন সম্মোহনাস্ত্রে দ্রোণ প্রভৃতিকে মোহাচ্ছন্ন করেন এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে গুরুর সহিত ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একাদশ হতে পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত দ্রোণ সেনাপতি ছিলেন। ভীষ্মের সেনাপতিত্বের ফলে সপ্তম দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ বিরাটপুত্র শঙ্খকে বধ করেন। ত্রয়োদশ দিবসে চক্রব্যূহ রচনা করে তিনি অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেন। চতুর্দশ দিবসে রাজা বৃহৎক্ষত্র, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মাকে নিহত করেন, এবং শেষ পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করেন। এতদ্ভিন্ন বহু পাণ্ডবসৈন্য তাঁর হাতে বিনষ্ট হয়। অস্ত্রত্যাগ না করলে দ্রোণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয় ছিলেন বলে, কৃষ্ণের পরামর্শমত দ্রোণকে অস্ত্রত্যাগ করবার জন্য তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ তাঁকে শোনান প্রয়োজন বলে স্থির করা হয়। যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য কারো কথা দ্রোণ বিশ্বাস করবেন না বুঝে, যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে রাজী করানো হয় দ্রোণের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য। ভীম মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক হাতীকে গদাঘাতে বধ করেন, এবং দ্রোণকে এই সংবাদ দেন। দ্রোণ উক্ত সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। তিনি যুদ্ধে বিরত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেন। যুধিষ্ঠির

তখন কৌশলপূর্বক বলেন, 'অশ্বত্থামা হতঃ' এবং পরে অস্ফুটস্বরে বলেন, 'ইতি গজঃ'। অর্থাৎ, অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে শোকার্ত্ত দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের শেষ উক্তি শ্রবণে অক্ষম হন এবং পুত্রশোকে কাতর হয়ে রথের উপরই যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হন। এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের রথোপরি আরোহণপূর্বক তার কেশাকর্ষণ করে খড়্গদ্বারা শিরশ্ছেদ করেন এবং কৌরব সৈন্যগণের সম্মুখে উক্ত শির নিক্ষেপ করেন (মহাভারত—দ্রোণ)।

দ্যৌ—প্রাচীন অথর্ববেদের আকাশ-দেবতা দ্যৌ। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে সকলের পিতা-মাতারূপে বর্ণিত হয়েছেন।

দ্রৌপদী—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদী হতে উদ্ভূতা কন্যা। দ্রোণবধের জন্য পুত্রলাভেচ্ছায় দ্রুপদ যখন গঙ্গা ও যমুনার তীরে যাজ ও উপযাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের সহায়তায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, তখন যজ্ঞাগ্নি হতে বর্ম-মুকুট-খড়্গ-ধনুর্ধরী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যজ্ঞবেদী হতে শ্যামবর্ণা সুন্দরী যাজ্ঞসেনী উত্থিতা হন। দ্রৌপদী আজন্ম যুবতী, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, নীল ও কুঞ্চিত কেশকলাপভূষিতা। এঁদের জন্মকালে আকাশবাণী হয় যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বধ করবেন ও যাজ্ঞসেনী ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষয় ও দেবতাদের মহৎ কর্ম সাধন করবেন ও এঁর দ্বারা কৌরবকুল বিনষ্ট হবে। দ্রৌপদীর অন্য নাম—পাঞ্চালী (পাঞ্চাল-রাজকন্যা বলে), কৃষ্ণা (কৃষ্ণবর্ণ বলে), সৈরিন্ধ্রী ও নিত্য-যৌবনা বেদিজা। অর্জুনকেই কন্যাদানের ইচ্ছা ছিল বলে দ্রুপদ এক কৃত্রিম আকাশযন্ত্র ও এক দুর্জয় ধনু নির্মাণ করে ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি এই ধনুতে জ্যা যোজনা করে যন্ত্রের মধ্যে পঞ্চবাণ দিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করবেন। জতুগৃহ থেকে উদ্ধার পাবার পর গোপনে ব্রহ্মচারীবেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হন। তখন মহাবীর কর্ণ অগ্রসর হয়ে ধনুতে জ্যা যোজনা করেন; কিন্তু দ্রৌপদী বলেন যে, হীনজাতীয় সূতপুত্রকে তিনি কখনও বিবাহ করবেন না। তখন কর্ণ ক্রোধে ধনু ফেলে দিয়ে প্রস্থান করেন। এর পর সমস্ত ক্ষত্রিয় অকৃতকার্য হলে, অর্জুন ইঙ্গিতে কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে সমবেত রাজন্যবর্গের সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করেন। দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চভ্রাতা কুন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে গৃহের বহির্দেশ হতে মাতাকে বলেন যে তাঁরা এক অপূর্ব সামগ্রী ভিক্ষা করে আনয়ন করেছেন। কুটিরের অভ্যন্তর হতে কুন্তী সেই

জিনিস না দেখেই নির্দেশ দেন, "তোমরা সকলে মিলেই সেই জিনিস ভোগ কর।" তারপর তিনি গৃহের বহির্দ্বারে দ্রৌপদীকে দেখে বিব্রত হয়ে পড়েন। তখন ব্যাসের বিধান-মতে পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। ব্যাস বলেন যে, পূর্বকালের পাঁচ ইন্দ্রই পঞ্চপাণ্ডবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং লক্ষ্মী দেবী দ্রৌপদীর রূপ ধরে এঁদের স্ত্রী হবেন। পূর্বকালে এক ঋষিকন্যা মহাদেবের তপস্যা করে পাঁচবার স্বামীভিক্ষা করেছিলেন; তাতে মহাদেব তাঁকে পঞ্চপতি লাভের বর দেন। সেই ঋষিকন্যাই দ্রৌপদী; সুতরাং মহাদেবের বিধানে পঞ্চপতি লাভ করায় কোন অধর্মই নাই। বিবাহের পর ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে একবার নারদ পঞ্চপাণ্ডবের নিকট উপস্থিত হন ও তাঁর পরামর্শে ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্থির হয় যে, দ্রৌপদী এক একজন পাণ্ডবের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবেন। সেই সময় অন্য কোন ভ্রাতা তাঁদের দেখলে সেই ভ্রাতাকে ১২ বৎসর ব্রহ্মচারী হয়ে বনবাস করতে হবে। একবার দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাস করার সময়ে এক ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন উদ্ধারের জন্য অস্ত্র আনয়নের নিমিত্ত অর্জুন যুধিষ্ঠির-ভবনে প্রবেশ করেন। ফলে, তাঁকে ১২ বৎসর বনবাসে থাকতে হয়। এই সময়েই অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। অর্জুন দ্রৌপদীর প্রিয় ছিলেন বলে এই বিবাহে তিনি কিছু ঈর্ষ্যান্বিতা হন। পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামে পাঁচ পুত্র হয়। রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যে ঈর্ষ্যান্বিত দুর্যোধন পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করলে, যুধিষ্ঠির শকুনির কপটদ্যূতে পরাজিত হয়ে সর্বস্বান্ত হন। অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রেখে তাঁকেও হারান এবং অক্ষক্রীড়ার পণ অনুযায়ী নিজেরাও শকুনি কর্তৃক বিজিত হন। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন অন্তঃপুর হতে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে দ্যূতসভায় নিয়ে আসেন এবং কর্ণের পরামর্শে সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হন। দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ বহুবর্ণের শত শত বস্ত্রের সাহায্য দ্রৌপদীকে আবৃত করে রাখেন। দুঃশাসনের আকর্ষণেও সে বস্ত্র নিঃশেষ হয় না। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে তাঁর বাম উরু দর্শন করিয়ে অপমান করেন। পূর্বে উল্লেখ আছে এই অপমানের প্রতিশোধে ভীম দুঃশাসনের বক্ষের রক্ত পান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। দ্রৌপদীও প্রতিজ্ঞা করেন যে, দুঃশাসনের রক্তে ভীমসেন যে পর্যন্ত না তাঁর কেশবন্ধনে সাহায্য করেন,

সে পর্যন্ত তাঁর কেশ মুক্ত থাকবে। এই সব ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র বিচলিত হয়ে পড়েন। অবশেষে সকলকে নিরস্ত করে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে মুক্তি দেন এবং দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রের কাছ হতে পাণ্ডবদের দাসত্বের মুক্তি প্রার্থনা করেন এবং তা' প্রাপ্ত হন।

দুর্যোধন ও শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে যুধিষ্ঠির পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হয়ে পুনরায় পরাজিত হন ও শর্ত অনুযায়ী দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করেন। দ্রৌপদীও তখন তাঁদের অনুগামী হন। বনবাসকালে দ্রৌপদী তীক্ষ্ণ বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। বনগমনের আগে সূর্যদেব দ্রৌপদীকে এক তাম্রস্থালী দান করে বলেন যে, প্রতিদিন এই পাত্রে যে কোন খাদ্য রন্ধন করে দ্রৌপদী যতক্ষণ অভুক্ত থাকবেন ততক্ষণ এই পাত্র পূর্ণ থাকবে। সে কারণ তাঁর ভোজনের পূর্বে যত লোকই আসুক না কেন কেহই অভুক্ত থাকত না। পাণ্ডবদের কাম্যকবনে বাসকালে দুর্যোধনের পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা তাঁকে বর দিতে চাইলে দুর্যোধন এই বর কামনা করেন যে, দুর্বাসা যেন দ্রৌপদীর আহারের পর দশহাজার শিষ্যসহ পাণ্ডবদের আতিথ্যগ্রহণ করেন। অতঃপর দুর্বাসা কাম্যকবনে উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন দ্রৌপদীর আহারপর্ব সমাপ্ত হয়েছে, অতএব উক্ত সময় তাঁকে আহার যোগাতে সমর্থ না হলে, সকলেই দুর্বাসার শাপে ভস্মীভূত হবেন—এই দুশ্চিন্তায় পাণ্ডবরা ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তখন দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে তাঁর তাম্রস্থালী আনতে আদেশ করেন। সেই স্থালীর কানায় কিঞ্চিত শাকান্ন ছিল। কৃষ্ণ তাই আহার করে বলেন যে, বিশ্বাত্মা যেন এতে তৃপ্ত হন। তখনই স্নানরত দশহাজার শিষ্যসহ দুর্বাসার আকণ্ঠ উদরপূর্তি হয়ে যায় এবং লজ্জিত হয়ে সশিষ্য দুর্বাসা পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর একদিন বিবাহার্থে শাল্বরাজ্যে গমনপথে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কাম্যকবনে পাণ্ডবদের মৃগয়াকালীন অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলপূর্বক হরণ করেন। কিন্তু তখনই মৃগয়া-প্রত্যাগত পাণ্ডবরা জয়দ্রথকে অবরুদ্ধ করেন ও তাঁকে পরাজিত করে নিগৃহীত করেন। ভীম তাঁর মস্তকে পঞ্চচূড়া করে দিয়ে তাঁকে প্রতিজ্ঞা করান যে, তিনি যেন সর্বত্র পাণ্ডবদের দাস বলে আত্মপরিচয় দেন। দুঃশলার স্বামী বলে যুধিষ্ঠির তাঁর প্রাণভিক্ষা দেন। অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী

মৎস্যরাজ বিরাটের গৃহে নানারূপ ছদ্মবেশে নানাকর্মে নিয়োজিত হয়ে আশ্রয় নেন। দ্রৌপদী কেশ-সংস্কারে কুশলা সৈরিন্ধ্রীরূপে বিরাটের রাণী সুদেষ্ণার পরিচারিকা নিযুক্ত হন। দ্রৌপদীর রূপে রাজা আকৃষ্ট হতে পারেন, সুদেষ্ণা এই আশঙ্কা প্রকাশ করলে দ্রৌপদী তার উত্তরে বলেন যে, তিনি সর্বদা তাঁর পাঁচজন গন্ধর্বপতি কর্তৃক রক্ষিতা এবং তাঁকে দিয়ে কারো পাদপ্রক্ষালন বা উচ্ছিষ্ট ভোজন না করালে গন্ধর্বপতিরা তার উপর তুষ্ট হবেন। কিন্তু কেহ তাকে কামনা করলে গন্ধর্বহস্তে সে ব্যক্তি অবশ্যই বিনষ্ট হবে। সুদেষ্ণা এই শর্তেই দ্রৌপদীকে আশ্রয় দেন। সেখানে দশ মাস অজ্ঞাতবাসে কাটাবার পর একদিন বিরাট সেনাপতি ও সুদেষ্ণার ভ্রাতা কীচক সুদেষ্ণার ভবনে দ্রৌপদীকে দেখে তাকে লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুদেষ্ণাও পাছে রাজার মন দ্রৌপদীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, এই ভেবে এবং ভ্রাতার বাসনা পূর্ণ করবার অভিলাষে কোন এক পর্ব-উপলক্ষে দ্রৌপদীকে কীচকের ভবনে সুরা আনয়ন করতে প্রেরণ করেন। সেখানে কীচক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করলে দ্রৌপদী তাকে ধাক্কা দিয়ে ভূপাতিত করে দ্রুতগতিতে বিরাটের সভায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অপমানিত কীচক এসে সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করেন। বিরাট কীচকের ভয়ে ও পাণ্ডবগণ আত্মপরিচয় উদ্ঘাটিত হবার ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন। এই ঘটনার পর দ্রৌপদী গভীর নিশীথে ভীমের নিকট উপস্থিত হয়ে এই অপমানের প্রতিকার প্রার্থনা করেন, এবং ভীমের পরামর্শে স্থির হয় যে দ্রৌপদী কীচককে গভীর রাত্রে শূন্য নাট্যশালায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার প্রলোভন দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বলবেন। দ্রৌপদী অনুরূপ ব্যবস্থা করলে, রাত্রে তাঁর পরিবর্তে ভীম সেখানে উপস্থিত হয়ে, কীচককে নিমেষে নিষ্পেষিত করে এক মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। সকলেই এই কার্য গন্ধর্বদের কীর্তি মনে করে ভয়ে চুপ করে থাকেন। কীচকের ভ্রাতৃসম্পর্কীয় একশ পাঁচজন উপকীচক কীচকের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় দ্রৌপদীকে দেখে তাঁকেও কীচকের সঙ্গে একই চিতায় দগ্ধ করবার জন্য বেঁধে নিয়ে যায়। দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে পাণ্ডবদের তৎকালীন ছদ্মনাম ধরে ডাকতে থাকেন। ভীম সেই আহ্বান শুনে গুপ্তদ্বার দিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হয়ে, চিতার নিকটস্থ এক বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করে সমস্ত উপকীচককে বধ করে দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন। এই ঘটনায় সকলেই ভীত হন এবং সুদেষ্ণা

দ্রৌপদীকে চলে যেতে বলেন। অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হতে পাণ্ডবদের আর মাত্র তের দিন বাকী ছিল বলে দ্রৌপদী সুদেষ্ণার নিকট হতে উক্ত কয়েক দিনের জন্য আশ্রয়ভিক্ষা করেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন কৃষ্ণ যুদ্ধের সম্পর্কে পাণ্ডবদের মতামত গ্রহণরত ছিলেন, তখন দ্রৌপদী কৌরবগণ কর্তৃক পূর্ব-অপমান স্মরণ করে নিজের বেণী কৃষ্ণকে দেখিয়ে বলেন যে, দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি হবে না।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সহায়তায় রাত্রিকালে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করে সুপ্ত অবস্থায় দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রসহ সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয়কে হত্যা করেন। তখন পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। নকুলের কাছে দ্রৌপদী সেই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট এসে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হন। যুধিষ্ঠির তাঁকে শোক সংবরণ করতে বলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বলেন যে, অশ্বত্থামাকে বধ করে তার মাথার সহজাত মণি এনে দিলে তবেই তিনি প্রাণধারণ করবেন। তার অনুরোধে ভীম এবং নকুল বনমধ্যে অশ্বত্থামার সন্ধানে যাত্রা করেন। অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রের কথা স্মরণ করে কৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির তাঁদের পশ্চাদ্‌গমন করেন। অশ্বত্থামাকে পরাজিত করে তাঁর মাথার মণি নিয়ে এসে ভীম দ্রৌপদীকে দিলে দ্রৌপদী সান্ত্বনালাভ করেন ও যুধিষ্ঠিরকে সেই মণি ধারণ করতে দেন। অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব থাকলেও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভীমসেনকেই তিনি স্মরণ করতেন। যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগের পর পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে পাণ্ডবগণ যখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন, তখন দ্রৌপদীও তাদের সঙ্গিনী হন। তাঁরা হিমালয়, বালুকার্ণব মেরুপর্বত পার হয়ে চলার পথে দ্রৌপদী যোগভ্রষ্ট হয়ে পতিত হন। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় যুধিষ্ঠির বলেন যে, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্বের দোষে এঁর পতন হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দ্রৌপদীর কাহিনী এইরূপ: রাম যখন সীতার সহিত বনগমন করেছিলেন, তখন অগ্নি রামকে বলেছিলেন, "প্রাক্তনকার্য দুর্নিবার্য, আপনি সীতাকে গোপনে রক্ষা করুন। কারণ, সাতদিনের মধ্যে রাবণ সীতাকে হরণ করবে।" তখন রাম সীতাকে নিয়ে যাবার জন্য অগ্নিকে অনুরোধ করলেন। তাঁর কাছে ছায়া-সীতা বাস করবে।

অগ্নি সীতাকে নিয়ে প্রস্থান

করলে রামের সহিত ছায়া-সীতা অবস্থান করতে থাকেন। রাবণ এই ছায়া-সীতাকেই হরণ করে। যে সময় সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়, সেই সময় অগ্নি ছায়াকে রক্ষা করে সীতাকে ফিরিয়ে দেন। এই ছায়া নারায়ণ সরোবরে একশত বৎসর শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করে। মহাদেব এতে সন্তুষ্ট হয়ে ছায়া-সীতাকে বর দিতে চান। তখন ছায়া পাঁচবার স্বামী প্রার্থনা করে। তখন মহাদেব বলেন, "তুমি পাঁচবার স্বামী প্রার্থনা করেছ, সেই কারণ হরির অংশস্বরূপ পঞ্চ ইন্দ্র তোমার স্বামী হবেন। তাঁরা এখন পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত।" পরে এই ছায়া রাজা দ্রুপদের যজ্ঞকুণ্ড হতে উদ্ভূত হয়ে দ্রৌপদী নামে খ্যাত হন। ইনিই সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাতে সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী হয়েছেন। ইনি কৃষ্ণে ভক্তিপরায়ণা ছিলেন বলে এঁর নাম কৃষ্ণা। রাজা দ্রুপদ অর্জুনের হাতে এঁকে সমর্পণ করেন। অর্জুন তাঁর মার কাছে গিয়ে বলেন যে তিনি আজ একটি জিনিস লাভ করেছেন। কুন্তী উত্তরে বলেছিলেন যে, ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই জিনিস সমভাবে সকলে ভোগ করুক। পূর্বে মহাদেবের বর ও মাতৃআজ্ঞার জন্য পঞ্চভ্রাতা মিলিত হয়ে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন।

ধ

ধনপতি—পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা, বিশ্রবার পুত্র ধনপতি। এঁর অন্য নাম কুবের। পুলস্ত্য একজন তপঃপরায়ণ ঋষি ছিলেন। একদিন ভরদ্বাজ মুনি বিশ্রবার আশ্রমে এসে দেববর্ণিনী নামে এক কন্যাকে এঁর হাতে অর্পণ করেন। কালক্রমে এঁর একটি পুত্র হলো এবং ইনি গণনা করে দেখলেন যে, এই পুত্র গুণসম্পন্ন ও ধনাধ্যক্ষ হবে। বিশ্রবা হতে এই পুত্রের নাম হলো বৈশ্রবণ। বৈশ্রবণ সহস্রবৎসর তপস্যায় রত ছিলেন। এতে ব্রহ্মা প্রীত হয়ে বৈশ্রবণকে বর দিতে চান। বৈশ্রবণ প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন লোকপাল ও ধনাধ্যক্ষ হন। ব্রহ্মা তাঁকে সেই বরই দান করেন (রামায়ণ—উত্তর)।

ধন্বন্তরি—(১) ইনি দেববৈদ্য। সমুদ্রমন্থনকালে ইনি অমৃতভাণ্ড হস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হলে বিষ্ণুর আদেশে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার সময় আনুষঙ্গিক আরো জিনিসের মধ্যে শেষে অমৃত-হস্তে ধন্বন্তরি ও সর্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। ইনি দেববৈদ্য-রূপে গৃহীত হন। ইনি বেদজ্ঞ ও মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ (বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মহাভারত, ভাগবত)।

(২) হরিবংশে ধন্বন্তরির জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:

দেবাসুরের অমৃতমন্থনকালে ধন্বন্তরি অমৃত-কলস হতে উৎপন্ন হন। উক্ত সময় তিনি বিষ্ণুর ধ্যানরত ছিলেন। বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে দেখে বলেন, "তুমি জল হতে জন্মগ্রহণ করেছ বলে তোমার নাম হবে অব্জদেব।" তখন ধন্বন্তরি বলেন, "আমি আপনার পুত্র; তাই আমার জন্য যজ্ঞ-ভাগ কল্পনা ও অবস্থানের নির্দেশ দিন।" তখন বিষ্ণু বলেন, "তুমি দেবতাদের পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেছ; অতএব যজ্ঞভাগ গ্রহণে তুমি সমর্থ হবে না। এ-জন্মে তুমি দেবতাদের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ; অতএব দ্বিতীয় জন্মে লোকমধ্যে খ্যাতিলাভ করবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হবে, আর সেই শরীরেই তুমি দেবত্বলাভ করবে। তুমি আয়ুর্বেদ অষ্টভাগে বিভক্ত করবে।" অতঃপর ধন্বন্তরির দ্বাপরযুগে দ্বিতীয় জন্মকালে সুনহোত্রবংশীয় কাশীরাজ ধন্ব পুত্রকামনায় দীর্ঘকাল অব্জদেবের আরাধনা করেন। তিনি প্রার্থনা করেন, যে দেবতা তাঁকে বর দান করবেন, তিনিই যেন তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগবান অব্জদেব (ধন্বন্তরি) ধন্বের গৃহে কাশীরাজ নামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। পরে ইনি আয়ুর্বেদ অষ্টভাগে বিভক্ত করেন। ধন্বন্তরির কেতুমান নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে (হরিবংশ)।

ধর্ম—ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ হতে ধর্ম উৎপন্ন হন। বরাহপুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করার মানসে যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন, তখন তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ হতে এক পুরুষের (ধর্ম) আবির্ভাব ঘটে। ব্রহ্মা তখন তাঁকে বলেন, "তুমি চতুষ্পাদ ও বৃষভাকৃতি। তুমি বড় হয়ে প্রজাপালন কর।" তখন ধর্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপদ, দ্বাপরে দ্বিপদ ও কলিতে একপদ হয়ে ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণরূপে, ক্ষত্রিয়দের তিন ভাগে, বৈশ্যদের দুই ভাগে ও শূদ্রদের এক ভাগ দিয়ে রক্ষা ও পালন করতে থাকেন। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটি ধর্মের পাদ। বেদে এঁর নাম তৃশৃঙ্গ। এঁর মাথা দুইটি ও হাত সাতটি; বামনপুরাণ মতে ধর্মের স্ত্রী অহিংসা। এঁর গর্ভে চারিটি পুত্র হয়—সনৎকার, সনাতন, সনক ও সনন্দ। অন্যান্য পুরাণে এঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে কথিত হয়েছেন।

ধর্মধ্বজ—মিথিলার জনকবংশের একজন রাজা। দণ্ডনীতি, সন্ন্যাসধর্ম ও মোক্ষশাস্ত্রে এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। একবার সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী ধর্মধ্বজের খ্যাতি শুনে এঁকে পরীক্ষা করবার জন্য নিজরূপ ত্যাগ করে, যোগবলে

এক মনোহর সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করে ধর্মধ্বজের কাছে উপস্থিত হন। রাজা তাঁর সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়ে সুলভাকে সংবর্ধনা করেন। তারপর সুলভা যোগবলে নিজের স্বত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষু রাজার স্বত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করেন। সুলভার অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে রাজা তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ করে বলেন, "আসক্তি, মোহ ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমি পরম বুদ্ধিলাভ করেছি এবং জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করেছি; অতএব তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভবপর নয়। তুমি সন্ন্যাসিনী, আমি গৃহস্থ; তুমি ব্রাহ্মণী, আমি ক্ষত্রিয়। তুমি আমাকে পরাজিত করে নিজের উন্নতি কামনা করছো। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ নেই বলে এ-মিলন বিষতুল্য হবে। আমাকে ত্যাগ করে তুমি সন্ন্যাসধর্ম পালন কর।" এর উত্তরে সুলভা বলেন, "এই বস্তু আমার, এই বস্তু আমার নয়—এই দ্বন্দ্ব থেকে তুমি মুক্ত হও নাই। তুমি নিজেকে এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কর না; তুমি মোক্ষের অধিকারী না হয়েই নিজেকে মুক্ত মনে করছো। সমদৃষ্টিহীন ব্যক্তির মোক্ষের অভিমান বৃথা। তুমি জীবন্মুক্ত নও, তাই আমার সংস্পর্শে তোমার অপকার হবে মনে করছো। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে তোমার দেহে আমি আছি। তোমার এই স্পর্শজ্ঞানের কোন মূল্য নেই।" সুলভার যুক্তিসম্মত ও অর্থযুক্ত কথা ও গভীর মোক্ষজ্ঞান দেখে ধর্মধ্বজ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন (মহাভারত—শান্তি)।

ধনঞ্জয়—অর্জুনের অন্য নাম। সমস্ত জনপদ জয় করে ধন-সংগ্রহ পূর্বক তার মধ্যে বাস করতেন বলে অর্জুন এই নামে পরিচিত (অর্জুন দেখ)। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করে, ধনঞ্জয় তাহাদের অন্যতম।

ধর্মপুত্র—যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম। দুর্বাসার মন্ত্র-প্রভাবে কুন্তী ধর্মকে (যম) আকর্ষণ করেন। যমের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় (দুর্বাসা ও কুন্তী দেখ)।

ধর্মব্যাধ—মিথিলাধিবাসী জাতিস্মর সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় জনৈক ব্যাধ। পূর্বজন্মে ইনি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও এক রাজার সখা ছিলেন। ইনি মৃগয়াকালে মৃগভ্রমে এক ঋষিকে বাণবিদ্ধ করায় তাঁর শাপে জাতিস্মর শূদ্র ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও মাতাপিতার সেবাপরায়ণ হন।

এক সময়ে কৌশিক নামে এক বেদাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণ বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট হয়ে তপস্যারত ছিলেন। উক্তকালে বৃক্ষবাসী এক বক তাঁর উপর পুরীষ নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ

কৌশিকের শাপে বক মৃত অবস্থায় বৃক্ষ হতে পতিত হয়। তখন কৌশিক দুঃখিত হয়ে এক পূর্বপরিচিত ব্রাহ্মণীর গৃহে ভিক্ষা করতে প্রবেশ করেন। কিন্তু ঐ সময় ব্রাহ্মণীর স্বামী গৃহে উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণী অতিথি-সেবা ত্যাগ করে পতিসেবার জন্য গমন করেন। স্বামাসেবার পর অতিথিকে ভিক্ষা দিতে এলে, কৌশিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অতিথির প্রতি এই অন্যায় আচরণের জন্য ব্রাহ্মণীকে তিরস্কার করে শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ব্রাহ্মণী বলেন, আমি "বক নই, আপনার শাপে আমি ভস্মীভূত হব না। আপনি যে ক্রোধে বককে বিনষ্ট করেছিলেন, পতিসেবার পুণ্যফলে তা' আমি পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করতে পারে, সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।" অতঃপর ব্রাহ্মণী কৌশিককে মিথিলাধিবাসী সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পিতামাতার সেবক ধর্মব্যাধের সমীপস্থ হয়ে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে বলেন।

কৌশিক তখন মিথিলায় গমন পূর্বক তপস্বী ব্যাধকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধর্মব্যাধ তাঁকে দেখেই দিব্যজ্ঞানে জ্ঞাত হন যে, কৌশিক এক পতিব্রতা নারীর উপদেশানুসারে তাঁর কাছে এসেছে।

তিনি কৌশিককে সসম্মানে গৃহে আহ্বান করে উপদেশ দান করেন। পরে তিনি বলেন যে, পূর্বজন্মে তিনি একজন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন; আত্মকৃতদোষেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। একদিন তিনি এক রাজ-বন্ধুর সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে শরনিক্ষেপে এক মৃগরূপী ঋষিকে নিহত করায়, তিনি মৃত্যুকালে এই অভিশাপ দিয়ে যান যে, শূদ্রযোনিতে ব্যাধ হয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। তখন ঋষিকে অনুনয় বিনয় করলে তিনি বলেন যে, এ-শাপ অন্যথা হবার নয় তবুও শূদ্র হয়েও তিনি ধর্মজ্ঞ হবেন, পিতামাতার সেবা করবেন এবং পরবর্তীকালে সিদ্ধিলাভ করে জাতিস্মর হবেন। পরে শাপমোচনান্তে পুনর্বার তিনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হবেন। তপস্বী ব্যাধ আরও বলেন যে, মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করলেও তিনি নিজে প্রাণিবধ না করে পরের নিহত মাংস বিক্রয় করেন এবং এই সব মাংস ভক্ষণও করেন না। এই মাংসে দেবতাগণ, পিতৃগণ, অতিথিগণ ও আত্মীয়দের সেবা হয়—নিহত পশুরও ধর্মাচরণ হয় এতে। বৃদ্ধ পিতামাতার তিনি সেবা করেন ও যথাশক্তি দান করেন। দেবতা অতিথি ও ভৃত্যদের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন তিনি ভোজন করেন। এইরূপে ধর্ম, দর্শন, মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দান করে, নিজে সিদ্ধির ফলস্বরূপ নিজের পিতামাতার সুখ-শান্তি

কৌশিককে দেখিয়ে ধর্মব্যাধ বলেন যে, পিতামাতাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। কৌশিক পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ না করেই বেদাধ্যয়নের জন্য গৃহ হতে বহির্গত হওয়ায় তাঁর পিতামাতা অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, অতএব তিনি যেন সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক তাঁদের শান্ত করেন। ধর্মব্যাধের উপদেশ গ্রহণান্তে কৌশিক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন (মহাভারত—বনপর্ব)।

ধর্মব্রতা—মহাতেজস্বী রাজা ধর্ম ও তাঁর স্ত্রী বিশ্বরূপার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যার নাম ধর্মব্রতা। ইনি পতিব্রতার জন্য কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। এই সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষি মরীচি তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করেন যে, যৌবন অবস্থায় তিনি কেন এই কঠোর তপস্যা করছেন? ধর্মব্রতা উত্তরে বলেন যে, পতিব্রতা হবার জন্য তিনি এই কঠোর তপস্যায় রত হয়েছেন। এই কথা শ্রবণান্তে মরীচি বলেন, "এইরূপ একজন পতিব্রতা নারীর সন্ধানেই আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমার মত পতিব্রতাও কেউ নেই, আর আমার মত স্বামীও তুমি কোথাও পাবে না; অতএব এসো আমরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হই।" তখন ধর্মব্রতা মরীচিকে তাঁর পিতার কাছে গিয়ে এই বিবাহের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে বলেন। মরীচি ধর্মের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করেন। তখন রাজা ধর্ম এঁর হাতেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করেন (বায়ুপুরাণ)।

একদিন মরীচি ধর্মব্রতাকে তাঁর পদপ্রক্ষালন করতে বলেন। ধর্মব্রতার সে আদেশ পালনরত অবস্থায় মরীচির পিতা ব্রহ্মা সে-স্থলে এসে উপস্থিত হন। ইনি স্বামীরও গুরু মনে করে ব্রহ্মাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ধর্মব্রতা উঠে যান। সেবা ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার জন্য মরীচি ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে বলেন, "তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ, সে-কারণ তুমি শিলীভূতা হবে।" ধর্মব্রতাও ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীকে শাপ দেন যে, তাঁকে অকারণে শাপ দেওয়ার জন্য শঙ্করও তাঁকে শাপ দেবেন (অগ্নিপুরাণ)।

ধর্মশাস্ত্র—ইহা হিন্দুদের ধর্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ। ইহাকে আইন-গ্রন্থও বলা হয়। পূর্বে প্রধানতঃ মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতিকে ধর্মশাস্ত্র বলা হতো। পরে ভগবান হতে ঋষিদের প্রাপ্ত, যা পরে স্মৃতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তাহাও ধর্মশাস্ত্র বলে কথিত হয়। এই ধর্মশাস্ত্র তিনটি গুণবিশিষ্ট ছিল—(১) আচার, (২) ব্যবহার, (৩) প্রায়শ্চিত্ত।

এই সব অনুপ্রাণিত আইনজ্ঞ ঋষিরা সংখ্যায় ১৮ জন; যদিও অনেক স্থলে ৪২ জনের নাম অনেক সময়

উল্লিখিত হয়। অবশ্য মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের স্থান অনেক উচ্চে এবং এঁদের বাদ দিয়েই শাস্ত্রজ্ঞ অনুপ্রাণিত ঋষির সংখ্যা ১৮ জন। এঁদের নাম হচ্ছে—অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ভ, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ ও বশিষ্ঠ। এই সব নাম ছাড়া আরও কতকগুলি নাম উল্লিখিত হয়; যেমন—নারদ, ভৃগু, মরীচি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও বৌধায়ন।

ধর্মরথ—সগর রাজার পুত্র। সগর সমস্ত দেশ জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে অশ্বমোচন করেন। অশ্ব নানা দেশ অতিক্রম করে রসাতলে প্রবেশ করে। এই স্থানে পুরুষোত্তম কপিলরূপে বাস করছিলেন। কপিল এই অশ্বকে আবদ্ধ কবে রেখেছেন সন্দেহ করে সগর ও তাঁর পুত্ররা তাঁকে আক্রমণ করেন। তখন মহর্ষি কপিলের ক্রোধানলে ৬০,০০০ সগরপুত্র ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল চার জন মাত্র পুত্র অবশিষ্ট থাকে। এই চার জনের নাম—বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্মরথ ও মহাবীর। এই চার জনই সগরের বংশধর (হরিবংশ)।

ধর্মরাজ—যমের অন্য নাম ধর্ম। ইনি মৃতদের ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা বলে ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত। জীবদের পাপ-পুণ্যের ইনি বিচারকর্তা। এঁর বাহন মহিষ এবং আয়ুধ দণ্ড।

ধর্ম-সাবর্ণি—চতুর্দশ মনুর মধ্যে ইনি একাদশ মনু। এই মন্বন্তরে অবতার ধর্মসেতু; ইনি বিষ্ণুর অবতার। ইন্দ্রের নাম বৈধৃতি। বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্মাণরতিগণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন। এই দেবগণের মধ্যে প্রত্যেক গণে ৩০ জন করে দেবতা ছিলেন। এই মন্বন্তরে নিশ্বর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান ও অনঘ—এই সাত জন সপ্তর্ষি হয়েছিলেন।

ধাতৃ-সৃষ্টিকর্তা, ঋক্‌বেদের পরবর্তী স্তোত্রে ধাতৃর কোন বিশেষ গুণাবলী বা ক্রিয়াকলাপ দেখা যায় না। সৃষ্টি-উৎপাদনে এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় ধাতৃ সব সময়ে নিযুক্ত। বিবাহসংগঠনকারী, জন্মদাতা, গৃহদেবতা, ভগ্নস্বাস্থ্য-উদ্ধারক—এই সকল রূপে এঁকে দেখা যায়। ইনি একজন আদিত্য। পরবর্তী পুরাণে ইনি প্রজাপতি বা ব্রহ্মার সঙ্গে জড়িত।

ধূম্রবর্ণ—এক নাগরাজের নাম। যাদববংশের স্থাপয়িতা যদু একবার সমুদ্র ভ্রমণে গমন করেন। সেখানে তিনি ধূম্রবর্ণদ্বারা নাগদের রাজধানীতে নীত হন। উক্ত রাজধানীতে যদু ধূম্রবর্ণের পাঁচটি কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই হতে নাগদের পাঁচটি বিভিন্ন বংশের উৎপত্তি হয় (হরিবংশ)।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা। তন্ত্রশাস্ত্রে এঁর সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে: একবার পার্বতী ক্ষুধিত হয়ে মহাদেবের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু মহাদেব খাদ্যদান করতে অসমর্থ হন। তখন পার্বতী ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মহাদেবকেই গ্রাস করে ফেলেন। এই সময় পার্বতীর দেহ হতে ধূম নির্গত হয়ে তাঁকে বিবর্ণ করে। মহাদেব তখন মায়াদ্বারা শরীর কম্পিত করে বলেন, "তুমি আমাকে গ্রাস করে বিধবা হয়েছ, অতএব এখন থেকে তুমি বৈধব্যবেশেই অধিষ্ঠান করবে এবং এই বেশেই তুমি পূজনীয়া হয়ে ধূমাবতী নামে প্রসিদ্ধা হবে।"

ধুন্ধু—মধু রাক্ষসের পুত্র এক রাক্ষস। এই রাক্ষস তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসাদির অবধ্য হয়ে উঠে সকলের ত্রাসের কারণ হয়। উতঙ্ক ঋষির আশ্রমের নিকট মরুপ্রদেশে উজ্জালক নামে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে এই দানব বাস করতো। বালুকার মধ্যে নিদ্রিত থেকে ধুন্ধু যখন বৎসরান্তে একবার নিঃশ্বাস ফেলতো, তখন সূর্য পর্যন্তও ধূলি, অগ্নিশিখা ও ধূমে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তেন, এবং প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী ভূমিকম্প হতো। ধুন্ধু নানাভাবে উতঙ্কের আশ্রমে উপদ্রব করতো। তখন উতঙ্ক ঋষির অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্ব রাজার দেহে প্রবেশ করেন। কুবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুন্ধুবধের জন্য যাত্রা করেন। কুবলাশ্ব বালু-সমুদ্র খনন করে ধুন্ধুর দর্শন পাওয়ামাত্র সে মুখনির্গত অগ্নিতে কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্রকে দগ্ধ করে ফেলে। তখন কুবলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে তার মুখাগ্নি নির্বাপিত করে ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে তাকে বধ করে "ধুন্ধুমার" নামে বিখ্যাত হন (মহাভারত—বনপর্ব)।

ধুন্ধুমার—ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্ব। অযোধ্যার এই রাজার "ধুন্ধুমার" নাম প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ—মধুকৈটভের পুত্র দানব ধুন্ধু তপস্যার ফলে ব্রহ্মার কাছ হতে বর পেয়ে দেব, দানব, রাক্ষস ইত্যাদির অবধ্য হয়। মহর্ষি উতঙ্কের আশ্রমের নিকট মরুপ্রদেশে উজ্জালক নামে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্রে লুকিয়ে ধুন্ধু উতঙ্কের আশ্রমে নানা উপদ্রব করত। উতঙ্ক অযোধ্যার রাজা বৃহদশ্বকে ধুন্ধু দানবকে বিনাশের জন্য অনুরোধ করলে, তিনি নিজ পুত্র কুবালাশ্ব ও তাঁর পুত্রদের এই কাজে নিয়োগ করতে মুনিকে পরামর্শ দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। উতঙ্ক কুবলাশ্বের শরণাপন্ন হলে তিনি একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুন্ধুকে বধের জন্য যাত্রা করেন। এক সপ্তাহ ধরে সেই বালুময় সমুদ্র খনন করবার পর

ধুন্ধুকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যায়। সে উঠে তার মুখ-নিঃসৃত অগ্নির তেজে কুবলাশ্বের পুত্রদের ভস্ম করে ফেললো। তখন কুবলাশ্ব যোগবলে তার মুখাগ্নি নির্বাপিত করে, ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাকে বধ করে "ধুন্ধুমার" নামে বিখ্যাত হলেন (মহাভারত—বনপর্ব)।

ধূম্র—বানর দলপতি জাম্ববানের ভ্রাতা। ইনি লঙ্কাযুদ্ধে বহু রাক্ষস বিনাশ করেন (রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড)।

ধূম্রলোচন—দানবরাজ শুম্ভের সেনাপতি। ভগবতী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করবার জন্য রূপলাবণ্যময়ী নারীমূর্তি ধারণ করে বললেন, "যে আমাকে জয় করতে পারবে, তাঁকে আমি বরমাল্য প্রদান করবো।" শুম্ভ সুগ্রীব নামে দূতের মুখে এই কথা শ্রবণান্তে দেবীকে বদ্ধ অবস্থায় আনয়নের জন্যে ধূম্রলোচনকে আদেশ দিলেন। ধূম্রলোচন ষাট হাজার সেনানীপরিবৃত হয়ে ভগবতীর সমীপস্থ হলেন। তখন দেবী এমন প্রচণ্ড হুঙ্কার দিলেন যে, ষাট হাজার সৈন্যের সঙ্গেই ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হলো (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)।

ধূম্রাক্ষ—রাবণের সেনাধ্যক্ষ। রাম-রাবণের যুদ্ধকালে রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ-মুক্তির সংবাদ পেয়ে রাবণ ধূম্রাক্ষকে সসৈন্য যুদ্ধে প্রেরণ করেন। ধূম্রাক্ষ বহু বানর বধ করায় হনুমান এক গিরিশৃঙ্গের আঘাতে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন (রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড)।

ধৃতরাষ্ট্র—পুরুবংশে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি গঙ্গাকে বিবাহ করার ফলে তাঁর গর্ভে দেবব্রত নামে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পরে ভীষ্ম নামে পরিচিত হন। রাজা শান্তনু পরে দাস-রাজকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। এই সত্যবতী হতে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্ম কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই বিচিত্রবীর্য ক্ষয়রোগে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মাতা সত্যবতী বংশলোপের আশঙ্কায় ভীষ্মকে বিধবা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। ভীষ্ম পুত্র উৎপাদনে অস্বীকার করলে, তিনি নিজের কানীন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্মরণ করেন। স্মরণমাত্রই ব্যাসদেব সেই স্থানে এলে সত্যবতী তাঁকে দুই পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভসঞ্চার করবার জন্য অনুরোধ করেন। সঙ্গমকালে ব্যাসের কৃষ্ণবর্ণ দীপ্ত নয়ন ও পিঙ্গল জটাশ্মশ্রু দর্শনে অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করেন। ইহার ফলে পরে অম্বিকা এক অন্ধ পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রের নাম হলো ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র

জন্মান্ধ হলেন দেখে বেদব্যাস আবার অন্য পুত্রবধূ অম্বালিকার গর্ভসঞ্চার করেন। এই সময়ে অম্বালিকাও ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যান। ইহার ফলে অপর এক পুত্রের জন্ম হয়। সঙ্গমের সময় অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিলেন বলে এই পুত্রের নাম হয় পাণ্ডু। অম্বিকা পুনর্বার ঋতুমতী হলে সত্যবতী তাঁকে আবার ব্যাসের নিকট গমন করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু এবার অম্বিকা স্বয়ং না গিয়ে তাঁর এক সুন্দরী দাসীকে প্রেরণ করেন। এই দাসীর গর্ভেই বিদুরের জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র, জন্মান্ধ ছিলেন বলে রাজা হতে সক্ষম হননি, পাণ্ডু কনিষ্ঠ হয়েও রাজ্যাধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান ছিলেন। বেদব্যাসের বরে ইনি শতহস্তীর ন্যায় বল লাভ করেন। গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামীর অন্ধত্বের জন্যে পতিব্রতা গান্ধারী চক্ষে সর্বদা বস্ত্রখণ্ড বেঁধে রাখতেন। বেদব্যাস গান্ধারীকে শতপুত্র লাভের বর দান করেন। গর্ভবতী হওয়ার পর দুই বৎসরেও সন্তান প্রসব না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্ম হওয়ায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে নিজের গর্ভপাত করেন। তাতে এক লৌহকঠিন মাংসপিণ্ড প্রসবিত হয়। বেদব্যাসের পরামর্শমত সেই মাংসপিণ্ড শীতল জলে ভিজিয়ে তা' হতে একশত ভ্রূণ পৃথক করে ঘৃত-কলসে রাখা হয়।

এর এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধনের জন্ম হয় ও ক্রমে দুঃশাসনাদি আরো ৯৯ জন পুত্রের ও দুঃশলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। এই শতপুত্রের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রধান ছিলেন। গান্ধারীর গর্ভধারণকালে এক বৈশ্যনারী ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত ছিল। উক্ত সময় ধৃতরাষ্ট্র হতে সেই বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসু নামে এক ধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়। দুর্যোধনের জন্মের পর চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখা গেলে, যখন সকলে তাঁকে পরিত্যাগ করতে বলেন, তখন পুত্রস্নেহবশে ধৃতরাষ্ট্র তা করেননি। কুরু নামে এক পূর্বপুরুষের নাম হতে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ কৌরব নামে বিখ্যাত হন। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত যুযুৎসু ভিন্ন আর সকল পুত্রই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হস্তে নিহত হন।

পাণ্ডুপুত্ররা পাণ্ডব নামেই বিখ্যাত হন। এই পুত্রদের মধ্যে যুধিষ্ঠির ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গেই হস্তিনাপুরে বাস করতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের আশ্রয়ে পাণ্ডব ও কৌরবগণ দ্রোণাচার্যের

নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধিতে দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে দুর্যোধন্ নিজেকেই যুবরাজ বলে মনে করতেন এবং পাণ্ডবদের রাজ্যে অধিকার অস্বীকার করতেন। দুর্যোধনের পরামর্শ-অনুসারে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠান। সেখানে কৌশলে দুর্যোধন পাণ্ডবদের জতুগৃহে দগ্ধ করবার নিষ্ফল চেষ্টা করেন। পাণ্ডবরা এখান হতে রক্ষা পেয়ে পরে স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করেম। ক্রমে তাঁদের রক্ষা পাওয়া ও স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদীলাভের সংবাদ হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌঁছোলে তিনি প্রথমে দুর্যোধনই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন মনে করে আনন্দিত হন। পরে প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাত হয়ে সন্তুষ্ট হবার ভাব দেখান। দুর্যোধন ও কর্ণ তখনই যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিনষ্ট করার পরামর্শ দিলে, ধৃতরাষ্ট্র তা' নিয়ে ভীষ্ম-দ্রোণাদির সঙ্গে পরামর্শে রত হন.। তাঁরা পাণ্ডবদের সমাদরে গ্রহণ করবার পরামর্শ দিলে, তিনি তাই করেন। অবশেষে ভ্রাতৃ-বিরোধ নিবারণকল্পে সকলের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য বিভক্ত করে দেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করতে বলেন। ঐ স্থানে পাণ্ডবগণ নূতন রাজধানী স্থাপন করে ও নানা দেশ জয় করে প্রচুর ধনসম্পত্তি আহরণ করেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেন। যজ্ঞে নিমন্ত্রিত দুর্যোধন পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হন ও শকুনির পরামর্শে পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বাপহরণের ব্যবস্থা করেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সৎপরামর্শ দেবার জন্য চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে স্নেহবশে দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি দেন ও বিদুরের সাহায্যে পাণ্ডবদের দ্যূতসভায় আহ্বান করেন। শকুনির নিকট কপট-দ্যূতে যুধিষ্ঠির সর্বস্বান্ত হন এবং পণে দ্রৌপদীকেও হারান। এর ফলে সভামধ্যে দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রের উপস্থিতিতেই লাঞ্ছিতা হন। দ্রৌপদী বিজিতা হলে ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তাঁর অপমানের পর তাঁকে ও ধনসম্পত্তিসহ পাণ্ডবদের মুক্তি দেন। দুর্যোধনাদি পুনর্বার পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান কবলে, ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাতে সম্মতি দেন। গান্ধারী নানা কারণ দেখিয়ে তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করলেও তিনি পুত্রদের অভীষ্টপথে চলতে বাধা দেননি। দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবরা সর্ত-অনুযায়ী দীর্ঘ বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করেন। পাণ্ডবদের বনযাত্রার পর ধৃতরাষ্ট্র অস্থিরচিত্তে বিদুরের নিকট কুরু-পাণ্ডবের হিতার্থে

পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইলে: বিদুর তাঁকে বলেন যে, দুর্যোধন যদি সন্তুষ্টচিত্তে পণ্ডবদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন, তবেই মঙ্গল সম্ভব। না হলে ধৃতরাষ্ট্রের উচিত দুর্যোধনকে নিগৃহীত করে যুধিষ্ঠিরকেই রাজ্যদান করা। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তা' করতে অস্বীকার করে বিদুরকে এই মন্ত্রণাদানের জন্য তিরস্কার করেন ও তাঁকে তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করতে বলেন। বিদুর পাণ্ডবদের নিকট উপস্থিত হলে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় অনুতপ্ত হয়ে সঞ্জয়ের সাহায্যে বিদুরকে ফিরিয়ে আনেন। পরে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপরামর্শ দিলে, পুত্রস্নেহবশে ধৃতরাষ্ট্র তা' শুনতে অক্ষম হন। ঘোষযাত্রাকালে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি চাইলে, তিনি প্রথমে আপত্তি করলেও পরে সম্মতি দেন। নির্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হবার পর পাণ্ডবরা স্বরাজ্য প্রার্থনা করলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দিয়ে পাণ্ডবদের নিকট শান্তি ভিক্ষা করেন, কিন্তু রাজা প্রতার্পণের কথা উত্থাপন করেন না। ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় বিদুরকে আহ্বান করে পরামর্শ চান। বিদুর পুনরায় সৎপরামর্শ দিলেও ধৃতরাষ্ট্র সব জেনেই স্বীকার করেন যে, দুর্যোধন তাঁর কাছে এলেই তাঁর বুদ্ধিবৈকল্য ঘটে এবং সে-কারণ তিনি ন্যায়বিচারে অসমর্থ হন। কৌরবসভায় পরামর্শকালে পাণ্ডবদের বনগমন সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে ভীত ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তিরস্কার করে সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ দেওয়ায় দুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি আপন আপন শক্তির পরিচয় প্রদানপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করেন। ধৃতরাষ্ট্র নানা উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধন কোন কথাই গ্রাহ্য করেন না। মধ্যস্থ হিসাবে কৃষ্ণ উপস্থিত হলে, ধৃতরাষ্ট্র আপন অক্ষমতার কথা জানিয়ে গান্ধারীকে সভায় এনে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় সঞ্জয় দিব্যচক্ষুতে যুদ্ধ দর্শন করে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করতেন। যুদ্ধের শেষে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কুলক্ষয়ের সংবাদ শোনান। শতপুত্রের মৃত্যুতে শোকাকুল হলে, সঞ্জয় তাঁকে সান্ত্বনা দেন। হস্তিনাপুর হতে গান্ধারী সমভিব্যবহারে যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে যাত্রা করলে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে তাঁর অনুগমণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট মনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করেন ও ভীমের অনুসন্ধান করেন। কৃষ্ণ তাঁর উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে এক লৌহময় ভীমমূর্তি তাঁর সম্মুখে স্থাপন করেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহমূর্তি আলিঙ্গন করে চূর্ণ করেন ও বক্ষে চাপ পড়ায় রক্তবমন করতে করতে বসে পড়ে ভীমের জন্য বিলাপ করতে থাকেন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবদের তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের পনের বৎসর পর ভীমের গুপ্তভাবে বিরোধিতা ও অপমান সহ্য করতে না পেরে, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতিকে নিয়ে বনবাসে যাত্রা করেন। তিনি যুধিষ্ঠির ও রাজ্যের প্রজাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। সেই সময়ে পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র প্রজাদের নিকট দুর্যোধনের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কারণ দুর্যোধন প্রজাদের কোন ক্ষতি করেন নি। ধৃতরাষ্ট্র ক্রমে গঙ্গাতীর পার হয়ে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমের নিকট বনবাস করতে থাকেন। এখানে ব্যাসদেব উপস্থিত হয়ে কুন্তীর অনুরোধে ভাগীরথীতীরে নিজ তপস্যাবলে কুরুক্ষেত্রে নিহত সমস্ত যোদ্ধাদের এক দিনের জন্য উপস্থিত করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে দেখাবার জন্য তাঁকে দিব্যচক্ষু দান করেন। এর পর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে মৌনী ও বায়ুভুক অবস্থায় কঠোর তপস্যায় রত হন। ছয় মাস অতিবাহিত হলে, তাঁরা বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই সময় দাবাগ্নিতে গান্ধারী ও কুন্তীসহ সমাধিস্থ অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু হয় (মহাভারত)।

ধৃতবর্মা—ত্রিগর্তরাজ কেতুবর্মার পুত্র। এঁর ভ্রাতার নাম সূর্যবর্মা। অর্জুন যখন অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে ভ্রমণরত ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এঁদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ধৃতবর্মার পিতা ও ভ্রাতা কেতুবর্মা ও সূর্যবর্মা নিহত হন। এঁদের মৃত্যুর পর ধৃতবর্মা অর্জুনের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে তুমুল যুদ্ধ করেন এবং পরিশেষে পরাজিত হয়ে অর্জুনের বশ্যতা স্বীকার করেন।

ধৃষ্টকেতু—(১) চেদিরাজ্যের রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপাল এবং শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু ও কন্যা করেণুমতি। করেণুমতী চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের স্ত্রী ছিলেন। ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করেন। যেদিন জয়দ্রথ নিহত হয়, সেই দিন ইনি অসাধারণ বীরত্ব দেখান। ধৃষ্টকেতু যখন দ্রোণাচার্যের গতিরোধ করতে উদ্যত হন, তখন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার পুত্র বীরধন্বা নামে কৌরবপক্ষীয় এক বীর এঁর গতিরোধ করেন। সেই যুদ্ধে ধৃষ্টকেতু বীরধন্বাকে নিহত করেন এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রোণাচার্যের হস্তে নিহত হন (মহাভারত—দ্রোণপর্ব)।

(২) পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইনি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞলব্ধ পুত্র ও পৃষতের পৌত্র। দ্রোণের হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পর দ্রোণের মৃত্যুকামনায় দ্রুপদরাজ যাজ ও উপযাজ ঋষিদের সাহায্যে গঙ্গা ও যমুনাতীরে যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞাগ্নি হতে বর্ম ও ধনু হস্তে ধৃষ্টদ্যুম্ন

ও কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) উত্থিত হন। দ্রোণাচার্যের নিকট ইনি ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন সভায় ভগিনীর রক্ষকরূপে উপস্থিত ছিলেন ও বরমাল্যের পণস্বরূপ লক্ষ্যভেদের কথা ঘোষণা করেন। পাণ্ডবরা বনে গমন করলে ইনি সেখানে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করে বহু কৌরব-সৈন্য নিহত করেন। ইনি মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের সাতজন সেনাপতির অন্যতম ও ব্যূহরচনায় কুশলি ছিলেন। যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনে দ্রোণ তাঁর একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ যুধিষ্ঠিরের কাছ হতে শুনে শোকাচ্ছন্ন হয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের জন্য রথের উপর যোগাসনে উপবেশন করলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গাঘাতে নিরস্ত্র দ্রোণের শিরশ্ছেদ করেন। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে পাণ্ডবপক্ষেই ধৃষ্টদ্যুম্ন তিরস্কৃত হন ও সাত্যকির সহিত তাঁর যুদ্ধের উপক্রম হয়। তখন কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, সহদেব ইত্যাদির চেষ্টায় এই কলহ নিবারিত হয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবশিবিরে নৈশ হত্যাকাণ্ডের সময় অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধরূপে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন (মহাভারত—দ্রোণপর্ব)।

ধেনুক—রাক্ষসবিশেষ। বৃন্দাবনের নিকটে এই রাক্ষসের বাস ছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম একবার ধেনু চরাতে তালিবনে গমন করেন। সেই জনশূন্য তালিবনে এক রাক্ষসের বসবাস ছিল, সেখানে বলরাম ভক্ষণের জন্য একটি তাল পাড়লে এই রাক্ষস সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় উপস্থিত হয়ে বলরামকে দংশন করতে আরম্ভ করে। তখন বলরাম ওর পদদ্বয়ধারণপূর্বক ঘুরোতে ঘুরোতে তালবৃক্ষের উপর আছড়িয়ে দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। ফলে ঐ রাক্ষস ভূপতিত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয় (হরিবংশ)।

ধৌম্য—(১) ইনি মহর্ষি অসিতের পুত্র ও মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধৌম্য পাণ্ডবদের পুরোহিত ছিলেন। পাণ্ডবরা এঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করলে, ইনি তাঁদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে রাজত্বকালে ও সকল অবস্থাতেই পাণ্ডবদের সঙ্গে অবস্থান করে এঁদের হিত চেষ্টা করতেন। অজ্ঞাতবাসের আগে পাণ্ডবদের প্রতি এঁর উপদেশ-বাক্য বিশেষ জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। কেবলমাত্র অজ্ঞাতবাসকালে ইনি বাধ্য হয়ে পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুপদ রাজার আশ্রয়ে বাস করেন। ইনি নারদের নিকট হইতে সূর্যের এক স্তব লাভ করেন এবং তাহা যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দেন। এই স্তবের প্রভাবে যুধিষ্ঠির অক্ষয়স্থালী প্রাপ্ত হন।

(২) আয়োদধৌম্য নামে আর

একজন ঋষি ছিলেন। আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে এঁর তিনটি শিষ্য ছিল।

(৩) ইনি সত্যযুগের একজন ঋষি এবং ব্যাঘ্রপদ ঋষির পুত্র। একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে খেলা করতে করতে গাভী দোহন করতে দেখে, ইনি মাতার কাছে গিয়ে দুধ পান করার ইচ্ছা জানালেন। পুত্রকে দুধ না দিতে পেরে মাতা বললেন যে, মহাদেবের উপাসনা না করলে অভিষ্ট বস্তু পাওয়া যায় না। তখন থেকে ধৌম্য মহাদেবের তপস্যায় রত হলেন। এঁর কঠোর তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, "ধৌম্য তুমি অজর, অমর, তেজস্বী ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হবে।" মহাদেব আরও বললেন, "সামান্য দুধের জন্যে তুমি আমাকে লাভ করেছ তোমার ইচ্ছামাত্র ক্ষীরসমুদ্র তোমার সমক্ষে আবির্ভূত হবে। এক কল্প পরে তুমি স্বর্গে যাবে। তোমার আশ্রমে আমি স্থায়িভাবে বাস করলাম" (মহাভারত—অনুশাসন)।

ধ্রুব—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের দুই রাণী ছিল—সুনীতি আর সুরুচি। প্রথমা সুনীতির গর্ভে ধ্রুব আর দ্বিতীয়া সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে রাজার দুই পুত্র হয়। রাজা সুরুচিকে সুনীতি অপেক্ষা বেশী ভাল বাসতেন। সুরুচির প্ররোচনায় তিনি সুনীতির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে তাঁকে বনবাস দেন। একদিন রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে পথভ্রান্ত হয়ে বনস্থিত সুনীতির নির্জন কুটীরে উপস্থিত হন এবং তথায় রাজ-সহবাসে সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। একদিন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম পিতার ক্রোড়ে বসে আছে, সেই সময়ে ধ্রুব রাজসভায় উপস্থিত হয়ে পিতার ক্রোড়ে বসতে চাইলেন। ঐ সময় বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে কটুবাক্যে অপমানিত করলে, ব্যথিতচিত্তে ধ্রুব মার কাছে গিয়ে এই অপমানের কথা বর্ণনা করলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে সুনীতি বললেন যে, একমাত্র হরিই দুঃখীদের দুঃখমোচন করতে পারেন। যে হরির দয়ায় মানুষের মঙ্গল হয়, সেই হরিকে পাবার জন্যে ধ্রুব ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। একদিন রাত্রিতে নিদ্রিত মাতাকে ত্যাগ করে ধ্রুব গভীর বনে চলে গেলেন ও হরির অন্বেষণে ঘুরতে লাগলেন। ক্রমাগত পূর্বদিকে যেতে যেতে ধ্রুব সাত জন মুনিকে দেখতে পেলেন। তাঁদের কাছে ধ্রুব বললেন, "আমি অর্থ বা রাজ্য কিছুই প্রার্থনা করি না। আমি এমন স্থান প্রার্থনা করি যা' কেউ উপভোগ করেনি।" এই সাত জন মুনি সপ্তর্ষি। তাঁরা ধ্রুবকে বললে যে, বিষ্ণুর আরাধনা করলে ধ্রুবের এই ইপ্সিত স্থান পাওয়া যাবে। ধ্রুব তখন বিষ্ণুর আরাধনায় কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা

এই কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে নানা উপায়ে ধ্রুবের তপোভঙ্গ করতে চেষ্টা করলেন এবং অবশেষে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে ধ্রুবের কাছে এসে বললেন, "আমই হরি, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি, তুমি বর গ্রহণ কর।" ধ্রুব বললেন, "আমি যেন আপনার স্তব করিতে পারি—এই বর আমাকে দান করুন।" বিষ্ণু বললেন, "তুমি পূর্বে এমন একটি স্থান প্রার্থনা করেছিলে যা' কেউ উপভোগ করেনি। তুমি পূর্বে এক ব্রাহ্মণপুত্র ছিলে এবং তোমার এক বন্ধু রাজপুত্রের ঐশ্বর্য দেখে তুমি রাজার পুত্র হতে চেয়েছিলে। তাই তুমি রাজা উত্তানপাদের-গৃহে জন্মগ্রহণ করেছ এবং আমাকে আরাধনা করে এখন তুমি মুক্তি পেয়েছ। তুমি সকল তারা ও গ্রহগণের উপরে তাদের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকবে। এই স্থানের নাম হবে ধ্রুবলোক।" এর পর ধ্রুব পিতার রাজ্যলাভ করেন। বিবাহ করে ধ্রুব সংসারী হলে তাঁর দুই পুত্র হয়। যথাকালে ধ্রুব দেহত্যাগ করলে বিষ্ণুদত্ত ধ্রুবলোকে প্রস্থান করে নক্ষত্ররূপে অবস্থান করতে লাগলেন (বিষ্ণুপুরাণ)।

ন

নকুল—পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ও চতুর্থ পাণ্ডব। পাণ্ডুর অন্যতমা স্ত্রী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে এঁর জন্ম হয়। পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হয়ে যখন বনে তপস্যারত ছিলেন, তখন দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী তাঁর অনুগমন করেন। এই সময়ে দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে তিন দেবতাকে আহ্বান করে কুন্তীর তিন পুত্র জন্মে। এই দেখে মাদ্রিও স্বামীকে তাঁর পুত্রলাভের জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করতে বলেন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে দুর্বাসালব্ধ মন্ত্র দান করেন। মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করাতে তাঁরা আবির্ভূত হয়ে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্রের জন্ম দেন। অশ্বিনীকুমার হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে নকুল খুব সুপুরুষ হন। মাতা মাদ্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হলে নকুল ও সহদেব বিমাতা কুন্তীদ্বারা প্রতিপালিত হন। অন্যান্য কুরু-সন্তানদের সঙ্গে নকুলও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন ও অসিযুদ্ধে পারদর্শী হন। দ্রোণের শিক্ষায় ইনি একলাই বহু শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং বিচিত্রভাবে যুদ্ধ করতে পারতেন। এই জন্য ইনি অতিরথ ও চিত্রযোধী নামে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর অন্যতম। এঁর ঔরসে শতানিক নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্রৌপদী ভিন্ন ইনি ধৃষ্টকেতুর ভগিনী চেদিরাজকন্যা করেণুমতীকেও বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে তাঁর নিরমিত্র নামে এক পুত্র হয়।

রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে দিগ্বিজয় যাত্রাকালে নকুল পশ্চিম দিকে যাত্রা করে দশার্ণ, মালব, ত্রিগর্ত্ত ও পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তাঁর দূতের নিকট কৃষ্ণাদি যাদবগণ বশ্যতা স্বীকার করেন। শাকলে ইনি মাতুল মদ্ররাজ শল্যের নিকট প্রচুর ধনরত্নাদি সংগ্রহ করেন। ম্লেচ্ছাদি বর্বরদের জয় করে দশ হাজার উট বোঝাই ধনসহ ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন। দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হলে, সকলের সহিত ইনিও বনবাসে যান। ঘোষযাত্রাকালে গন্ধর্বদের হস্তে দুর্যোধন বন্দী হলে, ভীম, অর্জুন ও সহদেবের সহিত নকুলও গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান। হরিণরূপে ধর্ম এক ব্রাহ্মণের অরণি-মন্থ হরণ করলে, পঞ্চপাণ্ডব তা' উদ্ধার করতে গিয়ে যখন তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়েন, তখন নকুল তাঁদের জন্যে তূণে করে প্রথমে জল আনতে গেলে, ধর্ম অন্তরীক্ষ থেকে নকুলকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপান করতে নিষেধ করেন। নকুল তা অগ্রাহ্য করায় তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্যান্য তিন ভ্রাতারও সেই গতি হলে, যুধিষ্ঠির যখন ধর্মের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন, তখন ধর্ম তাঁকে যে কোন একজন ভ্রাতার জীবন প্রার্থনা করতে বলেন। বিমাতার সন্তান বলে যুধিষ্ঠির প্রথমেই নকুলের জীবন প্রার্থনা করেন। মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে অজ্ঞাতবাসকালে নকুল রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ও অশ্বচিকিৎসক পরিচয়ে 'গ্রন্থিক' নাম ধারণ করে বিরাটের অশ্ব তত্ত্বাবধানের ভার নেন। তাঁর গুপ্ত নাম ছিল জয়সেন। যুদ্ধের পূর্বে মন্ত্রণাকালে কৃষ্ণের কৌরবসভায় দৌত্যের সময় নকুল কৃষ্ণকে কালোচিত কার্য করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণ যেন প্রথমে কৌরবদের মৃদু বাক্য বলেন ও তাতে কার্যোদ্ধার না হলে যেন ভীতি প্রদর্শন করেন। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর অপমানকালে নকুল ধার্তরাষ্ট্রদের সংহার করবার প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নকুল বহু কৌরব-সৈন্য সংহার করেন। ষোড়শ দিনের যুদ্ধে নকুল কর্ণের হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন। কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী কর্ণ নকুলকে প্রাণভিক্ষা দেন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হলে নকুল উপপ্লব্য নগর থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসেন। অশ্বত্থামার মণি হরণকালে নকুল ভীমের সারথি হন। যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজ্যভোগান্তে ইনি ভ্রাতাদের সহিত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। সবচেয়ে বেশী রূপবান বলে গর্ব অনুভব করায় ইনি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেননি। নরকভোগ করার পরও যুধিষ্ঠিরের আগমনের পর ভ্রাতাদের সহিত নকুল স্বর্গবাস করেন।

নগ্নজিৎ—(১) কোশলদেশের রাজা। এঁর কন্যার নাম সত্যা। পিতার নাম-অনুসারে কন্যার নাম নাগ্নজিতী ছিল। নগ্নজিৎ নিজের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ পণ করেন যে, যে তাঁর রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ বধ করতে পারবে, সে-ই তাঁর জামাতা হবে। কৃষ্ণ বৃষকে পরাস্ত করাতে তাঁর সঙ্গে নাগ্নজিতীর বিবাহ হয় (ভাগবত)।

(২) অগ্নির স্ত্রী স্বাহা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা করেন। পরজন্মে নগ্নজিৎ রাজার কন্যা নাগ্নজিতীরূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে পাবেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বাহাকে বলেছিলেন (দেবী ভাগবত)।

নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা। মথুরার অপর দিকে গোকুল গ্রামে গোপজাতীয় নন্দের বাস ছিল। সেই সময় কংস মথুরার রাজা ছিলেন। নন্দের স্ত্রীর নাম যশোদা। যে-রাত্রে যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রেই শ্রীকৃষ্ণও মথুরার কারাগারে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'বসুদেব ও দেবকীর কোন সন্তানের হস্তে কংসের মৃত্যু হবে', এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কংসের ভয়ে বসুদেব সেই জলঝড়পূর্ণ মধ্যরাত্রে কৃষ্ণকে নন্দের আবাসে নিদ্রিতা যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন করে, তাঁর অজ্ঞাতসারে কন্যা মহামায়াকে এনে দেবকীর কোলে রেখে দেন। মহামায়ার জন্মের সময় তাঁর মায়াতে সকলেই আচ্ছন্ন ছিলেন, সেইজন্য বসুদেবের এই সন্তান-পরিবর্তন কেহই জানতে পারেনি। কৃষ্ণ নন্দের গৃহে লালিত পালিত হতে লাগলেন। তিনি নন্দের সমস্ত ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এ-দিকে কংস কৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত জানতে পেরে তাঁকে বধ করবার জন্যে গোকুলে ছদ্মবেশী চরদের পাঠান, কিন্তু এতে তিনি কৃতকার্য হন না। তখন নন্দ ভীত হয়ে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যান। একবার কংসের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে নন্দ কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরায় যান। সেখানে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন (ভাগবত)।

নন্দনকানন—স্বর্গস্থিত উপবন। সুরোদ্যান।

নন্দিনী—স্বর্গের গোমাতা সুরভির কন্যা। নন্দিনী মাতার মত কামধেনু ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ নন্দিনীকে নিজের আশ্রমে রাখেন। সূর্যবংশের রাজা দিলীপ অপুত্রক হওয়াতে স্ত্রীসহ এই নন্দিনীকে সেবা করে পুত্র রঘুকে লাভ করেন। একবার সস্ত্রীক বসুগণের ন-বিহারকালে দ্যৌ নামক বসুর স্ত্রী নন্দিনীকে দেখে তাঁকে পাবার জন্যে স্বামীকে অনুরোধ করেন। দ্যৌ তখন অন্যান্য বসুর সাহায্যে একে হরণ করেন। এর ফলে বশিষ্ঠের শাপে বসুদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

করতে হয়। দ্যৌ ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কামধেনু নন্দিনীর জন্যই বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধ হয়।

নন্দী ও ভৃঙ্গী—শিবের প্রধান অনুচরদ্বয়।

নন্দী—মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক। মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে নন্দী নামে এক অযোনিসম্ভব পুত্র লাভ করেন। নন্দী দীর্ঘকাল মহাদেবের অর্চনা করে তাঁর গণমধ্যে গণ্য হন। মহাদেব নিজে মরুৎদের সুযশা নামে কন্যার সঙ্গে নন্দীর বিবাহ দেন (কূর্মপুরাণ)।

নন্দীশ্বর—মহাদেবের বিশ্বস্ত অনুচর। ইনি করালরূপ, বামনাকৃতি, খর্ববাহু, বানরমুখ ও কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ। রাবণ কুবের জয় করে পুষ্পিকারোহণে কৈলাসের কাননে যাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর রথের গতি থেমে যায়। এই সময় নন্দী তাঁকে বনমধ্যে যেতে নিষেধ করে; কারণ হরগৌরী তখন ওখানে বিহার করছেন। রাবণ নন্দীশ্বরের মুখ দেখে হেসে উঠলেন। তখন নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলো, "আমার আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোমাকে সবংশে নিধন করবে" (রামায়ণ)।

নন্দীগ্রাম—অযোধ্যা হতে একক্রোশ দূরে। রামকে বনবাস হতে ফিরিয়ে না আনতে পেরে, ভরত অযোধ্যায় না গিয়ে এই স্থান হতে রামের হয়ে রাজ্যপালন করেন। লঙ্কাজয়ের পর চতুর্দশ বৎসর বনবাস শেষ হলে, রাম এইস্থানে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হন ও অযোধ্যায় ফিরে আসেন (রামায়ণ)।

নন্দীমুখ—পিতৃদের একটি শ্রেণী।

নবদুর্গা—কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্র, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী—এই নয়জন নবদুর্গা নামে খ্যাত। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে এঁরা বীরভদ্রের সঙ্গে গমন করেছিলেন (স্কন্দপুরাণ)।

নভগ—বৈবস্বত মনুর দশটি পুত্রের অন্যতম নভগ। ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকার সময় পিতৃধন বিভাগকালে ইনি পিতা এবং অন্যান্য ভ্রাতৃগণ কর্তৃক বঞ্চিত হন। পিতার কাছে অনুযোগ করলে মনু তাঁকে বললেন, "তোমার ভ্রাতাদের বিশ্বাস করো না। আঙ্গিরস মুনিদের কাছে বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে দুইটি সূক্ত পাঠ করে শোনাও। ফলে যজ্ঞের শেষে স্বর্গে যাবার সময় সময় এঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে দান করে যাবেন।" যজ্ঞান্তে নভগ দানগ্রহণে উদ্যত হলে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ এসে তাঁকে বাধা দেন ও বলেন, "এ ধন আমার।" পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "এই কৃষ্ণকায় পুরুষ রুদ্র, এই ধনের প্রকৃত অধিকারী।' নভগ তখন সমস্ত ধন এঁকেই দান করলেন। পিতা-পুত্রের

সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে রুদ্র নভগকে ধন ও ব্রহ্মবিদ্যা দান করে অন্তর্হিত হলেন (ভাগবত)।

নমুচি—(১) দৈত্যবিশেষ। বামন-পুরাণমতে শুম্ভের তৃতীয় ভ্রাতা। কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে এর জন্ম হয়। নমুচি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়। নমুচির কথা ঋগবেদে, শতপথব্রাহ্মণে ও মহাভারতে পাওয়া যায়।

(২) বিপ্রচিত্তি নামে এক দানবের পুত্র। ইন্দ্র যখন অসুরদের পরাজিত করেন, তখন একমাত্র নমুচি ইন্দ্রকে সবলে বাধা দিয়ে পরাজিত করে। নমুচি প্রথমে ইন্দ্রের বন্ধু ছিল, পরে সে সোমরসের সঙ্গে ইন্দ্রের বল হরণ করে। নমুচি এই সর্তে ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে রাজী হয় যে, ইন্দ্র নমুচিকে দিনে কিংবা রাত্রে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুদ্বারা নিহত করতে পারবেন না। ইন্দ্র এই সর্তে রাজী হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। ইন্দ্র সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে সমুদ্রফেনবৎ বজ্রাস্ত্র লাভ করেন। সেই কারণে ইন্দ্র দিবা ও রাত্রের সংযোগস্থলে, অর্থাৎ গোধূলি সময়ে এবং জলের ফেনা যা' শুষ্ক বা আর্দ্র নয়—এই দুইয়ের সাহায্যে নমুচির মস্তক ছিন্ন করেন। কথিত আছে—নমুচির ছিন্ন মস্তক "তুই পাপাত্মা, বন্ধুর মস্তক ছিন্ন করলি",এই বলে ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হলে ইন্দ্র ভীত হয়ে ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্র অরুণা নদীতে স্নান করে পাপমুক্ত হয়ে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও অরুণার জলে স্নান করে অক্ষয়লোক লাভ করে (মহাভারত - শল্য)।

নরক—(১) মৃত্যুর পর যে স্থানে গিয়ে পাপভোগ করতে হয়। সকল ধর্মশাস্ত্রেই অল্পবিস্তর নরকের প্রসঙ্গ দেখা যায়। অধর্মই নরকের একমাত্র হেতু বলে কথিত হয়েছে। চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিকেরা স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, দেহ ভস্ম হলে স্বর্গ-নরকভোগ অসম্ভব। ভাগবতে আছে—এই ভূমণ্ডলের দক্ষিণ দিকে ভূমির নীচে ও জলের উপরে যম মৃত লোকদের আনয়ন করে তাদের কর্মানুসারে দোষ-গুণের বিচার করেন। এই স্থানে নরকসকল আছে। এই নরকের সংখ্যা একুশটি। যতদিন পাপভোগ শেষ না হয়, ততদিন পাপীরা তারতম্যানুসারে ঐ সকল নরকে পতিত হয়ে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করে। একুশটি নরকের নাম—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তকূর্মী, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণবোন, বিশসন, লালভক্ষ, সারমেয়াদর্ন, অবীচী ও অয়ঃপান।

(২) অসুরবিশেষ এবং পৃথিবীর পুত্র। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণমতে এই অসুর অদিতির কর্ণকুণ্ডল চুরি করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে রেখে দেয়; কিন্তু দেবতাদের অনুরোধে কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে অসুরদের হত্যা করে ঐ কর্ণকুণ্ডল উদ্ধার করেন। হরিবংশে দেখা যায়—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক দেবতাদের পরম শত্রু ছিলেন। তিনি একবার এক হাতীর রূপ ধারণ করে বিশ্বকর্মার কন্যাকে অপহরণ করেনএবং তাঁর সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে তিনি গন্ধর্ব, মানুষ ও দেবতাদের কন্যাদের এবং অপ্সরাদের ধরে এনে এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। এই ধৃতা নারীদের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। তিনি এদের সমস্ত অলঙ্কার বস্ত্র ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ করেন। কথিত আছে—এই দুর্দান্ত অসুর আর জন্মগ্রহণ করে নাই।

নর-নারায়ণ—দুইজন প্রাচীন ঋষি, ধর্ম ও অহিংসার পুত্র। এঁরা অতি দুর্গম পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন। দুই জনই অমিততেজা ছিলেন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে এঁদের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্রদ্বারা নানাপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য না হয়ে অপ্সরাদের পাঠিয়ে দুই জনকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করলেন। নর-নারায়ণ এতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে নিজেদের তপোবল দেখাবেন বলে ঠিক করলেন। নারায়ণ একটি ফুল নিয়ে নিজের উরুর উপর স্থাপন করামাত্র একটি সুন্দরী অপ্সরা বেরিয়ে এল। এর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরারা লজ্জায় ও দুঃখে স্বর্গে ফিরে গেল। ঋষির উরু থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এর নাম হল উর্বশী। দেবতাদের সম্মুখে এইরূপে এই অপ্সরার সৃষ্টিতে ইন্দ্রাদি দেবগণের গর্ব খর্ব হল। পরে নারায়ণ ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরাদের পরিচর্যার জন্য কয়েক সহস্র সুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন। অপ্সরারা এই ব্যাপারে বিস্মিত হলে নারায়ণ তাদের উর্বশীকে নিয়ে ইন্দ্রের কাছে ফিরে যেতে বললেন। প্রথমে নানা অনুনয়-বিনয় করে নারায়ণের সান্নিধ্য প্রার্থনা করলেও অপ্সরারা প্রত্যাখ্যাতা হন। এই নর ও নারায়ণ দ্বাপরের শেষভাগে অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন (বামনপুরাণ)।

(২) শরভরূপী মহাদেব দন্তাঘাতে নরসিংহকে দ্বিধাবিভক্ত করেন। নররূপ দেহার্ধ হতে মহাতপা মুনিরূপধারী নর আর সিংহরূপ দেহার্ধ হতে মহাতপা নারায়ণ নামক জনার্দন উৎপন্ন হন (কালিকাপুরাণ)।

নরমেধ—এই যজ্ঞে পুরুষবধ হয় বলে এর নাম নরমেধ। শুক্লযজুর্বেদের ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে দেখা যায়—ব্রাহ্মণ

ও ক্ষত্রিয়, এই দুই বর্ণ অতিষ্ঠা কামনা করে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন (সকল ভূত অতিক্রম করে অবস্থানের নাম অতিষ্ঠা)। ৪০ দিনে এই যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র ও যযাতি এই যজ্ঞ করেছিলেন।

নরসিংহ—বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু অর্ধনর ও অর্ধসিংহ-রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। ব্রহ্মার বরে অসুররাজ হিরণ্যকশিপু ঘোর অত্যাচারী ও গর্বিত হয়ে দেবতাদের নানাপ্রকার অপমান করতে আরম্ভ করেন। তিনি দেব অসুর ও গন্ধর্বদের অবধ্য ছিলেন। ব্রহ্মার বরের জন্য মুনিরা এঁকে অভিশাপ দিতে পারতেন না। এঁর চার পুত্র। তার মধ্যে প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড ও অমার্ক দৈত্যপুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্রদের বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্য সভায় আহ্বান করলেন। জিজ্ঞাসিত হলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণ বর্ণনা করলেন। নিজের ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করার জন্য হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। পুত্রের মুখে শত্রুর প্রশংসা শুনে প্রহ্লাদকে তিনি খুব তিরস্কার করলেন। ক্রমে প্রহ্লাদ আরো কৃষ্ণভক্ত হয়ে পড়ায় হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকারে পুত্রকে পীড়ন করতে আরম্ভ করলেন। শেষে একদিন প্রহ্লাদ পিতার সম্মুখে এলে দৈত্যরাজ প্রশ্ন করলেন, "তোমার ভগবান কোথায় আছেন?" তখন প্রহ্লাদ বিনীত হয়ে উত্তর দিলেন, "সর্বস্থানেই ঈশ্বর আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এর মধ্যে ভগবান আছেন কি না। তখন প্রহ্লাদ বিনীতভাবে আবার জানালেন যে, তিনি সর্বত্রই যখন বিদ্যমান, তখন এ স্তম্ভের মধ্যেও নিশ্চয় আছেন। এই শুনে হিরণ্যকশিপু এক পদাঘাতে সেই স্ফটিকস্তম্ভ যেমন চূর্ণ করতে গেলেন, অমনি এক নরসিংহমূর্তি ভীম গর্জন করে স্তম্ভের ভিতর হতে আবির্ভূত হয়ে, হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করে তাঁকে বধ করলেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

নল—নিষধরাজ; রাজা বীরসেনের পুত্র। বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর রূপ ও গুণের কথা শুনে নল তাঁর প্রতি আসক্ত হন। একদিন উদ্যানে ভ্রমণকালে নল একটি কনকবর্ণ হংসকে ধরেন। হংস নলকে বলে যে, তাকে না মেরে মুক্তি দিলে সে নলের প্রিয়কার্য করবে। ভীমের কন্যা দময়ন্তীর কাছে গিয়ে সে এমন ভাবে নলের গুণগান করবে যে, দময়ন্তী তাঁকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করবেন। নল হংসকে মুক্তি দিলে সে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে নলের প্রশংসা করলে, দময়ন্তী নলের

প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। দময়ন্তী নলকে স্বামীরূপে পাবার জন্যে ব্যস্ত হলে, তাঁর পিতা ভীম তাঁর স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করলেন।

এই স্বয়ংবর-সভায় নানা দেশের রাজগণ ও দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হলেন। পথে নলের সহিত দেবতাদের সাক্ষাৎ হলে দেবতারা নলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। নলকে পাণিপ্রার্থীরূপে দেখলে দময়ন্তী কোন দেবতাকেই বরণ করতে চাইবে না জেনে, নিজেদের দূতরূপে দেবতারা নলকে দময়ন্তীর কাছে পাঠালেন। তাঁদের আদেশে নল দময়ন্তীকে সংবাদ দিলেন যে, স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত চার দেবতাদের মধ্য হতেই দময়ন্তীকে পতিনির্বাচন করতে হবে। দময়ন্তী নলকে জানালেন যে, তাঁকে পাবার জন্যই তিনি স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করেছেন। কোন দেবতাকেই তিনি পতিরূপে চান না। এই সংবাদ নল দেবতাদের জ্ঞাপন করলে, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বয়ংবর-সভায় নলের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হন। দময়ন্তী তখন করুণভাবে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন মানুষ নলকেই পতিত্বে বরণ করতে পারেন। তখন দেবগণ তাঁদের দেবচিহ্ন ধারণ করায় দময়ন্তীর নলকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। দময়ন্তী তাঁকেই বরণ করলেন। দেবগণ এতে তুষ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন যে, যজ্ঞকালে নল তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন; অগ্নি বললেন যে, নলের ইচ্ছামাত্রই তিনি আবির্ভূত হবেন; বরুণ বললেন যে, প্রার্থনামাত্রেই নল জল পাবেন; এবং যম বললেন যে, নলের প্রস্তুত যে কোন খাদ্যই সুস্বাদু হবে।

নল ও দময়ন্তী বিবাহান্তে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তাঁদের ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা হয়।

কলি ও দ্বাপর দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেননি। ইন্দ্রাদি দেবগণের কাছে দময়ন্তীর নলকে পতিত্বে বরণ করার সংবাদ শুনে তাঁরা নলের সর্বনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কলি নলের দেহে প্রবেশের ছিদ্র খুঁজতে থাকেন ও দ্বাপরকে অক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে বলেন। নল একদিন মূত্রত্যাগের পর পদপ্রক্ষালন না করে সন্ধ্যা করতে বসায়, সেই ছিদ্রে কলি নলের দেহে প্রবেশ করেন এবং নলের ভ্রাতা পুষ্করকে দ্যূতক্রীড়ায় নলের রাজ্য অপহরণ করতে পরামর্শ দেন। পুষ্করের আহ্বানে নল দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারান। তখন দময়ন্তী সারথি বার্ষ্ণেয়কে দিয়ে পুত্রকন্যাদের তাঁর পিতা ভীমের নিকট পাঠিয়ে দেন। পুষ্কর দময়ন্তীকে পণ রাখতে বলায়, নল কিছু না বলে এক

বস্ত্রে দময়ন্তীকে নিয়ে রাজ্যত্যাগ করেন। একদিন ক্ষুধার্ত নল কতকগুলি স্বর্ণবর্ণ পাখী দেখে পরিধেয় বস্ত্র খুলে চাপা দিয়ে তাদের ধরতে যেতেই তারা বস্ত্রসহ উড়ে গিয়ে বলে যে, যা' নিয়ে নল দ্যূতক্রীড়া করেছিলেন, তারাই সেই পাশা। তখন নল দময়ন্তীকে পিতৃগৃহে চলে যেতে বলায় দময়ন্তী অস্বীকার করেন ও উভয়ে একই বস্ত্র পরিধান করে চলতে থাকেন। একদিন পথিকদের এক বিশ্রামস্থানে দময়ন্তী নিদ্রিত হয়ে পড়লে, কলির দুষ্টপ্রভাবে নিকটে পতিত একখানি খড়্গের সাহায্যে নল বস্ত্রার্ধ কেটে নিয়ে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। নিদ্রাভঙ্গের পর দময়ন্তী নলকে না দেখতে পেয়ে, তাঁর অনুসন্ধানে বনমধ্যে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে চেদিরাজ সুবাহুর গৃহে রাণীর সৈরিন্ধ্রীরূপে আশ্রয় পান। দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল বনমধ্যে প্রজ্বলিত দাবাগ্নির মধ্য হতে নারদের শাপে স্থবিরত্ব-প্রাপ্ত কর্কোটক নাগকে উদ্ধার করে শাপমুক্ত করেন। মুক্তি পেয়ে কর্কোটক দংশন করে নলের রূপ বিকৃত করে বলে যে, নলের আত্মগোপনের সুবিধার জন্যই সে এ-কাজ করেছে। এর ফলে নলের দেহস্থ কলি কষ্ট পাবে। সে তখন নলকে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গিয়ে বাহুক নাম নিয়ে সারথ্য গ্রহণের পরামর্শ দেয় ও ঋতুপর্ণকে অশ্বহৃদয় শিখিয়ে তাঁর নিকট হতে অক্ষহৃদয় শিখে নিতে বলে। নলকে দিব্য বস্ত্রযুগল দিয়ে সে বলে যে, পূর্বরূপ ধারণ করবার ইচ্ছা হলে এই বস্ত্র পরিধান করে নল যেন কর্কোটককে স্মরণ করেন। তাঁর পরামর্শ-অনুযায়ী নল ঋতুপর্ণের আশ্রয় নিলেন। ইতিমধ্যে বিদর্ভরাজ ভীম চর-মুখে চেদিরাজ-গৃহে দময়ন্তীর সন্ধান পেয়ে তাঁকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু নলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন সময়ে পর্ণাদ নামেএক ব্রাহ্মণ দময়ন্তীকে সংবাদ দেন যে, নল ঋতুপর্ণের সারথি হয়ে বাহুক নাম গ্রহণ করে তাঁর রাজভবনে আছেন। তখন দময়ন্তী গোপনে তাঁর পুনর্বার স্বয়ংবর হওয়ার সংবাদ এক ব্রাহ্মণের হাতে ঋতুপর্ণের নিকট পাঠান। ঋতুপর্ণ এই সংবাদ পেয়ে বিদর্ভনগরে স্বয়ংবর-সভায় যাবার ব্যবস্থা করলেন। অযোধ্যা থেকে বিদর্ভে এক রাত্রির মধ্যে নিয়ে যেতে একমাত্র বাহুকই সমর্থ হলেন। পথে বাহুকরূপী নল ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে তাঁর নিকট হতে অক্ষবিদ্যা ও গণনাবিদ্যা শিখে নিলেন। সেই সময় নলের দেহস্থ কলি কর্কোটক-বিষ বমন করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। বিদর্ভনগরে উপস্থিত হয়ে স্বয়ংবরের কোন ব্যবস্থা না দেখে ঋতুপর্ণ স্তম্ভিত হলেন। বাহুকরূপী নলকে দেখে

দময়ন্তীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য দময়ন্তী তাঁর দূতীকে নিযুক্ত করে জানতে পারেন যে, বাহুকের দৃষ্টিমাত্রে জলকলস পূর্ণ হয়ে যায়, সূর্যকিরণে তৃণ ধরলেই তা' প্রজ্বলিত হয়, পুষ্প মর্দন করলে তা' অবিকৃত থেকে আরো সুগন্ধ বাহির হয়। অধিকন্তু বাহুকের রন্ধিত মাংস খেয়ে দময়ন্তী বুঝতে পারলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই নল। তখন দময়ন্তী নলের নিকট গিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। কর্কোটক-দত্ত বস্ত্র পরিধান করে নল পূর্বরূপ ফিরে পেলেন। সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় সকলে আনন্দিত হলো। ঋতুপর্ণ নলের বন্ধু হলেন। নল নিজ রাজ্যে ফিরে এসে দ্যূতক্রীড়ায় পুষ্করকে হারিয়ে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন; কিন্তু পুষ্করকে মার্জনা ও তাঁকে অর্ধরাজ্য দান করে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন (মহাভারত—বনপর্ব। কর্কোটক, কলি ও দময়ন্তী দ্রষ্টব্য)।

নলকূবর- কুবেরের পুত্র। এঁর ভ্রাতা মণিগ্রীব। একদিন স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা অভিসারিকাবেশে নলকূবরের কাছে যাবার সময় পথে রাবণ কর্তৃক বলপূর্বক ধর্ষিতা হন। রম্ভা রাবণের এই অত্যাচারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দেন যে, রাবণ কামের বশীভূত হয়ে যদি বলপূর্বক কোন নারীর সতীত্ব নাশ করতে যান, তবে সেই দিনই তাঁর মৃত্যু হবে। এই শাপের ভয়েই সীতা রাবণের অত্যাচার হতে রক্ষা পান (রামায়ণ)।

একবার ইনি ভ্রাতা মণিগ্রীবের সহিত সুরাপানে মত্ত ও বিবস্ত্র হয়ে গঙ্গাজলে রমণীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছিলেন। নারদ সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নারীরা শাপভয়ে বস্ত্র পরিধান করলো। কুবেরের মত্ত পুত্রদ্বয়কে এই অবস্থায় দেখে নারদ "স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হও" বলে এঁদের অভিশাপ দেন। সেই থেকে এই দুই ভ্রাতা ঋষিশাপে বৃন্দাবনে যমলার্জুনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে শাপমুক্ত হন (ভাগবত)।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা-উর্বশীর পুত্র আয়ু নামক রাজার পুত্র। নহুষের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যযাতি প্রসিদ্ধ। নহুষ অতি পুণ্যবান্ ও বীর্যবান্ ছিলেন এবং সাধনাদ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করেছিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েও এঁর কোন ভোগবিলাস ছিল না। একদা তুণ্ড দৈত্যকে বধ করে ইনি ত্রিলোকের প্রশংসাভাজন হন। ইনি ভোগতৃষ্ণায় নিরাসক্ত হয়ে পুণ্যকর্মে এমন আত্মনিয়োগ করেন যে, হঠাৎ গোবধ-রূপ মহাপাপ করেও ঋষিগণের কৃপায় এঁর দোষক্ষালন হয়। ইন্দ্র যখন প্রথমে ব্রহ্মহত্যা ও পরে বৃত্রাসুরকে মিথ্যাচারে বধ করে, শ্রান্ত ও অচেতন হয়ে জলমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে

অবস্থান করছিলেন, তখন দেবতা ও মহর্ষিরা তেজস্বী ও যশস্বী নহুষকে দেবরাজ করে দেন। ইনি শতসহস্র বৎসর দেবরাজ্য শাসন করেন। কিন্তু ইন্দ্রত্বলাভ করে তিনি কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে বৃহস্পতির কাছে গেলে, তিনি কৌশলে এই ব্যাপারে বাধা দিলেন। দেবতা ও ঋষিরা নহুষকে পরস্ত্রী-সংসর্গের পাপ হতে এবং শচীকে স্ত্রীরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা হতে নিবৃত্ত হতে বললেন। বৃহস্পতিও ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। এরপর ইন্দ্রের পরামর্শে শচী নহুষকে বললেন যে, ঋষি-বাহিত যানে যদি নহুষ তাঁর কাছে আসেন, তবেই তিনি নহুষের অনুগামিনী হবেন। নহুষ ঋষি-বাহিত শিবিকায় যাবার সময় ঋষিদের সহিত মন্ত্র সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ করতে আরম্ভ করলেন ও সেই সময় অগস্ত্যের মাথায় পাদস্পর্শ করলেন। এর ফলে, ক্রুদ্ধ অগস্ত্যের শাপে নহুষ অজগর সর্পরূপে বিশাখযূপ বনে পতিত হলেন। নহুষের করুণ প্রার্থনায় অগস্ত্য বললেন যে, একদিন যুধিষ্ঠির তাঁকে শাপমুক্ত করবেন।

পাণ্ডবদের বনবাসকালে মৃগয়া করতে গিয়ে ভীমসেন সর্পরূপী নহুষের কবলে পতিত হন। অজগরের বেষ্টন থেকে ভীম নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির ভীমের অন্বেষণে এই মহাকায় সর্পের কাছে এসে ভীমকে ছেড়ে দিতে বললেন। তখন অজগর বললো যে, যুধিষ্ঠির যদি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবেই ভীমকে সে ছেড়ে দেবে। তখন অজগর প্রশ্ন করলো—ব্রাহ্মণ কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। সর্পের অন্য প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির আরো বললেন যে, শূদ্রের যদি ঐ সব গুণ থাকে, তবে সে-ও ব্রাহ্মণ। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে নহুষ বললেন, "ভীম আমার কবল হতে মুক্তি পেলেন এবং আমি তোমার কৃপায় শাপমুক্ত হলাম।" এই বলে নহুষ সর্পরূপ ত্যাগ ও দিব্যরূপ ধারণ করে স্বর্গে গমন করলেন (মহাভারত—আদি, বন ও শান্তি, অনুশাসন, পদ্মপুরাণ)।

নবদুর্গা—কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী—এই নয়টি দেবী নবদুর্গা নামে খ্যাত। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করবার সময় বীরভদ্রের সঙ্গে এঁরা সেখানে গিয়েছিলেন।

নাগ—নরাকার দেবযোনি বিশেষ। পাতালে অর্থাৎ নাগলোকে এদের বাসস্থান। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করবার সঙ্গে সঙ্গে কশ্যপের জন্ম হয়। এঁর কদ্রু নামে এক স্ত্রী ছিল। এই কদ্রুর গর্ভে কয়েকজন পরাক্রান্ত পুত্রের জন্ম

হয়। এদের নাম—অনন্ত, বাসুকি, কম্বল, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক ও অপরাজিত। এরাই কশ্যপের বংশধর নাগ নামে অভিহিত। এদের পুত্র-পৌত্রাদিতে ক্রমে সমস্ত পৃথিবী নাগ-পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই সর্পরা অতি কুটিল ও বিষপূর্ণ ছিল। যখন এই নাগদের বিষের প্রভাবে প্রজাসকল ক্ষয় হতে লাগল, তখন তারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তাদের রক্ষা করতে বললো। ব্রহ্মা তখন বাসুকি প্রভৃতি নাগদের ডেকে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন যে, নাগবংশ কল্পান্তরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। নাগেরা এই শাপ শুনে ভয় পেয়ে ব্রহ্মার স্তব করতে লাগলো। তারা ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলো—কুটিল ও বিষপূর্ণ করে আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন; আপনি এখন আমাদের জন্য পৃথক স্থান নির্দেশ করুন। তখন ব্রহ্মা নাগদের পাতাল, বিতল ও সুতল—এই তিন লোকে অবস্থানের আদেশ দিলেন। ব্রহ্মা আরো বললেন যে, যে সব মানুষ কালপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের নাগেরা ভক্ষণ করতে পারবে ও যারা মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি ধারণ করে, তাদের নাগেরা স্পর্শ করতে পারবে না (বরাহপুরাণ)।

নাগপাশ—বরুণের অস্ত্র। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রের নিকট এই অস্ত্রলাভ করেছিলেন।

নাগলোক—পাতাল; যেখানে নাগেরা বাস করে।

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে অভিলাষী হয়ে প্রথমে মরীচি, অত্রি, দক্ষ প্রভৃতিকে ও পরে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, নারদ ও রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করেন (হরিবংশ)। ইনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকজ্ঞ, বেদজ্ঞ তপস্বী। নার শব্দের অর্থ জল; সর্বদা তর্পণের জন্য ইনি জলদান করতেন বলে এঁর নাম হয় নারদ। ভাগবতে নারদ সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে—পূর্বজন্মে ইনি ব্রাহ্মণদের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতার আদেশে ইনি যোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। একবার এই যোগীদের আজ্ঞায় তাঁদের উচ্ছিষ্ট অন্ন আহার করায় নারদের পাপমোচন হয়। এর পর থেকে তাঁর চিত্তশুদ্ধি ও ধর্মে মতি হয়। এমন সময় একদিন পথিমধ্যে সর্পাঘাতে এঁর মাতার মৃত্যু ঘটে। তখন সমস্ত ত্যাগ করে ইনি বনমধ্যে প্রবেশ করেন ও পরমাত্মার চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই সময় তাঁর হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েই অদৃশ্য হয়ে যান। নারদের ব্যাকুলতায়ও তিনি আর একবারও আসেন না; কিন্তু বলেন যে, নারদের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই তিনি একবার মাত্র এসেছিলেন। সাধুদের সেবা

করে বুদ্ধি দৃঢ় করলে নারদ ভগবানের পার্শ্বচর হতে পারবেন। তখন নারদ ভগবৎ-চিন্তায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন। এমন সময় নারদের মৃত্যু হয় এবং তিনি ভগবানের সঙ্গে লীন হয়ে যান। তারপর কল্পাবসানে যখন ভগবান বিষ্ণু সমুদ্রজলে শয়ন করে ছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসযোগে নারদ তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেন। যুগ-সহস্রের পর প্রলয়ের অবসান হলে, ভগবান যখন নিদ্রা থেকে উঠে পুনর্বার সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁব ইন্দ্রিয় হতে মরীচি, অত্রি প্রভৃতি ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেন; নারদও তখন জন্মগ্রহণ করেন। সেই হতে নারদ দেবদত্ত বীণায় হরিগান করে সর্বত্র ভ্রমণ করে বেড়ান।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁর অন্যান্য মানসপুত্রদের সঙ্গে নারদকে সৃষ্টিকার্যের ভার দেন; কিন্তু নারদ দেখলেন যে, সৃষ্টিকার্য নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে ঈশ্বরের চিন্তায় তাঁর বাধা পড়বে। তাই তিনি ব্রহ্মার এই আদেশ পালন করতে রাজী হলেন না। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে অভিশাপ দিলেন। ব্রহ্মার শাপে নারদ গন্ধমাদন পর্বতে গন্ধর্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করে উপবর্হণ নাম গ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের ৫০টি কন্যাকে বিবাহ করেন। একদিন ব্রহ্মার সভায় অপ্সরা রম্ভার নৃত্য দেখে নারদ এত কামমোহিত হয়ে পড়েন যে, উত্তেজনায় তাঁর রেতঃপাত হয়। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে শাপ দেন। এই শাপের ফলে নারদ গন্ধর্বদেহ ত্যাগ করে নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কান্যকুব্জবাসী দ্রুমিল নামে এক গোপরাজের কলাবতী নামে এক বন্ধ্যা স্ত্রী ছিলেন। একদিন কশ্যপ নামে এক ঋষি স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে দেখে কামাতুর হয়ে রেতঃপাত করেন। কলাবতী এই রেতঃ ভক্ষণ করে গর্ভবতী হন। তখন কলাবতীর গর্ভে গন্ধর্ব উপবর্হণ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণরা এঁকে ব্রহ্মার পুত্র জেনে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। একদিন ইনি বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতে করতে ধ্যানস্থঅবস্থায় বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পেলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তি এই ভবিষ্যৎবাণী করে অদৃশ্য হয়ে যায় যে—তোমার এই দেহ নষ্ট হলে আমাকে দেখতে পাবে। যথাসময়ে বিষ্ণুকে ধ্যান করতে করতে নারদের মৃত্যু হলে, তাঁর শাপমোচন হয় ও তিনি ব্রহ্মে লীন হন। কয়েক কল্প পরে ব্রহ্মা যখন আবার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর কণ্ঠ হতে নারদ উৎপন্ন হন।

বীণা হাতে ইনি ত্রিভুবন ভ্রমণ করতেন এবং বীণা বাজিয়ে গান

করে সকলকে মোহিত করতেন। সংবাদ ও পরামর্শদান, যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাহাদি সংঘটনে এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। নানাপ্রকার বার্তাদানে, দীক্ষাদানে, দৈত্যবিনাশে সহায়তাদানে, নিয়ম-নির্দেশ ও নীতিপরামর্শদানে ইনি নিয়োজিত থাকতেন। শিবের বিবাহে ইনি ঘটক, ধ্রুবের তপস্যায় ইনি মন্ত্রদাতা। দক্ষের দর্পনাশেও নারদ ছিলেন। সঙ্গীত-অনুরাগের জন্য ইনি ব্রহ্মার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তারপর বিষ্ণুর নিকট গন্ধর্ব তুম্বুরুর গীত শ্রবণ করে নিজের সঙ্গীতজ্ঞান অসম্পূর্ণ বোধ করায়, বিষ্ণুর আদেশে উলুকেশ্বর নামে এক গন্ধর্বের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে নারদ জ্ঞানযোগ ও গীতযোগ, উপদেশামৃত শ্রবণ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে—ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। নারদ একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে বর্ণিত হয়েছেন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নারদের বাহন ঢেঁকি ; কিন্তু শাস্ত্রে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নারায়ণী সেনা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যপ্রার্থী হন ও তাঁকে নিজ নিজ পক্ষে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—তিনি দুই জনকেই সাহায্য করবেন। প্রথমে অর্জুনকে বললেন যে তাঁর নারায়ণী সেনা নামে তিন লক্ষ অক্ষৌহিণী যোদ্ধা আছে, আর আছেন তিনি নিজে, যুদ্ধে বিমুখ ও নিরস্ত্র। অর্জুন কি চান—নারায়ণী সেনা, না সচিবরূপে কৃষ্ণকে ? তখন অর্জুন কৃষ্ণকেই বরণ করে নিলেন। দুর্যোধন নিলেন সেই তিন লক্ষ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন এই সেনা ধ্বংস করেন।

নচিকেতা—ইনি রাজা বাজশ্রবার পুত্র। বাজশ্রবার অন্য নাম গৌতম। বাজশ্রবা স্বর্গে গমনের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের সমস্ত ধনরত্ন দান করেন। এই যজ্ঞের সময় নচিকেতা বালক ছিলেন। নচিকেতা যজ্ঞের বিরাট দানসামগ্রী দেখে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও যখন তিনি দেখলেন যে, পিতা বৃদ্ধ গো দান করছেন তখন তিনি পিতাকে বললেন যে, কোন ঋত্বিককে দক্ষিণাস্বরূপ নচিকেতাকে তিনি দান করুন। রাজা পুত্রের এ-কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাই পুত্র তিন বার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি আমাকে কার হাতে সমর্পণ করবেন ? পিতা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন—তোমাকে আমি যমের হাতে দান করলাম। প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য রাজা নচিকেতাকে যমের কাছে প্রেরণ

করলেন। নচিকেতা যমের প্রাসাদে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে তিন রাত্রি উপবাসে অবস্থান করলেন। যম সেই সময় ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে এসে যম দেখলেন যে, নচিকেতা তিন রাত্রি উপবাসে আছেন। তখন তিনি নচিকেতাকে বললেন—তুমি তিন দিন অনাহারে আমার গৃহে আছ; সেই জন্য তুমি আমার কাছ থেকে তিনটি বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা তখন এই তিনটি বর প্রার্থনা করলেন—(১) আমি কিরূপভাবে যমালয়ে বাস করছি, এই চিন্তায় আমার পিতা খুব ভাবিত আছেন। পিতার এই চিন্তা নিবৃত্ত হোক এবং তিনি আমার উপর পূর্বের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকুন। (২) স্বর্গলোকে যারা আগমন করবে, তারা যেন পৃথিবীবাসী জীবের মত ক্ষুৎপিপাসা, জরা, মৃত্যু ও শোকগ্রস্ত না হয়ে সুখে বাস করে। এই দুই বরই যম নচিকেতাকে দান করলেন। (৩) এইবার নচিকেতা মানুষের মৃত্যুর পর যে কেহ বলে জীবাত্মা আছে, কেহ বলে জীবাত্মা নাই—এই সন্দেহ দূর করবার জন্য যমের কাছ হতে তৃতীয় বর চাইলেন। তখন যম নানারকম ঐশ্বর্যদানের প্রলোভন দেখিয়ে নচিকেতাকে এই প্রশ্ন থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন; কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই নিবৃত্ত হলেন না। তখন যম সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন (কঠোপনিষৎ)।

মহাভারতে নচিকেতার কাহিনী এইরূপ—নচিকেতা উদ্দালক ঋষির পুত্র। একদিন উদ্দালক ভুলক্রমে নদীতীরে কুশপুষ্পাদি ফেলে এসেছিলেন। গৃহে ফিরে এসে পুত্র নচিকেতাকে তা' আনতে বললেন। নচিকেতা নদীতীরে গিয়ে দেখলেন যে, সমস্তই নদীস্রোতে ভেসে গিয়েছে। পুত্রকে রিক্তহস্তে ফিরে আসতে দেখে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, "তুমি এখনই যম-দর্শন কর।" এই অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করামাত্র নচিকেতা মৃত অবস্থায় ভূপতিত হলেন। তখন উদ্দালক পুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতে বিলাপ করতে লাগলেন। একদিন ও একরাত্রি নাচিকেতার শব কুশাসনের উপরেই পড়ে রইল। পরদিন প্রভাতে হঠাৎ শবদেহে প্রাণসঞ্চার হতে দেখে উদ্দালক পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন—তুমি নিজের প্রভাবে দেবলোক দর্শন করেছ, তোমার দেহ মানবদেহ নয়। নচিকেতা পিতাকে জানালেন যে, পিতৃশাপে দেহত্যাগ করে যমরাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তিনি যমরাজকে দেখলেন এবং কোথায় তাঁকে যেতে হবে এই বিষয়ে তিনি যমরাজকে প্রশ্ন করলেন। যমরাজ বললেন—তোমার পিতা

তোমার 'যম-দর্শন হোক' বলে শাপ দিয়েছিলেন ; তোমার যম-দর্শন হয়েছে, এবার তুমি গৃহে ফিরে যাও। তবে তুমি আমার অতিথি ; তুমি যদি কিছু প্রার্থনা কর, তা' আমি পূর্ণ করবো। নচিকেতা তখন যমের কাছে পুণ্যোপার্জিত উৎকৃষ্ট লোকসকল দেখতে চাইলেন। যমের আদেশে দিব্যরথে আরোহণ করে নচিকেতা পুণ্যলোকের সমস্ত স্থান দেখে ফিরে এলেন। তিনি দেখলেন যে, যত রকম পুণ্যস্থান আছে, তার মধ্যে ধেনুদানকারীরাই সব চেয়ে পুণ্যস্থান লাভ করে। তাই যম নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন যে গোদানই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ (মহাভারত—অনুশাসন)।

নায়িকা—ভগবতী দুর্গার শক্তি। দুর্গার আটটি শক্তির নাম অষ্টনায়িকা—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা ও চণ্ডবতী।

নিকষা—সুমালী রাক্ষসের কন্যা ও মহর্ষি বিশ্রবার স্ত্রী। এর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করে।

নিকুম্ভ—(১) রাক্ষসবিশেষ। কুম্ভকর্ণের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী বজ্রজ্বালার গর্ভে নিকুম্ভ রাক্ষসের জন্ম হয়। এর ভ্রাতার নাম কুম্ভ। এই রাক্ষস রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

(২) একজন অসুর। হরিবংশ-অনুসারে এই অসুর ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বর পায় যে, কেবলমাত্র বিষ্ণুহস্তে এর মৃত্যু হবে। ইন্দ্রজাল-শক্তি থাকাতে সে নানা প্রকার আকার ধারণ করতে পারতো। শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু ব্রহ্মদত্তের কন্যাদের এই অসুর হরণ করে। এই অসুর নানা প্রকার আকার ধারণ করে ব্রহ্মদত্তকে আক্রমণ করে এবং তাঁকে যুদ্ধে নিহত করে। কিন্তু অবশেষে সে কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কাপুরীতে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থানস্বরূপ উপবন। ইন্দ্রজিৎ এখানে যজ্ঞ করে যুদ্ধে যেতেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন।

নিবাতকবচ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামে তপস্যাপরায়ণ দানবেরা জন্মগ্রহণ করে। অর্জুন এদের বধ করেন (হরিবংশ)। (২) মহাভারতমতে অভেদ্য কবচযুক্ত রসাতলবাসী দৈত্যগণ। প্রায় তিন কোটি দানব নিবাতকবচ নামে খ্যাত। তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এরা নিরাপদে সমুদ্রমধ্যে বাস করবার এবং দেবগণের অবধ্য হবার বর পায়। দেবগণের অবধ্য হয়ে এরা দেবতাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতে থাকে। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় অর্জুন ইন্দ্রের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্বর্গে যান। স্বর্গে দেবতা, যক্ষ ও

গন্ধর্বদের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে, অর্জুন গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে ইন্দ্র এঁর উপর নিবাতকবচদের বিনাশের ভার দেন। অর্জুন মাতলি-চালিত রথে আরোহণ করে ভীষণ যুদ্ধে এদের বিনাশ করেন (মহাভারত—বনপর্ব)। (৩) বিষ্ণু নিবাতকবচ নামে দৈত্যদের বিনাশ করেন (রামায়ণ—লঙ্কা)।

নিধি—কুবেরের নয় রত্নবিশেষ। এই নয়টি নিধির নাম—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, খর্ব ও নীল।

নিমি—সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম নিমি। ইনি হিমালয়ের নিকট বৈজয়ন্ত নগরে রাজত্ব করতেন। একবার ইনি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করে প্রথমে বশিষ্ঠকে ও পরে গৌতম, অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে আমন্ত্রণ করে যাজকত্বে বরণ করলেন; কিন্তু বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞের ব্রতী হয়েছেন, তাই তিনি নিমিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু নিমি অপেক্ষা না করে গৌতমের উপর যজ্ঞের ভার দিলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞে এসে গৌতমকে হোম করতে দেখে নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রিত নিমিকে শাপ দিলেন যে, তাঁর দেহ চেতনা-বিলীন হবে। নিমিও তখন জেগে উঠে বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিলেন যে, সুপ্তকে অভিশাপ দেবার ফলে তাঁরও মৃত্যু হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বহুকাল অবিকৃত থাকবে। পরস্পরের শাপের ফলে নিমি ও বশিষ্ঠ দুই জনেই দেহত্যাগ করে বায়বীয় দেহ পেলেন। নিমির এই শাপের ফলে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হলো। তারপর একদিন উর্বশীকে দেখে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হয়; এর ফলে সেই বীর্য হতে বশিষ্ঠ অন্য দেহ লাভ করেন।

নিমির মৃত্যুর পর তাঁর দেহ তেল ও গন্ধাদির দ্বারা সযত্নে রক্ষা করে ঋষিরা যজ্ঞ করতে লাগলেন। এতে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে, নিমির দেহে চেতনা দান করা হবে; তখন নিমি উত্তর দিলেন যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হওয়ার চেয়ে বেশী দুঃখ আর কিছুই নাই। এইজন্য তিনি আর শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু সকল লোকের নেত্রে তিনি বাস করতে ইচ্ছা করেন। দেবতারা তখন বর দিলেন—নিমি সর্বভূতের নেত্রে বিরাজ করবেন। এর ফলে সকলের চক্ষু বিশ্রামের জন্য বারংবার উন্মেষ ও নিমেষপ্রাপ্ত হবে। রামায়ণে কথিত আছে—নিমি দেবতাদের বরে বায়ুভূত হয়ে প্রাণি-সমূহের নেত্রে বাস করেন, সেইজন্য মানবের নিমেষ হয়ে থাকে। তারপর

ঋষিরা নিমির কোন পুত্র না থাকায় তাঁর দেহ অরণিতে মন্থন করতে লাগলেন। এর ফলে মহাতপা মিথির জন্ম হলো। মন্থনের ফলে জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম হল মিথি। মৃতদেহ হতে জন্ম হওয়ায় তাঁর অন্য নাম হল জনক। বিদেহ (সচেতন দেহ) থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর অন্য নাম হলো বৈদেহ (বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণ)।

নিরুক্ত—বৈদিক অভিধান। নিরুক্ততে বেদের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও তার অর্থ আছে। কঠিন বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগ দেখানই নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহা যাস্ক কর্তৃক লিখিত। যাস্ক-প্রণীত নিরুক্তেরই এখনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইনি পাণিনির পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতানুসারে যাস্ক খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থকার। পূর্বে অনেকগুলি নিরুক্ত ছিল। যাস্কের পূর্বে ১৭ জন নিরুক্তকারের নাম পাওয়া যায়। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে শব্দশাস্ত্রের সাধারণ বিষয়গুলি উল্লিখিত আছে। ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে একার্থবোধক শব্দগুলির নির্ঘণ্ট এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দুরূহ শব্দগুলির অর্থ দেওয়া আছে। ৭ম হতে ১২শ অধ্যায়কে শেষ ছয় অধ্যায় বলে—এর নাম দৈবতকাণ্ড। ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায় নিরুক্তের পরিশিষ্ট। যাস্ক শব্দগুলির মূলজ ধাতুগত অর্থ গ্রহণ করে তারই সাহায্যে বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন।

নিশুম্ভ—এই দানব কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শুম্ভ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নমুচি। এরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। স্বর্গ অধিকার করতে গিয়ে নমুচি ইন্দ্রের হাতে নিহত হয়। কনিষ্ঠের মৃত্যুতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ ক্রুদ্ধ হয়ে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। দেবতাদের বিতাড়িত করে তারা স্বর্গ অধিকার করে ও দেবতাদের পৃথিবীতে নির্বাসিত করে। এর পর মহিষাসুরের মন্ত্রী রক্তবীজের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ হলে এরা জানতে পারে যে, বিন্ধ্যপর্বতে কৌশিকী দেবীর হস্তে মহিষাসুর নিহত হয়েছে এবং সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড প্রাণভয়ে জলমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শুম্ভ এবং নিশুম্ভ মহিষাসুরের এই মৃত্যুকাহিনী শুনে, কৌশিকীকে বিনাশ করতে সঙ্কল্প করে চণ্ড ও মুণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা এক দূতমুখে বিন্ধ্যপর্বতে দেবীর কাছে বলে পাঠায় যে, শুম্ভ-নিশুম্ভ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। দেবীও ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বিবাহ করুন। দেবী দূতকে বললেন যে, যে ব্যক্তি তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করবে, তাকেই তিনি বিবাহ করবেন।

দেবীর এই কথা শুনে তাঁকে ধরে আনবার জন্য ধূম্রলোচনকে পাঠানো হলো। দেবীর হাতে ধূম্রলোচনের মৃত্যু হলে চণ্ড ও মুণ্ডকে পাঠানো হয়। এরাও দেবীর হাতে নিহত হলো। চণ্ড ও মুণ্ডের বিনাশের পর ত্রিশ কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে রক্তবীজ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাত্রা করে। রক্তবীজ দেবীর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে নিযুক্ত হয়। এর এক এক বিন্দু রক্ত হতে এক একটি দানবের সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু দেবী সসৈন্য রক্তবীজকে পরাস্ত করেন। তারপর প্রথমে নিশুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়ে দেবীকে তাকে বিবাহ করতে বললে। দেবী বললেন যে, তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করলে তিনি বিবাহ করতে রাজী আছেন। দেবীর সহিত নিশুম্ভের যুদ্ধ আরম্ভ হলে তাতে নিশুম্ভ নিহত হয়। পরে শুম্ভও দেবীর হস্তে নিহত হয়। তখন ইন্দ্র আবার স্বর্গরাজ্যে ফিরে গিয়ে সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন (বামনপুরাণ)।

নিষাদ—(১) অনার্য জাতি। কোশল রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে এদের রাজ্য। শৃঙ্গবেরপুর এদের রাজধানী ও রামসখা গুহক এদের রাজা ছিলেন। নিষাদরাজ মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার নিয়ে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (রামায়ণ)। (২) রাজা বেণের শরীর হতে উদ্ভূত জাতিবিশেষ। অগ্নিপুরাণে দেখা যায়—রাজা বেণের উরু মথিত হতে থাকলে এক কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতি পুরুষের জন্ম হয়। এই পুরুষ জন্মমাত্র ভীত অবস্থায় কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে থাকে। তখন সকলে একে বলে 'নিষীদ' অর্থাৎ উপবেশন কর। সেই হতে এই পুরুষ নিষাদ-বংশের সৃষ্টিকর্তা হয়। মনুসংহিতায় দেখা যায়—এই জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

নীল—বানরবিশেষ। কথিত আছে, নীল অগ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি সুগ্রীবের সখা ছিলেন। বহু সহস্র বানরসহ ইনি সীতা-অন্বেষণে গমন করেন। সেতু-বন্ধনের সময় এই বানর রামকে সাহায্য করে (রামায়ণ)। (২) মাহিষ্মতী নগরীর রাজা। অগ্নিদেব এঁর পরমাসুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁকে বিবাহ করেন। অগ্নি নীলকে বর দেন যে, যিনি মাহিষ্মতী নগরী অবরোধ করবেন, তিনি দগ্ধ হবেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে সহদেব মাহিষ্মতী নগরী অবরোধ করলে অগ্নি সহদেবের সৈন্যদল বেষ্টন করেন। সহদেব বহু স্তুতিদ্বারা অগ্নিকে তুষ্ট করেন। অগ্নির মধ্যস্থতায় সহদেব নীলরাজার নিকট হতে কর গ্রহণ করে ফিরে যান (মহাভারত—সভা)। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নীল পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করে যুদ্ধ করেন এবং অশ্বত্থামার শরে নিহত হন (মহাভারত—দ্রোণ)।

নীলকণ্ঠ—পুরাকালে দেবতা ও অসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হলে, দেবতারা দিন দিন শক্তিহীন হতে লাগলেন; শেষে অসুরদের হাতে স্বর্গরাজ্য যাবার উপক্রম হলো। তখন দেবতারা প্রথমে ব্রহ্মা ও পরে বিষ্ণুর কাছে উপদেশ নিতে গেলেন। বিষ্ণু বললেন যে, অসুরদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে সমুদ্রমন্থন করতে হবে। মন্দরপর্বত হবে মন্থনদণ্ড, সর্পরাজ বাসুকি হবে মন্থনের রজ্জু। সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠবে, তা'পান করলে দেবতারা অমর হবে। অমৃতপানের আগে দেবতাদের মানুষের মত মৃত্যু হতো। সমুদ্রমন্থনকার্যে অসুরদের সাহায্য দরকার ছিল; কারণ, দেবতাদের চেয়ে তারা বেশী শক্তিশালী ও পরিশ্রমী ছিল। ইন্দ্র অসুরদের কাছে এ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলে অসুররাজ বলি এতে রাজী হলো; কিন্তু তারা অমৃতের অংশ দাবী করলো। ইন্দ্র অংশ দিতে রাজী হলে মন্থনকার্য আরম্ভ হলো। বিষ্ণুর উপদেশে প্রথমে সমুদ্রের উপরে ওষধি গাছ-গাছড়া ছড়িয়ে দেওয়া হলো। মন্থনকার্যে বিঘ্ন হওয়াতে বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করে মন্থনদণ্ডরূপ মন্দরপর্বতকে ভাসমান রেখে দিলেন। মন্থন করতে করতে সমুদ্রজল ও গাছগাছড়া মিশ্রিত হয়ে একপ্রকার ভীষণ বিষ উৎপন্ন হলো। এই বিষের জন্য অনেক দেবতা ও অসুর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন সকলেই মহাদেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পৃথিবীকে রক্ষা করবারজন্য অজর, অমর মহাদেব এই বিষ পান করে সকলকে রক্ষা করলেন; কিন্তু এই বিষের ক্রিয়ায় তাঁর গলা নীলবর্ণে পরিণত হলো। এই জন্য মহাদেবকে নীলকণ্ঠ বলা হয় (মহাভারত)।

নীললোহিত—শিব; যার কণ্ঠ নীলবর্ণ এবং জটাজাল লোহিতবর্ণ; বা যিনি এক কল্পে নীলবর্ণ ও অপর কল্পে লোহিতবর্ণ।

নৃগ—একজন ব্রাহ্মণভক্ত প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি সব সময়ে যজ্ঞ ও নানারূপ সংকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। কোন সময়ে পুষ্করতীর্থে ইনি ব্রাহ্মণদের এক কোটি গাভী দান করেন। তার মধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী সেই গাভী সকলের সঙ্গে প্রদত্ত হয়ে যায়। যার গাভী হারিয়েছিল, সেই ব্রাহ্মণ খুঁজতে খুঁজতে এক পণ্ডিতের গৃহে গাভীটি দেখতে পায়। কিন্তু যে এই গাভীকে পালন করছিল, সে নৃগের কাছ থেকে পেয়েছে বলে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলো। এই বিবাদ মেটাবার জন্য উভয়েই রাজা নৃগের কাছে গেল। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিন অপেক্ষা করেও তারা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পেল না; তখন উভয়েই রাজাকে কৃকলাস হবার অভিশাপ দিলো। কৃকলাস হয়ে

রাজাকে বহু বৎসর গর্তমধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকতে হবে। পরে বিষ্ণু মনুষ্যমূর্তি ধারণ করে মর্ত্যে এলে তাঁর মুক্তিলাভ হবে (রামায়ণ)।

নৈমিষারণ্য—গোমতী নদীর নিকটবর্তী ঋষি ও মহর্ষিদের পবিত্র স্থান। গৌরমুখ মুনি এখানে নিমেষকালমধ্যে অসুর-সৈন্য ভস্মীভূত করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য। এই অরণ্যে সমবেত ঋষির সম্মুখে সৌতি মহাভারত পাঠ করেছিলেন।

পঞ্চকন্যা—অহল্যা, দ্রৌপদী কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—এঁদের স্মরণ করলে মহাপাতক নাশ হয়। এইজন্য এঁদের নাম পঞ্চকন্যা (এঁদের স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত অন্য স্থানে দেখুন)।

পঞ্চজন—(১) অসুরবিশেষ। এ হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও সংহ্লাদের পুত্র। এই অসুর শঙ্খরূপ ধারণ করে প্রভাসে মহাসমুদ্রে বাস করতো। কৃষ্ণের গুরু সন্দীপনি মুনির পুত্র প্রভাসতীর্থে স্নান করতে গেলে এই অসুর এঁকে হরণ করে। গুরুর আদেশ-অনুসারে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য কৃষ্ণ অসুরকে বিনাশ করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন এবং তাঁর কাছ থেকে পাঞ্চজন্য নামে একটি শঙ্খ লাভ করেন। এই শঙ্খ দেবতা ও মানুষের মধ্যে পাঞ্চজন্য নামে বিখ্যাত হয় (হরিবংশ)।

(২) রাজা সগরের অন্যতমা স্ত্রী কেশিনীর গর্ভে পঞ্চজনের জন্ম হয়। সগরপুত্রেরা কপিলের শাপে ভস্মীভূত হন। মাত্র বর্হকেতু, সুকেতু, পঞ্চজন ও ধর্মরথ নামে চার পুত্র জীবিত ছিলেন। সগরের মৃত্যুর পর পঞ্চজন রাজা হন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ।

পঞ্চবটী—গোদাবরী নদীর উৎসস্থানের নিকট এক রমণীয় অরণ্য। এস্থলে রাম নির্বাসনের কয়েক বৎসর আশ্রম নির্মাণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বসবাস করেন। এইপঞ্চবটীবন থেকেই সীতা অপহৃতা হন। এখানেই লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা কর্তন করেন। অশ্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী—এই পাঁচটি পবিত্র বৃক্ষের সমন্বয়স্থান বলে এই বন পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত। বর্তমান নাসিক সহর পঞ্চবটী নামে কথিত ছিল, কারণ লক্ষ্মণ এখানে শূর্পণখার নাসিকা কর্তন করেন।

পঞ্চবৃক্ষ—স্বর্গের পাঁচটি বৃক্ষের নাম—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন।

পঞ্চানন—যার পাঁচটি মুখ আছে; শিবকে 'পঞ্চানন' বলা হয়।

পঞ্চলক্ষণা—পুরাণের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ—এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত না হলে পুরাণ হয় না। এই পঞ্চলক্ষণ হচ্ছে—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।

পঞ্চশিখ—ইনি বিখ্যাত দার্শনিক এবং আসুরির শিষ্য। আসুরি সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিলের শিষ্য। পঞ্চশিখ সাংখ্যদর্শনের মতবাদ সমগ্র ভারতে প্রচার করেন। আসুরির স্ত্রীর নাম কপিলা। পঞ্চশিখ পুত্রভাবে গুরু-পত্নীর স্তন্যপান করতেন বলে ইনি কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামেও অভিহিত ছিলেন।

পর্জন্য—(১)বৃষ্টির দেবতা। এঁর সম্বন্ধে অনেক মন্ত্র রচিত আছে। (২) ব্রহ্মা পর্জন্যকে সমস্ত জল বর্ষণের অধিপতি করেন। পর্জন্যের পুত্র হিরণ্যরোমাকে ব্রহ্মা উত্তর দিকের দিক্‌পালরূপে অভিসিক্ত করেন (হরিবংশ)।

পর্ণাদ—রাজা নলের অনুসন্ধানে বিদর্ভরাজ ভীষ্ম কর্তৃক নিয়োজিত জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি নলের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়ে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সভায় বাহুকরূপী নলের সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর কথা দময়ন্তীকে বলেন (মহাভারত)।

পতঞ্জলি—ইনি পাতঞ্জল দর্শন ও পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই দর্শন ও মহাভাষ্য পতঞ্জলির অসাধারণ কীর্তি। এই মহাভাষ্যে পতঞ্জলি মহামুনি কাত্যায়ন পাণিনিসূত্রের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শনার্থে যে বার্তিক (টীকাগ্রন্থ) রচনা করেন; তা' খণ্ডন করেন। এই গবেষণার ফলে পতঞ্জলির জন্মকাল স্থিরীকৃত হয়। মহাভাষ্যের স্থলবিশেষ হইতে প্রমাণিত হয় যে, পতঞ্জলি সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। অনুমান করা হয় যে, খৃষ্টজন্মের ১৫০ বৎসর পূর্বে পতঞ্জলি বিদ্যমান ছিলেন। যে সময় মুনিবর পাণিনি অঞ্জলিবদ্ধ করে তপস্যা করছিলেন, সেই সময় পতঞ্জলি সর্প-দেহধারণে স্বর্গ হতে এঁর অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে পতিত হন; সেই থেকে এঁর নাম হয় পতঞ্জলি। পাতঞ্জল দর্শন চার ভাগে বিভক্ত। যথা—যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্য-পাদ। পতঞ্জলির মতে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে সমাধিলাভ করা যায়! ঈশ্বরের উপাসনা করতে হলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক—সমস্ত ব্যাপারেই ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে। পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর নিত্য নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। অল্পতার চূড়ান্ত যেমন পরমাণু, বৃহত্ত্বের শেষ সীমা যেমন আকাশ—পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং আকাশ অপেক্ষা বৃহত্তর কোনো জিনিসের যেমন কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির অল্পতার সীমা ক্ষুদ্র জীব এবং ঐ জ্ঞানশক্তির অতিশয় পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

পদ্মা—(১) ভগবান কল্কি অবতারে বৃহদ্রথ-রাজকন্যা পদ্মাকে বিবাহ করবেন। (২) লক্ষ্মীর অন্য নাম। দেবী মনসা, পদ্মা ও পদ্মাবতী নামে পরিচিতা।

পবন—(১) সুমেরু পর্বতে বানররাজ কেশরী রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা হতে পবনরাজের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। (২) বায়ুর অন্য নাম। একবার ইনি রাজা কুশনাভের শতকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁদের সঙ্গ কামনা করেন। কিন্তু এঁরা অস্বীকৃত হলে ইনি এঁদের বিকলাঙ্গ করে দেন। পরে কম্পিল্যনগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত এই শতকন্যাদের বিবাহ করেন (রামায়ণ—আদি)।

পম্পা—রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটস্থ নদী। কখনো কখনো ইহা সরোবররূপেও বর্ণিত হয়েছে। সীতাহরণের পর দনুর (কবন্ধের) পরামর্শে রাম-লক্ষ্মণ পম্পার নিকটস্থ ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন। পম্পার পশ্চিম তীরে মতঙ্গ মুনির আশ্রম অবস্থিত ছিল। সেই আশ্রমের পরিচারিকা শবরী দীর্ঘকাল অবধি রামের দর্শনে মুক্তিলাভের জন্য সেখানে প্রতীক্ষমানা ছিলেন। রামের আগমনে তাঁর পরিচর্যা করে শবরী মুক্তিলাভ করেন (রামায়ণ)।

পরশুরাম—ইনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এবং জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র। পিতার দিক থেকে ইনি ভৃগুবংশ থেকে উদ্ভূত বলে ভার্গব নামেও পরিচিত। মাতার দিক থেকে ইনি কুশিক-বংশোদ্ভূত। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার দমন করবার জন্য এঁর জন্ম হয়।

মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক কঠোর তপস্যা করে গাধি নামক এক বিখ্যাত মহাবল পুত্র লাভ করেন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা হয়। ভৃগুপুত্র ঋচীক এই কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন। তখন গাধি বলেন যে শুল্কস্বরূপ তাঁকে এক সহস্র অশ্ব দান করলে তিনি কন্যাদান করবেন। ঋচীক বরুণের নিকট হতে এক সহস্র অশ্ব সংগ্রহ করে গাধিকে প্রদানপূর্বক তার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। একদিন মহর্ষি ভৃগু সস্ত্রীক পুত্র ঋচীক ও পুত্রবধূ সত্যবতীকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়ে বধূকে বর দিতে চান। সত্যবতী নিজের ও তাঁর মাতার জন্য পুত্র কামনা করেন। তখন ভৃগু দুই পৃথক চরু প্রস্তুত করে সত্যবতীকে দিয়ে বলেন যে, এই দুই চরু দুই জনে আহার করলে উভয়েরই পুত্র লাভ হবে। কিন্তু এই চরু-ভক্ষণে বিপর্যয় দেখা দিলো; অর্থাৎ কন্যার চরু মাতা এবং মাতার চরু কন্যা ভক্ষণ করলেন। ভৃগু দিব্যজ্ঞানে এই ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে সত্যবতীকে বললেন যে, মাতার প্ররোচনাতেই এই বিপরীত কার্য সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে সত্যবতীর পুত্র ব্রাহ্মণ হলেও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি পাবে,

আর তাঁর মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণ-বৃত্তি লাভ করবে। তখন সত্যবতী বারংবার ভৃগুর কাছে অনুনয়-বিনয় করে বললেন যে, তাঁর পুত্র যেন ক্ষত্রিয়চারী না হয়, এবং এই দোষ যেন তাঁর পৌত্রে বর্তায়। ভৃগু 'তথাস্তু' বলে সম্মতি জানান।

যথাকালে সত্যবতীর জমদগ্নি নামে এক তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে জমদগ্নি ধনুর্বেদ ও অস্ত্রবিদ্যায় যশস্বী হয়ে ওঠেন। এঁর সঙ্গে প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ হয়। রেণুকার গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে—বসু, বিশ্বাবসু, বৃহদ্ভানু, বৃহৎকণ্ব ও রাম। এই কনিষ্ঠ পুত্র রাম পরশুরাম ও বিষ্ণুর অবতার বলে বিদিত হন।

একদিন মার্তিকাবর্ত দেশের রাজা গন্ধর্ব চিত্ররথকে সস্ত্রীক জলবিহারে রত দর্শনে রেণুকা কামস্পৃহ হয়ে পড়েন। স্ত্রীর এই মানসিক বিকার সহ্য করতে না পেরে জমদগ্নি একে একে চার পুত্রকে মাতৃহত্যার জন্য আজ্ঞা দেন। পুত্ররা এতে অস্বীকৃত হলে জমদগ্নি চার পুত্রকেই পশুপক্ষীর ন্যায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবার অভিশাপ দেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পরশুরাম পিতার আদেশ শিরোধার্য করে কুঠারাঘাতে মাতার শিরশ্ছেদ করেন। তখন জমদগ্নি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বর চান যে—(১) জমদগ্নির তপঃপ্রভাবে মৃতা মাতা রেণুকা যেন আবার জীবিতা হয়ে পুত্রদের সহিত রসবাস করেন। (২) তাঁর হত্যার ঘটনা যেন তাঁর মাতার স্মৃতিতে না থাকে। (৩) যুদ্ধে যেন তিনি অজেয় হন। (৪) এই মাতৃহত্যাকাণ্ডে তাঁর যেন পাপস্পর্শ না হয়। (৫) সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি যেন জীবিত থাকেন এবং তাঁর ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান।

ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে পরশুরামের ক্রোধের সূত্রপাত এইরূপে হয়: একদা জমদগ্নির পুত্রগণ অন্যত্র গমন করলে সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়রাজা কার্ত্তবীর্য আশ্রমে এসে সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ ও আশ্রমের জিনিসপত্র বিপর্যস্ত করে প্রস্থান করেন। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা শুনে কার্ত্তবীর্যের প্রতি ধাবিত হন ও তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্রবাহু ছেদন করে তাঁকে বধ করেন। এর ফলে কার্ত্তবীর্যের পুত্রেরা আশ্রমে এসে তপোনিরত জমদগ্নিকে অতর্কিত আক্রমণে বধ করে। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতাকে নিহত দেখে প্রতিজ্ঞা করেন যে, এদের বিনাশ করে সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে তিনি ধ্বংস করবেন। তিনি একাই কার্ত্তবীর্যের পুত্র ও তাদের অনুগত ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে বিনষ্ট করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এইরূপে একুশবার তিনি

পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন ও সমন্তপঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রুধিরময় হ্রদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তর্পণ করেন। শেষে পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে তিনি ক্ষত্রিয়হত্যা হতে নিবৃত্ত হন এবং এক মহাযজ্ঞের দ্বারা মহাত্মা কশ্যপকে এই পৃথিবী দান করে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন (মহাভারত—বন, শান্তি)।

ভীষ্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। সে কারণ পরশুরাম এঁদের অস্ত্রগুরু। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ভীষ্ম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হয়ে পরশুরামের কাছে এর প্রতিকার ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন পরশুরাম ভীষ্মকে অহ্বান করে অম্বাকে গ্রহণ করবার জন্য গুরু হিসাবে আজ্ঞা দেন ; কিন্তু ভীষ্ম এই গুরু-আজ্ঞা পালন করতে অস্বীকার করায় পরশুরামের সহিত তাঁর ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বহুদিন যুদ্ধের পর পরশুরাম ভীষ্মকে পরাজিত করতে অসমর্থ হয়ে পুনরায় মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অস্ত্রলাভের জন্য বহু বর্ষ ধরে মহাদেবের তপস্যা করেন। তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব পরশুরামকে বলেন, "জগতের হিত ও আমার প্রীতির জন্য তুমি দেবতাদের শত্রু-কুলকে নিধন কর।" উত্তরে পরশুরাম দেবাদিদেব মহাদেবকে বলেন, "আমি অস্ত্র-শিক্ষাহীন, আর দানবেরা সর্বাস্ত্র-বিশারদ ও দুর্ধর্ষ।" অতঃপর তিনি মহাদেবের আজ্ঞায় বজ্রতুল্য অস্ত্রের প্রভাবে দানবদের বধ করেন। দানবদের নিহত করায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে পরশুরামকে তেজোময় পরশু অস্ত্র দান করেন।

কর্ণ যখন নীচজাতীয় বলে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভে অসমর্থ হন, তখন তিনি পরশুরামের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এক সময় পরশুরাম কর্ণের উরুতে মস্তক স্থাপনপূর্বক নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময় অর্জুনের হিতাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র এক বিরাট কীটের রূপ ধারণ করে কর্ণের উরু বিদীর্ণ করেন। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় কর্ণ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে নীরব থাকেন। নিদ্রাভঙ্গের পর শিষ্যের সহিষ্ণুতা দেখে পরশুরাম বলেন, "তুমি নিশ্চয় ব্রাহ্মণ নও। সত্য, বল, তুমি কে?" কর্ণ নিজের যথার্থ পরিচয় দিলে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন, "কপট উপায়ে তুমি আমার কাছ হতে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করেছ, সেজন্য যথাকালে এই অমোঘ অস্ত্র-প্রয়োগে তোমার বিস্মৃতি আসবে। কারণ, বেদমন্ত্রযুক্ত অস্ত্র অব্রাহ্মণের নিকট স্থায়ী ও কার্যকরী হয় না।"

রামায়ণে পরশুরাম সম্বন্ধে নিম্ন

রূপ বৃত্তান্ত দেখা যায়—সপ্তম অবতার দাশরথি রামের পূর্বে ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের আবির্ভাব হয়, কিন্তু দুই অবতার একই সময়ে জীবিত ছিলেন। অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের পর সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালে পরশুরাম হরধনু ভঙ্গের সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হয়ে রামের সম্মুখে এসে বলেন, "তুমি হরধনু ভঙ্গ করেছ বটে, কিন্তু আমার নিকট বৈষ্ণব ধনু আছে। এই বৈষ্ণব ধনু ভঙ্গ করে প্রকৃত বীরত্ব দেখাও। এই ধনু ভঙ্গ করতে সমর্থ হলে আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হব।" রামএই কথা শ্রবণান্তে তৎক্ষণাৎ ভার্গবের হাত হতে ধনু গ্রহণপূর্বক অনায়াসে শর-যোজন করে পরশুরামের তপস্যার্জিত সমস্ত লোক বিনষ্ট করেন। এইরূপে পরশুরামেব তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি জড়বৎ নিবীর্য হয়ে পড়েন। তখন পরশুরাম রামচন্দ্রকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করে মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরাবসু—মহর্ষি রৈভ্যের অর্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র ছিল। রৈভ্যের কাছে ভরদ্বাজ নামে তাঁর এক বন্ধু বাস করতেন। ভরদ্বাজের পুত্র যবক্রীত গভীর তপস্যা করে ইন্দ্রের নিকট হতে বেদজ্ঞান লাভ করেন। এই জ্ঞানলাভের পর যবক্রীত দাম্ভিক ও ক্ষুদ্রমনা হয়ে পড়েন এবং মহানন্দে ঋষিদের অনিষ্টসাধন করতে থাকেন। একদিন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে যবক্রীত পরাবসুর রূপবতী স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ভজনা করতে বলেন। পরাবসুব স্ত্রী ভীত হয়ে 'তাই হবে' বলে পলায়ন করেন। যবক্রীতের এই ব্যবহারে রৈভ্য ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুই লম্বমান জটা ছিন্ন করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে, এক রূপবতী নারী ও এক ভীষণাকৃতি রাক্ষসের সৃষ্টি হয়। রৈভ্য এদের যবক্রীতকে হত্যা করার আদেশ দেন। উক্ত নারী যবক্রীতের কমণ্ডলু হরণ করে এবং রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্রীতকে নিহত করে। এইরূপে পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে ভরদ্বাজ সন্ত্রস্ত ও ক্রুদ্ধ রৈভ্যকে অভিসম্পাত দেন যে, তিনি শীঘ্রই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরাবসু কর্তৃক নিহত হবেন। এই অভিশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ পুত্রের সংকার করে নিজেও অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেন।

একদা অর্বাবসু ও পরাবসু এক যজ্ঞে রাজা বৃহদ্দ্যুম্নকে সাহায্য করছিলেন। সই সময় একদিন রাত্রে পরাবসু আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে বনমধ্যে কৃষ্ণাজিনধারী পিতাকে দেখে মৃগ মনে করে আত্মরক্ষা করবার জন্য পিতাকে বধ করেন। পিতৃহত্যার পর পরাবসু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসুকে এই সংবাদ দিয়ে বলেন যে, তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর হয়ে ব্রহ্মহত্যার

জন্য এখনই প্রায়শ্চিত্ত করুন। তিনি একাকীই রাজা বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। তখন অর্বাবসু আশ্রমে গমনপূর্বক পিতার মৃত্যুজনিত প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞস্থানে ফিরে যান। তখন পরাবসু রাজাকে জানালেন যে, তাঁর ভ্রাতাই ব্রহ্মহত্যাকারী, সে কারণ তাঁকে যজ্ঞে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিলে রাজার অনিষ্ট হবে। তখন অর্বাবসু বারবার রাজাকে বললেন যে, তাঁর ভ্রাতা পরাবসুই ব্রহ্মহত্যা করেছে। প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি তাঁর ভ্রাতাকে পাপমুক্ত করেছেন। কিন্তু তথাপি রাজা অর্বাবসুকে বিতাড়িত করলেন। তখন অর্বাবসু অরণ্যে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন। উপাসনার ফলে সূর্য ও দেবতারা প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এঁদের বরে রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীত পুনর্জীবিত হলেন এবং পরাবসুর পাপ দূর হলো।

পরাশর—মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র। বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির ঔরসে ও অদৃশ্যন্তীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। পরাশর বৈদিক ঋষি। বেদের অনেক মন্ত্রের ইনি রচয়িতা। এঁর রচিত সংহিতার নাম 'পরাশর-সংহিতা'। কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা একদিন মৃগয়াকালে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথে চলছিলেন। সেই পথে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিকে আসতে দেখে রাজা কল্মাষপাদ তাঁকে পথ ছেড়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন; কিন্তু শক্তি এতে রাজী হলেন না। কারণ, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। শক্তি কিছুতেই পথ ছেড়ে সরে গেলেন না দেখে রাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। তখন শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, "তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হও।" শক্তির অভিশাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসরূপে পরিণত হলেন। রাক্ষস হয়ে তিনি প্রথমেই শক্তিকে হত্যা করে ভক্ষণ করলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় রাক্ষস কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রের সকলকেই অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করে ফেললেন। পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ দুঃখে জর্জরিত হয়ে বহু প্রকারে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলো না। অবশেষে সন্তপ্তচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পশ্চাদ্ভাগ হতে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেলেন। কে তাঁকে অনুসরণ করছে—এই প্রশ্ন করায় তিনি জানতে পারলেন যে অনুসরণকারিণী শক্তিরই বিধবা পত্নী অদৃশ্যন্তী। তাঁর গর্ভে বরো বৎসর বয়সের এক পুত্র বর্তমান আছে এবং উক্ত গর্ভস্থ পুত্রই বেদপাঠ করছিলেন। পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভক্ষণ

করতে অগ্রসর হলেন। তখন বশিষ্ঠ ভীতা পুত্রবধূকে আশ্বস্ত করে অভয় দিলেন এবং বললেন যে, ইনি রাজা কল্মাষপাদ। তারপর তিনি রাজার দেহে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করে তাঁকে শাপমুক্ত করেন এবং রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে বলেন; অতঃপর তিনি অদৃশ্যন্তীকে পুত্ররত্ন লাভের বরদান করেন।

যথাসময়ে অদৃশ্যন্তী এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন বশিষ্ঠ নিজের জীবন 'পরাশু' অর্থাৎ বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন বলে এই পুত্রের নাম হয় পরাশর। একদিন পরাশর বশিষ্ঠকে পিতা বলে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী পুত্রকে জ্ঞাপন করেন যে, তাঁর পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করেছে। তখন পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষস-বংশ বিনাশের সংকল্প করে এক রাক্ষস-সত্র যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে সকল রাক্ষস দগ্ধ হতে থাকে। তখন অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। পুলস্ত্য বললেন, "এই রাক্ষসরা তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না। তোমার পিতৃহন্তা কল্মাষপাদ এখন শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে আছেন। তোমার পিতাই শাপ দিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন।" এই কথা শ্রবণান্তে পরাশর তাঁর যজ্ঞ শেষ করেন (মহাভারত—আদি)।

পরাশর বেদের বিভাগকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা। এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎসী হয়ে জলশয়ে বাস করতো। এই মৎসী ধীবরের জালে ধৃতা হলে এর উদর হতে এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই কন্যার নাম হয় সত্যবতী এবং সে মৎসজীবীদের সঙ্গে বসবাস করতো বলে তার অপর নাম হয় মৎস্যগন্ধা। একদিন মৎস্যগন্ধা যখন যমুনায় নৌকা পারাপার করছিলেন, তখন পরাশর মুনি তীর্থ-পর্যটন করতে করতে ঐ স্থানে এসে উপস্থিত হন এবং রূপবতী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহিত হয়ে তাঁকে নদী পার করে দিতে বলেন। কিন্তু নৌকায় অবস্থানকালে পরাশর কামাতুর হয়ে মৎস্যগন্ধার কাছে তাঁর বংশরক্ষার্থে পুত্র প্রার্থনা করেন। এর উত্তরে মৎস্যগন্ধা বলেন যে, মৎস্যকুলের মধ্যে জন্ম বলে তাঁর দেহ মৎস্যের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ, সে কারণ তিনি যেন তাঁকে এই কার্য হতে নিষ্কৃতি দেন। তখন পরাশর মৎস্যগন্ধাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী যোজনগন্ধা করে দেন। নদীগর্ভে কোন অসংগত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হলে তাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাহেতু মৎস্যগন্ধা ভীতা হয়ে পরাশরকে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। পরাশর তখন চারিদিকে

কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, এবং মৎস্যগন্ধাকে বলেন, "আমার অভিলাষ পূর্ণ করায় তুমি কুমারী অবস্থাতেই থাকবে।' পরাশর অতঃপর মৎস্যগন্ধাকে আরও বহু বর প্রদান করেন। এর ফলে বিষ্ণুর অংশ হতে তাঁর এক যশস্বী পুত্র হয়। মৎস্যগন্ধা সদ্যগর্ভধারণকরতঃ আর এক পুত্র প্রসব করেন। যমুনাদ্বীপজাত এই পরাশর-পুত্রের নাম হয় দ্বৈপায়ন। ইনি জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই মাতার অনুমতি লাভ করে তপস্যার জন্য বনগমন করেন। বনগমনকালে দ্বৈপায়ন মাতাকে বলে যান যে, তাঁকে স্মরণ করামাত্রই তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হবেন (দেবীভাগবত)।

পরীক্ষিৎ—চন্দ্রবংশীয় এক রাজা। ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও সুভদ্রার পৌত্র, অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র এবং জনমেজয়ের পিতা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দ্রোণ নিহত হলে, অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধের সমাপ্তি দিবসে রাত্রির অন্ধকারে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশকরতঃ পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর সুষুপ্ত পুত্রগণকে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রাণভয়ে গঙ্গাতীরে ঋষিগণ-মধ্যে আশ্রয় নেন। সেখানে অর্জুনকে দেখে তাঁর প্রতি ব্রহ্মশির-অস্ত্র প্রয়োগ করেন। কিন্তু সে অস্ত্র প্রতিসংহার করা অশ্বত্থামার অসাধ্য হওয়ায় তা' উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। উত্তরা মৃতসন্তান প্রসব করলে, কৃষ্ণ তাঁর নিজের তেজ দ্বারা উক্ত সন্তানের জীবন দান করে। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রাকালে এঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি মাদ্রবতী নামে এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভেই জনমেজয়ের জন্ম হয় (মহাভারত)।

একদিন পরীক্ষিৎ মৃগয়াকালে এক বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণে পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শমীক নামে এক মৌনব্রতী তপস্যারত মুনির দর্শন পেয়ে তাঁকে মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। মৌনব্রতী মুনি পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুর অগ্রভাগের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত একটি মৃত সর্প শমীকের স্কন্ধে বেষ্টিত করে প্রস্থান করেন। কিন্তু মুনি এতেও মৌন এবং অক্রোধী হয়ে থাকেন। শমীকের বালকপুত্র শৃঙ্গী পিতার এই অবমাননার বিষয় জ্ঞাত হয়ে পরীক্ষিতের উদ্দেশে এই অভিসম্পাত দেন যে, তাঁর নির্দোষ পিতাকে যে এইভাবে অবমাননা করেছে, সপ্তরাত্রির মধ্যেই সে মহাবিষধর তক্ষকনাগ কর্তৃক দংশিত হবে। শৃঙ্গী তাঁর পিতাকে এই শাপের কথা জানালে তিনি বলেন, "আমার মৌনব্রতের কথা জ্ঞাত না হয়েই রাজা এইরূপ কার্য করেছেন। তাঁকে অভিশাপ দেওয়া

তোমার অনুচিত হয়েছে।" কিন্তু শৃঙ্গী বলেন যে, তাঁর এই অভিশাপ মিথ্যা হবার নয়। তখন শমীক তাঁর এক শিষ্যকে প্রেরণপূর্বক পরীক্ষিৎকে পুত্রের অভিসম্পাতের বিষয় জানিয়ে সতর্ক করে দেন, এবং একথাও জানান যে, তিনি রাজাকে ক্ষমা করলেও তাঁর পুত্রের অভিশাপ ফলবতী হবে; অতএব রাজা যেন আত্মরক্ষার জন্য যত্নবান হন। এই সংবাদ শ্রবণান্তে রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শমত একটি মাত্র স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত এক প্রাসাদ নির্মাণ করে, বিষ-চিকিৎসক কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করতে লাগলেন। সপ্তম দিবসে কাশ্যপ নামে এক বিষ-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ রাজার সাহায্যার্থ তাঁর নিকট গমন করছিলেন। সেই সময় পথিমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী তক্ষক-নাগের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তক্ষক তাঁর পরিচয় ও যাত্রার কারণ জ্ঞাত হয়ে আত্মপরিচয় দেন, এবং কাশ্যপের শক্তি পরীক্ষার্থ নিকটস্থ এক বটবৃক্ষকে দংশনে বিনষ্ট করে কাশ্যপকে তা' পুনর্জীবিত করতে বলেন। কাশ্যপের মন্ত্রবলে ভস্মীভূত বটবৃক্ষ পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। তখন বিষ-চিকিৎসকের শক্তিমত্তায় বিস্মিত তক্ষক তাঁকে বলেন যে, ব্রহ্মশাপে রাজার সমূহ আয়ুক্ষয় হয়েছে; অতএব কাশ্যপ তাঁর চিকিৎসায় সফল হবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। রাজার নিকট তিনি যে পরিমাণ ধনরত্ন আশা করেন, তক্ষক তাঁকে তদপেক্ষা অধিক ধনরত্ন দিতে সম্মত আছেন। কাশ্যপও ধ্যানে জ্ঞাত হন যে, রাজার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। অগত্যা তিনি তক্ষকের নিকট হতে মনোমত প্রচুর ধনরত্ন গ্রহণ করে প্রস্থান করেন। তক্ষকের নির্দেশমত কয়েকজন নাগ তপস্বিবেশে বহুপ্রকার ফলাদিসহ পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত ফলাদি রাজাকে উপহার দেন। তিনি সেই সব উপহার গ্রহণ করে ফলাহারের উপক্রম করলে, সেই ফলের মধ্যে একটি কৃষ্ণনয়ন তাম্রবর্ণ কীট দেখতে পেয়ে বলেন, "শৃঙ্গীর বাক্যই সত্য হোক। এই কীটই তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন করুক।" এই বলে নিজের কণ্ঠে উক্ত কীটটি স্থাপন করামাত্রই তক্ষক নিজ মূর্তি ধারণকরতঃ পরীক্ষিৎকে দংশন করে নিহত করেন।

(২) জনৈক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইনি একবার মৃগয়াকালে তৃষ্ণার্ত হয়ে সরোবর-তীরে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখে তার পাণিপ্রার্থী হন। কন্যা বিবাহের প্রস্তাব সমর্থন করে রাজাকে প্রতিশ্রুত করান যে, তিনি যদি কখনো তাকে জল দেখান, তাহলে তিনি অন্যত্র প্রস্থান করবেন। রাজধানীতে এলে মন্ত্রী রাণীর জন্য এক

উদ্যান রচনা করে দেন। উদ্যানপার্শ্বে এক পুষ্করিণীর জল মুক্তাজাল দিয়ে ঢাকা ছিল। পুষ্করিণীর পাড়ও চুনে লেপে আবৃত ছিল। একদিন রানীর সঙ্গে বিহার করতে করতে রাজা পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হয়ে রানীকে জলে অবতরণ করতে বললেন। রানী জলে নেমে আর উঠলেন না। রানী অন্বেষণে রাজা পুষ্করিণী জলশূন্য করে কেবলমাত্র এক মণ্ডুককে দেখতে পায়, ক্রোধে সমস্ত মণ্ডুককুল নিধন করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সেই জলাশয়ের মণ্ডুকরাজ তপস্বীর বেশে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অকারণ মণ্ডুকনিধনে বিরত হতে বললেন। রাজা পরীক্ষিৎ তখন বললেন যে, মণ্ডুকরা তাঁর স্ত্রীকে ভক্ষণ করেছে। উত্তরে মণ্ডুকরাজ আয়ু বললেন যে, পরীক্ষিতের স্ত্রী সুশোভনা তাঁরই কন্যা। সে খলস্বভাব, এবং এইভাবে সে বহু রাজাকে প্রতারিত করেছে। তারপর রাজার প্রার্থনায় আয়ু তাঁর কন্যাকে প্রত্যর্পণ করলেন এবং রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁর পুত্র ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী হবে। তাঁর পুত্র শল, দল ও বামদেব ব্রাহ্মণকুলের ক্ষতি করবেন (মহাভারত—বন)।

পশুপতি—পশু অর্থাৎ সমস্ত জীবের পতি। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ব্রহ্মা একটি পুত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; যার ফলে রুদ্রের জন্ম হয়। এই পুত্র কাঁদতে কাঁদতে একটি নাম প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন এঁর নাম 'রুদ্র' রাখেন। কিন্তু এই পুত্র এর পরেও সাত বার কেঁদেছিলেন বলে সাতটি নাম প্রাপ্ত হন ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। এই নামগুলি রুদ্র বা শিবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পাকশাসন—পাক নামে এক অসুরকে বিনাশ করে ইন্দ্র পাকশাসন নামে খ্যাত হন।

পাঞ্চজন্য—কৃষ্ণের শঙ্খ। পঞ্চজন নামক রাক্ষসকে হত্যা করার পর তার অস্থি হতে এই শঙ্খ নির্মিত হয়।

পাঞ্চাল—একটি দেশের নাম। পাঞ্জাবকে সাধারণতঃ এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। হস্তিনাপুরের নিকটবর্তী স্থানও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে দিল্লী থেকে উত্তর ও পশ্চিমে বিস্তৃত স্থান—হিমালয়ের পাদমূল থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা রাজা দ্রুপদের রাজ্য ছিল।

পাঞ্চালী—পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যা হিসাবে দ্রৌপদীর অন্য নাম পাঞ্চালী।

পাণ্ডু—ইনি চন্দ্রবংশীয় শান্তনুপুত্র বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। শ্বশ্রূ সত্যবতীর অনুরোধে

অম্বালিকা শয়নগৃহে প্রবেশ করে ব্যাসের মূর্তি দেখে ভীতিতে পাণ্ডুবর্ণা হয়ে যান। মাতার দোষজাত এই পুত্রের বর্ণ সে কারণ পাণ্ডুর হয় এবং ইনি পাণ্ডু নামে খ্যাত হন। ইনি বিখ্যাত ধনুর্ধর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ও কনিষ্ঠ বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভজাত বলে পাণ্ডুই রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীকে তিনি স্বয়ংবর-সভায় লাভ করেন। ভীষ্ম মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ দেন। পাণ্ডু নানা দেশ জয় করে প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করেন এবং পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একদা বনমধ্যে মৃগয়াকালে সংগমরত এক মৃগমিথুনকে পাণ্ডু পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করেন। কিমিন্দম মুনি মৃগরূপে পুত্র-কামনায় তখন হরিণী-সংগম করছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় বলেন, "আমি লোকলজ্জার ভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্বক মৃগী সংগমে রত ছিলাম। তুমি আমাকে উক্ত অতৃপ্ত অবস্থাতেই বধ করলে। এতে তোমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ না হলেও আমার অভিশাপে স্ত্রী-সংগমকালে তুমিও অতৃপ্ত অবস্থায় দেহত্যাগ করবে।" এই অভিসম্পাতের ফলে পুত্রজন্ম অসম্ভব বিবেচনায় পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক বনবাসী হন। বনবাসকালে একদা কয়েকজন ব্রহ্মর্ষির ইঙ্গিতে তিনি পিতৃঋণ হতে মুক্ত হবার জন্য কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। কুন্তী তাঁকে দুর্বাসার কাছ হতে প্রাপ্ত মন্ত্রের কথা জানান। তখন পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে তিনি ক্রমান্বয়ে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে লাভ করেন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে ঐ মন্ত্র শিক্ষা দিলে তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন। একদা বসন্তকালে নির্জনে মাদ্রীকে দেখে পাণ্ডু কামার্ত হয়ে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে সবলে সহবাস করেন এবং ঐ সহবাসকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মাদ্রীও পাণ্ডুর সহগমন কামনায় প্রাণত্যাগ করেন (মহাভারত—আদি)।

পাণ্ডব—পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রকে পাণ্ডব বলা হয়। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এঁরা পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত।

পাণ্ড্যরাজ—পাণ্ডবপক্ষীয় মহাযোদ্ধা। ইনি কাহাকেও নিজের সমকক্ষ মনে করতেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ষোড়শ দিবসে ইনি অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হন (মহাভারত—কর্ণ)।

পাতঞ্জল দর্শন—পতঞ্জলি মুনি এই দর্শন প্রবর্তিত করেন। এই জন্য এর নাম পাতঞ্জল দর্শন। পতঞ্জলি সর্ব-

শক্তিমান ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে মানুষের পরিত্রাণ সাধনের উদ্দেশে 'যোগশাস্ত্র' প্রবর্তন করেন। পাতঞ্জল দর্শন ঈশ্বরবিশ্বাসী আর কপিল দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন। পতঞ্জলির মত এই—ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা-অনুসারে শরীর ধারণ করে জগৎ সৃষ্টি করেন। অতএব তাঁকে একরূপ সাকারবাদী বলতে পারা যায়। মানুষের নানা প্রকার চিত্তবৃত্তি আছে এবং এইসব বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ধারিত আছে। যেমন, দর্শনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ, ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ, ইত্যাদি। মনকে এই সকল বিষয় হতে নিবৃত্ত করে পরমেশ্বরের বিষয়ে ধ্যান করাকে যোগ বলে। এই যোগের ৮টি অঙ্গ আছে। যেমন, প্রথম যম, দ্বিতীয় নিয়ম, তৃতীয় আসন, চতুর্থ প্রণায়াম, পঞ্চম প্রত্যাহার, ষষ্ঠ ধারণা, সপ্তম ধ্যান এবং সর্ব পুণ্যফলদায়ক সমাধি অষ্টম। পতঞ্জলির মতেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা জড়ময় জগৎ হতে পৃথক—এই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। স্ফটিক যেমন স্বভাবত শুভ্র, সেইরূপ জীব স্বভাবতই চিন্ময়মাত্র। অজ্ঞানহেতু সংসারে প্রবৃত্ত থেকে 'আমি সুখী, আমি দুঃখী,' ইত্যাদি বোধ হতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক হলে অজ্ঞান নষ্ট হয়ে কেবল ঐ চিন্ময় স্বরূপই বিদ্যমান থাকে। একে কৈবল্য বা মুক্তি বলে। এই জ্ঞান জন্মালে সমস্ত ক্লেশ ও অনিষ্ট বিনষ্ট হয়।

পাতাল—পৃথিবীর নীচে অবস্থিত স্থান। পাতালের সংখ্যা সাতটি। দেবীভাগবতে লিখিত আছে—অন্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবী শত যোজন বিস্তৃত। এই পৃথিবীর অধোদিকে সপ্ত বিবর আছে। এদের পাতাল বলা হয়। এই সপ্ত পাতাল স্বর্গের চেয়েও সুখপ্রদ স্থান। এখানে দৈত্য, দানব ও সর্পরা তাদের পরিবার নিয়ে বাস করে। এরা সকলেই মায়াবী। এদের প্রথম অতল, দ্বিতীয় বিতল, তৃতীয় সুতল, চতুর্থ তলাতল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ রসাতল ও সপ্তম পাতাল। মায়ার অধীশ্বর ময়দানব এই সকল স্থানে নানাবিধ পুরী, মণিরত্ন-সুশোভিত বিচিত্র বাসগৃহ নির্মাণ করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ-অনুযায়ী পাতালের নাম এইরূপ—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিতল, মহাতল, সুতল ও পাতাল। এই সকল পাতালের প্রত্যেকের পরিমাণ এক যোজন। এই পাতালে মহানাগ ও সর্পগণ বাস করে।

পাতালকেতু—বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু মহর্ষি গালবকে উৎপীড়ন করতো। গালবের অনুরোধে শত্রুজিতের পুত্র কুবলাশ্ব গালবের আশ্রমে গিয়ে পাতালকেতুকে আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধকালে পশ্চাৎ-

দ্ধাবনপূর্বক তাঁর পাতালপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। এই পাতালপুরীতে বিশ্বাবসুর অপহৃতা কন্যা মদালসা ছিল। কুবলাশ্ব পাতালকেতুকে বধ করে মদালসাকে উদ্ধার করেন (মার্কণ্ডেয়-পুরাণ)।

পার্থ—পৃথা অর্থাৎ কুন্তীর পুত্র। পাণ্ডবদের মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন—এই তিন জনকে পার্থ বলা হয়; যদিও অর্জুনের প্রতিই এই নাম বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

পার্বতী—ইনি হিমালয় ও মেনকার কন্যা এবং মহাদেবের স্ত্রী। দক্ষযজ্ঞে সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও উপস্থিত হলে পিতা দক্ষকর্তৃক ভর্ৎসিতা হন। যজ্ঞসভায় পতিনিন্দা সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে সতী দেহত্যাগ করে পর্বতরাজ হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তপস্যা দ্বারা পুনরায় মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা বলে এঁর নাম হয় পার্বতী।

পারিজাত—সমুদ্র-মন্থনকালে এই পারিজাত বৃক্ষ সমুদ্র হতে উত্থিত হয়। এই পারিজাত বৃক্ষ স্বর্গে ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভাবর্ধনকারী।

একদিন কৃষ্ণ রুক্মিণীর সঙ্গে একাসনে বসেছিলেন। এমন সময় সেখানে দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হন। যথাবিধি অর্চনা করে নারদ কৃষ্ণকে একটি পারিজাত পুষ্প দান করেন। কৃষ্ণ এই পুষ্প তৎক্ষণাৎ রুক্মিণীকে দেন। তখন কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী সত্যভামা তাঁর দাসীর কাছ থেকে খবর পান যে, কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্প প্রদত্ত হয়েছে। এতে সত্যভামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হন। তখন কৃষ্ণ সত্যভামার কাছে গিয়ে বলেন যে, তিনি স্বর্গ হতে এই পারিজাত বৃক্ষ তাঁকে এনে দেবেন। তারপর কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করেন। সেখানে পারিজাত বৃক্ষ দর্শনে সত্যভামা কৃষ্ণকে উহা দ্বারকায় আনয়ন করতে বলেন। তাঁর অনুরোধে কৃষ্ণ যখন বৃক্ষটি উৎপাটনপূর্বক গরুড়ের উপর স্থাপন করে দ্বারকায় আনয়ন করছিলেন, তখন ইন্দ্র পারিজাত অপহরণের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। তারপর কৃষ্ণ দ্বারকায় এনে এই বৃক্ষ রোপণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই বৃক্ষ পুনরায় ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করা হয় (বিষ্ণুপুরাণ)

পাবক—দক্ষ প্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা স্বাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান ও শুচি—এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এঁরা সকলেই ঘৃতভোজী।

পাশুপত অস্ত্র—পশুপতি অর্থাৎ শিবের বৃহৎ শূলাস্ত্র। অর্জুন কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের নিকট হতে

এই অস্ত্র লাভ করেন। ইহার তেজ যুগান্তকালের অগ্নির মত এবং ইহা পঞ্চবক্ত্র, দশবাহু ও ত্রিলোচনযুক্ত।

পিতামহ—ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়।

পিতৃপুরুষ—পিতৃপুরুষরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) মৃত পিতৃপুরুষ, যাঁদের উদ্দেশে নির্দিষ্ট দিনে পিণ্ডদান করা হয়। (২) দশ জন প্রজাপতি অর্থাৎ দশ জন পৃথিবীর মনুষ্যদের জন্মদাতা। (৩) প্রথম পিতৃরা ভগবানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু দেবতারা ব্রহ্মাকে পূজা না করায় ব্রহ্মা কর্তৃক এঁরা অভিশপ্ত হন। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মা তাঁদের পুত্রদের নিকট হতে শিক্ষালাভ করতে বলেন। পুত্রদের নিকট হতে প্রায়শ্চিত্ত ও পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা করায় দেবতারা পুত্রদের পিতা বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেন।

পিতৃগণ—হিরণ্যগর্ভ মনু হতে মরীচি প্রভৃতি যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই পুত্রপরম্পরায় ‘পিতৃগণ’ নামে অভিহিত। এই পিতৃগণের মধ্যে বিরাটপুত্র সোমসদগণ সাধ্যগণের, মরীচিপুত্র অগ্নিষ্বত্তাদি দেবগণের এবং অত্রিপুত্র বহির্ষদগণ দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, সুপর্ণ ও মানুষদের পিতৃগণ (মনুসংহিতা)।

পীঠস্থান—তন্ত্র-অনুসারে ৫২টি স্থান, যেখানে সতীর দেহাংশ শিব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। দক্ষযজ্ঞে সতী মৃত হলে তাঁর মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করে পৃথিবী ভ্রমণকালে শিব তাঁর দেহ ছিন্ন করে ৫২টি স্থানে নিক্ষেপ করেন।

পিনাকপানি—মহাদেবের অন্য নাম। শিবের ধনু ও বাদ্যযন্ত্র পিনাক নামে খ্যাত। এর আকার ধনুকের মত এটি স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট একটি যষ্টি। এর দুই দিক তন্তুদ্বারা অবনত-ভাবে আবদ্ধ। মহাদেব যুদ্ধকালে ইহা দ্বারা শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে ইহা বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন। এই জন্য মহাদেবের নাম পিনাকপাণি।

পিপ্পলাদ—(১) মহর্ষি পিপ্পলাদ একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি। সুকেশ, সত্যকাম, গার্গ্য, কৌশল্য, ইত্যাদি এঁর শিষ্য ছিলেন। (২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কংসারী নামে এক ভগিনী ছিল। একবার কংসারী ভ্রাতার রেতঃপরিপ্লুত বস্ত্র পরিধান করে স্নান করেন। স্নান করবার সময় রেতোদক তার উদরে প্রবেশ করায় তিনি গর্ভবতী হন এবং একটি পুত্র প্রসব করেন। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি সেই শিশুকে রাত্রে একটি পিপ্পল বৃক্ষমূলে ত্যাগ করে চলে যান। সেইজন্য সেই শিশুর নাম পিপ্পলা (স্কন্দপুরাণ)।

পুঞ্জিকস্থলা- (১) অপ্সরাবিশেষ। একবার ইন্দ্রের প্ররোচনায় মার্কণ্ডেয়

মুনির তপোভঙ্গের চেষ্টা করতে গিয়ে পুঞ্জিকস্থলা অকৃতকার্য হয়। এঁর অন্য নাম অঞ্জনা। এই অপ্সরা অঞ্জনা বানররাজ কেশরীর স্ত্রী। অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। একবার পুঞ্জিকস্থলা ব্রহ্মার কাছে যাওয়ার সময় রাবণ এঁকে বিবসনা করে। পুঞ্জিকস্থলা ব্রহ্মাকে এই বিষয়ে অনুযোগ করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে বলেন যে, আজ হতে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বল-প্রকাশ করলে রাবণের মস্তক শতধা চূর্ণ হবে (রামায়ণ-লঙ্কা)। পুঞ্জিকস্থলা পঞ্চচূড়াবিশিষ্টা অপ্সরাদের অন্যতমা (বায়ুপুরাণ)।

পুণ্ড্র—বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। রাজা বলি উর্ধ্বরেতা ছিলেন। বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্ড্র নিজের নামীয় রাজ্যের রাজা হন।

পিতৃলোক—এই পৃথ্বীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে ভাগ বিভিন্ন ও নামও বিভিন্ন। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন অনুসারে সমস্ত লোকের মধ্যে পিতৃলোকও একটি। এই পিতৃলোকে পিতৃ, ঋষি ও প্রজাপতিরা বাস করেন।

পিশাচ—(১) কুবেরের অনুচর একজন যক্ষপতি। (২) জনৈক রাক্ষস। ইনি রাবণের সঙ্গে লঙ্কার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। (৩) ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। বেদমন্ত্র-অনুসারে রাক্ষসদের চেয়ে এদের স্থান নিম্নে। এরা অত্যন্ত ঘৃণিত প্রাণী। এদের জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের মতে অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে ব্রহ্মা কর্তৃক এরা সৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার যে জলবিন্দু হতে দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব ইত্যাদি সৃষ্ট হয়েছিল, সেই জলবিন্দুর সামান্য অংশ অন্যত্র পতিত হওয়ায় এই পিশাচ ও রাক্ষসদের সৃষ্টি হয়। মনুর মতানুসারে এরা প্রজাপতি হতে উদ্ভূত। পুরাণ-অনুসারে কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী ক্রোধবসার গর্ভে পিশাচদের জন্ম হয়। এদের প্রধান কাজ মানুষদের বিপথগামী করা। রাক্ষসের সঙ্গে তুলনায় এদের প্রভেদ অল্প। মৃতদেহ ভক্ষণ, শ্মশান ও কবরস্থানে বিচরণ প্রভৃতি এদের কাজ।

পীতাব্ধি—বৃত্রাসুর-বধের পর তার সহচর কালকেয় নামক দৈত্যরা দেবতাদের ভীতিতে দিবাভাগে সমুদ্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকতো এবং রাত্রিকালে বহির্গত হয়ে আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করতো। সমুদ্রের ভিতর বাস করার জন্যে দেবতারা এদের কিছুতেই দমন করতে সক্ষম হতেন না। পরে দেবতারা অগস্ত্যের সাহায্য প্রার্থনা করলে, তিনি সমুদ্রের সমস্ত জল গণ্ডূষে শোষণ করে ফেলেন।

তখন অসুররা দেবতাদের নিকট পরাস্ত হয়। সেই থেকে অগস্ত্যের নাম হয় পীতাব্ধি। 'পীত' অর্থে যাহা পান করা হয়েছে তাহাকে এবং 'অব্ধি' অর্থে সমুদ্রকে বোঝায়।

পুণ্ডরীকাক্ষ—পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরমস্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়। ব্রহ্মা পরমস্থানে বাস করেন এবং তাঁর ক্ষয় নাই বলে তাঁর নাম পুণ্ডরীকাক্ষ।

পুত—নরক বিশেষ; যেখানে নিঃসন্তান মানুষদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। 'পুত' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে বলে সন্তানের নাম পুত্র। 'পুন্নাম' অর্থাৎ পুৎ নামে যে নরক বিদ্যমান। মৃত্যুর পর সকলকে সেখানে গমন করতে হয়। আর সেই নরক হতে পিতাকে উদ্ধার করে বংশধর পুত্র।

পুতনা—বকাসুরের ভগিনী ও বালীর কন্যা পুতনা কংসরাজের অনুচরী ছিল। এই মায়াবিনী দানবী কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস কর্তৃক গোকুলে প্রেরিত হয়। পুতনা মায়াবলে সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি ধারণপূর্বক নন্দের গৃহে উপস্থিত হয়। পুতনা নন্দরাণীকে মায়ায় মুগ্ধ করে ও শিশু কৃষ্ণকে কপট স্নেহের সাহায্যে নিজের বিষাক্ত স্তন তাঁর মুখে অর্পণ করে স্তন্যদান করতে থাকে। কিন্তু অন্তর্যামী কৃষ্ণ তার দুরভিসন্ধি পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত হয়ে স্তন্যপানরত অবস্থায় তার জীবনীশক্তি শোষণ করে তাকে বধ করেন। মৃত্যুকালে পুতনা দানবীরূপ ধারণ করে বিকট আর্তনাদে কৃষ্ণের মুখ হতে স্তন মুক্ত করার বিফল চেষ্টা করে এবং পরিশেষে অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে ধরশায়ী হয়ে দেহত্যাগ করে।

পুরঞ্জয়—সূর্যবংশীয় রাজা। মনুবংশীয় রাজা বিকুক্ষির (যাঁর অন্য নাম শশাদ) পুত্র। ইনি ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ নামেও খ্যাত। পুরাকালে দেবতারা দৈত্যদের কাছে পরাজিত হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে, তিনি পুরঞ্জয়ের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেন এবং আরও বলেন যে, তিনি নিজের কিছু অংশ পুরঞ্জয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দৈত্যনাশ করবেন। দেবতারা পুরঞ্জয়ের কাছে সাহায্যার্থ গেলে পুরঞ্জয় তাঁদের প্রভু ইন্দ্রকে বৃষরূপ ধারণ করে তাঁকে ককুদের উপর বহন করে নিয়ে যেতে বলেন। ইন্দ্র প্রথমে লজ্জায় অসম্মত হন। পরে দেবতাদের অনুরোধে ঐ রূপ ধারণে সম্মত হন। বিষ্ণুতেজে বলীয়ান্ রাজা পুরঞ্জয় বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে (ষাঁড়ের ঝুঁটিতে) আরোহণকরতঃ দৈত্যদের পরাজিত করেন। সেই থেকে পুরঞ্জয় 'ককুৎস্থ' নামে বিখ্যাত হন এবং তাঁর বংশের রাজন্যবর্গও উক্ত নামে

পরিচিত হন। তিনি দানবপুরী জয় করে তাদের স্ত্রী ও ধনরত্ন হরণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় পুরঞ্জয় (শ্রীমদ্ভাগবত)।

পুরাণ—অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। সাধারণতঃ পুরাণ অর্থে বুঝায় ব্যাসাদি মুনিপ্রণীত শাস্ত্র। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত ব্যাসাদি মুনি-প্রণীত গ্রন্থ। যে গ্রন্থে স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্যাদির বৃত্তান্ত এবং সৃষ্টি-বিবরণ, ব্রহ্মানুসন্ধান, ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার বর্ণন, অন্তত্ত্ব নির্ণয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পূর্বতন রাজন্যবর্গের বংশাবলী প্রভৃতি নানা বিষয় সবিশেষ লিখিত আছে, এবং যাদ্দারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থার পরিজ্ঞান, জ্ঞানের নির্মলতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য জন্মে, তার নাম পুরাণ। এতে বেদার্থ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮; যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

সত্ত্ব, তম ও রজঃ-অনুসারে পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) যথা সত্ত্বগুণ-অনুসারে—বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহপুরাণকে বিষ্ণুপুরাণ বলা হয়। (২) তমগুণ-অনুসারে মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি পুরাণ এবং (৩) রজঃগুণ-অনুসারে ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামনপুরাণ। বায়ুপুরাণকে অনেক স্থলে শৈবপুরাণ বলা হয়েছে।

১। ব্রহ্মপুরাণ—সর্বপ্রথম এই পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে একে 'আদিপুরাণ' বলা হয়। এই পুরাণের প্রথমাংশে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, দেবতা ও অসুরগণের জন্ম এবং সূর্য ও চন্দ্রবংশের বিবরণ আছে। এর পরেই বিশ্বের বর্ণনা এবং দ্বীপ, বর্ষ, স্বর্গ, নরক ও পাতালাদির বিবরণ আছে। পরে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত আছে। শেষ ভাগে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আছে।

২। পদ্মপুরাণ—যখন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্বর্ণপদ্মরূপে বিরাজিত ছিল, তৎকালজাত ঘটনাবলীর বিবরণ এই পুরাণে লিখিত আছে বলে এর নাম পদ্মপুরাণ। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৫৫,০০০। এই পুরাণ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত—সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। এই পুরাণের প্রধান প্রধান বিষয়—সৃষ্টির আদিক্রম, তারকাসুরের উপাখ্যান, গো-মাহাত্ম্য, বৃত্রবধ,

পৃথুচরিত, বেণ-রাজার উপাখ্যান, নহুষ ও যযাতির কাহিনী, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থবিবরণ, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতির মাহাত্ম্য-কীর্তন, কর্মযোগ নিরূপণ, অগস্ত্যাদি ঋষির আগমন, রাবণোপাখ্যান, জগন্নাথের বিবরণ, কৃষ্ণের নিত্য-লীলা কথন, দধীচির উপাখ্যান, শিব-মাহাত্ম্য, গৌতমোপাখ্যান, জালন্ধরের কথা, সাগরোপাখ্যান, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, একাদশী-মাহাত্ম্য, ব্রত-মাহাত্ম্য, নৃসিংহোৎপত্তি, জম্বুদ্বীপান্তর্গত তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য, ভাগবত-মাহাত্ম্য, মৎস্যাদি অবতার প্রভৃতি।

৩। বিষ্ণুপুরাণ—পুরাণের পঞ্চলক্ষণ পূর্ণভাবে এই পুরাণে দেখা যায়। এই পুরাণ ছয় ভাগে বিভক্ত—(১) বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি, ধ্রুব চরিত, প্রহ্লাদচরিত ইত্যাদি আখ্যান, (২) পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, (৩)ব্যাসকর্তৃক বেদবিভাগ, শাখা বিভাগ, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি; (৪) সূর্য ও চন্দ্রবংশ এবং অন্যান্য রাজবংশের বর্ণনা; (৫) কৃষ্ণচরিত, বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা ইত্যাদি; (৬) বিষ্ণুভক্তি, যোগ ও মুক্তির কথা।

৪। বায়ুপুরাণ—এই পুরাণ চার অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের সৃষ্টি; দ্বিতীয় অংশে কল্পাদি, ঋষি-বংশাবলী, ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা, মন্বন্তর ও শৈব আখ্যানাদি; তৃতীয় অংশে জীবজন্তু এবং চন্দ্র ও সূর্যবংশের বিবরণ; চতুর্থ ভাগে যোগশাস্ত্র, যোগী ও শিবের মাহাত্ম্য।

৫। ভাগবতপুরাণ—এই পুরাণকে শ্রীমদ্ভাগবত বলা হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়াবাদ ইত্যাদির বর্ণনা, ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিষ্ণুর বরাহাবতার, কপিলাবতার, বেণ-রাজচরিত, ধ্রুবচরিত, পৃথু ও ভারত উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত, চন্দ্র ও সূর্য বংশের বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণচরিত, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, যদুবংশ-ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু এবং শেষে ভবিষ্য রাজাদের বিবরণ আছে।

৬। নারদীয় পুরাণ—বৃহৎকল্পে সে সকল কর্তব্য পালন করা হয়েছিল তার বর্ণনা নারদ এই পুরাণে বিবৃত করেছেন। এই পুরাণে বিষ্ণুস্তুতি, বৈষ্ণব-আখ্যান, হরিভক্তি, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব আচরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ—এর শ্লোক-সংখ্যা ৯,০০০। নানা রকম উপাখ্যানে এই পুরাণ পরিপূর্ণ। এই পুরাণে মার্কণ্ডেয় মুনি ধর্মাধর্মাভিজ্ঞ পক্ষিগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে জৈমিনীর প্রশ্নসমূহের সম্পূর্ণ উত্তর দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেছিলেন। ব্যাসশিষ্য জৈমিনী মার্কণ্ডেয়কে বাসুদেবের প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে মহর্ষি তাঁকে বিন্ধ্যপর্বতবাসী শকুনপক্ষীর নিকট যেতে বলেন। জৈমিনী সেখানে গিয়ে

নানারকম প্রশ্ন করে যে উত্তর পান, তাই নিয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আরম্ভ। এতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কলহ, চণ্ডী, দুর্গাকথা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা কথন ইত্যাদি এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মদালসার উপাখ্যান, রুদ্রাদি সৃষ্টি, মার্তণ্ডের জন্ম, ইক্ষ্বাকুচরিত, রামচন্দ্রের উপাখ্যান, কুশের বংশ নিরূপণ, পুরূরবার উপাখ্যান, যোগধর্ম প্রভৃতি আছে।

৮। অগ্নিপুরাণ—এই পুরাণে অগ্নি কর্তৃক বশিষ্ঠ মুনিকে ঈশানকল্প বৃত্তান্ত উপদেশচ্ছলে কথিত হয়েছিল। ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ শিব-মাহাত্ম্য প্রচার করা এর উদ্দেশ্য হলেও, এতে বিবিধ বিষয়ের প্রশ্নপূর্বক অবতারের কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিষ্ণুপূজাদি নিয়ম, শালগ্রামলক্ষণ ও পূজা, তীর্থ মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধবিধি, প্রায়শ্চিত্তবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, ধনুর্বিদ্যা ও ব্যবহারবিধি, পশু-চিকিৎসা, নানাবিধ পূজাবিধি, শব্দানুশাসন, নরকবর্ণন, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও এই পুরাণের অংশীভূত।

৯। ভবিষ্যপুরাণ—এই পুরাণে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চতুর্বর্ণের সংস্কার, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র, শাম্ব, বশিষ্ঠ, নারদ ও ব্যাসের কথোপকথন এবং সূর্যের মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে।

১০। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—এই পুরাণ সাবর্ণি কর্তৃক নারদকে বর্ণিত হয়েছিল। এতে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কথা আছে। এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণখণ্ড। অন্যান্য দেবতার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও স্তুতিই বেশী আছে। প্রসঙ্গক্রমে সাবিত্রী-সত্যবান, সুরভী, স্বাহা, স্বধা, সুরথ, কার্তবীর্য, পরশুরাম, ইত্যাদির উপাখ্যান আছে।

১১। লিঙ্গপুরাণ—এই পুরাণে মহেশ্বর অগ্নিলিঙ্গমধ্যে থেকে অগ্নিকল্পান্তকালে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ক কথা ব্যক্ত করেছেন। এই পুরাণে ১১,০০০ শ্লোক আছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। লিঙ্গোৎপত্তি, লিঙ্গ-পূজা, দধীচির উপাখ্যান, যুগধর্ম-নির্ণয়, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, শিবব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণন, বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, শিবের সহস্র নাম, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ, মদনভস্ম, পার্বতীর সহিত শিবের বিবাহ, বিনায়ক-উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্যু-উপাখ্যান, অম্বরীষ-উপাখ্যান, শিব-মাহাত্ম্য, সূর্য-পূজাবিধি, শিব-পূজাবিধি, দানপ্রকরণ, শ্রাদ্ধপ্রকরণ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত বিষয়।

১২। বরাহপুরাণ–এই পুরাণে মানবকল্প প্রসঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

তাই এর নাম বরাহপুরাণ। এতে ২৪,০০০ শ্লোক আছে।

এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত ও ইহা বিষ্ণু-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানসূচক। পূর্বভাগে রম্ভাচরিত, শ্রাদ্ধবিধি, গৌরীর উৎপত্তি, ব্রতনির্ণয়, মহিষাসুর-বধার্থ ত্রিশক্তি হতে দেবীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য, বিবিধ প্রকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম-বিপাক, এবং উত্তর-ভাগে পুলস্ত্য-কুরুরাজ-সংবাদ, সর্বতীর্থ-মাহাত্ম্য, বহুবিধ ধর্মলক্ষণ প্রভৃতি কীর্তিত হয়েছে।

১৩। স্কন্দপুরাণ—এই পুরাণে ষড়ানন (স্কন্দ) তৎপুরুষকল্পের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। পার্বতী ষড়ানন কার্তিকেয়ের নিকট, কার্তিকেয় নন্দীর নিকট এবং নন্দী অত্রিকুমারকে ইহা কীর্তন করেন। স্কন্দ তৎপুরুষকল্প প্রসঙ্গে নানা চরিত ও উপাখ্যান ও মহেশ্বর-নির্দিষ্ট ধর্ম প্রকাশ করেন। এই পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ৮১,৮০০। ইহা মহেশ্বরখণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, অবন্তীখণ্ড, নাগরখণ্ড এবং প্রভাসখণ্ড নামক সাত খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলির মধ্যে কাশীখণ্ডই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এতে কাশী-মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৪। বামনপুরাণ—এই পুরাণে ১০,০০০ শ্লোক আছে। এতে বিষ্ণুর বামনমূর্তিতে বলিকে ছলনা, দান-মাহাত্ম্য, দেব-দানবযুদ্ধ, মহিষাসুর-বধ, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, শিব ও উমার বিবাহ, কুমারের জন্ম এবং বহু তীর্থের বর্ণনা আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য।

১৫। কূর্মপুরাণ—এই পুরাণে বিষ্ণু কূর্মরূপে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-সমূহের মাহাত্ম্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কীর্তন করেন। এই পুরাণের মধ্যে ভৃগুবংশচরিত, কালপরিমাণ, পার্বতীর সহস্র নাম, ব্যাসগীতা, ঈশ্বরগীতা, তীর্থ-মাহাত্ম্য, বর্ণাচার প্রভৃতি ও জাতিসংকরের বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

১৬। মৎস্যপুরাণ—এই পুরাণের প্রধান বিষয় বিষ্ণু মৎস্যাবতারে মনুকে বর্ণনা করেছেন। ইহাতে মনুর সঙ্গে মীনরূপী বিষ্ণুর কথোপকথন, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, রাজবংশ বর্ণনা, নর্মদা-মাহাত্ম্য, ধর্ম, নীতি, মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণাদির কথা আছে।

১৭। গরুড়পুরাণ—এই পুরাণে বিষ্ণু কর্তৃক গরুড়কল্পে গরুড়ের বিনতা-গর্ভে উৎপত্তি সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণও দুই খণ্ডে বিভক্ত —পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। পূর্বখণ্ডের মধ্যে বিষ্ণুর সহস্র নাম, বিবিধ পূজাবিধি, দীক্ষাবিধি, আয়ুর্বেদ, প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি এবং উত্তরখণ্ডে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যমপুরীর বিষয়, শ্রাদ্ধবিধি, প্রেতত্বের কারণ, মৃত্যুর পূর্বাপর

'বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে কথিত আছে।

১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—এই পুরাণ চার পাদে বিভক্ত—প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপাদ্ঘাত ও উপসংহারপাদ। ইহাতে সৃষ্টি, কল্প, যুগভেদ, মন্বন্তর, রাজবংশ, বর্ষ, ভারতবর্ষ ও দ্বীপাদি বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত পুরাণগুলি ব্যতীত অন্যান্য উপপুরাণের সংখ্যা ১৮। ইহাদের নাম—সনৎকুমার, নর-সিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, ঔষনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভাগবত ও বশিষ্ঠ।

পূর্বমীমাংসা—জৈমিনী মুনি প্রবর্তিত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। ইহা বেদান্তের অংশীভূত। পূর্বমীমাংসার প্রধান উদ্দেশ্য বেদ-ব্যাখ্যায় সাহায্য করা।

পুরু—চন্দ্রবংশীয় রাজা। এঁর পিতা যযাতি ও মাতা শর্মিষ্ঠা। ইনি এবং এঁর ভ্রাতা যদু চন্দ্রবংশের দুই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। পুরুর বংশধরদের পৌরব বলা হয় এবং এই পৌরব বংশ হতে কৌরব ও পাণ্ডব বংশের সৃষ্টি। যদু-বংশধরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ একজন। রাজা যযাতির দুই স্ত্রী—দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ও শর্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা। শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শুক্রাচার্যের অগোচরে শর্মিষ্ঠাকে গ্রহণ করার জন্য শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হন। যযাতি শুক্রাচার্যের নিকট জরামুক্তির উপায় নির্ধারণের জন্য অনুনয় করলে তিনি বলেন যে, অন্য কেহ তাঁর জরা গ্রহণ করতে সম্মত হলে, তিনি তাঁর দেহে নিজের জরা সংক্রামিত করে নিজে মুক্ত হতে পারেন। যযাতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে একে একে সকল পুত্রকেই তাঁর জরা গ্রহণ করতে বলেন, কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত অন্য কেহই তাঁর জরা গ্রহণ করতে সম্মত হয় না। যযাতি তখন পুরুর দেহে নিজের জরা সংক্রামিত করে তাঁকেই তাঁর উত্তরাধিকারী করেন। বহু বৎসর যৌবন-তৃষ্ণা উপভোগ করার পর যযাতি পুত্রের নিকট হতে তাঁর জরা পুনরায় গ্রহণ করেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের অতিক্রম করে রাজা হন। এঁর তিন পুত্রের নাম—প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব (হরিবংশ)।

পুরুকুৎস—রাজা মান্ধাতার স্ত্রী বিন্দুমতীর পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অম্বরী নামে তিন পুত্র জন্মে। এই পুরুকুৎস রসাতলবাসী মৌনেয় নামে ষাট কোটি গন্ধর্ব বিনাশ করে নাগকুল রক্ষা করেছিলেন। এঁর অন্য স্ত্রীর নাম নর্মদা। নর্মদার গর্ভে পুরুকুৎসের ত্রসদস্যু নামে এক পুত্র জন্মে (বিষ্ণুপুরাণ)।

পুরূরবা—ইনি বুধের পুত্র ও চন্দ্রের পৌত্র। বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চন্দ্র হরণ করেন। তারার গর্ভে চন্দ্রের এক পুত্র হয়। এই পুত্রের নাম বুধ। বুধ ইলাকে বিবাহ করেন। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে এক পুত্র জন্মে। মিত্র ও বরুণের শাপে উর্বশী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মর্ত্যবাসিনী হন। পৃথিবীতে এসে উর্বশী ও পুরূরবা অত্যন্ত প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। উর্বশী কয়েকটি সর্তে পুরূরবার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে সম্মত হন। যথা—(১) উর্বশী যেন কোন দিন পুরূরবাকে বিবস্ত্র না দেখেন। (২) উর্বশী কামাতুরা হলেই তবে মৈথুনকর্ম সংগত হবে। (৩) উর্বশীর শয্যার পাশে পুত্রবৎ প্রিয় দুইটি মেষ বাঁধা থাকবে এবং এরা কখনও অপহৃত হবে না। (৪) পুরূরবা এক-সন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করবেন। পুরূরবা এই সকল সর্ত পালন করতে রাজী হন। অতঃপর উর্বশী ও পুরূরবা বহু বৎসর পরম সুখে একত্র বসবাস করেন। কিন্তু স্বর্গের গন্ধর্বরা উর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তারা এই সকল সর্তের কথা জ্ঞাত হয়ে কৌশলক্রমে এমন উপায় উদ্ভাবন করে যে, পুরূরবা পূর্বের সর্তগুলি ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। একদিন রাত্রিকালে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু উর্বশীর মেষ দুইটিকে হরণ করেন। উর্বশী তাদের উদ্ধার করার জন্য ক্রন্দনরতা হলে পুরূরবা শয্যা হতে বিবস্ত্র অবস্থাতেই ক্ষিপ্রগতিতে বিশ্বাবসুর পশ্চাতে ধাবিত হন। উক্ত সময়ে আকস্মিক বজ্রপাতের বিদ্যুতালোকে উর্বশী পুরূরবাকে বিবস্ত্র দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে যান।

পুরূরবা উর্বশীর সন্ধানে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে করতে কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে চারজন স্বর্গীয় অপ্সরার সহিত স্নানরতা উর্বশীকে দর্শনকরতঃ তাঁকে তাঁর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করেন। উর্বশী তখন বলেন, “আমি তোমার সহবাসে গর্ভবতী হয়েছি। তুমি বৎসরান্তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তোমার হস্তে আমার প্রথম সন্তান উপহার দেবো এবং মাত্র একরাত্রি তোমার সঙ্গে বাস করবো”। এইরূপে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল উর্বশী ও পুরূরবার বাৎসরিক সাক্ষাৎ চলতে থাকে এবং এর ফলেই আয়ু, বিশ্বায়ু, শতায়ু প্রভৃতি নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর উর্বশী পুরূরবাকে জ্ঞাত করেন যে, গন্ধর্বরা তাঁর প্রার্থিত যে কোনো বর দিতে প্রস্তুত। পুরূরবা তখন ব্যক্ত করেন যে উর্বশীর সঙ্গে তিনি চির-জীবন যাপন করতে চান এবং এই তাঁর একমাত্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। তখন গন্ধর্বরা অগ্নিপূর্ণ একটি পাত্র তাঁর সম্মুখে স্থাপন করে

বলে, এই "অগ্নিপাত্র গ্রহণ করে বেদের নির্দেশানুসারে এই অগ্নিকে তিন ভাগে ভাগ করো। তারপর উর্বশীতে মনোসংযোগ করে আহুতি অর্পণ করো। তবেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে।" সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করার পর পুরূরবা গন্ধর্বলোকে স্থান পেয়ে উর্বশীর চিরসঙ্গী ও চিরপ্রেমিক হয়ে থাকেন। পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢায়ু, বলায়ু, ও শতায়ু নামে সাত পুত্র হয়।

পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী নানাভাবে নানারূপে বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার বলেন যে, বেদের এই গল্প হতে উষা এবং সূর্যের মিলন-কাহিনী পাওয়া যায়। এতে মর ও অমরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপিত হয়েছে, প্রভাতের সঙ্গে সন্ধ্যা-গোধূলির মিলন হয়েছে। পুরূরবা হচ্ছেন সূর্য এবং উর্বশী প্রভাতের কুয়াশা। পুরূরবা যখন উদয় হন তখন উর্বশী অদৃশ্য হন, অর্থাৎ সূর্যের আলো প্রতিভাত হলে কুয়াশা সূর্যে লীন হয়ে যায়। অপ্সরারা কুয়াশারা প্রতীক; তারা কুয়াশা বা মেঘরূপে সূর্য কর্তৃক আকৃষ্ট হয়।

পুরোচন—ইনি দুর্যোধনের একজন মন্ত্রী ও বিশ্বাসী সহায়ক। ইনি শিল্পকর্মবিশারদ ছিলেন। ইনিই দুর্যোধনের আদেশে বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণপূর্বক পাণ্ডবদের দগ্ধ করে বিনাশ করবার চেষ্টা করেন। বিদুরের কূটবাক্যে পাণ্ডবরা পুরোচনের এই দুরভিসন্ধি জ্ঞাত হন। একদিন গভীর রাত্রে ভীম জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করে ভ্রাতৃগণসহ সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করেন। পুরোচন নিজের গৃহে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন (মহাভারত—আদি)।

পুলস্ত্য—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাত জন ব্রহ্মার মানসপুত্র। পুলস্ত্য ব্রহ্মার কর্ণ হতে জাত অন্যতম মানসপুত্র। সপ্তর্ষিব মধ্যে ইনি একজন। ইনি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন বটে, কিন্তু এঁর কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। পুলস্তের পুত্র বিশ্রবা। ইনি ব্রহ্মার নিকট হতে ব্রহ্মপুরাণ প্রাপ্ত হন এবং তাহা পরাশরকে জ্ঞাত করান। পরাশরই এই পুরাণ সর্বসাধারণে প্রচার করেন। সুমেরু পর্বতের নিকট তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমপ্রান্তে তপোনিরত থাকাকালীন অপ্সরা ও মুনিকন্যাদের নৃত্য-গীতে এঁর তপোভঙ্গ হতো। সে কারণ পুলস্ত্য বিরক্ত হয়ে এক অদ্ভুত অভিশাপ দেন। তিনি বলেন, যে নারী এই স্থানে এসে তাঁর নেত্রপথে পতিত হবে, সে গর্ভবতী হবে। দৈবক্রমে তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূ একদা নির্ভয়ে আশ্রমে এসে পুলস্ত্যের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে তাঁর বেদপাঠ শ্রবণকালে গর্ভবতী হন। তখন পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর

অনুরোধে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। এঁরই গর্ভে বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্রবা মুনি রাবণাদির পিতা। কথিত আছে, সমস্ত রাক্ষস পুলস্ত্য হতে জন্মগ্রহণ করে বলে পৌলস্ত্য নামে খ্যাত।

পুলহ—ব্রহ্মার মানসপুত্র ও প্রজাপতিগণের মধ্যে অন্যতম। ইনি ব্রহ্মার নাভিজাত। এঁর স্ত্রীর নাম ক্ষমা ও তিনটি পুত্রের নাম কর্দম, আর্বাবং ও সহিষ্ণু।

পুলোমা বা পুলোমন—দানববিশেষ। ইনি কশ্যপ-পুত্র দনুর পুত্র এবং ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পিতা। রাবণ স্বর্গ জয় করবার জন্য যুদ্ধে রত হলে রাবণপুত্র মেঘনাদ ও ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মেঘনাদ মায়াবলে রণস্থল তমসাচ্ছন্ন করে জয়ন্তকে বিপদ্‌গ্রস্ত করলে পুলোমা দৌহিত্রকে নিয়ে পলায়ন করেন। কথিত আছে, পুলোমার কন্যা শচীকে পুলোমার অনুমতি নিয়ে অনুহ্লাদ হরণ করেন। নিজের স্ত্রী এইরূপে অপহৃতা হয়েছে দেখে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের শ্বশুর ও অনুহ্লাদকে নিহত করেন।

(২) ভৃগু মুনির স্ত্রীর নাম পুলোমা। ইনি চ্যবনের জননী। এঁর পিতা দৈত্যরাজ বৈশ্বানর। একদা মুনির স্নানার্থ অনুপস্থিত থাকাকালীন পুলোমা নামে তাঁর প্রতি পূর্বানুরক্ত এক রাক্ষস তাঁকে হরণ করে। সেই সময় তিনি গর্ভিণী ছিলেন। এই দুরবস্থার মধ্যে রোরুদ্যমানা অবস্থায় ইনি সন্তান প্রসব করেন। সেই সদ্যোপ্রসূত শিশুর ব্রহ্মতেজে রাক্ষস ভস্মীভূত হয়। এই শিশুই চ্যবন (মহাভারত—আদি)।

পুলোমজা—দৈত্যরাজ পুলোমার কন্যা বলে শচী পুলোমজা নামে খ্যাতা।

পুরুষোত্তম—পুরুষের মধ্যে উত্তম। পুরুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ—বিষ্ণু। কৃষ্ণও পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন।

পুষ্কর—(১) নিষধরাজ নলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কলির প্ররোচনায় ইনি নলকে অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত করে নলের রাজ্য ও সম্পত্তি হরণ করেন এবং দময়ন্তীকেও পণ রাখতে বলেন। পরে নল শাপমুক্ত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় পুষ্করকে পরাজিত করে নষ্টরাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু পুষ্করকে শাস্তিদানের পরিবর্তে তাঁকে অর্ধরাজ্য দান করেন (মহাভারত—বন)।

(২) পুরাণ-প্রসিদ্ধ সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটি দ্বীপ।

(৩) আজমীড হতে পাঁচ মাইল দুরে অবস্থিত একটি জলাশয়।

পুষ্কল—অযোধ্যাপতি দশরথ-পুত্র ভরত ও মাণ্ডবীর কনিষ্ঠ পুত্র। ভরত নিজের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধার দেশ জয় করে

সেখানে পুত্রদের নামানুসারে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নগরদ্বয় স্থাপন করেন (রামায়ণ)।

পুষ্পক—চতুর্লোকপাল কুবেরের আকাশচারী সর্বগতি রথ। ব্রহ্মা কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে এই অপূর্ব পুষ্পকরথ দান করেন। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে এই পুষ্পকরথ হরণ করে নিয়ে আসেন। বহুদিন এই রথ তাঁর অধিকারে ছিল। রাম রাবণকে নিহত করলে এই রথ আবার কুবেরের করায়ত্ত হয়।

পুষ্পদন্ত—(১) একজন গন্ধর্ব ও শিবের বিশিষ্ট চরবিশেষ। একবার শিবের সহিত পার্বতীর গোপনীয় কথোপকথন নিভৃতে শ্রবণকরতঃ তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করার জন্য ইনি মহাদেবের ক্রোধভাজন হন। এই অপরাধে তাঁকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং তিনি বররুচি নামে প্রসিদ্ধ হন। দুর্গার সখী জয়া এঁর স্ত্রী।

(২) অষ্ট দিগ্‌গজের অন্যতম। উত্তর-পশ্চিম দিকের অধিপতি বায়ু এই পুষ্পদন্তের উপর অবস্থান করে ঐ দিক রক্ষা করেন।

(৩) পুষ্পদন্ত নামে একজন গন্ধর্ব ছিল। এর পুত্রের নাম মাল্যবান (পদ্মপুরাণ)।

পুষ্পোৎকটা—(১) বিশ্রবার অন্যতম স্ত্রী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও খর নামে চার পুত্র ও কুম্ভনসী নামে এক কন্যার জন্ম হয় (কূর্মপুরাণ)।

(২) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভনসী, পুষ্পোৎকটা প্রভৃতি চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে (রামায়ণ—উত্তর)।

পূর্বচিত্তি—(১) ইনি পঞ্চচূড়াবিশিষ্টা অপ্সরা (বায়ুপুরাণ)। (২) অপ্সরা বিশেষ। ব্রহ্মার আদেশ-অনুসারে ইনি রাজা আগ্নীধ্রের নিকট উপস্থিত হলে রাজা এঁকে গ্রহণ করেন। আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে নয় পুত্র হয় (ভাগবত)।

পুষা—বৈদিক ঋষিদের অন্যতম দেবতা। সূর্যের অন্য নাম পুষা। ঋষিরা এঁর স্তব করবার জন্য বহু ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। পুষার বাহন ছাগল। বেদে পুষা কোথাও পশুদের পোষক, কোথাও মানুষের পোষক, কোথাও আবার সূর্যদেবরূপে পৃথিবী পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সাহায্যেই দিন ও রাতের প্রকাশ। অনেক স্থলে ইন্দ্র ও ভগের সঙ্গে ইনি স্তুত হয়েছেন। নিরুক্ত ও পরবর্তী গ্রন্থে ইনি সূর্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

(২) কূর্মপুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের সময় মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র পুষার দন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।

(৩) মহাভারতেও কথিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের সময় মহাদেব ভগের চক্ষু উৎপাটন করেন এবং পূষাকে পদাঘাত করে তাঁর দন্ত উৎপাটন করেন।

পৃথা—যদুকুলশ্রেষ্ঠ শূরসেনের কন্যা, যদুবংশীয় বসুদেবের ভগ্নী এবং পাণ্ডুর স্ত্রী। শূরসেন নিজের বন্ধু কুন্তিভোজকে নিঃসন্তান দেখে নিজ কন্যা পৃথাকে দত্তক কন্যারূপে তাঁকে দান করেন। তদনুসারে বাল্যাবস্থা হতে পৃথা কুন্তিভোজের কাছে পালিতা হন এবং কুন্তী নামে খ্যাতা হন (কুন্তী দেখ)।

পৃথু, পৃথি—বেণ-রাজার পুত্র। ঋক্‌বেদে এঁর নাম উল্লিখিত আছে। ইনি ঋক্‌বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন।

হরিবংশে পৃথু সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে: অত্রি বংশে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। এই অঙ্গের পুত্র বেণ রাজা হিসাবে অত্যন্ত অত্যাচারী ও পাষণ্ড ছিলেন। বেণের রাজত্বকালে যজ্ঞ, বেদপাঠাদি ও ধর্মকর্ম বিলুপ্ত হলে ঋষিরা কুপিত হয়ে বেণকে নিহত করেন। তারপর ঋষিরা বেণের বাম উরু নিষ্পেষণ করতে থাকেন, এবং ঐ মর্দিত উরু হতে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উদ্ভূত হন। ঋষি অত্রি এঁকে দেখে বলেন, 'নিষীদ' (উপবেশন কর)। এই পুরুষই নিষাদ বংশের আদিপুরুষ। এর পর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করতে থাকেন। এই মথিত বাহু হতে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় পৃথু উদ্ভূত হন। সৎপুত্র পৃথুর জন্ম হলে বেণ পুন্নাম নরক হতে পরিত্রাণ পেয়ে স্বর্গে প্রস্থান করেন। এরপর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা পৃথুকে পৃথিবীর রাজা বলে অভিষিক্ত করেন। পৃথুর প্রজারা, যারা এতদিন দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল, তারা পৃথুর কাছে খাদ্যশস্য ও নানাবিধ অভীষ্ট দ্রব্য এবং তাদের বৃত্তি নির্ধারণ করতে বলে। এই সকল বস্তু হতে পৃথিবী এযাবৎ সমস্ত প্রজাবর্গকে বঞ্চিত করেছিলেন। অতঃপর পৃথু শরের সাহায্যে পৃথিবীকে আক্রমণ করেন। পৃথিবী ভীতা হয়ে গো-রূপ ধারণপূর্বক পলায়নপর হন। পৃথুও ধনুর্বাণ হস্তে পৃথিবীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। পরিশেষে পলায়নে সক্ষম না হয়ে পৃথিবী পৃথুর শরণাপন্ন হন। তখন পৃথু পৃথিবীকে প্রজাদের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করতে ও তাঁর কন্যা হতে বলেন। পৃথিবী তখন বলেন, "প্রজাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে হলে আমাকে দোহন করতে হবে। তার জন্য একটি বৎসের প্রয়োজন। বৎস না হলে পৃথিবী হতে দুগ্ধ নিঃসৃত হবে না।

আর আমাকে সমতল করতে হবে। তা' না হলে কি করে এই দুগ্ধ চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করবে।" পৃথু তখন নিজের ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবীকে উৎসারিত করলে পর্বতের সৃষ্টি হয় ও পৃথিবী সমতল হয়। অতঃপর স্বয়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে স্বহস্তে গো-রূপা পৃথিবীকে দোহন করেন। এই দোহনের ফলে পৃথিবীর প্রজারা বিবিধভাবে অন্নলাভ করে আজও জীবনধারণ করছে। পৃথুর কন্যা বলে পৃথিবী স্বীকার করার বসুন্ধরা পৃথ্বী নামে খ্যাত হন (হরিবংশ)।

মহাভারতে পৃথু সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে: বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করেন। তাঁরই অধস্তন পুরুষের মধ্যে বেণ একজন। বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। সে কারণ ঋষিরা মন্ত্রপূত কুশের সাহায্যে তাঁকে বধ করেন। তারপর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মন্থনে প্রবৃত্ত হন। উহা হতে এক কদাকার পুরুষ উৎপন্ন হয়। ঋষিরা তাকে বলেন, 'নিষীদ' অর্থাৎ উপবেশন কর। এই পুরুষ থেকে নিষাদ ও ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি। অতঃপর বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থনকালে ইন্দ্রের ন্যায় রূপবান এক পুরুষ উৎপন্ন হন। ইনিই বেণ-পুত্র পৃথু নামে খ্যাত। ঋষিরা এঁকে সমদর্শী হয়ে বেদ ও দণ্ডনীতি-সম্মত ধর্মপালন করতে বলেন। পৃথু এতে সম্মতি দান করলে মুনিরা তাঁর মন্ত্রী হন। পৃথু পৃথিবীকে সমতল করেন। পৃথিবীকে দোহনকরতঃ ইনি সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করেন। তাঁর সময় সমস্ত ভূমণ্ডল প্রোথিত (খ্যাত) হয়েছিল বলে পৃথিবী নাম হয়। দেবতারা তাঁকে রাজা করেন।

পৃশ্নি—সুতপা রাজার স্ত্রী। ইনি জন্মান্তরে কৃষ্ণের মাতা দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পৈল—মহর্ষি পৈলএকজন বেদজ্ঞ মহর্ষি। ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। পৈল ঋক্‌সমূহ সংগ্রহ করে দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং নিজের শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলীকে পাঠ করান। বাস্কলী চারখানি সংহিতা রচনা করে বোধ্য, অগ্নিমাঠর, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য নামে চারজন শিষ্যকে অধ্যাপনা করেন। ইন্দ্রপ্রমতি একখানি সংহিতা রচনা করে নিজ পুত্র মার্কণ্ডেয়কে অধ্যাপনা করেন।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব—বাসুদেব-পৌণ্ড্রদেশের একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইনি পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে খ্যাত। ইনি জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। হরিবংশ মতে বাসুদেবের দুই স্ত্রী ছিল—সুতনু ও নারাচী। সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্রক ও নারাচীর গর্ভে কপিল জন্মগ্রহণ করেন।

কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করেন এবং পৌণ্ড্রিক পৌণ্ড্ররাজ্য লাভ করে পৌণ্ড বাসুদেব নামে বিখ্যাত হন। মহাভারতে লিখিত আছে: রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীম এঁকে পরাজিত করেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে: মহর্ষি নারদ এঁর সভায় এসে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। শঙ্খচক্রধারী অপর একজন বাসুদেবের নাম শুনে ইনি বলেন, "আমি ভিন্ন আর কে আছে যে আমার নাম গ্রহণ করতে সক্ষম? কার এমন স্পর্ধা?" তিনি কৃষ্ণকে শাস্তি দেবার জন্য দ্বারকা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে বহু যাদব নিহত হয়। অবশেষে কৃষ্ণ পৌণ্ড্র বাসুদেবের দেহ চক্রদ্বারা বিদীর্ণ করে নিহত করেন (হরিবংশ)।

পৌরব—পুরুবংশে উদ্ভূত। কুরু-পাণ্ডব যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই কুলজাত। পুরু পিতা যযাতির জরাভার গ্রহণ করার পর যযাতি তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমার জরা গ্রহণ করে যথার্থ পুত্রের কাজ করেছ। সেই জন্য তোমার বংশ পৌরব নামে খ্যাত হবে।"

পৌলস্ত্যী—পুলস্ত্য-কন্যা শূর্পণখা ও কুম্ভনসী।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্য-পুত্র—কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ।

পৌলোম—মারীচ রাক্ষসের অন্যতমা স্ত্রী ও বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমার সন্তানরা পৌলমদৈত্য নামে খ্যাত (বায়ুপুরাণ)। কশ্যপের ঔরসে ও বৈশ্বানর দানবের কন্যা পুলোমার গর্ভে পৌলোমেরা জন্মগ্রহণ করে। এরা সংখ্যায় ৬০,০০০। অর্জুনের হাতে এরা সকলেই নিহত হয় (শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ)।

পৌষ্য—জনৈক রাজা। ইনি উতঙ্কের গুরুদেবকে উপাধ্যায়ের পদে বরণ করেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে সম্মত হলে, গুরু তার স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে কি দক্ষিণা গ্রহণে তিনি উৎসুক তা উতঙ্ককে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। তখন গুরু-পত্নী রাজা পৌষ্যের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর দুই কর্ণকুণ্ডল তাঁকে সংগ্রহ করে দিতে বলেন। উতঙ্ক রাজা পৌষ্যের সমীপস্থ হয়ে তাঁর স্ত্রীর কুণ্ডল প্রার্থনা করলে, তিনি উতঙ্ককে রাজমহিষীর নিকট যেতে বলেন। উতঙ্ক মহিষীর সন্ধানে গিয়ে তাঁর দর্শন না পেয়ে রাজাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করেন। পৌষ্য উতঙ্ককে বলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই অশুচি অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর সাক্ষাৎলাভে গিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত হয়েছেন। উতঙ্কের তখন স্মরণ হল যে, মহিষীর সঙ্গে যথাসম্ভব শীঘ্র সাক্ষাৎলাভেচ্ছায় দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আচমনকার্য সমাধা করায় তিনি অশুচি হয়েছেন। অতঃপর নিয়মিত

আচমনাদি সমাপ্ত করে ফিরে এসে তিনি মহিষীর সাক্ষাৎ পান এবং কুণ্ডল প্রার্থনা করায় তাহা লাভ করেন। পৌষ্যের নিকট উতঙ্ক পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করলে, পৌষ্য অতিথি-সৎকারের অভিলাষ প্রকাশ করেন। উতঙ্ক পৌষ্যকে বলেন যে, তাঁর ঘরে যা অন্ন আছে তাই যেন শীঘ্র আনয়ন করেন। অন্ন উপস্থিত হলে উতঙ্ক দেখেন যে, অন্ন অত্যন্ত শীতল ও তাতে ছিন্ন কেশ পতিত রয়েছে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উতঙ্ক রাজাকে অশুচি অন্নদানের জন্য অন্ধ হবার অভিসম্পাত দেন। পৌষ্যও উতঙ্ককে অভিশাপ দেন যে, নির্দোষ অন্নের উপর দোষারোপ করায় উতঙ্ক নিঃসন্তান হবেন। তখন উতঙ্ক রাজাকে সেই অন্ন বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করতে বলায় রাজা জ্ঞাত হন যে, শীতল অন্ন আনয়নকালে তার মধ্যে মুক্তকেশী স্ত্রীর ছিন্ন কেশ পতিত হয়েছে। তখন রাজা ক্ষমাপ্রার্থনা করলে উতঙ্ক বললেন যে, তাঁর বাক্য মিথ্যা হবে না; তবে রাজা অন্ধ হলেও যথাসম্ভব শীঘ্রই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তাঁর প্রতি রাজার শাপ যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়—এই প্রার্থনাও তিনি করেন। রাজা কিন্তু ক্রোধের বশে শাপ প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃত হয়ে উতঙ্ককে চলে যেতে বললেন। তখন উতঙ্ক বললেন যে, রাজা অন্নের দোষ স্বীকার করায় তাঁর এই অভিশাপ নিষ্ফল হবে। অতঃপর কুণ্ডল নিয়ে উতঙ্ক প্রস্থান করলেন।

প্রচেতা—(১) মহর্ষি প্রচেতা বৈদিক-যুগের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ইনি দুঃস্বপ্ন বা অমঙ্গল নাশের জন্য কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন (ঋকবেদ)।

(২) বেণ-পুত্র পৃথুবংশীয় প্রাচীনবর্হির স্ত্রী সমুদ্রকন্যা সর্বণা দশটি পুত্র প্রসব করেন। এঁদের সকলের নাম প্রচেতা। এঁরা দশ সহস্র বৎসর সমুদ্রসলিলে শয়ন করে বিষ্ণুর তপস্যা করেন। এই তপস্যার ফলে এঁরা মনুষ্যদের সৃষ্টিকর্তা হন। এই দশজন প্রচেতা মহর্ষি কণ্ডুর কন্যা মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হয় (বিষ্ণুপুরাণ)।

(৩) ব্রহ্মার পুত্র। পিতামহ ব্রহ্মা নিজ দেহ থেকে বেদ-বেদাঙ্গে শাস্ত্রবিদ পুত্রদের সৃষ্টি করেন। এঁদের নাম—অত্রি, পুলস্ত্য, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রতু ও বশিষ্ঠ (বোঢ়ু, কাপিল, আসুরী, কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ ও প্রচেতা) (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

প্রজা—বৈবস্বতাদি মনু মানবজাতির আদিপুরুষ। তাঁদের প্রজা অর্থাৎ সন্তান ব্রাহ্মণরা মানুষ।

প্রজাপতি—জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। বেদে ইন্দ্র, সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকে

প্রজাপতি বলা হয়। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনিই প্রকৃত সৃষ্টি কর্তা এবং পৃথিবীর রক্ষক। ব্রহ্মার পুত্র বলে এবং দশ জন ঋষির সৃষ্টিকর্তা বলে স্বয়ম্ভুব মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়। এই ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং এই মানসপুত্র হতেই মানবের সৃষ্টি। সেই জন্য এই দশ জন ঋষিকেই সর্বত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ—এই দশ জন সপ্তর্ষিই প্রজাপতি।

প্রতর্দন—কাশীর রাজা দিবোদাসের পুত্র। বীতহব্য নামে এক রাজা দিবোদাসের সমস্ত বংশ বিনাশ করেন। মহর্ষি ভৃগুর দ্বারা যজ্ঞ করে দিবোদাস প্রতর্দন নামে এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র পরে খুব শক্তিশালী হয়ে নিজের পিতার প্রতি অবমাননার প্রতিশোধ নেন। বীতহব্য আত্মরক্ষার জন্য ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন ভৃগু বীতহব্যকে ব্রহ্মর্ষির পদে উন্নীত করেন।

প্রতিবিন্ধ্য—যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভজাত পুত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর নিশীথে সুষুপ্ত অবস্থায় পাণ্ডব-শিবিরে অশ্বত্থামা কর্তৃক ইনি নিহত হন (মহাভারত)।

প্রদ্বেষী—মহর্ষি দীর্ঘতমার স্ত্রী। এঁর গর্ভে গৌতমাদি পুত্ররা জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘতমা গোধর্ম অবলম্বন করলে ইনি তাঁর প্রতি অতিশয় বিরক্ত হয়ে তাঁকে ত্যাগ এবং নদীতে নিক্ষেপ করেন (মহাভারত)।

প্রদ্যুম্ন—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের জন্ম হবার সাতদিন পরে সম্বরাসুর সূতিকা-গৃহ হতে এঁকে হরণ করে নিয়ে যায়। শিবের নেত্রাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হলে তাঁর স্ত্রী রতির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব বর দেন যে, কামদেব প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং রতিও মায়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হয়ে কোন বাধা সৃষ্টি করেন না। সম্বরের স্ত্রী মায়াবতী এই শিশুকে নিজের পুত্রের ন্যায় পালন করতে থাকেন। ক্রমে মায়াবতী জ্ঞাত হন যে, এই নবজাতকই তাঁর জন্মান্তরের স্বামী। তখন দুইজনের মধ্যে অনুরাগ ও আসক্তি ক্রমেই বর্ধিত হবে থাকে। অতঃপর প্রদ্যুম্ন সম্বরকে যুদ্ধে নিহত করে, মায়াবতীকে নিয়ে পিতা ও মাতার নিকট এসে নিজ স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে বলেন যে, প্রকৃত ইনিই তাঁর স্ত্রী। পূর্বজন্মে ইনি রতি নামে পরিচিতা ছিলেন। প্রদ্যুম্ন মাতুলকন্যা ককুদ্মতীকেও বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর অনিরুদ্ধ নামে এক

পুত্র হয়। প্রদ্যুম্ন বীরযোদ্ধা ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে কৃষ্ণের সহায়তা করেন। অসুররাজ বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতী-কেও ইনি গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। প্রভাবতী সহচরীর মুখে প্রদ্যুম্নের কথা শ্রবণপূর্বক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঘটনাক্রমে বজ্রপুরে প্রদ্যুম্ন উপস্থিত হলে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। এই বিবাহের ফলে প্রভাবতী গর্ভবতী হলে, অসুরগণ একত্র হয়ে প্রদ্যুম্নকে বিনাশ করতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রদ্যুম্ন নিজেই অসুরদের নিহত করেন। প্রভাবতীর গর্ভজাত পুত্র বজ্রপুরের রাজা হন। আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার সময় প্রদ্যুম্নও নিহত হন।

প্রবীর—মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের পুত্র ও বীরনারী জ্বালার গর্ভজাত পুত্র। এই জ্বালা 'জনা' নামে পরিচিতা। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অশ্ব মাহিষ্মতীতে উপস্থিত হলে, নীলধ্বজ-পুত্র প্রবীর এই অশ্বকে আবদ্ধ করেন। তখন অর্জুন এসে প্রবীরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে পরাজিত করেন। এরপর নীলধ্বজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হওয়ায় আসন্নপরাজয়ের সম্ভাবনায় অর্জুনের অশ্ব তিনি প্রত্যর্পণ করতে স্বীকৃত হন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী জনা স্বামীর এই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু ভ্রাতা ও পুত্র উভয়েই যুদ্ধে নিহত হয় এবং স্বামীরও একদিন রণস্থলে সংজ্ঞা লোপ পায়। এর ফলে তিনি অশ্ব প্রত্যর্পণ করে অর্জুনের সহিত সন্ধি করেন। অতঃপর জনা নিজেই গৃহত্যাগ করে আগুনে ঝাঁপ দেন এবং অর্জুনকে সংহারের বাসনায় ভয়ংকর বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণীর আশ্রয় করেন (জৈমিনী ভারত)।

প্রভাস—সরস্বতী নদীর তীরে লোক-বিশ্রুত প্রধান পবিত্র তীর্থ। কথিত আছে, পুরাকালে চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের রূপবতী সাতাশ জন কন্যাকে বিবাহ করেন; কিন্তু একমাত্র রোহিণীর প্রতিই বিশেষভাবে অনুরক্ত হন। সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার না করার ফলে দক্ষশাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। চন্দ্রের এই রোগে সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখে দেবতারা দক্ষকে অনুরোধ করাতে পুনরায় চন্দ্র দক্ষের নির্দেশে অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান করে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। চন্দ্র এখানে 'প্রভা' লাভ করেন বলে এই তীর্থের নাম প্রভাস এবং নামান্তরে সোমতীর্থ। এই তীর্থের বর্তমান অবস্থান-ক্ষেত্র কাথিয়াওয়াড়ের সমুদ্র-উপকূল।

প্রভাবতী—দৈত্যরাজ বজ্রনাভের কন্যা। হংসমুখে প্রদ্যুম্নের গুণাবলী শুনে প্রভাবতী এঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রদ্যুম্ন ভদ্র নামে এক নটের বেশে বজ্রপুরে প্রবেশ করে এঁকে গান্ধর্ব মতে

বিবাহ করেন। এতে বজ্রনাভ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রদ্যুম্নকে শাস্তি দিতে যান; কিন্তু নিজে পরাজিত হয়ে প্রদ্যুম্নের হস্তে নিহত হন (হরিবংশ)।

প্রমতি—মহর্ষি চ্যবনের ঔরসে ও স্ত্রী সুকন্যার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। প্রমতির স্ত্রী ঘৃতাচী হতে রুরুর জন্ম হয় (মহাভারত)।

প্রমথ—শিবের পারিষদ্ ও অনুচরবর্গ। এরা নৃত্য-গীতবিশারদ ও নানারূপধারী। কালিকাপুরাণে বর্ণিতআছে —মহাদেবের মুখনির্গত ফেনা হতে প্রমথদের উৎপত্তি। এরা মহাদেবের পার্শ্বচর ও পশ্চাৎ-বিচরণকারী। এই শ্রেণীর প্রমথরা মায়াবী এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত—একদল ভোগহীন, ধ্যানপরায়ণ যোগী; একদল কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া-বিষয়ের সহায়ক; আর একদল যুদ্ধে শত্রু দমনকারী; অন্য দল রুদ্র নামে মহাদেবের আদেশানুসারে স্বর্গে বসবাসকারী ও তাঁর সেবাব্রতী।

প্রমদ্বরা—রুরু মুনির স্ত্রী ও গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত কন্যা। প্রমদ্বরার জন্মের পর মেনকা কন্যাকে পরিত্যাগ করলে, মহর্ষি স্থূলকেশ তাকে দর্শনপূর্বক নিজের আশ্রমে এনে পালন করেন। চ্যবন ও সুকন্যার পুত্র প্রমতির ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রুরু প্রমদ্বরাকে দেখে মোহিত হলে, তাঁর পিতা প্রমতির অনুরোধে স্থূলকেশ কন্যাদানে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিবাহের সময় উপস্থিত হলে প্রমদ্বরা একদিন সখীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় দৈব-দুর্বিপাকে একটি সুপ্ত সর্পের দেহ পদদলিত করেন। ফলে, সর্পদংশনে প্রমদ্বরা বিবর্ণ, হতচেতন ও নিস্পন্দ হয়ে ভূপতিত হন। অকস্মাৎ এই ঘটনায় সকলেই শোকাতুর হয়ে পড়েন। রুরু সর্বাপেক্ষা অধিক শোকার্ত হন। শোকার্ত রুরু বিলাপ করে বলেন যে, যদি এতদিন তিনি সত্যসত্যই দান, তপস্যা, গুরুজনের সেবা ও ব্রতপালন করে থাকেন, তবে তাঁর প্রিয়া জীবিত হোন। দেবতারা তখন এঁর প্রতি কৃপান্বিত হয়ে এক দেবদূত প্রেরণ করে জানান যে, এই কন্যার আয়ু নিঃশেষিত; তবে কেহ যদি এই কন্যাকে তার আয়ুর অর্ধাংশ দান করে, তবে সে আবার জীবদ্দশা প্রাপ্ত হবে। প্রমদ্বরার পিতা বিশ্বাবসু তখন যমের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, রুরুর অর্ধায়ু নিয়ে প্রমদ্বরাকে জীবনদান করা হোক। যম এই প্রস্তাবে সম্মত হলে, প্রমদ্বরা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় পুনর্জীবিত হয়ে ওঠেন। অতঃপর রুরু ও প্রমদ্বরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন (মহাভারত)।

প্রমীলা—(১) লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের স্ত্রী।

(২) মহাভারতোক্ত এক নারী-রাজ্যের রাণী। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব এই নারীপ্রধান রাজ্যে উপস্থিত হলে, সাহসী রাণী প্রমীলা যজ্ঞাশ্ব ধরে রাখেন। অশ্বরক্ষক অর্জুন প্রমীলার এই দুর্জয় সাহস ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হন। অবশেষে প্রমীলা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করেন (মহাভারত)।

প্রম্লোচ্চা—একজন অপ্সরা। কণ্ডু মুনির তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য ইন্দ্র প্রম্লোচ্চাকে এই মুনির কাছে পাঠিয়ে দেন। কণ্ডু প্রণয়াসক্ত হয়ে এই অপ্সরার সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটান। পরে নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে কণ্ডু প্রম্লোচ্চাকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু তখন এই অপ্সরা অন্তঃসত্ত্বা; তার সন্তান দেহ হতে ঘর্মবিন্দুরূপে বৃক্ষপত্রের উপর পড়তে থাকে এবং এই ঘর্মবিন্দু জমে গিয়ে কন্যা মারিষায় পরিণত হয়। প্রচেতারা দশ ভ্রাতা এই মারিষাকে বিবাহ করেন।

প্রলম্ব—এক প্রসিদ্ধ অসুর। এই অসুর কংশের আশ্রিত ছিল। একদিন কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকরা একত্রে যখন ক্রীড়ারত ছিলেন, সেই সময় এই অসুর গোপবেশ ধারণকরতঃ এঁদের সঙ্গে মিলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বের ইচ্ছা জ্ঞাত হয়ে বালকদের সঙ্গে কৃত্রিম মল্লযুদ্ধ করতে থাকেন। এই কৃত্রিম যুদ্ধে পণ হয়, বিজিত ব্যক্তি বিজয়ীকে স্কন্ধে বহন করে নিয়ে যাবে। প্রলম্ব বলরামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, তাঁকে স্কন্ধে বহন করতে থাকে। তার ইচ্ছা ছিল, কিছুদূর নিয়ে গিয়ে বলরামকে বধ করবে। বলরাম তাহা জ্ঞাত হয়ে নিজের ভার এত বৃদ্ধি করতে থাকেন যে প্রলম্বের পক্ষে আর তাঁকে বহন করবার সামর্থ্য হয় না। তখন প্রলম্ব নিজের মূর্তি ধারণ করে বলরামকে অক্রমণ করলে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বলরামের হাতে নিহত হয় (শ্রীমদ্‌ভাগবত)।

প্রলয়—একটি কল্পের শেষে পৃথিবীর ধ্বংসকে প্রলয় বলে।

প্রসূতি—দক্ষপ্রজাপতির স্ত্রী ও শিব-পত্নী সতীর মাতা। ব্রহ্মার দেহাঙ্গ-রূপ ক্ষত্র ধাতু হতে স্বয়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী শক্তি শতরূপা এঁর স্ত্রী। শতরূপার তিন কন্যা—আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি। দক্ষপ্রজাপতির সহিত এঁর বিবাহ হয়। এঁর ঔরসে ৬০টি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা সতী দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করলে শিবের অনুচররা দক্ষের মস্তক ছেদন করে। অতঃপর শিব সেখানে উপস্থিত হলে প্রসূতির অনুরোধে তিনি দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন।

প্রসেনজিৎ—যদুবংশীয় রাজা নিঘ্নের প্রসেনজিৎ ও সত্রাজিৎ নামে দুই পুত্র

মেষবাহিনী সরস্বতী

বীণাবাদিনী সরস্বতী

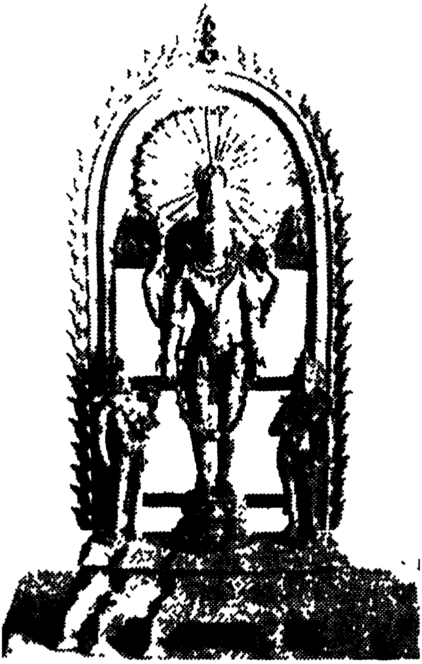

পদ্মহস্তে বসুমতী

বিষ্ণুর পরিবাররূপে
দণ্ডায়মানা সরস্বতী

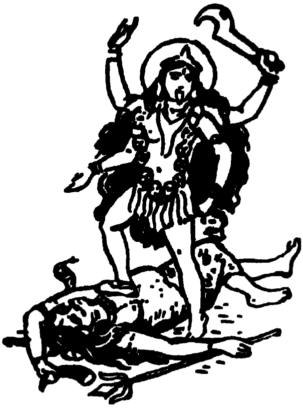
কালী

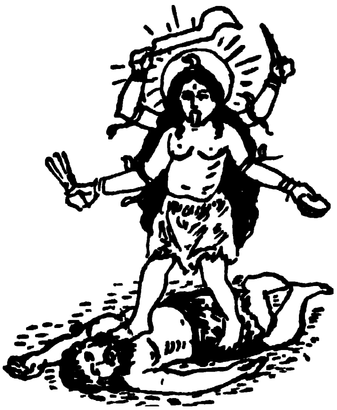
তারা

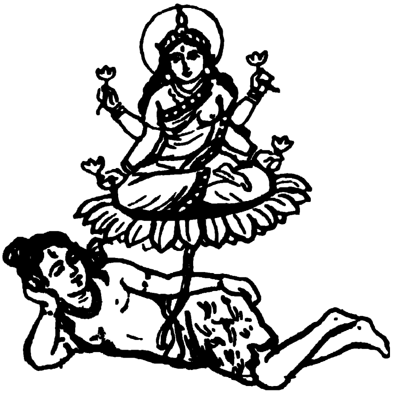
ষোড়শী

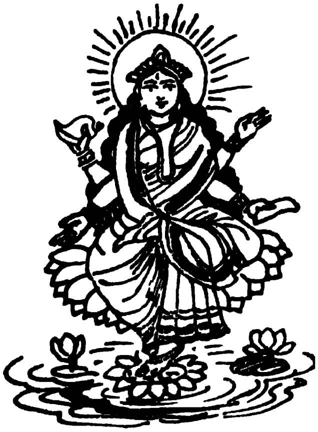
ভৈরবী

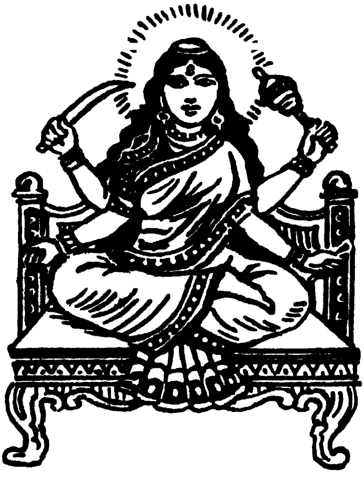
মাতঙ্গী

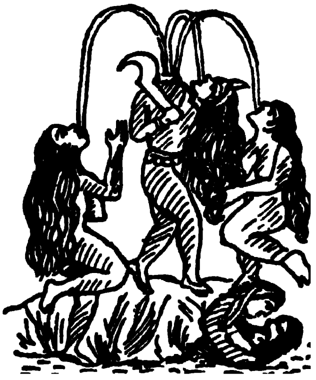
ছিন্নমস্তা

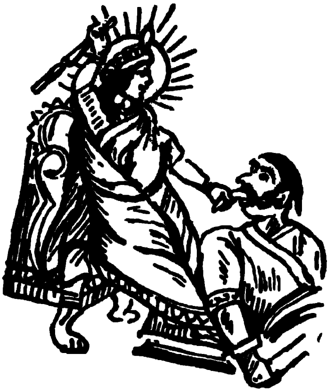

বগলা

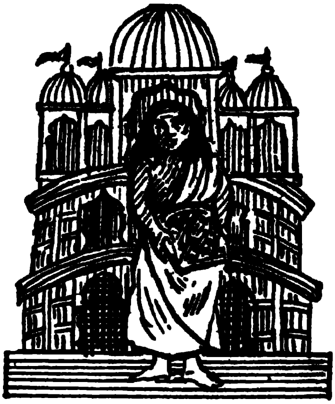

ধূমাবতী

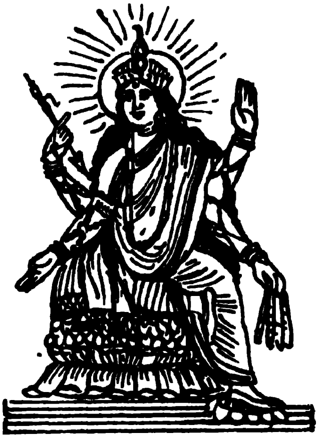

ভুবনেশ্বরী

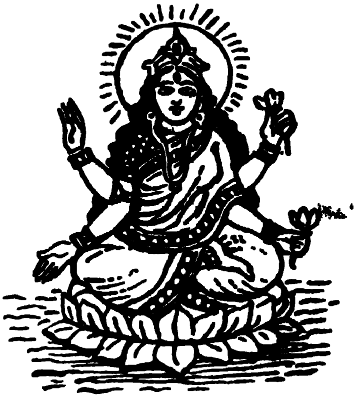

কমলা

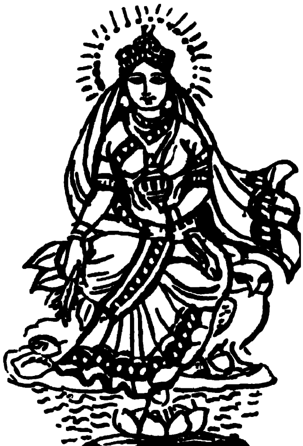

লক্ষ্মী

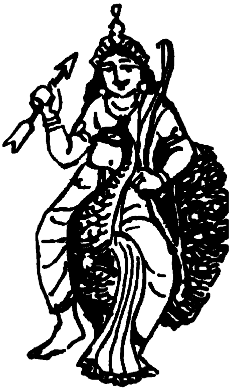

কার্তিকেয়

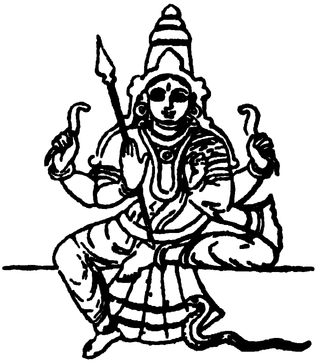

বৈবাট্যা

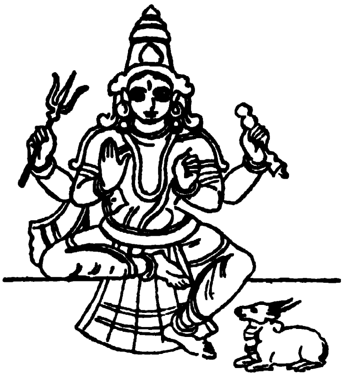

কালী

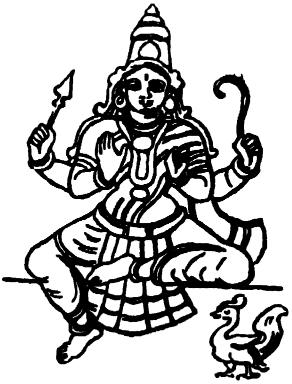

অচ্ছুপ্তা

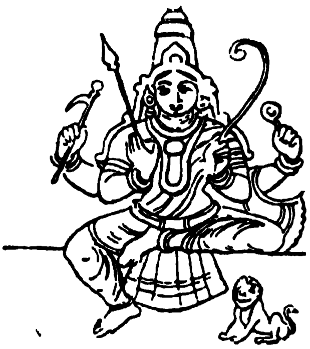

মানসী

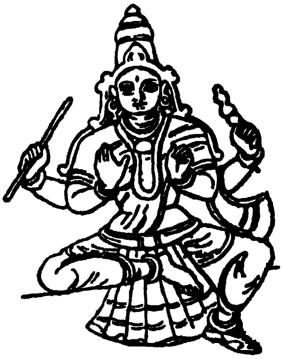

মহাকালী

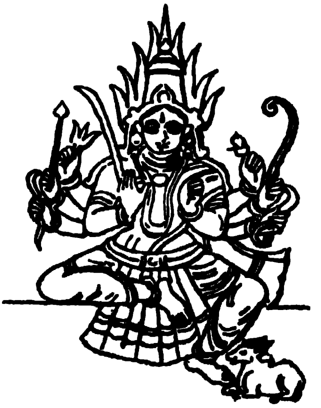

সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা

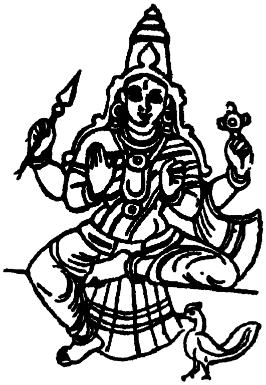

মহামানসী

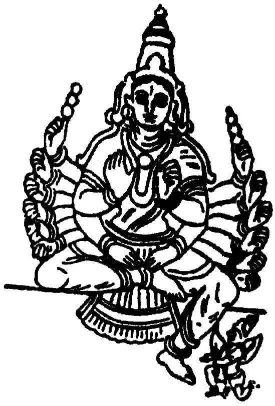

চক্রেশ্বরী

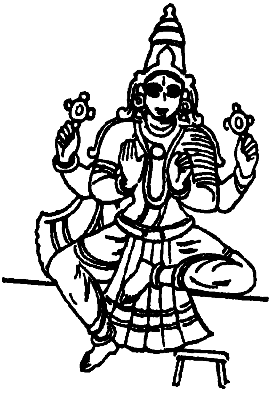

রোহিণী

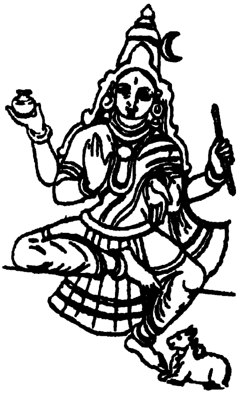

গৌরী

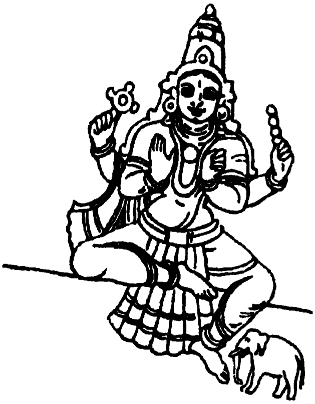

পুরুষদত্তা ভারতী

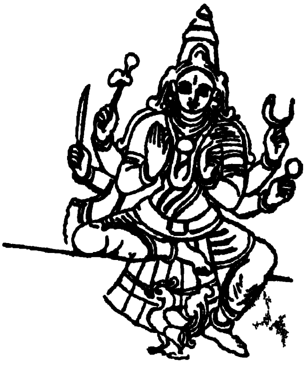

প্রজ্ঞপ্তী

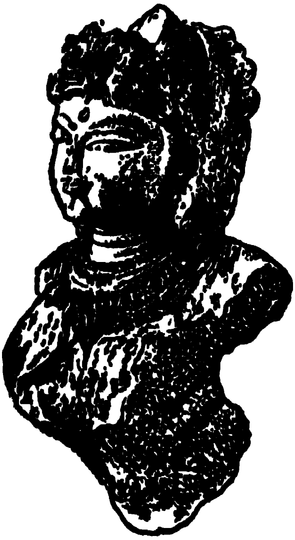

যোগিনী

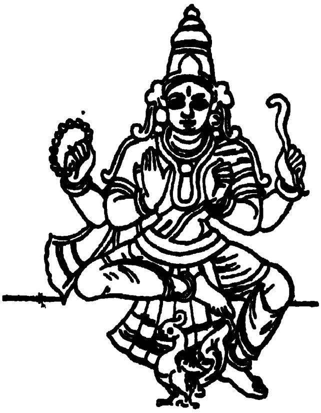

বজ্রশৃঙ্খলা

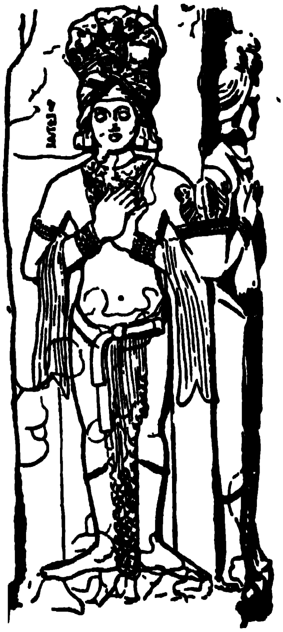

নাগরাজ

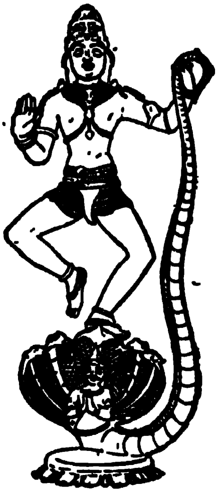

কালীয়দমন

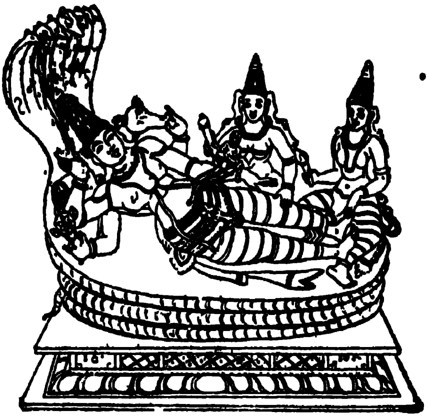

অনন্তশয্যা

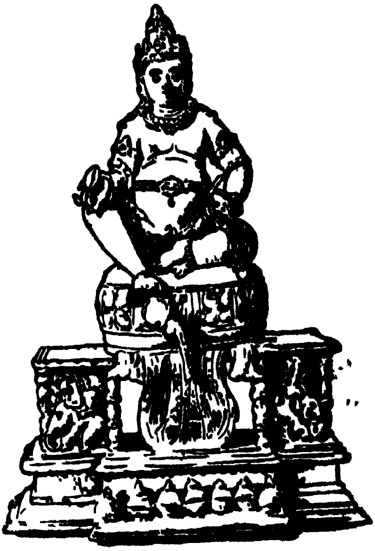

কুবের

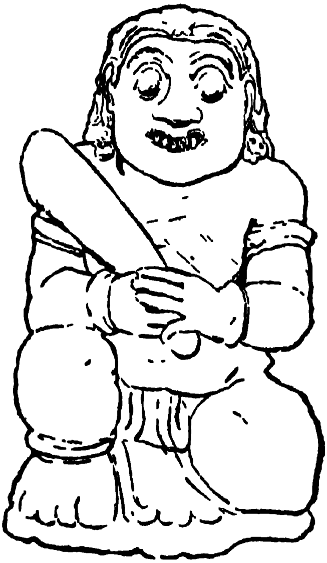

রাক্ষস

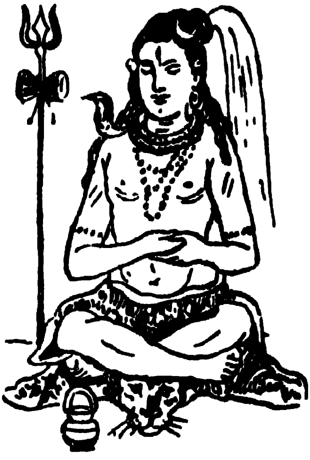

মহাদেব

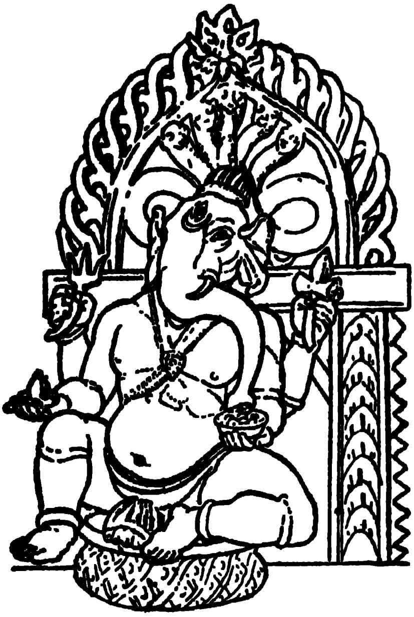

গণেশ

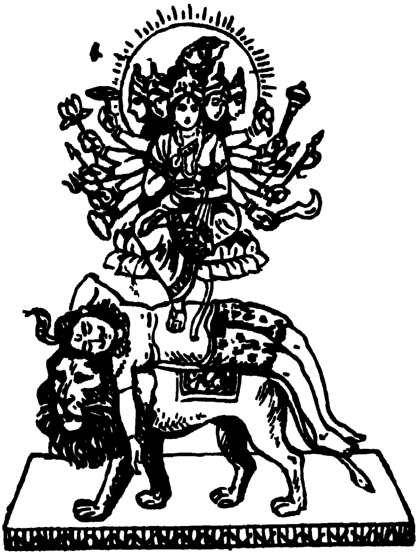

কামাক্ষ্যা

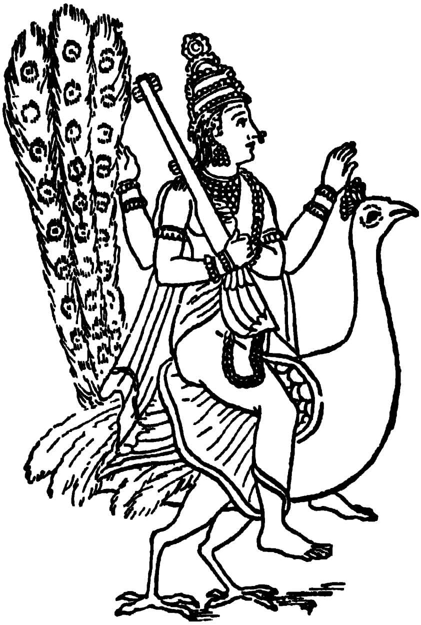

সরস্বতী

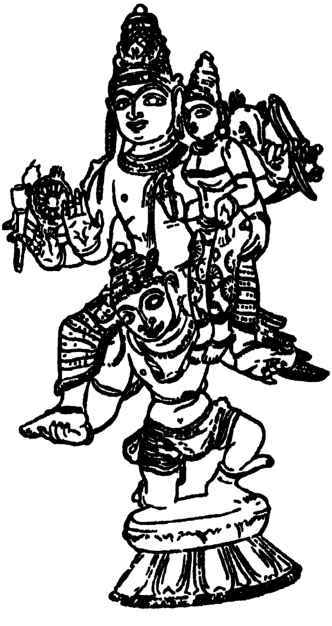

গরুড়পৃষ্ঠে—লক্ষ্মীনারায়ণ

জন্মে। প্রসেনজিতের স্যমন্তক নামে এক মণি ছিল। এই মণি বন্ধু সূর্যদেব তাঁকে দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ এই মণি প্রসেনজিতের নিকট যাচ্ঞা করেও পাননি। একবার প্রসেনজিৎ এই মণি ধারণপূর্বক মৃগয়ারত অবস্থায় জাম্ববান কর্তৃক নিহত হন। সকলেই সন্দেহ করে যে মণির জন্য ইনি কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়েছেন। পরে কৃষ্ণ জাম্ববানকে বধ করে তার কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেন, এবং যৌতুকস্বরূপ উক্ত মণি গ্রহণ করে প্রসেনজিতের ভ্রাতাকে উহা দান করেন।

প্রহ্লাদ –দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও তাঁর স্ত্রী কয়াধুর কনিষ্ঠ পুত্র। গোলোকে বিষ্ণুর ভক্ত দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয় শাপগ্রস্থ হয়ে মর্ত্যে তিনবার নারায়ণের শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ তিনবার এঁদের বধ করে উদ্ধার করেন। প্রথম জন্মে এঁরা যথাক্রমে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপু শুক্রাচার্যকে গুরুপদে বরণ করেন। এই জন্য শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক তাঁর গৃহেই বাস করতো। হিরণ্যকশিপু ষণ্ডামর্কের হস্তে প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। প্রহ্লাদ বিশেষ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; কিন্তু হিরণ্যকশিপু ছিলেন হরি-বিদ্বেষী। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হরিভক্তিতে বিরত করার যত প্রকার উপায় আছে, সবই অবলম্বন করে ব্যর্থ হন। তখন তিনি প্রহ্লাদকে খড়্গ দ্বারা নিহত করতে চেষ্টা করেন। হস্তিপদতলে, অগ্নিকুণ্ডে ও সাগরগর্ভে প্রহ্লাদকে তিনি নিক্ষেপ করেন ও সর্পবিষের সাহায্যে হত্যা করার চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুতেই প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি না হওয়ায় এক সন্ধ্যায় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "কে তোমাকে সমূহ বিপদ হতে রক্ষা করেন?" প্রহ্লাদ উত্তর দেন, "শ্রীহরি।" হরি কোথায় আছেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ বলেন, "তিনি সর্বত্রই আছেন।" ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে প্রহ্লাদকে বলেন, "এই স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যেও কি তোমার হরি আছেন?" প্রহ্লাদ উত্তর দেন, "হ্যাঁ, এই স্তম্ভের ভিতরেও হরি আছেন।" হরিকে দেখার উদ্দেশ্যে হিরণ্যকশিপু তখন স্তম্ভের উপর এক পদাঘাত করেন। এই পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ স্তম্ভের ভিতর থেকে এক নৃসিংহমূর্তি বহির্গত হয়ে, হিরণ্যকশিপুকে নিজের জানুর উপর স্থাপন করে, তাঁর বক্ষস্থল দুই হস্তের নখের সাহায্যে বিদীর্ণ করে বধ করেন। ব্রহ্মার বর ছিল, হিরণ্যকশিপুকে জীব, জন্তু বা কেহই কোন অস্ত্র দ্বারা নিহত করতে পারবে না—জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে, দিবসে বা রাত্রে তাঁর মৃত্যু হবে না।

সে কারণ নর-সিংহের ন্যায় অদ্ভুত প্রাণীর (যাহা মনুষ্য ও নহে, জন্তুও নহে) হতে, তাঁরই জানুদেশে, নখরাঘাতে, দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের রাজা হন।

প্রহস্ত—রাবণের প্রধানমন্ত্রী। লঙ্কাযুদ্ধে অকম্পনের পতন হলে, ইনি রাবণের আদেশে নিজের অনুচরসহ বানর-সৈন্য দলন করতে অগ্রসর হয়ে একে একে সকলেই নিহত হন। এঁর পুত্র জাম্বুমালী (রামায়ণ)।

প্রিয়ব্রত—ব্রহ্ম ও শতরূপার এক পুত্র, কিংবা অন্য সিদ্ধান্ত-অনুসারে স্বয়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইনি প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। সূর্য তাঁর কিরণ দ্বারা মাত্র অর্ধ-পৃথিবী আলোকিত করতেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রিয়ব্রত তাঁর বেগবান্ জ্যোতির্ময় রথে আরোহণপূর্বক সূর্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে রাত্রিকে দিনে পরিণত করতে চান। এর ফলে রথচক্রাগ্র দ্বারা সাতটি গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই সাতটি গহ্বর হতে সপ্ত-সমুদ্রের উৎপত্তি। এই সপ্তসাগর লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, জল ও দুগ্ধসাগর নামে খ্যাত। এই সপ্তসাগরের দ্বারাই সপ্ত-মহাদেশ বা সপ্তদ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রিয়ব্রতের কন্যা উর্জস্বতীর সঙ্গে শুক্রাচার্যের বিবাহ হয় এবং এঁরই গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করে। ইনি পরিণত বয়সে পুত্র আগ্নীধ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে বনবাসী হন (শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবীভাগবত ও অগ্নিপুরাণ)।

বিষ্ণুপুরাণ মতে রাজা প্রিয়ব্রত কর্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুই কন্যা ও দশটি পুত্র হয়। তিনটি পুত্র অত্যন্ত ধর্ম মনোভাবসহকারে জীবনযাপন করেন। অবশিষ্ট সাত পুত্রকে ইনি সপ্তদ্বীপ দান করেন।

ব

বক—(১) ঋষ্যশৃঙ্গ রাক্ষসের অলম্বুষ ও বক নামে দুই পুত্র ছিল। বকরাক্ষস একচক্রা গ্রামে বাস করতো ও গ্রামবাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করতো। শেষে গ্রামবাসীরা অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য রাক্ষসের সঙ্গে এক শর্তে আবদ্ধ হয়। সেই শর্তটি ছিল: প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে গ্রামের এক এক পরিবার থেকে এক একটি মানুষ, প্রচুর অন্ন ও দুইটি মহিষকে উক্ত রাক্ষসের খাদ্যরূপে প্রেরণ করতে হবে এবং এরই পরিবর্তে বকরাক্ষস দেশরক্ষা করবে। জতুগৃহদাহ হতে পরিত্রাণ পেয়ে পাণ্ডবরা একচক্রা নামক এই গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হওয়ায় তাঁর গৃহে

ভীষণ আতঙ্ক ও ক্রন্দনের রোল ওঠে। কুন্তী এই ঘটনা জ্ঞাত হয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন এবং ব্রাহ্মণের পরিবর্তে খাদ্যদ্রব্যসহ ভীমকে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করেন। ভীম সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীষণ যুদ্ধে বকরাক্ষসকে নিহত করে সমস্ত গ্রামে শান্তিস্থাপন করেন (মহাভারত—আদি)।

বকাসুর—মথুরাপতি কংসের অনুচর জনৈক অসুরের নাম। কংসের আদেশে ও তাঁর প্রীতার্থে এই অসুর বকরূপ ধারণপূর্বক ব্রজধামে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। কৃষ্ণ বক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অগ্নির ন্যায় তার গলদেশ দাহ করতে থাকেন। এই দহনজ্বালার অসহ্যতায় বক কৃষ্ণকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করে বধ করতে সচেষ্ট হলে, কৃষ্ণ এর চঞ্চুদ্বয় দ্বিধা-বিভক্ত করে একে নিহত করেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

বগলা—দেবীর মহাশক্তিবিশেষ। রুরু নামে এক অসুরের পুত্র দুর্গম ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে দেবতাদের পরাজিত করার ক্ষমতা লাভ করে। এই দুর্গম অসুর দেবতাদের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। দেবতারা ভগবতীর আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলে, তিনি নানা উপায়ে দেবতাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেন। দুর্গম অসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের সময় দেবীর শরীর হতে কালী, তারা, ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাসুন্দরী, কামাক্ষী, জম্ভিনী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা ও গুহ্যকালী প্রভৃতি মহাশক্তি আবির্ভূতা হন (দেবী-ভাগবত)।

(২) মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী—এঁরা দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাত।

বঙ্গ—বলিরাজের স্ত্রী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমা ঋষি হতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এঁরা সকলেই নিজের নামানুসারে নামীয় প্রদেশের রাজা হন। বঙ্গের নামানুসারে এঁর অধিকৃত রাজ্য বঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

বজ্র—(১) বৈদিক মতে বজ্র খড়্গাকার অমোঘ ও ভীষণ অস্ত্র (সারণ) বিশেষ।

(২) ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে—দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র বজ্র সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়। ইন্দ্র এই বজ্র দ্বারা বৃত্র ও অসুরদের বধ করেন।

(৩) বিশ্বকর্মা রবিকে ভ্রমিযন্ত্রে ভ্রমণ করিয়ে তাঁর তেজঃপুঞ্জকে পৃথক করেন। এই পৃথক্-কৃত সহস্র কিরণ-যুক্ত সূর্যতেজ বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল ও ইন্দ্রের বজ্ররূপে পরিণত হয় (মৎস্যপুরাণ)।

(৪) একদা ইন্দ্র দৈত্য-মাতার জঠরে প্রবেশ করে দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হস্ত রক্ষাকরতঃ ঊর্ধ্বমুখে আছে। তার নিকটেই এক মাংসপিণ্ড আছে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ মাংসপিণ্ড মর্দন করতে থাকেন। ফলে, ঐ মাংসপিণ্ড অত্যন্ত কঠিন হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উহা হতে কুলিশ উৎপন্ন হয় (বামন-পুরাণ)।

বজ্র অষ্টকোণ। অষ্টবজ্র বললে এই সকল অস্ত্রকে বুঝায়—বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্তিকেয়ের শক্তি এবং কালীর খড়্গ বা দুর্গার অসি।

(৫) যদুবংশের জনৈক নৃপতি-বিশেষ ও কৃষ্ণের প্রপৌত্র। প্রদ্যুম্ন পুত্র অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর পাণ্ডবগণ এঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়নপূর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর পুত্রের নাম প্রতিবাহু (হরিবংশ, মহাভারত)।

বজ্রকেতু—পাতালবাসী এক দৈত্য। এর পুত্র পাতালকেতু গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করেন (মৎস্যপুরাণ)।

বজ্রজ্বালা—কুম্ভকর্ণের স্ত্রী। ইনি বৈরোচন বলির দৌহিত্রী ছিলেন (রামায়ণ)।

বজ্রদংষ্ট্র—রাবণের অন্যতম সেনা-পতি। ধূম্রাক্ষের পতনের পর রাবণ বানর-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করবার জন্য এঁকে প্রেরণ করেন। ইনি অনেক বানর-সৈন্য নিহত করে শেষে অঙ্গদের শরে নিহত হন (রামায়ণ—লঙ্কা)।

বজ্রদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ ভগদত্তের পুত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বরক্ষকরূপে অর্জুন এখানে উপস্থিত হলে বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জুনের ভীষণ যুদ্ধ হয়। তিন দিন ঘোর যুদ্ধের পর বজ্রদত্ত অর্জুনের নিকট পরাস্ত হন (মহাভারত—আশ্বমেধিক)।

বজ্রনাভ—সুমেরুপর্বতশিখরবাসী এক অসুর। ব্রহ্মার বরে এই অসুর দেবতাদের অবধ্য হয়, এবং শত্রু যাতে নিজ পুরে প্রবেশ করতে না পারে, সে কারণ বজ্রপুর নামে দুর্গ-প্রাকার-বেষ্টিত এক রাজধানী লাভ করে। অতঃপর বজ্রনাভ সুমেরু ত্যাগ করে বজ্রপুরে এসে বাস করতে থাকে এবং দেবতাদের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। এমন কি, পরিশেষে ইন্দ্রকেও সে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করতে অনুরোধ করে এবং অন্যথায় যুদ্ধে ইন্দ্রকে আহ্বান করবে বলে জানায়। এই অসুরকে বধ করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মার বরে বজ্রনাভের এই সুরক্ষিত পুরীতে কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না।

এমন কি, বায়ু পর্যন্ত এই পুরীতে বজ্রনাভের আদেশ ব্যতীত প্রবেশলাভ করতে পারতেন না। ইন্দ্র স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করে স্বর্গের হংসদের বজ্রপুরের অন্তঃপুরস্থিত সরোবরে বিচরণ করতে বলেন এবং পরামর্শ দেন যে, তারা যেন বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে গোপনে আলাপ করে আত্মীয়তা স্থাপন করে এবং তাঁকে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরক্ত করতে সমর্থ হয়। এই হংসদের কৌশলে প্রভাবতীর মন প্রদ্যুম্নের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হংসমুখে এই সকল কথা শ্রবণকরতঃ প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরে প্রবেশ করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। উক্ত সময় ভদ্র নামে এক নট বজ্রপুরে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ করে। প্রদ্যুম্ন এই সুযোগে সেই নটের বেশে বজ্রপুরে প্রবেশ করেন। অতঃপর প্রভাবতীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের মিলন হলে গান্ধর্বমতে তাঁদের বিবাহ হয়। প্রভাবতীর দুই ভগিনী চন্দ্রাবতী ও গুণবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের দুই ভ্রাতা গদ ও শাম্বের বিবাহ হয়। যথাসময়ে এই কন্যাদের গর্ভে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই সকল ঘটনা বজ্রনাভের গোচরে এলে, তিনি যাদবদের বিনাশ সাধনে বজ্রপুরে উপস্থিত হন। তখন প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধকালে কৃষ্ণের চক্র প্রদ্যুম্নের হস্তগত হয়। এই চক্রদ্বারা প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভের মস্তক ছেদন করেন এবং যাদবরা বজ্রপুর অধিকার করে।

বজ্রপাণি—দেবরাজ ইন্দ্র।

বজ্রবারক—বজ্রপাত প্রতিষেধক। যাঁরা বজ্রপাত নিবারণ করেন। জৈমিনী, সুমন্ত্র, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য, পুলহ এবং বিষ্ণু—এই ছয় জন মহাতপার নাম স্মরণ করলে বজ্রপাত নিবারিত হয়।

বড়বামুখ—নারায়ণ একবার বড়বামুখ নামক এক তপস্বীর বেশ ধারণপূর্বক সুমেরুপর্বতে তপস্যারত ছিলেন। উক্ত সময়ে একদিন তিনি সমুদ্রকে আহ্বান করেন; কিন্তু সমুদ্র তাঁর বাক্যে কর্ণপাত করেন না। এই অবহেলার জন্য তিনি সমুদ্রকে অভিসম্পাত দেন যে, তার জল অপেয় হবে। সেই হতেই সমুদ্রের জল অপেয় হয় (মহাভারত—আদি)।

বৎসাসুর—শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে গোপ-বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলেন, তখন কংশের অনুচর এক দৈত্য তাঁকে বধ করার জন্যে গোবৎসরূপ ধারণপূর্বক অন্যান্য গোবৎসদের সঙ্গে বিচরণরত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জ্ঞাত হয়ে তার পশ্চাতের পদদ্বয় শূন্যে আবর্তনপূর্বক কপিত্থ গাছের উপর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

বড়বানল—সমুদ্রস্থ বহ্নি। কোন এক

সময় মহর্ষি ঔর্ব অযোনিজ পুত্রকামনায় নিজ বক্ষ হতে এক জ্বালাময় পুরুষ সৃষ্টি করবেন বলে স্থির করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই অগ্নিময় পুত্র অন্য সকলকে ধ্বংস করে জীবিত থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর উরু হতে সর্বধ্বংসকারী অগ্নিকে সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট হবার অব্যবহিত পরে সেই অগ্নি চিৎকার করে উঠে বলে : সে ক্ষুধিত, তাই পৃথিবী গ্রাস করতে চায়। তখন পৃথিবীর চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। ব্রহ্মার, সৃষ্ট পৃথিবী ধ্বংসের সম্মুখীন দেখে, তিনি ঔর্বের পুত্রের লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন এবং সমুদ্রের মুখে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। ব্রহ্মাও সমুদ্র হতে জন্মগ্রহণ করেন, ও সেখানেই বাস করেন। তিনি ও এই নূতন সৃষ্ট অগ্নি-পুরুষ প্রতি কল্পের শেষে দেবতা, অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে সমস্ত সৃষ্ট জিনিস ধ্বংস করে ফেলবেন বলে স্থির করা হয়। এঁকেই বড়বানল বলা হয় এবং এঁর আকৃতি অশ্বের মস্তকের উপর অগ্নিশিখার ন্যায় (হরিবংশ)।

বর্ণাশ্রম—চতুর্বর্ণের শাস্ত্রবিহিত কর্ম। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রম।

বদরিকাশ্রম—হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত অলকানন্দা নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ প্রভৃতির বাসভূমি।

বধূসরা—নদীর নাম। পুলোমা নামে এক রাক্ষস মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে পুলোমার শিশু গর্ভচ্যুত হয়। সেই হেতু উক্ত শিশুর নাম হয় চ্যবন। শিশু চ্যবনের দর্শনেই পুলোমা-রাক্ষস ভস্ম হয়ে যায়। তারপর ভৃগুপত্নী পুলোমা ক্রন্দনরতা অবস্থায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। ব্রহ্মা তাঁর এই রোরুদ্যমানা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দেন এবং এঁর অশ্রুধারায় যে নদীর সৃষ্টি হয়, তার নাম দেন বধূসরা।

বন্দী—এঁর পিতার নাম বরুণ। বন্দী জনকরাজার পুরোহিত ও অসাধারণ তার্কিক ছিলেন। ইনি তর্কে কহোড় ঋষিকে পরাজিত করেন এবং এই পরাজয়ের ফলস্বরূপ তাঁকে জলমগ্ন করেন। পরে কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্র তর্কে এই বন্দীকে পরাস্ত করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তাঁকেও জলমগ্ন করা স্থির করেন। তখন বন্দী বলেন, "রাজা জনককে দমন করে বরুণও এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। আমি ব্রাহ্মণদের জলমগ্ন করে সেই যজ্ঞ দর্শনে প্রেরণ করেছি। তাঁরা এখনই প্রত্যাবর্তন করবেন। আমি অষ্টাবক্রকে সম্মান করছি, তাঁর জন্যই আমি জলমগ্ন হয়ে পিতার সঙ্গে মিলিত হবো।" তখন অষ্টাবক্র কহোড়কে

দেখতে গেলেন (রামায়ণ—বন)।

বপুষ্টমা—কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার কন্যা। পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। জনমেজয় অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অশ্ব হনন করবার সময় বপুষ্টমা উক্ত হত অশ্বের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ইন্দ্র এঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁকে কামনা করেন এবং অশ্ব-শরীরে প্রবেশ করে বপুষ্টমার সহিত সংগমে রত হন। জনমেজয় অশ্বকে জীবিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, ইন্দ্রের দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হন। তখন রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে, অশ্বমেধ-যজ্ঞে আর কেহই ইন্দ্রের পূজা করবে না, তিনি বপুষ্টমাকেও এইজন্য তিরস্কার করেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু জনমেজয়কে বলেন, "আপনি তিন শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লোপ হবার আশঙ্কা হয়েছিল। এই জন্য তিনি অপ্সরা রম্ভাকে কাশীরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়ে এখানে প্রেরণ করেছিলেন। এই বপুষ্টমাই অপ্সরা রম্ভা। ইন্দ্র কৌশলে কার্যসিদ্ধি করে চলে গিয়েছেন। আপনা হতে ইন্দ্রের যে ভয় ছিল তাহা বিদূরিত হয়েছে। বপুষ্টমাকে বৃথা তিরস্কার করে কোন লাভ নাই। তাঁকে আপনি আবার গ্রহণ করুন।" বিশ্বাবসুর কথায় জনমেজয় বপুষ্টমাকে আবার গ্রহণ করেন (হরিবংশ)।

বভ্রু—(১) একজন যাদব। যদুবংশ ধ্বংস হলে ইনি যাদবরমণীদের রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হন। উক্ত সময় বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদের শাপসম্ভূত এক মুষল জনৈক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গরে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর দেহে পতিত হয় এবং তাঁর প্রাণসংহার করে (মহাভারত—মুষল)।

(২) মহর্ষি বভ্রু ঋক্‌বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ইনি অগ্নির স্তুতি সম্বন্ধে কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন।

(৩) বিশ্বামিত্রের অন্য পুত্র বভ্রু।

বভ্রুবাহন—চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জুনের পুত্র ও মণিপুরের রাজা। এঁর মাতা মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদা। পঞ্চপাণ্ডবরা নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন যে, একজন যখন দ্রৌপদীর সহিত একাকী বাস করবেন, তখন অন্য কোন পাণ্ডব সেই স্থানে গমন করবেন না যিনি এই নিয়ম লঙ্ঘন করবেন, তিনি নির্বাসিত হবেন। একবার অর্জুন ঘটনাচক্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে বাধ্য হওয়ায় স্বয়ং নির্বাসিত হন। নির্বাসিত হয়ে তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে করতে মণিপুরে এসে নাগকন্যা উলূপী ও মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জুনের যে পুত্র হয় তাঁর নাম বভ্রুবাহন।

অপুত্রক মাতামহ চিত্রবাহনের মৃত্যুর পর বভ্রুবাহনই রাজা হন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষকরূপে অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হন। পিতার আগমনবার্তা শ্রবণান্তে বভ্রুবাহন অগ্রবর্তী হয়ে পিতাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু এতে অর্জুন পুত্রের উপর রুষ্ট হয়ে বলেন যে, পুত্রের এই আচরণ ক্ষত্রিয়ধর্ম-বিরুদ্ধ। এ-স্থলে অভ্যর্থনার পরিবর্তে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্মরীতি। তখন বভ্রুবাহন যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করে বিমাতা উলুপীর প্ররোচনায় পিতা অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তুমুল যুদ্ধের ফলে অর্জুন শরবিদ্ধ অবস্থায় মূর্চ্ছিত ও নিপাতিত হন। চিত্রাঙ্গদা স্বামীর এই অবস্থা দর্শনে কাতর হয়ে মরণার্থ প্রায়োপবেশন করেন। তখন সপত্নী উলুপী নাগলোক হতে মৃতসঞ্জীবন-মণি আনয়ন করে বভ্রুবাহনকে এই মণি পিতার বক্ষে স্থাপন করতে বলেন। মণি বক্ষ স্পর্শ করামাত্র অর্জুন পুনর্জীবন লাভ করেন। অর্জুন পুনর্জীবিত হলে উলুপী বলেন যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শিখণ্ডীর সাহায্যে ভীষ্মকে নিহত করার অধর্মাচরণজনিত পাপে পুত্র কর্তৃক নিপাতিত হয়ে এতদিন পরে পাপমুক্ত হলেন। এই ভাবে প্রায়শ্চিত্ত না হলে অর্জুনের নরকবাস হতো। পুনর্জীবিত হয়ে অর্জুন পুনরায় যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করেন। জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপীর সহিত বভ্রুবাহন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন (মহাভারত)।

বরুণ—ঋষিদের ইনি একজন প্রধান দেবতা। ইনি দশ দিক্‌পালের অন্যতম ও একজন লোকপাল এবং জলের দেবতা নামে প্রখ্যাত। সূর্য তাঁর নেত্র, স্বর্ণময় তাঁর রথ ও প্রাসাদ। এঁর বহু অনুচর ছিল। ইনি বারুণী নামে সুরা পান করতেন। এই সুরা সমুদ্রমন্থন হতে উত্থিত হয়। বেদে বরুণ সহস্রলোচন বলে কথিত আছেন।

বেদে বহু স্থলে মিত্র ও বরুণ একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজিত হন। মিত্র ছিলেন আলোকের দেবতা। বরুণ অর্থাৎ আবরণ বা আবৃত করা। আবরণকারী আকাশকে আর্যরা বরুণ নামে পূজা করতেন। ঋক্‌বেদে ঋষিরা আকাশকে সমুদ্রের সঙ্গে কল্পনা করে জলময় মনে করতেন। এই জন্য ঋক্‌বেদ আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতেও বরুণের অবস্থিতি কল্পনা করেন। বরুণ সূর্যের গমনের পথ বিস্তার করে থাকেন। এঁর শত-সহস্র ওষধি আছে, অর্থাৎ ইনি যমের ন্যায় পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা। ইনি ধনাধিকারী, জলবিন্দুর মত শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের মত বলবান্। ইনি বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী, অন্ত-

রীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেছেন। ঋষিরা প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্যপরম্পরা দেখে বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদিকে স্বতন্ত্র কল্পনা করেছিলেন; কিন্তু পরে এঁদের ঐক্য দেখে ঈশ্বরের একত্ব অনুভব করেন। এই একত্বের জন্য মিত্র ও বরুণের নাম পার্থক্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক কাজ সম্পাদন করলেও মূলে এক ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নয়।

মহাভারতে কথিত আছে—ইনি কর্দম ঋষির পুত্র ও পুষ্করের পিতা। প্রায় একই সময়ে উর্বশীর কামনায় মিত্রাবরুণের এক কুম্ভমধ্যে শুক্রপাত হয়। এই তেজপূর্ণ শুক্র-নিক্ষিপ্ত কুম্ভ থেকে প্রথমে অগস্ত্য ও কিছুকাল পরে বশিষ্ঠের জন্ম হয়। খাণ্ডবদাহনের সময় অগ্নিকে সাহায্য করার জন্য বরুণ অর্জুনকে চন্দ্রপ্রদত্ত গাণ্ডীব ধনু, দুইটি অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী মে গদা প্রদান করেন। মহাভারতে আরও উল্লিখিত আছে যে, বরুণ চন্দ্রের কন্যা ও উতথ্যের স্ত্রী ভদ্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে যান। কিন্তু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েও ভদ্রাকে ফিরিয়ে না দেওয়ায় মহর্ষি উতথ্য জলরাশি পান করে ফেলেন। তখন বরুণ ভীত হয়ে ভদ্রাকে প্রত্যর্পণ করেন।

বরাহ—বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। মহাপ্রলয়ের সময় পৃথিবী জলমগ্না হলে স্বয়ম্ভুব মনু ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট অবস্থানের জন্য স্থান প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা এ-কথা শ্রবণ করে চিন্তা করতে থাকেন যে, তিনি পূর্বে একবার সমূহ জল পান করার পরও অকস্মাৎ আবার এই জল কি ভাবে উৎপন্ন হলো এবং এই জলমগ্ন পৃথিবী এখন আবার কি উপায়ে রক্ষা করা সম্ভব! অতঃপর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনি যখন ভগবানের হৃদয় হতে উৎপন্ন হয়েছেন, তখন সেই ভগবানই তাঁর কর্তব্য স্থির করে দেবেন। এইরূপ চিন্তারত অবস্থায় ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হতে সহসা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটি বরাহ নির্গত হয়। ক্ষণমধ্যে এই বরাহ ব্রহ্মার সম্মুখেই আকাশস্থ হয়ে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে এবং উক্ত বরাহের গর্জনে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সত্যলোক জনলোক ও তপোলোকবাসী মুনিরা বেদমন্ত্র দ্বারা এই বরাহকে বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে স্তুতি করতে থাকেন। এই বরাহ জলমধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেস্থলে দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করে, দন্তাগ্রভাগের সাহায্যে পৃথিবীকে ধারণপূর্বক ঊর্ধ্বে উত্থিত হন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ এই বরাহরূপী বিষ্ণুকে স্তব করতে থাকেন।

বর্চা—সোমদেবের (চন্দ্র) পুত্র। দেবতাদের অনুরোধে ইনি অর্জুনপুত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর

জন্মের পূর্বে চন্দ্র বলেন যে, এই পুত্র তাঁর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, এঁকে ত্যাগ করে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যদি ষোড়শ বৎসর কালের মধ্যে চক্রব্যূহে শত্রুবধ করে ও নিহত হয়ে এই পুত্র তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তবেই তিনি এঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করতে পারেন। চন্দ্র অধিকন্তু বলেন যে, এই পুত্রের সন্তানই পাণ্ডবদের বংশধর হবে (মহাভারত—আদি)।

বর্গা—এক অপ্সরা। বর্গা কুবেরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। একদা চার সহচরীসহ ইন্দ্রভবন হতে প্রত্যাবর্তনের পথে জনৈক ব্রাহ্মণ তাপসের সঙ্গে এদের দেখা হয়। এই পঞ্চ অপ্সরা নানা প্রকারে উক্ত তাপসের তপোভঙ্গ করে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হয় না। তখন তাপস ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এদের অভিসম্পাত দেন যে, তারা শত বৎসর কুম্ভীর হয়ে জলে অবস্থান করবে। পরিশেষে অপ্সরাদের বিশেষ অনুনয়-বিনয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত ক্রোধপরিহার করে বলেন যে, কোন পুরুষ যদি জলমধ্য থেকে তাদের উদ্ধার করে, তবেই তারা পূর্বরূপ ফিরে পাবে। একদা অর্জুন তীর্থভ্রমণ করতে এসে জ্ঞাত হন যে, পাঁচটি তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর বসবাস করে এবং তারা মানুষকে জলমধ্যে আকর্ষণ করে নেয়। বহু নিষেধ সত্ত্বেও অর্জুন একটি তীর্থে স্নান করতে নামেন। তৎক্ষণাৎ এক বৃহৎ জলজন্তু তাঁর পদদ্বয় আকর্ষণ করে। অর্জুন তাকে সবলে উপরে উত্তোলন করলে, উক্ত প্রাণী এক সুন্দরী নারীরূপ ধারণ করে। উক্ত নারীই অপ্সরা বর্গা। অতঃপর অর্জুন বর্গার অন্যান্য সখীদেরও উদ্ধার করেন (মহাভারত—আদি)।

বলরাম—ইনি এক অনন্তাবতার। মতান্তরে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম। ইনি বসুদেব ও তাঁর আর এক স্ত্রী রোহিণীর পুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বলভদ্র ও বলদেব নামেও ইনি প্রসিদ্ধ। দেবকীর যখন অষ্টম গর্ভ হয়, তখন যোগমায়া গর্ভ সংকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে এঁকে স্থাপন করেন। এইরূপে গর্ভ সঙ্কর্ষণের জন্য উক্ত গর্ভে যে পুত্র হয়, ঐ পুত্র 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হয়। ইনি নিজ বলে অতিশয় উন্নীত হন বলে বলভদ্র নামেও পরিচিত। বলরামের অস্ত্র 'হল'—এই জন্য এঁর অপর নাম হলধর বা হলায়ুধ। জন্ম হওয়ামাত্র কংশের হাত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য বলরাম গোকুলে নীত হন। নন্দ কর্তৃক কৃষ্ণের সহিত একত্রে ইনি প্রতিপালিত হন। সান্দীপনি মুনির নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বেদবিদ্যা, কলাবিদ্যা, ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র ও নীতি-

মার্গ ইত্যাদিতে পারদর্শী হন। গদাযুদ্ধে বলরাম অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি কৃষ্ণের সকল কর্মের সহায়ক ও লীলাসহচর। এঁরা উভয়ে একত্রে গোচারণ ও ক্রীড়া করতেন। বলরামের বাল্যকালের প্রধান ঘটনা—গর্দভরূপী বিরাট রাক্ষস ধেনুকাসুর-হত্যা। এই রাক্ষস তাঁকে আক্রমণ করলে, বলরাম তার চারিটি পা ধরে ঘুরিয়ে নিহত করেন। কৃষ্ণের মথুরায় গমনকালে বলরামও তাঁর সঙ্গে গমন করেন এবং বলরামের সাহায্যেই কৃষ্ণ কংশকে বধ করতে সমর্থ হন। কোন এক সময় বলরাম স্নানার্থ গমন করে জলক্রীড়ার জন্য যমুনা নদীকে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করেন; কিন্তু যমুনা সে আদেশ অবজ্ঞা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের হল দ্বারা যমুনাকে তীরের দিকে আকর্ষণ করে নিগৃহীত করেন। তখন যমুনা নিজ রূপ ধারণপূর্বক বলরামের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। বলরাম তাঁকে মুক্তি দিয়ে নিজে স্নান শেষ করেন। দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ংবর-সভায় শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব কৌরবগণ কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হন। বলরাম এই ঘটনা জ্ঞাত হয়ে কৌরবদের নিকট উপস্থিত হন; কিন্তু দুর্যোধন শাম্বকে মুক্তি দিতে অসম্মত হন। তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরবপুরী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করার জন্য লাঙ্গলাগ্র ঐ নগরীর প্রাকার-ভিত্তিতে সংলগ্ন করেন। এতে হস্তিনাপুর সবেগে ঘূর্ণিত হয়। দুর্যোধন তখন শাম্বসহ লক্ষ্মণাকে বলরামের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাঁর কাছে গদাযুদ্ধ শিক্ষার জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কংশহত্যার সংবাদ অবগত হয়ে তাঁর শ্বশুর জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করেন। তখন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জরাসন্ধ পরাজিত হন বটে, কিন্তু নিহত হন না। ভগিনী সুভদ্রা-হরণে ইনি অর্জুনকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের অনুরোধে তাঁকে ক্ষমা করেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। উভয়ের প্রতি সমান স্নেহবশতঃ তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন না করে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন।

গদাযুদ্ধে মগধরাজ জরাসন্ধও এঁর কাছে পরাজিত হন। বলরাম দুর্যোধন ও ভীমকে গদাযুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেন। দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধন ও ভীমের গদাযুদ্ধের সময় তিনি তীর্থভ্রমণ শেষে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে ভীম নিয়মবিরুদ্ধভাবে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলে তিনি এত বেশী ক্রুদ্ধ হন যে, নিজেই পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে উদ্যত হন; কিন্তু কৃষ্ণ অতি কষ্টে তাঁকে শান্ত করেন। যদুবংশ-ধ্বংসের পূর্বে কৃষ্ণের মৃত্যুর ঠিক আগে দ্বারকার বটবৃক্ষের নিচে

যোগসমাহিত অবস্থায় থাকাকালীন এঁর মুখ হতে রক্তবর্ণ সহস্রমুখ বৃহদাকার এক সর্প নির্গত হয়ে সমুদ্রে গমন করে। তখন বলরামের মৃত্যু হয়।

বলরামের জন্ম সম্বন্ধে অন্যমত প্রচলিত আছে। এই মতানুসারে তিনি নাগরাজ শেষের অবতার। সে কারণ, তাঁর মৃত্যুকালে উক্ত নাগ তাঁর মুখ হতে বহির্গত হয়। এঁর স্ত্রীর নাম রেবতী, রাজা রৈবতের কন্যা। রেবতীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে—নিশধ ও উল্মক। বলরামের অস্ত্র হিসাবে গদা, হল, মুষল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

বল্লভ—বিরাটরাজের রাজপ্রাসাদে ভীম ছদ্মবেশে বল্লভ নামে পরিচিত হয়ে পাচকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সময় কীচক দ্রৌপদীকে নির্যাতন করায় বল্লভের হস্তে নিহত হন (মহাভারত—বিরাট)।

বলি—দৈত্যরাজবিশেষ। ইনি হরিভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র। তপোবলে বলি অজেয় ও অমর হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে ইনি ত্রিভুবনের রাজা হন। এর ফলে দেবগণ রাজ্যচ্যুত হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন স্বীকৃত হয়ে বিষ্ণু বামনরূপে কশ্যপের পুত্র হয়ে জন্মান এবং বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করলে সেখানে গিয়ে কিছু দান প্রার্থনা করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে বলি প্রভূত দান করতে থাকলে বামন বলির কাছে মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি এতে সম্মত হয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমিদান করেন। দান প্রাপ্ত হওয়ামাত্র বামন আশ্চর্যরূপে বর্ধিত হতে থাকেন। বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করে নাভি হতে নির্গত তৃতীয় পদ রাখবার স্থান বলিকে নির্দেশ করতে বলেন। তখন বলি নিজ মস্তক অবনত করে তার উপর বামনকে তাঁর তৃতীয় পদ স্থাপন করতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করামাত্র বলি বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। এমন সময় তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুকে বলির বন্ধন মোচনের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর প্রার্থনায় বিষ্ণু বলির বন্ধন মোচন করে বলেন যে, "বলি, বহুকষ্ট স্বীকার করে তুমি নিজের সত্যপালন করেছ। সেই জন্য দেবতাদের দুষ্প্রাপ্য স্থান রসাতল তোমার বাসের জন্য দান করলাম।" তখন বিষ্ণুর আদেশে বলি রসাতলে বাস করতে থাকেন।

বরদা—যে বর দান করে; দেবীর নাম। সরস্বতীকেও 'বরদা' বলা হয়।

বশিষ্ঠ—ইনি মিত্রাবরুণের পুত্র। সে কারণ এঁর নাম মৈত্রাবরুণি। ইনি সৃষ্ট দশপ্রজাপতির অন্যতম। হরিবংশ মতে ইনি ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্রের অন্যতম। পুরাণান্তরে ইনি আবার সপ্তর্ষিগণের মধ্যেও একজন। ঋক্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলের এবং অন্য বেদেরও ইনি ঋষি। ইনি সূর্যবংশের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত। অরুন্ধতী এঁর স্ত্রী ও পরাশর এঁর পৌত্র। এঁর কৃপায় শক্তি শাপে রাক্ষসযোনিপ্রাপ্ত ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা সৌদাস শাপমুক্ত হন। রামচন্দ্রের কাছে ইনি যে রামায়ণ কীর্তন করেন, তাহা যোগবাশিষ্ঠ নামে খ্যাত।

একবার বিশ্বামিত্র সসৈন্য মৃগয়ায় গিয়ে পিপাসার্ত হয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে এক কামধেনু ছিল। এই কামধেনুর নিকট যাহা প্রার্থনা করা যেত, তাহাই পাওয়া যেত। বশিষ্ঠ এই কামধেনুর সাহায্যে বিশ্বামিত্রের অসংখ্য সৈন্যকে নানা প্রকার খাদ্যে পরিতোষের সঙ্গে সৎকার করেন। নন্দিনীর রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিজের রাজত্বের পরিবর্তে তাঁকে এই কামধেনু দান করতে বলেন। বশিষ্ঠ এতে অসম্মত হওয়ায় বিশ্বামিত্র সবলে নন্দিনীকে হরণ করতে চেষ্টা করেন। বশিষ্ঠের আদেশে নন্দিনী তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হতে অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে দেয়। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠের প্রতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করতে থাকেন; কিন্তু বশিষ্ঠ একাকী ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে সমস্তই ভস্মীভূত করে ফেলেন। তখন বিশ্বামিত্র গ্লানি-ভরে বলেন যে, ক্ষত্রিয়-বলকে ধিক্! ব্রহ্মতেজই প্রকৃত বল এবং তপস্যাই পরম বল। অতঃপর বিশ্বামিত্র রাজ্যত্যাগ করে তপস্যায় নিরত হন।

কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা একদিন মৃগয়ায় শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথে গমন-কালে সেই পথে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাজা শক্তিকে তাঁর পথ ছেড়ে দিতে বলায় শক্তি অসম্মত হয়ে বলেন যে, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। তখন রাজা শক্তিকে কশাঘাত করেন। তাতে শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে কল্মাষপাদকে নরমাংসভোজী রাক্ষসরূপ ধারণ করার অভিসম্পাত দেন।

এক সময়ে কল্মাষপাদকে যজমান-রূপে লাভের জন্য বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। অভিশপ্ত রাজা যখন শক্তিকে প্রসন্ন করবার চেষ্টায় রত ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস-

রাজা কল্মাষপাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর কল্মাষপাদ বিকৃতরূপ রাক্ষসে পরিণত হন। একদিন সেই রাক্ষসই শক্তিকে বধ করে ভক্ষণ করে। এরপর বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় কল্মাষপাদরূপী রাক্ষস বশিষ্ঠের শত পুত্রের সকলকেই ভক্ষণ করে। পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ বহু প্রকারে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে বিফল হন। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করে শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে পশ্চাতে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেয়ে দেখেন যে, শক্তির গর্ভবতী স্ত্রী তাঁকে অনুসরণ করছেন এবং উক্ত গর্ভস্থ সন্তানের বেদপাঠের ধ্বনিই শ্রুত হচ্ছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে ও তার দ্বারা বংশরক্ষা হবে—এই কথা জ্ঞাত হয়ে আনন্দিত বশিষ্ঠ পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। পথিমধ্যে কল্মাষপাদরূপী রাক্ষস বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলে, তিনি তার শরীরে মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করে শাপমুক্ত করেন এবং তাকে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে ও ব্রাহ্মণকে অপমান না করতে বলেন। কল্মাষপাদ ব্রাহ্মণদের পূজা করতে স্বীকৃত হন এবং পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য একটি পুত্র প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ তখন কল্মাষপাদের স্ত্রীর গর্ভে অশ্মক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন।

বশিষ্ঠের পুত্রবধূ ও শক্তির স্ত্রী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—রাজর্ষি নিমি একবার দীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বশিষ্ঠকে পুরোহিতরূপে বরণ করেন। কিন্তু তার পূর্বেই বশিষ্ঠ ইন্দ্রের এক যজ্ঞে বৃত হয়েছিলেন বলে নিমিকে অপেক্ষা করতে বলেন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে নিমির যজ্ঞে নিযুক্ত হতে সম্মত হন। বহু বৎসর পরে ইন্দ্রের যজ্ঞ হতে ফিরে এসে তিনি জ্ঞাত হন যে, নিমি গৌতম ঋষির সাহায্যে ইতঃপূর্বেই যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেছেন। তখন বশিষ্ঠ নিমির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন যে, নিমির দেহ চেতনাবিহীন হবে। নিমিও বিনা অপরাধে অভিশপ্ত হওয়ায় বশিষ্ঠকে প্রত্যাভিশাপ দেন যে, বশিষ্ঠও চেতনাবিহীন হবেন। তখন বশিষ্ঠ অশরীরী হয়ে অন্য দেহ ধারণের জন্য ব্রহ্মার সমীপস্থ হন এবং একটি দেহ দান করার জন্যে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বলেন। এর ফলে মিত্রাবরুণের ঔরসে ও উর্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠ আবার শরীরী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধের কথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত

আছে—বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। উক্ত সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি ও রাজ্যনাশ, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় ইত্যাদির জন্য বিশ্বামিত্রই দায়ী ছিলেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং অভিশাপ দিয়ে বিশ্বামিত্রকে এক বকপক্ষীতে পরিণত করেন। বিশ্বামিত্রও প্রতিশোধস্বরূপ বশিষ্ঠকে অন্য এক পক্ষীতে পরিণত করেন। পক্ষিরূপেই এই দুই ঋষি এমন ঘোর যুদ্ধে নিযুক্ত হন যে, সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়ে ওঠে এবং অসংখ্য প্রাণী ধ্বংস হয়। তখন ব্রহ্মা তাঁদের পূর্বদেহ ফিরিয়ে দিয়ে দুই জনের মধ্যে শান্তি-স্থাপন করে এই কলহের অবসান ঘটান (মহাভারত—আদি, রামায়ণ ইত্যাদি)।

রামায়ণে দেখা যায় যে, বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের কুলপুরোহিত ছিলেন। দশরথের পুত্রদের জাতকর্ম, বিবাহ, অভিষেক ইত্যাদি কর্মে ইনি পৌরোহিত্য করেন। বনবাসান্তে রাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বশিষ্ঠ তাঁর একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা হন।

বর্ষ—দেশ। পৃথিবীর বৃহৎ পর্বত-শ্রেণীর মধ্যে নয়টি দেশ অবস্থিত। এই বর্ষগুলির নাম ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক, হিরণ্ময়, উত্তরকুরু, ইলাবর্ত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালা।

বসু—(১) দেবতাবিশেষ। বসু নামে আট জন গণদেবতা আছেন। এঁরা হচ্ছেন—ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস ও দ্যু। এঁরা সকলেই ইন্দ্রের অনুচরবিশেষ। বসুগণ বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে হরণ করায় বশিষ্ঠের শাপে গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম এই বসুদের অন্যতম। এই আট জন অষ্টবসু নামে খ্যাত।

এই বসুগণ গঙ্গাকে অনুরোধ করেন যে, তাঁরা মানুষীর গর্ভে গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে চান। তাঁরা বলেন যে, রাজা শান্তনু এঁদের পিতা হবেন, এবং জন্মমাত্রই যেন তাঁরা জলে নিক্ষিপ্ত হন। তা'হলে তাঁরা শীঘ্রই পৃথিবী হতে নিষ্কৃতিলাভ করবেন। গঙ্গা এতে সম্মত হয়ে বলেন যে, তাঁর একটি পুত্র যেন জীবিত থাকে; নতুবা শান্তনুর সঙ্গে তাঁর সংগম ব্যর্থ হবে। বসুগণ তখন তাঁদের প্রত্যেকের বীর্যের অষ্টমাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে বলেন যে, তার ফলে সেই পুত্রটি জীবিত থাকবে। শান্তনুর সহিত গঙ্গার বিবাহের শর্ত ছিল যে, গঙ্গা যে কার্যই করুন না কেন শান্তনু তাঁকে বাধা দিতে পারবেন না। ক্রমে গঙ্গার আটটি দেবকুমার-তুল্য পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মমাত্র এক এক করে তাদের সাতটি জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

অষ্টম পুত্রের নিক্ষেপকালে শান্তনু পুত্রশোকে কাতর হয়ে গঙ্গাকে ভর্ৎসনা করলে, গঙ্গা আত্মপরিচয় দিয়ে বসুগণের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। বসু ভ্রাতৃগণের মধ্যে অন্যতম দ্যু বসু। ইনি নিজ স্ত্রীর প্ররোচনায় বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেছিলেন। শাপ দেওয়ার পর বসুগণের অনুনয়ে বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে, তাঁরা সকলে এক বৎসরের মধ্যে মুক্ত হবে। কিন্তু দ্যু বসু নিজ কৃতকর্মের জন্য দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বসবাস করবে। সে কারণ গঙ্গা বসুদের মনুষ্যজন্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্য জলে নিক্ষেপ করতেন। কেবল দ্যু বসুই (অষ্টম পুত্র) দীর্ঘজীবী; কিন্তু সে নিঃসন্তান হয়ে মনুষ্যলোকে বাস করবে এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ করবে। এই বলে গঙ্গা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্তর্হিতা হন ও পরে সর্বশাস্ত্রবিশারদ করে তাঁকে শান্তনুর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। এই পুত্রই পরে দেবব্রত ভীষ্মরূপে বিখ্যাত হন।

ঋক্‌বেদে বসুগণকে প্রকৃতির নিয়ামকরূপে এবং মন্ত্রপাঠরত অবস্থায় দেখা যায়। এই গণদেবতারা ধরার নিয়ন্তা ছিলেন। তাঁরা ধনরক্ষক এবং ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতির অনুগত সহকারী।

(২) চেদি দেশে বসু নামে কুরুবংশজাত এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রের অনুগ্রহে ইনি চেদিরাজ্য অধিকার করে সেখানে রাজত্ব করতেন। কিছুদিন পরে বসু অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় রত হন। এঁর কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র এঁর কাছে উপস্থিত হন এবং নানা প্রকার মিষ্টবাক্যে এঁকে তপস্যা পরিত্যাগ করে রাজ্যশাসনে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। ইন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ইনি তপস্যা ত্যাগ করেন এবং রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হন। ইন্দ্র এঁকে সখাভাবে গ্রহণ করে একখানি আকাশগামী স্ফটিকের বিমান, বৈজয়ন্তীমালা এবং একখানি বংশনির্মিত যষ্টি দান করেন। বসু ইন্দ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন বলে তাঁর নাম হয় উপরিচর-বসু। তাঁর পাঁচ পুত্র বিভিন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানীর নিকটস্থ শুক্তীমতী নদীর গর্ভে কোলাহল পর্বত একটি পুত্র ও গিরিকা নামে একটি কন্যা উৎপন্ন করে। রাজা সেই কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই পুত্রকে তাঁর সেনাপতি করেন। একদিন মৃগয়াকালে তাঁর রূপবতী স্ত্রীর স্মরণে তাঁর শুক্র স্খলিত হলে, এক শ্যেনপক্ষীকে দিয়ে রাজা সেই শুক্র গিরিকাকে পাঠিয়ে দেন। পথিমধ্যে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণে সেই শুক্র যমুনায় পতিত হয় এবং অদ্রিকা নাম্নী এক মৎসী সেই শুক্র গ্রহণ করে

গর্ভবতী হয়। যথাসময়ে এক ধীবররাজ তার উদর হতে এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। পুত্রটি পরে মৎস্য নামে এক ধার্মিক রাজা হয় এবং কন্যাটির নাম হয় সত্যবতী। ইনি মৎস্যগন্ধা নামে পরিচিতা এবং ব্যাসদেবের মাতা (মহাভারত)।

বসুদেব—যাদববিশেষ ও কৃষ্ণের পিতা। এঁর পিতা যদুবংশীয় শূর ও মাতা ভোজকন্যা মহিষী। বসুদেবের স্ত্রীর নাম দেবকী। পৃথা বা কুন্তী এঁর সহোদরা। বসুদেবের অন্য স্ত্রীর নাম রোহিণী। রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। দেবকীর সহিত এঁর বিবাহকালে কংশ দৈববাণী শ্রবণ করেন যে, দেবকীর অষ্টম সন্তান কর্তৃক তিনি নিহত হবেন। সেই জন্য কংশ বসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করেন। এর পর দেবকীর গর্ভে এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করতে থাকে এবং কংশ কর্তৃক তাঁরা নিহত হয়। সাতটি সন্তান নিহত হবার পর দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ট হওয়ামাত্র বসুদেব পুত্রকে ঘোর অন্ধকার রাত্রে যমুনার অপর পারে নন্দের গৃহে তাঁর স্ত্রী যশোদার নিকট রেখে, তার অজ্ঞাতেই নন্দের সদ্যোজাতা কন্যাকে এনে দেবকীর পাশে রেখে দেন। কংশ এই কন্যাকে পাষাণে নিক্ষেপ করতে গেলে, এই কন্যা শূন্যে উত্থিত হয়ে কংশের বিনাশকারী জন্মগ্রহণ করেছে বলে আকাশবাণী করে অন্তর্ধান করেন। এই কন্যা মহামায়া। পরে কৃষ্ণ ও বলরাম কংশের ধনুর্যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিনাশ করে বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করেন। কৃষ্ণ মথুরার রাজা হলে বসুদেব স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেন। রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের সুভদ্রা নামে এক কন্যা হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগ করলে ইনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং উক্ত সময় অর্জুন উপস্থিত হলে তাঁকে কৃষ্ণের শেষ আদেশ জ্ঞাপন করে যোগারূঢ় অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

বসুধারা—অন্তরীক্ষচারী রাজা উপরিচর দেব-ব্রাহ্মণ-বিবাদে দেবপক্ষ গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ-শাপে আকাশে গতিহীন ও ভূবিবরগত হলে, দেবতারা তাঁর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য যজ্ঞে বিপ্রপ্রদত্ত বসুধারা (ঘৃতধারা) পানের বিধান করেন। সেজন্য বসুর ঘৃতধারা বসুধারা নামে প্রসিদ্ধ। প্রীতিকামনায় চেদিরাজ বসুর উদ্দেশে এই ঘৃতধারা দেওয়া হয় বলে এর নাম বসুধারা। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসুধারা দিতে হয়। সাধারণতঃ এই ধারা প্রাচীর গাত্রে দেওয়াই বিধেয়। বসু শব্দের অর্থ ঘৃত।

বসুমনা—বিশ্বামিত্রের চার পুত্র—

অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা এবং শিবি। এই চার ভ্রাতা একদা রথারোহণে গমনকালে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে মিলিত হন। এই একত্রে যাত্রার সময় এক ভ্রাতা নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁরা চার ভ্রাতাই স্বর্গে অবস্থান করেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কে নরলোকে সর্বাগ্রে প্রত্যাবর্তন করবেন তা' কি তিনি বলতে পারেন? উত্তরে নারদ বললেন যে, আত্মশ্লাঘার জন্য অষ্টকেরই সর্বাগ্রে পতন হবে। তারপর অসূয়াবশতঃ দান করবার জন্যে প্রতর্দন এবং তৎপরে বসুমনা। দেবর্ষি নারদের আশীর্বাদে বসুমনা পুষ্পকরথ লাভ করেন। বসুমনা স্বীকার করেন যে, এই রথ নারদেরই। কিন্তু নারদ যখন একদিন এই রথ নিজ প্রয়োজনে যাজ্ঞা করেন, তখন কপটবাক্যে বসুমনা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই কপটবাক্যের জন্য বসুমনার পতন হয়। তখন নারদ বলেন যে, শিবির পতন হবে না; বরং তাঁর নিজেরই পতন হবে। কারণ, একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে শিবিকে তাঁর পুত্র বৃহৎগর্ভকে বধ করতে ও তার মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণের আহারের জন্য দিতে বলেন। শিবি উক্ত ব্রাহ্মণকে পুত্রের পক্ক মাংস ও অন্ন নিবেদন করলে তিনি অধোবদন হয়ে থাকেন। কিন্তু শিবি পুনরায় তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি শিবিকেই উক্ত মাংস ভক্ষণ করতে বলেন। শিবি ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত হলে ব্রাহ্মণ বলেন যে, শিবি জিতেন্দ্রিয়; ব্রাহ্মণের জন্য তিনি সবই ত্যাগ করতে পারেন। তখন শিবি দেখেন যে, তাঁর পুত্র সশরীরে তাঁরই সম্মুখে উপস্থিত। এই ব্রাহ্মণই স্বয়ং বিধাতাপুরুষ, রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন (মহাভারত—বন)।

বসুমতী—পৃথিবীর অন্য নাম বসুমতী। সুবর্ণ অগ্নির তেজে উৎপন্ন হয়। পৃথিবী এই সুবর্ণ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বসুমতী (মহাভারত—অনুশাসন)।

বসুষেণ—কর্ণ জন্মগ্রহণকালে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। সেজন্য এঁর অন্য নাম বসুষেণ।

বৎসাসুর—কংশের অনুচর এক অসুর। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংশ এই অসুরকে বৎসরূপে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ তা জ্ঞাত হয়ে একে বধ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

বাজশ্রবা—গৌতম বংশজাত মহর্ষি বাজশ্রবা এক যজ্ঞে নিজের সর্বস্ব দান করেছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম নচিকেতা। বাজশ্রবা একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে নচিকেতাকে তাঁকে যমকে দান করবেন বলেন। পিতৃসত্য পালনের

জন্য নচিকেতা নিজেই যমালয়ে উপস্থিত হন এবং যমের নিকট হতে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন (কঠোপনিষৎ)।

বাণ—দৈত্যরাজ বলির একশত পুত্রের মধ্যে বাণ শ্রেষ্ঠ। বাণ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর অনুগ্রহভাজন হন এবং তাঁরই আদেশানুসারে শোণিতপুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে থাকেন। শিবভক্ত বলে বাণ দেবতাদের অজেয় হয়ে তাঁদের উপর উৎপীড়ন করতে থাকেন। বাণের কন্যা ঊষা কৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হনএবং সখী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁকে অজ্ঞাতভাবে রাজভবনে এনে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। বাণ এই সংবাদ অবগত হয়ে অনিরুদ্ধকে নিহত করার জন্য নিজের সৈন্যদের আদেশ দেন। বাণের সমস্ত সৈন্য পরাজিত হবার পর বাণ স্বয়ং যুদ্ধে নেমে অনিরুদ্ধকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র প্রদ্যুম্ন ও বলরামের সঙ্গে যুদ্ধার্থ শোণিতপুরে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে মহাদেব বাণের পক্ষ অবলম্বন করলেও কৃষ্ণের হাতে বাণ পরাজিত হন। পরিশেষে বাণ কৃষ্ণের দয়ায় মহাকাল নামে বিখ্যাত হয়ে মহাদেবের অনুচরগণের মধ্যে গণ্য হন। তাঁর শোণিতপুর রাজ্য কৃষ্ণ বাণ-মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডকে দান করেন।

বাতাপি—এক রাক্ষস এবং ইল্বলের ভ্রাতা। এরা প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠপুত্র হ্লাদের পুত্র ছিল। একদিন ইল্বল এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে একটি ইন্দ্রতুল্য পুত্র বর প্রার্থনা করে; কিন্তু ব্রাহ্মণ তাবপ্রার্থনা পূর্ণ না করায় ইল্বল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মায়াবলে বাতাপিকে মেষে রূপান্তরিত করে তার মাংস রেঁধে ব্রাহ্মণকে ভোজন করতে দেন। ভোজনান্তে ইল্বল ভ্রাতা বাতাপিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন। বাতাপি সহাস্যে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করে বহির্গত হয়। এই প্রণালীতে দুই ভ্রাতা বহু ব্রাহ্মণকে হত্যা করে। মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বিবাহ করার পর একদিন সহবাস প্রার্থনা করলে, লোপামুদ্রা স্বামীর কাষায়বস্ত্র গেরুয়া অপবিত্র করতে অনিচ্ছুক হয়ে সালঙ্কারা দিব্যাভরণভূষিতা হয়ে পতির সঙ্গে মিলিত হতে চান। অগস্ত্য তখন স্ত্রীকে সালঙ্কারে ভূষিতা করার জন্য অর্থান্বেষণে বহির্গত হয়ে বাতাপি ও ইল্বলের নিকট উপস্থিত হন। অতিথি-সংকারের পর বাতাপি মেষে রূপান্তরিত হয় এবং ইল্বল তার মাংস অগস্ত্যকে আহার করতে দিলে, তিনি একা সমস্ত মাংস আহারান্তে অচিরে জীর্ণ করে ফেলেন। পূর্বের ন্যায় ইল্বল বাতাপির নাম ধরে

আহ্বান করলে অগস্ত্য তাকে বলেন যে, বাতাপি তাঁর উদরে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ইল্বল বিষণ্ণ ও ভীত হয় অগস্ত্যের বাসনা জানতে চাইলে অগস্ত্য তাঁর বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করেন। তখন ইল্বল বাঞ্ছিত ধন প্রদান করে অগস্ত্যকে বিদায় দেন (ইল্বল দেখ)।

বানপ্রস্থ—মানব-জীবনের তৃতীয় আশ্রম বলে কথিত। প্রৌঢ় বয়সে সংসার ত্যাগ করে বনে বসবাসের নাম বানপ্রস্থ। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার প্রকার আশ্রম। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ্য ও তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করতে হয়।

বামন—বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। প্রহ্লাদের পৌত্র দৈত্যরাজ বলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে দেবতাদের দেবলোক হতে নির্বাসিত করলে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বলিকে দমন করে দেবতাদের উদ্ধার করার জন্যে কশ্যপমুনির ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একবার বলি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে প্রচার করেন যে, এই যজ্ঞে তাঁর কাছে যে যা প্রার্থনা করবে, তিনি তাই পূরণ করবেন। এক বামন যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে বলির কাছে মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। যজ্ঞকার বলি চিন্তা করলেন যে, ক্ষুদ্র এই ব্রাহ্মণের ত্রিপাদ ভূমি আর কতটুকু। তাই তিনি ত্রিপাদ ভূমিদানে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে বলিকে এই দান করতে নিষেধ করেন। কিন্তু বলি বলেন যে, তিনি দান করবেন বলে যা অঙ্গীকার করেছেন, তা অস্বীকার করতে পারেন না। বলি তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করলে শুক্রাচার্য সংকল্পিত জলগ্রহণে বাধাদানের জন্য অদৃশ্যভাবে ভৃঙ্গারের মধ্যে প্রবেশ করে ভৃঙ্গার-বিবর বন্ধ করেন। তখন বামনের উপদেশানুসারে কুশদ্বারা অবরুদ্ধ ভৃঙ্গার-বিবর মুক্ত করা হয়। এতে শুক্রাচার্যের একচক্ষু কুশবিদ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। বলির সংকল্প শেষ হওয়ামাত্র বামন তাঁর এক পদ দিয়ে দিঙ্মণ্ডল আয়ত্ত করেন। অতঃপর দ্বিতীয় পদ বিস্তার করলে স্বর্গ তাঁর আয়ত্তে আসে। তৃতীয় পদের জন্য বামন তখন পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। তখন বলি বলেন, "আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন।" বলির স্ত্রী বিন্ধ্যাবলী স্বামীকে পাপমুক্ত করার জন্য বামনকে অনুরোধ করেন। কারণ, বলি তখন তাঁর সমস্তই বামনকে অর্পণ করেছেন। বিষ্ণু বলির সত্যবাদিতা ও পরম ভক্তি দেখে প্রীত

হয়ে বলেন যে, সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হবে এবং এই মন্বন্তর না আসা পর্যন্ত পাতালে সে বাস করবে (ভাগবত)।

বারুণী—(১)পুরাণমতে বারুণী বরুণ-কন্যা ও সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সমুদ্র-মন্থনকালে পূর্বদিকে অবস্থিত অপ্সরা-গণের বিহারস্থান ক্ষীরোদসমুদ্র হতে চন্দ্র, সুধা, স্বধা, ধন্বন্তরি, অপ্সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ এবং লক্ষ্মীর সহিত বরুণকন্যা বারুণী উত্থিত হন। দিতির পুত্ররা এঁকে গ্রহণ না করায় তাঁরা অসুর-নামে খ্যাত হন, এবং অদিতির পুত্ররা এঁকে গ্রহণ করায় তাঁরা সুর নামে খ্যাত হন (রামায়ণ—আদি)।

(২) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী বিনতা হতে বারুণী, গরুড় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত—আদি)।

(৩) বরুণের পুত্র বলে অগস্ত্য, ভৃগু ও বশিষ্ঠ বারুণী নামে কথিত হন।

বারণাবত—গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থ প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী। বর্তমান নাম প্রয়াগ। এই নগরে দুর্যোধন জতুগৃহ নির্মাণ করে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবদের জীবন্ত দগ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বাস করতে প্ররোচিত করেন। যাত্রাকালে বিদুর এই বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছ ভাষায় সতর্ক করে দেন। পরে বিদুর-প্রেরিত খনকের সাহায্যে পাণ্ডবরা জতুগৃহে গুপ্ত সুড়ঙ্গ খননপূর্বক উহাতে অগ্নিসংযোগ করে পলায়ন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পঞ্চপুত্রসহ নিদ্রিতা এক নিষাদী ও দুর্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন উক্ত জতুগৃহে দগ্ধ হন।

বালখিল্য ঋষি—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ যাট হাজার ঋষি। ঋগ্‌বেদের উল্লেখ-অনুসারে এঁরা ব্রহ্মার লোম হতে উদ্ভূত মানষপুত্র। ঋগ্‌বেদে এঁদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, একবার কশ্যপঋষি পুত্রকামনায় এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কশ্যপ ইন্দ্রকে বালখিল্য মুনিদের দ্বারা যজ্ঞের কাষ্ঠ আনয়নে নিযুক্ত করেন। খর্বাকৃতি ও দুর্বল বালখিল্যরা সকলে মিলিতভাবে মাত্র একটি পত্র বহন করে আনবার সময় জলপূর্ণ এক গোষ্পদে পতিত হন। এই দেখে ইন্দ্র এঁদের উপহাসপূর্বক লঙ্ঘন করে চলে যান। এইরূপে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বালখিল্যরা অধিকতর বলশালী এক ইন্দ্রের উৎপত্তির জন্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই সংবাদ অবগত হয়ে ইন্দ্র কশ্যপের শরণাপন্ন হন। কশ্যপ তখন বালখিল্যদের বলেন যে, ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁকে আর একটি ইন্দ্র সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মার নিয়ম অমান্য করা হবে। তবে অন্য ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ না করে এক পক্ষিশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করবে। কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করে

বালখিল্যরা সন্তুষ্ট হন। কশ্যপের স্ত্রী বিনতা ঋতুস্নান করে তাঁর কাছে গমন করলে, তিনি স্ত্রীর মনের বাসনা পূর্ণ করে বলেন, "বালখিল্য মুনিদের তপঃপ্রভাবে ও আমার সংকল্পবলে তোমার গর্ভে দুই বীর পুত্রের আবির্ভাব হবে। এই দুই বীর সমস্ত পক্ষিজাতির উপর ইন্দ্রত্ব করবে। এদের নাম অরুণ ও গরুড়।" বিনতার গর্ভে সূর্যসারথি অরুণ ও বিষ্ণুর বাহন গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। গরুড় জন্মের পর ক্ষুধার্ত হয়ে পিতার নির্দেশে গজকচ্ছপ ভক্ষণের জন্য এক বটবৃক্ষের শাখায় স্থান গ্রহণ করলে তার ভারে শাখা ভগ্ন হয়। বালখিল্য মুনিগণ সেই শাখায় অধোমুখে ঝুলে তপস্যারত ছিলেন। গরুড় চঞ্চুপুটে উক্ত শাখা ধারণপূর্বক এঁদের নিয়ে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হলে, কশ্যপের অনুরোধে বালখিল্যগণ হিমালয়ে তপস্যা করতে যান (মহাভারত—আদি)।

বাল্মীকি—ইনি বরুণের পুত্র এবং রামায়ণ-রচয়িতা মহর্ষি ও আদিকবি। দশরথ এঁর সমবয়স্ক ছিলেন। অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অরণ্যমধ্যে তমসা নদীর তীরে এঁর আশ্রম ছিল। এই স্থানেই তিনি রামায়ণ রচনা করেন। ইনি যৌবনে রত্নাকর নামে এক দুর্দান্ত দস্যু ছিলেন এবং পথিকদের বধ করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করতেন। এক সময় রত্নাকর দেবর্ষি নারদকে বধ করতে গেলে নারদ প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি জন্য এই মহাপাপ করছেন? রত্নাকর উত্তর দেন যে, পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালনের জন্য। নারদ আবার প্রশ্ন করেন যে, তাঁর পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রগণ এই পাপের ভাগ গ্রহণ করবেন কি না? উত্তরে রত্নাকর বলেন যে, অবশ্যই করবেন। নারদ তখন সেই স্থানে অপেক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রত্নাকরকে গৃহে গমন করে সকলকে এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে আসতে বলেন। রত্নাকর গৃহে গিয়ে সকলকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা কেউই তাঁর পাপের ভাগ গ্রহণ করতে সম্মত হন না। তখন রত্নাকরের চৈতন্যের উদয় হয়। তিনি নারদের নিকট এই মহাপাপের প্রতিকার কি তা জিজ্ঞাসা করায় নারদ কর্তৃক রাম-মন্ত্র জপ করার জন্য উপদিষ্ট হন এবং সুদীর্ঘ ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। একাদিক্রমে ষাট হাজার বৎসর তপস্যারত থাকায় তাঁর সর্বশরীর বল্মীকে আচ্ছন্ন হয়। এই জন্যই তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। এই ঘটনার পর একদা নারদ বাল্মীকির সমীপস্থ হয়ে তাঁকে রামচন্দ্রের কাহিনী শুনিয়ে দেবলোকে প্রস্থান করেন। একদিন বাল্মীকি ভরদ্বাজসহ তমসার তীরে ভ্রমণরত অবস্থায় অকস্মাৎ দেখেন যে,

বনমধ্যে কামক্রীড়ারত এক ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ক্রৌঞ্চকে জনৈক ব্যাধ শরাঘাতে বধ করলে ক্রৌঞ্চী করুণ স্বরে বিলাপ করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে শোকাভিভূত বাল্মীকির মুখ হতে একটি শ্লোক নির্গত হয়। শ্লোকটি হচ্ছে : "মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"

এই শ্লোকপঙ্‌ক্তি আদি শ্লোক হিসাবে কথিত হয়। ব্রহ্মা তখন বাল্মীকির আশ্রমে এসে বলেন যে, তাঁর সংকল্পেই বাল্মীকির কণ্ঠ হতে ঐ বাক্য নিঃসৃত হয়েছে। এই শ্লোক অবলম্বন করে তিনি বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ প্রদান করেন। এই সময় রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করে যান। এই স্থানে সীতার দুই যমজ পুত্র কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করে। বাল্মীকি প্রথমে এদের রামায়ণ গান করতে শেখান। রাম অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে বাল্মীকি কুশ ও লবকে নিয়ে রামের সভায় উপস্থিত হন এবং উক্ত স্থানেই এঁদের কণ্ঠ হতে রামায়ণ গান প্রথম প্রচারিত হয়।

বালী—কপিরাজ। এঁর রাজধানী ছিল কিষ্কিন্ধ্যা। বালীর স্ত্রী তারা, পুত্র অঙ্গদ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব। নারীবিশেষের বালে (কেশে) পতিত ইন্দ্রের বীর্য হতে জন্ম-হেতু এঁর নাম বালী। একবার মেরু-পর্বতে যোগাসনে আসীন অবস্থায় ব্রহ্মার নেত্র হতে অকস্মাৎ অশ্রুপাত হয় এবং সেই অশ্রুবিন্দু হতে ঋক্ষরাজ নামে এক বানরের উৎপত্তি হয়। এই বানর মেরুপর্বতের এক সরোবরে স্নান করে এক পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্র ও সূর্য উভয়েই এই নারীকে দেখে কামাতুর হন এবং এঁর মস্তকে ইন্দ্রের ও গ্রীবায় সূর্যের রেতঃপাত হয়। ইন্দ্রের বীর্য হতে বালী এবং সূর্যের বীর্য হতে সুগ্রীব জন্মগ্রহণ করে। ইন্দ্র বালীকে একটি কাঞ্চনমালা দান করেন। এই নারী পরে বানররূপ প্রাপ্ত হয়ে দুই পুত্রসহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলে, ব্রহ্মার আদেশে কিষ্কিন্ধ্যায় বিশ্বকর্মা-নির্মিত পুরীতে বানরাধিপতি হয়ে বাস করতে থাকেন। তারপর বালী এই রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হন। বালী অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। একবার রাবণ যুদ্ধার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর নিকট উপস্থিত হলে, তাঁর অমাত্যগণ রাবণকে বলেন যে, বালী চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনার্থ গিয়েছেন। দক্ষিণ সমুদ্রে গেলে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। রাবণ দক্ষিণ সমুদ্রে উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যারত বালীকে ধরবার জন্যে নিঃশব্দে অগ্রসর হলে, বালী তাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়েও চুপ

করে রইলেন। রাবণ নিকটবর্তী হওয়ামাত্রই বালী তাঁকে বক্ষপুটে ধারণপূর্বক এক লম্ফে আকাশে উত্থিত হয়ে, ক্রমান্বয়ে চারি সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাবণ বালীর শক্তি দর্শনকরতঃ তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে প্রত্যাবর্তন করেন। একবার দুন্দুভি নামে এক মহিষরূপী অসুর বালীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলে, বালী তার শৃঙ্গ ধারণপূর্বক তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে বধ করেন ও তার দেহ এক যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন। তখন তার মুখনিঃসৃত রক্ত ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হলে ক্রুদ্ধ মুনি অভিশাপ দেন যে, আশ্রমদূষিতকারী আশ্রমের এক যোজন মধ্যে উপস্থিত হলে তখনই তার মৃত্যু হবে। সেই ভয়ে বালী ঋষ্যমূক পর্বত পরিহার করতেন। দুন্দুভির পুত্র মায়াবীর সহিত নারী-ঘটিত ব্যাপারে বালীর শত্রুতা হয় ও মায়াবী একদিন রাত্রিকালে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। এই আহ্বানে বালী ও সুগ্রীব উভয়ে যুদ্ধার্থ গমন করলে, মায়াবী প্রাণভয়ে পালিয়ে ভূমধ্যস্থ এক বিবরে প্রবেশ করে। যতক্ষণ না তিনি শত্রুবধ করে প্রত্যাবর্তন করেন, ততক্ষণ সুগ্রীবকে বিবর-দ্বার রক্ষা করতে বলে বালী অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এক বৎসরেরও অধিককাল অপেক্ষা করে বালী ফিরলেন না দেখে এবং বিবর-মুখে অসুরদের গর্জন ও রুধির নির্গত হতে দেখে বালী মারা গিয়েছেন মনে করে সুগ্রীব এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে বিবর-দ্বার রুদ্ধ করে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরে বালী অসুরকে নিধন করে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসেন এবং ভ্রাতার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবকে বিতাড়িত করে তাঁর স্ত্রী রুমাকে গ্রহণ করেন। সুগ্রীব ভীত হয়ে হনুমান প্রভৃতি অনুচরের সঙ্গে ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নেন।

সীতাহরণের পর সীতান্বেষণে রত রাম-লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের সখ্যতা হলে রাম সুগ্রীবকে রাজ্য ও স্ত্রী উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেন। রাম সুগ্রীবকে বালীর নিকট গিয়ে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করতে বলেন এবং নিজে অন্তরালে অবস্থান করেন। সুগ্রীব বালীর সহিত প্রথমবার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঋষ্যমূকে পলায়ন করেন। উভয়ের বেশভূষা একপ্রকার থাকায় রাম বালীর প্রতি শর-নিক্ষেপে অসমর্থ হন। দ্বিতীয়বার রামের উপদেশানুসারে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কণ্ঠে চিহ্নস্বরূপ গজপুষ্পীলতা বন্ধন করে দেন। বালীর সহিত পুনর্বার যুদ্ধে সুগ্রীব ক্লান্ত হয়ে পড়লে রাম অন্তরাল

হতে বালীকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বধ করেন।

বাসুদেব—(১) বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন (কৃষ্ণ দেখ)।

(২) ব্রহ্মার অন্য নাম বাসুদেব।

বাসুকি—নাগরাজ। দক্ষকন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র। এঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপ। বাসুকি শেষনাগ ও অনন্তনাগ নামেও অভিহিত। এঁর ভগিনী জরৎকারু বা মনসা। সমুদ্র-মন্থনকালে নাগরাজ বাসুকিকে দেবগণ মন্থন-রজ্জুরূপে ব্যবহার করেন। সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনে প্রথমে আর কিছু উত্থিত না হওয়ায় বাসুকি হলাহল উদ্গীরণ করতে লাগলেন এবং শিলা দংশন করতে আরম্ভ করলেন। বিষপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাবার উপক্রম হওয়ায় দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন (রামায়ণ)। একদা কদ্রু সপত্নী বিনতাকে দাসী করবার জন্য সর্পপুত্রদের সহায়তায় কপট উপায় অবলম্বন করেন। যে সকল সর্পরা কপট উপায় অবলম্বনে অসম্মত হয়েছিলেন, তাদের কদ্রু জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ হবার অভিশাপ দেন। এই অভিশাপের পর বাসুকি নানা তীর্থে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তাঁর বাসনা জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, পরলোকেও তিনি তাঁর দুর্মতিসম্পন্ন ভ্রাতাদের সংসর্গ চান না। তপস্যায় প্রাণত্যাগই তাঁর কাম্য। ব্রহ্মা তাঁকে পাতালে গিয়ে এই চঞ্চলা পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে ধারণ করতে বলেন। বাসুকিও পাতালে গিয়ে পৃথিবী ধারণ করেন। তথাকার নাগগণ তাঁকে নাগরাজপদে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মার ইচ্ছায় গরুড়ও তাঁর সহায় হন। মাতৃশাপ মোচনের উপায় চিন্তা করবার সময় এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে জানায় যে, তিনি ব্রহ্মাকে দেবগণকে বলতে শুনেছেন, তপস্বী জরৎকারুর ঔরসে বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভজাত আস্তীক ধার্মিক সর্পদের রক্ষা করবেন। বাসুকি ঋষি জরৎকারুর অন্বেষণ করে তাঁর হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করেন এবং তাঁদের পুত্র আস্তীককে জনমেজয়ের সর্পসত্রে প্রেরণ করেন। আস্তীক জনমেজয়কে যজ্ঞ হতে নিবৃত্ত করে সর্পকুল রক্ষা করেন।

বাসন্তী—দুর্গা। বসন্তকালে দুর্গাদেবীর এক পূজা হয়। এই জন্য এঁর নাম বাসন্তী। বৎসরের মধ্যে শরৎ ও বসন্ত—এই দুই ঋতুতে দুর্গাপূজার বিধান আছে। শরৎকালের পূজা অকাল-পূজা। এই জন্য শরৎকালে দেবীর বোধন করে পূজা করতে হয়। কারণ, শরৎ ঋতু দেবতাদের রাত্রি

এবং তখন তাঁরা নিদ্রিত থাকেন। সেই জন্য উক্ত সময়কে অকাল বলা হয়। কিন্তু বসন্তকালের পূজায় দেবীর বোধন নাই এবং এই সময় দেবতারা জাগরিত থাকেন।

বাষ্কল—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতম শিষ্য পৈল ঋক্‌বেদকে দুই ভাগে ভাগ করে ইন্দ্রপ্রমতি ও বাষ্কল নামে দুই শিষ্যকে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করান। বাষ্কল ঋক্‌বেদের প্রথম শাখাকে চার অংশে বিভক্ত করে নিজের চার জন শিষ্য—বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরকে অধ্যয়ন করান। বাষ্কল আরও অন্য তিনখানি সংহিতা রচনা করে কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামে তিন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান (বিষ্ণুপুরাণ)।

বাহন—প্রায় প্রত্যেক দেবতারই কোন-না-কোন জীবজন্তু বাহনরূপে আছে; যথা—ব্রহ্মার হংস, বিষ্ণুর গরুড়, শিবের নন্দী, ইন্দ্রের ঐরাবত, যমের মহিষ, কার্তিকেয়ের ময়ূর, কামদেবের মকর বা টিয়াপাখী, অগ্নির মেষ, বরুণের মৎস্য, গণেশের ইঁদুর, বায়ুর হরিণ, শনির গৃধ্র, দুর্গার সিংহ, লক্ষ্মীর পেচক, সরস্বতীর হংস, ষষ্ঠির বিড়াল, বিশ্বকর্মার হাতী, ইন্দ্রের শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি।

বাহ্লিক—প্রাচীন পাঞ্চালের অন্তর্গত ব্যাক্‌টিয়া বা বালখ্‌নিবাসী কয়েকটি জাতির সাধারণ নাম। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, তারা সিন্ধু ও পঞ্চনদ বিধৌত দেশে বাস করত না, পবিত্র ভারতের বাইরে থাকত।

বাহুক—(১) রাজা নল রাজ্যচ্যুত হয়ে যখন ছদ্মবেশে রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন, তখন এই নাম তিনি অবলম্বন করেন। বাহুক অর্থে রথচালক।

(২) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগরাজ কৌরবের কুলজাত বাহুক, কুমারক, বেণী, কুণ্ডল ইত্যাদি নাগগণ বিনষ্ট হয় (মহাভারত—আদি)।

বায়ু—অন্তরীক্ষের দেবতা। বায়ু সম্বন্ধে বেদে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচিত হয়েছে। বেদের কোন কোন স্থলে ইন্দ্র ও বায়ু একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিষ্ণুপুরাণ মতে বায়ু গন্ধর্বদের রাজা। রামায়ণে বায়ু হনুমানের পিতৃরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। সুমেরু-পর্বতে বানররাজ কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে ও বায়ুর ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। অঞ্জনা একদিন রঙিন শাড়ি পরে বাগানে ভ্রমণ করছিল। এমন সময় বায়ু এঁর শাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যান। বানরী এতে চমকিতা হয়ে উঠলে বায়ু বললেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই অঞ্জনাতে উপগত হয়েছেন। এর ফলে হনুমানের জন্ম হয়। দুর্বাসার মন্ত্রবলে আহূত বায়ুর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। একবার বায়ু কুশনাভের শত কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে

তাদের সংগম কামনা করলে তারা এই কার্যে অস্বীকৃতা হয়। তখন বায়ু এদের কুব্জা করে দেন। পরে কম্পিল্যনগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত এই সকল কন্যাকে বিবাহ করলে তাদের কুব্জত্ব দূর হয়। এই জন্য কুশনাভের রাজ্যের নাম হয় কান্যকুব্জ।

একবার কোন কার্যবশতঃ ইন্দ্র হনুমানকে বজ্রপ্রহার করেন। এতে হনুমান বিহ্বল হয়ে পড়লে পিতা পবনদেব নিজের গতি রোধ করে পুত্রকে নিয়ে গিরিগুহায় প্রবেশ করলেন। এর ফলে পৃথিবীতে যন্ত্রণার পরিসীমা থাকল না। পৃথিবীর সমস্ত জিনিস বায়ুর অভাবে কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হলো। তখন দেবতারা ব্যস্ত হয়ে ব্রহ্মাকে এর প্রতিকার করতে বললেন। তখন ব্রহ্মা বায়ুকে সন্তুষ্ট করে সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করলেন (রামায়ণ)।

বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শত পুত্রের অন্যতম। দ্যূতসভায় আনীত হবার পর দ্রৌপদী যখন সভাস্থ সকলকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি প্রকৃত বিজিতা হয়েছেন কিনা, তখন সভাস্থ সকলে নীরব থাকেন। কেবল বিকর্ণ বলেন, যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন। অতএব দ্রৌপদী বিজিত হননি। ইনি দুর্যোধনের মত ক্রূর ছিলেন না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইনি ভীমহস্তে নিহত হন। ভীম এঁকে বধ করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন (মহাভারত—দ্রোণ)।

বিকর্তন—পুরাণে কথিত আছে যে, বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাসের মানসে খণ্ড খণ্ড করে সূর্যকে কর্তন করার পর সূর্যপত্নী সংজ্ঞা তাঁর তেজ সহ্য করতে সমর্থ হন। সেই জন্য সূর্যের এক নাম বিকর্তন।

বিকুক্ষি—ইনি সূর্যবংশের বিখ্যাত রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে মাংস সংগ্রহের জন্য বিকুক্ষি পিতার আদেশে মৃগয়ায় যান এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে একটি শশক ভক্ষণ করেন। এই জন্য তিনি শশাদ নামে খ্যাত। শ্রাদ্ধকার্যের ও ব্রাহ্মণভোজনের আগেই ভোজন করার জন্য বিকুক্ষি পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অযোধ্যার রাজা হন। এঁর পুত্রের নাম ককুৎস্থ (রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ)।

বিচিত্রবীর্য—ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর পুত্র। শান্তনুর স্ত্রী দাসরাজ-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। তাঁদের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে শান্তনু-পুত্র চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁকে বিবাহ দেবার উদ্দেশ্যে ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বয়ংবর-সভা হতে হরণ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ

করেছেন জেনে ভীষ্ম তাঁকে মুক্তি দেন এবং অন্য দুই কন্যার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য এই দুই স্ত্রী লাভ করে অতিরিক্ত মাত্রায় কামাসক্ত হন এবং সাত বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাস প্রথমা স্ত্রী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম দেন (মহাভারত—আদি)।

বিজয়—(১) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদের পরাজিত না করে নিবৃত্ত হতেন না। সেই জন্য তাঁর আর এক নাম বিজয়। (২) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম বিজয়। ইনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীমহস্তে নিহত হন। (৩) অযোধ্যার রাজা দশরথের অন্যতম দূত। ইনি দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে আনবার জন্য তাঁর মাতুলালয়ে গমন করেন। (৪) বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর জয় ও বিজয় নামে দুই দ্বারপাল ছিল। (৫) উর্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার অন্যতম পুত্র বিজয়। (৬) জাম্ববতীর গর্ভজাত কৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম বিজয়। (৭) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁরা পরস্পর বিবাদ করে একে অন্যকে শাপ দেন। এর ফলে একজন কুম্ভীর ও অন্য জন হস্তীতে পরিণত হন।

বিজয়া—(১) মদ্ররাজের কন্যা বিজয়াকে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব বিবাহ করেন। (২) ৬৪ যোগিনীর অন্যতমা বিজয়া। (৩) জয়া ও বিজয়া নামে পার্বতীর দুই সখী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে শ্রীদাম ও বসুদাম নামে দুই পুরুষ হিসাবে অভিহিত হন।

বিদেহ—(১) রাজা নিমি। ইনি বশিষ্ঠশাপে দেহহীন হন বলে এঁর এই নাম হয়। (২) মিথিলা প্রদেশ।

বিদুর—যুধিষ্ঠিরাদির পিতৃব্য। ইনি বেদব্যাসের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকার রূপবতী শূদ্রা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তানরূপে দেহত্যাগ করলে সত্যবতী ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে বংশধর পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। ভীষ্ম নিজে চিরকুমার থাকার পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। তখন সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করেন। ব্যাস স্মরণমাত্র উপস্থিত হয়ে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণপূর্বক পুত্র উৎপাদনে সম্মত হন। সংগমকালে অম্বিকা ব্যাসের কৃষ্ণবর্ণ, দীপ্তচক্ষু, পিঙ্গল জটা ও শ্মশ্রু দৃষ্টে ভীতা হয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন। সেই ত্রুটির ফলে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বপ্রাপ্তি ঘটে। অন্ধের রাজ্যলাভ সম্ভবপর নয় বলে সত্যবতী দ্বিতীয় পুত্রবধূ অম্বালিকার গর্ভে আর একটি সন্তান বেদব্যাসের নিকট প্রার্থনা করেন। অম্বালিকা ব্যাসের মূর্তি দৃষ্টে ভীতিতে পাণ্ডুবর্ণ

হওয়ার ফলে তার সন্তান পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। সত্যবতী তখন অম্বিকাকে পুনরায় ব্যাসের নিকট গমন করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্যাসের মূর্তি স্মরণ করে অম্বিকা নিজে না গিয়ে অপ্সরার মত রূপবতী তাঁর এক শূদ্রা দাসীকে পাঠিয়ে দেন। এই দাসীর গর্ভে বুদ্ধিমান ও ধর্মাত্মা বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। দাসীর গর্ভে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে ধর্মই বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইতিহাস এইরূপ—

মাণ্ডব্য নামে এক মৌনব্রতী ঊর্ধ্ববাহু তপস্বী মৌনব্রত ভঙ্গ না করার জন্য এক তস্করদলের সহিত ধৃত হয়ে রাজার আদেশে শূলবিদ্ধ হন, কিন্তু তপঃপ্রভাবে জীবিত থাকেন। তাঁর পরিচয় জ্ঞাত হয়ে রাজা তাঁকে শূলবিদ্ধ অবস্থা থেকে নামালেও শূলের ভগ্ন অগ্রভাগ বা অণী তঁ দেহে থেকে যায়। এই জন্য তাঁর নাম হয় অণীমাণ্ডব্য। একদিন ধর্মরাজকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ পাপে তাঁর এই শাস্তি? ধর্মরাজ উত্তরে বলেন যে, বাল্যকালে মাণ্ডব্য এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করেছিলেন বলে তার এই শাস্তি। তখন মাণ্ডব্য বলেন যে, লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়ায় অপরাধে ধর্মকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্মরাজ বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবকরাজার এক শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতা এক সুন্দরী কন্যার সহিত ভীষ্ম বিদুরের বিবাহ দেন। দুর্যোধনের জন্মকালে নানা দুর্লক্ষণ দেখে বিদুর এই পুত্রকে পরিত্যাগ করবার জন্য জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দেন। ধৃতরাষ্ট্র সর্বদা বিদুরের নিকট পরামর্শ গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও কার্যকালে তা অগ্রাহ্য করতেন। কালক্রমে দুর্যোধনের স্বভাবদোষে বিদুর পাণ্ডবদের পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। বারণাবতে জতুগৃহদাহের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তিনিই যুধিষ্ঠিরকে যাত্রাকালে ম্লেচ্ছভাষায় সতর্ক করে দেন। তিনিই সুড়ঙ্গ খননের জন্য খনক প্রেরণ করেন ও গঙ্গাতীরে পাণ্ডবদের পলায়নের সুবিধার জন্য যন্ত্রযুক্ত নৌকা রেখে দেন। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন জ্ঞাত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছায় তিনিই দ্রুপদের নিকট গমন করে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর একান্ত অনিচ্ছায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতসভায় আহ্বান করেন। কপটদ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে সর্বস্বান্ত হতে দেখে বিদুর নানাভাবে দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রকে এর বিষময় ফল সম্বন্ধে সাবধান করে দেন; কিন্তু দুর্যোধন তাঁকে সভামধ্যে উপেক্ষা ও অপমান করেন। দুর্যোধন

দ্যূতসভায় বিজিতা দ্রৌপদীকে আনয়ন করতে বললে বিদুর তাঁকে তিরস্কার করে এ কাজে তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। বনবাসকালে বিদুর কুন্তীকে নিজের আলয়ে রাখেন। পাণ্ডবরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র অস্থিরচিত্তে বিদুরের পরামর্শ চাইলে, বিদুর দুর্যোধনাদিকে পাণ্ডুদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে একত্রে রাজ্যভোগে পরামর্শ দেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের তা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি বিদুরকে প্রস্থান করতে বলেন। বিদুর দুঃখিত হয়ে কাম্যকবনে পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হন। পরে অনুতপ্ত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্‌যোগকালে বিদুর নানা পরামর্শ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ করার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হতে পরামর্শ দেন; কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। ধৃতরাষ্ট্র বলেন যে, দুর্যোধনকে স্মরণ করলেই তাঁর বুদ্ধিবিভ্রম হয়, আর দৈবশক্তিকে অতিক্রম করাও তাঁর সাধ্যাতীত; পুরুষকার নিরর্থক। হস্তিনাপুরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ উপস্থিত হলে, তিনি দুর্যোধনের অশ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্ন ত্যাগ করে বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে শতপুত্রের শোকে কাতর ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরই নানা ভাবে সান্ত্বনা দেন। পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের পর বিদুর ধর্ম ও আইন-বিষয়ক কার্যাবলী পরিদর্শন করতেন। তাঁর সুনীতির ফলে রাজ্যের নানা বিষয়ে লাভ হত। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সুখ-সুবিধার কথা কখনো বিস্মৃত হননি। ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ অবলম্বন করলে বিদুরও তাঁর সঙ্গে বনগমন করেন। বিদুর বহুকাল বাক্য ও আহার বর্জন করে বীটা (কাষ্ঠদণ্ড) মুখে দিয়ে ঘোর তপস্যা করেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দর্শনাভিলাষী হলে বিদুর এক বৃক্ষকাণ্ডে ভর করে যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর দেহ সৎকার করতে গেলে দৈববাণী হয়, তিনি যতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সান্তানিক লোকে গিয়েছেন, তাঁব দেহ যেন দগ্ধ না করা হয়।

বিদুলা—একজন তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়-নারী। ইনি শাশ্বতবংশে জন্মগ্রহণ করে সৌবীররাজের স্ত্রী হয়েছিলেন। এঁর পুত্র সঞ্জয়। স্বামীর মৃত্যু হলে সিন্ধুদেশের রাজা সৌবীররাজ্য জয় করেন। এঁর পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেখে বিদুলা তাঁকে তীব্রভাষায় তিরস্কৃত করে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করেন। সঞ্জয় বলেন যে, যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হলে পৃথিবী লাভ করেই বা বিদুলার কি সুখ হবে? উত্তরে বিদুলা বলেন যে, যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন বা শত্রুনাশ ব্যতীত

ক্ষত্রিয়ের শান্তিলাভ হয় না। অতঃপর বিদুলার পরামর্শে সঞ্জয় সিন্ধুরাজের শত্রুদের সঙ্গে মিলিত ও উদ্‌যোগী হয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন (মহাভারত)।

বিদর্ভ—মুনিবিশেষের অভিসম্পাত-গ্রস্ত স্থানবিশেষ। পুরাণে বর্ণিত আছে, কুশাঘাতে কোন এক ঋষি-কুমারের এই স্থানে অকালমৃত্যু হওয়ায়, উক্ত ঋষি এদেশে আর দর্ভ জন্মাবে না বলে শাপ দেন। সেই হতে এই স্থানের নাম হয় বিদর্ভ।

বিদ্যাধর এবং বিদ্যাধরী—দেব-যোনিবিশেষ। বিদ্যাধর অর্থাৎ সংগীত বিদ্যাধর। এরা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থলে বাস করে। সাধারণতঃ এরা মঙ্গলকামী; অনুচর হলেও এদের নিজেদের রাজা ছিল। এরা মনুষ্য-জাতির সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করত। এদের কামরূপী বলা হত, কারণ এরা যদৃচ্ছা নিজেদের চেহারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হত।

বিদ্যুৎকেশ—রাক্ষস হেতি ও যমের ভগিনী ভয়ার পুত্র। সন্ধ্যা রাক্ষসীর কন্যা সালকটঙ্কাকটা নামে কন্যার সহিত এর বিবাহ হয়। সালকটঙ্কাকটা গর্ভবতী হয়ে মন্দরপর্বতে গর্ভমোচন করে স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। শূন্যপথে যেতে যেতে হর-পার্বতী সেই শিশুর কান্না শুনে তাকে পালন করেন। এই রাক্ষসের নাম সুকেশ। এর বংশে রাবণ জন্মগ্রহণ করেন (রামায়ণ)।

বিদ্যুৎজিহ্ব—কালকেয় বংশীয় মায়াবী রাক্ষস। এই দৈত্য রাবণের ভগিনী শূর্পণখাকে বিবাহ করে। রাবণ একবার রসাতল জয় করতে গিয়ে কালকেয় দৈত্যদের পরাস্ত করেন এবং ভুলক্রমে নিজের ভগিনী-পতি বিদ্যুৎজিহ্বকেও নিহত করেন (রামায়ণ—উত্তর)।

বিদ্যুন্মালী—(১) ব্রহ্মার বরে তারকের বিদ্যুন্মালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ নামে তিন পুত্র হয়। এরা অত্যন্ত বলশালী হয়ে দেবতাদের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করলে মহাদেব এদের বধ করেন (লিঙ্গপুরাণ)।

(২) বিদ্যুন্মালী নামক এক রাক্ষস মহাদেবের পরম ভক্ত ছিল। মহাদেব একে একটি উজ্জ্বল সুবর্ণ বিমান দান করেন। বিদ্যুন্মালী সেই বিমানে আরোহণপূর্বক সূর্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতে আরম্ভ করলে, বিমানের দীপ্তিতে রাত্রিকাল অর্থাৎ অন্ধকার একেবারে বিলুপ্ত হয়। এই দেখে সূর্য নিজ তেজোরাশির দ্বারা উক্ত বিমানকে একেবারে দ্রবীভূত করে নিয়ে ফেলে দেন। এই শুনে মহাদেব ভক্তকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়ে সূর্যের দিকে কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ফলে, সূর্য দগ্ধ হয়ে বারাণসীতেপতিত হন। এই জন্য সূর্যের নাম লোলার্ক

(ভাগবত)।

বিধাতা—(১) ইনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। মেরুকন্যা নিয়তি এঁর স্ত্রী। (২) ব্রহ্মার অন্য নাম।

বিনতা—দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী। কশ্যপের অন্য এক স্ত্রীর নাক কদ্রু। কশ্যপ স্ত্রীদের বর দিতে ইচ্ছুক হলে কদ্রু পুত্ররূপে বলশালী সহস্র নাগ প্রার্থনা করেন। আর বিনতা কদ্রুর পুত্রের চেয়ে বলবান্ ও তেজস্বী দুই পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ উভয় স্ত্রীকেই অভীষ্ট বর প্রদান করেন। যথাকালে কদ্রু এক সহস্র ও বিনতা দুইটি ডিম্ব প্রসব করেন। কদ্রুর সহস্র ডিম্ব হতে এক সহস্র নাগের জন্ম হয়। বিনতার ডিম্ব হতে কিছুই নির্গত হয় না। তখন বিনতা একটি ডিম্ব ভেঙে দেখেন যে, তাঁর সন্তানের ঊর্ধ্বভাগ পরিণত কিন্তু নিম্নভাগ অপরিণত অবস্থায় রয়েছে। উক্ত পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে মাতাকে শাপ দেন যে, যেহেতু মাতার লোভের বশে তাঁর দেহ সম্পূর্ণতা লাভ করেনি, সেই হেতু তাঁর মাতাকে পাচ শত বৎসর বিমাতা কদ্রুর দাসী হয়ে থাকতে হবে এবং অন্য ডিম্বটি অসময়ে না ভাঙলে তা থেকে আর এক পুত্র নির্গত হয়ে মাতার দাসীত্ব মোচন করবে। এই বলে সেই সন্তান আকাশে উঠে অরুণরূপে সূর্যের সারথি হন। একদিন ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবাকে দর্শন করে তার বর্ণ নিয়ে বিনতা ও কদ্রুর মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। বিনতা বলেন, এর পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ ও কদ্রু বলেন, কৃষ্ণবর্ণ। অবশেষে এই স্থির হয়, যে বিচারে পরাজিত হবে, সে জয়ী পক্ষের দাসীত্ব স্বীকার করবে। কদ্রু তাঁর নাগ সন্তানদের নিকট অশ্বপুচ্ছের বর্ণ শ্বেত বলে জ্ঞাত হয়ে তাদের আদেশ দেন যে, তারা যেন অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করে থাকে, যাতে পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ দেখায়। যে সব সর্পপুত্র এই কার্যে অসম্মত হয়, কদ্রু তাদের জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ হবার অভিশাপ দেন। পরদিন প্রভাতে কদ্রু ও বিনতা আকাশ-পথে সমুদ্রের পরপারে গিয়ে দেখেন, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ। মিথ্যাভাবে পরাজিত করে কদ্রু তখন বিনতাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করেন। এরপর বিনতার অপর ডিম্ব বিদীর্ণ হয়ে বিশালদেহ গরুড় নির্গত হন। তিনি শূন্যমার্গে উত্থিত হয়ে সমুদ্রের পরপারে মাতার নিকট উপস্থিত হন এবং মাতার সহিত কদ্রু ও নাগগণের দাসত্ব করতে থাকেন। মাতার নিকট তাঁর এই দাসীত্বের ইতিহাস জ্ঞাত হয়ে তিনি নাগদের নিকট তাঁদের দাসত্ব হতে মুক্তির উপায় জানতে চাইলে নাগরা বলে যে, তিনি যদি আপন বীর্যবলে অমৃত আনয়নে সক্ষম হন, তবেই তাঁর মাতার মুক্তিলাভ

হবে। গরুড় তখন নানা দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নানা বিপদের মধ্য দিয়ে দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে, দেবলোক হতে অমৃত আনয়ন করে মাতাকে মুক্ত করেন (মহাভারত —আদি)।

বিনায়ক—মহাদেবের পুত্র গণেশের অন্য নাম। মহাদেবের নাম নায়ক। মহাদেবের স্ত্রী উমার দেহমল হতে গণেশের জন্ম হয়। সেই জন্য, অর্থাৎ নায়কের সাহায্য ব্যতীত গণেশের জন্ম বলে এঁর নাম বিনায়ক (বামনপুরাণ)।

বিন্ধ্য—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থলে বিস্তৃত পর্বত। বিন্ধ্যপর্বত সমস্ত পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় ছিল। দেবতারা এখানে বিহার করতেন। একদিন দেবর্ষি নারদ বিন্ধ্যের কাছে এসে বলেন যে, সুমেরু পর্বতের সমৃদ্ধি বিন্ধ্যের অপেক্ষা বেশী। সমস্ত দেবতা সুমেরুতে দিন যাপন করেন ও সূর্য সমস্ত নক্ষত্রকে নিয়ে এই পর্বত পরিভ্রমণ করেন। সেই জন্য সে বিন্ধ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ বলে গর্ব অনুভব করে। বিন্ধ্য সুমেরুর এই গর্ব খর্ব করার জন্য সূর্যের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। বিন্ধ্য তার সুদীর্ঘ শৃঙ্গগুলি সমুন্নত করে আকাশ পথ অবরোধ করতে থাকেন, যাতে সূর্য তাঁকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে না পারেন। এইরূপে সূর্যের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এক দিকে (যে দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়) সমস্ত কাজ প্রায় বিলুপ্ত হয় এবং পূর্ব ও উত্তর দিকে প্রচণ্ড সূর্যতেজে সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ হয়ে যেতে থাকে। এই ঘটনায় পৃথিবীর চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে যায়। তখন দেবতারা মহাদেবের পরামর্শ-অনুসারে বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু বলেন যে, একমাত্র মহর্ষি অগস্ত্যই এর প্রতিকার করতে সমর্থ। তখন অগস্ত্যের সমীপস্থ হয়ে দেবতারা তাঁর কৃপাভিক্ষা করেন। দেবতাদের অনুরোধে বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, বিন্ধ্য নিজের উচ্চশির অবনত করে গুরুকে প্রণাম করেন। অগস্ত্য তখন বিন্ধ্যকে বলেন, "আমি দক্ষিণাভিমুখে ভ্রমণে গমন করছি। যতদিন না উত্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, ততদিন তুমি এইরূপ অবনত মস্তকে আমার জন্য অপেক্ষা কর।" অগস্ত্য আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না এবং বিন্ধ্যও সেই অবধি অবনত মস্তকে উক্ত অবস্থাতেই থেকে যান (দেবী ভাগবত)।

বিপ্রচিত্তি—কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হতে বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। বিপ্রচিত্তি নিজের বৈমাত্রের ভগিনী সিংহিকাকে বিবাহ করেন। সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ইনি অসুরপক্ষের সেনাপতি ছিলেন। সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির রাহু, কেতু প্রভৃতি একশত একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ও তারা গ্রহত্বপ্রাপ্ত হয়

(শ্রীমদ্ভাগবত)। নবম বারের যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন (বায়ুপুরাণ)।

বিপাশা—যখন বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ বিবাদরত ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শতপুত্রকে বিনাশ করেন। বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি পর্বত হতে লম্ফ প্রদান করেন, কিন্তু তাতেও তাঁর মৃত্যু হয় না। তখন বর্ষাকালে এক নদীতে জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করা স্থির করেন এবং পাশদ্বারা নিজেকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে নদীতে জলমগ্ন হন। তখন সেই নদী রজ্জুচ্ছেদনপূর্বক তাঁকে পাশমুক্ত করে তাঁর প্রাণরক্ষা করে। পাশমুক্ত বশিষ্ঠই এই নদীর নামকরণ করেন বিপাশা (মহাভারত)।

বিভাণ্ডক—মহর্ষি কশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডক। বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। ইনি দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর এক মহাহ্রদে স্নানরত অবস্থায় উর্বশীকে দেখে কামাবিষ্ট হন এবং তাঁর রেতঃপাত হয়। এক তৃষিতা হরিণী জলের সহিত বিভাণ্ডকের এই শুক্র পান করে গর্ভিণী হয়। এর ফলেই যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। এই মুনিকুমারের মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল। যে হরিণী ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মদান করে, সেই হরিণী পূর্বজন্মে এক দেবকন্যা ছিল। ব্রহ্মা তাকে বলেছিলেন, "তুমি হরিণী হয়ে তপস্বী পুত্র প্রসব করে মুক্তিলাভ করবে।" ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হওয়াতে সেই হরিণী মুক্তিলাভ করে (মহাভারত—বন)।

বিভাবসু—(১) ইনি কোপনস্বভাব ঋষি ছিলেন। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক ধন বিভাগের জন্য বার বার ভ্রাতাকে বিরক্ত করতেন। এতে বিভাবসু বিরক্ত হয়ে ভ্রাতাকে হস্তীরূপ পরিগ্রহ করার শাপ দেন। সুপ্রতীকও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কূর্মরূপ ধারণের অভিসম্পাত দেন। তখন পরস্পর পরস্পরকে গজকচ্ছপরূপে আক্রমণ করতে থাকেন। পরে গরুড় এঁদের উভয়কেই ভক্ষণ করে ফেলেন (মহাভারত—আদি)।

(২) ধর্মের অন্যতমা স্ত্রী বসু হতে অষ্টবসুর অন্যতম বিভাবসু জন্মগ্রহণ করে।

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁর স্ত্রী সরমা ও পুত্র তরণীসেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ মহর্ষি বিশ্রবার তিন রাক্ষস পুত্র। রাক্ষস সুমালীর কন্যা নিকষা বা কৈকসী এঁদের মাতা। একদিন সুমালী কুবেরের ন্যায় এক দৌহিত্র লাভের আশায় কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার কাছে প্রেরণ করেন। ধ্যানস্থ বিশ্রবা কৈকসীকে দর্শনকরতঃ তার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে বলেন, "তুমি অসময়ে আমার নিকটে উপস্থিত হয়েছ, এই জন্য তোমার গর্ভে ভীষণাকার রাক্ষসরাই জন্মগ্রহণ করবে।"

তখন কৈকসী সান্ত্বনয়ে মহর্ষিকে জানায় যে, সে এইরূপ পুত্রের অভিলাষী নয়। তখন বিশ্রবা সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, “আমার কথা অন্যথা হবার নয়; তবে তোমার শেষ গর্ভের পুত্র আমার আশীর্বাদে আমার বংশানুরূপ পরম ধার্মিক হবে।” কৈকসীর সেই সন্তানই বিভীষণ নামে খ্যাত। ভ্রাতাদের মধ্যে বিভীষণ পরম ধার্মিক ছিলেন। ইনি গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা সরমাকে বিবাহ করেন। তপস্যা করে তিন ভ্রাতাই ব্রহ্মার নিকট হতে বর লাভ করে। রাবণ অমরত্বের বর লাভে বঞ্চিত হয়ে দেব-দানবের অবধ্য থাকেন। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাসুখের বর লাভ করে এবং ধার্মিক বিভীষণ চিরধার্মিক হবার বর পান। রাম সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য সসৈন্য লঙ্কায় এলে বিভীষণ রামের হস্তে সীতা-প্রত্যর্পণ হিতকর এবং কেহই রাম-সদৃশ বীর নয়—এইউপদেশ দেওয়াতে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে অপমানিত করলে, বিভীষণ চার জন রাক্ষসের সঙ্গে লঙ্কা হতে বহির্গত হয়ে রামের সঙ্গে যোগদান করেন এবং ক্রমাগত গুপ্ত-সন্ধান জ্ঞাপন করে রাবণকে সবংশে বিনাশ করতে রামকে সহায়তা করেন। এঁর সাহায্যে লক্ষ্মণ রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যজ্ঞশালায় হত্যা করেন। রাবণ সবংশে নিহত হলে, বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসেন ও রাবণ-পত্নী মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। রামের মহাপ্রস্থানকালে বিভীষণ অযোধ্যায় উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, “যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকবে, যতদিন পৃথিবী থাকবে, যতদিন আমার চরিতকথা বর্ণিত হবে, ততদিন ইহলোকে তোমার রাজ্য থাকবে।” বিভীষণের স্ত্রী সরমাও ধর্মপরায়ণা ছিলেন।

বিবস্বান—রামায়ণ ও পুরাণ অনুসারে দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা অদিতি হতে কশ্যপের ঔরসে অর্যমা, পূষা, বিবস্বান প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। এঁর স্ত্রীর নাম সংজ্ঞা। সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের তিনটি পুত্র সন্তান হয়—বৈবস্বত মনু, শ্রাদ্ধদেব ও যম, এবং যমুনা নামে যমের এক যমজ ভগ্নী। সংজ্ঞা সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে ছায়াকে সৃষ্টি করেন এবং ছায়ার উপর তাঁর পুত্র-কন্যাদের পালন করবার ভার দিয়ে অন্যত্র চলে যান এবং অশ্বীরূপ ধারণ করে বনে ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন বিবস্বান অশ্বরূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সহবাসে রত হন। এর ফলে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের জন্ম হয়। এরপর বিবস্বান সংজ্ঞাকে নিজের গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা তখন বিবস্বানের তেজ হ্রাস করবার জন্য তাঁকে শানযন্ত্রে কর্তন করে তাঁর অষ্টম অংশ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন। এই অংশ জলন্ত অবস্থায় পৃথিবীর উপর

পতিত হয়। তখন বিশ্বকর্মা এই থেকে বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়ের শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের অন্যান্য অস্ত্র প্রস্তুত করেন। মহাভারতের বর্ণনানুসারে কুন্তীর গর্ভে কর্ণ বিবস্বানের ক্ষেত্রজ পুত্র। বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু হতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। এই জন্য ইক্ষ্বাকু-বংশ সূর্যবংশ নামে খ্যাত। অশ্বরূপে বিবস্বান শুক্ল যজুর্বেদ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করেন। বিবস্বানই সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি দান করেন। এঁর রথ সপ্ত অশ্বদ্বারা বা সপ্ত মস্তক-বিশিষ্ট অশ্বদ্বারা সূর্যরশ্মিমণ্ডিত হয়ে চালিত হয়। কথিত আছে, ইনি শনি ও সুগ্রীবের পিতা।

বিরজা—(১) বিষ্ণুর মানসপুত্র। এঁর অধস্তন পুরুষ যথাক্রমে কীর্তিমান, কর্দম, অনঙ্গ, নীতিমান বা অতিবল ও বেণ। (২) রাজা যযাতির মাতা। (৩) কৃষ্ণ-প্রেমিকা রাধার সখী। এক সময়ে যখন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাধার সঙ্গে বিহাররত ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁকে দেখতে না পেয়ে রাধার সখী বিরজার কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আসক্ত হয়ে পড়েন। রাধা এই সংবাদ পেয়ে সেইখানে উপস্থিত হন। রাধার আগমনে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন এবং বিরজা অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তখন বিরজার দেহ নদীরূপে পরিণত হয়। এতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিলাপ করতে থাকেন। তখন বিরজা সুন্দরীর মূর্তি ধারণ করে নদী হতে উঠে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। অবশেষে বিরজা ও শ্রীকৃষ্ণ হতে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

বিরাটরাজ—মৎস্যদেশের রাজা। এঁর রাজধানী এঁর নামেই পরিচিত ছিল। বিরাটরাজ কুবের-তুল্য ধনী ছিলেন। তাঁর গো-ধনের তুলনা ছিল না। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর সহিত বনবাসের দ্বাদশ বৎসর সমাপ্ত হলে, এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটের রাজসভায় ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে অতিবাহিত করেন। বিরাটের স্ত্রীর নাম সুদেষ্ণা, পুত্র শঙ্খ, শ্বেত এবং ভূমিঞ্জয় বা উত্তর এবং কন্যার নাম উত্তরা। বিরাটের ভ্রাতার নাম শতানীক। বিরাটের শ্যালক কীচক ছিলেন তাঁর সেনাপতি। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে বিরাটের দ্যূতনিপুণ সভাসদ্ হন। ভীম বল্লভরূপে পাচক, অর্জুন বৃহন্নলা নামে উত্তরার নৃত্যগীত ও বাদ্যের শিক্ষক, সহদেব তন্তিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষ ও নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দ্রৌপদী 'সৈরিন্ধ্রী' রূপে সুদেষ্ণার পরিচারিকা নিযুক্ত হন। কীচক দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কামনা করলে, ভীম কীচককে গোপনে বধ করেন। পূর্বে কীচকের সাহায্যে

বিরাট ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করেছিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট সুশর্মা দুর্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভীমের হস্তে কীচকের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত হয়ে কৌরব-সৈন্যের সাহায্যে সুশর্মা বিরাটরাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমণ করে গো-ধন হরণ করেন। বিরাট যুদ্ধ করতে গেলে সুশর্মা তাঁকে পবাজিত ও বন্দী করেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্মাকে পরাজিত করে বিরাটকে উদ্ধার করেন। উক্ত সময় দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বিরাটরাজ্যের উত্তরাংশ আক্রমণ করে গো-হরণ করেন। বিরাট-পুত্র উত্তর বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথি করে যুদ্ধযাত্রা করেন। কুরুসৈন্য দর্শনে ভীত উত্তর পলায়নোদ্যত হলে অর্জুন তাঁকে আশ্বস্ত করেন ও তাঁকেই সারথি করে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অর্জুন সমস্ত কুরুসৈন্য পরাজিত করে গো-ধন উদ্ধার করেন। যুদ্ধজয়ের সংবাদে বিরাট পুত্রগর্বে স্ফীত হলে যুধিষ্ঠির বলেন যে, বৃহন্নলার সারথ্যের গুণেই যুদ্ধজয় সম্ভব হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের মুখে বৃহন্নলার প্রশংসা শ্রবণ করে বিরাট ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, নপুংসক কখনো ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে পরাজিত করতে পারে না এবং যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশার অঘাত করে রক্তপাত করেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, কোন ব্যক্তি যুদ্ধ বিনা অন্য কোন কারণে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত করলে তিনি তাকে বধ করবেন। যুধিষ্ঠির সে কারণে অর্জুনের নিকট এই ঘটনা গোপন করেন। পরে উত্তরের নিকট প্রকৃত ঘটনা অবগত হয়ে বিরাট যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। এরপর যথাসময়ে পাণ্ডবরা বিরাটের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। বিরাট আনন্দিত হয়ে অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব করেন। উত্তরা অর্জুনের শিষ্যা ও কন্যাস্থানীয়া বলে অর্জুন এই বিবাহে অসম্মত হন ও নিজপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বিরাট সসৈন্য পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন এবং যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণহস্তে নিহত হন (মহাভারত)।

বিরাধ--যব রাক্ষসের পুত্র। এর মাতার নাম শতহ্রদা। সীতাসহ রাম ও লক্ষ্মণ যখন দণ্ডকারণ্যে বসবাস করছিলেন, তখন এই নরখাদক রাক্ষসের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ হয়। উক্ত রাক্ষস সীতাকে দেখে হরণ করার উদ্‌যোগ করে। তাকে প্রশ্ন করে রাম জানতে পারেন যে, ব্রহ্মার বরে একে কেহ অস্ত্র দ্বারা খণ্ডিত করতে সক্ষম হবে না; এর শরীর অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অস্ত্রের অবধ্য। রাম সাতটি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলে তাতে ভীষণ আহত হয়ে সে ভূমিতে পতিত হয়। তখন বিরাধ রাম-লক্ষ্মণকে সবলে

স্কন্ধে নিয়ে ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করে। রাম ও লক্ষ্মণ তখন রাক্ষসের দুই বাহু ছেদন করেন, তাতে সে মূর্ছিত অবস্থায় ভূমিতে নিপতিত হয়। তখন একে ভূমিতে প্রোথিত করে হত্যা করাই রাম স্থির করেন। বিরাধ তখন আত্মপরিচয় দিয়ে বলে যে, সে পূর্বে তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্ব ছিল। অপ্সরা রম্ভার প্রতি আসক্তিবশে সে কর্তব্যে অবহেলা করায় কুবেরের শাপে রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। তার অনুনয়ে কুবের বলেন যে, রামের হস্তে নিহত হলে তার মুক্তি হবে। অত:পর বিরাধ রামকে শরভঙ্গমুনির আশ্রমে যাবার উপদেশ দিয়ে নিজেকে গর্তে নিক্ষেপ করতে বলে। রাম-লক্ষ্মণ বিরাধকে মৃত্তিকাগর্ভে নিক্ষেপ করে নিহত করেন (রামায়ণ)।

বিরূপাক্ষ—(১) পূর্ব দিকে অবস্থিত দিগ্‌হস্তী। সে পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে। কথিত আছে, যখন এই হস্তী ক্লান্ত হয়ে মস্তক সঞ্চালন করে তখন পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয় (রামায়ণ—আদি)।

(২) রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ রাবণের অন্যতম অনুচর। হনুমান লঙ্কার অশোকবন নষ্ট করলে রাবণ তাঁকে পরাজিত করার জন্য বিরূপাক্ষকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হনুমানের হাতে সে নিহত হয় (রামায়ণ—সুন্দর)।

(৩) মহাদেবের অন্য নাম বিরূপাক্ষ।

বিরোচন—এক দানব। প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। বিরোচনের পুত্র বিখ্যাত বলি। রাক্ষসরাজ বৃষপর্বার কন্যা সুরুচিকে বিরোচন বিবাহ করে। (২) বেণপুত্র পৃথু পৃথিবীকে দোহন করবার পরও বহু ব্যক্তি পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন। অসুররা যখন পৃথিবীকে দোহন করে, তখন দ্বিমূর্দ্ধা অসুর দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হয়েছিল (মৎস্যপুরাণ)।

(৩) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে জনৈক পুত্রের নাম।

বিশাখ—ইন্দ্র ও স্কন্দের মধ্যে একবার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উক্ত সময় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব হতে এক সুন্দর যুবার আবির্ভাব হয়। বজ্রের আঘাতে এর জন্ম হয়েছিল বলে এর নাম হয় বিশাখ (মহাভারত—বন)।

বিশল্যকরণী—ভেষজউদ্ভিদবিশেষ। রামায়ণে কথিত আছে, গন্ধমাদন পর্বতের দক্ষিণ শিখরে এর জন্ম। বিশল্যকরণী নামের অর্থ শল্য বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করার অস্ত্রশস্ত্র, লৌহ ও পাষাণাদির উদ্ধারকার্যে এর শক্তি অদ্ভুত। শক্তিশেলে বিদ্ধ হলে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে রক্ষা করার জন্য রাম হনুমানকে উক্ত পর্বতে বিশল্যকরণী আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন। উক্ত ঔষধ প্রয়োগের ফলেই লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা হয়।

বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী। বেদে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বকর্মা বলা হয়। এঁর মাতা বৃহস্পতির ভগিনী যোগ সিদ্ধা; পিতা অষ্টম বসু 'প্রভাস'। ইনি শিল্পসমূহের প্রকাশক, অলঙ্কারের স্রষ্টা, দেবতাদের বিমান-নির্মাতা; এঁর কৃপায় মনুষ্যরা শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করে। ইনি লঙ্কা নগরীর নির্মাতা। ইনি উপবেদ, স্থাপত্য-বেদের প্রকাশক এবং চতুঃষষ্ঠি কলার অধিষ্ঠাতা। ইনি প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান প্রভৃতির শিল্প প্রজাপতি। বিষ্ণুপুরাণ মতে প্রভাসের ঔরসে বৃহস্পতির ভগিনীর গর্ভে বিশ্বকর্মার জন্ম হয়।

ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে—ইনি সর্বদর্শী ভগবান। এঁর চক্ষু, মুখমণ্ডল, বাহু ও পদদ্বয় সর্বদিক ব্যাপিয়া আছে। বাহু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে ইনি স্বর্গ ও মর্ত্য নির্মাণ করেন। বিশ্বকর্মা সৃষ্টিশক্তির রূপক নাম। ইনি ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা ও প্রজাপতি। ইনি পিতা, সর্বজ্ঞ; দেবতাদের নামদাতা এবং মর্ত্যজীবের অনধিগম্য। ইনি সর্বমেধ-যজ্ঞে নিজেকে নিজের কাছে বলি দেন। ইনি বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য, কল্যাণকর্মা, বিধাতা।

কোন পুরাণ মতে এই বিশ্বকর্মা বৈদিক ত্বষ্টা দেবতার কর্মশক্তিও আত্মসাৎ করেছিলেন। এই জন্য তিনি ত্বষ্টা নামেও অভিহিত। ইনি কেবল দেবশিল্পীই নন, তাঁদের অস্ত্রাদিও প্রস্তুত করেন। অগ্নেয়াস্ত্র এঁরই নির্মিত। মহাভারত মতে ইনি শিল্পের শ্রেষ্ঠ কর্তা, সহস্র শিল্পের আবিষ্কারক, সর্বপ্রকার কারুকার্য-নির্মাতা। স্বর্গ এঁরই সৃষ্টি। লঙ্কাপুরী ইনিই নির্মাণ করেছিলেন। রামের জন্য সেতুবন্ধ নির্মাণকালে ইনি নল-বানরকে সৃষ্টি করেন।

বিশ্বকর্মা নিজের কন্যা সংজ্ঞার সহিত সূর্যের বিবাহ দেন। সংজ্ঞা সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে না পারায়, বিশ্বকর্মা সূর্যকে শানচক্রে স্থাপন করে তাঁর উজ্জ্বলতার অষ্টমাংশ কর্তন করতেন। এই কর্তিত অংশ পৃথিবীর উপর পতিত হলে উক্ত অংশের দ্বারা বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ করেন। শ্রীক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ জগন্নাথমূর্তি বিশ্বকর্মা প্রস্তুত করেন।

বিশ্বদেব—বিশ্বদেব মানে সর্বদেব। ঋগ্‌বেদে একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতেশ্বরবাদ সৃষ্ট হয় নাই। দেবতারা অসংখ; অথচ মিলিত। তাঁদের মন, হৃদয়, অভিপ্রায় ও কার্য সমভাবাপন্ন। তাঁদের সমবেত দেবশক্তি এক। ঋগ্‌বেদে প্রধানতঃ দেবতাদের এই সমবেত মহতী ঐশীশক্তিই পূজিত হয়। ঋগ্‌বেদের উপাস্য দেবতারা

সমবেত মহতী ঐশীশক্তিরই অংশ হিসাবে জ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ নামের বিচিত্রতায় ব্যাখ্যাত হয়েছেন। মূলকথা, বেদে দেবতা দুই অর্থে ব্যবহৃত। এই দুই অর্থের ভেদ সম্যক্ না বুঝলে ভ্রম জন্মে। প্রথম অর্থে দেবতারা সিদ্ধ এবং তাঁরা অসংখ্য। দ্বিতীয় অর্থে দেবতা সিদ্ধ পুরুষগণের মিলিত ঐশীশক্তি, তাহা এক। অসংখ্য দেবতার সমবেত ঐশীশক্তির নাম বিশ্বদেব বা ব্রহ্ম। অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্য দেবতারা সেই মহাশক্তির নামান্তর মাত্র। মানুষের একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা একই দেবতাকে বিভিন্ন প্রকারে একাদশ বার অনুভব করা যায় বলে সেই এক দেবতা একাদশ স্থান ও ত্রিস্থান ভেদে ৩×১১=৩৩। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন নামক উভয়েন্দ্রিয়ের মিলিত যোগফলই এই একাদশ। এই একাদশ পথে, একাদশ আকারে, দেবশক্তি আমাদের আত্মার উপর কার্য করে; অতএব ইন্দ্রিয়গোচর দেবতার সংখ্যা একাদশ। এই একাদশ দেবতারা আবার স্বর্গেও অবস্থিত, অন্তরীক্ষেও অবস্থিত এবং পৃথিবীতেও অবস্থিত—এই কল্পনা দ্বারাই ঋগ্‌বেদের দেবতার সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ণিত হয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারত কাল পর্যন্ত এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাই স্বীকৃত ছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শতপথ ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বদেবের সংখ্যা দশ ও তেত্রিশ। পরে অন্যান্য পুরাণে তাহাই তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হয়। এই সংখ্যা বহুত্ব জ্ঞাপকমাত্র। এককেই বহুরূপে ও বহুর মধ্যেও একক দেখবার সংকেত।

বিশ্বাবসু—গন্ধর্বদের অধীশ্বর। এঁর ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয় (মহাভারত—আদি)। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু কৌশলে উর্বশীকে রাজা পুরূরবার আলয় হতে উদ্ধার করেছিলেন। মহর্ষি জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা হতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করে (মহাভারত—বনপর্ব)। ইনি দেবলোকের বসিন্দা এবং বারি-সৃষ্টিকারী। দেবতারূপেই ইনি পূজিত হয়ে থাকেন (ঋগ্‌বেদ)।

বিশ্বামিত্র—একজন ব্রহ্মর্ষি। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যাবলে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইনি সপ্তর্ষিদের ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির অভিবক্তা। বিশ্বামিত্র বা তদীয় বংশের ঋষিগণ এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। রাজা কুশের পুত্র কুশিক, তাঁর পুত্র গাধি ও গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। এই জন্য ইনি কৌশিক ও গাধেয় নামে বিখ্যাত। গাধি পুরুবংশীয় এবং কান্য-

কুব্জের রাজা বলে কীর্তিত হয়েছেন। এই জন্য হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে বিশ্বামিত্র পৌরব, কৌশিক, গাধিজ ও গাধিনন্দন প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছেন। বিশ্বামিত্রের জীবনে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সহিত বিরোধ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলেছিল, তা এই ঋষির জীবন থেকে প্রমাণিত হয়। এই বিরোধের কথা ঋগ্‌বেদে অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে। এই দুই ঋষির শত্রুতা শেষে রক্তপাতে পর্যবসিত হয়। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক নিহত হয়। অন্যপক্ষে, বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় কল্মাষপাদ যিনি শাপগ্রস্ত হয়ে রাক্ষসে পরিণত হয়েছিলেন, তিনি বশিষ্ঠের শতপুত্রকে ভক্ষণ করেছিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র একই সময়ে সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন। তাতে দুই ঋষির মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এই সূত্রেই বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত করেন এবং বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে কঠোর মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

বিশ্বামিত্রের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত কথিত আছে: মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। ঋচীক নামে এক ঋষির সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ দেন। নিজ স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন পুত্র লাভের আশায় ঋচীক চরু প্রস্তুত করে স্ত্রীকে পরিবেশন করেন। আর স্ত্রীর মাতার ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মাবার জন্য আর এক পাক চরু প্রস্তুত করে মাতাকে দান করেন। কিন্তু মাতার প্ররোচনায় বাধ্য হয়ে সত্যবতী পরস্পরের চরু পরিবর্ত্তন করে ভক্ষণ করেন। এর ফলে মাতা ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন বিশ্বামিত্রকে ও কন্যা সত্যবতী জমদগ্নিকে জন্ম দেন। এই জমদগ্নির ঔরসে কালে ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন পরশুরামের জন্ম হয়।

একবার রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্য মৃগয়ায় গিয়ে পিপাসার্ত হয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠ কামধেনু নন্দিনীর সাহায্যে বিবিধ প্রকার প্রচুর আহার্য দিয়ে সসৈন্য বিশ্বামিত্রের পরিতোষসাধন করেন। বিশ্বামিত্র কামধেনুর আশ্চর্য গুণ অবগত হয়ে, বশিষ্ঠের নিকট সহস্র ধেনুর মিনিময়ে উক্ত কামধেনু প্রার্থনা করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ উহা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দুইজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিশ্বামিত্র সৈন্যের সাহায্যে কামধেনু হরণ করায়, বশিষ্ঠ কমধেনুকে নিজের শক্তি দ্বারা বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করতে বলেন। তখন সে অসংখ্য সেনা সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে। বিশ্বামিত্রের শতপুত্রও এই সঙ্গে বিনষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র পরাজিত হয়ে বশিষ্ঠের প্রতি বিবিধ শরবর্ষণ করেন। বশিষ্ঠ তার ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা

বিশ্বামিত্রের সব অস্ত্রই ব্যর্থ করেন। তখন বিশ্বামিত্র আত্মগ্লানিতে মর্মাহত হয়ে বলেন যে, ক্ষত্রিয়বলকে ধিক; ব্রহ্মতেজই প্রকৃত বল। এই বলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য দক্ষিণাভিমুখে গমন করে কঠোর তপস্যায় রত হন। ব্রহ্মা এঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে এঁকে রাজর্ষিত্ব দান করেন। কিন্তু এতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরপি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন।

এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করার অভিলাষে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন; কিন্তু বশিষ্ঠ ও তাঁর পুত্রগণ তাঁকে সাহায্য করতে অসম্মত হলে, তিনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র নিজ পুণ্যবলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। কারণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশঙ্কুকে অধঃশির অবস্থায় পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করেন। ত্রিশঙ্কুর এই পতন দৃষ্টে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে স্বীয় তপোবলে তাঁকে শূন্যে স্থাপন করে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন। উক্ত কালে দক্ষিণাংশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। তখন দেবতারা ভীত ও বিপন্ন হয়ে বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। অবশেষে স্থির করা হয় যে, আকাশে জ্যোতিশ্চক্রের বহির্দেশে অধঃশিরা ত্রিশঙ্কু দেবতুল্যরূপে অবস্থান করবেন ও নক্ষত্রগণ তাঁর অনুসরণ করবে। তাঁর দক্ষিণাংশে এইরূপ তপস্যার বিঘ্ন হওয়ায় বিশ্বামিত্র পশ্চিমাংশে পুষ্করতীর্থস্থ বনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় রাজা অম্বরীষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র এই যজ্ঞের পশুহরণ করায় পুরোহিত রাজাকে একটি নরবলি দিয়ে যজ্ঞের বিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন। অম্বরীষ নরবলীর উপযুক্ত লোক অন্বেষণ করতে করতে ঋচীক ঋষির মধ্যম পুত্র শুনঃশেফের সন্ধান লাভ করেন। মহারাজা অম্বরীষ যজ্ঞে বলিদানের জন্য শুনঃশেফকে আনয়নকালে পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হন। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণভিক্ষা করলে, বিশ্বামিত্র তাঁকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দিয়ে সেই স্তব করতে বলেন। ওঁর স্তবে অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হন। আর তাঁর বরে শুনঃশেফ অক্ষত দেহে যজ্ঞাগ্নি হতে নিজ প্রাণরক্ষায় সমর্থ হন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রের দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে ঋষিত্ব প্রদান করেন। কিন্তু তিনি এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আবার উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। উক্ত সময় ইন্দ্রের প্রেরণায় মেনকা নামক অপ্সরা পুষ্করতীর্থে স্নান করতে গেলে, বিশ্বামিত্র তার রূপে মুগ্ধ হন এবং তার সহবাসে দীর্ঘ দশ বৎসর

অতিবাহিত করেন। এই সহবাসের ফলে মেনকার গর্ভে শকুন্তলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। একদিন হঠাৎ তাঁর চৈতন্যোদয় হওয়াতে তিনি মেনকাকে বিদায় দিয়ে উত্তর দিকে গমন করেন এবং হিমালয়ের কৌশিকী নদীর তীরে আবার কঠোর তপস্যায় রত হন। এখানে ব্রহ্মার বরে তিনি মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রহ্মা বলেন যে, তাঁর সিদ্ধিলাভের এখনও বিলম্ব আছে; কারণ, এখনো তাঁর ইন্দ্রিয় জয় হয়নি। এই বাক্য শ্রবণান্তে মহর্ষি আবার তপস্যায় রত হন। দেবতারা ভীত হয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্যে ইন্দ্র দ্বারা অপ্সরা রম্ভাকে প্রেরণ করেন। মহর্ষি শাপ দিয়ে রম্ভাকে দীর্ঘকাল পাষাণে পরিণত করেন। কিন্তু ক্রোধের বশে শাপ দেওয়ার জন্য তাঁর তপঃফল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি আবার তপস্যায় রত হন। বহু বর্ষ পরে ব্রহ্মা এঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। একবার বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করায় বিশ্বামিত্র তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য কৌশলে হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত রাজৈশ্বর্য গ্রহণ করে দক্ষিণা প্রার্থনা করেন। তখন হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী ও পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে দক্ষিণার অর্থ অন্বেষণে কাশীতে উপস্থিত হন এবং স্ত্রী ও পুত্রকে এক ব্রাহ্মণের নিকট ও নিজেকে চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করে বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেন। পরে পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে, স্ত্রী মৃতপুত্রসহ ক্রন্দনরতা অবস্থায় শ্মশানে উপস্থিত হন। তখন চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র রাণীকে চিনতে পেরে ক্রন্দন করতে থাকেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র উপস্থিত হয়ে হরিচন্দ্রের এই অদ্ভুত আত্মত্যাগের প্রশংসা করে তাঁর পুত্রের জীবন দান করেন এবং তাঁর সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য প্রত্যর্পণ করেন।

মার্কণ্ডেয় ও অন্যান্য পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিশ্চন্দ্রকে এইরূপ কঠোর ও অন্যায় পরীক্ষা করায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। ফলে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপের ফলে দুইজনেই পক্ষীতে পরিণত হয়ে যুদ্ধে রত হন। অতঃপর ব্রহ্মা মধ্যস্থ হয়ে এঁদের এই বিরোধের অবসান ঘটান। তখন এই দুই ঋষির মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞনাশের জন্য রাক্ষসরা সর্বদা সচেষ্ট ছিল। রাক্ষসদের নিকট হতে রক্ষা পাবার জন্য রাজা দশরথের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিজের আশ্রমে নিয়ে যান এবং পথে তাঁদের অবলা ও অতিবল মন্ত্র শিক্ষা দেন এবং দিব্যাস্ত্রসকল দান করেন। এর ফলে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করে ঋষিদের যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করেন।

তারপর বিশ্বামিত্র দুই ভ্রাতাকে নিয়ে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে গৌতমের আশ্রমে রামের সাহায্যে অহল্যার শাপমোচন করেন। অতঃপর মিথিলার রাজা জনকের নিকট উপস্থিত হয়ে রামকে দিয়ে হরধনু ভঙ্গ করিয়ে তাঁকে জানকীলাভে সাহায্য করেন।

বিশ্বরূপ—ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ দেবতাদের পুরোহিত ও অসুরদের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি দেবতাদের প্রকাশ্যে ও অসুরদের গোপনে যজ্ঞভাগ দান করতেন। পরে মাতার আদেশে অসুরপক্ষ অবলম্বন করেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বশিষ্ঠকে ত্যাগ করে বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। এই জন্য বশিষ্ঠের শাপে নৃসিংহরূপী নারায়ণের হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত হন। এক সময়ে অসুরদের মঙ্গলের জন্য বিশ্বরূপ কঠোর তপস্যা করেন। ইন্দ্র তাতে ভীত হয়ে মহর্ষি দধীচির শরণাপন্ন হন। দধীচি নিজের অস্থি দান করলে, ইন্দ্র তা দিয়ে বজ্র প্রস্তুত করে বিশ্বরূপকে বধ করেন (মহাভারত—শান্তি)।

বিশ্রবা—ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের ঔরসে ও রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূর গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। ইনি পুলস্ত্য-পুত্র বলে পৌলস্ত্য নামে পরিচিত। বেদপাঠ শ্রবণকালে এঁর জন্ম হয় বলে ইনি বিশ্রবা নামে খ্যাত হন। বিশ্রবা পিতার মত তপোনিরত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজের কন্যা দেবর্ণিনীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে বৈশ্রবণ (কুবের) জন্মগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে রাক্ষস সুমালীর রূপবতী কন্যা কৈকসী কুবেরের ন্যায় পুত্রলাভের আশায় পিতার আদেশে বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু প্রদোষকালে মিলিত হওয়ার ফলে কৈকসীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণ, মধ্যম পুত্র কুম্ভকর্ণ, কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ ও কন্যা শূর্পণখার জন্ম হয়। কিন্তু কৈকসীর প্রার্থনায় কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ ধর্মভীরু হন। কথিত আছে, রাকা নামে এক রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার খর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিশ্রবার আদেশে কুবের দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ত্রিকুট পর্বতের উপর বিশ্বকর্মা নির্মিত লঙ্কাপুরীতে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ব্রহ্মার বরে বলদৃপ্ত রাবণ লঙ্কা অধিকার করতে চাইলে বিশ্রবা পুত্র কুবেরকে কৈলাসে বাস করতে আদেশ দেন।

লিঙ্গপুরাণ ও কূর্মপুরাণ মতে বিশ্রবার চার স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী হতে কুবের, দ্বিতীয় স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা বলাকা হতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তিন পুত্র ও মালিকা নামে

এক কন্যা, তৃতীয় স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা, পুষ্পোৎকটা হতে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও খর নামে তিন পুত্র এবং কুম্ভণসী নামে এক কন্যা, এবং চতুর্থ স্ত্রী সুমালী রক্ষসের কন্যা কৈকসী হতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

বিষ্ণু—নারায়ণ, কৃষ্ণ। ইনি ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তির একতম এবং সৃষ্টির পালক। লোকরক্ষার জন্য ইনি নানা অবতারে আবির্ভূত হয়ে মধুকৈটভ, হিরণ্যাদি লোকশত্রুকে বিনাশ করেছেন। ইনি ক্ষীরোদশায়ী। এঁর শয্যা অনন্ত, স্ত্রী লক্ষ্মী, পুত্র কামদেব, ধাম বৈকুণ্ঠ, বাহন গরুড়। এঁর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, চক্র সুদর্শন, গদা কৌমোদকী, মণি কৌস্তুভ। ইনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাদি দেবতারা বিপদের সময় এঁর শরণাপন্ন হন।

প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। এঁর দুই স্ত্রী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহায্য করবার জন্য ও দানবদলনের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে এঁর দশ অবতারের কথা লিখিত আছে; যথা—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। তিন যুগে ইনি বহু দৈত্য-দানবকে বধ করেছেন; যেমন—মধু, ধেনুক, পূতনা, যমলার্জুন, কালনেমি, হয়গ্রীব, শটক, অরিষ্ট, কৈটভ, কংশ, কেশী, শাল্ব, বাণ, কালীয়, নরক, বলি, শিশুপাল প্রভৃতি। এঁর চার হস্ত—এক হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, দ্বিতীয় হস্তে সুদর্শন চক্র, তৃতীয় হস্তে কৌমোদকী গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। এঁর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ ও অসির নাম নন্দক। এঁর বক্ষে কৌস্তুভ মণি বিলম্বিত এবং শ্রীবৎস নামে এক অদ্ভুত চিহ্ন অঙ্কিত। এঁর মণিবন্ধে স্যমন্তক মণি বর্তমান। বিষ্ণু ঋক্‌বেদের অনেক সূক্তে স্তুত হয়েছেন। কোন কোন স্থানে ইনি আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছেন, কোথাও বা তিনি সূর্যরশ্মির সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে বর্ণিত হয়েছেন। ইনি সপ্তকিরণের সঙ্গে ভূ-পরিক্রম করেন। ইনি রক্ষক, ধর্ম ধারণ করেন। ইনি ইন্দ্রের সখা। ইনি ত্রিপদে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আর্যদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। তিনি সদ্‌গুণের আধার। সৃষ্ট জগতের পালনভার তাঁর উপর অর্পিত। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, বিশ্বব্যাপী ও প্রভু। প্রলয় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারী হয়ে তিনি শেষনাগের উপর শায়িত আছেন। তাঁর নাভি-উদ্ভূত পদ্ম হতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। জগৎ-সৃষ্টিকালে

মধু ও কৈটভ নামক দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ হতে তিনি মেদিনী সৃষ্টি করেন। মহাভারত ও পুরাণে বিষ্ণু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রজাপতি হিসাবে তাঁর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে সক্রিয় সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মা, যিনি নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে উত্থিত হয়েছেন; দ্বিতীয় বিষ্ণু, স্বয়ং রক্ষক হিসাবে অবতার, যথা—শ্রীকৃষ্ণ; তৃতীয় শিব বা রুদ্র, বিষ্ণুর কপাল-উদ্ভূত ধ্বংসের দেবতা।

বিষ্ণুযশা—শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত আছে, কলিযুগে দশম অবতার কল্কি বিষ্ণুযশার ঔরসে জন্মগ্রহণ করবেন।

বীতহব্য—প্রজাপতি মনুর পুত্র শর্যাতি, শর্যাতির পুত্র বৎস। এই বৎসের এক পুত্রের নাম বীতহব্য। বীতহব্যের দশটি স্ত্রীর গর্ভে এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্ররা কাশীরাজ হর্যশ্বকে এবং পরে তাঁর পুত্র সুদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বধ করে। সুদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দিবোদাস কাশীর রাজা হলে বীতহব্যের পুত্রগণ পুনরায় তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। রাজ দিবোদাস তাঁদের সহিত সহস্র দিন যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে পলায়নপূর্বক ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হন। ভরদ্বাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে পুত্রোৎপাদক এক যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞের ফলে দিবোদাসের প্রতর্দন নামে এক পুত্র হয়। প্রতর্দন ভরদ্বাজের যোগবলে শিক্ষিত ও পরাক্রান্ত হয়ে পিতার আজ্ঞায় বীতহব্য ও তাঁর পুত্রদের আক্রমণ করেন। বীতহব্য ও তাঁর পুত্ররা পলায়ন করে মহর্ষি ভৃগুর শরণাপন্ন হন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসরণ করে ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বীতহব্যকে ত্যাগ করবার জন্য ভৃগুকে অনুরোধ করেন। কারণ, বীতহব্যের শতপুত্র তাঁর পিতৃকুল ও কাশীরাজ্য ধ্বংস করেছে। সে হেতু বীতহব্যকে বধ করে পিতৃগণের নিকট তিনি ঋণমুক্ত হতে চান। ধর্মাত্মা ভৃগু বীতহব্যের প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে বলেন যে, এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রতর্দন তখন ভৃগুর পাদস্পর্শ করে বলেন, "আমি বীর্যবান বীতহব্যকে জাতিচ্যুত হতে বাধ্য করেছি।" ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে বীতহব্য ব্রহ্মর্ষি হন এবং গৃৎসমদ নামে তাঁর এক রূপবান পুত্র হয় (মহাভারত—অনুশাসন)।

বীরণ—প্রজাপতিবিশেষ। এঁর কন্যা অসিক্নী। দক্ষপ্রজাপতি স্বয়ম্ভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রজা-সৃষ্টির মানসে এই কন্যাকে বিবাহ করেন। দক্ষ এই কন্যার গর্ভে পঞ্চ সহস্র বীর্যবান পুত্র উৎপাদন করেন। ক্রমে এই সব পুত্র হতে সৃষ্টি বিস্তৃতি লাভ করে (হরিবংশ)।

বীরভদ্র—মহাদেবের প্রিয় অনুচর।

দক্ষকন্যা সতী দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করলে, মহাদেব ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে নিজের মুখ হতে, মতান্তরে ক্রোধাগ্নি হতে, প্রবল পরাক্রান্ত বীরভদ্রের জন্মদান করেন। এর মুখ অতি ভয়ংকর, শরীর অগ্নিশিখায় ব্যাপ্ত, বহু হস্তে বহু আয়ুধ। বায়ুপুরাণের বর্ণনায় বীরভদ্র সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পদসম্পন্ন, সহস্র মুদ্গরধারী, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত। ভীষণাকার অত্যুজ্জ্বল এর রূপ। এর প্রকাণ্ড উদর, বিকট মুখ ও দীর্ঘ দন্ত। এর হস্তে শূল, টঙ্ক ও গদা বর্তমান। এর মস্তক অর্ধচন্দ্রশোভিত ও তার চতুর্দিকে অগ্নিশিখার মত তেজপুঞ্জও নির্গত হ'ত। বীরভদ্র সানুচর দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে দেবীর ক্রোধসম্ভূত মহাকালীও বীরভদ্রের অনুগামিনী হন। বীরভদ্র তার রোমকূপ থেকে রৌম্য নামক রুদ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা সৃষ্টি করে, তাদের সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ, উৎপাটিত ও দগ্ধ করে সকলকে প্রহার করতে থাকে। সে দক্ষের মস্তক ছিন্ন ও দক্ষপত্নীদের প্রহারে জর্জরিত করে। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু এসে বীরভদ্রকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে দেবগণসহ পলায়ন করেন। শেষে উপায়ান্তর না দেখে ব্রহ্মা এসে বীরভদ্রকে স্তুতি করে তার ক্রোধের শান্তি করেন। বীরভদ্র তখন দেবগণসহ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হয়। বীরভদ্রের এইরূপ বীরত্ব ও প্রভুপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব একে নানাবিধ বর দান করেন (বায়ুপুরাণ)।

বুধ—ইনি চন্দ্রের পুত্র। একদিন চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করেন। বৃহস্পতি চন্দ্রের এই কুকীর্তি দেবতাদের জ্ঞাত করলে দেবতা ও ঋষিরা তারাকে প্রত্যর্পণ করার জন্য চন্দ্রকে অনুরোধ করেন। চন্দ্র তাঁদের উপেক্ষা করলে রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করে চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অবতীর্ণ হলেন। এই উপলক্ষে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হয়। তখন ব্রহ্মা এই বিপদে শঙ্কিত হয়ে রুদ্রকে নিবৃত্ত করেন ও চন্দ্রের কাছ হতে তারাকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিকে প্রত্যর্পণ করেন। এই সময় তারা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাই বৃহস্পতি তারাকে গর্ভমোচন করে তাঁর কাছে আসতে আদেশ দেন। তখন তারা শরস্তম্বে গর্ভত্যাগ করেন। ফলে একটি পরম সুন্দর পুত্র জন্মলাভ করে। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, এই পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত। তখন চন্দ্র এই পুত্রকে গ্রহণ করে তাঁর নাম দেন বুধ ও তাঁকে গ্রহাধিপত্যে স্থাপন করেন। বুধ বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলাকে বিবাহ

করেন। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উর্বশী ইন্দ্রের শাপে পুরূরবার স্ত্রীরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

বৃকোদর—মধ্যম পাণ্ডব ভীমের অন্য এক নাম। বৃক নামক অগ্নি যার উদরে আছে, সে বৃকোদর।

ব্যুষিতাশ্ব—পুরুবংশী এক নরপতি। তিনি এক যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি দেবগণকে সোমপান করিয়ে ও ব্রাহ্মণদের দক্ষিণায় পরিতৃপ্ত করে শক্তিশালী হন। নানা দেশ জয় করে পুনর্বার এক যজ্ঞানুষ্ঠান করে তিনি দশ হস্তীর সমান বল লাভ করেন। কাক্ষীবানের রূপবতী কন্যা ভদ্রাকে ইনি বিবাহ করেন। স্ত্রীর রূপে বশীভূত হয়ে ইনি রাজকার্য পরিত্যাগ করেন ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। নিঃসন্তান ভদ্রা স্বামীদেহ আলিঙ্গন করে ক্রন্দন করতে থাকায়, ব্যুবিতাশ্ব দৈববাণী করেন যে, চতুর্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করে মৃত পতির সহিত ভদ্রা নিজ শয্যায় শয়ন করলে ব্যুষিতাশ্ব নিজের শবে আবির্ভূত হয়ে রাণীরগর্ভে সন্তান উৎপাদন করবেন। সেই উপদেশ অনুসারে মৃত পতির সহিতশব-সংসর্গে ভদ্রার গর্ভে তিনজন শাম্ব ও চারজন মদ্রের জন্ম হয় (মহাভারত—আদি)।

বৃত্র—প্রবল পরাক্রমশালী অসুর। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তিন মস্তকবিশিষ্ট বিশ্বরূপ নামে এক পুত্রের সৃষ্টি করেন। এই পুত্র এক কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। এই কঠোর তপস্যা দেখে ইন্দ্র বিশেষ চিন্তিত হয়ে এঁর তপোভঙ্গ করার জন্য উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিশ্বরূপের এতে কোনই চিত্তচাঞ্চল্য হয় না। তখন নিরুপায় হয়ে ইন্দ্র অন্য উপায়ে বিশ্বরূপকে বধ করবার চিন্তা করতে থাকেন।

একদিন ইন্দ্র বিশ্বরূপের কাছে গিয়ে দেখেন যে, তিনি তখন তপস্যায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। এই কঠোর তপস্যাবলে তিনি একদিন ইন্দ্রর ইন্দ্রত্ব লাভ করবেন—এই ভয়ে ইন্দ্র তাঁকে বধ করবার জন্যে আমোঘ বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্রাহত হতে বিশ্বরূপ ভূপতিত হলে ইন্দ্র তক্ষা নামে এক শিল্পীর সাহায্যে বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন করলেন।

ইন্দ্রহস্তে তাঁর পুত্র বিশ্বরূপের এইভাবে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিশ্বকর্মা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে আর একটি পুত্র সৃষ্টি করতে সঙ্কল্প করলেন। অষ্টরাত্রব্যাপী হোম করার পর প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড হতে এক দীপ্তিমান বিশাল সুপুরুষের আবির্ভাব হলো। বিশ্বকর্মা এই পুত্রের নাম রাখলেন বৃত্র। বৃত্র পিতাকে বললেন, তিনি দুঃখমোচনে সম্পূর্ণ সমর্থ। তিনি ইন্দ্র, যম বা অন্য

যে কোন দেবতার সহিত বিরোধ করতে সমর্থ। বিশ্বকর্মা এঁকে পুত্রহন্তা ইন্দ্রকে হত্যা করে পুত্রশোক দূর করতে বললেন এবং শূল. গদা বাণ, ধনু ইত্যাদি সকল প্রকার অস্ত্র প্রদান করলেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরের এই যুদ্ধ-অভিযানের সংবাদ পেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর সমস্ত সৈন্য সমাবেশ করলেন। মানস সরোবরের উত্তর তীরস্থ পর্বতে ইন্দ্র ও বৃত্রের মধ্যে এক শত বৎসর ধরে যুদ্ধ চলে। ইন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বরুণ, বায়ু, যম ও বিভাবসু। পরে ইন্দ্রসহ সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেন।

এরপর বৃত্র পিতাকে এই বিজয়বার্তা জানালে পিতা বললেন যে, জয়লাভ হলেও এখনও ইন্দ্রের মৃত্যু হয় নাই। পুনরায় শত বৎসর তপস্যা করার পর ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে এলে বৃত্র প্রার্থনা করলেন, লৌহ, কাষ্ঠ, শুষ্ক ও আর্দ্র জিনিস ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা তাঁর যেন মৃত্যু না ঘটে, আর যুদ্ধে যেন তাঁর বলবৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মা তাঁকে এই প্রার্থিত বর প্রদান করলেন। অতঃপর ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এই যুদ্ধে ইন্দ্র নানাভাবে নিগৃহীত হতে লাগলেন। অবশেষে বৃত্র বস্ত্রাদি ও কবচ বিরহিত করে ইন্দ্রকে নিজের মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করে গ্রাস করে ফেললেন। এই ব্যাপারে দেবতারা ভীত হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শ গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তখন বৃহস্পতি বললেন, বৃত্রের কোষ্ঠমধ্যে জীবিত অবস্থায় ইন্দ্র আছেন। এই অবস্থাতেই তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে। তখন দেবতারা নানা চিন্তা ও পরামর্শের পর জৃম্ভিকার সৃষ্টি করে বৃত্রের দেহে প্রবেশ করালেন। তাতে বৃত্রাসুর জৃম্ভন (হাই-তোলা) আরম্ভ করলে তাঁর মুখব্যাদান হওয়াতে ইন্দ্র বিজৃম্ভমান বৃত্রের মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ইন্দ্র বেরিয়ে এসে পুনরায় বৃত্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে বৃত্রাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন। এর প্রতিকারের জন্য ইন্দ্র অন্যান্য দেবতার সঙ্গে মহাদেবের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন মহাদেবের পরামর্শ মত তাঁরা সকলে ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং বৃত্রাসুরের কবল হতে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের উপায় নির্ধারণ করতে বললেন। বিষ্ণু তখন বললেন, এই অসুরকে পরাজিত করতে হলে প্রথমে কপট উপায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে এঁর মিত্রতা স্থাপন করতে হবে। মিত্রতাসূত্রে ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রাসুরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালে বিষ্ণু বজ্র মধ্যে গুপ্তভাবে প্রবেশ করবেন এবং বজ্রপ্রহারে ইন্দ্র তাঁকে বিনাশ করবেন। তখন

দেবতারা বৃত্রাসুরকে সন্তুষ্ট করে ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য নানা রকম প্রিয়বাক্যে তাঁকে পরিতুষ্ট করতে লাগলেন। দেবতারা বললেন যে, দুই জনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে ত্রিলোকের প্রজারা সুখে ও শান্তিতে বাস করতে পারবে। এই জন্য তাঁর ও ইন্দ্রের মধ্যে একটা সর্ত হওয়া উচিত। তখন বৃত্রাসুর এই সর্তে মিত্রতা স্থাপন করতে রাজী হলেন যে, ইন্দ্র যদি সমস্ত দেবতার সহিত শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা অথবা কাঠ, প্রস্তর কিংবা বজ্রদ্বারা দিনে কিংবা রাত্রে তাঁর নিধন সাধন না করেন, তবে দুই জনের মধ্যেসন্ধিস্থাপন হবে। ইন্দ্র বৃত্রের কাছে এসে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। এর মধ্যে ইন্দ্রের যে কপটতা ছিল, তা বৃত্রাসুর বুঝতে পারলেন না।

একদিন উপযুক্ত সময়ে বৃত্রাসুর যে বর পেয়েছিলেন, তা ইন্দ্রের স্মরণ হলো। তখন এক সন্ধ্যামুহূর্তে, দিবস ও রাত্রের সন্ধিক্ষণে, সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ফেনার সহিত (যা শুষ্ক বা আর্দ্র নয়) বৃত্রের প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করে ইন্দ্র মিথ্যাচারে তাঁর শ্রেষ্ঠ শত্রুকে নিপাতিত করলেন। এর ফলে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হলো (দেবীভাগবত)।

বৈদিক বিবরণে বৃত্রের নাম অনেক স্থলেই দেখা যায়। বৃত্র সম্বন্ধে যে পৌরাণিক কাহিনী এখানে বিবৃত হলো, বেদের বৃত্র সম্বন্ধে বিবরণের রূপক মাত্র। বৃত্র অর্থে আবরণ। জলকে ঘিরে রাখে বলে বৃত্র জলের কারা-নিবাস। ঋক্‌বেদের অনেক স্থানে বৃত্র শত্রু, অমিত্র, অরি, রিপু, দস্যু বলে ঘৃণিত হয়েছেন। তাই ইন্দ্র বজ্রধারী—বজ্র হস্তে মানবের প্রতিকূলসাধক ও অমঙ্গলকর আদিম শত্রুদের ধ্বংস করে থাকেন। এই থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণীদের উপকারী, বৃষ্টির অবরোধকারী যে কোন নৈসর্গিক বল বা শক্তিই বৃত্র। তাকে হত্যা করবার জন্যে ইন্দ্র বজ্র গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্র মরুৎদের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করে পৃথিবীকে বৃষ্টিদ্বারা অভিষিক্ত করেছেন। বৃত্র মেঘ দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করে অন্ধকার সৃষ্টি করতেন। মেঘের অন্য নামবৃত্র বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত করান। বৃত্র অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দানব। ক্রমাগত যুদ্ধে রত থেকে ইন্দ্র এঁকে পরাজিত করে বৃষ্টিপাত করিয়েছেন।

বৃত্রঘ্ন—তপনিরত বৃত্রকে দধীচি মুনির অস্থিনির্মিত বজ্রদ্বারা নিহত করে ইন্দ্র বৃত্রঘ্ন উপাধি পান।

বৃন্দা—অসুররাজ জলন্ধরের স্ত্রী ও কালনেমির কন্যা। ইনি অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। ব্রহ্মার বরে জলন্ধর দেবগণের অজেয় হয়। ফলে, জলন্ধর

দেবতাদের পরাস্ত করে দেবরাজ্য অধিকার করলে দেবতারা মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন শিব দেবতাদের হিতের জন্য নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। জলন্ধরের বর ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী বৃন্দা নিষ্কলঙ্কচরিত্রা থাকবেন, ততদিন জলন্ধরও অপরাজেয় থাকবে। বৃন্দা এদিকে স্বামীর মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন। ফলে, শিব জলন্ধরকে বিনাশ করতে অসমর্থ হন। তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে, বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। তখন জলন্ধর বিনষ্ট হয়। এই জন্য বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হলে, বিষ্ণু তাঁকে নিবৃত্ত করে পতির অনুগমন করতে বলেন। কারণ তাঁর চিতাভস্মে তুলসী, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র তরু উৎপন্ন হয়ে মানবের পূজনীয় হবে। বৃন্দা তুলসীরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া। দ্বাপরে তিনি রাধার সখী ছিলেন। কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন বৃন্দারই বন।

(২) বৃন্দা শ্রীরাধার সখী ও দূতী।

বৃন্দাবন—মথুরার তিন ক্রোশ দূরে যমুনার বাম তটে অবস্থিত নগর ও বন। স্বনামখ্যাত তীর্থ। কৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে দানবদের নিহত করেন। তারপর নন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি বলে বৃন্দাবন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।

বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। অঙ্গরাজ কর্ণ পদ্মাবতী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পদ্মাবতীর গর্ভে কর্ণের বৃষসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রভৃতি পুত্র জন্মে। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অর্জুনকে বধ না করে তিনি পদধৌত করবেন না বা জলগ্রহণ করবেন না। অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত এই ব্রতপালনে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই ব্রতপালনের সময় কোন প্রার্থীকে তিনি বিমুখ না করতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কর্ণের এই দানশীলতা পরীক্ষা করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভোজনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কর্ণ তাঁকে তুষ্ট করবার জন্যে অনায়াসে নিজ পুত্রকে বধ করেন। কর্ণের এই অদ্ভুত দানশীলতা দেখে কৃষ্ণ সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে বৃষকেতুকে পুনর্জীবিত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ নিহত হলে, যুদ্ধান্তে বৃষকেতু পাণ্ডবদের আশ্রয়প্রার্থী হন এবং পরম সমাদরে গৃহীত হন (মহাভারত)।

বৃষপর্বা—কশ্যপ হতে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে যে মহাবল দৈত্যরা জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে বৃষপর্বা অন্যতম (মৎস্যপুরাণ)।

বৃষসেন—অঙ্গরাজ কর্ণের পুত্র। ইনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইনি রথী হয়ে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন।

বৃহদারণ্যক—শুক্ল যজুর্বেদের উপ-

নিবন্ধ বিশেষ। শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায়।

বৃহন্নলা—ক্লীবরূপী অর্জুন। অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গবাসকালে উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উর্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন। অজ্ঞাতবাসের বৎসরে অর্জুন ক্লীবরূপে এই নাম গ্রহণ করেন। বিরাট নগরে রাজকন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীর নৃত্যগীতাদির ইনি শিক্ষক হন। এই সময় তার কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও সুবর্ণনির্মিত বলয় থাকতো। দুর্যোধন কর্তৃক বিরাট রাজ্যে গোহরণকালে বৃহন্নলা উত্তরের সারথিরূপে যুদ্ধে যান। কুরু-সৈন্য দর্শনে ভীত উত্তর পলায়নোদ্যত হলে, বৃহন্নলা তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁকেই সারথি করে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিরাটের গো-ধন উদ্ধার করেন (মহাভারত—বিরাটপর্ব)।

বৃহস্পতি—ইনি সপ্ত মুখ, সপ্ত রশ্মি, মিষ্ট জিহ্বা, নীল পৃষ্ঠ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শতপত্রবিশিষ্ট। ইনি হিরণ্য ও লোহিতবর্ণ। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ বৃহস্পতিকে রথে বহন করে। বৃহস্পতি যজ্ঞপ্রাপক, রাক্ষস-নাশক, মেঘ-ভেদক ও স্বর্ণপ্রদায়ক। ইনি দেবগণের পিতা, অগ্নির ন্যায় ত্রিলোকবাসী। ইনি বৃত্রাদিকেও বধ করেন। ইনি বন্দনকারীর বন্ধু। বৃহস্পতি অভিষ্টবর্ষী; ইনি দেবকামীদের ফল প্রদান করেন, সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন। ইনি প্রাণীদের চৈতন্য উৎপাদন করেন। ইনি যোদ্ধা, যুদ্ধে সাহায্যকর্তা ও জয়দাতা। এঁর ধনুর জ্যা ঋত (সত্য)। এঁর পরশু শাণিত করে দেন ত্বষ্টা। ইনি ঋতরথে আরোহণ করে রাক্ষস ও শত্রুকে বিনাশ করেন এবং আলোক জয় করে অরুণাশ্ব কর্তৃক বাহিত হন। বৃহস্পতি পুরোহিত। এঁর উচ্চারিত শ্লোক স্বর্গে গমন করে। ইনি ছন্দের অধিকারী ও ইন্দ্রের ন্যায় সোম-পায়ী। সোম-যাজ্ঞিকদের ইনি সহায় ও বন্ধু। ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদের কোন কোন মন্ত্রে ইনি একাকী এবং কোনটিতে ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারূপে স্তুত হয়েছেন। বেদের কোন কোন মন্ত্রে ইনি যজ্ঞ রক্ষাকর্তা, সর্বময় পিতা ও সর্বদেবতা-স্বরূপ বিশেষণে বন্দিত হয়েছেন। ইনি দেবতাদের পুরোহিত। মন্ত্রের অধিপতি দেবরূপে ইনি খ্যাত। এঁর প্রসাদ ব্যতীত যজ্ঞফল লাভ হয় না। এঁর হস্ত হতে দেবতারা যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। ইনি জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা। এঁর আদেশেই চন্দ্র ও সূর্য বিকশিত। বেদের এই দেবতা পরবর্তী যুগে গ্রহাধিকারিরূপে দেখা দেন। ইনি বৃহস্পতি গ্রহের নেতা। কখনও স্বয়ং গ্রহরূপে কীর্তিত হয়েছেন। এঁর নীতিঘোষ নামে রথ আছে। এই রথ আটটি অশ্বদ্বারা চালিত।

পৌরাণিক যুগে বৃহস্পতি ঋষিরূপে

খ্যাত হন। বৃহস্পতি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। ইনি ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক এবং নবগ্রহের মধ্যে পঞ্চমগ্রহ। এঁর জন্ম-বিবরণ এইরূপ—অঙ্গিরা নিজের আশ্রমে কঠোর তপস্যা করে অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় অগ্নি জলের মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যায় রত হন। অঙ্গিরার প্রভাবে তাঁর এই হীন অবস্থা হওয়ার জন্য অগ্নি অনুতপ্ত হন, কিন্তু নিজের এই দুর্গতির কোন কারণ খুঁজে পান না। তাঁর মনে হয় তপস্যার ফলে তাঁর তেজ নষ্ট হয়েছে; বোধ হয় ব্রহ্মা অন্য একটি অগ্নির সৃষ্টি করেছেন। এইরূপ চিন্তা করবার সময় অগ্নিতুল্য ঋষি অঙ্গিরা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আপনার তেজ আপনি শীঘ্রই প্রকাশ করে জগতের মঙ্গল করুন। অন্ধকার দূর করবার জন্যে বিধাতা আপনাকেই সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্ধকার দূর করতে আপনিই একমাত্র অধিকারী।" অগ্নি বললেন, "আমার কীর্তি বিনষ্টপ্রাপ্ত হয়েছে। আপনিই অগ্নিতেজ প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি অগ্নিত্ব ত্যাগ করেছি। আপনি প্রথম অগ্নি হন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হব।" অঙ্গিরা বললেন, "আপনার এই অগ্নিত্বের অধিকার আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আবার অগ্নিতেজ গ্রহণ করে আমাকে এক পুত্রসন্তান দান করুন।" সন্তুষ্ট হলে অগ্নি নিজের পূর্বতেজ আবার গ্রহণ করলেন। এর ফলে অঙ্গিরার বৃহস্পতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরুপদে বৃত হন। চন্দ্র বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করলে তিনি দেবগণের শরণাপন্ন হন। চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণে বিমুখ হলে দেবগণ তাঁকে আক্রমণ করেন। রুদ্র ও সমস্ত দৈত্য-দানব চন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেন। ফলে, দেব-দানবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হওয়ায় বৃহস্পতি ব্রহ্মার কাছে নিজের দুরবস্থা জ্ঞাপন করলেন। তখন ব্রহ্মা চন্দ্রের কাছ হতে তারাকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিকে সমর্পণ করলেন। এই সময়ে তারা গর্ভবতী ছিলেন। বৃহস্পতি ও চন্দ্র দু'জনেই গর্ভজাত পুত্রকে আপন পুত্র বলে দাবী করলেন। তখন ব্রহ্মা আবার মধ্যস্থ হয়ে তারাকে পুত্রের প্রকৃত পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা স্বীকার করলেন যে, চন্দ্রই এই পুত্রের পিতা। এই পুত্রের নাম বুধ।

বিশ্বরাজ্য লাভের আশায় দেবতা ও অসুরে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছিল। সেই সময় দেবতারা বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরোহিত পদে বরণ করেন এবং অসুরদের পুরোহিত হন শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যার বলে যুদ্ধে নিহত অসুরদের পুন-

জীবিত করতেন। বৃহস্পতির এ বিদ্যা অজ্ঞাত থাকায় মৃত দেবতাদের তিনি পুনর্জীবিত করতে পারতেন না। এই অসুবিধার জন্য বৃহস্পতি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন্য শুক্রাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দেন। কচ ঐ বিদ্যা শিক্ষা করে এলে দেবগণ তাঁর কাছ থেকে সেই বিদ্যা শিক্ষা করেন (মহাভারত)। বৈবস্বত মন্বন্তরে চতুর্থ দ্বাপরে দেবগুরু বৃহস্পতি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করে বেদ বিভাগ করেন (বিষ্ণুপুরাণ)।

বৃহৎ দেবতা—ঋষি শৌনক লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ। এতে ঋগ্‌বেদের সমস্ত দেবতার বর্ণনা আছে।

বেতাল—শিবের অনুচর ভৃঙ্গী ও মহাকাল। শিবানীর শাপে মর্ত্যলোকে এরা জন্মগ্রহণ করে। কোন সময়ে শিব ও পার্বতীর একত্র অবস্থানকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষকরূপে অবস্থান করছিল। তারা গোপনে শিবানীর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখেছে জেনে শিবানী ক্রুদ্ধ হয়ে এদের শাপ দেন তাঁর এই অমর্যাদার জন্য এরা দু'জন মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করবে। তখন এরা দেবীকে অনুরোধ করে যে, যদি মানুষরূপেই জন্মগ্রহণ করতে হয় তবে তিনি ও শিব পৃথিবীতে যেন মানুষরূপে অবতীর্ণ হন। মর্ত্যে তারা যেন শিবানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। মহাদেব দক্ষের পৌত্র পৌত্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হলো চন্দ্রশেখর। অন্য দিকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থ-রাজকন্যারূপে শিবানী জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হলো তারাবতী। চন্দ্রশেখরের সহিত তারাবতীর বিবাহের ফলে দুইটি বানর পুত্রের জন্ম হলো। এঁদের নাম বেতাল ও ভৈরব (কালিকাপুরাণ)।

বেদ—শ্রুতি, ধর্ম ও ব্রহ্মার মুখনির্গত ধর্মজ্ঞাপক শাস্ত্র। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত। বেদ চারটি—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদমন্ত্রসমূহ চার ভাগে বিভক্ত করেন। সেই জন্য এঁর নাম বেদব্যাস। বেদকে সাধারণত এই ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—(১) সূক্ত; (২) ব্রাহ্মণ, যাতে যজ্ঞকাণ্ডের ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়া, যজ্ঞের তত্ত্ব ও বৈদিক আখ্যানাদির বর্ণনা আছে; (৩) আরণ্যক; (৪) উপনিষৎ—উপনিষদগুলি পরমব্রহ্মের তত্ত্বান্বেষণে ব্যাপৃত; (৫) কল্পসূত্র—সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ বৈদিক যজ্ঞাদির ক্রিয়াপ্রণালী। বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও নানাপ্রকার বর্ণনা আছে। অনেকের মতে বেদ ব্রহ্মার নিশ্বাস হতে নিঃসৃত। বেদের সূক্তগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর মনীষায় আবির্ভূত হয়েছিল। এই সব মনীষী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নামে খ্যাত। তাঁরা

মানসনেত্রে মন্ত্রদর্শন এবং স্বরসংযোগে গান করে প্রকাশ করতেন। ঋষি পরিবারের লোকেরা তা শুনে স্মরণ করে রাখতেন বলে বেদের অপর এক নাম 'শ্রুতি'। ঋষিদের কাছে এই বেদ মৌখিকভাবেই প্রকাশ হয়েছিল বলে সমস্ত বেদকে 'শ্রুতি' বলা হয়। বেদ চিরদিনই গুরু-পরম্পরায় শ্রুত হয়ে এসেছে। বেদগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদই সর্বপ্রাচীন। প্রথমে ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। অতি প্রাচীনকালে অথর্ববেদ বেদ সংজ্ঞাভুক্ত ছিল না। কিন্তু পরে অথর্ববেদ বেদ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে পরম পুরুষের একটি অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই আভাস এইরূপ—প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অধিষ্ঠাতাগণই হিন্দুদের উপাস্য দেবতা ছিলেন। মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়কেই হিন্দুরা পূজনীয় মনে করতেন এবং প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারে তাদের এক একজনকে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পনা করে নিয়েছিলেন। বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা আমাদের শ্রদ্ধা, ভয় বা বিস্ময়ের উদ্রেক করে বা যে সকল নৈসর্গিক প্রক্রিয়া আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত জড়িত—হিন্দুরা তাঁদের কেবলমাত্র দেবতা কল্পনা করেই ক্ষান্ত হননি, পরন্তু সে সকল দেবতা তাঁদের পূজার্হ হয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে স্তুতি করে দেবতারূপে পূজা করতেন। এই সব দেবতার মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্যকে লক্ষ্য করে সর্বাপেক্ষা বেশী স্তব লিখিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দেবতা ইন্দ্র বৃষ্টি ও শিশিরকে আয়ত্ত করেছেন বলে উল্লেখ আছে। এ ছাড়া, অদিতি, ঊষা, সূর্যপুত্র অশ্বিনীদ্বয়, বরুণ, পৃথ্বী, রুদ্র, যম—এঁরাও পূজিত হতেন। মরুৎ অর্থাৎ ঝড়ের দেবতা, বৃত্র অর্থাৎ অনাবৃষ্টির দেবতা—যে ইন্দ্রের সহিত ক্রমাগত বিরোধে প্রমত্ত ছিল—এঁরা সকলেই বেদে অল্প-বিস্তর পূজিত হয়ে এসেছেন। প্রত্যেক বেদের সূক্তের সঙ্গে ঋষিদের নাম জড়িত আছে। কারণ, এই সব ঋষিদের মধ্যেই বেদের সূক্তগুলি প্রতিভাত হয়েছিল। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ ও অন্য অনেকে এই সব সূক্তের রচয়িতা। যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বেদ মৌখিকভাবে শ্রুত হয়ে চলে আসছিল। শেষে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সমগ্র বেদকে সংগ্রহ করে একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনেন।

বেদবতী—ইনি বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা। ইনি জন্মান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুশধ্বজ

লক্ষ্মীকে কন্তারূপে পাবার জন্ত কঠোর তপস্তা করলে, তাঁর স্ত্রী মালাবতী কালক্রমে লক্ষ্মীর অংশরূপিণী এক কন্তা প্রসব করেন। এই কন্তা ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র বেদধ্বনি করতে থাকেন; সেই জন্ত এঁর নাম হয় বেদবতী। জন্মের পরেই বেদবতী পুষ্করতীর্থে গিয়ে এক মন্বন্তরকাল কঠোর তপস্তা করেন। এই সময়ে তিনি দৈববাণী শুনতে পান, "তুমি জন্মান্তরে বিষ্ণুকে স্বামীরূপে পাবে।" এই দৈববাণীর পর বেদবতী গন্ধমাদন-পর্বতে আবার তপস্তা করতে থাকেন। এই সময় হঠাৎ রাবণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি অতিথি জ্ঞানে তাঁর সেবা করেন। রাবণ এঁর রূপ-যৌবনে মুগ্ধ ও কামাতুর হয়ে বলপূর্বক অত্যাচার করতে উদ্যত হলেন। তখন বেদবতী ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে স্তম্ভিত করে তাঁর হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অবয়ব জড়ীভূত করে দিলেন। কিন্তু রাবণের হাতে তাঁর অপমানহেতু তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে রাবণকে বলে যান, এইরূপে ধর্ষিতা হবার জন্ত তিনি আবার অযোনিজা কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করে রাবণ-বধের কারণ হবেন।

বহুকাল পরে বেদবতী জনক রাজার কন্তা 'সীতা' নামে জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ এঁরই জন্য সবংশে ধ্বংস হন। দেবগণের ইচ্ছায় প্রকৃত সীতা অগ্নির কাছে থাকেন এবং রাবণ ছায়া-সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাবণ-বধের পর অগ্নি-পরীক্ষা কালে অগ্নি প্রকৃত সীতাকে অর্পণ করেন। রাম ও অগ্নির উপদেশে এই ছায়া-সীতাও পুষ্করতীর্থে তিন লক্ষ বৎসর তপস্যা করেন। এই তপোবল-প্রভাবে যজ্ঞ হতে উত্থিতা হয়ে ইনি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী নামে খ্যাত হন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

বেদব্যাস—ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত এবং বেদ বিভাগকর্তা। ইনি এক বেদকে শতশাখাযুক্ত চার ভাগে বিভক্ত করে বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। ইনি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, শক্তির পৌত্র, পরাশরের পুত্র ও শুকদেবের পিতা। এঁর মাতার নাম সত্যবতী। বর্ণ কৃষ্ণ ও দ্বীপে জন্ম বলে এঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ইনি মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, বেদান্তদর্শন এবং ভাগবত রচনা করেন। 'ব্যাস-সংহিতা' এঁর স্মৃতি, বেদান্ত এঁর দর্শন। এ ছাড়া পাতঞ্জল দর্শনের উৎকৃষ্ট টীকাও ইনি প্রণয়ন করেন। কথিত আছে, মহাভারত লিপিবদ্ধ করবার জন্য ব্যাস ব্রহ্মার নিকট উপদেশ নিতে গেলে ব্রহ্মা বলেন যে, গণেশই মহাভারতের লিপিকার হবেন। গণেশ এই সর্তে লিপিকার হতে সম্মত হন যে, তাঁর লেখনী ক্ষণমাত্রও থামবে না। ব্যাস

ভাবলেন যে, তাঁর রচনায় আট হাজার আট শত এমন শ্লোক আছে যার অর্থ গণেশ বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ব্যাসও তাই গণেশকে বললেন, "আমি যা বলে যাবো, আপনি তার অর্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না।" এতে গণেশ সম্মত হন। গণেশ সর্বজ্ঞ হলেও কঠিন শ্লোক লেখবার সময় তাঁকে সময়ে সময়ে বিশেষ চিন্তা করতে হত, এবং সেই অবসরে ব্যাস বহু শ্লোক মনে মনে রচনা করে নিতেন।

একদিন মৎস্যগন্ধা সত্যবতী পিতার আদেশে যমুনায় নৌকা পারাপার করছিলেন, এমন সময় ঋষি পরাশর পারাপারের জন্য সেই নৌকায় ওঠেন। রূপবতী মৎস্যগন্ধাকে দেখে পরাশর অত্যন্ত কামাতুর হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। এইরূপ স্থানে ও সময়ে মৎস্যগন্ধা সঙ্গমকার্যে আপত্তি প্রকাশ করলে, পরাশর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে মৎস্যগন্ধাকে জানালেন যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গমের ফলে মৎস্যগন্ধার কুমারীভাব দূষিত হবে না। পরাশর আরও বর দিলেন যে, মৎস্যগন্ধা সুগন্ধাযুক্তা হবেন। এই সঙ্গমের ফলে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম হয়। ব্যাস-জননী মৎস্যগন্ধা পরে সত্যবতী নামে পরিচিত হন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মমাত্র মাতার অনুমতি নিয়ে তপস্যায় রত হন এবং মাতাকে বলে যান যে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হবেন।

সত্যবতীর সহিত মহারাজ শান্তনুর বিবাহ হয়। তাঁর গর্ভজাত পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করলে, সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাস তাঁদের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন। সঙ্গমকালে ব্যাসের দীপ্ত নয়ন, কৃষ্ণ বর্ণ ও পিঙ্গল জটাজুট দেখে অম্বিকা ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করেন। ফলে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হন। ভয়ে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যান ব'লে পাণ্ডুও পাণ্ডুবর্ণ হন। সত্যবতী অম্বিকাকে পুনর্বার ব্যাসের নিকট যেতে বললে, তিনি ভয়ে তাঁর এক রূপসী দাসীকে ব্যাসের নিকট পাঠিয়ে দেন। ব্যাস এই দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন। মহাভারতের নানা ঘটনায় ব্যাস স্বয়ং জড়িত ছিলেন। ব্যাসের বিধান অনুযায়ীই পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এঁর বরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে সমর্থ হন। ধৃতরাষ্ট্রাদির

প্রার্থনায় ইনি যোগবলে যুদ্ধে মৃত জ্ঞাতিদিকে দর্শন করিয়ে তাঁদের পিতা, মাতা ও স্ত্রীদের প্রীত করান এবং ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দান করেন। ব্যাসদেব কৌরব ও পাণ্ডবদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। নানা বিপদকালে ইনি তাঁদের উপদেশ দিয়ে উপকৃত করতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ইনি পাণ্ডবদের ও ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতিকে নানা প্রকার সান্ত্বনা ও সংশয়চ্ছেদক উপদেশ দেন। এ সকল বিবরণ মহাভারতের স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ ও স্বর্গারোহণপর্বে দেখা যায়।

একবার এক অপ্সরাকে দেখে ব্যাসদেবের রেতঃপাত হয়। অপ্সরা ভীত হয়ে শুকপক্ষীর আকার ধারণ করে পলায়ন করে। এই রেতঃপাত হতে শুকদেবের জন্ম হয়। রেতঃপাতের পর তিনি শুকপক্ষীকে দেখেছিলেন বলে এই পুত্রের নাম রাখেন শুকদেব। বেদ বিভাগ ও মহাভারত রচনা ব্যতীত বেদব্যাস বেদান্তদর্শনও রচনা করেন। পুরাণে ব্যাস শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন পুরাণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্বরূপ বলা হতো। কল্পে কল্পে ধর্মের অবনতি দেখে ধর্মরক্ষার জন্য ভগবান ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদ-রক্ষা ও বেদ বিভাগ করে প্রচার করেছেন। ব্যাস ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়—বেদ বিভাগকারী ঋষিদের সম্মানসূচক উপাধি। তবে বেদব্যাসের উল্লেখে খুব সম্ভব একমাত্র বেদ বিভাগকর্তা এই বেদব্যাসকেই বোঝায়। এই বেদ বিভাগ করে, ইনি সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল, বৈশম্পায়ন ও পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান এবং মহাভারত সম্বন্ধেও এঁদের উপদেশ দেন। তারপর লোমহর্ষণ মুনিকে ইনি ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য বলে গ্রহণ করেন। ইনি চিরজীবীদের অন্যতম।

বেদাঙ্গ—বেদের অবয়ব। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত—এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। বেদ সম্যক্‌রূপে বুঝতে হলে ছয়টি বেদাঙ্গ আয়ত্ত করা আবশ্যক। (১) শিক্ষা অর্থে স্বরবিজ্ঞান, যদ্দ্বারা বৈদিক সূক্তগুলি উচ্চারণ করে স্বর-সংযোগে গান করবার নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। (২) ছন্দ—ছন্দ জ্ঞানের অভাবে বেদপাঠ অসম্পূর্ণ থাকে—রস, গুণ, দোষ উপলব্ধি হয় না এবং উচ্চারিত শব্দও হৃদয়ঙ্গম হয় না। গায়ত্রী, উষ্ণীক্, অনুষ্টুপ্‌, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতী—এই সাতটি বৈদিক ছন্দ। তার পরবর্তী আরগুলি লৌকিক ছন্দ। (৩) ব্যাকরণ—বৈদিক সাহিত্য

পরিচয়ের সহায়ক। (৪) নিরুক্ত—বৈদিক শব্দ ও বাক্যসমূহের অর্থপ্রতিপাদক গ্রন্থ। (৫) জ্যোতিষ—এর দ্বারা সূর্যাদি গ্রহের অবস্থান, গতি ও স্থিতিবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়। যজ্ঞাদি সম্পন্ন প্রভৃতি কার্যে গ্রহাদির অবস্থান জানা প্রয়োজন। (৬) কল্প—সূত্রগ্রন্থ। বেদের ব্রাহ্মণভাগ হতে সারতত্ত্ব সূত্রাকারে গ্রথিত। বাক্‌প্রয়োগ যাতে কল্পিত, অর্থাৎ সমর্থিত হয়।

বেদান্ত—ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপক শাস্ত্র। বেদের পূর্বভাগ মন্ত্র, ঋক্, যজুঃ ও সামন্। ঐ পূর্বভাগের দর্শন পূর্ব-মীমাংসা। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগই পূর্ব-মীমাংসার ভিত্তি। ব্রাহ্মণের শেষভাগ আরণ্যক ও আরণ্যকের শেষভাগ উপনিষদ। উপনিষদ ভাগকে বেদান্ত বলে। এতে বেদের চরম বস্তু আছে বলে এর নাম বেদান্ত। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্ম নির্ণয়মূলক যে সব গভীর চিন্তা আছে, তাদের সমন্বয় স্থাপন করাই উত্তরমীমাংসার উদ্দেশ্য। জীবব্রহ্ম নিরূপণাত্মক সূত্রই ব্রহ্মসূত্র। বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা।

বেণ—অঙ্গরাজের পুত্র। অঙ্গরাজের ঔরসে ও সুনীথার গর্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ প্রবলপরাক্রান্ত, অধার্মিক ও অত্যন্ত প্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন। নিজে পুণ্যহীন হলেও সৎপুত্র পৃথুর কল্যাণে স্বর্গলাভ করেন। রাজ্যলাভের পর তিনি রাজ্যমধ্যে যাগযজ্ঞাদি বা বলিদান প্রভৃতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং নিজেকেই যজনীয়, যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞস্বরূপ বলে প্রচার করেন। একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগরূপ পশুধর্ম এঁর শাসনকালে প্রচলিত হয়। মহর্ষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে বেণকে অধর্ম আচরণ হতে ক্ষান্ত হতে বলেন। তখন বেণ রাগান্বিত হয়ে ব্রাহ্মণদের আরো নিন্দা করেন এবং নিজেকে গর্বভরে সর্বশক্তিমান ও সর্বলোকপূজ্য বলে প্রচার করেন। বেণের চৈতন্য সম্পাদনে অসমর্থ মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রপূত কুশদ্বারা তাঁকে বিনাশ করেন। তারপর তাঁরা মৃত বেণের দক্ষিণ উরু মন্থন করতেথাকেন। তাতে এক খর্বদেহ কদাকার দগ্ধ কাষ্ঠতুল্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। ঋষিগণ তাকে বলেন, 'নিষাদ' (অর্থাৎ উপবেশন কর)। এই পুরুষ থেকে বন ও পর্বতবাসী নিষাদ এবং ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি হয়। তারপর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করায় রূপবান্ অপর একটি পুরুষের আবির্ভাব হয়—এর নাম পৃথু। ইনি ধনুর্বাণধারী এবং বেদ, বেদাঙ্গ, ধনুর্বেদ ও দণ্ডনীতিতে পারদর্শী। দেবতা ও ঋষিরা এই বেণপুত্রকে বললেন, "তুমি নিজের প্রিয়, অপ্রিয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মান ত্যাগ করে সর্বজীবের প্রতি সমদর্শী হয়ে ধর্মভ্রষ্ট মানুষকে দণ্ড দান করবে, দণ্ডনীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে এবং

বর্ণ-সঙ্কর নিবারণ করবে। এই পৃথুর জন্য বেণ পুত নামক নরক থেকে উদ্ধারলাভ করে স্বর্গে গমন করেন (মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ)।

বেদের মতে বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোন দেবতাকে বেণ নামে উপাসনা করা হয়েছে (রমেশচন্দ্র দত্ত)।

বৈকর্তন—কর্ণের অন্য নাম। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রার্থনায় নিজের শরীর হতে কবচ ও কুণ্ডল বিবর্তন করে ইন্দ্রকে দান করেছিলেন বলে এঁর নাম বৈকর্তন ও কর্ণ। (মহাভারত—আদি)।

বৈকুণ্ঠ—বিষ্ণুর এক নাম। "আমি কুণ্ঠিত না হইয়া জলের সহিত পৃথিবীর, বায়ুর সহিত আকাশের এবং তেজের সহিত বায়ুর মিলন করিয়াছি বলিয়া পাণ্ডবেরা আমাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করেন।" (কালী সিংহের মহাভারত)।

পঞ্চম (রৈবত)মন্বন্তরে বিষ্ণু শুভ্রের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী বৈকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণের সঙ্গে আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীর ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড়।

বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদকে বৈজয়ন্ত বলা হয়।

বৈবস্বত—(১) মরীচি হতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান (সূর্য) এবং বিবস্বান হতে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মনুই মনু (রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড)।

(২) বৈবস্বত সপ্তম মনু। এই মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও ঋচিক্-পুত্র জমদগ্নি—ঐঁরা সপ্তর্ষি। সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এঁরা দেবতা। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশজন বৈবস্বত মনুর পুত্র। এঁদের পৌত্র-পুত্র প্রভৃতি সন্তানগণ কালক্রমে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়েছেন (হরিবংশ)।

(৩) সমস্ত মনুর মধ্যে বৈবস্বত মনু সপ্তম। স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম ও তারপর যথাক্রমে স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুস্ মনু হন (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

বৈতরণী—নরকে প্রবেশ করার পূর্বে এই নদী অতিক্রম করতে হয়। এই নদী দুর্গন্ধপূর্ণ, রুধিরবহা, উষ্ণতোয়া ও মহাবেগা।

বৈদেহ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমি বশিষ্ঠের শাপে দেহত্যাগ করলে, ঋষিরা পুত্রের জন্য তাঁর দেহ মন্থন করেন। মথিত দেহ হতে একটি কুমার জন্মগ্রহণ করে। মৃতদেহ হতে জন্ম বলে তাঁর নাম হয় জনক। ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলে এঁর নাম বৈদেহ এবং মন্থন-

দ্বারা জন্ম হয় বলে এঁর আর এক নাম মিথি।

বৈশেষিক দর্শন—ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত দর্শনশাস্ত্র। এই দর্শনে পরমাণুবাদ প্রচারিত হয়েছে। মহর্ষি কণাদ এই শাস্ত্রপ্রণেতা। কণাদ ঋষির অন্য নাম উলূক।

বৈশ্বানর—(১) বৈশ্বানর বা অগ্নি ঋক্‌বেদের একজন প্রধান দেবতা। বিশ্বামিত্র এই দেবতার স্তুতি করে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেছেন। (২) দানবরাজ দনুর শত পুত্রের অন্যতম। তাঁর দুই কন্যা—পুলোমা ও কালকা।

বৈষ্ণবী—(১) অন্ধকারাসুরের রক্তপান করার জন্য মহাদেব-সৃষ্ট একজন মাতৃকা (মৎস্যপুরাণ)। (২) দেবী পার্বতী মাতৃকাদের মধ্যে বৈষ্ণবী নামে খ্যাতা (পদ্মপুরাণ)। (৩) দুর্গার অন্য নাম। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা (কালিকাপুরাণ)।

বৈশম্পায়ন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রিয় শিষ্য। ব্যাস এঁকে সংহিতা প্রদান করেন। ইনি লোমহর্ষণের নিকট পুরাণ পাঠ করেন এবং ইনি ষট্‌ পৌরাণিকের একজন। জনমেজয় কুরুপাণ্ডব-চরিত-কথা শুনতে ইচ্ছা করলে ব্যাস এঁকে মহাভারত-কথা কীর্তন করতে আদেশ দেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ইনি যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। একবার বৈশম্পায়ন হঠাৎ ভুলক্রমে তাঁর ভগিনীর পুত্রকে পদাঘাতে নিহত করেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তিনি শিষ্যদের ব্রহ্মবধ্যা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলেন। শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "আপনার অন্যান্য শিষ্যের যজ্ঞ করার দরকার নেই, আমি নিজেই এই ব্রত সম্পন্ন করবো। এতে আমি নিজের তপস্যার বল দেখাবো।" বৈশম্পায়ন এইরূপ গর্বিত বাক্য শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁর অধীত বিদ্যা গুরুকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। শিষ্য রুধিরাক্ত বমনে তৎক্ষণাৎ সমস্ত যজুর্বেদ উদ্গার করে করে দেন। অন্যান্য শিষ্যরা তিত্তিরী পক্ষীতে পরিণত হয়ে ভূমিতে পতিত বমন করা যজুর্বেদ সংগ্রহ করেন। এই অবস্থায় বেদের যে অংশ পাওয়া যায় তাকে তৈত্তিরীয় ও কৃষ্ণ বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সেখান থেকে প্রস্থান করে তপস্যায় সূর্যকে প্রীত করেন, এবং গুরুও জ্ঞাত নন এমন বেদবিদ্যা লাভের বর প্রার্থনা করেন। সূর্য বাজী (অশ্ব) রূপ ধারণ করে যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদবিদ্যা শিক্ষা দেন। সেই জন্য এই সংহিতার নাম বাজসেনীয় এবং সূর্য থেকে প্রাপ্ত বলে শুক্ল। পুরাণে লিখিত আছে, এই মুনি বজ্রবারক। এঁর নাম করলে বজ্রভয় দূরীভূত হয়।

বৈশ্রবণ—বৈশ্রবণ কুবেরের অন্য নাম। পিতা বিশ্রবার নাম হতে এঁর নাম হয় বৈশ্রবণ। ইনি বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে

জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রাক্ষসের মত রূপ ও অসুরের মত শক্তি ছিল। 'কু' শব্দের অর্থ কুৎসিত, 'বের' শব্দের অর্থ শরীর। কুৎসিত শরীর বলেই বৈশ্রবণের নাম হয় কুবের (বায়ুপুরাণ)। ইনি শিবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেই জন্য শিবের অনুগ্রহে ইনি সমস্ত ধনরত্নের অধিপতি, গুহ্যকদের অধীশ্বর, যক্ষ ও কিন্নরদের রাজা, রাক্ষসদের প্রভু ও সকলের ধর্মদাতা হন।

ব্যোমকেশ—মহাদেব। ব্যোম (আকাশ) কেশ যাঁহার। স্বর্গ হতে গঙ্গাবতরণকালে শিবের জটাসমূহ আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সেইজন্য মহাদেবের আর এক নাম ব্যোমকেশ।

ব্রজ—মথুরা ও তার চারদিক। এই স্থান কৃষ্ণের লীলাভূমি ও মহাতীর্থস্বরূপ। এই ব্রজভূমিতে বারোটি বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন আছে।

ব্রহ্ম—অব্যয়, অব্যক্ত, চিরন্তন, সর্বসৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপক, স্বয়ম্ভু। ইনি নামচিহ্নের অতীত, ইনি স্থিতি ও সৃষ্টির কর্তা, ইনি স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয়। ইনি অদৃশ্য, আদি ও অন্তহীন। অসীম ও অনন্ত, সমস্ত জিনিস এঁর থেকে সৃষ্ট ও সমস্তই এঁতে বিলীন হয়। ইনি কালের ও সীমার অতীত।

ব্রহ্মণস্পতি—ঋগ্‌বেদের একজন দেবতা। পণ্ডিতরা মনে করেন, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও বাচস্পতি একই দেবতা, কেবল নামান্তর মাত্র। বেদের কোন কোন স্থানে এঁরা অগ্নিদেবের রূপান্তর। ঋগ্‌বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তুতি বা প্রার্থনা। ম্যাক্সমূলার মনে করেন, বৃহ্‌ ধাতুর একটি অর্থ বর্ধন, আর একটি অর্থ বাক্য। রমেশ দত্তের মতে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি স্তুতিদেব। অতএব ব্রহ্মণস্পতি স্তুতিপাঠক পুরোহিত। ইনি বৈদিক মতে ধনবান, রোগহন্তা, ধনদাতা। ইনি দেবগণের গণপতি, অসুরহন্তা, মন্ত্রসমূহের স্বামী, ক্রোধের হিংসক। ইনি প্রাণিগণের অধিপতি। ইনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, ধনুর্ধর। ইনি পর্বত, দুর্গ ভেদ করেন এবং বৃত্রদের বধ করেন।

ব্রহ্মদত্ত—পবিত্রপরায়ণ এক রাজা। একদা কালরূপী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ এঁর গৃহে অতিথি হন। রাজা গৌতমের জন্য যে আহার্য প্রদান করেন, তাতে মাংস মিশ্রিত ছিল। এতে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মদত্তকে 'গৃধ্র হও' বলে শাপ দেন। রাজা অনেক ক্ষমাভিক্ষা করলে গৌতম বললেন, "ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা রাম তোমাকে স্পর্শ করলে তুমি মুক্তিলাভ করবে।" ব্রহ্মদত্ত গৃধ্র হয়ে বাস করতে লাগলেন। রামের রাজত্বকালে এই গৃধ্র অযোধ্যার রাজোদ্যানে

এক উলুকের বাসা অধিকার করে বাস করতে লাগল। উলুক রামের কাছে এর জন্য অভিযোগ করলে, রাম বিবাদস্থলে উপস্থিত হয়ে উলুককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এ বাসা কত দিনের?" সে বললে, "এই পৃথিবীতে যতদিন বৃক্ষের জন্ম হয়েছে, ততদিন এই বাসা নির্মিত হয়েছে।" গৃধ্র বললে, "পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করা থেকে আমি এই গৃহে বাস করছি।" দুই জনের কথা শুনে রাম বুঝলেন, সৃষ্টির নিয়মানুসারে মানুষের আগে বৃক্ষের জন্ম। তাই এ বাসার প্রকৃত অধিকারী উলুক। গৃধ্র একজন অপহরণকারী। রাম গৃধ্রকে দণ্ড দিতে গেলে দৈববাণী হলো, "গৃধ্র গৌতম শাপে দগ্ধ হয়েছে; একে স্পর্শ করে শাপমুক্ত করুন।" রামের স্পর্শে গৃধ্র দিব্যরূপ প্রাপ্ত হোল (রামায়ণ)।

ব্রহ্মর্ষি—প্রথমে ব্রহ্মর্ষি, তারপর দেবর্ষি, তারপর রাজর্ষি। কশ্যপ বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও অত্রি—এঁদের গোত্রে ব্রহ্মর্ষিরা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলে এঁরা ব্রহ্মর্ষি।

ব্রহ্মা—মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হলে, এক ভাগ আকাশে ও অন্য ভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হয়। এরপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ—এই দশ জন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা নারদকে সমস্ত সৃষ্টির ভার নিতে বলেন; কিন্তু ব্রহ্ম-সাধনায় বিঘ্ন হবে বলে নারদ সৃষ্টির ভার নিতে রাজী হন না। এই জন্য ব্রহ্মার শাপে তাঁকে গন্ধর্ব ও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা এঁর দুই কন্যা।

ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মস্তক ছিল; কিন্তু একদা শিবের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ করায় শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মস্তক দগ্ধ হয়। ব্রহ্মার বাহন হংস। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না। সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ—(১) প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার একটি করে ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণ ভাগ সংহিতা হতে বিভিন্ন। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া-প্রণালী, ক্রিয়ার

তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগ সাধারণতঃ গদ্যে রচিত; কিন্তু কোন কোন স্থানে গাথা বা পদ্যময় অংশও আছে। এই ব্রাহ্মণের শেষ অংশের নাম 'আরণ্যক' এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষৎ। আরণ্যকগুলি গার্হস্থ্যাশ্রমের শেষে নিভৃত অরণ্যে পাঠ্য ছিল বলে এই নাম প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে তিনটি বিষয় আছে—(১) যজ্ঞ প্রণালী, (২) অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা, (৩) উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ত্ব।

(২) চতুর্বর্ণের মধ্যে আদি ও প্রধান বর্ণ।

ভ

ভগদত্ত—ইনি প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুরের পুত্র। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের আধিপত্য অমান্য করার জন্য অর্জুনের সঙ্গে এঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কর দান করে ইনি পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরবপক্ষ অবলম্বন করে দ্বাদশ দিনের যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করবার মানসে পিতৃদত্ত আমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করাতে তা বৈজয়ন্তীমালা হয়ে তাঁর বক্ষলগ্ন হয়। তখন পরমাস্ত্রহীন ভগদত্তকে অর্জুন অর্ধচন্দ্র বাণে বধ করেন (মহাভারত)।

ভগবতী—মহিষমর্দিনী দুর্গার এক নাম। ইনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, পৃথিবী, সূর্য, বসুগণ, কুবের, অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তেজসম্ভূতা। এই সব দেবদেবী অসুর-বিনাশের জন্য এঁকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদান করেন। ভগবতী ঐ দেবদেবীগণের তেজ ধারণ করে তাঁদের অস্ত্রের সাহায্যে মহিষাসুরকে বধ করেন। ইনি প্রকৃতিস্বরূপিণী মহামায়া দেবী। লঙ্কার যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য রাম ভগবতীর পূজা করেছিলেন। ইনি মহিষাসুর, রক্তবীজ, চণ্ডাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দানবদের নিহত করেন।

ভগবৎ পুরাণ—ইহা অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। ভগবতে অধ্যায় শেষে মহাপুরাণ বলে এর উল্লেখ আছে। এই পুরাণ ব্যাস-রচিত। শুকদেব ইহা পিতার নিকট শ্রবণ করেন এবং গঙ্গাতীরে ব্রহ্মশাপগ্রস্তপরীক্ষিতের প্রার্থনায় এই ভগবত-কথা কীর্তন করেন। এই পুরাণে অসুর বৃত্রের পরাজয় ও মৃত্যুর বিবরণ আছে। এই পুরাণের দশম ভাগ বিশেষ মূল্যবান। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়।

ভগীরথ—ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর-রাজার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। সগরের পৌত্র অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ।

দিলীপ ভগীরথের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে তপস্যার জন্য হিমালয়ে গমন করেন ও দীর্ঘকাল তপস্যার পর দেহত্যাগ করেন। ভগীরথ বাল্যকালে মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন। এঁর দেহাস্থি দৃঢ় না থাকায় ইনি সরলভাবে দণ্ডায়মান হতে পারতেন না। একদিন অষ্টাবক্র মুনিকে সম্মান দেখাতে গিয়ে ইনি দাঁড়াবার জন্য বৃথা চেষ্টা করেন। এঁর এই বক্র অবস্থা দেখে মুনি ভাবলেন যে, তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যই ভগীরথ এরূপ ব্যবহার করেছেন। তখন অষ্টাবক্র এঁকে শাপ দিলেন, "আমাকে বিদ্রূপ করে থাকলে তুমি বিকলাঙ্গ হবে, আর তা না হলে তুমি উত্তমাঙ্গ হবে।" সেই হতে ভগীরথ সুস্থ ও উত্তমাঙ্গ হলেন। কপিলের শাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষদের উদ্ধারার্থ ইনি গোকর্ণ-তীর্থে বহু বর্ষ ধরে উগ্র তপস্যা করেন। তখন ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগীরথকে বর দিতে চাইলে তিনি দু'টি বর প্রার্থনা করেন—(১) সন্তানের অভাবে যেন তাঁর বংশলোপ না হয়। (২) কপিলের শাপে ভস্মীভূত সগররাজের ৬০,০০০ পুত্র (ভগীরথের পিতৃপুরুষগণ) যেন গঙ্গাসলিলে সিক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেন। ব্রহ্মা প্রথম বর দিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বর সম্বন্ধে তিনি বললেন যে, হিমালয়ের কন্যা গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করতে পারবে না। একমাত্র মহাদেবই গঙ্গার এই পতনবেগ ধারণ করতে সক্ষম। তখন ভগীরথ পুনরায় তপস্যারত হয়ে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁকে গঙ্গাধারণের জন্য নিয়োজিত করেন। ভগীরথের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ করতে সম্মত হন। গঙ্গা অতিবেগে মহাদেবের মস্তকের উপর পতিত হয়ে স্রোতে ভাসিয়ে তাঁকে রসাতলে নিয়ে যেতে চাইলেন; কিন্তু মহাদেব গঙ্গার এই অভিপ্রায় বুঝতে পেরে সহস্র বৎসর গঙ্গাকে নিজের জটার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন। গঙ্গার এই অবস্থা দেখে ভগীরথ পুনরায় মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব গঙ্গাকে জটামণ্ডল হতে নির্গত করে দেন। তখন সপ্ত ধারায় গঙ্গা ভূতলে অবতরণ করেন। গঙ্গার তিনটি প্রবাহ পূর্ব দিকে ও তিনটি প্রবাহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, এবং আর একটি প্রবাহ ভগীরথকে অনুসরণ করে চলে ভগীরথ এই স্রোতের পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন বলে এই প্রবাহের নাম হয় ভাগীরথী। ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করে গঙ্গার সঙ্গে রসাতলে যান। সেখানে গঙ্গা সগরসন্তানদের ভস্মরাশির উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তাঁরা মুক্তিলাভ করে স্বর্গারোহণ করেন (রামায়ণ, মৎস্যপুরাণ)।

ভঙ্গাশ্বন—ভঙ্গাশ্বন নামে এক ধার্মিক

রাজা পুত্র-কামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করে শত পুত্র লাভ করেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিকেই স্তুতি করা হয় বলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন এবং মায়াজাল বিস্তার করে এঁকে বিমোহিত করেন। রাজা দিগ্‌ভ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পান। সেই সরোবরে স্নান করলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপে রূপান্তরিত হন। তখন তিনি সেই অবস্থাতেই রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে স্ত্রী ও পুত্রদের এর কারণ জানান ও পুত্রদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বনগমন করেন। স্ত্রীরূপী ভঙ্গাস্বন এক ঋষির আশ্রমে এসে বাস করতে থাকেন। সেই ঋষির ঔরসে স্ত্রীরূপী রাজার গর্ভে আবার একশত পুত্র হয়। তিনি এই একশত পুত্র নিয়ে পূর্বের একশত পুত্রের কাছে গিয়ে বললেন, "এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমরা রাজ্যভোগ কর।" ইন্দ্র দেখলেন যে, অপকার করতে গিয়ে তিনি রাজার উপকারই করেছেন।" তখন ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবার জন্য তিনি সেই দুইশত পুত্রকে বললেন, "তোমরা একদল রাজা ভঙ্গাস্বনের পুত্র, আর একদল ঋষির পুত্র, অতএব সকলের একত্রে রাজ্যভোগ অসম্ভব।" ইন্দ্রের এই কথা শুনে রাজপুত্রদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মালো এবং তারা যুদ্ধ করে পরস্পরকে বিনষ্ট করলো। পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে রাজা রোদন করতে আরম্ভ করলে ইন্দ্র এসে বললেন, "আমাকে আহ্বান না করে অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করেছিলে বলে তোমার এইরূপ ফল হয়েছে।" তখন রাজা ইন্দ্রের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। এতে ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বললেন, "তুমি কোন পুত্রদের জীবন কামনা করো—তোমার ঔরসজাত পুত্রদের, না তোমার গর্ভজাত পুত্রদের?" তখন রাজা জানালেন, তিনি স্ত্রী হয়ে যে পুত্রদের জন্ম দিয়েছেন, সেই পুত্রদেরই জীবন-কামনা করেন। এতে ইন্দ্র আশ্চর্য হলে রাজা বলেন, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহই বেশী। এতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে সেই বরই তাকে দান করেন। তারপর রাজা অন্য বর প্রার্থনা করেন—তিনি স্ত্রী হয়েই থাকতে চান। কারণ, স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে স্ত্রীরাই অধিক সুখী হয়। ইন্দ্র এই বরও তাঁকে দান করেন (মহাভারত—অনুশাসন)।

ভদ্রকালী—ভগবতীর এক মূর্তি। এই দেবী ষোড়শ হস্তযুক্তা। একদিন মহিষাসুর নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, দেবী ভদ্রকালী তাঁর শিরশ্ছেদ করে রক্তপান করেছেন। স্বপ্ন দেখে ভীত মহিষাসুর ভদ্রকালীর পূজা করতে আরম্ভ করেন। পূজায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁর কাছে উপস্থিত হন। তখন মহিষাসুর দেবীকে বলেন, "একদা কাত্যায়ন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব

হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন। সেই সময় আমি স্ত্রীমূর্তি ধারণ করে তাঁর তপোভঙ্গ করি। তখন তাঁর গুরু কাত্যায়ন শাপ দেন, স্ত্রীরূপে তাঁর শিষ্যকে মোহিত করার জন্যে স্ত্রীর দ্বারাই আমার মৃত্যু হবে। এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। মৃত্যুর পূর্বে আমি এক বর প্রার্থনা করছি—আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করছি এবং আপনার পদসেবক রূপে বাস করতে চাই।" তখন দেবী বলেন, "যজ্ঞভাগ দেবতাদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, অতএব আমি তোমায় বর দিচ্ছি যে, আমার দ্বারা নিহত হলেও তুমি আমার চরণ ত্যাগ করবে না। যেখানে আমার পূজা হবে, সেখানে তুমিও পূজা পাবে। উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গার পদলগ্ন হয়ে তুমি সর্বদা বাস করবে" (কালিকাপুরাণ)।

ভবিষ্যপুরাণ--ভবিষ্যপুরাণে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তাই বলা হয়েছে। পুরাণের লক্ষণ হিসাবে যা স্বীকৃত, এ পুরাণে তার কিছুই নাই। প্রধানতঃ এই পুরাণে নিয়ম ও পূজা-প্রণালীর ব্যাপার লিখিত আছে। এই পুরাণের দেবতা শিব'।

ভরত—(১) ইনি সূর্যবংশীয় রাজা দশরথ ও তাঁর স্ত্রী কৈকেয়ীর পুত্র ও রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অপুত্রক রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞশেষে স্বয়ং অগ্নিদেব অগ্নিকুণ্ড হতে উঠে দশরথের হাতে পায়স দেন। দশরথ সেই পায়স স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এই পায়স ভোজন করে কৌশল্যা রামকে, কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে জন্মদান করেন। কৈকেয়ীর বরের ফলে যখন জ্যেষ্ঠপুত্র রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে প্রেরিত হন, তখন ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। কৈকেয়ী নিজ-পুত্র ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করবার জন্যই রামকে বনবাসে পাঠান; কিন্তু ভরত মাতাকে হতাশ করেন এবং তাঁকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। তিনি মৃত পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেই রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে চিত্রকূট পর্বতে যান; কিন্তু রাম বনবাস-কাল পূর্ণ না হলে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হন। তখন ভরত রামের প্রতিনিধি-স্বরূপ তাঁর পাদুকাযুগল সিংহাসনে স্থাপন করে রামের নামে তাঁর দাস হয়ে নন্দীগ্রামে অবস্থানপূর্বক রাজ্য-শাসন করতে থাকেন। বনবাসান্তে ফিরে এলে ভরত রামের চরণে তাঁর সেই পাদুকাযুগল স্থাপন করে তাঁর হস্তে রাজ্যভার তুলে দেন। ভরত জনকরাজার ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীকে বিবাহ করেন। মাণ্ডবীর গর্ভে ভরতের দুই পুত্র হয়। তাদের নাম দক্ষ ও পুষ্কল। ভরত এই দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধর্বরাজ শৈলূশের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিন্ধুনদের

উত্তরস্থিত গন্ধর্বদেশ জয় করেন এবং এই দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করে দুই পুত্রকে দেন। তক্ষ যে রাজ্যের রাজা হন, সেই রাজ্যের নাম তক্ষশীলা এবং পুষ্কল যে রাজ্যের রাজা হন, তার নাম পুষ্কলবতী। ভরত রামের ন্যায় সরযূ-সলিলে আত্মবিসর্জন করেন (রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত)।

(২) নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা। ভারতের প্রাচীন নাট্যকলার পরিচয় এঁর গ্রন্থে আছে।

(৩) চন্দ্রবংশীয় রাজা। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে কণ্বমুনির আশ্রমে এঁর জন্ম হয়। ইনি নিজে রাজা হয়ে সকল নৃপতিদের পরাজিত করে সার্বভৌমত্ব লাভ করেন। ইনি যমুনাতীরে একশত, সরস্বতীতীরে তিনশত এবং গঙ্গাতীরে চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পরে আবার সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এতদ্ব্যতীত অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র বাজপেয় যজ্ঞও ইনি সম্পন্ন করেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত এঁর বিবাহ হয়। বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ এঁর দ্বারাই পালিত হন। ইনি প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, এবং সমস্ত ভারতবর্ষ নিজের শাসনাধীনে আনেন। এঁরই নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। ভরতের নবম বংশধর কুরু, তাঁর চতুর্দশ বংশধর শান্তনু এবং শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্রদের বংশধরগণ পাণ্ডব ও কৌরব নামে খ্যাত।

(৪) ঋষভদেবের পুত্র। ইনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রাজা হয়ে ইনি বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনাকে বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র হয়। রাজা পুত্রদের রাজ্যভাগ করে দিয়ে তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। বনবাসকালে একদিন এক আসন্নপ্রসবা হরিণী জলপান করতে এসে এক সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে পদস্খলিত হয়ে ভূপতিত হয় এবং গর্ভপাতের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। ভরত এই মাতৃহীন মৃগের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তপস্যা ত্যাগ করেন এবং এই মৃগের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন। পরজন্মে ইনি মৃগজন্ম লাভ করেন এবং জন্মান্তরে ব্রাহ্মণকুমার রূপে আবির্ভূত হন। তিনি লোকসঙ্গ থেকে বিবর্জিত হয়ে জড়বৎ বাস করতেন বলে এঁর নাম হয় ‘জড়ভরত’।

ভরদ্বাজ—বিখ্যাত ঋষি। ইনি বৃহস্পতির পুত্র ও দ্রোণের পিতা। বেদের অনেক মন্ত্রের ইনি বক্তা। উতথ্য ঋষির স্ত্রী মমতার গর্ভিণী অবস্থায় তাঁর দেবর বৃহস্পতি তাঁর সঙ্গম প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ অমান্য করে বৃহস্পতি বলপ্রয়োগ করলে, গর্ভস্থ শিশু দ্বিতীয় গর্ভের স্থান না থাকায়

ক্রুদ্ধ হয়ে পদদ্বারা পিতৃব্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। ঐ ভাবে নিবারিত হওয়ায় বৃহস্পতির বীর্য ভূমিতে পতিত হয়। গর্ভস্থ শিশুর দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে বৃহস্পতি 'অন্ধ হও' বলে তাঁকে অভিশাপ দেন। ফলে অন্ধ হয়ে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। বৃহস্পতির ভূমিতে পতিত বীর্য হতে আর এক পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় মমতা এই পুত্রকে ত্যাগ করতে চান। কারণ, তিনি ব্যাভিচারিণী জানলে স্বামী তাঁকে ত্যাগ করবেন। বৃহস্পতির সঙ্গে মমতার এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বৃহস্পতি বলেন যে, এই শিশু একের ক্ষেত্রে অন্যের বীর্যে উৎপন্ন হয়েছে, সুতরাং সে মমতার স্বামীরই পুত্র। বৃহস্পতি এই পুত্রকে ভরণপোষণ করতে বলেন। মমতা রাজী না হওয়ায় তাঁরা উভয়েই সেই পুত্রকে ত্যাগ করে চলে যান। তখন মরুদ্গণ এই শিশুকে পালন করেন। এই পুত্রের নাম হয় ভরদ্বাজ। ইনি মরুদ্গণ কর্তৃক 'ভৃত' হয়েছিলেন বলে 'ভর' এবং দুইয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে 'দ্বাজ' (অর্থাৎ সঙ্কর)।

একদিন গঙ্গায় স্নানকালে ঘৃতাচী অপ্সরাকে নগ্নাবস্থায় দেখে ভরদ্বাজের শুক্রপাত হয়। দ্রোণমধ্যে এই শুক্র রক্ষিত হলে এঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রৈভ্যের সঙ্গে এঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত রৈভ্যের পুত্রবধূর সতীত্ব নষ্ট করলে রৈভ্য তাকে নিহত করেন। ভরদ্বাজ এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ না জানায় রৈভ্যকে শাপ দেন যে, তিনি বিনা অপরাধে পুত্র দ্বারা নিহত হবেন। পরে সমস্ত অবগত হয়ে ভরদ্বাজ অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন এবং রৈভ্যের পুত্র অর্বাবসুর তপঃ-প্রভাবে পুনর্জীবিত হন (দেবী ভাগবত)।

ব্যাধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির জন্য ইনি মুনিদের অনুরোধে ইন্দ্রালয়ে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সমস্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠ করে ইনি মর্ত্যলোকে ফিরে এসে ঋষিদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। মহাভারতে দেখা যায়—ইনি হরিদ্বারে বাস করতেন। রামায়ণে আছে—ইনি রামের বনবাসকালে ও বন হতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে নিজ আশ্রমে সীতাকে অভ্যর্থনা করেন। চিত্রকূট যাত্রাকালে ভরত এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

ভরতের পুত্র সম্ভাবনা বিতথ হলে, অর্থাৎ পুত্র হবার সম্ভাবনা না থাকলে, ইনি মরুৎস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে মরুদ্গণ প্রীত হয়ে ভরতকে এক পুত্র দান করেন। এই জন্য ভরদ্বাজের অন্য নাম 'বিতথ' (ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ)।

ভানুমতী—(১) কুরুরাজ দুর্যোধনের স্ত্রী। এঁর গর্ভে লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মণা নামে

পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে। (২) যদুবংশীয় ভানুর কন্যা। এঁকে হরণ করার ফলে নিকুম্ভ দৈত্য কৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত হয়। পরে কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব এঁকে বিবাহ করেন।

ভার্গব—(১) ভৃগু মুনির পুত্র ও তাঁর বংশধরগণ। ভার্গব অর্থে চ্যবন, সৌনক, জমদগ্নি ও পরশুরামকে বোঝায়।

ভীম--(১) ইনি পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ দ্বিতীয় পুত্র এবং মধ্যম পাণ্ডব নামে খ্যাত। ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে লাভ করার পর পাণ্ডু কুন্তীকে একটি বলবান পুত্র প্রর্থনা করতে বলেন। তখন বায়ুকে আহ্বান করে কুন্তী তাঁর কাছে এক মহাকায় বলবান পুত্র প্রার্থনা করেন। কুন্তীর গর্ভে ও বায়ুর ঔরসে ভীমের জন্ম হয়। হনুমান এঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ভীমের আকৃতি বিরাট এবং দেহের শক্তি অপরিমিত ছিল। গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন বলে কর্ণ এঁকে তুবরক (মাকুন্দ) বলে পরিহাস করতেন। দ্রোণ ও বলরামের নিকট ইনি অস্ত্রশিক্ষা করেন এবং গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয় হন। বাল্যকালে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতি একশত ভ্রাতার সহিত পাণ্ডু-পুত্রদের সর্বদা ক্রীড়া-কৌতুক চলতো। ভীমের অত্যধিক শারীরিক শক্তির জন্য কৌরবদের পক্ষে তাঁর ক্রীড়া পীড়ার কারণ হত। তাই বাল্যকাল হতে ইনি ধার্তরাষ্ট্রদের বিশেষ নিগ্রহের কারণ হয়ে ওঠেন। বাহুযুদ্ধে, গতিবেগে বা ব্যায়ামে তাঁর সমকক্ষ কেহই ছিল না। ইনি কাঞ্চনবর্ণ, বৃষস্কন্ধ, উন্নতবক্ষ ও অযুত হস্তীর ন্যায় বলশালী ছিলেন। অতিরিক্ত ভোজনপটু বলে তাঁর এক নাম 'বৃকোদর' (বৃক নামক অগ্নি যার উদরে অবস্থিত)।

বিপদকালে দ্রৌপদী এঁর উপরেই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন এবং সুকঠিন কার্যভার এঁর উপরেই ন্যস্ত করতেন। বাল্যকালেই তাঁকে বিনাশ করবার জন্যে একবার দুর্যোধন গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটী নামক স্থানে জলক্রীড়ার জন্যে একটি ক্রীড়াস্থল নির্মাণ করে ভ্রাতাদের নিমন্ত্রণ করেন। এই স্থানে তিনি ভীমকে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন খাইয়ে অজ্ঞান ও লতাপাশে বদ্ধ করে জলে নিক্ষেপ করেন। নিমজ্জিত ভীম নাগলোকে পতিত হন। সেখানে নাগ-দংশনে তাঁর বিষক্ষয় হয়। জ্ঞান লাভ করে তিনি নাগদের হত্যা করতে থাকেন। নাগরাজ বাসুকী তাঁকে নিজের দৌহিত্র কুন্তীভোজের দৌহিত্র বলে চিনতে পেরে আলিঙ্গন করেন ও রসায়ন পান করতে দেন। ভীম আটটি রসায়ন-কুণ্ড নিঃশেষ করে আট দিন নিদ্রা যান ও নিদ্রান্তে রসায়ন জীর্ণ করার ফলে অযুত হস্তীর সমান বল লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্রোণের গুরুদক্ষিণারূপে পাঞ্চালরাজ্য বিজয়ে ভীম বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। এরপর দুর্যোধন বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করে অন্যান্য পাণ্ডব ও কুন্তীসহ ভীমকেও জীবন্ত দগ্ধ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পাণ্ডবরা বিদুরের সাবধান বাক্যে দুর্যোধনের এই চক্রান্ত নিষ্ফল করেন। ভীম সুড়ঙ্গপথে সকলকে অন্যত্র পাঠিয়ে স্বয়ং জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করেন এবং কুন্তীকে স্কন্ধে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে নিয়ে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনের হাত ধরে মহাবেগে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে বিদুর প্রেরিত নৌকায় উঠে পলায়ন করেন। গঙ্গার পরপারে তাঁরা এক অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে সকলে ক্লান্ত ও নিদ্রিত হলে ভীম একা জাগ্রত থাকেন। নিকটস্থ এক শালবৃক্ষে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস বাস করত। সে পাণ্ডবদের দেখে নরমাংস ভোজনের লোভে তাঁদের বধ করে আনতে তার ভগ্নী হিড়িম্বাকে প্রেরণ করে। হিড়িম্বা ভীমের রূপে মুগ্ধ হয়ে এক সুন্দরীর বেশ ধারণ করে এবং হিড়িম্বের অভিসন্ধির কথা জানিয়ে পঞ্চপাণ্ডবদের রক্ষা করতে ও ভীমকে বিবাহ করতে চায়। ভগিনীর বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব স্বয়ং এসে উপস্থিত হলে, ভীম তাকে বধ করেন ও হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। অতঃপর পাণ্ডবরা একচক্রা নগরে এসে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নেন। সেখানে বক নামে এক রাক্ষস নগর-রক্ষার মূল্যস্বরূপ প্রত্যহ একজন মানুষ ও প্রচুর আহার্য ভক্ষণ করত। পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হলে, তাদের পরিবারবর্গের ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে কুন্তী ভীমকে বকরাক্ষসের নিকট প্রেরণ করেন। ভীম স্বয়ং ব্রাহ্মণের পরিবর্তে গিয়ে বকরাক্ষসকে বধ করে একচক্রাবাসীদের ভয় দূর করেন। এই একচক্রা নগরে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভার বিবরণ শুনে সেখানে উপস্থিত হন। সেখানে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ফলে স্বয়ংবর-সভায় আহূত অন্যান্য রাজগণ পাণ্ডবদের আক্রমণ করেন। কিন্তু পাণ্ডবরা তাঁদের সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করে সকলে মিলেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করলে, নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে মনস্থ করেন। মগধরাজ জরাসন্ধ এই যজ্ঞের বিঘ্নস্বরূপ হবেন জেনে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে মগধে উপস্থিত হন এবং চতুর্দশ দিন তাঁর সহিত মল্লযুদ্ধের পর ভীম দুই পা ধরে তাঁর শরীর দ্বিধাবিভক্ত করে তাঁকে হত্যা করেন। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে ধনাহরণের জন্য পাণ্ডবগণ যে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, তাতে ভীম পূর্বদিকে গিয়ে পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা প্রভৃতি নানা দেশ জয় করে প্রচুর

ধনরত্নসহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন।

হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হলে, দুঃশাসন যখন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করেন, তখন ক্রুদ্ধ ভীম দুঃশাসনের বক্ষ-রক্ত পান করবার প্রতিজ্ঞা করেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে অপমান করবার জন্যে তাঁর বাম উরু প্রদর্শন করলে, ভীম তাঁর উরুভঙ্গ করতে প্রতিজ্ঞা করেন। বনযাত্রাকালে দুঃশাসন ভীমকে বিদ্রূপ করে 'গরু' বললে, ভীম পুনরায় দুঃশাসনের রক্তপান ও সমস্ত কৌরব ভ্রাতাকে বিনাশ করবার প্রতিজ্ঞা করেন। কাম্যকবনে বাস করবার সময় বকরাক্ষসের ভ্রাতা কির্মীর রাক্ষস প্রতিশোধকল্পে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলে ভীম তাকেও বধ করেন। দ্বৈতবনে বাসকালে ভীম তাঁর স্বভাবসুলভ স্থূলবুদ্ধিবশতঃ অল্প ধর্ম ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরকে কপটতার দ্বারা শত্রুজয়ের পরামর্শ দেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যুক্তির নিকট নতিস্বীকার করেন। বদরিকাশ্রমে বাসকালে একদিন গঙ্গায় একটি সুগন্ধ, সুন্দর, সহস্রদল পদ্ম ভেসে আসতে দেখে দ্রৌপদী ভীমকে সেইরূপ আরো পদ্ম সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন। সেই পদ্ম আনবার পথে গন্ধমাদন পর্বতে হনুমানের সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎ হয়। স্বর্গের পথ ধরে ভীমকে যেতে দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান রুগ্ন বানরের রূপ ধারণ করে পথরোধ করে শুয়ে থাকেন। ভীম পথ ছেড়ে দিতে বলায় হনুমান তাঁকে তাঁর লেজটি সরিয়ে পথ করে নিতে বলেন। ভীম হনুমানের লাঙ্গুল উত্তোলনে অসমর্থ হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। হনুমান আত্ম-পরিচয় ও পথরোধের কারণ ব্যক্ত করে ভীমকে প্রার্থিত পদ্মবনের সন্ধান দেন। কুবের-ভবনের নিকটস্থ এক নদী থেকে কুবেরের অনুচরদের পরাস্ত করে ভীম উক্ত পদ্ম সংগ্রহ করেন। জটাসুর নামে এক রাক্ষস ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করত। একদা ভীম মৃগয়ায় গেলে সে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র এবং যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে হরণ করে। মৃগয়া প্রত্যাগত ভীম এই কারণে জটাসুরকে নিষ্পিষ্ট করে বধ করেন। সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষার্থে গত অর্জুনের জন্য কৈলাস-পর্বতের নিকট যখন পাণ্ডবগণ প্রতীক্ষায় ছিলেন, তখন দ্রৌপদীর প্ররোচনায় ভীম কুবেরের অনুচর রাক্ষসদের পর্বতশিখর হতে বিতাড়িত ও নিহত করেন। কুবেরসখা মণিমানও ভীমের হাতে নিহত হন। বনবাসের একাদশ বৎসরে পাণ্ডবরা যমুনার উৎপত্তি স্থানের নিকট বিশাখযূপবনে যখন বাস করছিলেন, তখন এক দিন মৃগয়াকালে অগস্ত্য-শাপে অজগররূপী নহুষ ভীমকে বেষ্টন করে ভক্ষণ করতে উদ্যত হন।

নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির ভীমের অনুসন্ধানে গিয়ে তাঁর এরূপ দুরবস্থা দেখে ভীমকে মুক্তিদানের জন্য অজগরকে অনুরোধ করেন এবং অজগরের সর্তানুযায়ী তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভীমকে মুক্ত করেন। কাম্যকবনে বাসকালে জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দ্রৌপদীকে হরণ করলে, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ জয়দ্রথকে আক্রমণ করেন। জয়দ্রথকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করে ভীম তাঁর মস্তকে অর্ধাস্ত্র বাণদ্বারা পঞ্চচূড়া করে তাঁকে পাণ্ডবদাসরূপে পরিচয় দিয়ে বেড়াতে আদেশ করেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহে জয়দ্রথ মুক্তি পান। অজ্ঞাতবাসকালে ভীম বল্লব নামে পাচকরূপে বিরাটের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ হন। সেখানে ব্রহ্মার উদ্দেশে যে জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন হয়, তাতে তিনি জীমূত নামে এক মহামল্লকে মল্লযুদ্ধে নিহত ও অন্যান্য বহু মল্লকে বিনষ্ট করেন। বিরাটের শ্যালক কীচক দ্রৌপদীকে লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাঁকে সভামধ্যে অপমান করলে, দ্রৌপদী গোপনে ভীমকে সে কথা জ্ঞাপন করেন। ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী রাত্রিকালে নাট্যশালায় কীচককে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে ভীম কীচককে নিহত করে তার শরীরের মধ্যেই হস্তপদাদি প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। নিহত কীচককে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় কীচকের ভ্রাতা উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে বন্দী করে নিয়ে গেলে, ভীম ছদ্মবেশে তাদের সকলকে নিহত করে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করেন। কীচকের মৃত্যু-সংবাদে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা দুর্যোধনের সহায়তায় বিরাটরাজ্যের দক্ষিণস্থ সমস্ত গো-ধন হরণ করেন। তাঁকে বাধা দিতে গেলে সুশর্মা বিরাটকে পরাজিত ও বন্দী করেন। তখন যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্মাকে পরাজিত ও বন্দী করে বিরাটকে উদ্ধার করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ দিনব্যাপী যুদ্ধে ভীম একাকী ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রকে বধ করেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে ভীমকে অগ্রবর্তী করেই পাণ্ডবরা অগ্রসর হন। ইনি প্রথম দিনে ভীষ্মের সহিত ও দ্বিতীয় দিনে কলিঙ্গ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখান। যুদ্ধের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দিবসে ভীম দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করেন। সপ্তদশ দিবসে ইনি দুঃশাসনকে হত্যা করে প্রতিজ্ঞাপূরণস্বরূপ তাঁর বক্ষরক্ত পান করেন ও এই দিন ইনি কর্ণের হস্তে পরাজিত হন। কুন্তীর নিকট পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কর্ণ ভীমকে মুক্তি দেন। অষ্টাদশ দিবসে দুর্যোধন পলায়ন করে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিলে, একজনমাত্র পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করে রাজ্য

উদ্ধারের সর্তে তিনি হ্রদ থেকে উঠে আসতে স্বীকৃত হন ও ভীমকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বেছে নেন। তুমুল যুদ্ধের পর ভীম তাঁর পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন এবং পতিত দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেন। এতে যুধিষ্ঠির অসন্তুষ্ট ও বলরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তখন কৃষ্ণ বলরামকে নিবৃত্ত করেন। নিশীথ রাত্রে অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রসহ পাণ্ডবপক্ষীয় অবশিষ্ট বীরদের সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করলে, ক্রুদ্ধা দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে বধ করে তাঁর মস্তকের মণি ভীমকে আনতে বলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ নকুলকে সারথি করে অশ্বত্থামার সন্ধানে যাত্রা করেন। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন জেনে কৃষ্ণার্জুনও তাঁর অনুগামী হন। সেখানে অশ্বত্থামাকে পরাজিত করে তাঁর মস্তকের মণি নিয়ে ভীম দ্রৌপদীকে দেন। রাজ্যলাভের পরে যুধিষ্ঠির ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন ও দুর্যোধনের ভবন দান করেন। ভীম গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে নানাভবে অপমানিত করতেন। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জুনের পতনের পর ভীম পতিত হন—অতিভোজন ও আত্ম-প্রসংসার জন্য। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের সুতসোম নামে এক পুত্র জন্মে। হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্রের নাম ঘটোৎকচ। বিরাট রাজগৃহে ছদ্মবেশে বাসকালে ভীমের গুপ্ত এক নাম ছিল জয়ন্ত (মহাভারত)।

(২) ইনি বিদর্ভরাজ এবং দময়ন্তীর পিতা। বহুদিন পর্যন্ত ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। সে জন্য তিনি সর্বদা দুঃখিত হয়ে থাকতেন। একদা দমন নামে এক ঋষি তাঁর কাছে এলে, পুত্রলাভের জন্য তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মহর্ষির সংকার করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। মহর্ষির বরে ভীম দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন (মহাভারত)।

ময়দানব বিন্দু সরোবর হতে এঁকে বৃষপর্বার গদা উপহার দেন। ভীম কাশীরাজের কন্যা বলন্ধরাকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে ভীমের সর্বগ নামে এক পুত্র হয়।

ভীমা—দুর্গাদেবী। ভগবতী দুর্গা হিমাচলে ভীষণ রূপ ধারণ করে মুনিদের ত্রাণ করবার জন্যে রাক্ষসদের বিনাস করেন। এই জন্য এঁর নাম ভীমা (চণ্ডী)।

ভীষ্ম—রাজা শান্তনুর ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। এই জন্য এর নাম গাঙ্গেয় ও নদীজ। এঁর অন্য নাম সত্যব্রত। বশিষ্ঠের শাপে গঙ্গাগর্ভে জাত অষ্টবসুর ইনি অন্যতম। ইনি রাজা শান্তনুর একমাত্র উত্তরাধিকারী। সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহে সিংহাসন ত্যাগ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ—এই দুই ভীষণ প্রতিজ্ঞাহেতু ইনি ভীষ্ম

নামে খ্যাত হন এবং পিতার নিকট স্বেচ্ছায় মরণ বর প্রাপ্ত হন। রাজা শান্তনু একদিন গঙ্গাতীরে এক পরমাসুন্দরী নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। সেই নারী (গঙ্গা) উত্তর দেন, রাজা যদি তাঁর শুভ বা অশুভ কোন কার্যে বাধা দান বা ভর্ৎসনা না করেন, তবেই তিনি শান্তনুর স্ত্রী হতে সম্মত আছেন। আর তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেই তিনি শান্তনুকে ত্যাগ করে স্বস্থানে প্রস্থান কববেন। শান্তনু এই সর্তেই তাঁকে বিবাহ করেন। ক্রমে গঙ্গার গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলে গঙ্গা তাদের জলে নিক্ষেপ করেন। গঙ্গাকে হারাবার ভয়ে এই ব্যাপারে শান্তনু অসন্তুষ্ট হলেও কিছু বলতে সাহস করেননি। অষ্টম পুত্রের জন্মের পর শান্তনু এই পুত্রকে হত্যা করতে নিষেধ করে গঙ্গাকে মিনতি জানান। তখন গঙ্গা সেই পুত্রের জীবনদান করেন এবং শান্তনুকে আত্ম-পরিচয় ও তাঁর এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জানিয়ে তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। গঙ্গা শান্তনুকে বলেন, তাঁর এই পুত্ররা মহাতেজা অষ্টবসু। এঁরা বশিষ্ঠের শাপে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। একবার সস্ত্রীক অষ্টবসুরা বশিষ্ঠের আশ্রমে বিহার করতে যান। দ্যু নামক বসুর স্ত্রীর অনুরোধে এঁরা বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে হরণ করেন। বশিষ্ঠ জানতে পেরে অভিশাপ দেন, কামধেনু অপহরণকারীরা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবে। বসুগণের অনুনয়ে বশিষ্ঠ বলেন, অন্যান্য বসুগণ এক বৎসর পরে শাপমুক্ত হবেন, কিন্তু যে বসু গাভী হরণ করেছিলেন, তিনি দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করতে বাধ্য হবেন। একবার ব্রহ্মার সভায় দেবগণের উপস্থিতকালে গঙ্গার সূক্ষ্ম বস্ত্র বায়ুদ্বারা অপসৃত হয়। তখন দেবগণ অধোমুখে থাকেন; কিন্তু ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মহাভিষ বস্ত্রহীনা গঙ্গাকে নিঃসঙ্কোচে দেখতে থাকেন। মহাভিষ বহু যজ্ঞ করার ফলে স্বর্গলাভ করলেও এই আচরণের জন্য ব্রহ্মা তাঁকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দেন। মহাভীষ প্রতীপের পুত্র শান্তনুরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

এদিকে মহাভিষের চিন্তা করতে করতে মর্ত্যে আসবার পথে বসুগণকে মূর্ছিত দেখে গঙ্গা তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, বসুগণ তাঁদের শাপের বিবরণ বলে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণের বাসনা প্রকাশ করেন এবং জন্মের পরেই তাঁদের জলে বিসর্জন দিতে অনুরোধ করেন। যাতে শান্তনুর সঙ্গে তাঁর সংগম ব্যর্থ না হয় তার জন্যে গঙ্গা একটি পুত্রকে জীবিত রাখতে বলেন। বসুগণ তাতে সম্মত হন, কিন্তু বলেন যে; সেই পুত্র বীর্যবান

হলেও বিবাহ করবে না এবং ধর্মাত্মা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্র-বিশারদ হবে। গঙ্গাতীরে জপ-নিরত প্রতীপের নিকট সুন্দরী নারীবেশে গঙ্গা জল হতে উঠে তাঁর দক্ষিণ উরুতে বসেন। প্রতীপ তাঁর প্রার্থনা জানতে চাইলে গঙ্গা তাঁকেই প্রার্থনা করেন। প্রতীপ বলেন যেহেতু গঙ্গা কন্যা ও পুত্রবধূর স্থান দক্ষিণ উরুতে বসেছেন, সেইজন্য তিনি প্রতীপের পুত্রবধূ হবেন। গঙ্গা তাতে সম্মত হয়ে রাজাকে এই সর্ত করিয়ে নেন যে, তাঁর পুত্র গঙ্গার কোন কার্যে বাঁধা দিতে পারবে না। শান্তনু যৌবনলাভ করলে প্রতীপ তাঁকে এই বৃত্তান্ত জানিয়ে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। শান্তনুকে ত্যাগ করবার সময় গঙ্গা অষ্টম গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে চলে যান। ছত্রিশ বৎসর পর শান্তনু একদা মৃগয়াকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে এক সুন্দর বালককে শর নিক্ষেপ করতে দেখে মুগ্ধ হতেই সেই বালক অন্তর্হিত হয়। শান্তনু তাঁকে নিজ পুত্র অনুমান করে গঙ্গাকে স্মরণ করলে গঙ্গা সপুত্র আবির্ভূতা হয়ে শান্তনু-পুত্রকে সমর্পণ করেন এবং বলেন তাঁকে তিনিই পালন করেছেন। এই পুত্র বশিষ্ঠের কাছে বেদ অধ্যয়ন এবং পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেছে। শান্তনু 'দেবব্রত' নাম-ধারী এই পুত্রকে গৃহে নিয়ে গিয়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এর চার বৎসর পরে একদিন যমুনাতীরস্থ বনে ভ্রমণ করতে করতে শান্তনু দাস রাজকন্যা সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে দাসরাজের নিকট তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করেন। দাসরাজ বলেন, যদি শান্তনু এই কন্যাকে ধর্মপত্নী করতে চান তবে এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দান করতে হবে। এই সর্তে তিনি রাজাকে কন্যাদান করতে রাজী আছেন। রাজা এই প্রতিশ্রুতি দিতে অসমর্থ হয়ে চিন্তাকুল মনে রাজধানীতে ফিরে আসেন। তাঁকে চিন্তান্বিত দেখে দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করে প্রকৃত কারণ জানতে পারেন; এবং দাসরাজের নিকট গিয়ে পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করেন। তখন দাসরাজ বলেন, বৈমাত্র ভ্রাতারূপে ভীষ্ম সত্যবতীর পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন, সেইজন্য তিনি চিন্তিত। তখন দেবব্রত দাসরাজের সমক্ষে রাজ্যের স্বত্ব ত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞা করেন। তার উত্তরে দাসরাজ বলেন, সত্যব্রত রাজ্যস্বত্ব ত্যাগ করলেও সত্যব্রতের পুত্রগণ সিংহাসন দাবী করতে পারেন। তার উত্তরে দেবব্রত বলেন যে, তিনি পূর্বেই রাজ্যত্যাগ করেছেন; এখন ব্রহ্মচারীরূপে অপুত্রক হয়ে থাকবার প্রতিজ্ঞা করলেন। নিঃসন্তান হলেও তিনি অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হবেন। তখন দাসরাজ শান্তনুর হাতে সত্যবতীকে সমর্পণ করতে রাজী

হলেন। দেবব্রতের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে আকাশ হতে দেব ও অপ্সরাগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁকে ভীষ্ম নামে অভিহিত করলেন। ভীষ্ম সত্যবতীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে এসে পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করায়, শান্তনু তাঁকে বর দেন তিনি যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাকবেন, কেন না, তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁর মৃত্যু হবে। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিবীর্য নামে দুই পুত্র হয়। কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্যের যৌবনলাভের পূর্বেই শান্তনুর মৃত্যু হলে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতিশয় যুদ্ধপ্রিয় চিত্রাঙ্গদ তাঁরই স্বনাম ধারী এক গন্ধর্বের হাতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে অকালে নিহত হলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্যকে ভীষ্ম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিচিত্রবীর্য যৌবনপ্রাপ্ত হলে ভীষ্ম তাঁর বিবাহ দানের জন্য কাশীরাজের তিন সুন্দরী কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হন ও সমবেত রাজাদের উপহাস অগ্রাহ্য করে তিন কন্যাকে ভ্রাতার জন্য হরণ করেন। সমবেত রাজারা বাধা দিতে এলে তিনি সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করেন। হস্তিনাপুরে এসে বিবাহের উদ্যোগকালে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা বলেন, তিনি ও শাল্বরাজ গোপনে পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করে অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দেন। অম্বা শাল্বরাজের নিকট উপস্থিত হলে, ভীষ্ম কর্তৃক অপহৃতা বলে অম্বাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বার বহু অনুনয়-বিনয়েও শাল্বরাজ তাঁকে গ্রহণ করতে অসম্মত হন। এই ভাবে শাল্বরাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হয়ে অম্বা ভীষ্মকেই তাঁর এই অবস্থার জন্য দায়ী মনে করেন ও ভীষ্মের শাস্তি বিধানের জন্য পরশুরামের শরণাপন্ন হন। পরশুরাম দূত মুখে ভীষ্মকে আহ্বান করে অম্বাকে গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আদেশ দেন। ভীষ্ম গুরুর আদেশে নিজের পূর্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে অসম্মত হলে, পরশুরাম তাঁকে বধ করবার জন্যে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে গুরু-শিষ্যে এই যুদ্ধ হয়। কিন্তু উভয়েই উভয়কে পরাস্ত করতে অসমর্থ হন। তেইশ দিন যুদ্ধের পর ভীষ্ম প্রস্বাপন অস্ত্র-প্রয়োগে পরশুরামকে সংজ্ঞাহীন করতে উদ্যত হলে, নারদ ও পরশুরামের পিতৃগণ উভয়কে নিরস্ত করেন। পরশুরাম অম্বাকে সাহায্য করতে অসমর্থ বলে চলে যান। অম্বা ভীষ্মকে বধ করবার জন্য যমুনাতীরে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের নিকট বর লাভ করেন যে, পরজন্মে দ্রুপদ রাজার নপুংসক সন্তান শিখণ্ডীরূপে

জন্মলাভ করে ভীষ্মবধের কারণ হবেন। তখন নবজন্ম লাভের আশায় অম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন।

অম্বিকা ও অম্বালিকাকে পেয়ে বিচিত্রবীর্য অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে সাত বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগ করেন। সত্যবতী ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রের জন্মদান করে বংশরক্ষা করতে অনুরোধ করলে, ভীষ্ম নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে এই কার্যে অস্বীকৃত হন এবং কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে অম্বিকা ও অম্বালিকাতে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করতে বলেন। তখন সত্যবতী তাঁর কানীন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বিবরণ জানিয়ে তাঁকে স্মরণ করেন। ব্যাস উপস্থিত হয়ে মাতার প্রস্তাব অনুযায়ী ধর্মপালনার্থ অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম দেন। অম্বিকার এক সুন্দরী দাসীর গর্ভেও ব্যাস বিদুরের জন্মদান করেন। ভীষ্ম এঁদের তিন জনকেই পুত্রবৎ পালন করেন। তিনি গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের ও কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী এবং মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ দেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ায় পাণ্ডুই রাজপদ লাভ করেন। এঁরা সকলেই কুরুবংশীয় হলেও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা কৌরব ও পাণ্ডুর সন্তানরা পাণ্ডব নামে অভিহিত হন। কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য ভীষ্ম প্রথমে কৃপাচার্য ও পরে দ্রোণাচার্যকে গুরুরূপে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে জ্ঞাতিবৈরিতা আরম্ভ হলে ভীষ্ম ও অন্যান্য বৃদ্ধরা তা নিবারণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হন। কৌরবভবনে বন্দি করে তাঁদের অন্নে প্রতিপালিত বলে ভীষ্ম অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। দ্যূতসভায় ইনি পাঞ্চালীর অপমান নিবারণ করতে পারেননি। তিনি ও বিদুর সর্বদাই ধৃতরাষ্ট্রকে বিরোধ নিবারণের পরামর্শ দিতেন। বিরাটরাজ্যে দুর্যোধন কর্তৃক গো-হরণকালে ভীষ্ম উপস্থিত ছিলেন। অর্জুনের সহিত যুদ্ধে অচেতন প্রায় হওয়ায় সারথি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে অন্যত্র নিয়ে যায়। সর্বশেষে অর্জুন সম্মোহন অস্ত্রে সকলকে সংজ্ঞাহীন করে উত্তরকে দিয়ে কৌরবদের মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার হরণ করান। কেবল ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিষেধ জানতেন বলে তাঁর নিকট যেতে বারণ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্‌যোগকালে ভীষ্ম ও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তা অগ্রাহ্য করেন। বিতর্ককালে কর্ণকে তিরস্কার করায় তিনি ভীষ্ম জীবিত থাকতে অস্ত্রধারণ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। যুদ্ধকালে দুর্যোধন প্রথমে ভীষ্মকে

সেনাপতি করেন। ভীষ্ম পাণ্ডুপুত্রদের বিনষ্ট করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং শিখণ্ডী যুদ্ধে এলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের দশ সহস্র সৈন্য ও সহস্র রথীকে বধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। যুদ্ধের প্রারম্ভে ভীষ্ম যুদ্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। তিনি স্বয়ং অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে স্থির করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে যুদ্ধের দশম দিনে দুর্যোধন কর্তৃক ক্রমাগত বাক্যবাণে পীড়িত হয়ে তিনি অর্জুনকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে ভীষ্মকে অগ্রমুখে রেখে কৌরবসেনা অগ্রসর হয়। প্রথম দিন বিরাটপুত্র উত্তর ও শ্বেত ভীষ্মের হাতে নিহত হয়। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম অর্জুন ও পাণ্ডবসেনাদের এরূপ পর্যুদস্ত করেন যে, এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করবার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শনচক্রের দ্বারা ভীষ্মকে বধ করতে উদ্যত হন। নবম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম যখন পাণ্ডবসেনা বিধ্বস্ত করেন, তখন পাণ্ডবরা নিরুপায় হয়ে রাত্রে ভীষ্মের নিকট গিয়ে তাঁর বধের উপায় জানতে চান। ভীষ্ম বলেন যে, তিনি নিরস্ত্র, ভূপতিত, বর্ম ও ধ্বজহীন, স্ত্রী, স্ত্রী-নামধারী, বিকলেন্দ্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী পূর্ব-জন্মে স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে অগ্রবর্তী করে যদি অর্জুন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করেন, তবেই ভীষ্মের বিনাশ হবে। দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে বিরত থাকেন। অর্জুনের বাণে তাঁর শরীরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও অবিদ্ধ ছিল না। এই দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম বিরাটের ভ্রাতা শতানীক, সাতজন মহারথ, পাঁচ হাজার রথী, চোদ্দ হাজার পদাতিক, গজারোহী, অশ্বারোহী ইত্যাদি বধ করে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে পূর্ব দিকে মস্তক রেখে ভূপতিত হন। সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ হওয়ায় তাঁর দেহ ভূমিস্পর্শ করেনি। তখন দক্ষিণায়ন বলে ভীষ্ম মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণের প্রতিক্ষায় থাকেন। শরশয্যায় শয়ন করলে উভয়পক্ষের বীরগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম সকলকে বলেন যে, উপাধান না থাকায় তাঁর মস্তক ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। রাজারা উপাধান নিয়ে উপস্থিত হলে ভীষ্ম অর্জুনকে বীরশয্যার উপযুক্ত উপাধান দিতে বলেন। অর্জুন তিনটি বাণ নিক্ষেপ করে ভীষ্মের শির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেন। পর দিবস ভীষ্ম তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে সকলে জলের কলস ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু ভীষ্ম মনুষ্যের ভোগ্যবস্তু প্রত্যাখ্যান করে অর্জুনকে জল দিতে বলেন। অর্জুন পর্জন্যাস্ত্রে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমি বিদ্ধ করে নির্মল জলধারা তুলে ভীষ্মকে পান করতে দেন। কর্ণ একাকী

ভীষ্মের নিকট আশীর্বাদ-ভিক্ষু হয়ে এলে, ভীষ্ম তাঁকে আশীর্বাদ করেন। যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবগণ জয়লাভ ও রাজ্যলাভ করার পর উত্তরায়ণের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, সমাজ-ধর্ম, নীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে সদুপদেশ দান করে আটান্ন রাত্রি শরশয্যায় থাকবার পর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে প্রাণত্যাগ করেন। শৌর্যে, বীর্যে, জ্ঞানে, রাজনীতিতে, দৃঢ়তায়, ধর্মে ও সংযমে ভীষ্মের মত মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ (মহাভারত)।

ভীষ্মক—ভোজদেশের অধিপতি। কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী এঁর কন্যা এবং বলদর্পী রুক্মী এঁর পুত্র। ভীষ্মক যদুকুল উদ্‌ভূত হলেও জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। ভীষ্মকের সঙ্গে অন্যতম পাণ্ডব সহদেবের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভীষ্মক পরাজিত হন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য কর প্রদান করেন (মহাভারত—আদি)।

ভুবর্লোক—ভূমি ও সূর্যের মধ্যবর্তী স্থান। ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক। এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিত।

ভূরিশ্রবা—কুরুবংশীয় রাজা সোমদত্তের পুত্র। একদা যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের জন্য দেবকীকে স্বয়ংবর-সভা থেকে সবলে হরণ করেন। কুরুবংশীয় সোমদত্ত তা সহ্য করতে না পেরে শিনির সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং শিনি কর্তৃক পরাজিত ও ভূপতিত হয়ে পদাহত হন। এই অপমানে সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় প্রসন্ন করে বর পান যে, তাঁর পুত্র যদুবংশীয় শিনি-পুত্র সাত্যকিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সর্ব-সমক্ষে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে সোমদত্ত ভূরিশ্রবাকে প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঞ্চম দিনে ভূরিশ্রবা সাত্যকির দশ পুত্রকে হত্যা করেন। যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে সাত্যকিকে যুদ্ধে পরাস্ত এবং ভূপতিত করে পদাঘাত করেন ও তার মুণ্ডচ্ছেদে উদ্যত হন। অর্জুন তখন দূর হতে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে তীক্ষ্ণ শরে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন। ভূরিশ্রবা অর্জুনকে তিরস্কার করে বাম হস্তে ভূমিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসেন। এই সময় সাত্যকি জ্ঞানলাভ করে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও যোগমগ্ন ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেন (মহাভারত)।

ভুশুণ্ডী—(১) পুরাণ-বর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাকবিশেষ। প্রবাদ আছে, কলির এই ভুশুণ্ডী আবহমানকাল বিদ্যমান থেকে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাপরম্পরা দেখে আসছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ভুশুণ্ডীকে যুদ্ধের বিবরণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়েছিল, সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে বিনা আয়াসে সে দৈত্যরক্ত পান ও মাংস

ভক্ষণ করেছিল। ত্রেতাযুগে লঙ্কা-যুদ্ধে তাকে অল্প পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তার কষ্টের সীমা ছিল না। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করবার জন্যে মহাদেব-সৃষ্ট অনেক মাতৃকা।

ভৃগু—ইনি যজ্ঞসম্ভব মহর্ষি। প্রাচীন একজন প্রজাপতি ও মহর্ষি। ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে জমদগ্নি ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন কালে ব্রহ্মা বরুণের এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম হয়। ভৃগু-স্ত্রী পুলোমার গর্ভে চ্যবনের জন্ম হয়। প্রমতি ভৃগুর পৌত্র রুরুর প্রপৌত্র। ঋচিক মুনিও ভৃগুর পুত্র। জমদগ্নি পৌত্র এবং পরশুরাম প্রপৌত্র। ভৃগু-বংশজাত বলে পরশুরাম ভার্গব নামে খ্যাত। স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় একদিন ভৃগু স্নানার্থে অনুপস্থিত থাকায়, পুলোমা নামধারী এক রাক্ষস ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ করে। পূর্বে এই রাক্ষস পুলোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কন্যার পিতা ভৃগুকেই কন্যা দান করেন। সেই দুঃখ ও বিদ্বেষ সর্বদা রাক্ষসের মনে জাগ্রত ছিল। ভৃগুর হোমগৃহে প্রজ্বলিত অগ্নিকে সম্বোধন করে রাক্ষস বলে, "তুমি দেবগণের মুখ। সত্য বলো এই পুলোমা কার স্ত্রী? এই সুন্দরীকে পূর্বে আমি স্ত্রীরূপে বরণ করেছিলাম; কিন্তু ভৃগু অন্যায় ভাবে এঁকে গ্রহণ করেছেন। এখন আমি এঁকে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই।" অগ্নি ভীত হয়ে বললেন, "তুমি পূর্বে সত্যই এই পুলোমাকে বরণ করেছিলে; কিন্তু যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করে বিবাহ করনি; পুলোমার পিতা বরলাভের আশায় ভৃগুকেই কন্যাদান করেছিলেন।" তখন রাক্ষস বরাহরূপ ধারণ করে পুলোমাকে হরণ করে মহাবেগে প্রস্থান করলে, পুলোমার সন্তান গর্ভচ্যুত হওয়ায় তার নাম হল চ্যবন। সূর্যতুল্য তেজোময় এই শিশুকে দেখেই রাক্ষস ভস্ম হয়ে ভূপতিত হলো। পুলোমা পুত্রকে নিয়ে দুঃখিত মনে আশ্রমে ফিরে চললেন। তখন ব্রহ্মা ক্রন্দনরতা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিয়ে তার অশ্রুজাত নদীর নাম রাখলেন 'বসুধারা'। ভৃগু তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "তোমার পরিচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল?" পুলোমা বললেন, "অগ্নি আমার পরিচয় দিয়েছিলেন।' তখন ভৃগু সরোষে অগ্নিকে শাপ দিলেন, "তুমি সর্বভুক হবে" (রামায়ণ—আদি)।

একবার ক্ষত্রিয়রাজা বীতহব্য যুদ্ধে রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনের কাছে পরাজিত হয়ে ভৃগুর শরণাপন্ন হন। ভৃগু শরণাগত বীতহব্যকে রক্ষার জন্যে প্রতর্দনকে বললেন, তাঁর আশ্রমে কোন ক্ষত্রিয় নাই। এখানে যাঁরা আছেন, তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ।

তিনি ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব দান করলেন। ভৃগুর বাক্য-প্রভাবে বীতহব্য ব্রহ্মর্ষি হয়ে শত্রুহস্ত হতে মুক্তি পেলেন (মহাভারত-অনুশাসন)।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, ইনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। মনুসংহিতা মতে ইনি দশ জন প্রজাপতির অন্যতম। কর্দম-কন্যা খ্যাতি এঁর স্ত্রী। এই খ্যাতির গর্ভজাত দুই পুত্রের নাম ধাতা ও বিধাতা। খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীও জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগু সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন। প্রতিদিন তর্পণ করবার সময় ভৃগুর উদ্দেশে তর্পণ করতে হয়। ভৃগু ধনুর্বেদ বিদ্যার প্রবর্তক।

ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু—এঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—মুনিঋষিরা এর মীমাংসার জন্য ভৃগুকে প্রথমে ব্রহ্মার কাছে প্রেরণ করেন, কিন্তু ব্রহ্মলোকে গিয়ে ভৃগু ইচ্ছাপূর্বক ব্রহ্মাকে সম্মান করেন না। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলে ইনি তাঁকে সন্তুষ্ট করে শিবের কাছে যান। সেখানেও শিবকে সম্মান না দেখানোর জন্য শিব ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন স্তবে শিবকে তুষ্ট করে গোলোকে গিয়ে ইনি বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখে বিষ্ণুর বক্ষস্থলে পদাঘাত করেন। জেগে উঠে ভৃগুর পা পদাঘাতে ব্যথিত হয়েছে মনে করে বিষ্ণু ভৃগুর পদসেবা করেন। বিষ্ণু ক্রোধের চিহ্ন না দেখিয়ে আরো বেশী নত ও বিনয়ী হয়ে ভৃত্যের মত ব্যবহার করেন। তখন ভৃগু স্থির করেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং এঁর পূজাই শ্রেষ্ঠ। তদবধি ভৃগু-পদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষে চিহ্নিত আছে।

ভৃঙ্গী—শিবের প্রিয় অনুচর। অন্ধকারাসুর মহাদেবের বরে ভৃঙ্গী নামে তাঁর অনুচর হন। ভৃঙ্গী একবার শিবানীর বীরাগভাজন হয়ে বানর-মুখ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ভৈরব—পুরাকালে অন্ধকাসুরের সঙ্গে যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে পদাঘাত করলে উহা চার ভাগে বিভক্ত হয় এবং রক্তধারা নির্গত হয়। এই রক্তধারা থেকে ভৈরব উৎপন্ন হয়। পূর্ব দিকের রক্তধারা হতে বিদ্যারাজ ভৈরব, দক্ষিণধারা হতে কামরাজ ভৈরব, পশ্চিমধারা হতে নাগরাজ ভৈরব এবং উত্তরধারা হতে সাচ্ছন্দরাজ ভৈরবের জন্ম হয়। মহাদেবের ক্ষত-স্থানের রক্ত হতে যে ভৈরব জন্মগ্রহণ করে, তার নাম লম্বিতরাজ (বামন-পুরাণ)। এ ছাড়া আরও অনেক ভৈরবের নামের উল্লেখ দেখা যায়। নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল—এঁরাও শিবের ভৈরব (কালিকা-পুরাণ)।

ভৈরবী—চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে প্রধানা যোগিনীর নাম ভৈরবী (অগ্নিপুরাণ)। দশমহাবিদ্যার অন্য

তমা গোপিনীরা মহেশ্বরীর সহচরী ও তাঁরই ন্যায় পূজনীয়া। বিভিন্ন সময়ে যোগিনীরা দেবীর সাহায্যার্থ অথবা তাঁর উপদেশে নানা কাজে লিপ্ত হতেন। কোন কোন স্থলে অষ্ট যোগিনীর উল্লেখ দেখা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এই যোগিনীগণের নাম জপ করে, তার দুষ্ট ব্যাধি ও অনতিক্রমণীয় বাধা দূর হয়। এই সকল নাম পাঠ করলে ডাকিনী. কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনরূপ উপদ্রব বা ক্ষতি করতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করলে শিশুদের পীড়া ও গর্ভিণীর গর্ভবেদনার শান্তি হয়।

ভোগবতী—গঙ্গার যে ধারা পাতালে প্রবেশ করেছে, সেই ধারার নাম ভোগবতী।

ম

মকর—বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তু। মকরকে কেহ মীন, কেহ বা হাঙ্গর বলে কিন্তু পৌরাণিক বর্ণনায় মকরের মস্তক ও সম্মুখের পদদ্বয় কৃষ্ণসার মৃগের মত এবং দেহ ও পুচ্ছ মৎস্যের ন্যায়। মকর গঙ্গাদেবীর বাহন, কামদেবের ধ্বজচিহ্ন এবং রাসিচক্রের দশম রাশি।

মকরাক্ষ—ইনি রাবণের সেনাপতি খরের পুত্র। লঙ্কাযুদ্ধে কুম্ভ ও নিকুম্ভ নিহত হলে রাবণ এঁকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে ইনি রামের হাতে নিহত হন (রামায়ণ)।

মগধ—দক্ষিণ বিহারের প্রাচীন নাম। জরাসন্ধের রাজ্য।

মঙ্গলচণ্ডী—সকল বিশ্বের মূলস্বরূপ প্রকৃতিদেবীর মুখ হতে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর জন্ম। ইনি সৃষ্টি কার্যে মঙ্গলরূপ এবং সংহার কার্যে কোপনরূপিণী। এই জন্য এঁর নাম মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গলবারে পূজনীয়া চণ্ডীকা। ভগবতী। দ্বিভুজা, রক্তপদ্মাসনা, গৌরবর্ণা দেবী। অভীষ্টসিদ্ধির মানসে হিন্দু স্ত্রীরা এই দেবীর অর্চনা ও ব্রত উপবাসাদি করে থাকেন। ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী প্রথম মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রবর্তন করেন।

মণিগ্রীব—ইনি কুবেরেব দ্বিতীয়পুত্র। নলকুবরের সহোদর। নারদের শাপে মণিগ্রীব ও নলকুবর যমলার্জুন নামে দুই বৃক্ষরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কৃষ্ণের পাদস্পর্শে এঁদের মুক্তিলাভ হয়।

মণিমান–কুবেরের বন্ধু ও কর্মচারী। একবার ইনি সদলবলে কুবেরের সঙ্গে দেবতাদের মন্ত্রণা-সভা কুশস্থলীতে গমন করেছিলেন। যমুনাতীরে তপোনিরত অগস্ত্যমুনিকে দেখে ইনি মূর্খতা বশতঃ তাঁর মাথায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। এতে অগস্ত্য অভিশাপ দেন, মণিমান সদলবলে মানুষের হস্তে নিপতিত হবে। বনবাস কালে পাণ্ডবরা যখন গন্ধমাদন পর্বতে বাস করছিলেন, তখন ভীম দ্রৌপদীর জন্য পঞ্চবর্ণফুল সংগ্রহ করতে গেলে এঁর

সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ফলে ইনি ভীম কর্তৃক নিহত হন (মহাভারত)।

মণ্ডূক—বশিষ্ঠ ঋষি মণ্ডূক দেবতার স্তব করে কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়ণের মতে বশিষ্ঠ পর্জন্যদেবের কাছ থেকে জল প্রার্থনা করেছিলেন বলে এই মন্ত্র। মণ্ডূকরা তাঁর এই প্রার্থনা পূর্ণ করেছিল। এই মণ্ডূকস্তুতি বৃষ্টি উৎপাদন করবার গান। বৃষ্টির সঙ্গে মণ্ডূকের সম্পর্ক থাকাতে মৃতদেহের অগ্নিসংকারের পর চিতা শীতল ও ধৌত করবার জন্য মণ্ডূককে আহ্বান করা হোত (ঋগ্‌বেদ)।

মণ্ডূকরাজ—এঁর নাম আয়ু। এঁর কন্যা সুশোভনা অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা পরীক্ষিৎকে মৃগয়াকালে বনমধ্যে দর্শন দিয়ে বিবাহ করেন ও রাজাকে প্রতিজ্ঞা করান, রাজা তাঁকে কখনো জল দেখাবেন না। একদিন উদ্যানবিহার করতে করতে উদ্যানস্থ পুষ্করিণী দেখে রাজা সুশোভনাকে জলে নামতে বললেন। সুশোভনা জলে নেমে আর উঠলেন না। তখন রাজা পুষ্করিণী শূন্য করিয়ে কতকগুলি ভেক দেখতে পেয়ে তারা রানীকে ভক্ষণ করেছে মনে করে তাদের হত্যা করতে আদেশ দিলেন। তখন মণ্ডূকরাজ আয়ু তপস্বীর বেশে রাজার কাছে এসে রাজাকে নিবৃত্ত করলেন এবং সুশোভনাকে এনে দিলেন। তিনি রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, তোমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী হবে (মহাভারত—বন)।

মতঙ্গ—(১) ইনি এক ব্রাহ্মণের পুত্র। একদিন এঁর পিতা মতঙ্গকে যজ্ঞের উপকরণ আনতে বলেন। মতঙ্গ একটি অল্পবয়স্ক গর্দভ-যোজিত রথে যাত্রা করলেন। কিন্তু এই গর্দভ মাতার কাছে রথ নিয়ে চলল। তখন মতঙ্গ ক্রুদ্ধ হয়ে গর্দভের নাসিকায় বার বার কশাঘাত করতে লাগলেন। সন্তান গর্দভের নাসিকায় ক্ষত দৃষ্টে মাতা গর্দভী বললে, এক চণ্ডাল তোমাকে কশাঘাত করে চালিত করেছে, ব্রাহ্মণ কখনও এমন নিষ্ঠুর হয় না, এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছে। শিশুর প্রতি এর কোন দয়ামায়া নেই। তখন মতঙ্গ রথ থেকে নেমে গর্দভীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে চণ্ডাল বলা হলো কেন? তাঁর মাতা কি কোনক্রমে দূষিত হয়েছিলেন? গর্দভী উত্তর দিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও এক শূদ্র নাপিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছ। সেই জন্য তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়েছে, তুমি চণ্ডাল। এই কথা শুনে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশায় মতঙ্গ সহস্রাধিকবৎসর কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র বার বার এসে মতঙ্গকে বললেন, তুমি অন্য বর চাও, চণ্ডাল হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, ব্রাহ্মণত্ব তোমার পক্ষে দুর্লভ। তিনি হতাশ হয়ে আবার

তপস্যা আরম্ভ করে সমস্ত শরীর এক অঙ্গুলীর উপর ভর করে তপস্যা করতে লাগলেন। এর ফলে তিনি একেবারে শীর্ণ ও জীর্ণ হয়ে গেলেন। মাটিতে পড়ে মরার মত অবস্থা হলে ইন্দ্র তাকে তুলে ধরলেন, কিন্তু প্রার্থিত বর দিলেন না। পরে এঁর অনুনয়-বিনয়ে ইন্দ্র এঁকে পাখীর মত যত্রতত্র বিচরণ করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছামত দেহ পরিবর্তন করার শক্তি ও পৃথিবীতে সম্মান পেয়ে বিখ্যাত হবেন বলে বর দান করলেন।

(২) পম্পা নদীর পশ্চিম তীরে ঋষ্যমূক পর্বতের নিকট মতঙ্গমুনির আশ্রম ছিল। এই রমণীয় স্থানের নাম ছিল মতঙ্গবন। এখানে সকলে কাম্য ফল লাভে কৃতার্থ হত। ধর্মশীলা শবরী মতঙ্গমুনির কৃপায় এখানে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পান। সীতার অন্বেষণ করতে গিয়ে রাম মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। বানররাজ বালী কর্তৃক দুন্দুভি নামক অসুর নিহত হয়ে এক যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হলে দুন্দুভির মুখনির্গত রক্তবিন্দু বায়ু চালিত হয়ে মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হয়। মতঙ্গ তা জানতে পেরে অভিশাপ দেন, ঋষ্যমূক পর্বতে প্রবেশ করলেই বালীর মৃত্যু হবে। এই জন্যই বালীর ভ্রাতা সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে বালী আসতে পারবে না জেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন (রামায়ণ)।

মৎস্য অবতার—বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার। বিষ্ণু প্রথমে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। পুরাকালে বিবস্বানের পুত্র মনু অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি তপস্যাদির দ্বারা পিতৃ-পিতামহদের অতিক্রম করেন। একদিন তিনি ঘোর তপস্যায় রত আছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে; কারণ, প্রবল এক মৎস্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সে ভীত হয়েছে। তাকে রক্ষা করলে সেও প্রতিদান-স্বরূপ প্রত্যুপকার করবে। বৈবস্বত মনু এই ক্ষুদ্র মৎস্যকে আশ্রয় দিলেন। এই মৎস্য দিন দিন এমন ভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, যে স্থানে সে ছিল, তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় মনু তাকে একটা পুষ্করিণীতে রেখে দিলেন। এখানেও সে এত বৃহৎ হয়ে পড়ল যে, দুই যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত এই পুষ্করিণীতেও এর স্থান হলো না। তখন মৎস্যের অনুরোধে মনু একে গঙ্গায় রেখে দিলেন, কিন্তু ক্রমে গঙ্গাতেও তার সঙ্কুলান হল না। তখন তাকে সমুদ্রে রাখার ব্যবস্থা হলো। সমুদ্রে এসে সে মনুকে বললে, এখন প্রলয়কাল আসন্ন, সমস্ত পৃথিবী প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন হবে। এখন আপনি রজ্জু-সংযুক্ত একটি নৌকা নির্মাণ করুন। সেই নৌকায় আপনি সপ্তর্ষিদের সহিত উঠুন। আপনার সহিত

সর্বপ্রকার জীবও রাখুন। নৌকায় বাস কালে আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি শৃঙ্গযুক্ত হয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব এবং আমিই আপনাকে এই মহাপ্রলয় থেকে উদ্ধার করবো।

এই কথা অনুসারে মনু এক বৃহৎ নৌকায় অবস্থান করতে লাগলেন। পরে এই মৎস্য শৃঙ্গযুক্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। নৌকা তখন সমুদ্রের প্রলয়োচ্ছ্বাসে ভীষণ আন্দোলিত হতে লাগলো। এই সময়ে এই মৎস্য তার শৃঙ্গের সহিত নৌকাকে আবদ্ধ করে নৌকাস্থিত সকলকে রক্ষা করবার জন্য লবণ জলের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে লাগল। মহাপ্রলয়ে তখন সমস্ত দিক জলমগ্ন। কেবল মৎস্য, মনু ও সপ্তর্ষি ভাসমান অবস্থায় বহু বৎসরকাল অবস্থান করলেন। শেষে এই মৎস্য হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গকে আকর্ষণ করে এনে ঋষিদের এই শৃঙ্গের সহিত নৌকা বন্ধন করতে বল্‌ল। ঋষিরাও নৌকাকে হিমালয়ের শৃঙ্গের সঙ্গে আবদ্ধ করলেন। এর পর মৎস্য ঋষিদের জানালেন, তিনিই স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ ধারণ করে এঁদের মহা ভয় হতে রক্ষা করেছেন। এখন মনু সুর, অসুর, মানুষ—সর্ব প্রকার প্রজা সৃষ্টি করবেন; জড় এবং চেতন প্রাণীও তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হবে। মৎস্য এই বলে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে বৈবস্বত মনু প্রজাসৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যা করে সমস্ত প্রাণী জগৎ সৃষ্টি করলেন। এই জন্যই ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন (মহাভারত)।

মৎস্যগন্ধা—উপরিচর নামে এক ধর্মনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। এঁর অন্য নাম বসু। ইনি কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন বলে ইন্দ্র ভীত হয়ে এই রাজাকে নানারূপে প্রলোভিত করে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করান। আকাশগামী রথ, বৈজয়ন্তীমালা ইত্যাদি উপহার দিয়ে ইন্দ্র এঁকে সন্তুষ্ট করেন। এই রাজার পাঁচটি পুত্র নিজ নিজ নামে দেশের নামকরণ করেন। আকাশে রথে ভ্রমণ করতেন বলেন এই রাজার নাম হয় উপরিচর। তাঁর রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামমোহিত হয়ে এই নদীর পথ বোধ করে। তখন বসুরাজ কোলাহল পর্বতকে পদাঘাত করেন। এর ফলে পর্বত হতে শুক্তিমতী নির্গত হলো। কোলাহল পর্বতের সঙ্গমে এই নদীর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করল। বসুরাজ পুত্রকে সেনাপতি এবং পর্বতকন্যা গিরিকাকে নিজ রাজ্ঞীরূপে গ্রহণ করলেন।

একদিন গিরিকা ঋতুস্নাতা হয়ে রাজার সঙ্গম প্রার্থনা করলেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়েই রাজা মৃগয়া করতে

বেরিয়ে গেলেন। মৃগয়া করতে গিয়ে বনমধ্যে গিরিকার কথা স্মরণ হওয়ায় বসুরাজের বৃক্ষমূলে রেতঃস্খলন হলো। এই রেতঃ তিনি এক শ্যেনপক্ষীর সাহায্যে ঋতুস্নাতা গিরিকার কাছে প্রেরণ করলেন। গমন কালে শ্যেন-পক্ষীর মুখস্থিত রেতঃ যমুনার জলে পতিত হলো। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপ ধারণ করে ঐ জলে বাস করত। মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা যমুনায় পতিত এই রেতঃ ভক্ষণ করল। এর ফলে দশ মাস পরে এক ধীবর দ্বারা এই মৎসী ধৃত হলে তার উদরের মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা পাওয়া গেল। বসুরাজ পুত্রকে গ্রহণ করলেন। শাপগ্রস্থা অদ্রিকা পূর্বশাপ অনুসারে পুত্রকন্যার জন্ম দিয়ে শাপমুক্ত হলো। আর রাজা মৎসী-গর্ভজাত কন্যাকে ধীবরের হাতে সমর্পণ করলেন। এই কন্যার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ থাকায় এর নাম হলো মৎস্যগন্ধা।

এই মৎস্যগন্ধা নদীতে নৌকা পারাপারের কাজে ধীবর পিতাকে সাহায্য করত। একদিন তীর্থযাত্রা-কালে পরাশর ঋষি নদী পার হবার জন্য মৎস্যগন্ধা-চালিত নৌকায় উঠলেন এবং কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে কামমোহিত হয়ে তাঁর সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। মৎস্যকন্যা বললেন, নৌকার উপরে উভয় তীরের লোক ও ঋষিদের দৃষ্টির ভিতরে এইরূপ সঙ্গম সম্ভবপর নয়। তখন পরাশর চারদিকে কুয়াশা সৃষ্টি করে সমস্ত দেশ অন্ধকার করে ফেললেন। মৎস্যগন্ধা পরাশরকে বললেন, আমি অবিবাহিতা কুমারী, এই সঙ্গমের ফলে আমার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য আপনি আদেশ করুন। তখন পরাশর প্রীত হয়ে বললেন, আমার সঙ্গমের ফলে তোমার কুমারীত্ব নষ্ট হবে না। তুমি কোন বর প্রার্থনা কর। তখন মৎস্যগন্ধা প্রার্থনা করলেন, তার সমস্ত দেহ যেন সুগন্ধযুক্ত হয়। পরাশর স্বীকৃত হয়ে কন্যাকে এই বরই দিলেন। তারপর মৎস্যগন্ধা ঋষি প্রভাবে ঋতুমতী হয়ে পরাশরের সঙ্গে সঙ্গম করল। সেই থেকে মৎস্য-গন্ধার নাম হলো গন্ধবতী এবং এক যোজন দূর হতেও এঁর গায়ের সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে এঁর আর এক নাম হলো যোজনগন্ধা। পরে ইনি সত্যবতী নামে খ্যাতা হন।

এই সঙ্গমের ফলে মৎস্যগন্ধা সদ্যোগর্ভ ধারণ করে যমুনা দ্বীপে বীর্যবান ব্যাসের জন্ম দিলেন। দ্বীপে জন্ম বলে ব্যাসের অন্য নাম দ্বৈপায়ন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতার অনুমতি নিয়ে ব্যাস তপস্যা করবার জন্য প্রস্থান করলেন এবং মাতাকে বলে গেলেন—কোন কাজের জন্য তাঁর আবশ্যক হলে স্মরণমাত্র তিনি এসে

উপস্থিত হলেন। পিতার প্রিয় কার্য সম্পাদনের জন্য ভীষ্ম তাঁর পিতা শান্তনুর বিবাহ সত্যবতীর সঙ্গে দেন। শান্তনুর ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র হয়। (মহাভারত—আদি, শান্তনু, ভীষ্ম দেখ)।

মৎস্য—(১) দ্বাদশ রাশির অন্যতম (মীন) রাশি। (২) তন্ত্র মতে 'মন'।

মৎস্য সাধন—দেহরূপ সমুদ্রের মধ্যে মনরূপ মৎস্যকে বাধ্য করা। সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করবার সাধনা।

মৎস্যদেশ—মৎস্যদেশের অবস্থান সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। মহাভারত অনুসারে বিরাটরাজের রাজধানী মৎস্য। কাহারো কাহারো মতে বর্তমান জয়পুরের নিকটবর্তী স্থানকে মৎস্যদেশ বলা হত।

মদ—মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসায় নবযৌবন লাভ করলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শর্যাতির যজ্ঞে তাঁদের সোমরস পান করাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ইন্দ্র এতে আপত্তি করেন এবং অশ্বিনীকুমাররা সোমপান করতে এলে বাধা দেন। এই নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষি চ্যবনের ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হলে ইন্দ্র চ্যবনকে বধ করবার জন্য বজ্র নিক্ষেপ করেন। চ্যবনও মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নি হতে এক ঘোরাকৃতি মহাকায় পুরুষ সৃষ্টি করলেন। এই ঘোরাকৃতি দৈত্যের নাম মদ। সে ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্র গ্রাস করে ফেলল। তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা বৃহস্পতির পরামর্শে চ্যবনের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং অশ্বিনীকুমারদের সোম পানের অধিকার দিতে সম্মত হলেন। এতে চ্যবন ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাদের ভয় দূর করবার জন্য মদকে বারো অংশে ভাগ করে কামিনী, সুরা, দ্যূতক্রীড়া ও মৃগয়াতে স্থাপন করলেন (দেবী ভাগবত)।

মদন—ব্রহ্মা যে সময়ে দক্ষ প্রজাপতিদের সৃষ্টি করে মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্র সৃষ্টি করেন, সেই সময় তাঁর মন হতে এক পরমাসুন্দরী নারীর আবির্ভাব হয়। এই নারীর নাম সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাই সন্ধ্যাকালে পূজিতা হয়ে থাকেন। কিন্তু এঁকে দেখে ব্রহ্মা, দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি ভাবতে লাগলেন, এই সৃষ্টির মধ্যে নারীকে নিয়ে তাঁরা কি করবেন এবং কেই বা এঁকে গ্রহণ করবেন। তখন ব্রহ্মা মন হতে এক সুন্দর পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। এই পুরুষের সৌন্দর্য দেখে সকলেই মোহিত হয়ে গেলেন। এই পুরুষ কম্বুগ্রীব, মীনকেতু ও মকরবাহন। এঁকে পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুসুমকার্মুকে শোভিত দেখে সকলেই বিস্মিত হলেন। এই পুরুষ ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলেন, কোন্ কার্যে তিনি নিযুক্ত হবেন। তাঁর অনুরূপ নাম ও স্ত্রী নির্দেশ করা হোক। ব্রহ্মা

বললেন—তুমি এই অপরূপ সুন্দর মূর্তিতে ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী-পুরুষকে মোহিত কর। দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, পশু তোমার বশবর্তী হবে। এমন কি আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তোমার বশবর্তী হব। তুমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে সৃষ্টি-লীলার সহায়তা কর। তুমি পুষ্পবাণ দিয়ে সকলের মনে মত্ততা ও আনন্দ সৃষ্টি করবে। তুমি দেবতাদের চিত্ত মথিত করেছ, এই জন্য তোমার নাম 'মন্মথ', তুমি অসাধারণ কামরূপী, সেই জন্য তোমার নাম কাম, সমস্ত লোককে তুমি মত্ত করবে, সেই জন্য তোমার নাম মদন, তুমি মহাদেবের দর্প চূর্ণ করবে, সেই জন্য তোমার নাম কন্দর্প। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে তোমার অবস্থিতি হবে। তারপর মদন তাঁর কুসুম শরাসন ও পুষ্পময় পঞ্চশর প্রথমে ব্রহ্মার উপর নিক্ষেপ করে তাঁর শক্তির পরীক্ষা করতে চাইলেন। সন্ধ্যার সম্মুখে ব্রহ্মার উপর এই শর নিক্ষেপ করাতে ব্রহ্মা কামমোহিত হয়ে পড়লেন। কামশরে বিদ্ধ সন্ধ্যা হতে চতুঃষষ্টি কলা উৎপন্ন হলো।

ব্রহ্মার কামাতুর ভাব দেখে মহাদেব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, পুত্রবধূ ও কন্যা, মাতৃতুল্যের প্রতি কামাসক্ত হওয়া ব্রহ্মার পক্ষে পাপকার্য—কারণ তিনি বেদের নিয়ামক। মহাদেবের এই তিরস্কারে ব্রহ্মা দুঃখিত হয়ে মদনকে অভিশাপ দিলেন: তোমার জন্য আমি অপমানিত হয়েছি, এই অপরাধে তুমি মহাদেবের অগ্নিবাণে দগ্ধ হবে। অভিশাপ শুনে মদন ব্রহ্মার কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা বললেন, মহাদেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হলেও তাঁর অনুগ্রহেই তোমার পুনর্জন্ম হবে। বিবাহের সময় মহাদেব মদনের শরীর দান করবেন।

এরপর দক্ষ মদনকে তাঁর দেহজাত কন্যা রতিকে বিবাহ করতে বললেন। তখন মদন রতিকে বিবাহ করলেন।

তারপর দেবতাদের প্ররোচনায় মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর নয়নের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত হলেন। মহাদেবের সহিত পার্বতীর বিবাহ হলে মদন পুনরায় শাপমুক্ত হয়ে নিজ শরীর প্রাপ্ত হন (কালিকা-পুরাণ)।

মদয়ন্তী—রাজা কল্মাষপাদের স্ত্রী। ব্রাহ্মণীর শাপে পুত্র উৎপাদনে অক্ষম হওয়ায় রাজা নিজের স্ত্রী মদয়ন্তীকে বশিষ্ঠের হস্তে প্রদান করেন। বশিষ্ঠ দ্বারা মদয়ন্তী গর্ভবতী হন। সাত বৎসর পর্যন্ত কোন সন্তান না হওয়ায় প্রস্তর দিয়ে তাঁর গর্ভ বিদীর্ণ করা হয়। এর ফলে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করল, তাঁর নাম হলো অশ্মক (মহাভারত—আদি)।

মথুরা—মধুদৈত্য নির্মিত নগরী। যমুনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান।

মদালসা—তত্ত্বদর্শিনী নারী। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা। রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ ঋষি গালবকে রক্ষার জন্য গালবের আশ্রমে যান। একদিন গালব সন্ধ্যাবন্দনায় রত আছেন, এমন সময়ে এক দানব শূকরের মূর্তিতে সেখানে উপস্থিত হয়। তখন ঋতধ্বজ তাকে অনুসরণ করে শরবিদ্ধ করলেন, কিন্তু সে দ্রুতবেগে পলায়ন করল। ঋতধ্বজ অশ্বারোহণে তাকে অনুগমন করলে সে এক বৃহৎ গর্তে প্রবেশ করে; ঋতধ্বজও সেই বৃহৎ গর্তে প্রবেশ করলেন, কিন্তু শূকরের কোন সন্ধান পেলেন না। তিনি তখন শূকরকে খুঁজতে খুঁজতে পাতালে গিয়ে শত শত ইন্দ্রপুরীর মত প্রাসাদ দেখতে পেলেন। কোন এক প্রাসাদে একটি কুমারীকে পালঙ্কে বসে থাকতে দেখে তিনি পরিচয়ে জানতে পারলেন যে, ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা—মদালসা। বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু এঁকে হরণ করে এখানে এনেছে এবং শীঘ্রই বিবাহ করবে। যে ব্যক্তি শরপ্রহারে এই দানবকে বিদ্ধ করবেন, তিনিই এই মদালসার স্বামী হবেন। ঋতধ্বজ তাঁর সমস্ত পরিচয় মদালসাকে দিয়ে কি করে এখানে এলেন, তাও জানালেন। এই ঋতধ্বজই এই দানবকে শরবিদ্ধ করেছেন জানতে পেরে কুমারী মদালসা ঋতধ্বজকে বিবাহ করতে চাইলেন। তখন কুলগুরুর দ্বারা এই বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হলো। তারপর ঋতধ্বজ মদলসাকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। এর বহুকাল পরে রাজা ঋতধ্বজকে আবার ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য চারিদিকে পর্যটন করতে পাঠিয়ে দিলেন। এই সময় যমুনাতীরে এক আশ্রমে পাতালকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তালকেতু মায়াবলে মুনিরূপ ধারণ করে আশ্রমে বাস করছিল। সেখানে ঋতধ্বজ আসা মাত্র পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে সে ঋতধ্বজের কাছ থেকে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যে দক্ষিণা প্রার্থনা করল। তখন ঋতধ্বজ তাকে তাঁর কণ্ঠহার দান করে আশ্রম রক্ষার ভার নিলেন। এই সুযোগে তালকেতু ঋতধ্বজের পিতার কাছে গিয়ে বললে, যজ্ঞদ্বেষী দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর পুত্র ঋতধ্বজ প্রাণত্যাগ করছেন। মদালসা স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তখনই প্রাণত্যাগ করলেন।

এরপর তালকেতুর হাত হতে মুক্তি পেয়ে ঋতধ্বজ পিত্রালয়ে ফিরে আসাতে পিতা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তাঁর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার

জন্য অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন ঋতধ্বজের পূর্বসুহৃদ নাগরাজ অশ্বতরের দুই পুত্র মদালসাকে জীবিত করবার জন্যে পিতাকে অনুরোধ করলেন। নাগরাজ অশ্বতর তপোবলে এই অসাধ্য সাধন করবেন বলে হিমালয়স্থ এক তীর্থে কঠিন তপস্যায় রত হলেন। তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব ও সরস্বতী এঁকে বর দিলেন, "মদালসা যে বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, সেই বয়সেই নাগরাজের কন্যারূপে জাতিস্মরা হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।" তখন নাগরাজ আবার ধ্যান করতে বসলেন এবং তাঁর দক্ষিণ কর্ণ হতে মদলসার জন্ম হলো। তখন নাগরাজের পুত্রদ্বয় ঋতধ্বজকে নাগলোকে নিয়ে গেল। এবারে পুত্রদ্বয় পিতাকে ঋতধ্বজের কাছে মদালসাকে আনতে অনুরোধ করলে। পিতা মদালসাকে ঋতধ্বজের সম্মুখে আনয়ন করলেন। তিনি মদালসাকে কেমন করে পুনর্জীবিত করেছেন, তা ঋতধ্বজকে বর্ণনা করলেন। তারপর ঋতধ্বজ স্ত্রীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এসে পিতাকে সমস্তই খুলে বললেন। শত্রুজিতের মৃত্যুর পর ঋতধ্বজ রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। কালক্রমে মদালসার চারপুত্র জন্মগ্রহণ করে। মদালসা তাঁর এক পুত্রকে গার্হস্থ্যধর্ম, এক পুত্রকে রাজধর্ম ও আর এক পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেন। চতুর্থ পুত্রের হাতে ঋতধ্বজ রাজ্যভার দিয়ে সস্ত্রীক বনে প্রস্থান করেন (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

মধু—লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অনেক মহাসুর। ইনি ব্রাহ্মণভক্ত ও আশ্রিতবৎসল ছিলেন। মহাদেব প্রীত হয়ে নিজের শূলের ন্যায় এক শূল এঁকে উপহার দিয়ে বলেন, মধু দেব ব্রাহ্মণের বিরাধিতা না করলে এই শূল তাঁর কাছেই থাকবে এবং এই শূল শত্রুকে ভস্ম করে মধুর হাতে ফিরে আসবে। মধু তখন প্রার্থনা করেন, এই শূল যেন চিরকালই তাঁর বংশের অধিকারে থাকে। মহাদেব তাতে অসম্মত হয়ে বলেন, মধুর এক পুত্র মাত্র এই শূলের অধিকারী হবে। রাবণ দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করলে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাকালে ও বিভীষণ তপস্যায় রত থাকার সময় মাল্যবানের কন্যা অনলার কন্যা কুম্ভীনসীকে মধুদৈত্য হরণ করে। কুম্ভীনসী সম্পর্কে রাবণের ভগিনী। রাবণ ফিরে এসে এই ঘটনা জানতে পেরে মধুদৈত্যকে শাস্তি দেবার জন্য মধুপুরে যাত্রা করেন। সেখানে কুম্ভীনসী রাবণের পদসেবা করে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করেন। তখন রাবণ ও মধুর মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। মধু ও কুম্ভীনসীর পুত্র লবণ ও কন্যা মধুমতী। লবণ শত্রুঘ্ন কর্তৃক নিহত হয় এবং মধুমতীর

সহিত সূর্যবংশের হর্যশ্বের বিবাহ হয়।

মধুকৈটভ—প্রলয় সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্তনাগের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর কর্ণমূল হতে দুই দানব মধু ও কৈটভ উৎপন্ন হয়। প্রথম অসুর উৎপন্ন হয়েই মধুপান করতে চেয়েছিল, সেই জন্য তার নাম হলো মধু, আর দ্বিতীয় কীটের মত আকৃতি বলে তার নাম হলো কৈটভ। তখন বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মার জন্ম হলো। এবং তিনি স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি মানসে তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। এই দুই দানব জন্মগ্রহণ করেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রতি ধাবমান হোল। তখন ব্রহ্মা চিৎকার করে উঠলেন। ফলে বিষ্ণুর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি অসুরদের সম্মুখীন হয়ে তাদের সহিত যুদ্ধে রত হলেন; কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ করেও বিষ্ণু এদের বধ করতে সক্ষম হলেন না। এই বলদর্পিত অসুররা তখন বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করতে বললে, বিষ্ণু যে বর চাইবেন, সেই বরই তারা বিষ্ণুকে দান করবে। তখন বিষ্ণু এই অসুরদ্বয়কে তাঁর বধ্য হতে বললেন। তারা রাজী হয়ে বললো, যেখানে জল নাই, সেখানে যেন তাদের বধ করা হয়। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শক্তিরূপিণী শিলাকে উচ্চস্থানে ধারণ করার জন্য বললেন। ব্রহ্মা এই শিলা ধারণ করলে বিষ্ণু এর উপরে উঠে মধু ও কৈটভের মস্তক উরুর উপর রেখে সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ডিত করলেন। এই অসুরদ্বয়ের মেদ হতে পৃথিবীর জন্ম হলো। সেই থেকে পৃথিবীর নাম মেদিনী (কালিকা পুরাণ)।

মধুছন্দা—সতীর অন্যতমা সহচরী।

মধুছন্দস্—বিশ্বামিত্রের পুত্র। মধুছন্দস্ ঋগ্‌বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি অগ্নি, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও মরুদ্গণ সম্বন্ধে অনেক রচনা করেছেন। (ঋগ্‌বেদ)

মধুমতী—মধুদৈত্যের কন্যা ও ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা হর্যশ্বের স্ত্রী। মধুমতীর গর্ভে যদু নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই যদুর নাম অনুসারেই এঁর বংশের নাম হয়। ইক্ষ্বাকু বংশ হতেই যদু বংশের উদ্ভব হয়েছে (হরি বংশ)।

মধুসূদন—বিষ্ণুর এক নাম। মধু ও কৈটভকে বধ করে বিষ্ণু মধুসূদন নাম প্রাপ্ত হন।

মনসা—সর্পগণের দেবী। ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন; সেই জন্য ইনি মনসা এবং এঁকে কশ্যপের মানসী কন্যা বলা হয়। পুরাকালে মানুষরা সর্বদা সর্পভয়ে ভীত থাকত; কারণ, নাগরা যাকে দংশন করতো, তৎক্ষণাৎ

তার মৃত্যু হোত। তখন ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করে এই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে মনসাকে সৃষ্টি করলেন। কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান এবং তাঁর কাছ থেকে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি সবই শিক্ষা করে সিদ্ধা হন। পরে দেবতা, মনু, মুনি, নাগ, মানুষ সকলেই মনসাদেবীর পূজা করতে থাকেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

জরৎকারু নামে এক মুনির সহিত কশ্যপ এঁর বিবাহ দেন। একদা জরৎকারু মনসার উরুতে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যাকালের উপস্থিতিতে সন্ধ্যা-বন্দনা না করায় স্বামীর ধর্মলোপ হবে—এই ভয়ে ভীত হয়ে মনসা স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করলেন। হঠাৎ তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করায় মনসার উপর জরৎকারু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে জরৎকারু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। মনসা তাঁর ইষ্টগুরু মহাদেব ও পিতা কশ্যপকে স্মরণ করলে তাঁরা জরৎকারুর সম্মুখে এলেন। স্ত্রীকে ত্যাগ করার কারণ শুনে এঁরা বললেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হোলে স্বধর্ম পালনের জন্য পুত্রোৎপাদন করে ত্যাগ করাই উচিত। পুত্রোৎপাদন না করলে তপস্যার ফল হয় না এবং তপোভঙ্গ হয়। তখন জরৎকারু মনসার নাভি স্পর্শ করলেন। ফলে এই গর্ভে এক তেজস্বী ও তপস্বী পুত্রের জন্ম হলো। এরপর জরৎকারু তপস্যার্থ স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এই পুত্রের নাম হলো আস্তিক। 'অস্তি' অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে এঁর নাম হলো আস্তিক।

মহাভারতে আছে—বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী ছিল। জরৎকারু বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, বাসুকি বহু অন্বেষণের পর মহর্ষি জরৎকারুকে পেয়ে তাঁর হাতে ভগিনীকে সমর্পণ করলেন। স্ত্রী ও স্বামী একই নামধারী হলেন। মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীকে বললেন, তুমি কখনও আমায় অপ্রিয় কিছু করবে না, যদি কর তবে তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাব। একদিন মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীর ক্রোড়ে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হলো। পাছে সন্ধ্যা-বন্দনার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এই ভয়ে স্ত্রী স্বামী জরৎকারুকে জাগিয়ে সন্ধ্যা-বন্দনার কথা জানিয়ে দিলেন। মহর্ষি বললেন, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে স্ত্রী তাঁকে অবমাননা করেছেন; তাই তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেলন, তাঁর গর্ভে এক তেজস্বী বেদজ্ঞ পুত্র আছে।

যথাকালে জরৎকারুর গর্ভে মহাতেজস্বী এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। মহর্ষি জরৎকারু চলে যাবার সময়

তাঁর স্ত্রীকে গর্ভস্থ পুত্রকে লক্ষ্য করে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন, সেই জন্য তাঁর পুত্রের নাম হলো আস্তিক।

এই দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে এঁর নাম জগৎগৌরী। শিবের শিষ্যা বলে শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী; জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরী; বিষ হরণকারিণী বলে বিষহরী; মহাদেবের কাছে হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, কশ্যপের মানসী কন্যা বলে মনসা।

মন্থরা—রাজা দশরথের দ্বিতীয়া স্ত্রী ভরত-জননী কৈকেয়ীর পিত্রালয় হতে আগত কুব্জা দাসী। সে বিকৃতাকার, বক্রদেহা, ঈর্ষাপরায়ণা, কূটবুদ্ধিসম্পন্না ছিল। কুমন্ত্রণাদানে নিপুণা হলেও, কৈকেয়ীর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী পরিচারিকা। দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করে রাজ্যভার দেওয়া স্থির করলে দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে নানা প্রকারে উত্তেজিত করে এবং তাঁর পুত্র ভরতকে রামের পরিবর্তে রাজা করবার জন্য দশরথের কাছে দাবী করতে বলে। মন্থরা কৈকেয়ীকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, শম্বর অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দশরথ ক্ষত-বিক্ষত দেহে অচেতন হয়ে পড়লে কৈকেয়ী তাঁকে রণস্থল থেকে এনে সেবা-যত্ন করে তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে দশরথ তাঁকে দুটি বর দিতে চান। তাতে কৈকেয়ী বলেন, পরে ইচ্ছামত তিনি বর চেয়ে নেবেন। এখন এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বলে মন্থরা কৈকেয়ীকে এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক চাইতে বলে। সত্যরক্ষার্থ দশরথ এই বর দিতে বাধ্য হন (রামায়ণ)।

মন্দপাল—জনৈক নিঃসন্তান বেদজ্ঞ তপস্বী। কঠোর তপস্যা করে মৃত্যু হলে ইনি পিতৃলোক স্থান না পেয়ে যমালয়ে যায়। এখানে তিনি বলেন, তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা কিছুই পূরণ হয় নাই। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইনি জানতে পারেন তাঁর কোন পুত্রের জন্ম না হওয়ায় 'পুত' নামক নরক হতে উদ্ধার পাননি। অবিলম্বে সন্তানলাভ করার জন্য মন্দপাল শার্ঙ্গক পক্ষিরূপে জরিতা নামে এক শার্ঙ্গিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে চারটি ব্রহ্মবাদী পুত্রের জন্মদান করেন। অগ্নির খাণ্ডবন দাহনের সময় এরা ডিম্বের মধ্যে বাস করছিলেন। মন্দপালের প্রার্থনায় অগ্নি এদের প্রাণরক্ষা করেন। তখন মন্দপাল তাঁর পুত্রগণ ও জরিতাকে নিয়ে অন্য স্থানে চলে যান (মহাভারত—আদি)।

মন্দর—পর্বত বিশেষ। দেবতা ও অসুররা মিলিত হয়ে যখন সমুদ্র মন্থন করেন, তখন এই পর্বতকে তাঁরা মন্থনদণ্ড করেন। এই পর্বত একাদশ

সহস্র যোজন প্রোথিত ছিল। দেবতারা এই পর্বতকে তুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অসমর্থ হন। পরে বিষ্ণু বাসুকীকে এই পর্বত তুলতে বলেন। বাসুকী বলপূর্বক একে উঠিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে যান। পরে দেবতারা ও অসুররা একে মন্থনদণ্ড করে সমুদ্রমন্থন করেন (মহাভারত—আদি)।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা। গঙ্গার যে প্রধান ধারা স্বর্গে গমন করে তাঁর নাম মন্দাকিনী। এই ধারা বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মলোক হয়ে স্বর্গে এসেছে।

মন্দোদরী—রাবণের প্রধানা মহিষী। হেমা অপ্সরার গর্ভে ও অসুরদের বিশ্বকর্মা ময়দানবের ঔরসে মন্দোদরীর জন্ম হয়। রাবণ একবার মৃগয়া উপলক্ষে দেশ ভ্রমণে গেলে, রাবণের পরিচয় পেয়ে ময়দানব মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করেন। মেঘনাদ প্রমুখ পুত্ররা মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ বধের পর রামের আদেশে যখন বিভীষণ লঙ্কার রাজা হন, তখন রামেরই আদেশে তিনি মন্দোদরীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। মন্দোদরী পূতচরিত্রা ও একান্ত ধর্মশীলা ছিলেন। তাঁর ধীর স্বভাব ও উন্নত ভাব দেখে হনুমান প্রথমে তাঁকেই সীতা বলে ভুল করেন। সীতার প্রতি রাবণের আকর্ষণ জেনেও তিনি কোন দিন সীতার প্রতি হিংসাভাব পোষণ করেন নি। ধর্মপত্নীরূপে রাবণকে তিনি বহুবার রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বারণ করেছিলেন (রামায়ণ)।

মন্বন্তর—মন্বন্তর শব্দের অর্থ মনুর রাজ্যশাসন কাল। ১৪টি মন্বন্তরে একটি কল্প হয় এবং এক কল্পকাল ব্রহ্মার একটি মাত্র দিন। এই এক দিনের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ মনুর অধিকার কাল শেষ হয়। এক মনুর অধিকার কাল শেষ হলে, অন্য এক মনুর অধিকার কাল আরম্ভ হয়। এক এক মনুর রাজত্ব কালকে মন্বন্তর বলে। মনুদের নিজেদের নাম অনুসারে চতুর্দশটি মন্বন্তরের চতুর্দশটি বিভিন্ন নাম হয়েছে। এই ১৪টি মন্বন্তরের প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার, এক একজন ইন্দ্র, পৃথক পৃথক দেবতাগণ, সপ্তর্ষি, মনু ও মনু-পুত্ররা আবির্ভূত হন।

মন্মথ—কামদেবের অন্য নাম।

মনু—ইনি ব্রহ্মার দেহ হতে উদ্ভূত; এই জন্য এঁর নাম 'স্বায়ম্ভুব' মনু। এঁর স্ত্রী শতরূপা, পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যা আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি। এঁর পুত্র কন্যা হতে মনুষ্য জাতির বিস্তার, তাই তারা 'মানব'। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগের সহস্র যুগে (অর্থাৎ সর্বমোট চার সহস্র যুগে) ভগবান ব্রহ্মার এক দিন। ঐ এক ব্রহ্ম-দিবসে চতুর্দশ জন মনু জন্মগ্রহণ করেন। ঐ এক এক মনুর অধিকার কালকে 'মন্বন্তর'

বলে। এক এক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনু, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র ও মনু-পুত্ররা আবির্ভূত হন। দেবতাদের হিসাবে আট লক্ষ বাহান্ন বৎসর এবং মানুষের হিসাবে ত্রিশকোটি সাতষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে এক মন্বন্তর হয়। মন্বন্তরের কাল পূর্ণ হলেই দেবতা, সপ্তর্ষি, ইন্দ্র, মনু-পুত্ররা সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নূতন করে অন্য মনু, দেবতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়। সকল মন্বন্তরেই সপ্তর্ষিরা ধর্মের ব্যবস্থা ও লোক রক্ষার জন্য আসেন। প্রত্যেক চতুর্যুগের অবসানে বেদ-বিপ্লব হয়। তখন সপ্তর্ষিরা পৃথিবীতে এসে আবাব বেদ প্রচার করেন। চার সহস্র যুগে অর্থাৎ চতুর্দশ মনুর অধিকার কালকে এক কল্প বলে। চতুর্দশ মনুর নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত বা সত্যব্রত, সাবর্ণি, দক্ষ-সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্র-সাবর্ণি, দেবতাসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মনুর নাম দেখা যায়। মৎস্য পুরাণে মনুদের নাম এই-রূপ। স্বায়ম্ভুব—ইনি ব্রহ্মা ও গায়ত্রী হতে সমদ্ভুত, দ্বিতীয় স্বারোচিষ, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবতঃ, ষষ্ঠ চক্ষুস, সপ্তম বৈবস্বত, অষ্টম সাবর্ণি, নবম রৌচ্য, দশম ভৌত্যঃ, একাদশ মেরুসাবর্ণি, দ্বাদশ ঋভু, ত্রয়োদশ ঋতুধামা ও চতুর্দশ বিষ্বক্‌সেন। প্রতি কল্পে এই চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়ে থাকে। সকল মনুই ধর্মশাস্ত্রকার। মনুদের মধ্যে যিনি আদি, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার দেহ হতে উদ্ভূত। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নিজেকে বিভক্ত করে নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। এই সৃষ্ট নারী ও পুরুষ হতে পুরুষ বিরাজ উৎপন্ন হলেন এবং এই বিরাজ হতে স্বয়ম্ভুব মনুর জন্ম হোল। মনু দশ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করলেন—এঁরাই মানবের জন্মদাতা—এঁরা মহর্ষি নামে খ্যাত। অন্য কাহিনী অনুসারে ব্রহ্মা নিজেই মনু-রূপে সৃষ্ট হলেন এবং তাঁর এক অংশে শতরূপা নামে নারী সৃষ্টি করলেন। কন্যা শতরূপার সহিত ব্যভিচারের ফলে মনুর জন্ম হলো। মনু এই শতরূপাকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁদের পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ। কন্যা—আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি। মনু, মরিচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, প্রচেতা, নারদ, বশিষ্ঠ—এই দশ প্রজাপতির স্রষ্টা। মরিচি প্রভৃতি হতে অন্যান্য মনু, অন্য দেবতা, যক্ষ, পিশাচ, নাগ, পক্ষী ও পিতৃগণ উৎপন্ন হন। ইনি ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করে মরিচি প্রভৃতিকে পাঠ করান। এই স্মৃতিশাস্ত্রকে মানবধর্ম শাস্ত্র বলে। ভৃগু মনুর আদেশে এই ধর্মশাস্ত্র ঋষি-

দের নিকট ব্যাখ্যা করেন। এর নাম মনুসংহিতা। ইনি চতুর্দশ মনুর প্রথম মনু।

এখনকার বৈবস্বত মনু বিবস্বান অর্থাৎ সূর্যের পুত্র। বৈবস্বত মনু সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ আছে—বিবস্বানের (সূর্য) পুত্র মনু বদরিকাশ্রমে দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করছিলেন। একদিন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতীরে এসে মনুকে বলে, বলবান মৎস্যদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মনু সেই মৎস্যকে একটি জালার মধ্যে রাখলেন। ক্রমশঃ বড় হলে মনু তাকে একটি পুষ্করিণীর মধ্যে রাখলেন। কালক্রমে মৎস্য এত বৃহৎ হলো যে, তাকে গঙ্গায় ছেড়ে দিতে হলো। গঙ্গাতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাকে সমুদ্রে স্থান দেওয়া হলো। তখন মৎস্য মনুকে বললে, আপনি আমায় সর্বদা রক্ষা করেছেন, এখন প্র[illegible]কাল আসন্ন; স্থাবর, জঙ্গম, সমস্তই জলমগ্ন হবে। আপনি রজ্জুযুক্ত একখানি দৃঢ় নৌকা প্রস্তুত করিয়ে সপ্তর্ষিদের সঙ্গে তাতে উঠবেন। নৌকায় প্রতীক্ষাকালে আমি শৃঙ্গ ধারণ করে আপনার কাছে উপস্থিত হব। মৎস্যের উপদেশে মনু মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন এবং মৎস্যকে স্মরণ করা মাত্র সে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। মনু তার শৃঙ্গে রজ্জু বন্ধন করলে, সে মহাসমুদ্র দিয়ে দ্রুতবেগে নৌকা নিয়ে চললো। তখন সমস্ত পৃথিবীই জলমগ্ন। বহু বৎসর পরে হিমালয়ের নিকটস্থ হয়ে মৎস্যের উপদেশে মনু পর্বত-শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করলেন। সেই শৃঙ্গের নাম হলো "নৌবন্ধন।" তখন মৎস্য আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা। তোমাদের ভয়মুক্ত করেছি। এখন মনু দেবাসুর, মানুষ, প্রাণী, [illegible]াবর, জঙ্গম, ইত্যাদি সৃষ্টি করবেন। এই বলে মৎস্য অন্তর্হিত হলে মনু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে প্রজা সৃষ্টি করতে সুরু করেন। মনুর সৃষ্ট বলে মানুষের নাম মানব। সাবর্ণিও সূর্যের পুত্র। অন্যান্য মনু অন্যান্য দেবরূপে উদ্ভূত হয়েছেন। মনুগণ প্রত্যেকেই ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা ও সংহিতাকার।

মনু সংহিতা – মানবধর্মশাস্ত্র। হিন্দু-ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলি, হিন্দুজাতির আচার, ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করে যে সংহিতা গ্রথিত হয়েছে, তা মনুর দ্বারা সঙ্কলিত। প্রবাদ আছে, ইহা প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব কর্তৃক লিখিত হয়। রাজার এবং লোক-সাধারণের ধর্ম, সমাজ, গার্হস্থ্যজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্তব্য সবিস্তারে এতে লিপিবদ্ধ আছে। এই সংহিতাকে হিন্দু আইনের ভিত্তিস্বরূপ বলা হয়। বেদের পরে মনুসংহিতা সৃষ্টি হয়েছিল, পণ্ডিতদের এইরূপ অভিমত। কথিত আছে,

সর্বপ্রথমে এতে এক লক্ষ শ্লোক ছিল, কিন্তু এখন মাত্র ২৬৮৪টা শ্লোক পাওয়া যায়।

মনোরমা—(১) কার্তবীর্যার্জুনের স্ত্রী। পরশুরামের সহিত কার্তবীর্যার্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হলে, মনোরমা স্বামীকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কারণ, তিনি জানতেন, এই যুদ্ধে স্বামী পরাজিত ও নিহত হবেন। স্বামীকে নিবৃত্ত করতে না পেরে আগেই ইনি যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন। (২) প্রজাপতি রুচির স্ত্রী। বরুণ-পুত্র পুষ্করের ঔরসে প্রম্লোচ্চা নামে অপ্সরার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। প্রম্লোচ্চার অনুরোধে রুচি এঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। রুচির ঔরসে এঁর গর্ভে রৌচ্যমনুর জন্ম হয়।

ময়দানব—দিতি-পুত্র; ময় নামে এক মায়াবী দানব। ইনি বিশ্বকর্মার মত দানবদের অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন। ব্রহ্মার বরে ইনি হিরণ্ময় অরণ্য ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ময়দানব সহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করে বর পান এবং শুক্রাচার্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যার অধিশ্বর হন। ইনি হেমা নামে এক অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি নামে দুই পুত্র এবং মন্দোদরী নামে একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হেমা দেবকার্যে তের বৎসরের জন্য স্বর্গে গমন করে। সেই সময় ময়দানব বিচিত্র হীরক, বৈদূর্য ইন্দ্রনীলখচিত এক স্বর্ণময় প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। একবার কন্যা মন্দোদরীকে নিয়ে বনে ভ্রমণ করবার সময় রাবণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুই জনে পরিচিত হওয়ায় ময়দানব তাঁর কন্যাকে রাবণের হাতে সম্প্রদান করেন এবং বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তপোলব্ধ এক অমোঘ শক্তি তাঁকে দান করেন। এই শক্তির আঘাতেই লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হন।

যখন সীতা অন্বেষণে বানররা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন তারা দক্ষিণদিকে ময়দানব রক্ষিত ঋক্ষবিলের সন্ধান পায়। এই ঋক্ষবিলের মধ্যে ময়দানব অপূর্ব কারুকার্যখচিত স্বর্ণময় সপ্ততল আবাস নির্মাণ করে হেমার সঙ্গে বাস করতেন। হেমার সহচরী ও মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ংপ্রভা নামে এক তাপসী এখানে গৃহরক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

অগ্নির তৃপ্তির জন্য কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক খাণ্ডবদাহ কালে ময়দানব সেই বনে উপস্থিত ছিলেন এবং পলায়নের চেষ্টা করলে কৃষ্ণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। তখন তিনি অর্জুনের শরণাপন্ন হলে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। অর্জুনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ও পাণ্ডবদের তুষ্টিবিধানের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব এক অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করেন। 'ময়মত' নামক গৃহনির্মাণ-শিল্পগ্রন্থ

প্রণেতা বলে এঁর প্রসিদ্ধি আছে।

হেমার প্রতি আসক্ত হওয়ায় এবং তাকে বিবাহ করায় ইন্দ্র ময়দানবকে বজ্রাঘাতে বধ করেন।

মরিচি—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন মুনি-বিশেষ। ইনি দশ প্রজাপতির অন্যতম, সৃষ্টির জন্য ধ্যানরত ব্রহ্মার মানস হতে এঁর জন্ম। কশ্যপ এঁর পুত্র। মনুর মতে, ইনি মনুর তপোবলে সৃষ্ট দশ প্রজাপতির একতম। ইনি প্রজাপতিরূপে নিয়োজিত হয়ে কর্দম-কন্যা কলাকে বিবাহ করেন। মহামুনি কশ্যপ এঁর পুত্র।

মরুৎ—ক্ষীরোদ সমুদ্র হতে উত্থিত অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয়, তাতে কশ্যপের স্ত্রী দিতির পুত্ররা দেবতাদের হাতে নিহত হলে, স্বামী কশ্যপের নিকট দিতি ইন্দ্রহন্তা অজেয় অবধ্য এক পুত্র কামনা করেন। কশ্যপ বললেন, তুমি যদি সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মাবে—এই বলে হস্ত দ্বারা দিতিকে স্পর্শ করে তাঁর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে তিনি তপস্যা করতে চলে গেলেন। দিতি কুশপ্লব নামক স্থানে পুত্র লাভের জন্য দারুণ তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন এবং ইন্দ্রও নানারূপে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। এই ভাবে নয় শত নব্বই বৎসর গত হলে দিতি প্রীত হয়ে ইন্দ্রকে বললেন; তোমার বিনাশের জন্য যে পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম, আর দশ বৎসর পরে তোমার সেই ভ্রাতাকে দেখবে এবং তার সঙ্গে নির্বিবাদে ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ হয়ে তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগ করবে। একদা মধ্যাহ্ন কালে দিতি শয্যার মাথার দিকে পা এবং পায়ের দিকে মাথা রেখে নিদ্রিত ছিলেন। এই জন্য ইন্দ্র তাঁকে অশুচি মনে করেন ও তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বজ্রাঘাতে দিতির গর্ভ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করলেন। তখন গর্ভস্থ শিশু ক্রন্দন করে উঠলে ইন্দ্র 'মা রুদ' (কেঁদো না) বলে তাকে কাটতে থাকেন এবং দিতিও জাগরিত হয়ে ইন্দ্রকে আঘাত করতে নিষেধ করায় ইন্দ্র বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, দিতি মাথার দিকে পা রেখে অশুচি হয়ে শুয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁর ভাবী হত্যাকারীকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করেন। দুঃখিত হয়ে তখন দিতি বলেন যে, তাঁর নিজের অপরাধেই গর্ভ সপ্তধা হয়েছে। এখন তাঁর এই সপ্ত পুত্র দিব্যরূপে মরুৎ নামে সপ্ত-লোকে বিচরণ করুক। ইন্দ্র মা রুদ বলেছিলেন বলে এঁদের নাম মরুৎ হল (রামায়ণ)।

(২) ঋক্‌বেদে মরুদ্‌গণের সংখ্যা সপ্ত। এই সংখ্যা উল্লেখের সময় সপ্তমে সপ্ত—সাত সাত জন মরুতের উল্লেখ থাকায় পুরাণে সাত-সাতে ৪৯ জন মরুৎ হয়েছেন। ঋক্‌বেদের এক

স্থানে তেষট্টি জন মরুতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মরুৎরা ঋক্‌বেদের প্রধান দেবতা। তাঁরা ৩৩টি সূক্তে স্তুত হয়েছেন। অপর দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, পুষার সঙ্গে আরো ৯টি সূক্তে এঁদের স্তুতি আছে। মরুদ্‌গণের পিতামাতা রুদ্র ও পৃশ্নি (সম্ভবত বিচিত্র বর্ণ মেঘ)। পৃথিবী ও সমুদ্রের এবং রুদ্রের পুত্র বলে এঁরা রুদ্র নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই সহোদর, সমবয়সী। এঁরা দেবী রোদসীকে (রোদসী অর্থে আকাশ, বিদ্যুৎ) বিদ্যুন্ময় রথে বহন করেন। রোদসী মরুদ্‌গণের স্ত্রী। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রাণীর সহায়ক ও বন্ধু এবং সরস্বতীর সখা। এঁরা বসুগণের সহিত এক রথে ভ্রমণ করেন।

মরুদ্‌গণের উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎ বিজড়িত দেহ। এঁদের পিতা রুদ্রের মত এঁদের হস্তে কুঠার ও ধনুর্বাণ। এঁরা বৃষের মত গর্জন করায় পৃথিবী কম্পিত হয়, বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, বন বিমর্দিত হয়। মরুদ্‌গণের প্রধান কাজ—বৃষ্টিপাত করে সূর্যের চোখ আবৃত করে রাখা। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সখা ও অনুচর। এঁরা গান ও স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করেন। ইন্দ্র তাঁর সকল কার্য মরুদ্‌গণ সাহায্যেই সম্পন্ন করেন (বেদ)।

মরুত্ত—একজন রাজা। সত্যযুগে মনুদণ্ডধর রাজার প্রপৌত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিংশ, বিংশের পৌত্র খনীনেত্র রাজা হয়ে প্রজাদের উৎপীড়ন করাতে তাঁর পুত্র সুবর্চা রাজা হন। কালক্রমে রাজা সুবর্চা দরিদ্র হয়ে পড়ায় সমস্ত রাজারা এঁর উপর অত্যাচার করতে লাগলেন। তখন তিনি হস্তে ফুৎকার দিয়ে সৈন্যদল সৃষ্টি করে বিপক্ষ রাজাদের পরাজিত করলেন। এই কারণে এঁর নাম হলো করন্ধম। তাঁর অবিক্ষিত নামে একটি সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র হয়। অবিক্ষিতের পুত্রের নাম মরুত্ত। এই মরুত্ত প্রবল প্রতাপশালী রাজচক্রবর্তী হন। কালক্রমে ইনি হিমালয়ের মেরুপ্রদেশে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অঙ্গিরার দুই পুত্র বৃহস্পতি ও সংবর্তের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল না। বৃহস্পতির উৎপীড়নে সংবর্ত দিগম্বর হয়ে বনবাস করতে থাকেন। এই সময় ইন্দ্র মরুত্তের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বৃহস্পতিকে নিজের পুরোহিত করে তাঁকে মরুত্তের পৌরোহিত্য করতে নিষেধ করেন। বৃহস্পতি এতে স্বীকৃত হন। মরুত্ত বৃহস্পতিকে এই বিরাট যজ্ঞের পৌরহিত্য করতে বলাতে, বৃহস্পতি বললেন, তিনি মানুষের যাজন করবেন না। মরুত্ত চিন্তিত হয়ে ফিরে যাবার সময় পথে নারদের সঙ্গে দেখা হয়। নারদ বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্তের দ্বারা যজ্ঞ করতে বললেন। সংবর্ত তখন

মহাদেবের দর্শন কামনায় বারাণসীতে ছিলেন। নারদেরই উপদেশ মত মরুত্ত সেই পুরীর দ্বারদেশে একটি শব রেখে দিলেন। সংবর্ত ঘুরতে ঘুরতে সেই স্থানে এসে সেই শব দেখেই ফিরে গেলেন। মরুত্তও তাঁর অনুসরণ করে এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হলেন। সংবর্ত রাজার গাত্রে ধূলি-কর্দম নিক্ষিপ্ত করে রাজাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন এবং কে তাঁর সন্ধান দিয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। মরুত্ত নারদের নাম উল্লেখ করায় সংবর্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন। তাতে মরুত্ত নারদের পরামর্শ মত জানালেন, তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করেছেন। অবশেষে সংবর্ত মরুত্তের যজ্ঞ সম্পাদনে প্রতিশ্রুত হলেন। রাজাকে তিনি বললেন, যজ্ঞ করার জন্যে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হলে রাজা যেন তাঁকে ত্যাগ না করেন। মরুত্ত এই শপথ করলেন যে, তাঁর পরামর্শ মত হিমালয়ের মুঞ্জবান পর্বতে শিবকে সন্তুষ্ট করে মরুত্ত যজ্ঞের জন্যে প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করবেন। এদিকে এই সকল সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন মরুত্ত ও সংবর্তকে দমন করেন। তখন ইন্দ্রের আদেশে বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিদেব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে বৃহস্পতিকে পুরোহিত করার জন্য মরুত্তকে অনুরোধ করেন। তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিকে ভস্ম করে ফেলবার ভয় দেখালেন। তারপর ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মরুত্তের কাছে পাঠালেন। গন্ধর্বরাজ বললেন, বৃহস্পতিকে পুরোহিত না করলে ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করবেন। তখন মরুত্ত উত্তর দিলেন, সংস্তম্ভনী বিদ্যাদ্বারা তিনি এই সব ভয় নিবারণ করবেন। এই বলে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ করে ইন্দ্রাদি দেবতাকে আহ্বান করলেন। সংবর্তের আহ্বানে ইন্দ্রাদি দেবতারা উপস্থিত হলেন এবং প্রীত হয়ে যজ্ঞভাগের নির্দেশ করলেন। বহু বৃষ বধ করে ও বহু স্বর্ণ দক্ষিণা দিয়ে সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করা হলো। মরুত্ত উদ্বৃত্ত স্বর্ণ কোষ মধ্যে রক্ষা করেন এবং গৃহে ফিরে এসে সসাগরা পৃথিবী শাসন করতে থাকেন। অশ্বমেধযজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির ব্যাসের পরামর্শে সেই সঞ্চিত স্বর্ণ সংগ্রহ করেন। (মহাভারত—আশ্বমেধিক)

রামায়ণে আছে উসীরবীজ দেশে সংবর্তকে যাজকরূপে গ্রহণ করে মরুত্ত যখন যজ্ঞ করছিলেন, তখন রাবণ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন। রাবণ মরুত্তকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, মরুত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন, কিন্তু এস্থলে সংবর্ত বলেন, যজ্ঞে দীক্ষিত অবস্থায় ক্রোধ করা অনুচিত। তখন মরুত্ত ধনুর্বাণ ত্যাগ করে যজ্ঞস্থলে

প্রত্যাগমন করেন, এবং রাবণও যজ্ঞে সমাগত ঋষিদের ভক্ষণ করে প্রস্থান করেন। যজ্ঞে উপস্থিত দেবতারা বিবিধ পশুরূপ ধারণ করে আত্মরক্ষা করেন। রাবণ চলে গেলে তাঁরা নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করে উপকারী পশুদের রূপ বৃদ্ধির বর দিয়েছিলেন।

মহাকাল—(১) শিবের অন্য নাম। এই নামে শিব ধ্বংসের দেবতা। (২) এলিফ্যান্টা গুহায় শিবের মহাকাল মূর্তি আছে। এই মূর্তিতে শিবের আটটি হস্ত দেখা যায়। (৩) শিবের 'গণ'দের অধিপতি।

মহাদেব—দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও মহাদেব সংহারকর্তারূপে সাধারণতঃ কীর্তিত হয়ে থাকেন। বেদে মহাদেব বা শিবের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু 'রুদ্র' নাম নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। বেদের এই রুদ্রই পরবর্তীকালে শিব বা মহাদেবে পরিণত হয়ে ত্রিমূর্তির মধ্যে গণ্য হয়েছেন। (রুদ্র দেখ)। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল, তাঁর ধনুকের নাম পিনাক। তাঁর বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র পাশুপত, যা তিনি অর্জুনকে দান করেছিলেন। প্রলয়কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংসকার্যে নিযুক্ত হন। ইনি ত্রিপুরাসুর বিনাশকারী বলে 'ত্রিপুরারি'।

বেদে রুদ্রের বর্ণনায় দেখা যায়—তিনি ভয়াবহ হিংস্র পশুর ন্যায় ধ্বংসকারী, তিনি বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ, তিনি বিদ্বান্, জ্ঞানী, এবং মর্ত্যেও দেবগণের কর্মের স্রষ্টা ও সাক্ষী। তিনি বদান্য, সহজে সন্তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে লোকদের হিংসা করেন ও তাঁদের সম্পত্তি ধ্বংস করেন, বজ্রাঘাতে মানুষ ও পশু বধ করেন, রোগ আনয়ন করেন। এই সকল অপকার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁকে পূজা ও স্তুতি করা হয়। রুদ্র প্রসন্ন হলে বিপদ্ হতে উদ্ধার করেন, রোগ দূর করেন। রুদ্রের চরিত্রে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধবাদী গুণের সমাবেশ দেখা যায়। রুদ্র একাধারে রুদ্র (ভয়ানক) ও শিব (মঙ্গলময়)। এই শিব বিশেষণও পরে রুদ্রের অন্য নাম হয়ে পৌরাণিক ত্রিদেবতার অন্যতম হয়েছিল। রুদ্র বা শিব পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিনাশশক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

মহাদেবের অন্য নাম রুদ্র বা মহাকাল, কারণ তিনি সর্বসংহারক। কিন্তু এই সংহার হতেই আবার তাঁর অভ্যুদয় হয়। সে জন্য শিব বা শঙ্কর নামে তিনি জননশক্তি। যা ধ্বংস হয়েছে তা পুনর্বার জন্মেছে—সেই জন্য তিনি ঈশ্বর; সর্বশক্তিমান মহাদেব। সৃষ্টির রক্ষক হিসাবে তাঁর প্রতীক লিঙ্গ

অর্থাৎ প্রজননের চিহ্ন। এই প্রতীকের সঙ্গে যোনি অর্থাৎ স্ত্রীশক্তি সংযুক্ত হয়ে তিনি সর্বত্র পূজিত হন। তিনি মহাযোগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কঠোর তপস্যা ও নির্গুণ ধ্যানের প্রতীকস্বরূপ। এই কঠোর তপস্যা ও ধ্যানের ফলস্বরূপ তিনি সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করেন। কৈলাস এঁর আবাসভূমি। স্বয়ং যোগী, কিন্তু কুবের এঁর ধনরক্ষক। জগন্মাতা পার্বতী এঁর স্ত্রী। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এঁর পুত্র-কন্যা বলে খ্যাত। মহাযোগীর বেশে তিনি দিগম্বর ধূর্জটি। তাঁর দেহ ভস্মাবৃত ও জটাজুটধারী। সংহার শক্তি প্রবল হলে তিনি ভৈরব, ভীষণ সংহারক—ধ্বংসেই তাঁর আনন্দ। তিনি ভূতেশ্বর বা ভূতনাথরূপে সমস্ত প্রকার ভূতের অধিপতি। তিনি শ্মশানে সর্পজড়িত মস্তকে, গলদেশে কঙ্কাল মাল্য ভূষিত হয়ে অনুচরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। উত্তেজক দ্রব্য পানের পর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নৃত্যে রত হন। এই নৃত্যের নাম 'তাণ্ডব'। অন্য মতে, বিশ্বধ্বংসের সময়কার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। তিনি নৃত্যকলারও উদ্ভাবক বলে তাঁর নাম 'নটরাজ'। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের বর্ণনা এইরূপ—তাঁর ললাটে তৃতীয় নয়ন, তাঁর উপর অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা, পরিধানে রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র। বাহন নন্দী সর্বদা তাঁর সহচর। তাঁর হস্তে সর্বদা ডমরু ও দুর্জনের শাস্তির জন্য মুদ্গর। পার্বতীর সহিত বিবাহের জন্য মদন যখন তাঁকে প্রলুব্ধ করে তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করেছিলেন, তখন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে তিনি ভস্ম হন। প্রলয়কালে তাঁর এই তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে পৃথিবী ধ্বংস হয় বলে কথিত আছে। কথিত আছে, ইনি মহর্ষি অত্রির কাছে যোগশিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। ইনি পরম ভক্ত অসুর বাণকে রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হওয়ায় বাণকে রক্ষা করতে অসমর্থ হন। সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র হতে ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হওয়ায় ভীত দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হলে, জগতের হিতার্থে ব্রহ্মা মহাদেবকে এই বিষ পান করতে বলেন। মহাদেব সম্মত হয়ে বিষ পান করে তাঁর কণ্ঠে তা ধারণ করেন। বিষের তেজে কণ্ঠ নীল বর্ণ হয়ে যায়; কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস

থেকে রক্ষা পায়। এই জন্যই এর এক নাম নীলকণ্ঠ। অতি সহজে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ঈপ্সিত বর প্রদান করেন বলে এঁর অন্য নাম আশুতোষ। কেবলমাত্র বিল্বপত্র দানেই এঁকে তুষ্ট করা যায়। এঁর বরের প্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি অসুররা অত্যাচারী হয়ে শেষে ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতির হাতে নিহত হয়। বিশ্বামিত্র এঁর দয়ায় অস্ত্রলাভ করেন। পরশুরাম এঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্রলাভ করে অজেয় হন। ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে তাচ্ছিল্য করে অসম্মানসূচক কথা বলেছিলেন বলে মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক কর্তন করেন। সেই হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ইনি কিরাতবেশে তাঁর সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ করে প্রসন্ন হন এবং তাঁকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতীকে মহাদেব বিবাহ করেন। ভৃগু-যজ্ঞে মহাদেব শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন নি বলে ক্রুদ্ধ দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও এই যজ্ঞে উপস্থিত হন। সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ শিবনিন্দা করায় সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ পেয়ে মহাদেব সেখানে এসে ক্রোধে জটা ছিন্ন করলে শিবজটা হতে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। আর তাঁর নিঃশ্বাস-বায়ু হতে কোটি কোটি ভূতপরিবৃতা মহাকালীর আবির্ভাব হোল। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু শিবনিন্দার পাপে এঁর মুণ্ডে ছাগমুণ্ড যোগ করে দেন। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে শিব যখন নৃত্য করছিলেন, তখন সুদর্শনচক্র দ্বারা বিষ্ণু ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। ৫২ খণ্ডে বিভক্ত সতীদেহ যে যে স্থানে পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থান ৫২টি পীঠস্থান বা পরম তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এরপর সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্যে কঠোর তপস্যা করেন। তখন মহাদেবও কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা জানতে পারেন যে, মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মাবে সেই পুত্রই তারককে বধ করবে। সেই জন্য পার্বতী ও মহাদেবের মিলন করতে এসে মদন মহাদেবের কোপে ভস্মীভূত হন। তারপর পার্বতী ও মহাদেবের মিলন হলে মদন পুনর্জীবন লাভ করেন। পার্বতীর পুত্র কার্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করে তারকাসুর বধ করেন। শিবের দুই পুত্র কার্তিকেয় ও গণেশ এবং তিন স্ত্রী সতী, পার্বতী ও গঙ্গা।

মহাদেবের তৃতীয় নেত্র উদ্ভবের আর একটি কারণ উল্লিখিত আছে। পার্বতী একবার পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের দুই নেত্র হস্তদ্বারা আবৃত করেন। এতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত হয় এবং আলোকবিহীন পৃথিবীর সমস্ত মানব বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন পৃথিবীর লোকদের রক্ষা করবার জন্য তিনি ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন। এই নেত্রের তীব্র জ্যোতিতে হিমালয় দগ্ধ হয়ে যায়; পরে পার্বতীর প্রীতির জন্যে তিনি হিমালয়কে আবার পূর্বের ন্যায় রমণীয় করেন।

একদা নারদের গর্ব খর্ব করবার জন্যে রাগরাগিণীগণ বিকলাঙ্গ হয়ে পথে পড়ে থাকেন। নারদ কারণ জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, নারদের স্বরহীন সঙ্গীত চর্চার জন্যই তাঁদের এই দুর্দশা। মহাদেব সুললিত কণ্ঠে গান করলে তাঁরা আবার পূর্বরূপ ফিরে পাবেন। তখন নারদ বহু স্তুতি করে মহাদেবকে গান করতে সম্মত করান; কিন্তু গান শোনবার উপযুক্ত শ্রোতা না পেলে মহাদেব গাইতে অস্বীকার করেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শ্রোতা হন। মহাদেবের গান শুনে বিষ্ণু বিগলিত হয়ে পড়েন দেখে ব্রহ্মা তাঁকে কমণ্ডলুর মধ্যে রক্ষা করেন। বিষ্ণুর এই বিগলিত অংশই গঙ্গা। পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করবার সময় গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করতে পারবেন না জেনে শিবকে স্তুতি করে গঙ্গাকে ধারণ করার জন্যে সম্মত করা হয়। গঙ্গা শিবকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করায় শিব ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে আপন জটার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। ভগীরথের পুনর্বার স্তুতিতে শিব গঙ্গাকে জটা হতে মুক্ত করেন।

তারকাসুরের তিন পুত্র। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী। এরা কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে বর পায়, তারা তিন জনে তিনটি কামগামী নগরে বাস করবে এবং কেহই তা বিনষ্ট করতে পারবে না। সহস্র বৎসর পরে এরা তিন জনে একত্র মিলিত হলে এদের ত্রিপুর এক হয়ে যাবে; তখন যদি কেহ এক বাণে এই সম্মিলিত ত্রিপুর ভেদ করতে পারে তবেই ত্রিপুর বিনষ্ট হবে। ময়দানব স্বর্গে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে তিন পুর নির্মাণ করে দেন। সেখানে দেবতা কর্তৃক বিতাড়িত দৈত্যগণ আশ্রয় নেয় এবং ত্রিলোকের উপর নানা উৎপীড়ন সুরু করে। এরা ব্রহ্মার বরে অজেয় হওয়ায় দেবতারা এদের বধ করতে না পেরে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব তাঁর অর্ধ তেজ দেবগণকে দান করে ত্রিপুর ধ্বংস করতে বলেন। দেবতারা তাঁর

তেজ ধারণে অসমর্থ জানিয়ে মহাদেবকেই তাঁদের অর্ধতেজ নিয়ে শত্রু ধ্বংস করতে অনুরোধ করেন। শিব দেবগণের অর্ধতেজ গ্রহণের ফলে তাঁর শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। বিশ্বকর্মা পৃথিবী, দেবী, মন্দরপর্বত, দিগবিদিক, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি দিয়ে রথ নির্মাণ করেন। চন্দ্র ও সূর্য চক্র হন। ইন্দ্র, বরুণ, যম কুবের অশ্ব হন; সুমেরু ধ্বজ ও মেঘ পতাকা হন। সংবৎসর ধনু ও কালরাত্রি জ্যা এবং বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র বাণ হন। ব্রহ্মা সারথি হন। ত্রিপুর অভিমুখে যাত্রা করলে বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র, ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভারে রথ ভূমিতে বসে যায়। তখন বিষ্ণু বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষরূপে রথ ভূমি হতে উত্তোলন করেন। মহাদেব বৃষরূপী নারায়ণ ও অশ্বের পৃষ্ঠে চরণ রেখে ধনুতে জ্যা রোপণ করে পাশুপত অস্ত্র যোজনা করে অপেক্ষা করতে থাকেন। এই সময় দানবদের তিনপুর একত্র হতেই মহাদেব বাণ নিক্ষেপ করেন এবং ত্রিপুর দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হয়। এই জন্য মহাদেবের অপর নাম ত্রিপুরারি।

রামায়ণে মহাদেব একজন প্রধান দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু এখানে তিনি পরম দেবতা না হয়ে ব্যক্তিগত দেবতা হিসাবে গৃহীত হয়েছেন। এখানে তিনি বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র কর্তৃক পূজিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি রামচন্দ্রের দেবত্ব স্বীকার করেছেন। কুবেরকে পরাস্ত করে রাবণ কৈলাসে উপস্থিত হলে তাঁর রথের গতি রুদ্ধ হয়। মহাদেবের অনুচর নন্দী এসে রবণকে বলেন, এস্থান শিবের বাসস্থান এবং সকলের অগম্য। রাবণ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ভুজবলে কৈলাস উত্তোলন করতে থাকেন। পর্বত কম্পিত হওয়ায় পার্বতী সভয়ে শিবকে আলিঙ্গন করেন। তখন মহাদেব পায়ের অঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণের বাহু নিপীড়িত করলে রাবণ ত্রিলোক কম্পিত করে গর্জন করে ওঠেন। তখন মন্ত্রিগণের পরামর্শে শিবের স্তুতি করায় সহস্র বৎসর পরে শিব রাবণের হস্ত মুক্ত করেন এবং রাবণের বীরত্বে প্রীত হয়ে বলেন, দারুণ রব করায় জন্যে তোমার নাম 'রাবণ' হবে। রাবণ মহাদেবের কাছে অজেয় অস্ত্র প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে চন্দ্রহাস নামে এক খড়্গ দান করেন। মহাভারতেও মহাদেব বিষ্ণু ও কৃষ্ণ কর্তৃক পূজিত হয়েছেন। মহাভারতে লিখিত আছে, ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই মহাদেবকে পূজা করেন। মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে নানা উল্লেখ দেখা যায়। এই দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরোধের মধ্যে এক সমন্বয় স্থাপন

করবার চেষ্টা দেখা যায়। শিব ও বিষ্ণু যে একই দেবতা, তা প্রমাণ করবার চেষ্টা আছে, কিন্তু পরবর্তী কালে পুরাণের সময় মহাদেব কিংবা বিষ্ণু যে অন্য সমস্ত দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এই ভাব নানা প্রকারে প্রচারিত হয়। হরিবংশে লিখিত আছে, শিব কিংবা বিষ্ণু দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মহাদেব ধূম্ররূপী বলে ইনি ধূর্জটি, মানুষের নিয়ত মঙ্গল কামনা করে বিবিধ কর্মের দ্বারা তাদের উন্নত করেন বলে তিনি শিব। পশুদের অধিপতি ও পালনকর্তা বলে ইনি পশুপতি।

মহাপার্শ্ব—(১) রাবণের ভ্রাতা। লঙ্কার যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ বধের পর মহাপার্শ্ব বানর ঋষভকে গদাঘাত করে। ঋষভ তাঁর গদা কেড়ে নিয়ে সেই গদাঘাতে তাকেই বধ করেন।

(২) রাবণের অমাত্য। ইনি ইন্দ্রজিৎ বধের পর যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অঙ্গদের হাতে নিহত হন।

মহাপ্রলয়—প্রত্যেক কল্পের শেষে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তখন সপ্তলোক এবং তাহাদের অধিবাসী দেবগণ, ঋষিগণ, এমন কি ব্রহ্মা নিজেও এই মহাপ্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

মহাপুরাণ—বিষ্ণু পুরাণ ও ভগবৎ পুরাণকে মহাপুরাণ বলা হয়।

মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশজন মহাবিদ্যা (দশ মহাবিদ্যা দেখ)।

মহাভারত—ভারতীয় মহাবংশ-চরিত ও কুরু-পাণ্ডবীয় যুদ্ধ-বর্ণনাত্মক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কৃত মহাকাব্য। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তিনি এইরূপ পবিত্র কাব্য রচনা করবেন—যাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের নিরূপণ, জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের নানা পুরাণোক্ত আচারবিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও যুগ-প্রমাণ, ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ন্যায়-শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম, পাশুপতধর্ম এবং যিনি যে-কারণে দিব্য বা মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, দুর্গ, সেনার ব্যূহ-রচনাদি কৌশল ইত্যাদি কথিত হবে। অথচ যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরম ব্রহ্মাই প্রতিপাদিত হবেন। এই মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত। আবার এই

অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে একশত পর্বাধ্যায় আছে। মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক আছে। পৃথিবীর মধ্যে মহাভারত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাকাব্য। কথিত আছে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর পৌত্রের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে ৩ বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন।

মহাভারতের রচনাকাল এরূপ :- প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কিছু বেশী বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন—মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে পঞ্চম অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে।

মহাভিষ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইনি সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ করে স্বর্গলাভ করেন। একদা ব্রহ্মার সভায় তিনি দেবতাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকায় সমঃ বায়ু দ্বারা গঙ্গার সূক্ষ্ম অঙ্গবস্ত্র অপসৃত হয়। তখন দেবগণ লজ্জায় মুখ নত করেন; কিন্তু মহাভিষ আপাদমস্তক গঙ্গাকে দেখতে থাকেন। তাঁর এই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে মর্ত্যলোকে জন্মাবার শাপ দেন। মহাভিষ স্বর্গচ্যুত হয়ে রাজা প্রতীপের পুত্র শান্তনু রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং গঙ্গা বশিষ্ঠ কর্তৃক শাপগ্রস্থ বসুগণের উদ্ধারের জন্যে মর্ত্যে শান্তনুর স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত-আদি)।

মহারাজিক—গণদেবতা; সংখ্যায় এঁরা ২৩৬।

মহাশ্বেতা—দেবী দুর্গা মহাভাব আশ্রয় করেও শ্বেত ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে এঁর এক নাম হয় মহাশ্বেতা। (দেবীপুরাণ)

মহামায়া—ব্রহ্মার দেহ হতে অর্ধ নর নারী মূর্তি প্রকাশ হয়। এই অর্ধ নারী মূর্তি ব্রহ্মার আদেশে নিজের দেহ ভাগ করে স্বাহা, স্বধা, মহামায়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা হন (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। ইনি সর্বদা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ইনি জীবগণের কামনা পূরণ করেন। এই জগৎ তাঁতেই ও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ও তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয় (দেবী ভাগবত)।

মহিষমর্দিনী—দেবী দুর্গা মহিষাসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হন। মহিষাসুরের অত্যাচারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু বললেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষজাতীয় জীবের হস্তে অবধ্য। তবে দেবতাদের তেজ হতে যদি এক পরমরূপবতী নারী সৃষ্ট হয়, তবেই তিনি মহিষাসুর বধ করতে সমর্থ হবেন। দেবতাদের মিলিত প্রার্থনায় এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ হস্তা নারী

সৃষ্টি হোলো। বিভিন্ন দেবতার তেজ হতে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি হোল। মহাদেব ত্রিশূল, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শীতঘ্নীশক্তি, পবন তূণীর ও ধনু, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডলু ও দেবতারা অন্যান্য অস্ত্র তাঁকে দান করলেন। মহিষাসুর এই মহাশক্তি-সম্পন্না নারীর সংবাদ পেয়ে তাঁকে তার সম্মুখে আনবার জন্যে দূত প্রেরণ করে অকৃতকার্য হলে সেনাপতিদের পাঠানো হোলো। তারা দেবীর হস্তে নিহত হলে মহিষাসুর নিজেই দেবীর কাছে গেল। তখন দুই জনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিছুদিন যুদ্ধের পর দেবী চক্র দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত করলেন। সেই থেকে দুর্গা মহিষমর্দিনী নামে খ্যাতা (দেবী ভাগবত)।

মহিষ্মতী—পুরাণ ও মহাভারতোক্ত একটি প্রাচীন নগর। তালজঙ্ঘের সহস্র হস্তধারী রাজা কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী। একবার রেবার জলে কার্তবীর্যার্জুন স্ত্রীদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন, তখন রাবণ এঁর বলবীর্য না জেনে এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হন (ভাগবত)। মহাভারতের সভাপর্বে লিখিত আছে, রাজসূয় যজ্ঞকালে এখানে সহদেব কর আদায়ের জন্য উপস্থিত হয়ে কর আদায় করেন।

মহিষাসুর—(১) অসুর বিশেষ। রম্ভ নামে এক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করে তাঁর কাছে ত্রিলোক-বিজয়ী এক পুত্র প্রার্থনা করায় মহাদেব সেই বর প্রদান করেন। এই বরের প্রভাবে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। কালক্রমে এই অসুর অতি দুর্দান্ত হয়। এবং দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। বিতাড়িত দেবতারা বিষ্ণুর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করলে বিষ্ণু বলেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষজাতীয় যে কোন জীবের অবধ্য। সমস্ত দেবতার তেজ হতে যদি কোন পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্ট হয় তবে তিনি মহিষাসুরকে বধ করতে সমর্থ হবেন। তখন দেবতাদের মিলিত প্রার্থনার ফলে দেবতাদের তেজ হতে এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ-হস্তা নারীর আবির্ভাব হয়। দেবগণ তাঁকে বিবিধ অস্ত্র দান করেন। মহিষাসুর এই দেবীকে বিবাহ করবার জন্য দূত পাঠায়। দূতকে তিরস্কৃত করে বিদায় দিলে মহিষাসুর দেবীকে শাস্তি দেবার জন্যে সসৈন্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দেবীর সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘোর যুদ্ধের পর দেবীর হস্তে মহিষাসুরের নিধন ঘটে (দেবী ভাগবত)।

মহিষাসুর তিনবার জন্মগ্রহণ করে। তিন বারই দেবী ত্রিবিধরূপ ধারণ করে তাকে বিনাশ করেন। মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য ভগবতী প্রথমে উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয়বারে ভদ্রকালী,

তৃতীয়বারে দুর্গারূপ ধারণ করেছিলেন। বরাহপুরাণে, মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও কালিকাপুরাণে মহিষাসুর সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

(২) রম্ভ নামক এক অসুর মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে তাঁর নিকট বর প্রার্থনা করে। মহাদেব বর দিতে চাইলে, সে বর চায়, মহাদেব যেন অজেয়, চিরায়ু এবং যশস্বী হয়ে তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব তা স্বীকার করে প্রস্থান করলেন। বর লাভ করে আনন্দিত মনে পথে যেতে যেতে রম্ভাসুর একটি অল্পবয়স্কা ঋতুমতী নারীকে দেখতে পেয়ে কামাতুর হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করলে মহিষাসুরের জন্ম হলো। এই মহিষাসুর ঘোর মায়াবী ছিল। সে একদিন স্ত্রীরূপ ধারণ করে ক্যাত্যায়ন মুনির শিষ্যদের তপোবিঘ্নের চেষ্টা করায় কাত্যায়ন একে অভিশাপ দেন, নারীর হস্তে সে নিহত হবে। এই মহিষাসুর দেবতা ও দানবদের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। এই সময় সে এক দিন স্বপ্ন দেখে যে ভগবতী ভদ্রকালী রূপ ধরে তার শিরশ্ছেদ করতে এসেছেন। সেই হতে মহিষাসুর দেবীর পূজা করতে আরম্ভ করে। একদিন দেবী তার কাছে আবির্ভূতা হোলে সে দেবীকে বলে সে যেন দেবীর সহিত সর্ব যজ্ঞে পূজিত হয় ও দেবীর পদসেবা করতে পায়। তা শুনে দেবী উত্তর করলেন, সমস্ত যজ্ঞভাগ দেবতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবে তুমি আমার পদসেবায় সর্বদা নিযুক্ত থাকবে এবং যেখানে আমার পূজা হবে, সেইখানেই তুমিও পূজা পাবে (কালিকাপুরাণ)।

মহোদর—রাবণের অনুচর। হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গিয়ে সীতার সঙ্গে পরিচিত হন। পরে সীতার কাছ থেকে এক অভিজ্ঞান নিয়ে ফেরবার সময় অশোকবন ধ্বংস করেন। রাবণ হনুমানকে দমন করবার জন্য মহোদর ইত্যাদিকে প্রেরণ করেন। এরা সকলেই হনুমানের হাতে নিহত হয় (রামায়ণ—লঙ্কা)।

মাণ্ডকর্ণি—পঞ্চাপ্সর সরোবরের সৃষ্টিকর্তা ঋষি। ইনি কেবল মাত্র বায়ু আহার করে দশ সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা আপন পদচ্যুতি আশঙ্কা করে এঁর তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য পাঁচ জন অপ্সরাকে পাঠিয়ে দেন। ঋষি এই পাঁচ জন অপ্সরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে এক সরোবরের ভিতর গুপ্তগৃহ নির্মাণ কার সুখে বাস করতে থাকেন। রাম বনবাসকালে এই সরোবরের কাছে এসে সরোবর মধ্য হতে সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, অথচ কোথাও জনপ্রাণী নাই দেখে বিস্মিত হন (রামায়ণ)।

মাণ্ডবী—দশরথের পুত্র ভরতের স্ত্রী

এবং রাজা জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা। এঁর দুই পুত্র—তক্ষ ও পুষ্কল।

মাণ্ডব্য—অণিমাণ্ডব্য দেখ।

মাতঙ্গী—(১) দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করবার জন্য মহাদেবের শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। (৩) দেবী দুর্গার এক নাম।

মাতলী—ইন্দ্রের সারথি ও সখা। মাতলি কন্যা গুণকেশীকে সুমুখ নামক নাগের সঙ্গে বিবাহ দেন। গুণকেশীর স্বামী ও মাতলির জামাতা হলে ইন্দ্র এঁকে গরুড়ের ভয় হতে রক্ষা করেন। ইন্দ্রের অনুরোধেই গরুড় এঁকে ভক্ষণ করেন নি। রাবণ-বধের দিন মাতলি ইন্দ্রের আদেশে রামকে সাহায্য করবার জন্য রথ নিয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হন। দিব্যাস্ত্র শিক্ষাকালে অর্জুনকে মাতলি রথে করে স্বর্গে নিয়ে যান। ইন্দ্রের অনুরোধে নিবাত-কবচদের বধ করবার সময় মাতলি অর্জুনের সারথ্য করেন।

মাণ্ডুকেয়—বেদব্যাস-শিষ্য পৈল ঋক্‌বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুই সংহিতা প্রণয়ন করেন এবং তা ইন্দ্র-প্রমতি ও বাস্কল নামে দুই শিষ্যকে অধ্যাপনা করান। ইন্দ্রপ্রমতি তা নিজ পুত্র মাণ্ডুকেয়কে শিক্ষা দেন।

মাতৃকাগণ—অন্ধক নামে দৈত্যের সঙ্গে মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অন্ধককে মহাদেব শূলের আঘাত করলে অন্ধকের দেহ হতে পতিত রক্তে সহস্র সহস্র অসুর সৃষ্ট হতে থাকে। এই ব্যাপার দেখে মহাদেব রুষ্ট হলেন এবং ক্রোধবশতঃ তাঁর মুখ থেকে এক অগ্নিশিখা নির্গত হোল। পরে এই অগ্নিশিখা এক দেবীরূপে পরিণত হয়। এঁর নাম হোল যোগেশ্বরী। এই যোগেশ্বরীই প্রধান মাতৃকা। ক্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরাহরূপী বিষ্ণু, কার্তিকেয় প্রত্যেকে এক একজন করে সাতটি মাতৃকা সৃষ্টি করলেন। এই অষ্ট মাতৃকা সৃষ্টি হলে এঁদের সকলের চেষ্টায় অসুররা নিহত হোল। এই মাতৃকাদের নাম—যোগেশ্বরী, মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মণী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, চক্রধারিণী ও বারাহী। ক্রমে ক্রমে মাতৃকাদের সংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল।

মাদ্রী—পাণ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী। রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীর সহিত বিবাহের পর ভীষ্ম পাণ্ডুর আর একটি বিবাহ দেবার ইচ্ছায় মদ্রদেশের বহ্লীক বংশীয় রাজা শল্যের নিকট তাঁর ভগিনী মাদ্রীকে প্রার্থনা করেন। শল্য তাঁর বংশের কুলধর্ম অনুযায়ী বহু স্বর্ণ, রত্ন, গজ ইত্যাদি পণরূপে গ্রহণ করে মাদ্রীকে দান করেন। ভীষ্ম মাদ্রীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসে পাণ্ডুর সহিত বিবাহ দেন। কিমিন্দম মুনির শাপে স্ত্রী-সঙ্গমকালে মৃত্যু হবার আশঙ্কায় পাণ্ডু ব্রহ্মচর্য পালন করে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন।

কুন্তী ও মাদ্রী ইন্দ্রিয় দমন করে তাঁর সঙ্গেই তপস্যারত হলেন। নিঃসন্তান বলে পাণ্ডুর নিকট স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হবে মনে করে পাণ্ডু কুন্তীকে সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করতে বলেন। কুন্তী পাণ্ডুকে দুর্বাসা-প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে পাণ্ডুর অনুরোধে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের সহিত সঙ্গমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। তখন মাদ্রী পাণ্ডুকে অনুরোধ করেন যে, কুন্তী ইচ্ছা করলে তাঁকেও পুত্রবতী করতে পারেন। সপত্নী বলে মাদ্রী স্বয়ং কুন্তীকে এই বিষয়ে অনুরোধ করতে সাহস করেন নি। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে যে-কোন একজন দেবতাকে আহ্বান করতে বলেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করে নকুল ও সহদেবকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে পাণ্ডু মাদ্রীর আরো পুত্রের জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করলে কুন্তী বলেন যে, মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত ; তিনি যুগ্ম দেবতাকে আহ্বান করে কুন্তীকে প্রতারিত করেছেন, সুতরাং পাণ্ডু যেন আর কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ না করেন। কিছুকাল পরে একদা বসন্তকালে নির্জনে পাণ্ডু মাদ্রীর সহিত একাকী বনবিহার-কালে সহসা মাদ্রীর রূপ-লাবণ্য দেখে ধৈর্য হারান ও মাদ্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বলপূর্বক তাঁকে আলিঙ্গন ও সঙ্গম করেন এবং কিমিন্দম মুনির অভিশাপে তখনি প্রাণত্যাগ করেন। মাদ্রীর আর্তনাদ শ্রবণে কুন্তী সেখানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা শুনে স্বামীর সহিত সহমৃতা হতে চান। মাদ্রী বলেন, তিনি স্বামীর সহবাসে অতৃপ্ত এবং কুন্তীর পুত্রদের যদি আত্মবৎ দেখতে না পারেন, তবে তাঁর লোকনিন্দা হবে। তিনি আপন পুত্রদ্বয়ের পালন ভার কুন্তীর উপর সমর্পণ করে স্বামীর সহীত সহগমন কামনায় প্রাণত্যাগ করেন। নিকটস্থ ঋষিগণ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ হস্তিনাপুরে নিয়ে যান। সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর পাণ্ডু ও মাদ্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন (মহাভারত—আদি)।

মাধবী—রাজা যযাতির কন্যা। কোন সময় বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব বিশ্বামিত্রকে বার বার গুরুদক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করায় বিশ্বামিত্র ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র একটি কর্ণ ও শ্যাম বর্ণ আট শত অশ্ব তিনি গুরুদক্ষিণা চান। গালব বিপদে পড়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করলে তাঁর সখা গরুড় তাঁকে নিয়ে নানাদেশ ঘুরে অবশেষে রাজা যযাতির কাছে উপস্থিত হন। যযাতি গালবের প্রার্থনা পুরণ করতে অপারগ হয়ে নিজের কন্যা মাধবীকে দান করেন এবং বলেন অন্য রাজারা এই কন্যার শুল্কস্বরূপ গালবকে

আট শত অশ্ব দান করবেন। মাধবীকে নিয়ে গালব অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে উপস্থিত হোলে হর্যশ্ব মাধবীর গর্ভে বসুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করে গালবকে দুই শত অশ্ব দেন। পরে এক ব্রহ্মজ্ঞ মুনির বরে মাধবী পুনর্বার কুমারী হয়ে রইলেন। এরপর গালব ক্রমে কাশীরাজ দিবোদাস ও ভোজরাজ উশীনরের কাছে মাধবীকে নিয়ে যান ও তাঁরা প্রত্যেকে দুই শত করে অশ্ব দিয়ে মাধবীর গর্ভে যথাক্রমে প্রতর্দন ও শিবিকে উৎপাদন করেন। তখন গরুড় গালবকে বলেন, প্রাচীন কালে মহর্ষি ঋচীক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এইরূপ সহস্র অশ্ব দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এইসকল অশ্ব আবার ঋচীক বরুণের কাছে পেয়েছিলেন। একদা গাধি ব্রাহ্মণদের সমস্ত অশ্ব দান করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হর্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর, প্রত্যেকে দুই শত করে অশ্ব ক্রয় করেন। অবশিষ্ট চার শত অশ্ব পথে অপহৃত হয়। সুতরাং অশ্ব আর পাওয়া যাবে না। তখন গরুড়ের পরামর্শ অনুসারে গালব বিশ্বামিত্রকে ছয় শত অশ্ব ও বাকী দুই শতের পরিবর্তে মাধবীকে দান করে বলেন, এই কন্যা তিন জন রাজর্ষির ঔরসে তিনটি ধার্মিক পুত্র প্রসব করেছে; বিশ্বামিত্র ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, পূর্বে এই কন্যাকে পেলে তিনি চারিটি বংশধর পুত্র পেতেন। যথাকালে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মাধবীর গর্ভে অষ্টক নামে এক পুত্র হোল। বিশ্বামিত্র তাকেই ধর্ম, অর্থ ও অশ্বগুলি দান করে মাধবীকে গালবের হাতে দিয়ে বনে গমন করলেন। গালব মাধবীকে যযাতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। যযাতি গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থ আশ্রমে মাধবীর স্বয়ংবর সভা করলে মাধবী সকল রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে বনবাসে ধর্ম পালন করতে থাকেন। এমন সময় যযাতি স্বর্গে গমন করেন। বহু বর্ষ স্বর্গবাসের পর অতিরিক্ত অহংকারের ফলে তিনি স্বর্গচ্যুত হয়ে সাধুজনের মধ্যে পতিত হওয়া স্থির করেন। তখন মাধবীর চার পুত্র নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করছিলেন; সেই যজ্ঞ-ধূম অবলম্বন করে যযাতি সেখানে গমন করেন। সেই সময় মাধবীও সেখানে এসে পিতাকে প্রণাম করেন ও তাঁর দৌহিত্রদের পরিচয় দেন। গালবও অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হন। প্রত্যেকেই তাঁদের তপস্যার অংশ দিয়ে যযাতিকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন (মহাভারত—উদ্‌যোগ)।

মানসপুত্র—মন হতে উৎপন্ন পুত্র। ব্রহ্মার সাত কিম্বা দশ জন মন হতে জাতপুত্র। এই মানসপুত্র হতেই পৃথিবীর মানবজাতির জন্ম। এই দশ জন মানস পুত্রকে প্রজাপতি বলা

হয়; যেমন মারিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা দক্ষ, ভৃগু এবং নারদ। কোন কোন মতে ৭ জন প্রজাপতি ছিলেন। এঁদের সপ্তর্ষি বলা হয়; শতপথব্রাহ্মণে এঁদের নাম এই রূপ—গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ এবং অত্রি। এই সপ্তর্ষিদের এখন আকাশে তারকারূপে দেখা যায়।

মান্ধাতা—সূর্য বংশের রাজা যুবনাশ্বের পুত্র। অপুত্রক রাজা যুবনাশ্ব পুত্র-কামনায় মুনিদের আশ্রমে যোগ সাধন করতে থাকেন। কালক্রমে মুনিরা এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুত্র উৎপাদনের জন্য যজ্ঞারম্ভ করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ নিবৃত্ত হলে মুনিরা মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলসী বেদীর উপরে রেখে নিদ্রা যান। স্থির ছিল যে, এই কলসীর জল যুবনাশ্বের স্ত্রী পান করলে পুত্র উৎপাদন হবে। রাজা যুবনাশ্ব পিপাসায় কাতর হয়ে মন্ত্রপূত জল নিজেই পান করে ফেললেন। মুনিরা জাগ্রত হয়ে দেখেন কলসী জলশূন্য। যুবনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনে মুনিরা বললেন—আপনার পুত্রোৎপত্তির জন্যই এই তপঃসিদ্ধ জল রেখেছিলাম। জল পানের ফলে আপনিই পুত্র প্রসব করবেন; কিন্তু গর্ভ ধারণের ক্লেশ হতে মুক্তি পাবেন। শতবর্ষ পূর্ণ হলে যুবনাশ্বের পার্শ্ব ভেদ করে এক সূর্যতুল্য তেজস্বী পুত্র নির্গত হলো। কিন্তু মাতৃ-স্তন অভাবে পুত্র কি পান করে জীবিত থাকবে—রাজা এই কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময় ইন্দ্র সেখানে এসে বললেন, এই বালক আমাকে ধারণ করবে। "ধাস্যতি মাময়ং" অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকবে। এই কারণে এঁর নাম হোল মান্ধাতা। ইন্দ্র তখন বালকের মুখে নিজের অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে দিলে বালক সেই অঙ্গুলি চুষতে লাগলো। মান্ধাতা পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী জয় করতে বের হলেন। সুমেরু পর্বতে রাবণের সঙ্গে এঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরস্পরের বলবীর্য সমান হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হোল। অবশেষে মান্ধাতা স্বর্গরাজ্য জয় করতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে বলেন, এখনো তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারেন নি। সমস্ত পৃথিবী জয় করবার পর তিনি যেন স্বর্গরাজ্য জয়ের চেষ্টা করেন। তখন মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবীতে এমন কে আছে যে তাঁর আধিপত্য অস্বীকার করে? তখন ইন্দ্র বললেন, মধুর পুত্র লবণাসুর এখনও তাঁর অধীন হয় নাই। তখন মান্ধাতা মধুর পুত্র লবণের সহিত যুদ্ধ করতে গিয়ে লবণের হস্তে নিহত হন। মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে পুরুকুৎস,

অম্বরীষ, মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও ৫টি কন্যা জন্মগ্রহণ করে (বিষ্ণু-পুরাণ)।

মায়াবতী—মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে কামদেব ভস্মীভূত হলে স্ত্রী রতি শোকান্বিতা হয়ে এক দৈববাণী শুনতে পেলেন। কামদেব কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে শম্বরাসুরের গৃহে বাস করবেন। রতি মায়াবতী নাম গ্রহণ করে শম্বরপুরে বাস করতে আদিষ্ট হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এদিকে কামদেব প্রদ্যুম্নরূপে কৃষ্ণের ঔরসে ও রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মের ষষ্ঠ দিবসে শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে হরণ করে সাগরে ফেলে দিলে এক মৎস্য ঐ শিশুকে উদরস্থ করে। তারপর ঐ মৎস্য এক ধীবরের জালে ধৃত হয়ে শম্বরের গৃহে আনীত হয়। সেখানে মৎস্যের উদর হতে প্রদ্যুম্ন বের হোলে মায়াবতী তাঁকে পালন করতে লাগলেন। পরে প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। এরপর প্রদ্যুম্ন শম্বরকে বধ করে মায়াবতীকে নিয়ে দ্বারকায় পিতৃ-ভবনে ফিরে আসেন (বিষ্ণুপুরাণ)।

মায়াবী—দুন্দুভি অসুরের পুত্র। স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারে বালীর সঙ্গে দুন্দুভির শত্রুতা হয় এবং বালী তাকে বধ করেন। দুন্দুভি-হত্যাকারী বানররাজ বালীকে বধ করবার জন্য এই অসুর কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হয়। বালী এর দিকে ধাবিত হোলে অসুর প্রাণভয়ে পলায়ন করে ভূ-বিবরে প্রবেশ করে। বালী এর অনুসরণে সেখানে প্রবেশ করে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তাকে বধ করেন। অন্যত্র উল্লিখিত আছে, ময়দানবের দুই পুত্র দুন্দুভি ও মায়াবী এবং এক কন্যা মন্দোদরী।

মায়াসীতা—(১) ইন্দ্রজিৎ একটি মায়াময়ী সীতার মূর্তি রথে স্থাপন করে যুদ্ধস্থলে বানর সেনাদের প্রতারিত করেছিলেন। তিনি এই মায়াসীতার কেশাকর্ষণ করে সকলের সমক্ষে প্রহার করেন। সেই মায়াময়ী মূর্তিও রামকে দেখে আর্তনাদ করতে থাকে। অবশেষে সকলের সমক্ষে ইন্দ্রজিৎ খড়্গাঘাতে মায়াসীতাকে বধ করেন। এতে বানরগণ এবং রাম ও লক্ষণ শোকে মুহ্যমান হওয়াতে বিভীষণ সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হবার জন্য ইন্দ্রজিৎ এই ভাবে যজ্ঞের বিঘ্ন সম্ভাবনা দূর করবার জন্য সকলকে প্রতারিত করেছেন। এর পরই লক্ষ্মণ ও বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য নিকুম্ভিলা-যজ্ঞস্থলে যাত্রা করেন (রামায়ণ—যুদ্ধকাণ্ড)।

(২) মায়াকল্পিতা সীতা। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের সময়ে অগ্নি প্রকৃত সীতাকে নিয়ে গিয়ে মায়া সীতাকে রেখে গিয়েছিলেন। পরে সীতার

অগ্নিপরীক্ষার সময় তিনি সীতাকে ফিরিয়ে দেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

মারীচ—হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দ অসুরের ঔরসে ও তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে এর জন্ম হয়। এ রাবণের অনুচর। মারীচ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। তখন বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় দশরথ এই রাক্ষসকে বিনাশ করবার জন্যে রামকে বনে পাঠিয়ে দেন। বিশ্বামিত্র সহ রাম বনে গমন করলে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মারীচ ভীষণ উৎপাত করতে থাকে। তখন রাম মানবাস্ত্র সন্ধান করে মারীচকে শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন। পরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে গমন করলে দণ্ডকারণ্যে মৃগরূপধারী দুই রাক্ষসের সঙ্গে মারীচ ঋষি-হত্যা করে তাঁদের রক্তমাংস ভোজন করেন। এমন সময় রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে দেখে পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে মারীচ প্রতিশোধের ইচ্ছায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গী মৃগরূপে তাঁদের আক্রমণ করে। রাম তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলে মারীচ কোন মতে প্রাণরক্ষা করে; কিন্তু অপর দুই রাক্ষস বিনষ্ট হয়। সেই হতে মারীচ তপস্বীবেশে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে থাকে। সীতাহরণ কালে রাবণ মায়াবী মারীচের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে বলেন। মারীচ রামের বিক্রম জেনে অসম্মত হন। রাবণ তাকে অর্ধরাজ্যের লোভ দেখান এবং অসম্মত হোলে হত্যা করবার ভয় দেখান। মারীচ অবশেষে রামের হস্তেই মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতার অনুরোধে রাম তাকে ধরতে গেলে মারীচ রামকে ভুলিয়ে বহুদূরে নিয়ে যায়। তাকে ধরতে অসমর্থ হয়ে রাম শরাঘাতে তাকে বধ করেন। মৃত্যুকালে সে রামের স্বর অনুকরণ করে আর্তনাদ করেছিল (রামায়ণ)।

মারিষা—কণ্ডু ঋষির কন্যা। পুরাকালে কণ্ডু নামে এক ঋষি ভীষণ তপস্যায় রত ছিলেন। এঁর তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হয়ে তপোভঙ্গের জন্য প্রম্লোচ্চা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। প্রম্লোচ্চা কণ্ডু মুনির তপোভঙ্গ করতে সমর্থ হয়। বহু শতাব্দী ধরে এই অপ্সরার সঙ্গে বাস করার ফলে এঁর মনে বিতৃষ্ণা এলে ইনি প্রম্লোচ্চাকে বিতাড়িত করলেন। এই অপ্সরা আকাশ পথে যেতে যেতে তার স্বেদ মার্জনা করল। তা বৃক্ষের পত্র থেকে পত্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কণ্ডু ঋষি এই অপ্সরার যে গর্ভ সঞ্চার করেছিলেন, তা স্বেদরূপে রোমকূপ দিয়ে নির্গত হোল। স্বেদসিক্ত বৃক্ষরা সেই গর্ভ গ্রহণ করলো এবং বায়ু তা একত্র করলো। এর ফলে এক কন্যার

জন্ম হোল। এই কন্যার নাম মারিষা। এঁর গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণুপুরাণ)।

মার্কণ্ডেয়—মৃকণ্ড মুনির পুত্র। এঁর স্ত্রীর নাম ধূম্রাবতী। ধূম্রাবতীর গর্ভে বেদশিরা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর আরাধনা করে চিরজীবী হন।

নৃসিংহ পুরাণে মার্কণ্ডেয়ের দীর্ঘ জীবন লাভের বৃত্তান্ত এইরূপ—জন্ম হলে মৃকণ্ড জানতে পারেন তাঁর পুত্রটি ১২ বৎসর বয়সে মৃত হবে। মার্কণ্ডেয়ের পিতামাতা এতে সর্বদা অতিশয় ম্রিয়মাণ হয়ে থাকতেন। মার্কণ্ডেয় তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদ জেনে পিতাকে শোক করতে বারণ করে বললেন, তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন। এই বলে মার্কণ্ডেয় বনে গিয়ে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন এবং তপোবলে মৃত্যুকে জয় করে চিরজীবী হলেন।

পদ্ম পুরাণে আছে—মৃকণ্ড পুত্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হবে জেনে শীঘ্রই মার্কণ্ডেয়ের উপনয়ন দিয়ে তাঁকে ঋষিদের প্রণাম করতে বললেন। তখন সপ্তর্ষিরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে 'চিরায়ু হও' বলে আশীর্বাদ করার পর তাঁরা এঁর অল্পায়ু জানতে পারলেন। তখন তাঁরা মার্কণ্ডেয়কে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মার বরে মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মার পরমায়ু পেলেন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করে ঘরে ফিরে এলেন।

মার্তণ্ড—দৈত্য-দানবরা জোর করে ত্রিভুবনের ও দেবতাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করলে দেবমাতা অদিতি সূর্যকে আরাধনা করে সূর্যতেজময় গর্ভ ধারণ করেন। পরে অদিতি শুচি হয়ে গর্ভ ধারণের জন্যে চন্দ্রায়ণ ব্রতাদি গ্রহণ করলে কশ্যপ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—কোন্ উপবাস করে গর্ভাণ্ড বধ কর? কশ্যপের এই কথা শুনে অদিতি ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ গর্ভপাত করে বলেন—এই দেখ, আমি গর্ভবধ করি নাই। এই কশ্যপ কথিত "মারিত গর্ভাণ্ড" হতে মার্তণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন বলে এঁর নাম হোল মার্তণ্ড (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

মৃত্যু—ব্রহ্মার ক্রোধজাত দেবী। প্রাণী সৃষ্টির পর ব্রহ্মা তাদের সংহারের উপায় ভাবতে থাকেন। তাঁর ক্রোধ হতে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সমস্ত জগৎ দগ্ধ হতে থাকে। তখন প্রজাদের রক্ষার্থ মহাদেব ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করলেন এবং ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী ভারার্ত হলে প্রাণী সংহারের জন্য অনুরোধ করার কোন উপায় না দেখে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁর নিজের দেহেই তাঁর ক্রোধাগ্নি ধারণ করলেন। তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার থেকে পিঙ্গলবর্ণা, রক্তনয়না, রক্তাননা স্বর্ণ-

কুণ্ডলধারিণী মৃত্যুদেবী আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা তাঁকে সকল প্রাণী সংহারে নিয়োজিত করতে চান। মৃত্যু বলেন, তিনি নারী; সুতরাং তিনি এই ক্রূর কর্ম করতে পারবেন না। ব্রহ্মা তাঁকে আদেশ দিলেও তিনি অসম্মতা হয়ে ধেনুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে এলে মৃত্যু তখন বলেন, তিনি সুস্থ প্রাণীকে বধ করতে চান না। তিনি স্বয়ং আর্ত ও ভীত হয়ে ব্রহ্মার নিকট অভয় প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলেন, এতে মৃত্যুর কোন অপরাধ হবে না। সনাতন ধর্মই তাঁকে পবিত্র রাখবেন। যম এবং ব্যাধি সকলই তাঁকে সাহায্য করবেন। ব্রহ্মা ও দেবগণের বরে তিনি নিষ্পাপ ও খ্যাতিসম্পন্ন হবেন। মৃত্যু তখন ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য করে বলেন যে লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, দ্রোহ, মোহ, অলজ্জা ও পুরুষ আচরণ ইত্যাদি দোষ দেহে বিদ্ধ হলেই তিনি সংহার করেন। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলে বললেন, মৃত্যুর যে অশ্রুবিন্দু ব্রহ্মার হাতে পড়েছিল তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণী সংহার করবে, মৃত্যুর কোন অধর্ম হবে না (মহাভারত—দ্রোণ)।

মালী—রাক্ষসরাজ সুকেশের মাল্যবান, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মে। বসুদা নামে এক গন্ধর্বকন্যা মালীর স্ত্রী ছিল। বসুদার গর্ভে মালীর অমল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চার পুত্র হয়। মাল্যবান, সুমালী ও মালী বিভীষণের অমাত্য ছিল। এই তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার বরে শক্তিশালী হয়ে সকলের উপর অত্যাচার করে। দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু যুদ্ধে মালীকে বধ করেন এবং অন্য দুই ভ্রাতা পলায়ন করে (রামায়ণ—উত্তর)।

মালিনী—এই নদী হিমালয়ের নিকট প্রবাহিত। এরই তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ছিল। এখানে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়।

মাল্যবান—এক রাক্ষস। গ্রামণী নামে গন্ধর্বের কন্যা বেদবতীর গর্ভে এবং সুকেশ রাক্ষসের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে। মাল্যবানের ভ্রাতা সুমালী ও মালী। এই সুমালীর কন্যা নিকষা। ঋষি পুলস্ত্যের পুত্র মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে ও নিকষার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করেন। মাল্যবান, মালী ও সুমালী সুমেরু পর্বতে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী, প্রভুত্বশালী ও পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং ত্রিলোকের উপর উৎপীড়ন করতে থাকে। এদের অনুরোধেই বিশ্বকর্মা ত্রিকূট পর্বতের উপর লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেন। নর্মদা নামে এক গন্ধর্বীর তিন কন্যার এক কন্যা সুন্দরীকে মাল্যবান বিবাহ করেন।

অপর দুই কন্যা কেতুমতী ও বসুদাকে সুমালী ও মালী বিবাহ করেন। মাল্যবান ও সুন্দরীর বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতি পুত্র হয়। এই তিন ভ্রাতার উৎপাতে প্রতিকার প্রার্থনায় দেব ও ঋষিগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হন। নারায়ণ এদের বধ করতে স্বীকার করেন। তখন মাল্যবান, মালী ও সুমালী সসৈন্যে দেবতাদের আক্রমণ করে। সে সময় দেবতাদের রক্ষার্থ নারায়ণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। মালী নিহত হয় এবং মাল্যবান ও সুমালী লঙ্কা ত্যাগ করে সস্ত্রীক পাতালে আশ্রয় নেয়। লঙ্কা-যুদ্ধের সময় মাল্যবান রাবণকে সদুপদেশ দিয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে বলে ; কিন্তু রাবণ তাহা প্রত্যাখান করেন।

মিত্রাবরুণ—ঋগ্বেদের বহু সূক্তে মিত্র ও বরুণের স্তুতি লিখিত হয়েছে। মিত্র একাকী মাত্র একটি সূক্তে ও বরুণ বারোটি সূক্তে স্তুত হয়েছেন ; কিন্তু মিত্র ও বরুণ একত্র বহু সূক্তে স্তুত হয়েছেন। মিত্রাবরুণ যুবা, নিত্য তরুণ, উজ্জ্বল-পরিচ্ছদধারী। সূর্য এঁদের চক্ষু, সূর্যকিরণ-রূপ অস্ত্রে এঁরা তাড়না করেন। এঁরা রথারূঢ়। মিত্র দিবসের এবং বরুণ রাত্রির দেবতা—অর্থাৎ মিত্র আলোকের দেবতা ও বরুণ আবরণের দেবতা। মিত্র সূর্যোদয়ের আগে আলোকের বিকাশ—এই আলোক পাপ, অসত্য ও অন্ধকার দূর করে। ইনিই বৈদিক মিত্র। আবরণকারী আকাশকে আর্যরা বরুণ নামে পূজা করতেন। ঋগ্বেদ আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতে বরুণের অবস্থিতি কল্পনা করেন।

এঁরা সম্রাট্, শাসক, রক্ষক, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর ধারণকর্তা। এঁরা অসুর, এঁদের মায়ায় জগৎ শাসিত হয়। মায়াশক্তিতে এঁরা উষাকে প্রেরণ করেন, সূর্যকে আকাশে বিচরণ করান এবং মেঘ বৃষ্টি দ্বারা সূর্যকে আবৃত করেন। মিত্রাবরুণ নদীর পরিচালক, বৃষ্টিকর্তা। মিত্রাবরুণ ধর্ম ও নিয়মের (ঋত) রক্ষক ও পালক। এঁদের স্থির নিয়ম অমর দেবতাদেরও পরিবর্তন করবার শক্তি নাই।

পুরাণে এই দুই জনের উল্লেখ অনেক স্থলেই আছে। এঁরা একত্র মিত্রাবরুণ নামে পরিচিত বা উল্লিখিত আছেন। উর্বশীর গর্ভে মিত্র হতে বশিষ্ঠ ও বরুণ হতে অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রাবরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম।

মিথি—রাজা নিমির পুত্র। রাজা নিমি অপুত্রক ছিলেন। বশিষ্ঠ-শাপে চেতনাশূন্য নিমিদেহ মুনিরা যজ্ঞভূমিতে অরণি রূপ কল্পিত করে মন্ত্রহোম দ্বারা মন্থন করতে লাগলেন। সেই মন্থন হতে এক পুত্রের জন্ম হয়।

মন্থন হতে জাত বলে এঁর নাম মিথি। জনন হতে জন্ম বলে এঁর আর নাম জনক। এবং বিদেহ (অর্থাৎ বিগত দেহ) হতে জন্ম বলে এর অন্য নাম বিদেহ (রামায়ণ)।

মিথিলা—প্রাচীন রাজ্য ও বিদেহের (উত্তর বিহার) রাজধানী। রাজা জনকের নগর বলে প্রসিদ্ধ। অন্য নাম বিদেহ। এই জন্য মিথিলার রাজকন্যার নাম মৈথিলী বা বৈদেহী। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের সময় রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে এখানে এসেছিলেন।

মুচুকুন্দ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। ইনি বীরপুরুষ ছিলেন। দেবতাদের সেনাপতি হয়ে দেবাসুরের যুদ্ধে ইনি অসুরদের ধ্বংস করেন। দেবতারা প্রীত হয়ে এঁকে বর দিতে চাইলে মুচুকুন্দ বর চাইলেন, যে ব্যক্তি তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত করে তাঁর সম্মুখে পড়বে তার প্রতি তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করামাত্র সে ভস্মে পরিণত হবে। দেবতাদের নিকট এই বর পাবার পর তিনি হিমালয় পর্বতের গুহায় নিদ্রিত হলেন। বহু যুগ নিদ্রায় গত হোল। এদিকে পরাক্রান্ত যবনরাজ কালযবন যাদবদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তখন যাদবরা ভীত হয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় গমন করে। শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে বিনাশ করবার জন্যে মথুরায় আসেন। কালযবন কৃষ্ণের সম্মুখীন হলে কৃষ্ণ পলায়নের ছলে হিমালয়ের যে গুহায় মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ নিদ্রিত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন এবং অলক্ষ্যে তাঁর মাথার দিকে লুকায়িত থাকেন। কালযবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে মুচুকুন্দের গুহায় প্রবেশ করে ও নিদ্রিত মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ মনে করে পদাঘাত করতে থাকে। মুচুকুন্দ জাগরিত হয়ে কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র মুচুকুন্দের নেত্রাগ্নিতে সে ভস্মীভূত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে মুচুকুন্দকে বর দিলেন, তিনি উর্ধ্বলোকে যদৃচ্ছা বিচরণ করতে পারবেন এবং সর্ব প্রকার স্বর্গীয় আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করতে পারবেন (হরিবংশ)।

মুণ্ড—দানবরাজ শুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই সেনাপতি ছিল। এরা প্রায়ই দুই জন একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতো। দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধের সময় শুম্ভের আদেশে ধূম্রলোচনের মৃত্যুর পর এরা দুই জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং দেবীর হস্তে নিহত হয়। চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত করে দেবী 'চামুণ্ডা' নাম প্রাপ্ত হন।

মুদগল—কুরুক্ষেত্রবাসী এক ধর্মাত্মা উঞ্ছবৃত্তিধারী মুনি। ইনি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে প্রতি পক্ষে এক দিন আহার করতেন এবং প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যজ্ঞ করতেন। অতিথিদের এক দ্রোণ

অন্ন দিতেন। তার অবশিষ্ট অন্ন অতিথি দেখলেই বৃদ্ধি হত। এক দিন দুর্বাসা তাঁর অতিথি হন। মুদ্গল তাঁকে অন্ন দিলে তিনি সমস্ত ভোজন করে দেহে উচ্ছিষ্ট অন্ন মেখে চলে যান। দুর্বাসা পর পর ছয়টি পর্ব দিনে এসে সমস্ত অন্ন খেয়ে যান। মুদ্গল নির্বিকারে অনাহারে থাকেন। এতে প্রীত হয়ে দুর্বাসা বলে যান, মুদ্গল সশরীরে স্বর্গে যাবেন। তখন দেবদূত মুদ্গলকে নিয়ে যাবার জন্য দৈব বিমান নিয়ে এলেন। মুদ্গল দেবদূতকে স্বর্গবাসের দোষগুণ বর্ণনা করতে বললে দেবদূত স্বর্গবাসের বিবিধ সুখের কথা বলে দোষ হিসাবে বলেন, স্বর্গে কৃতকর্মের ফল ভোগ হয়; কিন্তু নূতন কর্ম করা যায় না। অপরের সম্পদে অসন্তোষ হয় এবং কর্মক্ষয় হলে পৃথিবীতে আবার পতন হয়। মুদ্গল তখন দেবদূতকে বিদায় দিয়ে বলেন, যে অবস্থায় লোকে শোকদুঃখ পায় না বা পতিত হয় না—সেই কৈবল্যই তাঁর কাম্য। এই বলে তিনি জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন। ইনি মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ (মহাভারত—বন)।

মুরু—এক ভীষণ রাক্ষস; এর সাত হাজার পুত্র ছিল। প্রাক্‌জ্যোতিষের রাক্ষস রাজা নরক এর বন্ধু ছিল। এই রাক্ষস তার বন্ধু রাক্ষসরাজের রাজধানী শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণ হতে রক্ষা করবার জন্য সাহায্য করে। এই রাক্ষস সহচরের চারিদিকের গণ্ডী তরোয়ালের মত তীক্ষ্ণ দড়ি দিয়ে জড়িয়ে রাখে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আক্রমণ করে চক্র দ্বারা সমস্তই টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেন এবং সাত হাজার পুত্রকে পতঙ্গের মত আগুনে দগ্ধ করেন। এবং মুরুকে হত্যা করেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মুরারী।

মেঘনাদ—রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের এক নাম। লঙ্কার যুদ্ধে ইনি দুইবার রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। পরে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। ইন্দ্রজিৎ দেখ (রামায়ণ)।

মেনকা—প্রসিদ্ধা অপ্সরী, শকুন্তলার জননী। ইন্দ্রের আদেশে মেনকা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেন ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র তপস্যার জন্য গমন করেন এবং মনকাও শিশু কন্যাকে নদীতীরে ত্যাগ করে প্রস্থান করেন।

মেনা—ইনি উমার মাতা ও হিমালয়ের স্ত্রী। যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করতেন সেই সময় মেনকা সতীর সখী ছিলেন। তারপর সতী যখন দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করেন তখন মেনকা কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন—যেন সতী তাঁর কন্যা হয়ে আবার জন্মগ্রহণ

করেন। এখন ভগবতী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি বর চাইলেন—তাঁর যেন একশত পুত্র ও একটি কন্যা হয়। দেবী বললেন—তাই হবে এবং আমি তোমার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করবো। বর লাভের পর মৈনাক প্রভৃতির জন্ম হয় এবং সতী জন্মগ্রহণ করেন (কালিকা পুরাণ)।

মেরু—পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থানে অবস্থিত পর্বত, যার উপর ইন্দ্রের স্বর্গ অবস্থিত। দেবতাদের আবাসস্থান। মেরু অন্য নামেও পরিচিত; যেমন সুমেরু, হিমাদ্রি ইত্যাদি।

মেরু-সাবর্ণ—নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মনুদের এই নাম। কথিত আছে, এই মনুরা দক্ষের এক কন্যার গর্ভে দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম ও রুদ্র কর্তৃক মেরু পর্বতে প্রসূত হয়। এই জন্যই হয়তো এঁরা মেরু নামে বর্ণিত।

মৈত্রেয়—জনৈক ঋষি। ইনি কাম্যকবনে তীর্থ পর্যটন করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই সময় বিদুরকে নির্বাসিত করেন ও পরে অনুতপ্ত হয়ে ফিরিয়ে আনেন। ধৃতরাষ্ট্রের অস্থির মতির কথা জ্ঞাত হয়ে ব্যাস ও মৈত্রেয় পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করতে নিষেধ করলেন। দুর্যোধন কোন উত্তর না দিয়ে আপন উরুতে চপেটাঘাত করে মৈত্রেয়কে উপেক্ষা করেন। এতে মৈত্রেয় ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, গদাযুদ্ধে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন (মহাভারত—বন)।

মৈত্রেয়ী—যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। এঁর অন্য স্ত্রীর নাম কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। ব্রহ্মবিদ্যা অনুসরণ করে স্বামীর পথ অবলম্বন করতেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী কাত্যায়নী ছিলেন সাধারণ গৃহিণীর মত সতীসাধ্বী; কিন্তু ধর্মচর্চায় লিপ্ত ছিলেন না। কাত্যায়নী কেবলমাত্র গার্হস্থ্য জীবনেই নিরত ছিলেন। মৈত্রেয়ী সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যারও অনুশীলন করতেন। তাঁর জ্ঞানার্জন স্পৃহা ছিল অদম্য। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার আশ্রম ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। সংসার ত্যাগ করবার পূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য দুই স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে আমি এখন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করছি। সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের অনুমতি পেলে আমি তোমাদের দুই জনের মধ্যে আমার সমস্ত অর্থসম্পদ বণ্টন করে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে চলে যাব। মৈত্রেয়ীর সমস্ত অন্তর এতে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, "পৃথিবীর সমস্ত ধন ও অর্থ যদি আমার হয়, তবে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারবো"? "কথং তেন অমৃতা স্যাম?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, ধনী লোকের জীবন যেমন,

তোমার জীবনও সেই রকম হবে। বিত্ত দ্বারা কখনো অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বললেন—মানুষ পার্থিব ভোগসুখের ফেনপুঞ্জের সঙ্গে মিশে গেলে তার অমৃতের মধুর আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নাই; কারণ, মানুষ মরণশীল। সেই চির নিশ্চিত মৃত্যু এসে মানুষের সকল ভোগসুখের উপর যবনিকা পাত ঘটায়। তাই বিত্তদ্বারা কখনই অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই।

এই দার্শনিক সত্য উপলব্ধি করার পর মৈত্রেয়ী স্তব্ধ হয়ে ভাবলেন—বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই, মৃত্যু তাঁকে মুক্তি দান করবে না। তাঁর কাছে ধন তুচ্ছ, বিত্ত তুচ্ছ, তুচ্ছ এই গৃহসংসার যদি অমৃতত্বের সন্ধান না পাওয়া যায়; যে মোহজালে পতিত মানুষের পরম সত্য লাভ হয় না,—তাই ভেবে মোহের আকর্ষণ তিনি মুহূর্ত মধ্যে ত্যাগ করলেন। তারপর মৈত্রেয়ী স্বামীর যাত্রাকালে জিজ্ঞাসা করলেন, "যে নাহং নাহমৃতা স্যাং; কিমহং তেন কুর্যাম্।" যাতে আমি অমৃত হব না, তা দিয়ে আমি কি করব? তাই তিনি স্বামীকে অমৃতের সন্ধান দিতে বললেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য সমস্তই ভুলে গেলেন—ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন না, তখন তিনি স্ত্রীর কাছে এই অমৃতের, এই অমরত্বের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

মৈথিলী—মিথিলার রাজকন্যা সীতা মৈথিলী নামে খ্যাতা ছিলেন।

মৈনাক—(১) কৈলাসের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বত। হিমাবতের এবং মেনকার পুত্র বলে এই নাম। পূর্বকালে পর্বতের পাখা থাকতো। পাখীর মত তারা চারিদিকে আকাশপথে ভ্রমণ করতো। দেবতারা ও ঋষিরা এই পর্বতদের সর্বদা ভয় করতেন। ইন্দ্র একবার ক্রুদ্ধ হয়ে সকল পর্বতের পক্ষ ছেদ করেছিলেন; কিন্তু মৈনাক পবনদেবের সাহায্যে সাগরে আশ্রয় গ্রহণ করে ইন্দ্রের আক্রমণ হতে রক্ষা পান। হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের সময় পবনদেবের উপকারের কথা স্মরণ করে তাঁর বিশ্রামের জন্য মৈনাক জল থেকে উত্থিত হয়ে হনুমানকে তাঁর উপর বিশ্রাম করতে বলেন। হনুমান তাঁকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যান (রামায়ণ—সুন্দর)।

য

যক্ষ—দেবযোনি বিশেষ। এরা কুবেরের অনুচর এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; মুখ বিকৃতাকার ও পিঙ্গলাক্ষ। বৃহৎ উদর, কেহ বা স্ফটিকবর্ণ, রক্তবেশ ও দীর্ঘস্কন্ধ। এদের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে, ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির কাছে নিযুক্ত থাকার সময় অতিশয়

ক্ষুধার্ত হন এবং ক্রোধের বশে অন্ধকারের মধ্যেই প্রজা সৃষ্টি করতে থাকেন। এর ফলে অন্ধকারের মধ্যে বিকৃতরূপ ক্ষুধার্ত প্রজার সৃষ্টি হোল। তাদের মধ্যে কেহ ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে কয়েক জন প্রজা এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে। প্রজাদের মধ্যে যারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তারা হোল যক্ষ, আর যারা নিষেধ করেছিল (রক্ষতাং) তারা হোল রাক্ষস (পদ্ম পুরাণ)।

অবশ্য, এদের জন্ম সম্বন্ধে আরো অন্য কাহিনী আছে। এরা বিশেষ কোন গুণসম্পন্ন না হলেও দোষশূন্য।

রামায়ণে কথিত আছে—ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন। তারপর সেই জল রক্ষার জন্যে প্রাণীদের সৃষ্টি করলেন; সেই প্রাণীদের মধ্যে কেহ কেহ বললে—যক্ষামঃ, অর্থাৎ আমরা পূজা করব। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, যারা তোমাদের মধ্যে যক্ষামঃ বলেছ, তারাই যক্ষ হবে। অন্য একদল প্রাণী বললে—রক্ষামঃ, অর্থাৎ জল রক্ষা করব। ব্রহ্মার আদেশে এরা হোল রাক্ষস। যক্ষরা সাধারণতঃ মানুষের বন্ধু ও কুবেরের ভৃত্য আর রাক্ষসরা মানুষের শত্রু।

যজ্ঞ—(১) আর্য জাতির প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান যজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য দান করার নাম যজ্ঞ। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি মুখ্যতঃ যজ্ঞের বিবরণে পরিপূর্ণ। কোন যজ্ঞে কি অনুষ্ঠান কর্তব্য, তা ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিবৃত আছে। ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি বৈদিক দেবতার উদ্দেশে কোন না কোন দ্রব্য ত্যাগ করা হোত। ত্যাগ কর্মের নাম আহুতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হোত, তার নাম হব্য। নানাবিধ দ্রব্য হব্য রূপে দেওয়া হোত। যেমন—ঘৃত, চরু বা পায়সান্ন, দুগ্ধ, দধি, পুরোডাশ বা রুটি, পশু মাংস, সোমলতার রস ইত্যাদি। এই দ্রব্য-ত্যাগের নাম যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ অনুষ্ঠিত হোত, তিনি যজমান। যিনি যজমানের হিতার্থে এই যাগকর্ম সম্পাদন করতেন তিনি যাজক বা ঋত্বিক্। যাগকর্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক করতে হোত। প্রত্যেক কর্মেরই নির্দিষ্ট মন্ত্র ছিল।

(২) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতমা কন্যা কাকুতি প্রজাপতি রুচির স্ত্রী ছিলেন। কাকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। যজ্ঞ নিজের ভগিনী দক্ষিণাকেই বিবাহ করেন। দক্ষিণার গর্ভে যম নামে খ্যাত দ্বাদশ জন পুত্র জন্মে। (বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, গরুড়পুরাণ)

যজুর্বেদ—শত শাখাযুক্ত বেদ। এতে যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রসমূহ ও নিয়ম পালনের

বিষয় আছে। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ি সংহিতা নামেও অভিহিত। যজুর্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ। শুক্লের শতপথব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। "যে মন্ত্রের অক্ষরে চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, তাহা যজুঃ অর্থাৎ একালে যাহাকে গদ্য বলে, তারাই যজুঃ।"—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

যবক্রীত—ইনি ভরদ্বাজ নামক এক তপস্বীর পুত্র। ভরদ্বাজের প্রতিবেশী ও সখা রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্র অর্বাবসু ও পরাবসু পরম বিদ্বান্ ছিলেন; আর ভরদ্বাজ শুধু তপস্বী ছিলেন এবং অধ্যয়ন না করে তিনি বেদ-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্মণরা ভরদ্বাজকে সম্মান করতেন না, কিন্তু রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্রকে সম্মান করতেন দেখে ভরদ্বাজ-পুত্র যবক্রীত কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে বেদবিদ্যা লাভ করবার জন্য যবক্রীত চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে ইন্দ্র ভীত হয়ে তাঁকে গুরুর কাছে বেদবিদ্যা শিক্ষা করতে বললেন। যবক্রীত ইন্দ্রের কথা না শুনে তপস্যা করতে লাগলেন। তখন ইন্দ্র অতি জরাগ্রস্ত যক্ষ্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরে গঙ্গা তীরে এসে বার বার বালুকামুষ্টি গঙ্গায় ফেলতে লাগলেন। এই দেখে যবক্রীত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি নিরর্থক কি করছেন? এর উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি যেমন বেদজ্ঞ হবার আশায় বৃথা তপস্যা করছ, আমিও তেমনি বালুকা দিয়ে গঙ্গায় সেতু বাঁধতে চেষ্টা করছি। তখন যবক্রীত ইন্দ্রের নিকট বিদ্বান্ হবার বর প্রার্থনা করলেন। তখন ইন্দ্র পিতা-পুত্রকে বেদজ্ঞ হবার বর দান করলেন। পিতাকে এই বর লাভের বিষয় জানালে, পিতা যবক্রীতকে বললেন, অভীষ্ট বর পেয়ে তুমি অহঙ্কারী ও ক্ষুদ্রমনা হবে, ফলে তোমার মৃত্যু হবে। এরপর একদিন যবক্রীত পরাবসুর পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কামনা করলেন। পরাবসুর স্ত্রী ভয় পেয়ে সেখানে থেকে পালিয়ে যান। এই সংবাদ পেয়ে রৈভ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুইগাছি জটা ছিন্ন করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এক সুন্দরী নারী ও এক রাক্ষস সৃষ্টি করেন। রৈভ্য তাদের আদেশ দিলেন, যবক্রীতকে বধ কর। তখন সেই নারী যবক্রীতকে মুগ্ধ করে তাঁর কমণ্ডলু হরণ করল। রাক্ষস শূল উদ্ধত করে তাঁকে হত্যা করতে ধাবিত হোল। যবক্রীত তাঁর পিতার অগ্নিহোত্র গৃহে আশ্রয় নিতে যান; কিন্তু সেই গৃহের রক্ষী এক অন্ধ শূদ্র তাঁকে সবলে ধরে রাখল। তখন রাক্ষস তাঁকে শূলের আঘাতে বধ করল।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজও অভিশাপ দিলেন যে, রৈভ্যও শীঘ্র তার কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। এই অভিশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এই সময়ে রাজা বৃহদ্দ্যুম্নের এক যজ্ঞে দুই ভ্রাতা অর্বাবসু ও পরাবসু নিযুক্ত ছিলেন। একদিন রাত্রে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করবার সময় বন মধ্যে কৃষ্ণাজিনধারী পিতাকে দেখে তাঁকে মৃগ মনে করে আত্মরক্ষার জন্য পরাবসু বধ করেন। পিতার অন্ত্যেষ্টি শেষ করে পরাবসু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসুকে বললেন, মৃগভ্রমে আমি পিতাকে বধ করেছি, আপনি আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুন। তখন অর্বাবসু আশ্রমে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। তখন পরাবসু রাজা বৃহদ্দ্যুম্নকে জানালেন, তাঁর ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যাকারী, সে যেন এই যজ্ঞ না দেখে; কারণ, এতে ঘোর অনিষ্ট হবে। তখন রাজা অর্বাবসুকে বিতাড়িত করেন; যদিও অর্বাবসু বার বার বললেন, তাঁর ভ্রাতাই ব্রহ্মহত্যা করেছেন এবং তিনি ভ্রাতাকে পাপমুক্ত করেছেন। বিতাড়িত হয়ে অর্বাবসু বনে সূর্যের আরাধনা করতে লাগলেন। সূর্য ও দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা ও পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। দেবতারা তখন অর্বাবসুকে যে বর দিলেন, তার প্রভাবে রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীত পুনর্জীবিত হলেন ও পরাবসুর পাপ মুক্ত হোল। তখন যবক্রীত দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বেদাধ্যায়ী, তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও, রৈভ্য কেমন করে তাঁকে বধ করলেন? এর উত্তরে দেবতারা বললেন—গুরুর সাহায্য না নিয়ে কেবল তপস্যার ফলে বেদশিক্ষা হয়েছিল, কিন্তু রৈভ্য অতি কষ্টে গুরুর কাছে দীর্ঘকাল বেদপাঠ করেছিলেন; সেই জন্য তাঁর স্থানই শ্রেষ্ঠ। (মহাভারত—বন)

যম—পুরাণ মতে ইনি দক্ষিণের দিক্‌পাল। সূর্যের ঔরসে এবং তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা। স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়াকে স্বামীর নিকট রেখে পলায়ন করেন। কিন্তু ছায়া সংজ্ঞার সন্তানদের যথোচিত যত্ন করতেন না বলে যম ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করেন। বিমাতার শাপে তাঁর পদদ্বয় ক্ষত ও কীট-দষ্ট হয়। যম পিতা সূর্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে সূর্য তাঁর ক্ষতস্থানের পুঁজ ও কীট ভক্ষণের জন্য যমকে একটি কুকুর দান করলেন। এই কুকুর ক্ষত হতে নির্গত পুঁজ ও কীট ভক্ষণ করাতে যম সুস্থ হলেন; কিন্তু দুর্বল পায়ের জন্য মহিষ বাহনে ভ্রমণ করতে বাধ্য হন। একবার ঋষি মাণ্ডব্য এক পতঙ্গের দেহে

তৃণ বিদ্ধ করেছিলেন বলে যক্ষের আদেশে শূলবিদ্ধ হন এবং অণীমাণ্ডব্য নামে খ্যাত হন। অণীমাণ্ডব্যও ক্রুদ্ধ হয়ে যমকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। ফলে যম মর্ত্যে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যম পতিব্রতা সাবিত্রীর ব্যবহারে ও স্তবে তুষ্ট হয়ে তাঁর মৃত পতি সত্যবানকে জীবিত করেন এবং সাবিত্রীর অন্ধ ও রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরকে চক্ষু ও রাজ্য ফিরিয়ে দেন। দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশটি কন্যাকে যম বিবাহ করেন। যমের ঔরসে এঁদের গর্ভে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তীর গর্ভে যমের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। যম স্বর্গের দেবতা হলেও নরকের অধীশ্বর। এক জন্ম হতে পুনর্জন্ম মধ্যে মানুষ দুষ্কৃতির পরিমাণ অনুসারে নরকে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আসে। যমের পুরীর নাম সংযমনী। এঁর সম্মুখে বিরাজ করেন পাশমুদ্গরধারী ত্রিলোকসংহারক মৃত্যু, পার্শ্বে জলদগ্নিতুল্য মূর্তিমান কালদণ্ড, তাই তিনি দণ্ডধর নামে খ্যাত। দেবগণের মধ্যে যম সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান বলে এঁর নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ। শাস্তি বা নিবৃত্তি এনে দেন, তাই শমন; অন্ত আনেন বলে ইনি কৃতান্ত বা অন্তক; পিতৃপুরুষের উপর এঁর প্রাধান্য বলে ইনি পিতৃপতি। ইনি জীবের পাপপুণ্যের বিচারকর্তা। এই কার্যে সাহায্য করবার জন্য পাপপুণ্যের হিসাব-রক্ষক চিত্রগুপ্ত এঁর মন্ত্রী। মানুষ মৃত্যুর পর নরকে গমন করলে, সেখানে মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা হতে প্রত্যেকের পাপপুণ্যের বিবরণ বর্ণনা করেন। যমের দেহের রং সবুজ, তিনি রক্তবর্ণ পরিচ্ছেদে ভূষিত। এঁর দুই জন অনুচর, মহাচন্দ ও কালপুরুষ। যমের দূতরা যমদূত নামে খ্যাত। এরা মৃত আত্মাদের যমালয়ে নিয়ে আসে।

ঋগ্‌বেদের ১০ মণ্ডলের তিনটি সূক্ত যমের উদ্দেশে রচিত। আর একটি সূক্তে যম ও তাঁর ভগিনী যমীর কথোপকথন আছে। যমের নাম প্রায় ৫০ বার ঋগ্‌বেদে উল্লেখ আছে। যম পুণ্যাত্মা মৃতদের ও নেতৃগণের প্রধান। তিনি প্রথম মৃত হন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে একত্র বৃক্ষের উপর বাস করেন। যম দেবসহচর হলেও কোথাও তাঁকে দেবতা বলা হয় নাই—যম রাজা। যম স্বর্গীয় পিতৃগণের সহচর। ঋগ্‌বেদে বিবস্বান্‌ ও সরণ্যুর সন্তান যম-যমী—যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী। যম যমীর সহবাস আকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু

যমী তা প্রত্যাখ্যান করেন। বেদে যমকে এই ভাবে বলা হয়েছে—যে দেবতা সকল ভূত জাতির পরিচিত, কিন্তু পুণ্যবান বা পাপী সকলের গন্তব্য-পথের পরম সহায়, যে বিবস্বানের পুত্র, যে পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে কার্যফল অনুসারে জীবদের এ লোক হতে অন্য লোকে যাবার উপযুক্ত শরীর দান করে থাকেন, যে জীবমাত্রের রাজা বলে পরিচিত—সেই যম।

ঋগ্‌বেদের অনেক স্থলে যমকে বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে একত্র বর্ণিত হতে দেখা যায়। কোনও স্থলে অগ্নি ও যম অভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। অথর্ব-বেদে উল্লিখিত আছে, যমই মৃতদের আশ্রয় দেন ও ভবিষ্যংবাসের স্থান নির্দেশ করেন।

যমের আত্মাই সর্ব প্রথম স্বর্গে গমন করে। বরুণের পাশের ন্যায় যমের পড়বিশ (পদবন্ধন) থাকে। যমের দূত পক্ষী—উলূক বা কপোত এবং সারমেয়। সারমেয়দের চার চক্ষু, বর্ণ বিচিত্র, বৃহৎ নাসিকা। তারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না। তারা যমের প্রহরী, পথরক্ষী, সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফেরে। এরা যমের পথও রক্ষা করে। এদের সম্মুখে প্রেতাত্মারা দ্রুত বেগে চলতে থাকে। পণ্ডিতদের মতানুসারে এই দুই কুকুর চন্দ্র ও সূর্যের রূপক মাত্র।

মহাভারতে দেখা যায় উদ্দালক মুনির শাপে তাঁর পুত্র নচিকেতা যমপুরে গমন করেন। সেখানে যমের সহিত সাক্ষাৎ করে তিনি গোমাহাত্ম্য ও গোদান মাহাত্ম্য শ্রবণ করে পিতার কাছে ফিরে আসেন। কঠোপনিষদে আছে—বাজশ্রবা রাজার পুত্র নচিকেতা। রাজা এক বিরাট যজ্ঞ করে তাঁর সমস্ত ধন দান করেন। তখন তাঁর পুত্র নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, পিতা, আমাকে কাকে দান করলেন? বার বার নচিকেতা এই কথা বলতে লাগলেন। এতে পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে বললেন যে, তাঁকে যমের হস্তে দান করা হোল। তখন নচিকেতা যমালয়ে গিয়ে তিন রাত্রি যমের জন্য অপেক্ষা করলেন। এতে যম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন যে, তাঁর ইচ্ছামত তিনি আবার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে মিলিত হবেন। কিন্তু এই বরে নচিকেতা সন্তুষ্ট না হয়ে আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব যমের কাছ থেকে জানতে চাইলেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান নচিকেতা যমের কাছ হতে পেলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—বিশ্বকর্মার সংজ্ঞা নামে এক কন্যা ছিল। সূর্যের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্যকে দেখে চোখ নিমীলিত করেছিলেন, এতে সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে সংজ্ঞাকে অভিশাপ দেন, তাঁকে দেখে চোখ বন্ধ করেছেন বলে তাঁর গর্ভে

যে পুত্র হবে সে পুত্র প্রজা-সংযম যম হবে, অর্থাৎ প্রজাদের সংযম করবে। সংজ্ঞা রবির এই অভিশাপে আবার স্বামীর প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করেছিলেন; এতে সূর্য আবার বলেছিলেন, আমার প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করাতে তোমার যে কন্যা হবে, সে চঞ্চলা নদীরূপে পরিণত হবে। কালক্রমে সংজ্ঞার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম প্রজা-সংযম যম এবং কন্যার নাম যমুনা। এই সূর্য-কন্যা পরে যমুনা নদী হয়।

যমলোক মনুষ্যলোক হতে ৮৬,০০০ যোজন দূরে অবস্থিত। যমরাজার পুরী চার হাজার যোজন দীর্ঘ এবং দুই হাজার যোজন বিস্তৃত। উচ্চ স্বর্ণময় প্রাচীর দ্বারা এই পুরী বেষ্টিত (গরুড়পুরাণ)। যম পুণ্যবান্ লোকদের দেখলে নারায়ণরূপে দেখা দেন। আর পাপীদের কাছে তিনি ভীষণরূপ ধারণ করেন (পদ্মপুরাণ)।

যমদ্বিতীয়া—মহাভারতে লিখিত আছে—কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা ভ্রাতা যমকে নিজের গৃহে পূজা করে আহারে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। সেই জন্য ঐ দিনে ভগিনীরা ভ্রাতাদের নিজ গৃহে আহারে পরিতৃপ্ত করে। একে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে। ঐ দিন ভগিনীর হস্তে আহার করলে সর্বপ্রকার মঙ্গল হয়।

যমী বা যমুনা—কালিন্দ পর্বত হতে যমুনা নদীর উৎপত্তি। এই নদী সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে যমের সঙ্গে যমজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য ইনি যমের সহোদরা। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। একবার বলরাম মত্ত অবস্থায় স্নান করবেন বলে যমুনাকে তাঁর কাছে আসতে বলেন; কিন্তু যমুনা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে তাঁর কাছে টেনে আনেন এবং তাঁর ইচ্ছামত যত্রতত্র যমুনাকে অনুগমন করতে বাধ্য করেন। এই জন্য যমুনা নদী নারীমূর্তি ধারণ করে বলরামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনেক অনুনয়ের পর বলরাম সন্তুষ্ট হয়ে যমুনাকে ক্ষমা করেন।

যমলার্জুন—এই নামে বৃন্দাবনস্থ যমজ বৃক্ষদ্বয়। একদা কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব মদ্যপান করে বিবস্ত্র অবস্থায় স্ত্রীদের নিয়ে গঙ্গাজলে জলক্রীড়া করছিলেন। এমন সময় নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে ঐ দৃশ্য দেখেন। এতে স্ত্রীরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে শাপভয়ে বস্ত্র পরিধান করে; কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব মত্ত অবস্থায় থাকায় নারদের আগমন জানতে পারেন নি। তখন নারদ তাঁদের অভিশাপ দেন, তাঁরা দুইজন অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হবেন। তখন এঁরা দুইজন নারদের শাপে এই বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ

বাল্যক্রীড়াচ্ছলে এই বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করলে এঁরা শাপমুক্ত হয়ে মুক্তি পান।

যদু—চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। মহারাজ যযাতির ঔরসে ও দেবযানীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর কনিষ্ঠ সহোদরের নাম তুর্বসু। যযাতির অন্য স্ত্রী শর্মিষ্ঠার গর্ভে অনু, দ্রুহ্য ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতি যখন জরাগ্রস্ত হন, তখন তাঁর অনুনয়ে শুক্রাচার্য বলেন, ইচ্ছা করলে যযাতি তাঁর জরা অন্যের দেহে সংক্রামিত করে নিজে যৌবনলাভ করতে পারবেন। যযাতি প্রথমে পুত্র যদুকে তাঁর জরা গ্রহণ করতে বললে, যদু অসম্মত হয়ে বলেন যে, রাজা তাঁর অন্য প্রিয়তর পুত্রদের এই জরা প্রদান করুন। যযাতি ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দিলেন যদুর বংশে কেহই রাজ্যলাভ করবে না। পরে এই শাপ দেওয়া সত্বেও যযাতি যদুকে রাজ্যের দক্ষিণাংশ দান করেন। যদু হতেই যাদবদের উৎপত্তি। এই বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগের পূর্বে যদু-বংশের ধ্বংস দেখে যান।

যযাতি—চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র। এঁর দুই স্ত্রী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা ও শর্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র হয়। একদা যযাতি মৃগয়া করতে গিয়ে কূপে পতিতা দেবযানীকে উদ্ধার করেন। পরে অন্য সময়ে দেবযানী ও তাঁর সঙ্গিনী শর্মিষ্ঠা দুই সহস্র দাসীকে নিয়ে জলবিহার করছিলেন। এমন সময় যযাতি জলপান প্রার্থী হয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। দেবযানী যযাতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, দুই সহস্র কন্যা ও সখী শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে আমি আপনার স্ত্রী হয়ে আপনার সঙ্গে বাস করতে রাজী আছি। আপনি আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। কিন্তু যযাতি এই বিবাহে রাজী হন না। কারণ, তিনি ক্ষত্রিয় আর দেবযানী ব্রাহ্মণ। তখন পিতা শুক্রাচার্য কন্যার অনুরোধে যযাতির কাছে গিয়ে দেবযানীকে বিবাহ করতে বলেন। বিবাহের পর দুই সহস্র দাসী ও শর্মিষ্ঠা সহ যযাতি স্ত্রী দেবযানীকে স্বগৃহে নিয়ে এলেন। কালক্রমে দেবযানীর একটি পুত্র হোল। পরে শর্মিষ্ঠার ঋতুকাল উপস্থিত হলে তিনি রাজাকে তাঁর ঋতুরক্ষা করতে বললেন, কিন্তু শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার সহিত সহবাস করতে যযাতিকে নিষেধ করেছিলেন। অবশেষে শর্মিষ্ঠার অনুনয়-বিনয়ে দেবযানীর অজ্ঞাতে যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করলেন।

শর্মিষ্ঠার পুত্র হবার পর দেবযানী বললেন, তুমি আমার অধীনে থেকে

অসুর স্বভাবের বশে আমারই অপ্রিয়-কার্য করেছ। শর্মিষ্ঠা উত্তর দিলেন—আমি ন্যায় ও ধর্মানুসারে চলেছি। এই রাজর্ষিকে তুমি যখন পতিরূপে গ্রহণ করেছিলে, তখন আমিও এঁকে গ্রহণ করেছিলাম। যিনি আমার সখীর স্বামী, তিনি ধর্মানুসারে আমারও স্বামী। তখন দেবযানী স্বামিগৃহ ত্যাগ করে পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে স্বামী ও শর্মিষ্ঠার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। অভিযোগ শুনে শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে দুর্জয় জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দেন। যযাতি বহু অনুনয় করাতে শুক্রাচার্য বললেন, তাঁর শাপ মিথ্যা হবে না, তবে যযাতি ইচ্ছা করলে অন্যের দেহে নিজের জরা সংক্রামিত করতে পারেন। শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হলে তিনি একে একে পুত্রদের আহ্বান করে তাঁর জরা গ্রহণ করতে এবং তাঁদের যৌবন তাঁকে দান করতে বলেন। কিন্তু দেবযানীর গর্ভ-জাত দুই পুত্র ও শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত প্রথম দুই পুত্র জরা গ্রহণে অস্বীকার করলেন। অবশেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁর জরা গ্রহণে সম্মত হলেন। যযাতি চার পুত্রকে অভিশাপ দিয়ে পুরুর দেহে নিজের জরা সংক্রামিত করে পুত্রের যৌবন নিজে গ্রহণ করে পুরুকে বললেন, "আমি তোমার যৌবন নিয়ে কিছুদিন পৃথিবীর সুখ ভোগ করবো; ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে তোমার যৌবন আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি জরা গ্রহণ করবো।" যযাতি যৌবন-লাভ করে ১০০০ বৎসর ইন্দ্রিয়সম্ভোগ করেন। অতঃপর তিনি দেখলেন, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হয় না। পৃথিবীতে সমস্ত ধন ও সমস্ত রমণী সম্ভোগ করলেও পরিতৃপ্তি হয় না। তখন তিনি ভোগ-তৃষ্ণা ত্যাগ করে পুরুকে তাঁর যৌবন প্রত্যর্পণ ও রাজপদে অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক কঠোর তপস্যা করেন। ফলে মৃত্যুর পরে কিছুকাল তিনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন। কিন্তু অহঙ্কার-বশতঃ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক মনে করায় ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে অন্তরীক্ষ পথে পতিত হতে থাকেন। পথের মধ্যে আকাশের যে স্থানে তাঁর দৌহিত্র অষ্টক. প্রতর্দন, বসুমনা ও ও শিবি বাস করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হওয়ায় দৌহিত্ররা মাতামহ যযাতির পরিচয় পেয়ে তাঁকে তাঁদের পুণ্যবলে আবার স্বর্গে প্রেরণ করলেন। এইরূপে যযাতি মুক্তিলাভ করেন। (মহাভারত—আদিপর্ব), মাধবী দ্রষ্টব্য।

যশোদা—নন্দের স্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণের পালিতা মাতা। যোগমায়ার গর্ভে যশোদা জন্মগ্রহণ করেন। দেবকীর সাত পুত্র কংস কর্তৃক নিহত হবার পর বসুদেব দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত

পুত্রের জন্ম মাত্র নন্দের স্ত্রী যশোদাকে দেন এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যা যোগমায়াকে দেবকীর কাছে রাখেন। কংস এই যোগমায়াকে হত্যা করতে গেলে শক্তিরূপিণী যোগমায়া কংসের হাত হতে মুক্তিলাভ করে অদৃশ্য হয়ে যান, এবং যাবার সময় বলে যান, কংসের হত্যাকারী অন্যত্র বর্ধিত হচ্ছেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যশোদার নিকট প্রতিপালিত হন।

বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তাঁর স্ত্রী ধরা ভগবানের দর্শন পাবার আশায় গন্ধমাদন পর্বতে কঠোর তপস্যা করতে যান। ভগবান এঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে বললেন, তোমরা জন্মান্তরে হরির দর্শন পাবে। তারপর দ্রোণ নন্দরূপে ও ধরা যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)।

যাজ্ঞবল্ক্য—সংহিতাকার ঋষি ও ব্যাসের শিষ্য। এঁর প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকের ইনিই সংগ্রহীতা। মহাভারতে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। শতপথব্রাহ্মণের মতে ইনি রাজা জনকের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করতে না পেরে, নানা রত্নরাজি, ১০০০ সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ গোধন নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে জনক বললেন, 'এই রত্নরাজি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করলাম। আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ তিনি এই রত্নসম্ভার গ্রহণ করুন।' এই কথা শুনে উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণই মহামূল্য রত্ন পাবার আশায় নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করতে লাগলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রচার করলেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করায় তাঁর মত বেদজ্ঞ আর কেহ নাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হলে তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সম্মত আছেন। ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বিচারে নিযুক্ত হলে সকলকেই তিনি পরাস্ত করলেন। তিনি মহর্ষি শাকল্যের সঙ্গে বিচারে নিযুক্ত হয়ে জয়লাভ করলেন। তখন রাজা জনকের উৎসর্গিত সমস্ত ধন-সম্পত্তি তিনিই লাভ করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তিনি অনেকবার মত প্রকাশ করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার মূলমন্ত্র হচ্ছে, বানপ্রস্থ অবলম্বন ও যোগাভ্যাস। সেই জন্য তাঁকে যোগশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। মৈত্রেয়ীকে তিনি তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দেন। যাজ্ঞ-

বল্ক্যের গুরু বৈশম্পায়ন একবার তাঁর নিজের জন্য তাঁর শিষ্যদের এক ব্রতের অনুষ্ঠান করতে বলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, তিনি একাই ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করে তপস্যার বল দেখাবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই গর্বপূর্ণ কথা শুনে বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি আমার কাছে যা অধ্যয়ন করেছ, (অর্থাৎ বেদ) তা সমস্তই ফিরিয়ে দাও। যাজ্ঞবল্ক্য এই কথায় তাঁর সমস্ত অধীত যজুঃ বমন করে গুরুকে ফিরিয়ে দিলেন। অন্যান্য মুনিরা তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করে যজুঃ সকল গ্রহণ করলেন। এই হতে তৈত্তিরীয় শাখা উৎপন্ন হোল। তারপর তিনি সূর্যের অধিগত সমস্ত যজুঃ লাভ করবার জন্যে সূর্যদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। সূর্য যাজ্ঞবল্ক্যের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজের অবিজ্ঞাত সমস্ত মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যেকে দান করলেন। এই যজুঃ শুক্ল যজুর্বেদ নামে খ্যাত। ইনি কর্ণ, মধ্যন্দিন প্রভৃতি ১৫ জন শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দেন। সেই অনুসারে এই বেদ পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদীর অন্য নাম। দ্রুপদ রাজার অন্য নাম ছিল যজ্ঞসেন। সেই হতে তাঁর কন্যার এই নাম হয়।

যাজ ও উপযাজ—দুই ব্রহ্মর্ষি ভ্রাতা। যাজ জ্যেষ্ঠ, উপযাজ কনিষ্ঠ। যাজ শুচি, অশুচি বিচার করতেন না। ইনি গুরুগৃহে বাসকালে অপরের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করতেন ও ভূপতিত ফল তুলে আহার করতেন। দ্রুপদ দ্রোণহন্তা পুত্রলাভের জন্য গঙ্গা-যমুনার তীরে বিচরণ করতে করতে এক ব্রাহ্মণ বসতিতে এসে উপযাজকে দশকোটি ধেনু দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে এক দ্রোণহন্তা পুত্র প্রার্থনা করলেন। উপযাজ অসম্মত হলে দ্রুপদ তাঁর পরিচর্যা করতে থাকেন। সংবৎসর গত হলে উপযাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাজের নিকট দ্রুপদকে যেতে বললেন। যাজ শুচি-অশুচি বিচার-বিহীন এবং সম্ভবতঃ ধনপ্রার্থী। হয়ত দ্রুপদের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত হতে পারেন। দ্রুপদের অনুরোধ রক্ষায় যাজ সম্মত হন ও ভ্রাতা উপযাজকে সহায়ক নিযুক্ত করলেন। এঁদের যজ্ঞাগ্নি হতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যজ্ঞবেদী হতে দ্রৌপদী উদ্ভূত হন (মহাভারত—আদি)।

যাতুধান—দস্যু, রাক্ষস, দানব ইত্যাদির সমগোত্র মায়াবী পাপমতি জীব। এদের আকার অনেকটা কুকুর, শকুনী ও অন্যান্য জন্তুর মত। তবে এরা রাক্ষস শ্রেণীর নয়। বায়ুপুরাণে ১২ জন যাতুধানের নাম পাওয়া যায়। এদের জন্ম কশ্যপ ও সুরসা হতে।

যাতুধানী—কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী ব্রহ্মলোক

লাভের জন্যে কঠোর তপস্যা করে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন। পশুসখ নামে এক শূদ্র ও তার স্ত্রী গণ্ডা এই ঋষিদের পরিচর্যা করত। এই সময় অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাবে দেশের লোকরা বহু কষ্টে পড়েছিল। শিবি-পুত্র শৈব্য-বৃষাদর্ভি এক যজ্ঞ করে ঋত্বিক্‌গণকে নিজ পুত্রকেই দক্ষিণা-স্বরূপ দান করলেন। সেই পুত্র অকালে মৃত হলে খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট মহর্ষি তাঁদের জীবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ পাক করতে থাকেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য এই কার্য ত্যাগ করতে বলেন এবং আরও বলেন যে, তাঁদের পুষ্টির জন্য যে খাদ্য দরকার তা তিনি দেবেন। ঋষিরা বললেন, আপাততঃ রাজার দান গ্রহণ করলে সুখ হবে বটে, কিন্তু পরিণামে দানগ্রহণের ফলে সমস্ত তপস্যা বিনষ্ট হবে। তখন তাঁরা রন্ধন পরিত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। তখন রাজা তাঁর মন্ত্রীদের সাহায্যে বন থেকে উড়ুম্বর (ডুমুর) সংগ্রহ করে ঋষিদের দিতে থাকেন। কিছুকাল পরে রাজা ফলের মধ্যে স্বর্ণ পূর্ণ করে পাঠান। অত্রি সেই গুরুভার ফল স্বর্ণ-পূর্ণ বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করেন ও সকলে অন্যত্র প্রস্থান করেন। এইরূপে দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, রাজা শৈব্য এক যজ্ঞ করে যাতুধানী নামে এক ভীষণা কৃত্যা সৃষ্টি করেন। রাজা ঋষিদের ও তাঁদের দাসদাসীদের নাম জিজ্ঞাসা করে সকলকে হত্যা করতে যাতুধানীকে আদেশ দেন। যাতুধানী এক সরোবরে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে ইন্দ্র এক স্থূলকায় পরিব্রাজকরূপে এক হৃষ্টপুষ্ট সারমেয় সহ ঋষিদের পরিচর্যা-ভিলাসী হয়ে তাঁদের সঙ্গ নেন। ঋষিরা যাতুধানীরক্ষিত সরোবরে উপস্থিত হয়ে মৃণাল উৎপাটনে গেলে, যাতুধানী তাঁদের নাম ও নামের অর্থ বলে সরোবরে নামতে বলে। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ নাম ও অর্থ বললে যাতুধানী তাঁদের প্রত্যেককে বলে, তোমাদের নামের অর্থ আমার বোধগম্য হলো না বটে, কিন্তু তা'হলেও তোমরা জলে নামতে পার। অবশেষে পরিব্রাজক (ইন্দ্র) বললেন যে, তাঁর নাম শুনঃসখ (অর্থাৎ যম বা ধর্মের সখা)। যাতুধানী অর্থ বুঝতে না পেরে তাঁকে পুনরায় নামের অর্থ বলতে বললে। তখন পরিব্রাজক বললেন, একবার বলাতেও যখন সে নামের অর্থ বুঝতে পারেনি, তখন তাকে তিনি তাঁর ত্রিদণ্ডের আঘাতে বধ করবেন। এই বলে পরিব্রাজক যাতুধানীর মস্তকে আঘাত করে তাকে বধ করলেন। ঋষিরা মৃণাল তুলে তীরে রেখে পুনর্বার জলে নেমে তর্পণান্তে উঠে দেখলেন, উৎপাটিত মৃণাল অপহৃত হয়েছে। তাতে তাঁরা শপথ করে অপহরণ-কারীর উদ্দেশে অভিশাপ দেন।

তখন শুণঃসখ শপথ করেন, যে চুরি করেছে, সে দেবজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করুক এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন করে স্নান করুক। ঋষিরা তখন তাঁকেই চোর বলে ধরেন। তখন ইন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে বলেন, তিনি ঋষিদের পরীক্ষা ও উদ্ধার করতে এসেছেন। ঋষিরা প্রলোভন ত্যাগ করে ক্ষুধা সহ্য করার জন্যে সর্বকামপ্রদ অক্ষয়লোক লাভ করবেন। সকলে তখন ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করলেন (মহাভারত—অনুশাসন)।

যাস্ক—বৈদিক শব্দার্থবোধক শাস্ত্রকার। নিরুক্ত নামে বেদাঙ্গ গ্রন্থের প্রণেতা। নিরুক্তকে বৈদিক ব্যাকরণ বা অভিধান বলা যেতে পারে। দুরূহ বৈদিক শব্দের অর্থ এই পুস্তকে পাওয়া যায়। ইহাই সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য বৈদিক অভিধান। বৈদিক শব্দের অর্থ ছাড়া, সেই সময়ের সামাজিক, ধার্মিক ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়।

যাদবী—ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা বাহুর স্ত্রী। বাহু হৃতরাজ্য হয়ে বনবাসে গেলে স্ত্রী যাদবীও স্বামীর সহগমন করেন। বনে বাহুর মৃত্যু হলে গর্ভবতী যাদবী স্বামীর সহিত সহমরণে যেতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর সপত্নী তাঁর গর্ভনষ্ট করবার জন্য তাঁকে গর বিষ প্রদান করেন। যাদবী চিতারোহণ করতে উদ্যত হোলে ঔর্ব মুনি তাঁকে বারণ করেন। ঔর্ব মুনির আশ্রমে যাদবি প্রতিপালিত হয়ে সগর নামে এক পুত্র প্রসব করেন (বায়ু পুরাণ), সগর দ্রষ্টব্য।

যুধাজিৎ—কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতের মাতুল ছিলেন। ইনি ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধর্বদেশ অধিকার করতে যান (রামায়ণ—অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)।

যুধিষ্ঠির—পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। শতশৃঙ্গপর্বতে ধর্মের সঙ্গমে কুন্তীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। এই জন্য ইনি ধর্ম, ধর্মরাজ এবং ধর্মপুত্র। কিন্দিম মুনি মৈথুনকালে পাণ্ডুর মৃত্যু হবে অভিশাপ দেওয়ায় পাণ্ডু কুন্তীকে ক্ষেত্রজ সন্তানলাভের চেষ্টা করতে বলেন। দুর্বাসার বরে কুন্তী মন্ত্রবলে যে কোন দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন। স্বামীর অনুমতী অনুসারে কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠিরকে লাভ করেন। এঁর জন্মকালে দৈববাণী হয়—এই জাতক ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, সত্যবাদী ও পৃথিবীপতি হবে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডব হস্তিনাপুরে এসে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। ইনি দুর্যোধনেরও জ্যেষ্ঠ। কৃপ ও দ্রোণের নিকট অন্যান্য পাণ্ডব ও কৌরবদের সহিত ইনি অস্ত্র-শিক্ষা করেন এবং রথ চালনায় বিশেষ পার-

দর্শিতা লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রাপ্তবয়স্ক যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কৌরব-জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন এতে অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষান্বিত হয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে আরম্ভ করেন। অন্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে সুকৌশলে পাণ্ডব নিগ্রহে প্ররোচিত ও কুন্তীকে বারণাবতে নির্বাসিত করিয়ে ইনি পাণ্ডবদের বাসের জন্য এক জতুগৃহ নির্মাণ করান। এবং মন্ত্রী পুরোচনকে সুযোগ মত জতুগৃহে অগ্নিদান করে পাণ্ডবদের বিনাশ করতে বলেন। বিদুর দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে যুধিষ্ঠিরকে যাত্রার পূর্বে ম্লেচ্ছভাষায় (যে ভাষা কেবল যুধিষ্ঠির ও বিদুর জানতেন) কৌশলে দুর্যোধনের অভিসন্ধি জানিয়ে সাবধান করে দেন। জতুগৃহে উপস্থিত হয়ে ভীম সে স্থান হতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করতে চাইলে যুধিষ্ঠির কৌরবদের সন্দেহ উৎপাদন হবে বলে তা নিষেধ করেন। যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে পাণ্ডবরা জতুগৃহেই বাস করতে থাকেন। বিদুর প্রেরিত খনক গৃহমধ্যে গোপনে এক সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে দেয়। পাণ্ডবরা রাত্রে সেখানে পুরোচনের অজ্ঞাতে অবস্থান করতেন এবং দিবাভাগে যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে মৃগয়াচ্ছলে পথঘাটের পরিচয় নিতেন। বৎসরান্তে পুরোচন যখন বুঝলেন যে, পাণ্ডবদের মনে কোন সন্দেহ নাই, তখন যুধিষ্ঠির জতুগৃহে অগ্নিদান করে পুরোচনকেই দগ্ধ করে পলায়ন করবেন স্থির করলেন। একদিন কুন্তী ব্রাহ্মণ-ভোজন করালেন। তাতে অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও উপস্থিত ছিল। এক নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ পানাহারে মত্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় সেইখানেই নিদ্রিত হয়। সকলে নিদ্রিত হলে, ভীম জতুগৃহে অগ্নিদান করে সকলের সহিত সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করেন। পুরোচন ও পঞ্চপুত্র সহ নিষাদী দগ্ধ হয়ে মরায় পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদই প্রচারিত হলো। পাণ্ডবরা বিদুর প্রেরিত এক নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে প্রথমে এক বনে আশ্রয় নেন। সেখানে ভীম রাক্ষস হিড়িম্বকে বধ করে তার ভগ্নী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। পরে ব্যাসের পরামর্শে এঁরা একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতে থাকেন। সেখানেই ভীম বকরাক্ষসকেও বধ করেন। সেখানেই দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরা হওয়ার সংবাদ শুনে ব্যাসের পরামর্শে এঁরা পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করেন। যাত্রা-পথে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের সহিত অর্জুনের সঙ্ঘর্ষ হয়। অঙ্গারপর্ণের রথ দগ্ধ করে অর্জুন তাঁকে বন্দী করলে তাঁর স্ত্রী কুম্ভীনসীর অনুরোধে যুধিষ্ঠির তাঁকে মুক্তি দেন। পাঞ্চাল রাজ্যে পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণবেশে ভার্গব নামে এক

কুম্ভকার-গৃহে অতিথি হন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। কুন্তীর ভ্রমাত্মক আদেশে ও পরে ব্যাসের বিধান অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডব মিলে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। নারদের পরামর্শ মত পাণ্ডবরা নিয়ম করেন দ্রৌপদী এক বৎসর করে এক এক-জনের গৃহে বাস করবেন। সেই সময় অন্য কোন ভ্রাতা তাঁদের দেখলে সেই ভ্রাতাকে ব্রহ্মচারিরূপে বার বৎসর বনবাস করতে হবে। ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানকলে এক ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন উদ্ধারের জন্য অস্ত্র আনতে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী যখন একত্র বাস করেছিলেন তখন অর্জুন তাঁদের গৃহে প্রবেশ করেন ও সেই জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসে যান। যুধিষ্ঠির বহু অনুনয় করেও অর্জুনকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। পাণ্ডবদের জীবিত থাকার সংবাদ পেয়ে বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আনয়ন করেন এবং তাঁদের অর্ধরাজ্য দান করে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করতে বলেন। সেখানে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। দুর্যোধন হস্তিনাপুর পেলেন। পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র লাভ করেন। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্র জন্মায়। এ ছাড়া গোবাসনের কন্যা দেবিকাকে স্বয়ংবর-সভায় যুধিষ্ঠির লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র হয়। পাণ্ডবগণ বহু দেশ জয় করে বহু ধন আনয়ন করেন। নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হন। যজ্ঞের বিঘ্নস্বরূপ মগধরাজ জরাসন্ধকে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী ভীম ও অর্জুন বধ করেন। যুধিষ্ঠিরের সম্মতিক্রমে অন্যান্য পাণ্ডবরা নানাদিকের রাজাদের পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকার করান ও যুধিষ্ঠির মহা সমারোহে রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত দুর্যোধন পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে যুধিষ্ঠিরাদির সর্বনাশের জন্য মাতুল শকুনির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি আদায় করে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করেন। দ্যূতের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান তাঁহার নিয়মবিরুদ্ধ ছিল বলে শকুনির কপট চরিত্র জানা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন এবং কপট দ্যূতে শকুনির নিকট রাজ্য, ভ্রাতৃগণ, নিজেকে, এমন কি দ্রৌপদীকেও পণ রেখে সর্বস্ব হারান ও কৌরবদের দাসত্ব স্বীকার করেন। দ্রৌপদীও দাসী হলেন বলে দুঃশাসন তাঁর কেশাকর্ষণ করে সভামধ্যে তাঁকে বিবস্ত্রা করতে চেষ্টা করেন। দ্যূতে বিজিত দাস হয়েছেন বলে ধর্মহানির ভয়ে পরাজিত যুধিষ্ঠির এই অপমানের কোন প্রতিকার করেন নি।

অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত অবগত হয়ে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন ও তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। দ্রৌপদী বললেন, তাঁর পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে কেহ যেন দাসীপুত্র না বলে। ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর প্রার্থনা পূরণ করেন ও পাণ্ডবদের মুক্তি দিয়ে তাঁদের অপহৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। এতে দুর্যোধনের ক্ষোভ ও আক্রোশ আরো বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় পাণ্ডবদের সর্বনাশ করবার জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশঙ্কা নিবারণের জন্য তিনি দ্বিতীয়বার দ্যূত-সভার আয়োজন করেন। ক্ষাত্রধর্মের নিয়মানুসারে এবারও যুধিষ্ঠির এই আহ্বান গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এবারে সর্ত হলো, পরাজিত পক্ষ ১২ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। দ্বিতীয়বার অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীসহ বনবাসের জন্য কাম্যক বনে যান। সেখান হতে দ্বৈতবনে এসে সরস্বতী নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। বনবাসকালে দ্রৌপদীর কটূক্তি ও ভীমের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির অবিচলিত চিত্তে প্রতিজ্ঞা পালন করাই স্থির করেন। কাম্যক-বনবাস কালে অর্জুন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহার্থ দেবালোকে যাত্রা করলে, যুধিষ্ঠিরাদি অন্য পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সঙ্গে নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, ভৃগুতীর্থ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, মহেন্দ্রপর্বত, প্রভাসতীর্থ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। বনবাসের একাদশ বৎসরে যমুনার উৎপত্তিস্থলে বিশাখযূপ বনে বাস করবার সময় ভীম অগস্ত্য-শাপে সর্পরূপী নহুষ কর্তৃক আক্রান্ত হন। যুধিষ্ঠির তাঁর অনুসন্ধানে এসে তাঁর অবস্থা দেখে ভীমকে পরিত্যাগ করবার জন্য সর্পকে অনুরোধ করেন। সর্পরূপী নহুষ বলেন, যুধিষ্ঠির যদি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন, তবেই তিনি ভীমকে পরিত্যাগ করবেন, নচেৎ যুধিষ্ঠিরও তাঁর ভক্ষ্য হবেন। যুধিষ্ঠির সর্পের সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে ভীমকে মুক্ত করেন। এর ফলে সর্পরূপী নহুষও মুক্তিলাভ করেন। পাণ্ডবরা পুনরায় দ্বৈতবনে সরোবরের নিকট বাস করবার সময় দুর্যোধন ঘোষযাত্রা ছলে পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে যান। সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে দুর্যোধনের সংঘর্ষ হয়। দুর্যোধন কৌরব-পত্নীগণসহ গন্ধর্ব হস্তে বন্দী হলে তাঁর পরাজিত সৈন্যগণ পাণ্ডবদেরই শরণাপন্ন হয়। যুধিষ্ঠির কুলধর্মনাশ ও শরণাগত ত্রাণের জন্যে দুর্যোধন ও নারীদের উদ্ধার করতে ভ্রাতাদের আদেশ দেন। দুর্যোধনকে মুক্ত করে যুধিষ্ঠির তাঁকে মিষ্টবাক্যে বিদায় দেন। একবার যুধিষ্ঠির

স্বপ্ন দেখেন, দ্বৈতবনের মৃগযূথ তাঁর কাছে নিবেদন করছে যে, পাণ্ডবরা তাদের অতি অল্পসংখ্যকই অবশিষ্ট রেখেছে। এতে দুঃখিত হয়ে যুধিষ্ঠির সদলে পুনরায় কাম্যক বনে বাস করতে যান। এখানে একদিন পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করেন। পাণ্ডবরা পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে নিগৃহীত ও বন্দী করলে, যুধিষ্ঠির তাঁকে ক্ষমা করেন ও মুক্তি দেন। বনবাসের দ্বাদশ বৎসরে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করবার জন্য হরিণরূপে এক ব্রাহ্মণের অরণি-মন্থ হরণ করেন। ব্রাহ্মণ তাঁর অগ্নিহোত্রের হানির আশঙ্কায় পাণ্ডবদের শরণাগত হলে, পঞ্চভ্রাতা হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করেন। হরিণ অদৃশ্য হলে পঞ্চভ্রাতা প্রার্থীকে বিমুখ করবার আশঙ্কায় দুঃখিত হলেন। দীর্ঘ ভ্রমণে তৃষ্ণার্ত পাণ্ডবদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নকুল জলের অন্বেষণে এক সরোবরে উপস্থিত হয়ে জলগ্রহণ করতে উদ্যত হলে অন্তরীক্ষ হতে ধর্ম পূর্বে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান করতে বললেন। নকুল তা অগ্রাহ্য করে জলপান করতেই ভূপতিত হলেন। তাঁর আগমনের বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির একে একে সহদেব, অর্জুন ও ভীমকে পাঠালে তাঁরাও ধর্মের নিষেধ অগ্রাহ্য করায় নকুলের দশা প্রাপ্ত হন। তখন যুধিষ্ঠির সেখানে উপস্থিত হলে ধর্ম বকরূপে যুধিষ্ঠিরকে জলগ্রহণে নিষেধ করেন। যুধিষ্ঠির তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি যক্ষরূপ ধারণ করে বলেন, তাঁর নিষেধ অমান্য করায় চার ভ্রাতার এই দশা হয়েছে। তখন যুধিষ্ঠির যক্ষের সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে যে কোন এক ভ্রাতার জীবনভিক্ষা দিতে সম্মত হয়। যুধিষ্ঠির নকুলের জীবনভিক্ষা চাইলে যক্ষ তার কারণ জিজ্ঞাসা করল। যুবিষ্ঠির বললেন, কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই তাঁর কাছে তুল্য এবং উভয়েরই সন্তান জীবিত থাকে এই তাঁর কাম্য। যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরের উদার চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে আত্মপরিচয় দান ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে সমস্ত ভ্রাতারই প্রাণ দান করেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বর প্রার্থনা করতে বললে যুধিষ্ঠির হৃত-অরণি ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত না হয়, তাই প্রার্থনা করেন। ধর্ম অরণি-মন্থ প্রত্যর্পণ করে অন্য বর প্রার্থনা করতে বললে, যুধিষ্ঠির বললেন, অজ্ঞাতবাস কালে তাঁদের যেন কেহ চিনতে না পারে। ধর্ম 'তথাস্তু' বলে তাঁদের বিরাট রাজ্যে বাস করতে উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করেন। বিরাট-রাজসভায় যুধিষ্ঠির 'কঙ্ক' নামে দ্যূত-নিপুণ ব্রাহ্মণ ও যুধিষ্ঠিরের সখা বলে রাজার বয়স্য হন। তাঁর গুপ্ত নাম ছিল জয়। বিরাট-সভায় কীচক প্রকাশ্যে দ্রৌপদীকে পদাঘাত করলে,

যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে ভীমকে প্রতিশোধ নিতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে তাঁদের আত্মপরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বার আশঙ্কা ছিল। অজ্ঞাতবাসশেষে পাণ্ডবরা তাঁদের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণের জন্য কৌরবদের অনুরোধ করলে, দুর্যোধন অসম্মত হন। কৌরবরা জানান যে, অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হবার পূর্বেই পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের যুদ্ধের উদ্‌যোগ কালে সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কাছে দূতরূপে পাঠিয়ে যুদ্ধে নিবৃত্ত হতে বললে, যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললে, তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য যদি না দেওয়া হয়, তবে পঞ্চভ্রাতাকে কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দ, বারণাবত ও আর একটি গ্রাম, অর্থাৎ একত্রে এই পঞ্চগ্রাম দান করলেই তাঁরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হবেন। যুদ্ধ নিবারণের শেষ চেষ্টার জন্য যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে দূতরূপে হস্তিনাপুরে পাঠান। দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দিতে অসম্মত হন। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয় এবং যুধিষ্ঠির দুঃখিত মনে যুদ্ধে সম্মত হন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ইত্যাদি গুরুজনদের প্রণাম ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করে শিষ্টাচার প্রকাশ করেন। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে চাইলে তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করেন। ভীষ্মকে অপরাজেয় জেনে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য পাণ্ডবরা ভীষ্মের নিকট গিয়ে তাঁর মৃত্যুর উপায় জেনে আসেন। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে নিহত হন। দ্রোণকে অস্ত্র ত্যাগ করবার জন্য যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের প্ররোচনায় "অশ্বত্থামা হতঃ—ইতি গজঃ" এই মিথ্যা কথা বলেন। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের নিকট পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে অস্ত্রত্যাগ করলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর শিরশ্ছেদ করেন। যুদ্ধের সপ্তদশ দিনে যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে শিবিরে পলায়ন করেন। অর্জুন তাঁর সন্ধানে উপস্থিত হলে কর্ণকে বধ করতে না পারার জন্য অর্জুনকে অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করেন ও গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলেন। তাতে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এইটিই যুধিষ্ঠিরের একমাত্র বীরত্বের নিদর্শন বলা যেতে পারে। দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করলে যুধিষ্ঠিরই তাঁকে তীক্ষ্ণ বাক্যে উত্তেজিত করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। যুদ্ধান্তে গান্ধারী প্রভৃতি রণস্থলে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির তাঁর ক্রোধ শান্তির জন্যে তাঁর পদধারণ করেন। সেই সময় গান্ধারী তাঁর আবরণ বস্ত্রের অন্তরাল হতে

যুধিষ্ঠিরের নখগুলি দেখতে পান। এর ফলে যুধিষ্ঠিরের নখ বিকৃতবর্ণ হয়ে যায়। যুদ্ধান্তে মৃতদেহ সংকারকালে কুন্তী কর্ণের জন্মরহস্য প্রকাশ করে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর উদ্দেশে তর্পণ করতে বলেন। যুধিষ্ঠির এতে শোকার্ত হয়ে অভিশাপ দেন যে, স্ত্রীজাতি কিছুই গোপন করতে পারবে না। রাজ্যাভিষেকের পূর্বে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিনাশ ও বন্ধুনাশে অনুতপ্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করতে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ইত্যাদির বহু অনুনয়ে তিনি রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন। রাজ্যলাভের পর যুধিষ্ঠির সদলে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম তাঁকে বহু উপদেশাদি দিয়ে দেহত্যাগ করেন। এর পর যুধিষ্ঠিরের পুনর্বার মনস্তাপ উপস্থিত হলে, ব্যাসদেবের পরামর্শে আত্মীয়-বন্ধুজনিত পাপক্ষয়ের জন্য তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যুদ্ধজয়ের পর যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যাতে কোন কষ্ট না পান, সে দিকে যুধিষ্ঠির সতর্ক ছিলেন, এবং সাধ্যমত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা করতেন। ধৃতরাষ্ট্র বনগমন করলেও তিনি সেখানে গিয়ে তাঁদের সংবাদ নিতেন। যদুবংশ ধ্বংসের সংবাদ শোনবার পর, যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র যুযুৎসুর উপর রাজ্যপালনের ভার দিয়ে চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। এই সময়ে একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গী হয়। পথিমধ্যে চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদী ক্রমে ক্রমে পতিত হন। ভীমের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির অবিচলিত চিত্তে প্রত্যেকের পতনের কারণ বর্ণনা করেন। সমস্ত ভ্রাতা ও স্ত্রীর পতনের পর অগ্রসর হতে হতে যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গদ্বারে পৌঁছিলে ইন্দ্র তাঁকে কুকুর পরিত্যাগ করে স্বর্গে প্রবেশ করতে বললেন। যুধিষ্ঠির এর উত্তরে বলেন যে, এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করে তিনি স্বর্গে যেতে রাজী নন। কুকুরকে ত্যাগ করলে নির্দয়তা হবে। তখনই ইন্দ্র বললেন, যার সঙ্গে কুকুর থাকে, সে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে না; ক্রোধবশ নামক দেবতারা তাঁর যজ্ঞাদির ফল বিনষ্ট করেন। যুধিষ্ঠির আবার বলেন যে, ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য তাঁর পাপ হবে। ভীত, আর্ত, অসহায় ও দুর্বল ভক্তকে রক্ষা করা তাঁর ব্রত। তখন কুকুররূপী ধর্ম নিজমূর্তি ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে বললেন, স্বর্গে তোমার সমান কেহ নাই। কারণ, ভক্ত কুকুরের জন্য তুমি স্বর্গ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলে। তারপর ইন্দ্র ও মরুদ্গণ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যান। স্বর্গে প্রবেশ করে ভ্রাতাদের না দেখতে

পেয়ে যুধিষ্ঠির তাঁদের দেখতে চান। সেইজন্য তাঁকে নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভ্রাতাদের দেখে তিনি স্বর্গে ফিরে যেতে অসম্মত হলেন। তখন ইন্দ্র বললেন, যুধিষ্ঠির দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে প্রতারিত করেছিলেন বলে কৌশলক্রমে তাঁকে নরকদর্শন করতে হয়েছে। তাঁরা কেউই নরকবাসের উপযুক্ত নন। ধর্ম তখন বললেন যে, এই তৃতীয় বারের পরীক্ষাতেও যুধিষ্ঠির উত্তীর্ণ হয়েছেন। তখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ স্বর্গে গমন করলেন।

যুধিষ্ঠির কষ্টসহিষ্ণু, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, অসীম ধৈর্যশীল বিরাট পুরুষ ছিলেন। অহিংসা, দয়া, সত্যবাদিতা ও সত্যরক্ষা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাপীকে ঘৃণা না করে ক্ষমাশীল হওয়া তার প্রধান চরিত্রগত গুণ ছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁর বিষয়বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। শল্যকে স্বপক্ষে না পেয়ে তিনি তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করেন, শল্য যেন কর্ণের হয়ে কর্ণের বলক্ষয় করেন। ভীষ্ম বধের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা ও দ্রোণ বধের জন্য মিথ্যা ভাষণও তিনি করেছিলেন। তিনি ভ্রাতৃবৃন্দের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ক্রোধী ভীমসেনও তাঁকে মান্য করতেন। ভদ্রতা ও শিষ্টতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। এমন কি দুর্যোধনকেও তিনি সুযোধন বলে ডাকতেন। অপকারীর উপকার ও শত্রুকে মার্জনা তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল।

যুবনাশ্ব—এক জন সূর্যবংশীয় রাজা। এঁর পিতার নাম প্রসেনজিৎ ও মাতার নাম গৌরী। বিখ্যাত রাজা মান্ধাতা এঁর পুত্র।

যুযুৎসু—ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। বয়ঃক্রম অনুসারে ইনি দ্বিতীয়। ধৃতরাষ্ট্রের এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রের ন্যায় ইনি অধার্মিক ছিলেন না। ইনি পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তা করতেন না। ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ বলে ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে ইনিই একমাত্র জীবিত ছিলেন। যুযুৎসুর মাতার নাম সৌবলী (মহাভারত)।

যোগ—ব্যক্তিগত আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন এবং তপশ্চর্যা—যার সাহায্যে এই মিলন সম্ভব হয়। যোগদর্শনের প্রবক্তা পতঞ্জলি। হিন্দু ষড় দর্শনের মধ্যে যোগ একটি। মনকে কেন্দ্রীভূত (অর্থাৎ পূর্ণ মনোযোগ সম্পন্ন) করে সত্যকে উপলব্ধি করাকে যোগ দর্শন বলে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ।

যোগনিদ্রা—(১) কল্পের অবসানে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত

হলে ব্রহ্মা তাঁর নাভিকমলের উপর অধিষ্ঠান করে তাঁর স্তব করতে থাকেন। তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করতে থাকেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবী যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করে সুপ্তোত্থিত হয়ে যুদ্ধ করে মধু ও কৈটভকে বধ করেন (পদ্মপুরাণ)।

(২) দেবকীর সপ্তম গর্ভে নারায়ণের অংশে বলরামের উৎপত্তি হলে, বিষ্ণুনিযুক্ত যোগনিদ্রা তাঁকে রোহিণীর গর্ভে সংক্রমিত করেন (বিষ্ণুপুরাণ)।

যোগবাশিষ্ট—আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। দেবর্ষি বশিষ্ঠ রামকে বেদান্ততত্ত্ব ও আত্মার চিরশান্তি বিষয়ক যে যোগোপদেশ দান করেন, তা এই গ্রন্থে লেখা আছে। এই গ্রন্থ বাল্মীকিকৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বলে সাধারণের কাছে পরিচিত। এর অন্য নাম বশিষ্ঠ-রামায়ণ। বৈরাগ্যবাদ, মুমুক্ষু ব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্বাণ—এই ছয় প্রকরণে ইহা বিভক্ত।

যোগমায়া—(১) যশোদার গর্ভজাত কন্যা। বসুদেব নিজপুত্র কৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে যোগমায়াকে দেবকীর কাছে রেখে যান। কংস তাঁকেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করে বধ করবার জন্য শিলায় নিক্ষেপ করেন। তখন যোগমায়া আকাশে উঠে কংসকে এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন যে, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।" (অগ্নিপুরাণ, দেবী ভাগবত)।

(২) নারায়ণের অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী যোগমায়ারূপে প্রসিদ্ধা। নারায়ণ যখন রামরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন যোগমায়া লক্ষ্মী ও সীতারূপে জন্মলাভ করেন।

যোগিনী—যোগিনীরা দুর্গার সহচরী। বিভিন্ন সময় যোগিনীরা দেবীকে সাহায্য করতে বা তাঁর উপদেশ অনুসারে কাজ করতে আসত। এরা সংখ্যায় ৬৪। দুর্গাপূজার সময় এই ৬৪ যোগিনীর পূজা করতে হয়। কোন কোন স্থানে অষ্টযোগিনীর নাম উল্লেখ দেখা যায়—এঁরা অবশ্য ৬৪ যোগিনীর অন্তর্ভুক্ত। তিথি বিশেষে যোগিনী এক এক দিকে অবস্থান করেন।

যোগিনীর অবস্থান নির্দেশক জ্যোতিষী চক্র অর্থাৎ যোগিনী চক্র আছে। প্রতিপদ নবমীতে পূর্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশীতে পশ্চিমে ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে

উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে যোগিনী বাস করেন। এই আট জন যোগিনীর নাম—সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী, মধুমতী।

যোজনগন্ধা—সত্যবতীর অন্যনাম। ব্যাসদেব মৎস্যকন্যা সত্যবতীর দেহের মৎস্য-গন্ধ সুন্দর গন্ধে পরিণত করে যোজনব্যাপী করেছিলেন, সেই থেকে এঁর নাম যোজনগন্ধা (মহাভারত)।

যোনী—শক্তি উপাসকরা স্ত্রীযোনী ও পুরুষ লিঙ্গের একত্রে লিঙ্গ পূজা করে থাকে। আকর, উৎপত্তিস্থল, স্ত্রীচিহ্ন।

র

রক্তবীজ—দানবরাজ রম্ভের মৃত্যু হলে যক্ষরা মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে। রম্ভের স্ত্রীও সহমরণের জন্য চিতারোহণ করেন। চিতায় অগ্নি-সংযোগ করলে স্ত্রীর কুক্ষি ভেদ করে মহিষাসুর নির্গত হয়। তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি স্নেহবশত রূপান্তর গ্রহণ করে চিতা হতে উত্থিত হলেন। এই রূপান্তরিত রম্ভই রক্তবীজ নামে খ্যাত (দেবী ভাগবত)। ইনি দৈত্য-রাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি ছিলেন। দেবীর সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধকালে রক্তবীজ ও দেবীর সহচরীদের ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এর শর-বিদ্ধ দেহ হতে যত বিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়ত, তা থেকে রক্তবীজের মত ভয়ঙ্কর বলবীর্যসমন্বিত তত মহাশূর তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হত। এই জন্য ইন্দ্র নিজের বজ্র দিয়ে একে নিপাত করতে গেলে শত শত রক্তবীজের আবির্ভাব হয়েছিল। শেষে দেবী মহাশক্তি দেবতাদের বিপদ দেখে নিজের অঙ্গ-নির্মিতা ও অঙ্গীভূতা কালীকে বললেন, "সমস্ত রক্ত-বীজ-স্বরূপ দৈত্যকে ভক্ষণ কর এবং রসনা-বিস্তার করে সমস্ত শোণিত পান কর। তা'হলে রক্তবীজ নিঃশোণিত হয়ে আমার হস্তে নিহত হবে।" দেবী মহাশক্তি চামুণ্ডা ও কালীর সাহায্যে রক্তবীজের নিপাত করেন।

রক্ষরজা—ব্রহ্মার অঙ্গ হতে উৎপন্ন পৌরাণিক পুরুষ। সুমেরু-পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার দিব্য সভা আছে। এখানে যোগনিরত থাকা কালে তাঁর চক্ষু হতে যে অশ্রুবিন্দু পড়ে তা থেকে এক বানরের সৃষ্টি হয়, ইনিই রক্ষরজা। একদা সুমেরুর উত্তর শিখরে এক সরোবর তীরে দেহ সঞ্চালন কালে জলমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে রক্ষরজা ভাবলেন, এ আমার শত্রু। এই ভেবে লম্ফ দিয়ে জলে পড়াতে ইনি পরমাসুন্দরী স্ত্রীর রূপ পেলেন। এই বরাঙ্গনার রূপে ইন্দ্র ও সূর্য দুজনেই উত্তেজিত হলেন। রক্ষরজার কেশে পতিত ইন্দ্রের বীর্য থেকে জাত সন্তানের নাম হোল বালী এবং গ্রীবায় পতিত সূর্যের বীর্য থেকে জাত সন্তানের নাম হোল সুগ্রীব। বালীকে অক্ষয় কাঞ্চনমালা দিয়ে ইন্দ্র সুরলোকে

প্রস্থান করলেন। সুগ্রীবের সকল কাজে পবন-পুত্র হনুমান সহায় হবেন বলে সূর্য চলে গেলেন। পরদিন ঋক্ষরজা পুনরায় বানরের রূপ পেয়ে দুই পুত্রসহ ব্রহ্মার কাছে এলে, ব্রহ্মা এঁকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ও সমস্ত পৃথিবীর বানরের অধিপতি করলেন। ইনিই বালী ও সুগ্রীবের পিতা ও জননী।

রঘু—সূর্যবংশীয় রাজা, দিলীপের পুত্র। রঘুর পুত্র অজ। অজের পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। দিলীপ এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে রঘুর উপর অশ্ব রক্ষার ভার দেন। ইন্দ্র এই যজ্ঞাশ্ব হরণ করলে রঘু ইন্দ্রকে পরাস্ত করে এই অশ্ব উদ্ধার করেন। রাজ্যলাভের পর রঘু দিগ্বিজয়ে বার হয়ে প্রায় সমস্ত দেশ জয় করেন। দিগ্বিজয় লব্ধ প্রচুর ধনরাশি দিয়ে তিনি 'বিশ্বজিৎ' নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তিনি ব্রাহ্মণদের সর্বস্ব দান করেন। রঘু হতে এই বংশের নাম রঘুবংশ হয়, তাই রামকে রঘুপতি ও রাঘব বলা হয়।

রজ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হলে সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যারা স্কন্দকে সাহায্য করবার জন্য প্রেরিত জনৈক সেনাপতি (মহাভারত-শল্য)।

রজি—পুরূরবার পুত্র আয়ু; আয়ুর পুত্র রজি। রজির পরাক্রমশালী পাঁচ শত পুত্র ছিল। কোন সময়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হবার উপক্রম হলে, দেবতা ও অসুররা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, কারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে? তখন ব্রহ্মা বলেন, রাজা রজি যে পক্ষ গ্রহণ করবেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করবে। তখন অসুররা রজির সাহায্য প্রার্থনা করলে রজি বললেন, যুদ্ধে জয়লাভ করলে যদি তাঁকে ইন্দ্রত্ব দান করা হয়, তবেই তিনি অসুরদের পক্ষ নেবেন। কিন্তু অসুররা জানালো, যুদ্ধে জয় হলে প্রহ্লাদকেই তারা ইন্দ্রত্ব দান করবে। সেই জন্য রজির সর্ত গ্রহণ করতে তারা রাজি হলো না। তখন দেবতারা রজির সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁকে ইন্দ্রত্ব দেবেন বলায় রজি রাজী হলেন। দেবাসুরদের এই যুদ্ধে রজির হস্তে অসুররা পরাজিত ও নিহত হলো। যুদ্ধের শেষে ইন্দ্র রজির পদতলে মাথা রেখে বললেন, দেবতাদের অসুরহস্ত থেকে পরিত্রাণ করবার জন্য রজি তাঁদের পিতা হলেন। এই কথায় তুষ্ট হয়ে রজি নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন এবং ইন্দ্র পূর্বের মত স্বর্গে রাজত্ব করতে গেলেন (বিষ্ণু পুরাণ)।

রতি—যৌন আকাঙ্ক্ষার দেবী। এঁর অন্যান্য নাম কামী, প্রীতি, কাম-পত্নী, কামকলা, কামপ্রিয়া, রাগলতা, মায়াবতী, কেলীকলা, শুভাঙ্গী, ইত্যাদি। ইনি কামদেবের স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা।

কালিকা পুরাণে আছে, প্রজাপতি দক্ষ নিজের কন্যা রতিকে দেখিয়ে কামদেবকে বললেন, এ আমার দেহজাত কন্যা এবং গুণে তোমার অনুরূপ; ধর্মতঃ তোমার সহচারিণী এবং কার্যত তোমার বশবর্তিনী হবে। দক্ষ এই বলে নিজের শরীর হতে স্বেদজলসম্ভূতা কন্যাকে রতি নাম দিয়ে কামদেবের হাতে সমর্পণ করলেন। এই কামপত্নীকে দেখে দেবতারা এঁর প্রতি অনুরক্ত হন। মহাদেবের কোপে কামদেব ভস্মীভূত হলে রতি স্বামীকে পুনর্জীবিত করবার জন্যে মর্ত্যলোকে মায়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

রত্নাকর—রামায়ণ রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি পূর্বে 'রত্নাকর' নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি করে সংসার নির্বাহ করতেন। একবার দেবর্ষি নারদকে হত্যা করতে উদ্যত হলে নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র সকলে তাঁর এই পাপের ভাগ নেবেন কিনা। তখন রত্নাকর পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়দের এই প্রশ্ন করলে তাঁরা সকলেই তাঁর পাপের ভাগ নিতে অসম্মত হলেন। তখন রত্নাকরের চৈতন্য হল এবং তিনি নারদের কাছে রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। বহুকাল তপোনিরত থাকায় তাঁর সমস্ত শরীর উইপোকার মাটিতে (বল্মীক) আবৃত হয়। রত্নাকর তপস্যাকালে বল্মীকে আবৃত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। সরস্বতীর বর-পুত্র হয়ে বাল্মীকি অসাধারণ কবিত্ব লাভ করলেন এবং নারদের আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। তমসাতটে বিচরণকালে মিথুন বিহাররত এক ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চকে এক ব্যাধ তাঁর সমক্ষে বধ করে। তাতে ক্রৌঞ্চী সংগমরত পক্ষীর বিচ্ছেদে করুণস্বরে বিলাপ করতে থাকে। এই দৃশ্য দর্শনে করুণাপরবশ বাল্মীকি এই বলে ব্যাধকে অভিশাপ দিয়ে ওঠেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং
ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ
কামমোহিতম্।।"

—নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ করবি না, কারণ তুই ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।

জগতে এই প্রথম ছন্দবদ্ধ শ্লোক রচিত হলো। তাই বাল্মীকি আদিকবি নামে খ্যাত। এরপর ব্রহ্মা তাঁর আশ্রমে এসে তাঁকে রামচরিত বিবৃত করে রামায়ণ রচনা করতে বলেন এবং বাল্মীকি রামের পুত্র কুশ ও লবকে সেই রামায়ণ-গান করতে শেখান। রামের অশ্বমেধযজ্ঞ সভায় আমন্ত্রিত হয়ে কুশ ও লব রামায়ণগান করে পৃথিবীতে রামায়ণ প্রচার করেন। গর্ভবতী সীতা রাম কর্তৃক

নির্বাসিতা হয়ে বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর যমজ পুত্র কুশ ও লব এই আশ্রমেই জন্মলাভ করেন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে সর্ববিদ্যা দান করে অস্ত্রবিদ্যায়ও সুশিক্ষিত করেন।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ধরে কুশ ও লব যুদ্ধে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও শেষে রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। সীতা তখন শোকে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। তখন বাল্মীকি তীর্থ-দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি এই সঙ্কটকালে ফিরে এসে রামচন্দ্রাদিকে পুনর্জীবিত করেন। রামের অশ্বমেধযজ্ঞে কুশ ও লব রামায়ণ-গান করে জনসমক্ষে রামায়ণ প্রচার করেন।

রন্তিদেব—ইনি সঙ্কৃতির পুত্র। বহু যজ্ঞকারী বিখ্যাত রাজা। রন্তিদেব সমাংস অন্নদান করে অতুল কীর্তিলাভ করেন। এই রন্তিদেব কঠোর তপস্যায় ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে বর প্রার্থনা করেন যে, ইন্দ্রের দয়াতে যেন তাঁর গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির আগমন হয়, তিনি যেন সব সময় শ্রদ্ধাবান থাকেন এবং তিনি যেন কখনও কারো কাছে প্রার্থনা না করেন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে এই বর তাঁকে দেন। রন্তিদেবের এই অতিথি-অনুষ্ঠানে সমস্ত পশু নিজেরাই এসে তাঁকে দৈব ও পিতৃকার্যে তাদের নিয়োজিত করতে বলত। রাজার যজ্ঞ-নিহত পশুদের চর্ম হতে যে ক্লেদ বের হত, তা হতে একটা নদী উৎপন্ন হয়—এই নদীর নাম চর্মণ্বতী (চম্বল)। রন্তিদেবের গৃহে এত অতিথি সমাগম হত যে, অসংখ্য পশু নিহত করেও অতিথিদের প্রচুর মাংস ভোজন করানো যেত না। দুই লক্ষ পাচক অতিথি ব্রাহ্মণদের ভোজন কার্যে সর্বদা নিযুক্ত থাকত। তাঁর গৃহে এত অতিথি সমাগম হোত যে, প্রত্যহ একুশ হাজার বৃষ এবং অসংখ্য অন্যান্য পশু বধ করেও সকলের প্রয়োজনীয় মাংসের সংকুলান হত না (মহাভারত—শান্তি)।

রম্ভ—দনুর পুত্র রম্ভ ও করম্ভ। এরা অপুত্রক ছিল। পুত্র কামনায় দুই ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করলে ইন্দ্র ভীত হয় কুমীরের আকার ধারণ করে করম্ভকে গ্রাস করেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে রম্ভ অগ্নিতে আহুতি দিতে উদ্যত হোলে, অগ্নিদেব একে নিষেধ করেন। নিবৃত্ত হয়ে রম্ভ অগ্নির কাছে বর ভিক্ষা করে। অগ্নিদেব বর দিলেন, রম্ভ দেব দানব ও মানবের অজেয় এক পুত্র লাভ করবে। পরে রম্ভের ঔরসে ও এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। এর পূর্বে রম্ভাসুর অন্য এক মহিষ কর্তৃক নিহত হয় (দেবীভাগবত)।

রম্ভা—স্বর্গের এক প্রধানা অপ্সরা।

বিভিন্ন পুরাণে এই অপ্সরার সৌন্দর্য ও সঙ্গীত পারদর্শীতার সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আছে। রম্ভা মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় আবির্ভাব হয়। একবার রম্ভা কুবেরের পুত্র নলকুবরের নিকট অভিসার গমনকালে রাবণ তাঁকে দেখে কামমুগ্ধ হয়ে বলপূর্বক ধর্ষণ করেন। রম্ভা নলকুবরকে এই বৃত্তান্ত জানালে নলকুবর রাবণকে অভিশাপ দেন, কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তার প্রতি বল প্রয়োগ করতে গেলে রাবণের মস্তক সপ্ত খণ্ডে ভগ্ন হবে। এই জন্যই সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়েও নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হন (রামায়ণ—উত্তর)। একবার ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করবার জন্য অপ্সরা রম্ভাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর শাপে রম্ভা শিলাতে পরিণত হয়ে ১০০০ বৎসর অবস্থান করেন (রামায়ণ—উত্তর, মহাভারত—অনু)।

রম্ভা যখন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে শিলারূপে বাস করছিলেন তখন অঙ্গারিকা নামে একজন রাক্ষসী সেখানে নানা উপদ্রব করতে আরম্ভ করে। তখন ঐ আশ্রমে তপস্যারত শ্বেতমুনি বায়ব্য অস্ত্রে ঐ শিলাখণ্ড যোজনা করে রাক্ষসীর দীকে নিক্ষেপ করেন। অস্ত্রভয়ে ভীত রাক্ষসী পলায়ন করে কপিতীর্থে এলে তাঁর মস্তকে সেই শীলাখণ্ড পড়ে তার মৃত্যু হয়। ঐ শিলাখণ্ড কপিতীর্থে নিমগ্ন হলে রম্ভা আবার নিজরূপ ফিরে পান (স্কন্দ পুরাণ)।

ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালে রম্ভার তালভঙ্গ হয়। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের শাপে স্পন্দনহীন, বিকলাঙ্গ হয়ে রম্ভা ভূতলে পতিত হন। পরে নারদের পরামর্শে শিবের পূজা করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যেতে পারেন (স্কন্দ পুরাণ)।

ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা জাবালি মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে রম্ভার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জাবালি এই কন্যাকে প্রতিপালন করেন; কন্যার নাম ফলবতী (স্কন্দ পুরাণ)।

রাকা—রাক্ষসরাজ সুমালীর অন্যতমা কন্যা। তাঁর স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে রাকার জন্ম হয় (রামায়ণ—উত্তর)।

রাক্ষস—রাক্ষসদের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে এইরূপ লেখা আছে—পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করেন। তারপর প্রাণীগণকে সৃষ্টি করে বললেন—তোমরা সযত্নে এই জল রক্ষা কর। একদল বললেন, 'রক্ষামঃ'—আমরা রক্ষা করব। ব্রহ্মার আদেশে তারা রাক্ষস হোল। আর একদল বললে, যক্ষামঃ—আমরা পূজা করবো; তারা যক্ষ হোল।

বিষ্ণুপুরাণ মতে কশ্যপ ও দক্ষের কন্যা খসা হতে রাক্ষসদের জন্ম।

রামায়ণ ও মহাভারতের মতে আর্যদের আগমনের পূর্বে যে জাতি এদেশে বাস করত, তারা অনার্য এবং তাদের রাক্ষস বলা হত। আর্যরা যুদ্ধ করে এই অনার্য রাক্ষসদের পরাজিত করেছিলেন। সাধারণতঃ, রাক্ষসদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীকে অনেকটা যক্ষদের মত বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী অত্যন্ত শক্তিশালী, এরা দেবতাদের শত্রু; তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে দানব ইত্যাদিরা। এরা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করে, যজ্ঞ ইত্যাদি নষ্ট করে, শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়, সাধু ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করে, মানুষদের ভক্ষণ করে এবং সমস্ত মানুষকে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীভুক্ত রাক্ষসদের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাবণ।

কথিত আছে, শিব ও পার্বতী একবার রাক্ষসদের বর দিয়েছিলেন যে, রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণ মাত্রই সন্তান প্রসব করবে, এবং সেই সন্তান মাতার সমকক্ষ হবে। মহাভারতে ভীম কর্তৃক বক, কির্মীর ও হিড়িম্ব, রাক্ষসদের বিনাশ এবং হিড়িম্বাকে বিবাহ করা দেখতে পাওয়া যায়। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

রাজসূয়—রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ। এই যজ্ঞ রাজকীয় ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান। এর প্রধান অর্থ হচ্ছে, যিনি এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন, তিনি সার্বভৌম রাজা হবেন। অন্যান্য রাজা-রাজড়ারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবেন। এই যজ্ঞ কেবল রাজাদেরই করবার অধিকার। রাজারা এই যজ্ঞ করে সম্রাট্ উপাধি লাভ করতেন।

রাধা—কৃষ্ণপ্রেমিকা গোপবালা। বৃষভানুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী কলাবতীর গর্ভে রাধার জন্ম। আয়ান ঘোষের সহিত এঁর বিবাহ হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে ইনি কৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার কোনরূপ উল্লেখ নাই। কৃষ্ণপ্রেমিকা এক সখীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত ও পদ্মপুরাণে রাধার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হতে রাধা উদ্ভূতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে আরম্ভ করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাধা আবির্ভাব মাত্রই ষোড়শ বৎসর বয়স্কা ও নবযৌবনসম্পন্না হন এবং রত্ন-সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে আসীনা হন। এই সময় রাধার লোমকূপ হতে লক্ষ কোটি গোপিকা ও কৃষ্ণের লোমকূপ হতে সেইরূপ গোপ এবং গোসমূহ আবির্ভূত হয়। গোলোকে রাধার এইরূপে জন্ম হয়। এই গোলোকের রাধা পরে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেমন করে

তিনি বৃন্দাবনে এলেন, সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এইরূপ লেখা আছে। একবার শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের বৃন্দাবনের রম্যবনে রমণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা হওয়া মাত্র তাঁর দেহ হতে শ্রীরাধা উৎপন্ন হলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণ মূর্তি ও বাম অঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করলেন। রাধা নিজের স্বামীকে কামাতুর দেখে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। এইজন্য এঁর নাম হল রাধা। 'রা' অর্থে লাভ করা, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করা এবং 'ধা' অর্থে ধাবমান হওয়া—হরির পদে ধাবমান হওয়া। এই রাধা সুদামের শাপে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মর্ত্যে জন্মগ্রহণের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা গোলোকে অবস্থান করেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ একবার রাধিকাকে বঞ্চনা করে বিরজা নামে এক গোপিনীর সঙ্গে মিলিত হন। চারজন দূতী এই সংবাদ রাধিকাকে দিলে, তিনি সখী-সহ কৃষ্ণের অনুসন্ধান করেন। কৃষ্ণসখা সুদামা রাধার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণকে দিয়ে পলায়ন করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভয়ে বিরজাকে ত্যাগ করে অন্তর্হিত হন। বিরজা ক্রোধে প্রাণত্যাগ করে নদী-রূপে প্রবাহিত হলেন। রাধা সে স্থানে কাহাকেও না দেখে স্বস্থানে ফিরে আসেন। পরে কৃষ্ণের দেখা পেয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। সুদামা কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই আচরণ সহ্য করতে না পেরে রাধাকে তিরস্কার করেন। এতে রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে সুদামাকে অসুরযোনি লাভ করবার অভিশাপ দেন। সুদামাও ক্রুদ্ধ হয়ে রাধাকে অভিশাপ দেন, তুমি গোলোক হতে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে গোপগৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং শতবর্ষ কৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করবে। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার ধারণের জন্য তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। রাধার অভিশাপে সুদামা অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে শঙ্খচূড় নামে খ্যাত হলেন আর সুদামার শাপে রাধা বৃষভানু-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

রাধাকৃষ্ণ লীলা ভারতীয় ধর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জ্ঞান ব্যতিরেকে 'ভক্তির' সাহায্যে ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়—রাধা ও গোপীদের জীবনের এই মূলসূত্র। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী অনন্তের আহ্বানের প্রতীক: শ্রীকৃষ্ণই ভগবান ও আর রাধা মানবাত্মা।

(২) সারথি অধিরথের স্ত্রী এবং কর্ণের পালিকা মাতা। একদিন স্বামীসহ রাধা নদীতে স্নান করবার সময় একটি মঞ্জুষা জলে ভেসে আসছে দেখতে পান। রাধার অনুরোধে অধিরথ সেটি জল হতে তুলে নিয়ে এলে তার মধ্যে সদ্যঃপ্রসূত এক শিশু দেখতে পান। রাধা এই শিশুকে

সযত্নে পালন করেন। এই শিশুই পরে কর্ণ নামে বিখ্যাত হন। পালিকা মাতার নাম অনুসারে কর্ণের আর এক নাম 'রাধেয়'।

(৩) বৃষভানুর স্ত্রী কলাবতী বায়ু গর্ভধারণ করেন। কালে কলাবতী বায়ু প্রসব করলে অযোনিসম্ভূতা রাধার জন্ম হয়। ১২ বৎসর পরে বৃষভানু আয়ান ঘোষের সঙ্গে রাধার বিবাহ দেন। রাধা তাঁর নিজের ছায়া স্থাপন করে অদৃশ্য হন। এই ছায়ার সঙ্গেই আয়ানের বিবাহ হয়। ১৪ বৎসর অতীত হলে শ্রীকৃষ্ণ কংস বধের জন্য বালকরূপে গোকুলে এলেন। আয়ান ঘোষ শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদার সহোদর এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ। এরপর রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন-কথা সকলের কাছে পরিচিত।

রাধেয়—কর্ণের অন্য নাম। অধিরথের স্ত্রী রাধা কর্তৃক প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে কর্ণের আর এক নাম 'রাধেয়'।

রাবণ—ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য, তাঁর পুত্র বিশ্রবা। এই বিশ্রবামুনির ঔরসে ও সুমালী-কন্যা কৈকসী (অন্য নাম নিকষা) রাক্ষসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, এই তিন পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। লঙ্কা রাক্ষসদের বাসভূমি ছিল। এই রাক্ষসদের সঙ্গে বিষ্ণুর ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাক্ষসরা পাতালে আশ্রয় নেয়। এই রাক্ষসদের মধ্যে সুমালী রাক্ষসের কৈকসী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সুমালী কন্যার বিবাহ স্থির করার জন্য পাতাল থেকে মর্ত্যলোকে বেরিয়ে এসে মনে মনে স্থির করেন কন্যার এমন বিবাহ দিতে হবে যেন কন্যার সন্তান বিষ্ণুকে দমন করতে পারে। তিনি তখন পুলস্ত্য-পুত্র বিশ্রবাকে স্বামিরূপে বরণ করবার জন্য কন্যাকে বললেন, যেন এই বিবাহ হতে অমিততেজা শত্রু দমনে সমর্থ এক পুত্র হয়। বিশ্রবার কাছে গেলে তিনি এই কন্যার ইচ্ছা তপঃপ্রভাবে জানতে পেরে বললেন, কৈকসী পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এসেছেন, কিন্তু দারুণ প্রদোষকালে আসায় কৈকসীর পুত্রগণ দারুণ ক্রূরকর্মা রাক্ষস হবে। তখন কৈকসী অনুনয়-বিনয় করে উত্তম পুত্র প্রার্থনা করলে বিশ্রবা বললেন, তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশানুরূপ ও ধর্মশীল হবে। এরপর বিশ্রবার সহিত কৈকসীর বিবাহের ফলে এক বীভৎস রাক্ষসের জন্ম হল। এই পুত্রই রাবণ। এর দশটি মস্তক, কুড়িটি বাহু, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কেশ প্রদীপ্ত, লোহিতবর্ণ ওষ্ঠ ইত্যাদি। পরে কৈকসীর গর্ভে মহাবল কুম্ভকর্ণ ও ধর্মাত্মা বিভীষণের জন্ম হয়, আর কন্যার নাম হয় শূর্পণখা। কুবের বিশ্রবার অন্য স্ত্রীর পুত্র। সুমালী-পুত্র

কুবেরের ঐশ্বর্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে কৈকসী নিজের পুত্রদের এই তপস্যা করতে বলেন যে, তারা যেন কুবেরের ঐশ্বর্য ও তেজ পায়। কুবের রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা। ইনি যক্ষদের ও রাবণ রাক্ষসদের রাজা। মাতার উপদেশে তিন ভ্রাতাই ব্রহ্মার ঘোরতর তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা এঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চাইলে রাবণ অমরত্বের বর চাইলেন। কিন্তু ব্রহ্মা অসম্মত হলে রাবণ দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদির অজেয় ও অবধ্য হবার বর চাইলেন। মানুষদের তিনি তৃণতুল্য জ্ঞান করেন বলে—এ সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ নাই। ব্রহ্মা রাবণকে এই বরই দিলেন। বিভীষণ প্রার্থনা করলেন নিরতিশয় বিপদে পড়লেও যেন তাঁর ধর্মে মতি থাকে। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাসুখে জীবন কাটাবার বর পেলেন। দানব-শিল্পী ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীর সহিত রাবণের বিবাহ হয়। মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি রাবণ-পুত্র মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। বর পেয়ে রাবণ পৃথিবী জয়ের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। সেই সময় লঙ্কা রাজ্য বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরের অধীনে ছিল। প্রথমেই লঙ্কায় এসে কুবেরকে বিতাড়িত করে তিনি রাক্ষস-রাজ্য স্থাপন করেন এবং ভ্রাতার পুষ্পক রথ অধিকার করেন। কুবের কৈলাস পর্বতে অলকানগরী নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। কেবল মাত্র কার্ত্তবীর্যার্জুন ও কিষ্কিন্ধ্যার বানর-রাজ বালীর হস্তে ইনি পরাজিত হন। ইনি মহারাজ মান্ধাতাকে পরাস্ত করতে না পেরে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। পাতালে বলীরাজের নিকটও রাবণ লাঞ্ছনা ভোগ করেন। নারদের প্ররোচনায় রাবণ যমের সহিত যুদ্ধ করেন। ব্রহ্মা তাঁদের যুদ্ধ নিবারণ করেন। একবার কৈলাসের নিকট দিয়ে পুষ্পক রথে যাবার সময় রাবণের রথের গতি রুদ্ধ হয়। শিবের অনুচর নন্দী বলেন, হর-পার্বতী এখানে আছেন—এ স্থান সকলের অগম্য। নন্দীর বানর মুখ দেখে রাবণ অবজ্ঞায় হাস্য করায় নন্দী অভিশাপ দেন যে, তাঁর তুল্য বানরদের হাতেই রাবণের বংশ লোপ হবে।

রাবণ তখন ভুজবলে কৈলাস উত্তোলন করতে থাকেন। পার্বতী চঞ্চল হয়ে শিবকে আলিঙ্গন করাতে শিব পদাঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণকে নিপীড়িত করলেন। তাতে রাবণ ত্রিলোক কম্পিত করে ভীষণ গর্জন করেওঠেন। অমাত্যদের পরামর্শে রাবণ মহাদেবের স্তব করাতে মহাদেব রাবণকে মুক্ত করেন এবং বলেন পর্বতের ভারে নিপীড়িত ও দারুণ রব করার জন্য তাঁর নাম রাবণ হবে। মহাদেব রাবণকে 'চন্দ্রহাস' নামক এক দীপ্ত

অভয় দান করেন। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে রাবণ যুদ্ধ করেন এবং রাবণ-পুত্র মেঘনাদ কপট যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিত করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। ব্রহ্মার অনুরোধে ইন্দ্র মুক্তিলাভ করেন। এই কার্যের জন্য মেঘনাদের নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। রাবণ ক্রমশঃ অত্যাচারী হয়ে দেব দানব ও ঋষিকন্যাদের হরণ করতে থাকেন। বৃহস্পতি-পুত্র মহর্ষি কুশধ্বজের কন্যা তপোনিরতা বেদবতীকে হরণ করতে উদ্যত হলে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন ও পুনর্বার কোন ধার্মিকের অযোনিজা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে রাবণ-বধের কারণ হবেন বলে রাবণকে অভিসম্পাত দেন।

রাবণ রাজা মরুত্তের যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞে আগত ঋষিদের ভক্ষণ করেন। সুরথ, গাধি, গয় ও পুরূরবা প্রভৃতি রাজগণ রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। অযোধ্যাপতি অনরণ্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। রাবণ কর্তৃক নিহত হবার পূর্বে তিনি অভিসম্পাত দেন, তাঁরই বংশজাত রাম রাবণকে বধ করবেন। নলকূবরের নিকট অভিসারে গমনকালে রম্ভাকে সবলে ধর্ষণ করার জন্যে নলকূবর রাবণকে অভিশাপ দেন, কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রয়োগ করলেই তৎক্ষণাৎ রাবণের মৃত্যু হবে। রাবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে নাগগণকে পরাভূত করেন ও নিবাতকবচ নামে দৈত্যদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হন। ব্রহ্মার বরে উভয়েই সুরাসুরের অজেয় হওয়ায় ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় পরস্পরের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয় এবং রাবণ এঁদের কাছে বহু মায়া শিক্ষা করেন। এরপর রাবণ বরুণপুত্রদের পরাজিত করেন। অশ্মনগরে চার শত কালকেয় দানবদের যুদ্ধে বধ করবার সময় রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বও নিহত হন। একমাত্র ভগিনী এইরূপে বিধবা হলে রাবণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করবার অনুমতি দেন। সেই সময় পিতৃসত্য পালনার্থ অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণ করে বনবাস কাল পূর্ণ করছিলেন। শূর্পণখা রামের প্রণয়িনী হয়ে সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ এঁর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করেন। শূর্পণখার অধীনস্থ রাক্ষস খর ও দূষণ সসৈন্যে রামের হস্তে নিহত হয়। শূর্পণখা লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে সমস্ত সংবাদ রাবণকে দিয়ে সীতা হরণে উত্তেজিত করেন। রাবণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হয়ে তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচের সাহায্যে সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার সম্মুখে বিচরণ করে ও

রাম সীতার প্রার্থনায় তাকে ধরতে বহুদূরে চলে যান। অবশেষে তাকে বধ করবার জন্য বাণ নিক্ষেপ করলে মারীচ রামের স্বর অনুকরণ করে কাঁদতে থাকে। সীতার অনুরোধে লক্ষ্মণ তাঁকে একাকী রেখে রামের অনুসন্ধানে গেলে রাবণ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকেন। এতে নিষ্ফল হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করে রাবণ সবলে সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় জটায়ু পথিমধ্যে তাঁকে আক্রমণ করলে রাবণ তাঁর পক্ষচ্ছেদ করে জটায়ুকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে যান। পথে সীতা ঋষ্যমূকপর্বতে সুগ্রীব প্রভৃতি বানরদের উদ্দেশে নিজের অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করেন। লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে সীতাকে স্ববশে আনবার জন্য রাবণ বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু অসমর্থ হয়ে তাঁকে অশোকবনে বন্দিনী করে রাখেন ও তাঁকে বশীভূত করবার জন্যে বহু রাক্ষসী নিযুক্ত করেন। রাবণ সীতাকে বলেন, দশ মাসের মধ্যে রাবণের বশীভূতা না হলে তাঁকে ভক্ষণ করবেন। নলকুবেরের শাপের ভয়ে রাবণ সীতার উপর বলপ্রয়োগ করেন নি। রাম-লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতা করেন ও হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার সংবাদ আনয়ন করেন। সেখানে হনুমান অশোকবন ভগ্ন ও লঙ্কা দগ্ধ করেন। রাম বানর-সেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হন। তখন রাবণ রাক্ষসদের সহিত পরামর্শ করেন। বিভীষণ রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিলে রাবণ তাঁকে অপমানিত করে বিতাড়িত করেন। বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করেন। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করেন, কিন্তু গরুড়ের সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণ মুক্ত হন। তারপর ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন ও প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসরা রামের হস্তে নিহত হয়। কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করে যুদ্ধে পাঠান হলে কুম্ভকর্ণও নিহত হন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে বধ করেন। অবশেষে রাম-রাবণে ঘোরতর যুদ্ধ হলে রাবণ নিহত হন।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে রাবণের দশ মুণ্ড, কুড়ি হস্ত ও তাম্রবর্ণ বিংশতি লোচন ও চন্দ্রের মত উজ্জ্বল দন্ত। রাজকীয় স্বভাব বর্তমান থাকলেও, দেহের নানা স্থলে দেবতাদের সঙ্গে নানা প্রকার যুদ্ধের ক্ষতের চিহ্ন ছিল। ইন্দ্রের বজ্র, ঐরাবৎ, বিষ্ণুর চক্র তাঁর দেহে নানা প্রকার চিহ্ন করেছিল। তিনি পর্বতের চূড়াকে খণ্ডিত করতে বা সমুদ্রকে আলোড়ন করতে

পারতেন। পর্বতের মত লম্বা হওয়াতে তিনি হস্তদ্বারা সূর্য বা চন্দ্রের গতিরোধ করতে পারতেন। তিনি এত গর্বিত ও অহঙ্কারী ছিলেন, যে নিজের প্রতিরক্ষার জন্য কখনও মানুষের বা কোন জন্তুর সাহায্য চান নাই। তাই বিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করে রাবণকে নিহত করেন।

বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয় ঋষিশাপে মর্ত্যলোকে তিন বার জন্মগ্রহণ করে বিষ্ণু অবতারের হস্তে নিহত হয়ে বিষ্ণুলোকে ফিরে যান। প্রথমবারে এরা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে বিষ্ণুর বরাহ ও নরসিংহ অবতারের হস্তে নিহত হন। পরজন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে রামের হস্তে ও শেষ জন্মে ও শিশুপালরূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন।

রামচন্দ্র—সূর্যবংশীয় অযোধ্যার রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ লব্ধ জ্যেষ্ঠ পুত্র। দশরথের তিন রাণীর গর্ভে চার পুত্রের জন্ম হয়। তার মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁর পরে কৈকেয়ীর গর্ভজাত ভরত ও সুমিত্রার গর্ভজাত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। রামের চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিশ্বামিত্র রাক্ষসদের হাত হতে যজ্ঞ-রক্ষা করবার জন্যে দশরথের অনুমতিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণকে নিজের আশ্রমে নিয়ে যান। রামকে তাড়কা ও অন্যান্য রাক্ষসদের নিহত করে মহর্ষির যজ্ঞ সম্পন্ন করাতে বলা ও অতিবলা বিদ্যা ও দিব্যাস্ত্র সকল দান করেন। তারপর বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণসহ মিথিলা যাত্রা করেন। পথে তাঁরা গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হলে, গৌতমের শাপে সকলের অদৃশ্য অহল্যাকে রাম শাপমুক্ত করেন। মিথিলায় জনকরাজার আতিথ্য গ্রহণ করে বিশ্বামিত্রের পরামর্শে জনকের হরধনু ভঙ্গ করে রাম জনকের বীর্যশুল্কা কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মণের সহিত সীতার কনিষ্ঠা ভগিনী ঊর্মিলার বিবাহ হয়। জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। শিবের হরধনু ভঙ্গ করার সময় বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জীবিত ছিলেন। তিনি শিবের শিষ্য ছিলেন। সেই জন্য হরধনু ভঙ্গ করতে রামের উপর তিনি কুপিত হন। দুই জনেই বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্ত্বেও পরশুরাম রামকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং রামের হস্তে পরাজিত হন।

কিছুকাল পরে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করেন। এই সংবাদে দাসী মন্থরার প্ররোচনায় দশরথের দ্বিতীয়া স্ত্রী ভরত-জননী কৈকেয়ী ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়েন। আশৈশব রামকে স্নেহ করলেও মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী

[illegible] [illegible] সুযোগে এক বরে ভরতের যৌবরাজ্য প্রাপ্ত ও আর অন্য বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাসের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অনুসরণ করেন।

পিতৃসত্য পালনার্থ রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে বন্ধু নিষাদরাজ গুহের সাহায্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হন। প্রয়াগের নিকট ভরদ্বাজমুনির আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তাঁর পরামর্শে দণ্ডকারণ্যের চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে থাকেন। রামের বনগমনের পর দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন। ভরত রাজ্যলোভ ত্যাগ করে রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য চিত্রকূটে উপস্থিত হন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বন-বাসকাল পূর্ণ করবার সঙ্কল্প স্থির রাখেন। তাতে ভরত রামের পাদুকা তাঁর প্রতীক-স্বরূপ সিংহাসনে স্থাপন করে রামের প্রতিনিধিরূপে নন্দীগ্রামে বাস করে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। এরপর এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে বাস করে রাম নির্বাসনের দশ বৎসর কাটিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। অগস্ত্য মহা সমাদরে অতিথি-সৎকার করে রামকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মাস্ত্র ও অক্ষয় তূণীর দান করলেন। মহর্ষির উপদেশানুসারে রাম গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। তখন এই বন রাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা এই বনে বাস করত। এই রাক্ষসী রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রণয় নিবেদন করলে রাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও বিতাড়িত হয়ে সীতাকে গ্রাস করবার চেষ্টা করে। রামের আদেশে লক্ষ্মণই এই রাক্ষসীর নাক ও কান কেটে দিলেন। তারপর শূর্পণখার দুই ভ্রাতা খর ও দূষণ রামকে আক্রমণ করলে, রাম তাদের দুজনকে এবং সমস্ত সৈন্যকে বধ করে পঞ্চবটী বন রাক্ষসশূন্য করেন। শূর্পণখা তখন তাঁর ভ্রাতা রাবণের নিকট সমস্ত সংবাদ নিবেদন করল। রাবণ সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে ও ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচের সহিত পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হলেন। মায়াবী মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতার সম্মুখে ভ্রমণ করতে লাগল। সীতা তখন রামকে ঐ স্বর্ণমৃগ এনে দিতে অনুরোধ করায়, রাম লক্ষ্মণকে কুটীরে রেখে স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করে মৃগকে শরাঘাত করলেন। শরবিদ্ধ মারীচ রামের স্বর অনুসরণ করে 'হা লক্ষ্মণ, হা সীতা' বলে প্রাণত্যাগ করল। এই কাতরোক্তি শুনে রামের বিপদ আসন্ন ভেবে সীতা লক্ষ্মণকে রামের

অনুধাবন করতে প্রেরণ করলেন। এই সুযোগে রাবণ গুপ্তস্থান হতে পরিব্রাজকবেশে উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক সীতাকে নিজের রথে চড়িয়ে লঙ্কার দিকে প্রস্থান করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরে এসে কুটীর শূন্য দেখে সীতা অন্বেষণে যাত্রা করে পথে মস্তকহীন কবন্ধকে হত্যা করলে তার অশরীরী আত্মা বানর রাজা সুগ্রীবের সাহায্য গ্রহণ করতে বললে। সুগ্রীবকে তার ভ্রাতা বালীর হাত হতে হৃতরাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা উদ্ধারে সাহায্য করতে রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হোল। এর ফলে সীতা উদ্ধারে সমস্ত বানরকুল ও হনুমানের সাহায্য পেলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হলে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ সীতাকে মুক্তি দেবার জন্য রাবণকে বলেন। এতে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে অপমানিত করলে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে রাম লক্ষ্মণ রাবণকে সবংশে সংহার করে সীতাকে উদ্ধার করলেন ও বিভীষণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সীতার সম্বন্ধে রাম বললেন, চরিত্র-রক্ষা, অপবাদ খণ্ডন এবং তাঁর বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্য সীতাকে বর্জন করলেন। এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। তখন সীতা প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে অগ্নিতে স্বর্ণ-প্রতিমা সীতা বিলীন হয়ে গেলেন। তারপর অগ্নি সীতাকে রামের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে সীতার সুচরিত্র ও সতীত্বের প্রমাণ করে দিলেন।

এইরূপে চৌদ্দ বৎসরের পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলে ভরত রামের হস্তে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করলেন। তখন রাম রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি শুনতে পেলেন, সীতার দীর্ঘকাল রাবণের গৃহে একাকী বন্দিনী থাকায় প্রজারা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দীহান হয়ে নানারকম কুৎসা রটনা করছে। সীতাকে নিজে সতী জেনেও প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য রাম লক্ষ্মণকে বললেন, সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করে আসতে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ এই আদেশ পালন করলেন। তখন সীতা পূর্ণগর্ভা ছিলেন।

এরপর রাম অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যক্তা হবার পর তাঁর দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। মহর্ষি এদের নাম দিলেন—লব ও কুশ। বাল্মীকি কুশ ও লবকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিলেন। রামের অশ্বমেধযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে বাল্মীকি লব ও কুশের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন [illegible]

কুশের রামায়ণ গান শুনে রাম মুগ্ধ হলেন এবং এদের আকার ও অবয়ব দেখে নিজের পুত্র বলে বুঝতে পারলেন। বাল্মীকির কাছে সীতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা শুনে রাম সীতাকে রাজ সভায় আনতে বললেন। বাল্মীকি সীতাকে আবার অযোধ্যায় এনে বললেন, রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত, এখন আজ্ঞা কর, সীতা তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। তখন সীতা অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে মাতা বসুধার কোলে স্থান পাবার জন্যে প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হল এবং সীতা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন। সীতাকে হারিয়ে রাম বিষণ্ণ চিত্তে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন সময় একদিন কালপুরুষ তাঁর কাছে এসে গোপনে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই গোপন কথাবার্তার সময়ে কেহ সেখানে উপস্থিত হলে রাম তাকে বর্জন করবেন, এইরূপ স্থির ছিল। লক্ষ্মণ প্রহরীরূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হয়ে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ সাক্ষাৎকারে বাধা দিলে তিনি লক্ষ্মণকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন লক্ষ্মণ বাধ্য হয়ে রামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাম সত্য বাক্য পালনের জন্য লক্ষ্মণকে বর্জন করতে বাধ্য হলেন। বর্জিত হবার পর লক্ষ্মণ সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন করেন। প্রিয় ভ্রাতাকে বর্জন করবার পর রাম শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে কুশকে কোশলের ও লবকে উত্তর কোশলের রাজা করে সরযূতে প্রবেশ করে যোগাবলম্বনে প্রাণ-ত্যাগ করেন। রামায়ণ মহাকাব্যে রামের চরিত্র অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় বিচিত্র ও জটিল ভাব ধারণ করেছে। রামচন্দ্র পুত্ররূপে, ভ্রাতারূপে, মিত্ররূপে, প্রভুরূপে, স্বামীরূপে, প্রজাপালক রাজারূপে ও মহাশূররূপে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। এই সকল সদ্গুণাবলীর জন্য তিনি পুরুষোত্তম মূর্তিতে যুগ-যুগান্ত সকলের হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু রাম চরিত্র কয়েকটি আপাতবৈষম্য ও জটিল রহস্যে পূর্ণ। তাঁর চরিত্রে যে সকল বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়েছে, সেই আপাতবৈষম্যের সামঞ্জস্য ও রহস্যের মীমাংসা ব্যতিরেকে এই অনন্যসাধারণ চরিত্রের সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। শ্রেষ্ঠনীতি ও পরম সত্য তাঁর চরিত্রকে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন করে রেখেছে। কর্তব্যের কাছে তিনি নির্মল ছিলেন বলে সীতা-বর্জনে আপন জীবনকে পূর্ণরূপে নৈরাশ্যময় করেও তিনি নিজ নির্দিষ্ট কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। সীতাকে ত্রিলোকের মধ্যে বিশুদ্ধা ও সতীত্ব প্রভাসম্পন্না জেনেও লোকনিন্দাভয়ে লোক সমক্ষে সীতার পরীক্ষা

গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা তাঁর চরিত্রের নীতিজ্ঞান, কর্তব্যবুদ্ধি, আদর্শ স্থাপন ও সতেজ পৌরুষের দিকগুলি সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বোত্তর জীবনের বহুশত ঘটনার আলেখ্যদর্শনে মনে হয় মর্ত্যলোকে তিনিই স্বর্গরাজ্য রচনা করেছিলেন, যে স্বর্গরাজ্যের নাম রামরাজ্য। তাঁর আশ্চর্য চরিত্রের আদর্শ কেবল মহা বিস্ময়ের বস্তুই নয়—অন্তরের পরম পূজনীয় সামগ্রী।

রামায়ণ—বাল্মীকি রচিত রামচন্দ্রের জীবনী। রামায়ণ সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে চব্বিশ হাজারের অধিক শ্লোক আছে। এই সপ্তকাণ্ডের নাম—আদি বা বালকাণ্ড—রামের বাল্যকাল। অযোধ্যাকাণ্ড—অযোধ্যার ঘটনাবলী—দশরথ কর্তৃক রামের নির্বাসন। অরণ্যকাণ্ড—রামের অরণ্যজীবন ও সীতা-হরণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—কিষ্কিন্ধ্যায় রামের বাস এবং সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব। সুন্দরকাণ্ড—রামের লঙ্কাযাত্রা ও লঙ্কায় উপস্থিতি। লঙ্কা বা যুদ্ধকাণ্ড—রাবণের সহিত রামের যুদ্ধ, রাবণের পলায়ন ও মৃত্যু, সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রামের রাজ্যাভিষেক। উত্তরকাণ্ড—অযোধ্যায় রামের রাজ্যশাসন, সীতার বনবাস, লব-কুশের জন্ম, সীতার নির্বাসিতা প্রয়াণ, পুনর্মিলন ও মৃত্যু।

রাহু—এক দানব। বিপ্রচিত্তি দানবের ঔরসে ও দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে যখন দেবগণের সুধা ভাগ করে দিচ্ছিলেন, সেই সময় এই রাহু দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের সহিত অমৃত পান করবার জন্যে এক সঙ্গে উপবিষ্ট হন। এঁর কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত প্রবেশ করলে চন্দ্র ও সূর্য এঁকে চিনতে পেরে বিষ্ণু ও দেবতাদের কাছে এঁর স্বরূপ প্রকাশ করে দেন। তখন বিষ্ণু নিজের সুদর্শন চক্রে এঁর মস্তক ছেদন করেন; কিন্তু অমৃত পান করবার ফলে রাহুর মৃত্যু হলো না; এঁর মস্তক-ভাগ রাহু এবং দেহভাগ কেতু নামে খ্যাত হলো। তখন হতে চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরশত্রুতার সূত্রপাত—তাই রাহু এঁদের গ্রাস করে ফেলেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং সূর্যকে গ্রাস করলে সূর্যগ্রহণ হয়। রাহু নবগ্রহের একতম ও নৈঋত কোণের অধিপতি। রাহুর রথ ধূসরবর্ণ। এই রথ আটটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব কর্তৃক বাহিত হয়। এই অশ্বরা একবার মাত্র রথে যুক্ত হয়ে সর্বসময় রথ বহন করছে। চন্দ্রগ্রহণে রাহু সূর্য হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সূর্যে প্রবেশ করেন (বিষ্ণুপুরাণ)।

রুক্মরথ—শল্যের পুত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অভিমন্যুর হাতে

ইনি নিহত হন।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। ইনি লক্ষ্মীর অবতার। এঁর ভ্রাতার নাম রুক্মী। রুক্মিণীর অসামান্য রূপলাবণ্যে শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন এবং রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীতে তাঁর প্রতি অনুরক্তা হয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা রুক্মী কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন। ইনি পরশুরামের কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন এবং কৃষ্ণ কংস হত্যাকারী বলে তাঁর বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য এই বিবাহে তিনি সম্মতি দেন না। এদিকে মগধের রাজা জরাসন্ধ চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপালের জন্য রুক্মিণীকে প্রার্থনা করে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। ভীষ্মক জরাসন্ধের এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। চেদিরাজ দমঘোষ ও মগধরাজ এক বংশোদ্ভূত। দমঘোষের পুত্র শিশুপাল জরাসন্ধের কাছে থেকে পুত্রের ন্যায় লালিত পালিত হন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের জামাতা কংসকে বিনাশ করার জন্য শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী। কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মীর পরামর্শ অনুসারে ভীষ্মক জরাসন্ধের প্রস্তাবে সম্মত হলে বিবাহের আয়োজন চলতে থাকে। এই বিবাহের কথা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ সেখানে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে রুক্মিণীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে হরণ করলেন। রুক্মিণীর হৃতাবস্থা দেখে জরাসন্ধ, শিশুপাল, রুক্মী ইত্যাদি সকলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এবং এই যুদ্ধে তাঁরা সকলেই পরাজিত হন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে যথাবিধি বিবাহ করেন। রুক্মিণীই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চরুদেহ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু ও চারু প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একটি কন্যার নাম চারুমতী (হরিবংশ)।

রুক্মী—ভীষ্মকরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র ও রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রুক্মিণী হরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের আগমন রোধ করবার সময় ইনি নর্মদা তীরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হন এবং লজ্জায় আর বিদর্ভে প্রত্যাবর্তন করেন নি। নর্মদার নিকটে ভোজকট শহরে ইনি রাজত্ব করতে থাকেন। ইনি কৃষ্ণদ্বেষী হয়েও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত নিজের কন্যা রুক্মাবতীর বিবাহ দেন এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের সহিত নিজের পৌত্রীর বিবাহ দেন। এই সময়ে বলরামকে অক্ষক্রীড়ায় প্রতারণা করতে গিয়ে রুক্মী বলরাম কর্তৃক অক্ষাঘাত প্রাপ্ত হন এবং তা হতেই নিহত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রুক্মী অক্ষৌহিণী সেনা সহ উপস্থিত

হন এবং প্রথমে পাণ্ডবদের ও পরে কৌরবদের সাহায্য করতে চান; কিন্তু আত্মগর্বের দোষে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের দ্বারা বর্জিত হন।

রুচি—(১) একজন প্রজাপতি। একদিন তিনি গৃহহীন ও আশ্রমবর্জিত হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন, এমন সময় তাঁর পিতৃগণের সঙ্গেসাক্ষাৎ হয়। পিতৃগণ তাঁকে বিবাহ করতে বলেন। অবশেষে এঁদের নানা রকম উপদেশে রাজী হয়ে রুচি উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণ করতে লাগলেন। পিতৃগণের স্তব করতে তাঁরা একস্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন—এই নদীর মধ্যে হতে তোমার জন্য কন্যার আবির্ভাব হবে। নদীমধ্য হতে অপ্সরা প্রম্লোচা উত্থিতা হয়ে বলেন—আমার গর্ভে বরুণ-পুত্র পুষ্করের ঔরসে এক কন্যার জন্ম হয়েছে, আপনি সেই কন্যাকে বিবাহ করুন। তখন রুচি প্রম্লোচার কন্যা মালিনীকে বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভে রৌচ্য নামে রুচির এক পুত্র জন্মে। ইনিই অন্যতম মনু (মার্কণ্ডেয় ও গরুড় পুরাণ)।

(২) সূর্যের স্ত্রীর নাম রুচি (বায়ু পুরাণ); (৩) নহুষের কন্যার নাম রুচি; (৪) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম রুচি (মহাভারত—অনুশাসন)।

রুদ্র—ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে। 'রুদ্‌' ধাতুর অর্থ রোদন বা শব্দ করা। রুদ্র সেই জন্য গর্জনকারী মরুৎগণের পিতা; এই সম্পর্কে রুদ্র বজ্র বা বজ্রধারী মেঘরূপ দেবতা।

বেদে রুদ্রের বিবিধ নামের ও বিবিধ গুণের উল্লেখ দেখা যায়। রুদ্র ত্র্যম্বক অর্থাৎ ত্রিভুবন তাঁর মাতা। রুদ্রের রূপ কল্পনা ও গুণ ধর্ম এইরূপ—রুদ্রের হাত আছে, তাঁর ওষ্ঠ সুন্দর, তিনি কপর্দী (জটাকেশ)। তাঁর বর্ণ পিঙ্গল, উজ্জ্বল সূর্যের মত দীপ্তিশালী। তিনি রথারূঢ় হয়ে বিচরণ করেন। তাঁর হস্তে বজ্র এবং আকাশ হতে তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাঁর হাতে ধনুর্বাণও থাকে। স্ত্রী, পুরুষ, গাভী, অশ্ব, ভেড়া ইত্যাদিকে তিনি নানা প্রকার মঙ্গল ও প্রাচুর্য দান করেন। রোগের ওষধি দান করে রুদ্র সকলকে নীরোগ করেন; পাপ হতে সকলকে নিষ্কৃতি দেন। রুদ্র ভয়াবহ বন্য জন্তুর মত ধ্বংসকারী। তাঁকে বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ বলা হয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে মুক্তিদাতা, প্রথম দেব-ভেষজ। এঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ, দেহের রং লাল, ইনি সহস্রাক্ষ ও এক হাজার গৃহপালিত পশুর রক্ষাকর্তা, কিন্তু রুক্ষ স্বভাবপন্ন; ইনি এখানে ভীষণ ধ্বংসাত্মক রুদ্র দেবতা। ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে। তিনি বদান্য, সহজে তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ। তিনি আবার অনিষ্টকারী। তিনি

ক্রুদ্ধ হলে লোকদের হিংসা করেন, বজ্রাঘাতে মানুষ ও পশু বধ করেন, রোগ আনয়ন করেন। রুদ্র প্রসন্ন হলে বিপদ হতে ত্রাণ করেন, রোগ দূর করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। রুদ্রের চরিত্রে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। রুদ্র একাধারে রুদ্র (ভয়ানক) ও শিব (মঙ্গলময়, ১০।৯২।৯ ঋগ্‌বেদ)। এই শিব বিশেষণ পরে রুদ্রের অপর নাম হয়ে পৌরাণিক ত্রিদেবতার একতম হয়েছেন। রুদ্র বা শিব পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিনাশ শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

উপনিষদে রুদ্রের চরিত্রের বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে রুদ্র নিজেকে বলেছেন—আমিই সর্ব প্রথমে আগত, আমার পূর্বে কিংবা উপরে কেহ নাই। আমি চিরন্তন ও আমি চিরন্তন নই। আমি ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মা নই। ইনি এই পৃথিবীর শাসনকর্তা, সমস্ত জীব এঁর কথায় চালিত হয়। প্রলয় কালে ইনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করেন। এঁর আদি, মধ্যম, অন্ত কিছুই নাই। ইনি ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু, ইনি ইন্দ্র, ইনি শিব।

(২) গণদেবতা বিশেষ। রুদ্রের সংখ্যা এগারো জন—অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী (মৎস্ত পুরাণ), অজৈকপাদ ও সুরেশ্বর। বিভিন্ন পুরাণে রুদ্রদের আরও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়।

বিষ্ণু পুরাণে রুদ্রের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করছিলেন, তখন তাঁর শরীর হতে রোদন করতে করতে একটি পুত্র উৎপন্ন হলো। সেই পুত্র তখন ব্রহ্মার কাছ হতে নিজের নাম প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁর নাম দিলেন রুদ্র। তারপর সে পুনরায় ক্রন্দনরত হয়ে সাতবার চোখের জল ফেলল। তখন সাতটি নাম সে প্রাপ্ত হল—ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, কপালী ও মহাদেব বা রুদ্র কিংবা শিব। ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে এবং মরুৎরা এঁর সন্তান। এই বেদে তিনি এই ভাবে কীর্তিত হয়েছেন—তিনি সঙ্গীতের ও যজ্ঞের দেবতা।

(৩) পদ্ম পুরাণে রুদ্রের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে—ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে তাঁর ভ্রূ-মধ্য হতে রুদ্রের আবির্ভাব হয়। আবির্ভূত হয়েই ইনি কাঁদতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—তুমি কাঁদছ কেন ? এর উত্তরে রুদ্র বললেন—আমার নাম, স্থান ও স্ত্রী-পুত্রাদির বিষয় নির্দেশ করে দিন, তা' হলে আমি ক্রন্দন হতে নিবৃত্ত হব। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, তুমি জন্মিবামাত্রই রোদন করেছ, এজন্য তোমার নাম

রুদ্র। এ ছাড়া ঋতধ্বজ, মনু, মন্যু, উগ্ররেতা, শিব, ভব, কাল, মহিনস, বামদেব ও ধৃতব্রত তোমার নাম হলো। ইন্দ্রিয় সকল, অন্তহৃদ, ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, তপস্যা, চন্দ্র ও সূর্য—এই সকল স্থানে তুমি বাস করবে। ধৃতি, ধী, অসিলোমা, নিযুৎ সর্পি, বিলম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা তোমার স্ত্রী হবে। সকল স্ত্রীর সহিত প্রজা সৃষ্টি করে তুমি জগৎ পূর্ণ কর। ব্রহ্মা এই কথা বলার পর রুদ্র ভূত, প্রেত ও ভৈরবাদি সৃষ্টি করতে লাগলেন। এইরূপ জগৎ ধ্বংসকারীর সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মা রুদ্রকে বিরত হতে বললেন এবং বিষ্ণুর আরাধনা করতে বললেন।

রুমা—বানররাজ সুগ্রীবের স্ত্রী। বানররাজ বালী সুগ্রীবকে বিতাড়িত করলে রুমা বহুকাল বালীর আশ্রয়ে ছিলেন। পরে রাম বালীকে বধ করলে রুমা সুগ্রীবকে ফিরে পান (রামায়ণ)।

রুদ্রসাবর্ণ—বা সাবর্ণ; ইনি দ্বাদশমনু।

রুরু—ভৃগুপুত্র চ্যবনের ঔরসে ও সুকন্যার গর্ভে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সহবাসে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতী হন। কিন্তু এই অপ্সরার কন্যা জন্মগ্রহণ করলে তিনি নদীতীরে কন্যাকে পরিত্যাগ করে প্রস্থান করেন। সেই সময় মহর্ষি স্থূলকেশ এই কন্যাকে দেখতে পেয়ে নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে লাগলেন। এই কন্যার স্বভাব, রূপ, গুণ সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ বলে মহর্ষি এর নাম রাখলেন প্রমদ্বরা। রুরু এই কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করতে আগ্রহান্বিত হলেন। তাঁর পিতা প্রমতির অনুরোধে স্থূলকেশও কন্যাকে দান করতে সম্মত হলেন। বিবাহকাল আসন্ন হলে প্রমদ্বরা সখীদের সহিত খেলা করতে করতে হঠাৎ একটা সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেলেন। সর্পের দংশনে প্রমদ্বরা বিবর্ণ ও হতচেতন হয়ে পড়লেন। তখন রুরু বনে গিয়ে করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন এবং দেবতাদের কাছে প্রমদ্বরার জীবন-ভিক্ষা করতে লাগলেন। রুরুর বিলাপ শুনে দেবতারা তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে একজন দূত পাঠালেন। দূত এসে বললে, প্রমদ্বরার আয়ু শেষ হয়েছে, যদি তুমি এই কন্যাকে তোমার আয়ুর অর্ধ দান কর, তাহলেই সে আবার জীবিত হবে। রুরু তখনই প্রমদ্বরার পিতা বিশ্বাবসুও দেবদূতের সঙ্গে যমের কাছে গিয়ে রুরুর অর্ধায়ুর পরিবর্তে মৃত প্রমদ্বরার জীবনভিক্ষা করলেন। যম এতে রাজী হলে প্রমদ্বরা জেগে উঠলেন। প্রমতি ও স্থূলকেশ তাঁর

এই বর-কন্যার বিবাহ দিলেন। এর পর রুরু অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্পকুল ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা করে যথাশক্তি সকল প্রকার সর্প বধ করতে লাগলেন। এক দিন তিনি এক ডুণ্ডুভ সাপকে বধ করতে উদ্যত হলে এই সাপ বললে, সে কোন অপরাধ করে নি, তবে কেন তাকে বধ করা হচ্ছে। উত্তরে রুরু বললে, তাঁর স্ত্রীকে সাপে দংশন করেছিল, সেই জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞা মত তিনি সর্প বিনাশ করছেন। তখন ডুণ্ডুভ বললে, যারা মানুষকে দংশন করে তারা অন্য জাতীয় সাপ। সে পূর্বে সহস্রপাদ নামক ঋষি ছিল। তার খগম নামে এক বন্ধু ছিল, এই বন্ধুর বাক্য একেবারে অব্যর্থ সত্য। একদিন খগম তপস্যায় নিযুক্ত থাকা কালে, সে খেলার ছলে একটি তৃণ-নির্মিত সর্প নিয়ে তাকে ভয় দেখায়। তাতে তার বন্ধু মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞানলাভ করে তিনি তাকে শাপ দেন, সে সর্পে পরিণত হবে। অনেক অনুনয়-বিনয় ও ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফলে খগম বলেন—আমি যা বলেছি তা মিথ্যা হবার নয়, তবে প্রমতির পুত্র রুরুর দর্শন পেলে তুমি শাপমুক্ত হবে। তুমিই সেই রুরু। আজ আমি তোমার দর্শনে শাপমুক্ত হলাম।

রেণুকা—বিদর্ভরাজ প্রসেনজিতের কন্যা ও পরশুরামের জননী। জমদগ্নি ঋষির সহিত বিবাহ হলে তাঁর ঔরসে রেণুকার পাঁচটি পুত্র হয়। রুমন্বন, সুসেন, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম। এঁদের মধ্যে পরশুরাম ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। কথিত আছে, রেণুকা একবার স্নানের জন্য নদীতে গেলে অপ্সরাদের জলকেলি দেখে কামাতুর হয়ে পড়েন, অথবা রাজা চিত্ররথ ও তাঁর স্ত্রী ও সঙ্গিনীদের সঙ্গে জলক্রীড়া দেখে রেণুকা রাজার প্রতি অত্যন্ত কামাতুর হয়ে পড়েন। রেণুকার মনে এই ভাব জাগরিত হওয়ায় তাঁর শরীর হতে ক্লেদ নির্গত হতে থাকে এবং তিনি দ্রুতপদে গৃহে ফিরে যান। জমদগ্নি যোগবলে রেণুকার এই মানসিক অধঃপতনের কথা জানতে পেরে, একে একে পুত্রদের মাতার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। কিন্তু প্রথম চারিটি পুত্র অস্বীকার করলে পরশুরাম মাতার শিরশ্ছেদ করে পিতৃআজ্ঞা পালন করেন। জমদগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে পরশুরামকে যে কোন বর প্রার্থনা করতে বলেন। পরশুরাম বরস্বরূপ জননীর পুনর্জীবন ও তিনি যেন নিষ্পাপ হয়ে আসেন—এই দুই বর প্রার্থনা করলেন। তখন রেণুকা আবার নবজীবন লাভ করেন। তারপর পরশুরাম তপস্যার জন্য সংসার ত্যাগ করে চলে গেলে, জমদগ্নি কার্তবীর্যের হাতে নিহত হন। পরশুরাম ফিরে এসে পিতার মৃত্যুবিবরণ জানতে পেরে

একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবার প্রতিজ্ঞা করলেন। তখন রেণুকা সন্তুষ্ট চিত্তে স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন (কালিকা পুরাণ)।

কথিত আছে, একবার জমদগ্নির শর-ক্রীড়া কালে রেণুকা নিক্ষিপ্ত শরগুলি আহরণ করছিলেন। সূর্যের তাপে তাঁর মস্তক ও পদ উত্তপ্ত হওয়ায় তিনি গাছের ছায়ায় কিছুকাল বিশ্রাম করেন। আসতে বিলম্ব হওয়ায় জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হলে রেণুকা সভয়ে বিলম্বের কারণ ব্যক্ত করেন। তখন জমদগ্নি সূর্যকেই শরবিদ্ধ করতে উদ্যত হন। ভীত সূর্য ছত্র ও পাদুকা জমদগ্নিকে দান করেন। সেই হতে ছত্র ও পাদুকার প্রচলন হয়।

রেবত—রাজা আনর্তের পুত্র। রেবত রাজার পুত্র রৈবত ও ককুদ্মী; এঁর পুরীর নাম কুশস্থলী।

রেবতী—রৈবত রাজার কন্যা ও বলরামের স্ত্রী। রেবতী পরমা সুন্দরী ছিলেন বলে পিতা পৃথিবীতে কন্যার উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে ব্রহ্মার পরামর্শ গ্রহণ করতে স্বর্গে যান। ব্রহ্মা রৈবতকে দ্বারকায় গিয়ে বলরামের হস্তে এই কন্যাকে সম্প্রদান করতে বলেন। কারণ, বিষ্ণুর অংশে বলরাম জন্মগ্রহণ করেছেন। নিজের অজ্ঞাতসারে লক্ষ বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করবার পর ফিরে এসে রৈবত দেখেন, পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির অবনতি হয়েছে; তারা এখন খর্বাকৃতি, ক্ষীণদেহ ও বুদ্ধিহীন। তিনি ফিরে এসেই দ্বারকাতে গিয়ে বলরামের হস্তে কন্যা রেবতীকে দান করেন। অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী অপরূপ সুন্দরী রেবতীকে দেখে বলরাম তাঁর হল দ্বারা এই দীর্ঘাঙ্গীকে একটু খাটো করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। বলরামের ঔরসে রেবতীর নিশঠও উল্মুক নামে দুই পুত্র হয়। যদুবংশ ধ্বংসের সময় বলরামের মৃত্যু হলে রেবতী সহমৃতা হন (হরিবংশ)।

রেবন্ত—সূর্যের ঔরসে অশ্বীরূপিণী সজ্ঞার গর্ভে চর্ম, বর্ম ও খড়্গাধারী শর-তূণীরাদি সমন্বিত অশ্বারূঢ় এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এঁর নাম রেবন্ত। ইনি গুহ্যকদের অধিপতি। কালিকা পুরাণে আছে—রাজারা তোরণ প্রান্তে প্রতিমা বা ঘটে সূর্য পূজার মত রেবন্তের পূজা করবেন।

রৈবত—ইনি রেবতের পুত্র। রেবত রাজা আনর্তের পুত্র ছিলেন। কুশস্থলী বা দ্বারকা নগরী ইনিই স্থাপন করেন। রূপলাবণ্যবতী কন্যা রেবতীর জন্য সুপাত্রের সন্ধান করতে ইনি ব্রহ্মার নিকট যান। ব্রহ্মপুর তখন নাচ গানের আসরে মুখরিত। এই দৃশ্য দেখে রৈবত মুগ্ধ হয়ে সেখানে অবস্থান করেন; ফলে যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত হয়ে যায়। যখন তিনি মর্ত্যলোকে ফিরে এলেন, তখন ব্রহ্মার আদেশে

রেবতীকে বলরামের হস্তে অর্পণ করলেন।

রৈবত মনু—চতুর্দশ মনুর ইনি অন্ততম। ইনি অতীত মনুদের পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন। রৈবত মনুর সময়ে বিভু ইন্দ্র ছিলেন।

রৈভ্য—একজন ঋষি এবং ভরদ্বাজের বন্ধু। এঁর দুই পুত্র অর্বাবসু ও পরাবসু। ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র যবক্রীত একবার রৈভ্য ঋষির পুত্র পরাবসুর স্ত্রীকে প্রার্থনা করেন। এতে রৈভ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের জটা ছিন্ন করে অগ্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি হতে রাক্ষসাকৃতি এক কৃত্যা উৎপন্ন হয়ে রৈভ্যের আদেশে যবক্রীতকে বধ করে। যবক্রীতের পিতা এর জন্য রৈভ্যকে অভিশাপ দেন, তিনি নিজ পুত্রহস্তে নিহত হবেন। একদিন রৈভ্যমুনি অরণ্যপথে আশ্রমে ফিরছিলেন, এমন সময়ে তাঁকে পুত্র পরাবসু মৃগ ভ্রমে বধ করেন। ভ্রাতার এই পিতৃহত্যাজনিত পাপের জন্য অর্বাবসু বনে গমন করে প্রায়শ্চিত্তে রত হন। কঠোর তপোস্যার ফলে ইনি ভ্রাতা পরাবসুর পিতৃহত্যাজনিত পাপ স্খালন করতে সমর্থ হন। কিন্তু বন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর ভ্রাতা পরাবসু তাঁকে পিতৃহত্যাকারী বলে মিথ্যা প্রচার করলেন। তখন অর্বাবসু আবার বনে প্রত্যাবর্তন করে তপস্যায় রত হলে দেবতারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে পরাবসুকে বিতাড়িত করে তাঁদের পিতা রৈভ্যকে পুনর্জীবিত করলেন।

রোদসী—মরুদ্‌গণের স্ত্রী (ঋগবেদ)। রুদ অর্থে ক্রন্দন করা। বজ্রের মত শব্দ করে, সেই জন্য মরুদগণের (বায়ু ও ঝড়ের) স্ত্রীর নাম রোদসী।

রোমহর্ষণ—বা লোমহর্ষণ বেদব্যাসের একজন প্রধান শিষ্য। বেদব্যাস বেদ বিভাগ করে প্রথম চার জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। তারপর তিনি সূত জাতীয় পণ্ডিত রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের জন্য শিক্ষাদান করেন। গুরুর আদেশে রোমহর্ষণ সমবেত ঋষিদের মধ্যে পুরাণাদি কীর্তন করতেন। ব্যাসদেবের মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করে তাঁর রোমাদি হর্ষিত হয়েছিল বলে এর নাম হয় রোমহর্ষণ। ঋষিমণ্ডলে পুরাণবক্তা সৌতি এঁর পুত্র (কূর্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ)।

রোহিত—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। রোহিতাশ্ব নামেও ইনি পরিচিত। ইনি ক্রীতদাসী জননীর ব্রাহ্মণ-প্রভুর জন্য পুষ্পচয়ন করতে গিয়ে কালসাপ কর্তৃক দংশিত হন। ইনি রোহিতপুর নামে এক নগরী নির্মাণ করেন। (২) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে দেবতাদের অন্ত গণ ছিল রোহিত। (৩) অগ্নিদেবের অশ্বের নাম রোহিত (ঋগ্‌বেদ)। (৪) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র।

রোহিণী—বসুদেবের স্ত্রী। বলরামের মাতা ও কৃষ্ণের বিমাতা। বসুদেব কংস ভয়ে রোহিণীকে ব্রজধাম নন্দালয়ে রেখেছিলেন। কংসবধের পর ইনি মথুরায় ফিরে আসেন। যদুবংশ ধ্বংস সময়ে বসুদেব দেহত্যাগ করলে রোহিণী অনুমৃতা হন। (২) কশ্যপ ও সুরভীর কন্যা। এই রোহিণী কামধেনু প্রভৃতি গোজাতির মাতা। (৩) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম রোহিণী। (৪) দক্ষের ২৭ জন কন্যার অন্যতমা রোহিণী; এই ২৭ জন কন্যাই চন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। রোহিণীর প্রতিই চন্দ্র বেশী অনুরক্ত ছিলেন; সেই জন্য অন্যান্য স্ত্রীরা দক্ষের কাছে অনুযোগ করেন। তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে চন্দ্রকে শাপ দেন। এর ফলে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হন।

রৌচ্য—ইনি ত্রয়োদশ মনু। রুচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ্য। এই মন্বন্তরকালে সুপর্বা প্রভৃতি দেবতা ও দিবস্পতি ইন্দ্র, অব্যয়, তত্ত্বদর্শি, নিরুৎ, সুক, নির্মোহ, সুতপা, নিষ্প্রকর্ম চিত্রনরকৃত, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনেত্র, ক্ষত্রবুদ্ধি ও সেন, বিচিত্র, সুরত প্রভৃতি মনুপুত্রগণ উদ্ভূত হন।

রৌরব—একটি নরকের নাম। কূটসাক্ষী ও মিথ্যাবাদীরা এই নরকে যায়। এই রৌরবভূমি অতি উত্তপ্ত অঙ্গার সমূহে আচ্ছন্ন। পাপীরা এই ভূমিতে বিচরণ করে ও পদে পদে দগ্ধ হয় (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

ল

লক্ষ্মণ—রাজা দশরথের পুত্র ও দশরথের অন্যতমা স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভজাত পুত্র। এই জন্য ইনি সৌমিত্রি নামেও খ্যাত। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যমজ ভ্রাতা ও রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের বিশেষ অনুগত ছিলেন। রাক্ষসদের অত্যাচার হতে ঋষিদের যজ্ঞ হোমাদি রক্ষা করবার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে আশ্রমে আনলে, লক্ষ্মণও রামের অনুগমন করেন। তাড়কা বধের পর লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে মিথিলায় আসেন এখানে রামের সহিত সীতার বিবাহের পর জনক-কন্যা ঊর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হয়। ঊর্মিলার গর্ভে লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে দুই পুত্র হয়। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য রামের বনযাত্রা কালে লক্ষ্মণ সহগমন করেন। পঞ্চবটী আশ্রমে রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা কামাতুর হয়ে লক্ষ্মণের কাছে এলে তিনি নিজ হস্তে শূর্পণখাকে ছিন্ননাসা ও লাঞ্ছিত করেন। শূর্পণখার প্রার্থনায় রাক্ষস-সেনাপতি খর ও দূষণ রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করতে এলে নির্মূল হয়। তখন শূর্পণখা তার ভ্রাতা রাবণকে সীতা-হরণের জন্য উত্তেজিত করে। রাবণ স্বর্ণমৃগরূপী মায়াবী মারীচের সহিত দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হয়ে কৌশলে সীতাকে হরণ করেন। রাম সীতাকে

উদ্ধার করবার মানসে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। লঙ্কায় ঘোর যুদ্ধে লক্ষ্মণ রামের সহায় ছিলেন। অন্যের অবধ্য রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্মণ বধ করেন। শোকাতুর রাবণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শক্তিশেল অস্ত্রদ্বারা লক্ষ্মণকে বধ করেন। বানর চিকিৎসক সুষেণ বিশল্যকরণী নামক উদ্ভিজ্জ লতা দ্বারা লক্ষ্মণকে জীবিত করেন। অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করে লোকাপবাদ ভয়ে গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে পাঠালে লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাসে রেখে আসেন। তারপর সীতা বাল্মীকির আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর দুই যমজ পুত্র লব ও কুশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা বাল্মীকি-কর্তৃক শাস্ত্রে ও অস্ত্রে শিক্ষিত হয়। দুই ভ্রাতা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ অশ্ব ধরে অজ্ঞাত ও অপরিচিত পিতৃব্য লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। উর্মিলার গর্ভজাত লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, দুই পৃথক রাজ্যের রাজা হন।

সীতা পাতালে প্রবেশ করার পর সমস্ত পার্থিব কাজ শেষ হয়ে গেলে, কালপুরুষ ছদ্মবেশে রামের নিকট উপস্থিত হন। তাপসরূপী কালপুরুষ বলেন, তুমি যদি নিজের হিত চাও, তবে আমার বক্তব্য গোপনে শ্রবণ করতে হবে, অন্য কেহ যদি আমাদের কথা শোনে বা একত্রে আমাদের দেখে তবে সে তোমার বধ্য হবে। রাম এই সর্তে তাঁর কথা শুনতে সম্মত হন। রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে স্বয়ং দ্বাররক্ষা করতে বলেন। লক্ষ্মণকেও এই সর্ত জানান হয়। ঠিক এই সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা রামের সহিত সাক্ষাতের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হলে, লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে অপেক্ষা করতে বলেন। এতে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে সকলের উপর অভিশাপ দিতে আরম্ভ করেন। তখন লক্ষ্মণ ভাবলেন যে, সকলের বিনাশ না হয়ে কেবল তাঁরই মৃত্যু হোক। তখন দুর্বাসা আর অভিশাপ না দিয়ে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। লক্ষ্মণ তখন রামকে বললেন, আপনি সন্তপ্ত না হয়ে আমার প্রতি আপনার পূর্ব-প্রতিজ্ঞা পালন করুন। পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যা ত্যাগ করে সরযূ তীরে এসে যোগমগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

(২) দুর্যোধনের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর হাতে নিহত হন।

লক্ষ্মণা—ইনি দুর্যোধনের কন্যা। এঁর বিবাহের জন্য দুর্যোধন এক স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব এঁকে স্বয়ংবর-সভা হতে হরণ করবার সময় দুর্যোধন পক্ষীয় সৈন্যদের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু বলরাম শাম্বকে উদ্ধার করতে উপস্থিত হয়ে হস্তিনাপুর শহর গঙ্গা

পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যান এবং শাম্বকে উদ্ধার করে শাম্বর সঙ্গে লক্ষ্মণার বিবাহ দেন।

লক্ষ্মী—ঋক বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের দুই স্ত্রী হিসাবে দেখা যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রজাপতি হতে শ্রী সম্ভূত বলে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী যুগে লক্ষ্মী ও শ্রী ঐশ্বর্যের দেবী, বিষ্ণুর স্ত্রী এবং কামের মাতা রূপে খ্যাত। রামায়ণ অনুসারে লক্ষ্মী পদ্মহস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন, যখন দেবতা ও অসুররা সমুদ্র মন্থন করছিল।

পুরাণের মতানুসারে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। ইনি নারায়ণের স্ত্রীরূপে অঙ্কশায়িনী হন। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভুবন জয় থেকে বঞ্চিত ও শ্রীহীন হলে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। তারপর সমুদ্র মন্থনের সময়ে ঘৃত থেকে লক্ষ্মী উত্থিত হয়ে দেবগণের কাছে যান। এই লক্ষ্মীকে লাভ করবার জন্যে দানবরা দেবতাদের সঙ্গে কলহে মত্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু বিষ্ণু মায়া বিস্তার করে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী সর্ব সম্পদে সফলা, সকল শ্রী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী।

লঙ্কা—রাক্ষসরাজ রাবণের পুরী। লঙ্কা লবণ সমুদ্র বেষ্টিত ত্রিকূট পর্বতের উপরিস্থিত বিশ্বকর্মা নির্মিত পুরী। প্রস্থে দশ ও দৈর্ঘে বিশ যোজন। স্বর্ণপ্রাচীর বেষ্টিত। এরপর কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা। চারদিকে স্বর্ণদ্বার, প্রত্যেক দ্বারে শত্রুবিনাশী প্রশস্ত যন্ত্রসেতু। মাল্যবান, সুমালী ও মালী ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দ্বারা এই পুরী নির্মাণ করান। এই স্থান হতে তাঁরা সর্বলোকের উপর উৎপীড়ন করায় বিষ্ণু এদের দমন করেন। মালী নিহত হয় ও সুমালী ও মাল্যবান পাতালে গমন করে। এরপর বৈশ্রবণ কুবের লঙ্কার অধিপতি হন। তিনি বৈমাত্র ভ্রাতা রাবণের হস্তে পরাজিত হয়ে রাবণকে লঙ্কার অধিকার ছেড়ে দেন। রাবণ সীতা হরণ করবার পর সীতা অন্বেষণে এসে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেন। রাবণ নিহত হলে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ লঙ্কার অধিপতি হন (রামায়ণ)।

লব—রামচন্দ্র ও সীতার পুত্র। রাম সীতাকে গর্ভাবস্থায় লোকাপবাদের ভয়ে নির্বাসিত করলে সীতা বাল্মীকির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। সেই সময় তাঁর যমজ পুত্র—কুশ ও লবের জন্ম হয়। বাল্মীকির কাছে তাঁরা সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। মহর্ষি তাঁর স্বরচিত রামায়ণ এঁদের কণ্ঠস্থ করিয়ে সকলকে শোনাতেন। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে দুই

ভ্রাতা মুনি-বালক বেশে বাল্মীকির সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে মহর্ষির আদেশে রামায়ণ গান করে সকলকে মুগ্ধ করেন। এঁদের গান শুনে ও আকার-প্রকার দেখে রাম এঁদের নিজ পুত্র বলে চিনতে পারলেন। পরে প্রকৃত পরিচয় পেয়ে রাম সীতাকে ও লব-কুশকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন। মনোদুঃখে সীতা পাতালে প্রবেশ করলে রাম কুশকে কোশলরাজ্যের এবং লবকে উত্তর কোশলের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনি লবকোট বা লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত।

লবণাসুর—সত্যযুগে দৈত্য বংশে লোলাদৈত্যের মধু নামে এক মহাসুর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই অসুর ব্রাহ্মণ দেবতাদের ভক্ত ছিল। তাই এর কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব একটি শূল উপহার দেন। মহাদেব শূল দান করে মধুকে বলেছিলেন—দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধ না করলে এই শূল তার কাছেই থাকবে এবং কেহ তাকে যুদ্ধে আক্রমণ করলে এই শূলের সাহায্যে সে তাকে ভস্ম করে দিতে পারবে। মধুর প্রার্থনায় এই শূল তার পুত্রের অধিকারে থাকবে মহাদেব এরূপ বরও দিয়েছিলেন। মধু রাবণের ভগিনী কুম্ভনসীকে বিবাহ করে। মধু ও কুম্ভনসীর বিবাহের ফলে লবণের জন্ম হয়। লবণাসুর পিতার মৃত্যুর পর এই শূলের অধিকারী ও অবধ্য হয়ে ঋষিদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে লাগল। এর অত্যাচার অসহ্য চলে চ্যবন ইত্যাদি ঋষিরা রামের শরণাপন্ন হন। রাম লবণ দলনের জন্য বিষ্ণু কর্তৃক সৃষ্ট শরগুলি শত্রুঘ্নকে দিয়ে লবণকে দমন করতে পাঠালেন। শত্রুঘ্ন মধুবনে উপস্থিত হলে লবণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তখন লবণের হস্তে শূল ছিল না বলে শত্রুঘ্ন তাকে আক্রমণ করে শর দ্বারা নিহত করেন (রামায়ণ)।

ললিতা—(১) ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ নিমিরাজের শাপে দেহহীন হন এবং নিমিও বশিষ্ঠ শাপে দেহহীন হন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে কামরূপে সন্ধ্যাচলে তপস্যা করে ইনি বিষ্ণুর দর্শন পান। বিষ্ণুর বরে তিনি এক অমৃত কুণ্ড প্রস্তুত করে তার অমৃত জলে স্নান করে ও জল পান করে শাপ-মুক্ত হন। এই অমৃত কুণ্ড থেকে সাগরগামী ললিতা নদী নিঃসৃত হয়। (কালিকা পুরাণ)।

(২) ধৃতরাষ্ট্র নামে এক নাগরাজের কন্যা; শাপভ্রষ্টা হয়ে ইনি বিদ্যাধরী হন। অযোধ্যার রাজা সহস্রানীকের পুত্র উদয়নের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। উদয়নের ঔরসে ললিতার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন ললিতা শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে প্রস্থান করে।

(৩) রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে একজন। গোলোকে রাধিকার লোমকূপ

হচ্ছে এই সকল গোপিনীর জন্ম (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)। পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে, যিনি ললিতা তিনিই দুর্গা, এবং রাধিকা ও ললিতার কোন ভেদ নাই।

লিঙ্গ—শিবমূর্তি বিশেষ। শিবের দ্যোতক মূর্তি। এই প্রতীক হিসাবে শিব পূজিত হয়ে থাকেন। বেদে অবশ্য এই উল্লেখ দেখা যায় না। শিবপুরাণে এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলেছেন—আমি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু এই ১২টি স্থানে আমি লিঙ্গাকারে বাস করি। (১) গুজরাটের সোমনাথে; (২) কৃষ্ণা নদীর কাছে শ্রীশৈলে বা মল্লিকার্জুনে; (৩) উজ্জয়িনীর মহাকালে; (৪) নর্মদা তীরে ওঙ্কার মান্ধাতার মন্দিরে; (৫) উজ্জয়িনীর অমরেশ্বরে; (৬) দেওঘরের বৈদ্যনাথে; (৭) রামেশ্বরে; (৮) রাজমহেন্দ্রী জেলার ভীবসঙ্করে; (৯) কাশীর বিশ্বেশ্বরে; (১০) গোমতী তীরের ত্র্যম্বকে; (১১) গোতম; (১২) হিমালয়ের কেদারনাথে।

লোক—পৃথিবী বিশ্বজগতের অংশ। পৃথিবী অর্থে সাধারণতঃ ত্রিলোক বুঝায়—স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। অন্য মত অনুসারে পাতাল ছাড়া ৭টি লোক আছে। যেমন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জপ, তপ, সত্য—এই সপ্তলোক। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন মতে ৮টি লোক আছে। যথা—ব্রহ্মলোক, পিতৃলোক, সোমলোক, ইন্দ্রলোক, গন্ধর্বলোক, রাক্ষসলোক, যক্ষলোক, পিশাচলোক। সুশ্রুতে লেখা আছে, লোক দুই প্রকার—স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, তৃণ, লতা—স্থাবর এবং পশু, পক্ষী, কীট, মানুষ প্রভৃতি জঙ্গম। এই স্থাবর ও জঙ্গম লোকদ্বয় উষ্ণ ও শীত ভেদে আবার আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত ভেদে বিভক্ত। এই দুই লোকের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চার প্রকার—স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ। একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের অধিষ্ঠাতা।

লোকপাল—পৃথিবীর অধ্যক্ষ বা রক্ষক। পৃথিবীর অষ্ট দিকে অষ্টদিকপাল অধিষ্ঠিত। পূর্ব দিকের অধিপতি ইন্দ্র, দক্ষিণ-পূর্বের অগ্নি, দক্ষিণের যম, দক্ষিণ-পশ্চিমের সূর্য, পশ্চিমের বরুণ, উত্তর-পশ্চিমের বায়ু, কিম্বা ঈশানের ও উত্তরের কুবের, উত্তর-পূর্বে সোম। প্রত্যেক দিকপালের একটি করে রক্ষক আছে। তারা দিকপালদের অধিকৃত স্থানকে রক্ষা করে। এই সব রক্ষকরা হস্তী। ইন্দ্রের হস্তীর নাম ঐরাবত, অগ্নির হস্তীর নাম পুণ্ডরীক, যমের হস্তীর নাম বামন, সূর্যের হস্তী কুমুদ; বরুণের হস্তী অঞ্জনা, বায়ুর হস্তী পুষ্পদন্ত; কুবেরের হস্তী সর্বভৌম, সোমের হস্তী সুপ্রতিক।

লোপামুদ্রা—অগস্ত্যের স্ত্রী। যিনি নারীদের রূপাভিমান লোপ করেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁর পিতৃগণকে এক বিবরের মধ্যে লম্বমান থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তাঁরা এই অবস্থায় আছেন। পিতৃগণ উত্তরে বলেছিলেন, অগস্ত্য যেন পুত্র উৎপাদন করে তাঁর এই পিতৃগণকে নরক হতে উদ্ধার করেন। তখন অগস্ত্য বলেছিলেন, তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করবেন। তখন অগস্ত্য সমস্ত প্রাণীর উত্তম অঙ্গের সমন্বয়ে এক অদ্বিতীয়া সুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন। সেই সময়ে সন্তান-কামনায় বিদর্ভরাজ তপস্যানিরত ছিলেন। অগস্ত্য আপনার নির্মিত এই কন্যাকে বিদর্ভরাজের হাতে অর্পণ করলেন। বিদর্ভরাজ-গৃহে পালিতা হয়ে এই কন্যা লোপামুদ্রা নামে পরিচিতা হন। লোপামুদ্রার যখন যৌবনাবস্থা, তখন অগস্ত্য বিদর্ভরাজের কাছে এঁকে প্রার্থনা করলেন। রাজার অনিচ্ছা থাকলেও ঋষির শাপের ভয়ে ও লোপামুদ্রার অনুরোধে ঋষির হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করা হল। ঋষির অনুরোধে বহুমূল্য বসন ও আভরণ ত্যাগ করে বল্কল ও চীর পরিধান করে লোপামুদ্রা স্বামী অগস্ত্যের অনুগমন করলেন। গঙ্গাতীরে এসে দুই জনে উৎকট তপস্যায় রত হন। বহুকাল পর একদিন লোপামুদ্রাকে ঋতু-স্নাতা দেখে অগস্ত্য সঙ্গমপ্রার্থী হয়ে তাঁকে আহ্বান করলেন। লোপামুদ্রা বললেন, পুত্রের জন্য যখন তাঁকে বিবাহ করা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন; কিন্তু তার পূর্বে তিনি পিতৃগৃহের অনুরূপ শয্যা, বসন ও ভূষণাদি প্রার্থনা করলেন। কারণ, চীর কাষায় বাস তিনি অপবিত্র করতে চান না। অগস্ত্যের পক্ষে এই রাজোচিত বসন, ভূষণ ও শয্যা সংগ্রহ করা অসম্ভব; তা সত্ত্বেও লোপামুদ্রা স্বামীর সহিত মিলিত হতে চাইলেন। তখন অগস্ত্য বাধ্য হয়ে ধন আহরণের জন্য যাত্রা করে প্রথমে শ্রুতর্বা রাজার কাছে গেলেন, কিন্তু রাজার অর্থানুকূল্য না থাকায় অগস্ত্য তাঁর কাছ থেকে ধন গ্রহণ করলেন না। পর পর তিনি আরোও দুইটি রাজার কাছে গেলেন, কিন্তু সেখানেও কৃতকার্য না হওয়ায় শেষে বাতাপি দানবের ভ্রাতা ইল্বলের কাছে এলেন। ইল্বল মেষরূপধারী বাতাপির মাংস দিয়ে ঋষিকে পরিতৃপ্ত করলেন। ইল্বল বাতাপিকে বার বার ডাকা সত্ত্বেও যখন সে এল না, তখন অগস্ত্য বললেন, তিনি বাতাপিকে জীর্ণ করে ফেলেছেন। তখন ইল্বল ভীত হয়ে ঋষিকে প্রচুর অর্থ দিলেন। অগস্ত্য এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করে গৃহে ফিরে এলে লোপামুদ্রা ঋষিকে একটি

পবিত্র ও বলবান পুত্র উৎপাদন করতে বললেন। যথাসময়ে দুই জনে মিলিত হলে লোপামুদ্রা গর্ভবতী হলেন, এবং ঋষি অগস্ত্য বনগমন করলেন্। সাত বৎসর পরে এক রূপবান ও বেদজ্ঞান-সম্পন্ন পুত্রের জন্ম হলো। পুত্রের নাম হলো ইধ্মবাহ। তপস্যার প্রভাবে এই পুত্র পিতার উপযুক্ত পুত্র হয়েছিলেন (মহাভারত—বনপর্ব)।

লোমপাদ—ইনি অঙ্গরাজ্যের রাজা। লোমপাদ অযোধ্যার রাজা দশরথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দশরথের কন্যা শান্তাকে তিনি নিজের কন্যারূপে পালন করেন। তিনি দেশে অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্য-শৃঙ্গকে বারঙ্গনা কর্তৃক লুব্ধ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। ঋষ্যশৃঙ্গ উপস্থিত হতেই বৃষ্টিধারায় তাঁর রাজ্য সুশীতল ও শস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

লোমশ—একজন মহর্ষি। ইনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা ধরে অনেকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ইনি ব্যাসের আদেশে বনবাসী পাণ্ডবদের সঙ্গে থেকে তাঁদের বহু তীর্থ দর্শন করান ও নানা রকম উপদেশপূর্ণ পৌরাণিক গল্প বলে পাণ্ডবদের চিত্ত বিনোদন করতেন (মহাভারত—বন)। লোমশ মুনির কল্পে কল্পে এক একটি লোম বিনাশ হোত বলে ইনি এই নামে পরিচিত হন (পদ্ম পুরাণ)।

লোমহর্ষণ—রোমহর্ষণ দেখুন।

লৌহিত্য—(১) মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী অমোঘাকে একদিন আশ্রমে একাকী দেখে ব্রহ্মা তাঁর রূপে মুগ্ধ হন। কিন্তু সতী অমোঘার শাপভয়ে তাঁকে ধর্ষণ করতে সাহসী না হয়ে ব্রহ্মা আশ্রম-দ্বারে বীর্যপাত করে পলায়ন করেন। শান্তনু ফিরে এসে হংস-পদচিহ্ন দেখে সন্দিগ্ধ হন। শেষে স্ত্রীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে স্ত্রীকে বললেন, লোক-হিতের জন্য তুমি এই বীর্য পান কর। অমোঘা বললেন—আপনি নিজে পান করে আমাকে প্রসাদ দিন। এইরূপ ব্যবস্থার পর অমোঘা গর্ভবতী হলেন। তাঁর প্রসূত ব্রহ্মার পুত্র কৈলাস, গন্ধ-মাদন, জারুধি ও সংবর্তক—এই চারটি পর্বত বেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ডে জলরাশিরূপে অবস্থান করতে থাকেন। মাতৃহত্যা পাপ হতে মুক্ত হবার জন্য জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম এই কুণ্ডে স্নান ও জলপান করে শাপমুক্ত হন। সমস্ত পাপ দূর হওয়ায় জগতের হিতার্থে তিনি ঐ ব্রহ্মকুণ্ডের পূত জলরাশিকে লৌহিত্য সরোবর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত করবার জন্যে নিজের পরশু দ্বারা প্রবাহ-পথ খনন করেন। এই জন্যই ব্রহ্মপুত্র 'লৌহিত্য' নামে পরিচিত হন।

(২) অমোঘার গর্ভে ব্রহ্মবীর্যে যে জলরাশী উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম-পুত্রকে শান্তনুমুনি চারিটি পর্বতের মধ্যস্থলে স্থাপন করেন। পর্বতের কুণ্ডমধ্যে এই পুত্র বৃদ্ধি পেতে

থাকে। পরশুরাম মাতৃ-হত্যার পাপ স্খালনের জন্য এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে শাপমুক্ত হন। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য পরশুরাম পরশু দ্বারা পথ প্রস্তুত করে ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত করে দেন। সেই ব্রহ্মপুত্র নদ নিকটের লোহিত সাগরে পতিত হয়। পরশুরাম আবার কুঠার দ্বারা পথ খনন করে ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করে দেন। লোহিত সরোবর হতে নিঃসৃত হওয়ায় এই ব্রহ্মপুত্র নদের নাম হয় লৌহিত্য। (কালিকা পুরাণ)।

লোলা—একজন দানব। এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মধু দৈত্য। (রামায়ণ—উত্তর)।

লৌহ ভীম—লৌহ-রচিত ভীমের প্রতিমূর্তি। দুর্যোধন এই লৌহমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনছলে ভীমকে নিহত করবার জন্য হাত প্রসার করলে কৃষ্ণ ভীমের পরিবর্তে লৌহভীমমূর্তি প্রদান করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সুদৃঢ় আলিঙ্গনে লৌহমূর্তি চূর্ণ হয় (মহাভারত)।

শ

শকুনি—গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র ও গান্ধারীর ভ্রাতা ও দুর্যোধনাদির মাতুল। ইনি দুর্যোধনের একজন প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে তাঁকে অন্যায় কর্মে সর্বদা প্ররোচিত করতেন। তাঁরই প্ররোচনায় দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনি অতি অভিজ্ঞ দ্যূতক্রীড়ক ছিলেন। কপট ক্রীড়াতেও তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। এই কপট দ্যূতক্রীড়ার দ্বারাই তিনি পাণ্ডবদের সর্বস্ব জয় করেছিলেন এবং পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর বনবাসের কারণ হন। প্রধানতঃ তাঁরই প্ররোচনায় দ্যূতক্রীড়ার সভাক্ষেত্রে দ্রৌপদীর অবমাননা হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শকুনি কৌরবপক্ষে থেকে যথাসাধ্য যুদ্ধ করেন। বৃষক ও অচল নামে তাঁর দুই ভ্রাতাকে অর্জুন নিহত করেন। অর্জুনকে বধ করতে চেষ্টা করলে অর্জুনের হস্তে এঁর পরাজয় ও যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করতে হয়। কিন্তু দুর্যোধনাদি আশ্বাসবাক্য দিয়ে তাঁকে পুনর্বার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। এইবার তিনি ভীমের হস্তে লাঞ্ছিত হওয়ায় পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। পরে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে এলে তিনি পুত্রসহ সহদেবের হস্তে নিহত হন। শকুনির পুত্রের নাম উলূক।

শকুন্তলা—পূর্বকালে ঋষি বিশ্বামিত্রকে ঘোর তপস্যায় রত দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবস্ত্রা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র মেনকার সহিত মিলিত হন। মিলনের ফলে বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার

গর্ভে কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র অপ্সরা মেনকাকে বিদায় দিয়ে আবার তপস্যায় রত হন। তখন মেনকা সদ্যোজাতা কন্যাকে বন-মধ্যে মালিনী নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। এই পরিত্যক্তা কন্যা শকুন্ত অর্থাৎ পাখী কর্তৃক রক্ষিত হয়ে মহর্ষি কণ্বের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহর্ষি কণ্বই নিজের আশ্রমে এনে এঁকে নিজের কন্যার ন্যায় পালন করতে থাকেন। শকুন্ত কর্তৃক রক্ষিতা বলে কন্যাটির নাম হয় শকুন্তলা। এই সময় একদিন মহারাজ দুষ্মন্ত বন-মধ্যে মৃগয়া করতে এসে শ্রান্ত হয়ে কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলা রাজাকে যথোচিত অতিথি সৎকার করেন। শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে কণ্বমুনির ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন; কিন্তু রাজা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ায় শকুন্তলা রাজাকে বলেন যদি নিতান্তই তাঁকে তাঁর স্ত্রী হতে হয়, তবে শকুন্তলার গর্ভে যে পুত্র হবে তাকেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে উত্তরাধিকারী করতে হবে। প্রেম-মুগ্ধ রাজা শকুন্তলার কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে তাঁকে বিবাহ করে কিছুদিন সেখানে সুখে বাস করার পর নিজ রাজ্যে ফিরে যান। এই সময় শকুন্তলা একটি সুকুমার শিশুর জন্ম দেন। এই বালক অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিমান ছিল এবং সর্বপ্রাণীকে দমন করতে পারতো বলে এর নাম হলো সর্বদমন। কণ্বমুনি একদিন শকুন্তলাকে বললেন, বালকের এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার সময় হয়েছে। তখন শকুন্তলা তাঁর পুত্রের সহিত দুষ্মন্তের কাছে উপস্থিত হলেন এবং পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে রাজাকে অনুরোধ করলেন। রাজা পূর্বের সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হওয়ায় স্ত্রীকেও চিনতে পারলেন না; তিনি সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করে শকুন্তলা ও রাজকুমারকে বিদায় দেন। তখন দৈববাণী হলো—রাজা দুষ্মন্তই পুত্রের পিতা এবং এর নাম 'ভরত' হোক। এই দৈববাণী শুনে রাজা শকুন্তলা ও পুত্রকে গ্রহণ করলেন।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলার' আখ্যান সামান্য অন্যরূপ। মহারাজ দুষ্মন্ত বিবাহের পর আশ্রম ত্যাগের সময় শকুন্তলাকে একটি স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দান করে যান। একদিন শকুন্তলা যখন স্বামিবিচ্ছেদে চিন্তামগ্না, সেই সময় দুর্বাসা মুনি আশ্রমে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। কিন্তু শকুন্তলা তখন এতই চিন্তামগ্না যে, দুর্বাসার আগমন লক্ষ্যই করলেন না। তখন ক্রুদ্ধ দুর্বাসা তাঁর [illegible]

অবহেলা দেখে শকুন্তলাকে শাপ দেন—যার জন্য সে এমন তন্ময় হয়ে আছে, স্মরণ করিয়ে দিলেও সে ব্যক্তি শকুন্তলাকে চিনতে পারবে না। তখন শকুন্তলার দুই সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুর্বাসাকে অনেক অনুরোধ করার পর ঋষি বললেন—কোন অভিজ্ঞান দেখলে শকুন্তলার শাপমোচন হবে। শকুন্তলার এত তন্ময়তা এসেছিল যে, শাপের কথা তিনি জানতে পারেন নি। কণ্ব ফিরে এসে শকুন্তলার পরিচয় ও গর্ভসঞ্চারের কথা জানতে পেরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দেন। দুর্বাসার শাপে শকুন্তলার কথা দুষ্মন্ত একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হলে শকুন্তলা রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন। কারণ, সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়টি তখন তাঁর কাছে ছিল না। কোন সময়ে দৈবক্রমে বস্ত্রাঞ্চলবদ্ধ অঙ্গুরীয়টি স্নানের সময় জলে পড়ে গিয়েছিল। এরপর এক ধীবরের কাছ হতে সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি পেয়ে দুষ্মন্তের পূর্ব ঘটনা মনে পড়ে যায়। তখন তিনি শকুন্তলা ও পুত্রকে ফিরিয়ে আনেন। এই পুত্র ভরত নামে খ্যাত হয়ে পিতৃরাজ্য পান। এই ভরতের নামানুসারেই এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ।

শক্তি—(১) তন্ত্রে ষোলটি স্বরবর্ণের ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। ঐ সকল শক্তি রুদ্রের ক্রোড়ে বাস করেন। এঁদের মূর্তি সিঁদুরের মত রক্তবর্ণ। সকলের হাতে রক্তোৎপল ও নরকপাল আছে।

(২) ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতাদের নিজ নিজ শক্তি আছে। এঁরা নিজেদের দেবগণের অংশভূতা। প্রয়োজনমত এঁরা দেব-তেজ হতে উদ্ভূতা হয়ে নিজ নিজ দেবগণকে সাহায্য করেন। রক্তবীজের সঙ্গে চণ্ডিকার যুদ্ধকালে এরূপ শক্তি উদ্ভূতা হয়ে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন।

শক্তিশেল—এই ভীষণ বৃহৎ অস্ত্র ময়দানব কর্তৃক নির্মিত। এই অস্ত্র রাবণের নিকট ছিল। শক্তিশেল অষ্টঘণ্টাযুক্ত, বজ্রনিনাদী, মহাবেগবান এবং সর্প-জিহ্বার মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বিচ্ছুরণকারী। লঙ্কা-যুদ্ধে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি এই অব্যর্থ শক্তিশেল নিক্ষেপ করেন। হনুমান ওষধি পর্বতের দক্ষিণ শিখর থেকে বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, মৃতসঞ্জীবনী ও সন্ধানী—এই চার প্রকার মহৌষধি আনতে গেলেন, কিন্তু ওষধি খুঁজে না পাওয়ায় পর্বতের শৃঙ্গ উৎপাটন করে নিয়ে এলেন। এইসব ওষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করেন।

শক্তি$_২$—ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র। এঁর মাতার নাম অরুন্ধতী। শক্তি$_২$র স্ত্রী অদৃশ্যন্তী ও পুত্র পরাশর।

কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে

সংকীর্ণ পথে চলছিলেন। এমন সময়ে সেই পথে বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তিকে আসতে দেখে কল্মাষপাদ তাঁকে পথ ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। উত্তরে শক্তি বললেন—তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁকে পথ ছেড়ে দেওয়া রাজার সনাতন ধর্ম। শক্তি পথ ছেড়ে দিলেন না দেখে কল্মাষপাদ তাঁকে কশাঘাত করলেন। তখন শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে শাপ দিলেন—তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হও। পূর্বে কল্মাষপাদকে যজমানরূপে পাবার জন্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা হয়। এই সময়ে বিশ্বামিত্রের আদেশে অভিশপ্ত কল্মাষপাদের শরীরে কিংকর নামে এক রাক্ষস প্রবেশ করে। তারপর এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এসে মাংস ও অন্ন প্রার্থনা করলেন, কিন্তু রাজার পাচক রাজাকে জানালেন যে, মাংস নাই। তখন রাক্ষসাবিষ্ট রাজা কল্মাষপাদ পাচককে নরমাংস রন্ধন করতে বললেন। সেই নরমাংস ব্রাহ্মণকে আহার করতে বললে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে বুঝতে পেরে রাজাকে শাপ দিলেন—রাজা কল্মাষপাদ নরমাংসভোজী হবে। শক্তি ও ব্রাহ্মণের শাপে রাক্ষসাবিষ্ট কল্মাষপাদ প্রথমেই শক্তিকে বধ করে ভক্ষণ করে ফেললেন। তারপর বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রকে ভক্ষণ করলেন।

শম্ভু—ব্রাহ্মণ-পুত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে—ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্ঞান-বলে দেহ হতে ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত বেদ-বেদাঙ্গবিৎ পুত্রদের সৃষ্টি করেন। এঁদের নাম—অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রতু, বশিষ্ঠ, বোঢ়ু, কপিল, আসুরি, কবি, শম্ভু, শঙ্খ, পঞ্চশাখ ও প্রচেতা।

শঙ্কর—শিব। মহাদেব সকলের কল্যাণ করেন বলে এঁর নাম শঙ্কর। স্কন্দ পুরাণে শিব নিজেই বলেছেন—ভক্তদের ধ্যানে তুষ্ট হয়ে তাদের পবিত্র ও নিরাময় করার জন্য আমি শঙ্কর ও ভূতনাথ নামে অভিহিত।

শঙ্খ—(১) বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সপ্তম দিনে দ্রোণকর্তৃক নিহত হন। (২) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ।

শঙ্খচূড়—একজন দৈত্য। সুদামা নামে একজন গোপ রাধিকার শাপে অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করে। তখন তার নাম হয় শঙ্খচূড়। তপস্যা বলে শঙ্খচূড় ব্রহ্মার কাছ থেকে এক কবচ লাভ করে দেবতাদের অজেয় হয়। ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিবাহ হয়। দেবতারা অধিকার হতে চ্যুত হয়ে প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মা ও শিবের সঙ্গে বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু বলেন, শঙ্খচূড়ের শাপের অবসান হবার সময় এসেছে। মহাদেব তাঁর শূল দ্বারা এই দানবকে

সংহার করবেন। শঙ্খচূড় শিবের প্রদত্ত কবচ ধারণ করে আছেন; সেই কবচ তার কণ্ঠে থাকতে কেহ তাকে বধ করতে পারবে না। সেই জন্ত বিষ্ণু ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে ঐ কবচ চেয়ে নেবেন। আর ব্রহ্মা আরও বর দিয়েছিলেন যে, শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট না হলে কেহ তাকে বধ করতে পারবে না। এই বিষয়েও একটা উপায় অবলম্বন করতে হবে। এরপর শিব শঙ্খচূড়ের কাছে গিয়ে নানা স্তোবকাক্যে দেবতাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। অরাজী হওয়ায় তিনি বললেন যে, এর ফলে দেবতারা তার সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করে তাঁদের রাজ্য অধিকার করবেন। এর ফলে দেবতাদের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এই যুদ্ধের সময় বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশ ধরে তার কাছ থেকে কবচ গ্রহণ করলেন, এবং শঙ্খচূড়ের রূপ ধরে তুলসীর কাছে গিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করলেন। তারপর শিব বিষ্ণু-দত্ত শূল দ্বারা শঙ্খচূড়কে নিহত করলেন। শঙ্খচূড় শাপমুক্ত হয়ে আবার গোলোকে ফিরে গেলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)।

শচী—ইন্দ্রের স্ত্রী। ইন্দ্র ও শচীর জয়ন্ত নামে এক পুত্র ও জয়ন্তী নামে এক কন্যা হয়। রামায়ণ ও পুরাণে ইনি দৈত্য পুলোমনের কন্যা। ইন্দ্র এঁর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং এঁর পিতার অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য ইন্দ্র পুলোমনকে হত্যা করেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে অজ্ঞাতবাসে থাকেন। তখন দেবতারা ইন্দ্রের অদর্শনে শঙ্কিত হলেন এবং পরস্পর মন্ত্রণা করে নহুষ রাজাকে দেবরাজ-পদে মনোনীত করেন। নিজের ঐশ্বর্যে মত্ত নহুষ শচীকে স্ত্রী-রূপে পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন দেবগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণায় শচী নিজের আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। ঋগ্বেদে শচীর নাম কয়েকবার উল্লেখ আছে। নারীদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে ভাগ্যবতী। কারণ, বার্ধক্যের জন্য এঁর স্বামীর কোনদিন মৃত্যু হবে না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, এঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র অন্যান্য দেবীদের প্রত্যাখ্যান করে এঁকেই বরণ করেন।

শতক্রতু—ইন্দ্রের এক নাম। ইন্দ্র শত্রুদের জয় করবার জন্য পর পর এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই জন্য এঁর নাম শতক্রতু (মহাভারত—শান্তি)।

শতদ্রু—পঞ্চনদের অন্যতম। বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় রাক্ষসরূপী কল্মাসপাদ কর্তৃক বশিষ্ঠের শত পুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হলে পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ বহুপ্রকারে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেন। তথাপি তাঁর মৃত্যু না হওয়ায় তিনি হস্ত-পদ বন্ধন করে এই নদে

ঝাঁপ দেন। মহর্ষির মৃত্যুর পরিবর্তে এই নদ শতধা হয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে এর শতদ্রু নাম হয়।

শতধনু—এক জন রাজা। এঁর স্ত্রীর নাম শৈব্যা। একবার কার্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করে স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয়ে গঙ্গা জলে স্নান ও বিষ্ণুর পূজা করে উঠলে তাঁরা এক পাষণ্ডকে দেখতে পান। রাজা শতধনু তার সঙ্গে আলাপ করেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী পাষণ্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না। উপোষিত অবস্থায় পাষণ্ডের সঙ্গে আলাপ করাতে রাজা জন্মান্তরে কুকুর হয়ে এবং তাঁর স্ত্রী এক রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর শতধনু ক্রমে ক্রমে শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী প্রতিবারই কাশীরাজ-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি জন্মেই জন্তুরূপী শতধনুর সঙ্গে রাজকন্যারূপী তাঁর স্ত্রীর দেখা হত। রাজকন্যা জন্তুরূপী স্বামীর যথাসাধ্য সেবা করতেন এবং তাঁকে পূর্বজন্মের পাপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে পূর্বগৌরব ও জীবনলাভ করতে অনুরোধ করতেন। অবশেষে শতধনু জনকরাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করলেন। পিতার মৃত্যুর পর শতধনু রাজা হয়ে সম্মান ও খ্যাতিলাভ করে স্বর্গগামী হলে স্ত্রীও সহমৃতা হলেন (বিষ্ণু পুরাণ)।

শতধন্বা—শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক-মণি উদ্ধার করে সত্রাজিতকে ফিরিয়ে দেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সত্রাজিত নিজ কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন; কিন্তু শতধন্বা, অক্রূর প্রভৃতি যাদব-রাজারা পূর্বেই সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। তাঁদের কারো সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ না দেওয়ায় তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের সকলের প্ররোচনায় শতধন্বা সত্রাজিতকে বধ করে স্যমন্তক-মণি অধিকার করলেন। সত্যভামার কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করতে মনস্থ করলেন। শতধন্বা এই সংবাদ জানতে পেরে কৃতবর্মা, অক্রূর ইত্যাদির সাহায্য প্রার্থনা করলেন; কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন না। তখন শতধন্বা অক্রূরের কাছে সেই মণি গচ্ছিত রেখে পলায়ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামের সঙ্গে পশ্চাদানুসরণ করে শতধন্বাকে বধ করলেন (বিষ্ণু পুরাণ)।

শতপথব্রাহ্মণ—শত অধ্যায়ে বিভক্ত বেদের অংশ বিশেষ। ইহা শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ এবং মধ্যন্দিন ও কাণ্ব—দুই শাখায় বিভক্ত। মধ্যন্দিনে ১৪ কাণ্ড ও শত অধ্যায় আছে। এই জন্য এর নাম শতপথব্রাহ্মণ। চতুর্দশ কাণ্ডের প্রথম নয়টি অতি প্রাচীন। দশম ও একাদশ কাণ্ডে অগ্নি চয়নের

কথা আছে ; দ্বাদশ কাণ্ড প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক। ত্রয়োদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ ও নরমেধের কথা এবং দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত, কাশীরাজ, ধৃতরাষ্ট্র ও পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিক রাজগণের উল্লেখ আছে। চতুর্দশ কাণ্ডকে আরণ্যক বলে। এর শেষ ছয়টি অধ্যায়ের নাম বৃহদারণ্যকোপনিষদ। এর তৃতীয় অধ্যায়ে জনকরাজের পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক তর্কে পরাজিত সমবেত পণ্ডিতগণের বিষয় বর্ণিত আছে।

শতমুখ—এক দানব। ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুর উৎপাদন করেন। এই অসুর শতাধিক বৎসর যাবৎ নিজ শরীরের মাংস আগুনে আহুতি দিয়ে মহাদেবের আরাধনা করত। মহাদেব এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। তখন শতমুখ বলে, আপনার দয়ায় যেন আমার সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জন্মে এবং ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে থাকে। এইরূপ বর শিব তাকে দানকরেন (মহাভারত—অনুশাসন)।

শতরূপা—প্রথম নারী। এক বর্ণনা হিসাবে ইনি ব্রহ্মার কন্যা ; ব্রহ্মা কন্যার সহিত অজাচারে প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের জন্মদান করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, ইনি ব্রহ্মার স্ত্রী, কিন্তু মনুর মাতা নহেন। মনুর বিবরণ হিসাবে ব্রহ্মা নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করেন—নর ও নারী। এদের মিলনের ফলে মনুর জন্ম হয়। এই নারীকে সাবিত্রীও বলা হয়।

মৎস্য পুরাণে আছে, দশ জন মানস-পুত্র সৃষ্টি করবার পর ব্রহ্মা এক কন্যা সৃষ্টি করেন। এই কন্যাই শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রাহ্মণী নামে খ্যাতা। ব্রহ্মা এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁকেই বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভে ব্রহ্মা হতে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। অন্য মতে, ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মার মানস-পুত্ররা প্রজা-সৃষ্টি করতে অসম্মত হলে ব্রহ্মা প্রজা-বৃদ্ধির জন্য নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—একভাগ নারী, (শতরূপা), আর এক ভাগ পুরুষ। স্বায়ম্ভুব মনু হতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

শতযূপ—কেকয় দেশের রাজা। ইনি সংসারে বিতরাগ হয়ে বৃদ্ধাবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দান করে বনবাসে যান। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যখন বনে গমন করেন, তখন শতযূপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা পরস্পর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবং ধৃতরাষ্ট্র পরম সুখে শতযূপের আশ্রমে বাস করেন (মহাভারত—আশ্রম)।

শত্রুঘ্ন—রাজা দশরথের স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। ইনি লক্ষ্মণ ও রামের

অনুগত ও সহায় ছিলেন। রামের বন গমনে পুত্রশোকে দশরথ দেহত্যাগ করেন। তখন শত্রুঘ্ন ভরতের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে ছিলেন। শত্রুঘ্নের সহিত জনকরাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্যতমা কন্যা শ্রুতকীর্তির বিবাহ হয়। রামের নির্বাসনে ইনি এতদূর বিরক্ত ও মর্মাহত হয়েছিলেন যে সকল অনর্থের মূল কৈকেয়ীর দাসী মন্থরাকে নিগৃহীত করেন এবং কৈকেয়ীকে কঠোর ভর্ৎসনা করেন। রাম বনবাসের পর রাজ্যভার গ্রহণ করলে শত্রুঘ্ন ভরতকে রাজকার্যে সহায়তা করেন। একসময় যমুনাতীরবাসী মহর্ষিরা মধুদৈত্যের পুত্র লবণ রাক্ষসের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠলে, শত্রুঘ্ন রামের আদেশে তার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাকে শূলহীন দেখে আক্রমণ করে বিনষ্ট করেন। দেবতা প্রদত্ত শূলের জন্যই মধুদৈত্যের ন্যায় তার পুত্র লবণও অজেয় ছিল। লবণবধের পর শত্রুঘ্ন লবণের মথুরা রাজ্য নিজের পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতীকে অর্পণ করেন। এরপর শত্রুঘ্ন রামের সহিত সরযূ নদীতে প্রবেশ করে যোগবলে দেহত্যাগ করেন (রামায়ণ)।

শত্রুজিৎ—রাজা বিশেষ। এঁর পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজ কুবলাশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন।

শতানন্দ—মহর্ষি জনকের কুলপুরোহিত। মহর্ষি গৌতমের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়। ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করলে গৌতম জমদগ্নির মত পুত্র শতানন্দকে মাতৃহত্যার আদেশ দিয়ে তপস্যা করতে যান; কিন্তু শতানন্দ পরশুরামের ন্যায় মাতৃহত্যা না করায় পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা হলো ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। এমন সময় গৌতম অহল্যাকে নিরপরাধ জানতে পেরে ফিরে এলেন এবং তখনও শতানন্দ মাতার প্রাণ নাশ করেন নাই দেখে সন্তুষ্ট হয়ে শতানন্দকে আশীর্বাদ করলেন।

শতানীক—(১) দ্রৌপদীর গর্ভজাত পুত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে দ্রৌপদীর শিবিরে নিদ্রিত অবস্থায় অন্য চার পুত্রের সহিত ইনিও অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হন। (২) মহর্ষি বেদব্যাসের এক শিষ্য। (৩) বিরাট রাজের ভ্রাতা।

শনি—সূর্যের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী ছায়ার গর্ভে দুই পুত্র শনি ও সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। চিত্ররথের কন্যা এঁর স্ত্রী। এক সময় শনি ধ্যানমগ্ন ও পূজারত ছিলেন, সেই সময় তাঁর স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয়ে সুন্দর বেশভূষা করে তাঁর কাছে এসে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন; কিন্তু ধ্যানমগ্ন শনি স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না এবং তাঁর ঋতুকাল রক্ষা করলেন না; এতে স্ত্রী ক্রুদ্ধা হয়ে স্বামীকে শাপ দেন—

তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, সেই বিনষ্ট হবে। পার্বতীর পুত্র গণেশ জন্মগ্রহণ করলে দেবতারা পুত্র দর্শন করতে এলেন। সেই সঙ্গে শনিও আসেন, কিন্তু তিনি পার্বতীর পুত্র গণেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। কারণ, স্ত্রীর অভিশাপে তিনি যার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, সেই বিনষ্ট হবে। পার্বতী এ কথা অবিশ্বাস করে শনিকে তাঁর পুত্রমুখ দর্শন করতে বললেন। তখন শনি বাধ্য হয়ে গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করামাত্র গণেশের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। পুত্রকে মস্তকহীন দেখে পার্বতী শনিকে শাপ দিলেন। এর ফলে, শনি খোঁড়া হয়ে গেলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)।

শবর—(১) ঋক্‌বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি গাভীদের বিষয়ে কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। (২) ম্লেচ্ছজাতি।

শবরী—নিম্নকুলোদ্ভবা বৃদ্ধা তপস্বিনী ও ব্রহ্মচারিণী। একসময় ইনি রামায়ণ-বর্ণিত পম্পা তীরে মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে মুনিদের পরিচারিকা ছিলেন। তপস্বীরা শবরীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, রাম এই আশ্রমে এলে তাঁকে দর্শন করে শবরী এমন স্থানে যাবেন যেখান হতে কেউই আর ফিরে আসে না। সেই দিন হতে শবরী রামের আগমন প্রতীক্ষা করে রইলেন। রামের জন্য শবরী প্রত্যহ মূল ফল সংগ্রহ করে রাখতেন। অবশেষে একদিন রামচন্দ্র যখন অপহৃতা সীতার অন্বেষণে সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন শবরী করজোড়ে দণ্ডায়মান হয়ে রামের চরণে পতিত হলেন। রামের প্রশ্নের উত্তরে শবরী বললেন—রামের শুভ আগমনে তাঁর তপস্যার সমাপ্তি হলো, তাঁর জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবা সফল হলো। এবারে তিনি দেবলোকপ্রাপ্ত হলেন। এইরূপে রামের সেবা করে জটাবতী চীর-অজিন-ধারিণী শবরী অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়ে স্বর্গলোকে গমন করলেন (রামায়ণ—অরণ্য)।

শবলাশ্ব—হর্যশ্ব নামে পুত্ররা নিরুদ্দিষ্ট হলে প্রজাপতি দক্ষ বৈরিণী নামে স্ত্রীর গর্ভে এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। দক্ষের এই সহস্র পুত্র শবলাশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন। নারদের পরামর্শে এঁরা অগ্রজদিগের ন্যায় মোক্ষপথের সন্ধানে চলে যান (বিষ্ণু পুরাণ)।

শমিতা—যজ্ঞাগ্নির নামান্তর। যজ্ঞে পশুবধকারী ঋত্বিককে শমিতা বলা হোত।

শমীক—মুনি বিশেষ। অভিমন্যু-পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে শরাহত ও পলায়িত মৃগকে অনুসরণ করতে করতে মহর্ষি শমীকের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। শমীক একজন ক্ষমাশীল তপস্বী এবং সেই সময় বনমধ্যে তপোরত ছিলেন। মৌনব্রতী

শমীককে বার বার মৃগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেও রাজা পরীক্ষিৎ কোন উত্তর পেলেন না। তাঁর নিরুত্তরের কারণ বুঝতে না পেরে রাজা মনে করলেন, ঋষি ইচ্ছাপূর্বক তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন। সেই জন্য রাজা পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে নিকটেই একটা মৃত সর্প দেখতে পেয়ে ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তা তুলে মুনির স্কন্ধে পরিয়ে দিলেন। শমীক রাজার এরূপ আচরণেও নির্বিকার হয়ে রইলেন। কিন্তু মহর্ষির পুত্র শৃঙ্গী পিতার এই অবমাননায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিসম্পাত দিলেন, পিতার গলায় মৃত সর্প জড়িয়ে দিয়ে অবজ্ঞা করাতে অদ্য হতে সপ্তম দিনে সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক তাঁকে দংশন করবে এবং রাজার মৃত্যু হবে। মৌনভঙ্গের পর এই বৃত্তান্ত জানতে পেরে শমীক পুত্রকে শাপ দেওয়ার জন্য তিরস্কার করে রাজাকে আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে সংবাদ দিলেন (মহাভারত —আদি)।

শম্বর—এক মহাবল দৈত্য। শিবের কোপানলে কন্দর্প ভস্মীভূত হয়ে কৃষ্ণের ঔরসে ও রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী রতি মায়াবতী নামে জন্মগ্রহণ করে শম্বর দৈত্যের গৃহে বাস করছিলেন। শম্বর জানতেন যে, প্রদ্যুম্নের হস্তে তাঁর মৃত্যু হবে। এই জন্য সূতিকাগৃহ হতে প্রদ্যুম্নের জন্মের ষষ্ঠ দিনে এঁকে হরণ করে সাগরে নিক্ষেপ করেন। একটি মৎস্য প্রদ্যুম্নকে গ্রাস করলে ঐ মৎস্য এক ধীবরের জালে ধৃত হয়ে শম্বরের গৃহে নীত হয়। মৎস্যের উদরে তাঁর স্বামী প্রদ্যুম্নকে চিনতে পেরে মায়াবতী তাঁকে পালন করতে থাকেন। প্রদ্যুম্ন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করলে মায়াবতীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারেন। শেষে শম্বরকে বধ করে প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করে শ্রীকৃষ্ণের ভবনে নিয়ে যান (হরিবংশ)।

শম্বুক—এক শূদ্র। সশরীরে স্বর্গবাসের আশায় শূদ্র সর্বদা কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। কিন্তু শূদ্রের তপে অধিকার ছিল না। এই অনধিকার চর্চার ফলে রাজ্যে অকালমৃত্যু দেখা দিল। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে রোদন করতে করতে এসে রামকে জানান, তাঁর এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। তিনি নিজে কোন অন্যায় কাজ, হিংসা বা পাপ করেন নি। নিশ্চয় রামের কোনও মহাপাপের জন্যে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাম এই বালককে পুনর্জীবিত না করলে ব্রাহ্মণ স্ত্রীসহ রাজদ্বারে দেহত্যাগ করবেন। ফলে, রাম ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হবেন। এই অকালমৃত্যুর কথা শুনে নারদ বলেন, সত্যযুগে ব্রাহ্মণরাই তপস্যা করতেন, তাই অকালমৃত্যু ঘটিত না;

ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, দুই জাতিই তপস্যা করতেন, তখন অধর্মের একপাদ পৃথিবীতে এল। তারপর দ্বাপর যুগে বৈশ্যরা তপস্যা করতে আরম্ভ করলে অধর্মের দ্বিতীয়পাদ পৃথিবীতে এল। হীনবর্ণ শূদ্রেরা ভবিষ্যতে কলিযুগে তপস্যা করতে আরম্ভ করবে; কিন্তু এই দ্বাপরে তাদের পক্ষে তপস্যা করা ঘোর অন্যায়। এই রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন শূদ্র তপস্যায় রত আছে। এর প্রতিবিধানের জন্যে রাম অনুসন্ধানে বহির্গত হয়ে তপস্যারত শূদ্র শম্বুককে দেখতে পেলেন এবং খড়্গাঘাতে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। এর ফলে শূদ্র শম্বুকও স্বর্গে যান এবং মৃত ব্রাহ্মণকুমারও বেঁচে উঠল (রামায়ণ)।

শর্মিষ্ঠা—অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা ও নহুষ-পুত্র যযাতির কনিষ্ঠা স্ত্রী। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সহিত ইনি বাস করতেন। এতে দেবযানীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সখ্য হয়। একদিন তাঁরা দুই জন নদীতে জলকেলি করতে যান। তাঁদের রূপে মোহিত হয়ে ইন্দ্র বায়ুর রূপ ধারণ করে দুজনের বস্ত্রগুলি মিশ্রিত করে দেন। শর্মিষ্ঠা ভুলক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরলে দেবযানী কর্তৃক তিরস্কৃত হন। দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে এই ব্যাপারে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। শর্মিষ্ঠা ক্রোধে অধীর হয়ে দেবযানীকে এক কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। সেই সময়ে রাজা যযাতি মৃগয়ায় এসে কূপে পতিত দেবযানীকে উদ্ধার করেন। শুক্রাচার্য দেবযানীর কাছ হতে শর্মিষ্ঠার এই আচরণ জানতে পেরে বৃষপর্বার গৃহ ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হন। বৃষপর্বা দুঃখিত হয়ে শুক্রাচার্যের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শুক্রাচার্য তখন বৃষপর্বাকে বলেন, তিনি দেবযানীকে কোনক্রমে সন্তুষ্ট করুন। বৃষপর্বা দেবযানীর নিকট উপস্থিত হলে দেবযানী বলেন, সহস্র কন্যার সহিত শর্মিষ্ঠা আমার দাসী হোক এবং আমার বিবাহ হলে তারা আমার সঙ্গে স্বামীগৃহে যাক। শুক্রাচার্যের ক্রোধ নিবারণের জন্যে শর্মিষ্ঠা এই দাসীত্ব স্বীকার করলেন।

দীর্ঘকাল পরে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা বনে বিচরণরত অবস্থায় রাজা যযাতি মৃগয়ায় অন্বেষণে পিপাসার্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তখন দেবযানীর রূপে মুগ্ধ রাজা যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করেন। দেবযানীর বিবাহ হলে শর্মিষ্ঠাও তাঁর সঙ্গে দাসীরূপে যযাতির ভবনে গমন করেন। যযাতির সহিত শর্মিষ্ঠার গুপ্ত প্রণয় হওয়াতে দুই জনের গুপ্ত ভাবে বিবাহ হয়। এই গুপ্ত-মিলনের ফলে শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র হয়। তাদের নাম—দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। দেবযানী এই গুপ্ত-প্রণয়ের কথা অবগত হয়ে পিতার

কাছে আশ্রয় নিলেন। এই কার্যের জন্য শুক্রাচার্য যযাতিকে অভিসম্পাত দেন—"তুমি জরাগ্রস্ত হও।" এই শাপ প্রত্যাহারের জন্য যযাতি বহু অনুনয়-বিনয় করলে শুক্রাচার্য বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অন্যকে দান করতে পারবে। যযাতি বলেন, আপনি অনুমতি দিন যে, যে পুত্র আমাকে তার যৌবন দেবে, সেই আমার রাজ্য পাবে। শুক্রাচার্য বললেন, তাই হবে। দেবযানীর গর্ভে যযাতির দুই পুত্র যদু ও তুর্বসু জন্মগ্রহণ করে। পরপর সমস্ত পুত্রকে যযাতি তাঁর জরা গ্রহণ করে তার পরিবর্তে তাদের যৌবন দিতে বললেন, কিন্তু সকলেই অসম্মতি প্রকাশ করলে। কেবল শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরুই শেষে জরা গ্রহণ করে পিতাকে নিজের যৌবন ভোগ করতে দিলেন। সহস্র বৎসর পরে যযাতি যৌবন ফিরিয়ে দেন ও পুরুকেই রাজ্য প্রদান করেন। এই পুরুই কৌরব ও পাণ্ডবের পূর্বপুরুষ (মহাভারত—আদি)।

শর্যাতি—বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইনি একবার সৈন্য-সামন্তের সহিত সপরিবারে চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। শর্যাতির কন্যা সুকন্যা পিতার সহিত আশ্রমে এসে এক স্থানে উই ঢিবির ভিতর দুইটি উজ্জ্বল পদার্থ প্রজ্বলিত দেখে চাপল্যবশতঃ ঐ দুইটিকে শলাকাবিদ্ধ করেন। ঐ দুই উজ্জ্বল পদার্থই ছিল চ্যবনের দুই চক্ষু। শলাকাবিদ্ধের ফলে হঠাৎ অন্ধ হয়ে চ্যবন ক্রুদ্ধ হলেন। তখন তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য শর্যাতি তাঁর কন্যা সুকন্যাকে তাঁর হাতে দান করলেন। এতে চ্যবন সন্তুষ্ট হলেন।

শরদ্বান—ইনি মহর্ষি গৌতমের শিষ্য। ধনুর্বেদে এঁর যেরূপ মেধা ছিল, বেদাধ্যয়নে সেরূপ ছিল না। ইনি তপস্যারত অবস্থায় জানপদী নামে এক অপ্সরার রূপ দর্শনে কামমোহিত ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। এর ফলে শরস্তম্বে পতিত এঁর রেতঃ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্মের কারণ হয়। তাঁদের নাম কৃপ ও কৃপী। এঁরা রাজা শান্তনু কর্তৃক লালিত-পালিত হতে থাকেন। মহর্ষি শরদ্বান তপোবনে এঁদের বৃত্তান্ত জানতে পেরে রাজভবনে এসে কৃপকে ধনুর্বেদ শিক্ষাদানে পারদর্শী করে তোলেন।

শরভঙ্গ—একজন দণ্ডকারণ্যস্থ মহর্ষি। বনবাস কালে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এঁর আশ্রমে এসে আশ্চর্য ব্যাপার দেখেন—ভূমিস্পর্শ না করে স্থিত এক দিব্য রথ। সেই হরিদ্বর্ণ-অশ্ব-যোজিত রথে এক মূর্তিমান পুরুষ শরভঙ্গের সহিত আলাপে রত। রাম অগ্রসর হতেই এই দিব্যপুরুষ শরভঙ্গকে অভিবাদন করে সদলে অন্তর্হিত হন। তখন রামাদি শরভঙ্গের

কাছে গিয়ে তাঁর পদবন্দনা করেন। শরভঙ্গ এঁদের আতিথ্যের ব্যবস্থা করে কৌতূহলী রামকে বলেন, উগ্র তপস্যার বলে তিনি ব্রহ্মলোক অধিকার করেছেন। সেই জন্য ইন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। রামের মত প্রিয় অতিথিকে দেখার আশায় একদিন তিনি ব্রহ্মলোকে না গিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তারপর রামের বাসোপযোগী স্থান নির্দেশের জন্য তিনি সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে রামকে যেতে পরামর্শ দেন। পরক্ষণেই মহর্ষি শরভঙ্গ মন্ত্রোচ্চারণ করে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে ভস্মীভূত হন। সেই অগ্নি হতে তিনি অগ্নিতুল্য কুমারের রূপে উঠে ব্রহ্মলোকে গমন করেন (রামায়ণ—অরণ্য)।

শল—ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ ও মণ্ডুক-রাজকন্যা সুশোভনার জ্যেষ্ঠপুত্র। মণ্ডুকরাজের অভিশাপে ইনি ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন। রাজ্যলাভের পর শল একদা মৃগয়াকালে মৃগ ধরতে অসমর্থ হন। রাজা জানতে পারেন, মহর্ষি বামদেবের বাম্বী নামক দুই অশ্ব রথে যোজনা করলে রাজা মৃগ ধরতে সমর্থ হবেন। রাজা ঋষির কাছে অশ্ব প্রার্থনা করলে, বামদেব বললেন, তিনি কৃতকার্য হলে তা যেন প্রত্যর্পণ করেন। রাজা শিকার করে রাজধানীতে ফিরে আসেন, কিন্তু বামদেবের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও অশ্বদের প্রত্যর্পণে অস্বীকার করেন। অবশেষে বামদেবের আদেশে চার জন রাক্ষস আবির্ভূত হয়ে শূলের আঘাতে শলকে নিহত করে (মহাভারত—বনপর্ব)।

শল্য—মদ্রদেশের রাজা। পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রীর সহোদর ভ্রাতা। সুতরাং ইনি নকুল ও সহদেবের মামা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় ইনিও লক্ষ্যভেদে অকৃতকার্য হন এবং অন্যান্য রাজাদের সহিত মিলিত হয়ে লক্ষ্যবিজয়ী অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ভীম কর্তৃক পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রথমে পাণ্ডবদের দিকে যোগদান করবার ইচ্ছা থাকলেও, ইনি দুর্যোধনের সাদর নিমন্ত্রণ ও সবিশেষ মর্যাদা পেয়ে অভিভূত হয়ে কৌরব-পক্ষে যোগদান করে কর্ণের সারথি হন। অষ্টাদশ দিবসে ইনি কৌরবদের সেনাপতি পদে বৃত হয়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রসিদ্ধ শক্তি অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন (মহাভারত—শল্যপর্ব)।

শশবিন্দু—মহারাজ শশবিন্দুর এক লক্ষ স্ত্রী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। সেই পুত্রেরা প্রত্যেকে এক শত কন্যা বিবাহ করেন। কন্যারা সকলেই এক শত হস্তী, এক শত বৃষ, এক শত অশ্ব, এক শত দুগ্ধবতী গাভী এবং এক শত মেষ ও ছাগ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। মহারাজ শশবিন্দু এই সব যৌতুকসামগ্রী

দের দান করেন (মহাভারত—শান্তি)।

শশাদ—রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন। যজ্ঞের জন্য শশকের মাংস সংগ্রহার্থে ইনি পিতা কর্তৃক শিকারে প্রেরিত হন। বনে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ায় ইনি নিজেই শশকের মাংস ভক্ষণ করেন। যজ্ঞপুরোহিত বশিষ্ঠ বললেন, এই অন্যায়কাজের জন্য সমস্ত যজ্ঞই পণ্ড হয়েছে। কারণ, যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ দিয়ে এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই অন্য এঁর জন্য নাম হয় শশাদ।

শ্বফল্ক—যদুবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র। শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর। শ্বফল্ক যেখানে বাস করতেন সেখানে কোন রোগের বা অনাবৃষ্টির ভয় ছিল না। কোন সময়ে কাশী-রাজ্যে অনাবৃষ্টি হলে, কাশীরাজ শ্বফল্ককে নিজ রাজ্যে নিয়ে যান। তাঁর আগমনে রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কাশীরাজের কন্যা গান্দিনী এঁর স্ত্রী ছিলেন। ইনি পরম ধার্মিক ছিলেন (বিষ্ণু পুরাণ, হরিবংশ)।

শাকল্য—একজন ঋষি। ইনি দীর্ঘকাল শিবের আরাধনা করে বর লাভ করেন, শকল্য বেদশাখার সূত্রকার হবেন। ইনি নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বিশেষ গর্বিত ছিলেন। রাজা জনক তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের মূল্যবান ধনাদি উৎসর্গ করেন। ঐ সকল কে গ্রহণ করবে এই নিয়ে উপস্থিত ঋষিদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শাকল্যের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়। দুই পক্ষের নানারূপ প্রশ্ন ও উত্তরের পর যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে কয়েকটি প্রশ্ন করে বলেন, এই সব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে তাঁর মৃত্যু হবে। শাকল্য সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি বেদের সংহিতাকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করে বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামে পাঁচ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। এজন্য এঁর অন্য নাম ছিল বেদমিত্র এবং দেবমিত্র।

শাকম্ভরী—দেবী আদ্যাশক্তির অন্য নাম। শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হলে দেবী নিজের দেহ হতে উৎপন্ন জীবনধারক শাক দ্বারা পৃথিবীর লোককে পোষণ করেছিলেন। সেই থেকে এঁর এই নাম হয় (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

শাণ্ডিল্য—(১) একজন ভক্তিসূত্রের প্রচারকর্তা ঋষি। শাণ্ডিল্য গোত্রধারা এই মুনি প্রবর্তন করেন। এই গোত্রের তিনটি প্রবর—শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল।

শান্তনু—ইনি কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র ও মহাবীর ভীষ্মের পিতা। এঁর জন্মবৃত্তান্ত এই—মহাভিষ নামে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় এক পুণ্যবান

রাজা স্বর্গবাসের অধিকার পেলেও অন্যায় আচরণের জন্য ব্রহ্মার শাপে পুনর্বার নরজন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তখন প্রতীপ ও তাঁর স্ত্রী পুত্রলাভের আশায় তপস্যায় রত ছিলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হলো শান্তনু। শান্তনু যৌবনলাভ করলে প্রদীপ তাঁকে যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করে বনগমন করেন। পূর্বপুরুষদিগের ন্যায় শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল ছিলেন। একদা মৃগয়ায় গিয়ে ভাগীরথী তীরবর্তী উপবন অতিক্রম করবার সময় এক অনন্যসুন্দরী কন্যাকে দেখে শান্তনু অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁর পাণি-প্রার্থনা করেন। সেই কন্যা এই সর্তে সম্মত হন—তার কোন কার্য রাজার অপ্রীতিকর হলেও রাজা তা নিবারণ করবেন না। বা তাঁর বিরুদ্ধে পরুষবাক্য উচ্চারণ করলে তৎক্ষণাৎ তিনি রাজাকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। প্রতিশ্রুতি দিলে সেই কন্যা শান্তনুর মহিষী হন। কালক্রমে রাজার ঔরসে ও স্ত্রীর গর্ভে আটটি পুত্র জন্মে। সাতটি পুত্রকে জন্মমাত্রই জননী কর্তৃক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে শান্তনু মর্মাহত হলেও প্রতিশ্রুতি অনুসারে নীরব থাকেন; কিন্তু অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে রাজা পুত্রহত্যায় বাধা দিয়ে স্ত্রীর সত্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন শান্তনু জানতে পারেন তাঁর এই স্ত্রী স্বয়ং গঙ্গাদেবী এবং তাঁর পুত্ররূপে যাঁরা জন্মেছিলেন, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহাতেজা বসু। অভিশপ্ত অষ্টবসুর মধ্যে সাতজনকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করায় তাঁরা শাপমুক্ত হয়েছেন। অষ্টম বসু—তাঁর গর্ভজাত শেষ পুত্রটিকে রাজহস্তে সমর্পণ করে গঙ্গা প্রস্থান করলেন। গঙ্গার গর্ভজাত এই পুত্রের নাম হলো দেবব্রত। পুত্রের গুণমুগ্ধ হয়ে শান্তনু তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; চার বৎসর পরে শান্তনু যমুনা তীরে ভ্রমণকালে দিব্যগন্ধা পরমাসুন্দরী নৌকাচালনরতা সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হন। সত্যবতীর সঙ্গে মিলন কামনা করলে সত্যবতীর পালকপিতা দাসরাজ এই সর্ত করেন যে, সত্যবতীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে তাঁর পুত্রকে দেবব্রতের পরিবর্তে রাজসিংহাসনাধিকার দিতে হবে। ব্যথিত হলেও রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না। তখন মনঃক্ষুণ্ণ পিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রত নিজেই—কঠোর প্রতিজ্ঞা ও চরম স্বার্থত্যাগ করে। দেবব্রত স্বেচ্ছায় পিতার জন্য রাজপদ ত্যাগ করে চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করেন এবং সেই হতে 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হন। পুত্রের এই সত্যনিষ্ঠায় শান্তনু অভিভূত হন কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় মহান্ কুরুবংশ ও বিশাল রাজ্যের

ভবিষ্যৎ জেনে সত্যবতীকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এই সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র হয়—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। তিনি পুত্র দেবব্রত বা ভীষ্মকে যুদ্ধে অজেয় ও ইচ্ছামৃত্যুর বর দেন। উত্তর কালে তাঁর বাক্য সত্য বলে প্রমাণিত হয় (মহাভারত—আদি)।

শান্তা—রাজা দশরথের ঔরসজাতা ও দশরথের পরম বন্ধু অঙ্গাধিপতি রাজা লোমপাদের পালিতা কন্যা। রাজা লোমপাদ যজ্ঞ করবার জন্যে বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজ রাজধানীতে নিয়ে আসেন। যজ্ঞশেষে তিনি নিজের পালিতা কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সমর্পণ করেন (রামায়ণ—আদি)।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ইনি বলরামের প্রিয়পাত্র ছিলেন। দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে ইনি স্বয়ংবর-সভা হতে হরণ করলে কৌরবরা শাম্বকে বন্দী করে, কিন্তু বলরাম শাম্বকে এঁদের হাত হতে মুক্ত করেন। লক্ষ্মণার সঙ্গে শাম্বের যথারীতি বিবাহ হয়। একদিন বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ দ্বারকায় এলে যদুবংশীয় বীরদের মনে কুবুদ্ধি জাগে। তাঁরা শাম্বকে গর্ভিণী বেশে সজ্জিত করে মুনিদের কাছে নিয়ে এনে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করে—এঁর কি সন্তান হবে? এই প্রতারণায় মুনিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন যে—এই কৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব যদুবংশ ধ্বংস করবার জন্য ভীষণ লৌহময় মুষল প্রসব করবে। এই শাপে শাম্ব পরের দিন মুষল প্রসব করেন। পরে সাগরে নিক্ষিপ্ত সেই মুষলচূর্ণ হতে উৎপন্ন এক রকম তৃণের আঘাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়। (মহাভারত—মৌষল, বিষ্ণু পুরাণ)।

শালগ্রাম—বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ; বজ্রকীট দ্বারা চক্রযুক্ত শিলা। গণ্ডকী নদীজাত বজ্রকীট কর্তৃক চক্রযুক্ত যে শিলা পাওয়া যায়, তাকে শালগ্রাম শিলা বলে। কথিত আছে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও গণ্ডকী নদীর উত্তরে দশ যোজনব্যাপী বিস্তীর্ণ মহাক্ষেত্রে বিষ্ণু শালগ্রামে পরিণত হন। এই শালগ্রাম গণ্ডকী নদীজাত এবং অষ্টাদশ প্রকার। গঠন-রূপের বিভেদে ও লক্ষণ অনুসারে শালগ্রামের বিভিন্ন নাম প্রচলিত—লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মী-জনার্দন, রঘুনাথ, দধিবামন, শ্রীধর, দামোদর, বলরাম, রাজরাজেশ্বর, অনন্ত, মধুসূদন, গদাধর, হয়গ্রীব, নরসিংহ, লক্ষ্মীনরসিংহ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সুদর্শন, অনিরুদ্ধ। এই বিভিন্ন আখ্যার দ্বারা শালগ্রাম-শিলার ছিদ্রদ্বার, চক্র, চিহ্ন, আকার, বর্ণ, এবং ভিন্ন ভিন্ন আকার ও প্রকারভেদে সুফল বা কুফল নির্ধারিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে—

ভগবান্ কৌশলে ও ছলে শঙ্খচূড়কে নিহত করেন। শঙ্খচূড় বেশে তাঁর স্ত্রী তুলসীকে সম্ভোগ করলে তুলসী ভগবানকে অভিশাপ দেন, আপনি দয়ামায়াহীন পাষাণহৃদয়; পাষাণ রূপে আপনি এই পৃথিবীতে বাস করুন। তুলসীর এই কথায় ভগবান বলেছিলেন, তোমার শাপ ভোগের জন্যে আমি গণ্ডকীর নিকট শিলারূপে বসবাস করবো। বজ্রকীট ও কৃমি ইত্যাদি আমার শিলার ভিতর চক্র কর্তন করবে।

শাল্ব—দানব বৃষপর্বার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজক অসুর দ্বাপরে শাল্ব নামে ক্ষত্রিয় রাজা হন। কাশীরাজের তিন কন্যার স্বয়ংবর সভায় শাল্ব উপস্থিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা মনে মনে স্থির করেন, এঁর গলায় মাল্যদান করবেন। কিন্তু ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যান ও শেষে যুদ্ধে শাল্বকে পরাজিত করেন। অম্বাকে শাল্বের অনুরক্তা দেখে ভীষ্ম শাল্বের কাছে তাঁকে প্রেরণ করেন, কিন্তু ভীষ্ম দ্বারা অপহৃতা নারী অম্বাকে শাল্ব প্রত্যাখান করেন।
(মহাভারত—আদি)।

(২) ইনি শিশুপালের সখা এবং সৌভনগরের রাজা। শ্রীকৃষ্ণের শিশুপাল বধের বৃত্তান্ত শুনে শাল্ব পৃথিবী যাদব-শূন্য করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি দ্বারকাপুরী আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের শেষে দ্বারকায় ফিরে আসেন এবং চতুরঙ্গ বল নিয়ে শাল্বরাজকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে যান। শাল্ব তখন সমুদ্রের উপর তাঁর সৌভবিমানে দানব অনুচরদের সহিত অবস্থান করছিলেন। বহু মায়া-যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের আঘাতে সৌভ-বিমান বিদীর্ণ হয় এবং দ্বিখণ্ডিত শাল্বের মৃত্যু হয়।

(৩) ইনি কৌরবপক্ষীয় ম্লেচ্ছাধিপতি বীর। কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে শল্যবধের পর ইনি দুর্যোধনের একটি বিরাট হস্তীতে আরোহণ করে পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করতে থাকেন। অবশেষে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তী সহ এঁকে নিহত করেন (মহাভারত—শল্যপর্ব)।

শিখণ্ডী—দ্রুপদরাজের কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ংবরসভা হতে ভীষ্ম কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃতা হন। চিরকুমার ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য এই তিন কন্যাকে অপহরণ করেন, পূর্বে অম্বা মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন বলে ভীষ্ম এঁকে শাল্বের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু ইনি ভীষ্ম কর্তৃক প্রথমে অপহৃতা হাওয়ায় শাল্ব এঁকে আর বিবাহ করতে সম্মত হন না। 'সত্যের জয় এক দিন হবেই

হবে—এই কথা বলে অম্বা রাগে ও দুঃখে শাল্বরাজের প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন। ভীষ্মই তাঁর দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ মনে করে অম্বা ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভীষ্মের অস্ত্রশিক্ষক পরশুরামের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। পরশুরাম ভীষ্মকে বলেন যে, তুমি অম্বাকে হরণ করেছিলে বলে শাল্বরাজ অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতএব আমার আদেশে তুমি অম্বাকে গ্রহণ কর। ভীষ্ম পরশুরামের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন বলে তিনি ভীষ্মের গুরু। গুরুর আদেশ পালন করতে ভীষ্ম অসম্মত হন। তখন পরশুরামের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু এই যুদ্ধে কারও জয়লাভ হয় না। দুই জনই পরস্পরের অবধ্য। তখন পরশুরাম অম্বাকে বলেন, অম্বার এখন ভীষ্মের শরণ নেওয়া উচিত। কিন্তু অম্বা এতে রাজী না হয়ে ভীষ্মকে যুদ্ধে নিপাতিত করবেন বলে স্থির করেন। ভীষ্মের মৃত্যুর জন্য অম্বা কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তপস্যায় রত হয়ে তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে করতে তিনি গঙ্গার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। গঙ্গায় স্নান করার পর গঙ্গাদেবী অম্বার কঠোর তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভীষ্মই তাঁর এই দুর্দশার কারণ এবং তাঁর মৃত্যুর জন্যই অম্বা কঠোর তপস্যায় রত হয়েছেন—তাই জানালেন। অষ্ট বসুর মধ্যে এক বসু ভীষ্ম—গঙ্গাপুত্র। গঙ্গা অম্বার মূর্খতার জন্য তিরস্কার করে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হতে বিরত হতে বললেন।

এরপর অম্বার তপস্যা ও প্রার্থনায় আকৃষ্ট হয়ে মহাদেব অম্বার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ভীষ্মহত্যাই অম্বার একমাত্র কামনা—এই বর মহাদেবের কাছ থেকে তিনি প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তিনি তো সামান্য নারী, কেমন করে তিনি ভীষ্মের মত যোদ্ধাকে নিহত করবেন। উত্তরে মহাদেব বললেন—অম্বার নবজন্ম হবে এবং কিছুদিন পরে পুরুষ রূপ প্রাপ্ত হবেন। তখন যোদ্ধা হিসাবে অম্বা ভীষ্মকে নিহত করবে এবং বর্তমান দেহের সব ঘটনাই তাঁর মনে থাকবে। এই কথা বলে মহাদেব অদৃশ্য হলে অম্বা সন্তুষ্ট চিত্তে যমুনা তীরে চিতা প্রজ্বলিত করে অগ্নির মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

এই সময় দ্রুপদরাজের কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে বর দেন, দ্রুপদরাজের প্রথমে কন্যা হবে, সেই কন্যা পরে পুত্ররূপ গ্রহণ করবে। অনুরূপ দ্রুপদরাজের প্রথম কন্যা জন্মগ্রহণ করলে তিনি পুত্রোচিত জাতকর্ম করেন এবং প্রচার করেন যে, তাঁর

একটি পুত্র হয়েছে। এঁর নাম রাখা হয় শিখণ্ডী। এই শিখণ্ডীই অম্বা। পরে মহাদেবের বরে শিখণ্ডী পুরুষই হবে জেনে দ্রুপদের স্ত্রী দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ দেন। কিন্তু কিছুদিন পরে হিরণ্যবর্মা কন্যার কাছ থেকে সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হয়ে দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তাঁর জন্যই এই যুদ্ধ ও পিতামাতা দুঃখ ভোগ করেছেন—এই মনে করে শিখণ্ডী অরণ্যে গিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করেন। সেই অরণ্যে কুবেরের অনুচর স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ বাস করত। সে শিখণ্ডীর কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে কিছুকালের জন্য নিজের পুরুষত্ব শিখণ্ডীকে দান করে স্ত্রী হয়ে থাকে। সে শিখণ্ডীকে বলে, তিনি যেন তাঁর পিতাকে হিরণ্যবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করে ফিরে এসে তার পুরুষত্ব প্রত্যার্পণ করেন। কিছুকাল পরে কুবের স্থূণাকর্ণের গৃহে এসে স্থূণাকর্ণ স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাপ দেন, সে যেন স্ত্রী হয়ে চিরকাল বাস করে এবং শিখণ্ডী পুরুষ হয়েই থাকে। শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর সে যেন তার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এরপর শিখণ্ডী দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং পৌরষ পেয়ে রথীশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভীষ্ম জানতে পারেন যে অম্বা শিখণ্ডীরূপে পরিণত হয়েছে, এবং তাঁকে বধ করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। যৌবনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, স্ত্রীলোকের, ক্লীবের বা যে স্ত্রী পুরুষ হয়েছে বা অস্ত্রহীনের সঙ্গে তিনি কখনও যুদ্ধ করবেন না। দশ দিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মাত্মা ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু মনে জাগে। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরত কালে শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর বক্ষ বিদ্ধ করেন এবং তাঁকে সম্মুখে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে শরাঘাতে জর্জরিত করেন। এইরূপে ভীষ্মের পতন সম্ভবপর হয়। নিদ্রিত শিবিরবাসীদের অতর্কিত আক্রমণ করলে শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সঙ্গে জাগরিত হয়ে এসে অশ্বত্থামার প্রতি বাণ বর্ষণ করতে থাকেন, কিন্তু অশ্বত্থামার খড়্গাঘাতে শিখণ্ডী নিহত হন।

শিনি—যদুবংশের একজন রাজা এবং কংসের পিতৃব্য। ইনি দেবকরাজকন্যা দেবকীকে বিবাহ-সভা হতে বসুদেবের জন্য বলপূর্বক হরণ করেন। সেই সময় সোমদত্ত বাধা দিতে গেলে এঁর কাছ হতে পদাঘাত প্রাপ্ত হন। এঁর পুত্রের নাম সত্যক ও পৌত্র মহাবীর সাত্যকি (মহাভারত)।

শিব—ইনি ত্রিমূর্তির অন্যতম। প্রকৃতির তমোগুণে রুদ্রমূর্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হরণ করেন, সেইজন্য ইনি

'হর'। 'মহাকাল' এঁরই নামান্তর। ইনি বিরূপ নেত্র হেতু 'বিরূপাক্ষ,' ত্রিনয়ন হেতু 'ত্রিলোচন'। মৃত্যুঞ্জয়ী বলে মৃত্যুঞ্জয়, অগ্নিনেত্রে কামদাহ হেতু 'স্মরহর'; পিনাক এঁর ধনু, তাই ইনি 'পিনাকী', মস্তকে জটাজুট হেতু ইনি 'কপর্দী'। ডমরু এঁর প্রিয় বাদ্য, কৈলাস প্রিয় ধাম, প্রমথগণ প্রিয় সহচর। হলাহল পানে নীলকণ্ঠ হেতু ইনি 'নীলকণ্ঠ' (মহাদেব দেখ)।

শিবানী—দেবী আদ্যাশক্তি যখন কালিকারূপে শুম্ভ দানবকে বধ করতে যান, তখন বিভিন্ন দেবতাদের শক্তিগণও সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হয়। শিবশক্তি শিবানী বাহুতে সর্পবলয়, কপালে অর্ধচন্দ্র ও ত্রিশূল ধারণ করে বৃষভ-বাহনে দেবীর সাহায্যার্থ গমন করেন (দেবী ভাগবত)।

শিলাদ—একজন ধার্মিক ঋষি। একদিন শিবলোক হতে ফিরিবার সময়ে ইনি পিতৃগণকে নরকে লম্বমান অবস্থায় দেখেন। তাঁরা শিলাদকে বলেন, তিনি বিবাহ না করাতেই তাঁদের এই দুর্গতি। তারা শিলাদকে পুত্রলাভের জন্য মহাদেবের আরাধনা করতে বলেন। শিলাদ মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করে একটি বর প্রার্থনা করলেন—শিবতুল্য অমর অযোনিজ এক পুত্র। তখন মহর্ষি শিলাদ যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতে করতে লাঙ্গলমার্গে এক পরম তেজস্বী কুমারকে পুত্ররূপেপ্রাপ্ত হলেন। এই পুত্রের নাম হলো নন্দী। বালকের সাত বৎসর বয়স হলে মিত্র ও বরুণ নামে দুই তপস্বী শিলাদের আশ্রমে এলে শিলাদ এঁদের পরিচর্যা করলেন। শিলাদের পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তপস্বীরা বললেন, অষ্টম বর্ষে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হবে। নন্দী পিতার কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পেরে মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। এই উগ্র তপস্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন। এই বরে তিনি জরা ও মৃত্যু রহিত হলেন (স্কন্দ পুরাণ)।

শিবি—(১) একজন রাজর্ষি। স্বয়ং বিধাতা এঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে ব্রাহ্মণবেশে অন্নপ্রার্থী হয়ে শিবিকে বলেন—তিনি অন্নপ্রার্থী, শিবি তাঁর পুত্র বৃহৎগর্ভকে বধ করে মাংস ও অন্ন পাক করে তাঁর প্রতীক্ষা করুক। শিবি ব্রাহ্মণের কথা মত পুত্রের পক্ক মাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে শিবি বললেন—আপনার অন্ন প্রস্তুত, ভোজন করুন। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে শিবিকে সেই মাংস ভক্ষণ করতে বললেন। শিবি অম্লানবদনে ব্রাহ্মণের এই আদেশ পালন করতে উদ্যত

হলেন। তখন ব্রাহ্মণ শিবির হস্ত ধারণ করে বললেন—তুমি জিতক্রোধ। ব্রাহ্মণের জন্য তুমি সবই ত্যাগ করতে পার। এই বলে ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলেন। এই ব্রাহ্মণরূপ বিধাতা রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করবার জন্যে এসেছিলেন। শিবি তখন তাঁর সম্মুখে দেবকুমার তুল্য পুত্রকে দেখতে পেলেন।

(২) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অনুহ্লাদের অন্যতম পুত্র শিবি। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র শিবি। (৪) পুরুবংশীয় রাজা উশীনরের অন্যতম পুত্র।

শিশুপাল—বৃষ্ণিবংশীয় চেদি দেশের রাজা। এঁর পিতা চেদিরাজ দম ঘোষ। মাতা বসুদেব ভগিনী শ্রুতশ্রবা। বিষ্ণুপুরাণ মতে, ইনি পূর্বে দুই জন্মে হিরণ্যকশিপু ও রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণু ও রমা কর্তৃক নিহত হন। ইনি শিশুপালরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু ছিলেন। শিশুপাল জন্মকালে তিন চক্ষু, চার হস্ত সমেত ভূমিষ্ঠ হয়ে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করতে থাকেন। পিতা-মাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ভীত হয়ে এঁকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হয়, রাজা যেন পুত্রকে ত্যাগ না করে প্রতিপালন করেন। এঁর মৃত্যুকাল এখনও আসন্ন হয় নাই। এঁকে যিনি বধ করবেন, তাঁর জন্ম হয়েছে। শিশুপালের মাতা তখন দৈববাণীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন—কার হস্তে পুত্রের মৃত্যু হবে? পুনর্বার দৈববাণী হলো: যার ক্রোড়ে উঠলে এঁর অতিরিক্ত দুই হাত খসে পড়েবে, আর যাকে দেখে এঁর তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হবে—তিনিই এঁর হন্তা হবেন। বহু রাজারে ক্রোড়ে স্থাপিত হয়েও শিশুপালের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিছুকাল পরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পিতৃস্বসা চেদিরাজ-মহিষীর সঙ্গে দেখা করতে এলে রানী শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে পুত্রকে সমর্পণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ শিশুকে ক্রোড়ে করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অতিরিক্ত দুই বাহু স্খলিত হলো এবং কপালের তৃতীয় চক্ষু অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণই পুত্র-হন্তা বুঝতে পেরে ভয়ার্ত রানী শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন, তাঁর দ্বারা এই পুত্র বধ্য হোলেও তিনি শিশুপালের এক শত অপরাধ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন। পরবর্তীকালে শিশুপাল রাজ্যাধিকার পেয়ে অতি দৃপ্ত হয়ে উঠলেন। শিশুপাল এরপর দুর্যোধনাদির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। শ্রীকৃষ্ণই তাঁর প্রাণ বিনাশের কারণ হবেন জেনে তিনি তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে লাগলেন। ইনি বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ

করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এঁর হাত হতে রুক্মিণীকে উদ্ধার করে নিজেই বিবাহ করেন। এই সব কারণে শ্রীকৃষ্ণের উপর এঁর ক্রোধ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যতুগৃহ দাহ হতে রক্ষা পেয়ে যখন পাণ্ডবরা রাজা দ্রুপদের রাজ্যে বাস করতে আরম্ভ করলেন, তখন দুর্যোধনের বাধা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দেওয়া হোল ; তাঁরা এই নবলব্ধ রাজ্যের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী স্থাপন করলেন এবং যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। যজ্ঞ শেষে ভীষ্মের কথা মত সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে কাকে প্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হবে এই প্রশ্ন উঠলে ভীষ্ম বললেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কে আছে, যাঁকে এই যজ্ঞের প্রথম অর্ঘ্য দান করা যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হোক। শ্রীকৃষ্ণকে এই সম্মান দান অত্যন্ত অসমীচীন মনে হওয়ায়, অত্যন্ত অপমানসূচক কথায় শিশুপাল প্রথমে ভীষ্মকে ও পরে শ্রীকৃষ্ণকে হেয় প্রতিপন্ন করলে শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তাঁর ক্ষম্য একশত অপরাধ পূর্ণ হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন (মহাভারত—সভাপর্ব)।

শৃঙ্গবেরপুর—প্রয়াগ হতে ২২মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার উত্তর তটস্থিত নিষাদ-রাজ গুহকের রাজধানী। বর্তমানে শিঙ্গরুর বা সাঙ্গার নামে অভিহিত।

শিশুমার—গ্রহ বিশেষ। আকাশে এই নামের জল-জন্তুর আকৃতির মত নক্ষত্র। এর হৃদয়ে বিষ্ণু অবস্থিত এবং লেজের কাছে ধ্রুব বা ধ্রুবতারা। এই শিশুমারকে নিশাভাগে দেখলে দিবাকৃত সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। ধ্রুব যখন ঘুরতে আরম্ভ করে, তখন এর সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রও ঘুরতে আরম্ভ করে।

শুক—শুক নামক রাবণের মন্ত্রী। বানররা লঙ্কায় উপস্থিত হলে শুক রাবণের আদেশে সুগ্রীবের কাছে গিয়ে তাকে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যেতে বলে, কারণ এই যুদ্ধে সুগ্রীবের লাভ বা ক্ষতি কিছুই নাই। রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করায় তার ক্ষতি কি? শুক পক্ষীরূপ ধারণ করে রাবণের এই বার্তা সুগ্রীবকে জানায়। বানররা লম্ফ দিয়ে তাকে ধরে প্রহার করে। রাম দয়াপরবশ হয়ে বানরদের নিবারণ করলেন। কিন্তু সুগ্রীব ক্ষান্ত না হয়ে বললেন—তুমি দয়ার পাত্র নও, রামের শত্রু। আমরা তোমাকে সবান্ধব বধ করব। শুককে ধরে বানররা আবার পীড়ন করতে লাগল। তখন শুক রামকে বললে—আমাকে বানররা অত্যাচার করছে। যদি এরা আমাকে হত্যা করে, আমার সকল

পাপ তোমার হবে। তখন রাম শুককে নিষ্কৃতি দিলেন।

শুকদেব—বেদবিভাগকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কামনালব্ধ বরপুত্র। পুত্র কামনায় ব্যাসদেবের সুমেরু পর্বতে মহাদেবের তপস্যা করছিলেন। অগ্নি, বায়ু, ভূমি ও আকাশের মত পবিত্র ও বীর্যশালী এক পুত্র হোক—মনে এই সংকল্প করে ব্যাসদেব সুমেরু পর্বতে তপস্যায় নিযুক্ত হন। শতবর্ষ কাল আরাধনার পর মহাদেব ব্যাসকে বললেন, আমার বরে তোমার তেজোময়, কীর্তিমান, বিক্রমশালী, এক পুত্র হবে। এই বর পেয়ে ব্যাস নিজ আশ্রমে ফিরে এসে হোম করতে লাগলেন। বেদব্যাস হোমের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করবার সময়, ঘৃতাচী নামে এক অপ্সরা এসে উপস্থিত হয়। অপ্সরার রূপে কামাবিষ্ট হওয়ায় বেদব্যাসের চিত্তচাঞ্চল্য হলো। এই চাঞ্চল্যের বেগ দমন করতে না পারায় তাঁর বীর্য অরণির মধ্যে পতিত হয়। বেদব্যাসের এই অবস্থা দেখে ভীতচিত্ত অপ্সরা শুকপক্ষীর রূপ ধরে সেখান হতে প্রস্থান করে। বেদব্যাস প্রবল বেগে অরণি মন্থন করতে থাকেন। তার ফলে যজ্ঞকাষ্ঠ হতে প্রজ্বলিত অগ্নির মত শুকদেব নিজের তেজে বহির্গত হয়ে আসেন। ঘৃতাচী শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করে এই স্থান হতে প্রস্থান করেছিলেন বলে এই পুত্রের নাম হলো শুক। তখন গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে এই শিশুকে স্নান করালেন। মহাদেব স্বয়ং শুকদেবের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। আকাশ হতে ব্রহ্মচারীর ধারণযোগ্য কৃষ্ণাজিন পতিত হলো। ইন্দ্র তাঁকে কমণ্ডলু ও দিব্য অস্ত্র দিলেন। শুকদেব পিতার নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা করতে লাগলেন এবং বৃহস্পতির কাছে সকল বেদাদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। পিতা মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভের জন্য শুকদেবকে মিথিলার রাজা জনকের নিকট যেতে বলেন। রাজা জনকের কাছে গিয়ে তিনি মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন। তারপর তিনি হিমালয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হন। সেখানে পিতার চার শিষ্যের সঙ্গে শুকদেব বেদ অধ্যয়ন করলেন। এই স্থানে নারদ শুকদেবকে নানা উপদেশ দান করেন। এরপর তিনি স্থির করলেন, যোগবলে দেহত্যাগ করবেন। যোগাবলম্বন করে তিনি ব্রহ্মত্বলাভ করলেন। (মহাভারত—শান্তিপর্ব)।

তিনি এমন জিতেন্দ্রিয় ও নির্বিকার ছিলেন যে, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরারা তাঁর তপোভঙ্গ করতে নিষ্ফল তো হোলই, এমন কি শুকদেবের সমক্ষে তারা নগ্নাবস্থায় থাকতেও লজ্জাবোধ করত না। তারপর শুকদেব কৈলাস শিখর হতে যোগবলে সূর্যাভি-

মুখে যাত্রা করে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বলোকে গিয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। স্নেহবিহ্বল পিতা ব্যাসদেবের কাতর আহ্বান শুনে স্থাবর-জঙ্গম প্রতিধ্বনিত করে শুক "ভো" উত্তর দেন। সেই থেকে গিরিগুহা প্রভৃতি স্থানে এই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শুক্রাচার্য—ইনি ভৃগুর পুত্র। সেই জন্য তিনি ভার্গব নামে পরিচিত। ইনি দৈত্যরাজ বলির গুরু ও দৈত্যদের পুরোহিত ও গুরু ছিলেন। ইনি শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতবস্ত্রধারী। ইনি ছিলেন সর্বশাস্ত্র প্রবক্তা। শুক্রাচার্য দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণ বামনরূপে বলিকে ছলনা করতে এসে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলে শুক্রাচার্য বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ বলিকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপাদ ভূমি দানে বলিকে বিরত করতে চান। বিরত না হয়ে বলি যখন জল নিয়ে দান করতে উদ্যত হন, তখন শুক্রাচার্য মক্ষিকারূপে ভৃঙ্গারে প্রবেশ করে জল রোধ করেন। বামন তা জানতে পেরে ভৃঙ্গারের ভিতর কুশ বিদ্ধ করতে উদ্যত হন। এইরূপে তার মধ্যে কুশ প্রবেশ করাতে মক্ষিকারূপধারী শুক্রের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শুক্রাচার্যের জ্ঞাত সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে মৃতদের তিনি পুনর্জীবিত করতে পারতেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ এই বিদ্যালাভ করবার জন্য শুক্রের শিষ্য ও তাঁর কন্যা দেবযানীর ভক্ত হন। কচকে দৈত্যরা বারবার হত্যা করত, আর দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য প্রতিবার কচকে পুনর্জীবিত করতেন। শেষ বারে দৈত্যরা কচকে দগ্ধ করে তাঁর ভস্ম সুরার সহিত মিশ্রিত করে শুক্রকে পান করায়। তখন দেবযানীর কাতর অনুরোধে শুক্র উদরস্থ কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাদান করলেন এবং কচকে বললেন, সে যেন তাঁর উদর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাঁর অর্জিত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা শুক্রকে জীবিত করে। তাঁর নিজের দেহ বিভক্ত করার ফলে কচ বহির্গত হন এবং শুক্রাচার্য প্রাণত্যাগ করেন। কচ বহির্গত হয়ে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে শুক্রকে জীবিত করেন। শুক্রের পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক হিরণ্যকশিপুর আদেশে তৎপুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হন। রাজা যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করেন। তাঁর অন্য স্ত্রী শর্মিষ্ঠার উপর পক্ষপাতমূলক অনুরাগ ছিল বলে, দেবযানী নিজেকে অপমানিত মনে করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শুক্রাচার্য যযাতিকে অভিশাপ দিয়ে জরাগ্রস্ত করেন।

হরিবংশে বৃত্তান্ত আছে একবার অসুররা দেবতাদের পরাজিত করে ত্রিলোক অধিকার করে। দীর্ঘ দশ

যুগ ত্রিলোক বলির অধিকারে থাকবার পর বিষ্ণু দৈত্যরাজ বলিকে ছলনাপূর্বক স্বাধিকারচ্যুত করে ইন্দ্রকে ত্রিলোকের অধিপতি করেন। তখন অসুররা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের কাছে এর প্রতিকারের প্রার্থনা করে। তখন তিনি দেবতাদের খর্ব করবার জন্য মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেবের কাছে তিনি এমন মন্ত্র প্রার্থনা করেন—যা দেবগুরু বৃহস্পতির অজ্ঞাত এবং যার দ্বারা দেবতাদের পরাজয় এবং অসুরদের জয় অবশ্যম্ভাবী। মহাদেব আদেশ দিলেন, শুক্রাচার্য যদি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচারী হয়ে অধোমুখে থেকে কুণ্ডের ধূমপান করে তপস্যা করতে পারেন, তবেই তাঁর প্রার্থনা মত মন্ত্র বা বর তিনি পাবেন। তাঁর এই অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে দেবতারা অসুরদের আক্রমণ করেন। বিষ্ণু শুক্রাচার্যের মাতার শিরচ্ছেদ করলেন; এ কারণ শুক্রের পিতা ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন, এই স্ত্রী-বধ-জনিত পাপের জন্য তাঁকে সাতবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তিনি শুক্র-জননীকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু সমস্ত দেবতা, বিশেষতঃ ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে পড়েন, পাছে শুক্রাচার্য তাঁর ঈপ্সিত বর মহাদেবের কাছ হতে প্রাপ্ত হন। তখন ইন্দ্র শুক্রকে প্রলুব্ধ করবার জন্য নিজ কন্যা জয়ন্তীকে শুক্রের কাছে প্রেরণ করেন। জয়ন্তীও পরম ভক্তিভরে শুক্রের সেবা করতে থাকেন। এদিকে দীর্ঘকাল তপস্যার পর শুক্রাচার্য তাঁর প্রার্থিত বর পেলেন এবং ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর ইচ্ছানুসারে তিনি অদৃশ্য হয়ে দশ বৎসর তাঁর স্ত্রীরূপে তাঁকে গ্রহণ করলেন। জয়ন্তীর মায়ায় অসুররাও শুক্রকে পেল না। এই সুযোগে দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধারণ করে অসুরদের কাছে এলেন এবং অসুররা তাঁকে প্রকৃত শুক্র ভেবে সংবর্ধনা করল। দশ বৎসর অদৃশ্য অবস্থায় শুক্র জয়ন্তীর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কাটালেন এবং জয়ন্তীর গর্ভে তাঁর দেবযানী নামে এক কন্যা হলো। দশ বৎসর পরে তাঁর মোহ কেটে গেলে তিনি অসুরদের কাছে ফিরে এলেন কিন্তু ছদ্মবেশী শুক্রাচার্যের প্ররোচনায় অসুররা প্রকৃত শুক্রাচার্যকে বিতাড়িত করল। তখন প্রকৃত শুক্রাচার্য এই কাজের জন্য অসুরদের অভিশাপ দিলেন—তাঁকে অপমান করায় অচিরেই অসুররা জ্ঞান-ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হবে। অভিশপ্ত অসুররা বৃহস্পতির মায়া বুঝতে পেরে দলবদ্ধভাবে শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁর কোপ শান্ত করেন।

মহাভারতে' আছে—অসুররা দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুক্রের মাতার (ভৃগুপত্নীর)

আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন নি, সে জন্য বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীর শিরচ্ছেদ করেন। বিষ্ণু শুক্রের মাতাকে বধ করার জন্য শুক্র দেবদ্বেষী হন। একদিন তিনি যোগবলে কুবেরকে বদ্ধ করে তাঁর সমস্ত ধন হরণ করেন। কুবেরের অভিযোগ শুনে মহাদেব শূলহস্তে শুক্র-নিধনে এলেন। তখন শুক্র শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। তখন মহাদেব শুক্রকে ধরে গ্রাস করে ফেললেন। তারপর মহাদেব মহাহ্রদের জল মধ্যে দশ কোটি বৎসর তপস্যা করলেন। তাঁর জঠরে থাকায় শুক্রেরও উৎকর্ষ লাভ হ'ল। এরপর শুক্র মুক্তির জন্য মহাদেবের কাছে বার বার প্রার্থনা করতে লাগলেন। মহাদেব তাঁকে বললেন—আমার শিশ্ন দিয়ে তুমি নির্গত হও। শিশ্ন পথে নির্গত হওয়ায় তাঁর নাম হলো শুক্র।

শুনঃশেফ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেফ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান হওয়ায় পণ করেন যে, তিনি সন্তান লাভ করলে পুত্রকে বরুণের নিকট উৎসর্গ করবেন। তাঁর রোহিত নামে এক পুত্র হয়; কিন্তু পিতা নানা অছিলায় প্রতিজ্ঞা পালনে বিলম্ব করতে থাকেন। তারপর পিতা পুত্রকে উৎসর্গ করতে মনস্থ করলে পুত্র অসম্মত হন এবং বনে গমন করে ছয় বৎসর বাস করতে থাকেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ-ঋষির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই ঋষির তিনটি পুত্র ছিল। রোহিত ঋষিকে ১০০ গাভী দান করে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করেন এবং এঁকে নিজের পরিবর্তে উৎসর্গ করবেন বলে স্থির করেন। বরুণ এঁকে গ্রহণ করতে রাজী হন, কিন্তু শুনঃশেফ সেই সময় বিভিন্ন দেবতার পূজা-অর্চনা করে নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন এবং বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিলিত হন।

রামায়ণে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে, ঋচিক মুনির মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ। এক সময় অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করলে, ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশু হরণ করেন। অম্বরীষের পুরোহিত বলেন, রাজার দোষে পশু অপহৃত হওয়াতে রাজার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। একটি নরবলি এর বিহিত প্রায়শ্চিত্ত। রাজা নরবলি দানে অভিলাষী হয়ে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে মহর্ষি ঋচিকের নিকটে এসে এক লক্ষ ধেনু মূল্যের পরিবর্তে ঋচিকের প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করতে বললেন। কিন্তু মহর্ষি প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র বিক্রয় করতে অস্বীকার করলেন। কারণ, প্রথম পুত্র তাঁর এবং কনিষ্ঠ পুত্র মাতার প্রিয়; মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে বহু সুবর্ণ, রত্ন ও

ধেনুর পরিবর্তে নিয়ে যেতে বললেন। শুনঃশেফ রাজা অম্বরীষের সহিত যাওয়ার সময় তাঁর মাতুল বিশ্বামিত্রকে পেয়ে পায়ে পড়ে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের পুত্রদের যজ্ঞের পশু হয়ে শরণাগত শুনঃশেফের প্রাণরক্ষা করতে বললেন। বিশ্বামিত্রের পুত্ররা পিতার এ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিলেন, তারা কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে সহস্র বৎসর জীবনযাপন করবে। তারপর তিনি শুনঃশেফকে বললেন, তুমি যখন অম্বরীষের যজ্ঞে রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপিত হয়ে বৈষ্ণব-যূপে পাশ দ্বারা আবদ্ধ হবে, তখন তুমি দুইটি অগ্নি-স্তুতি কোরো। তাহলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। তারপর শুনঃশেফকে পশুরূপে যূপকাষ্ঠে বাঁধা হলে, তিনি অগ্নি, ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে স্তব করলেন। এই স্তব শুনে দেবতারা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করে যজ্ঞাগ্নি হতে রক্ষা করলেন। (রামায়ণ)

শুম্ভ—অসুর বিশেষ। নিশুম্ভের ভ্রাতা। এরা দুজনেই পাতালে বাস করত। একাসনে বসে এরা অযুত বর্ষ তপস্যা করায় ব্রহ্মা প্রীত হয়ে এদের বর দিতে চাইলে, এরা অমরত্ব প্রার্থনা করে; কিন্তু এই বর না পাওয়ায়, এরা আবার প্রার্থনা করলে, দেবতা, অসুর, পশুপক্ষী প্রভৃতিদের মধ্যে পুরুষজাতীয় কারো হস্তে তাদের যেন মৃত্যু না হয়। তখন ব্রহ্মা তাদের এই বর দেন। বর লাভের পর ভৃগুমুনি এদের পুরোহিত হয়ে শুম্ভকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন প্রভৃতি দানবরা এর সঙ্গে মিলিত হয়। এই দানবরা স্বর্গ অধিকার করতে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে ইন্দ্র, বায়ু, কুবেরাদিকে পরাস্ত করে ত্রিলোক ভোগ করতে থাকে। তাদের পীড়নে ত্রিলোকে বিপর্যয় ঘটতে থাকায় দেবতারা বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভগবতীর আরাধনা করতে থাকেন। তখন দেবী কৌশিকী ও মহাকালীর রূপ ধারণ করে এবং ইন্দ্রাণী, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ করে অসুর সেনাপতি দুর্ধর্ষ মহাসুর রক্তবীজের নিধন করেন। এরপর দেবী কর্তৃক প্রথমে নিশুম্ভ ও শেষে শুম্ভ নিহত হয়। দেবগণ স্বাধিকার ফিরে পান ও ত্রিলোকে স্বাভাবিক নিয়ম ফিরে আসে।

শূর্পণখা—একজন রাক্ষসী। মুনি বিশ্রবার ঔরসে ও কৈকসীর গর্ভে এর জন্ম হয়। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এর অগ্রজ ও বিভীষণ এর অনুজ। কালকেয়-বংশীয় রাক্ষসরাজ বিদ্যুৎজিহ্ব এর স্বামী। রাবণের দিগ্বিজয় কালে কালকেয়দের সঙ্গে যুদ্ধের

সময় ভ্রমক্রমে বিদ্যুৎজিহ্ব নিহত হয়। অনুতপ্ত রাবণ বিধবা ভগিনীকে দণ্ডকারণ্যে ইচ্ছামত বিহারের অনুমতি দিয়ে খরও দূষণ নামে দুই সেনাপতিকে এর রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। বনবাসকালে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে কুটীর নির্মাণ করে বাস করছিলেন, তখন রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে শূর্পণখা তাঁকে বিবাহ করতে চায়। রাম তাকে লক্ষ্মণের কাছে বিবাহের জন্যে পাঠালে লক্ষ্মণও তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন শূর্পণখা ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে তার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করে তাকে বিতাড়িত করেন। শূর্পণখা খর ও দূষণের কাছে এই অপমানের কথা বলে এর প্রতিকার চাইলে তারা উভয়ে রাক্ষস সৈন্য সহ রামকে আক্রমণ করে ও রামের হস্তে সসৈন্যে নিহত হয়। শূর্পণখা উদ্বিগ্ন হয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে সুন্দরী সীতাকে অপহরণ করতে উত্তেজিত করে। ফলে সীতা-হরণ ও রাবণের সবংশে নিধন হয় (রামায়ণ)।

শৃঙ্গী—মহর্ষি শমীকের পুত্র। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে শমীকের আশ্রমে এসে মৌনী শমীকের নিকট প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে তপোরত শমীকের গলায় মৃত সর্প জড়িয়ে দেন। তখন শৃঙ্গী আশ্রমে ছিলেন না। তিনি ফিরে এসে রাজাকে শাপ দেন যে, সপ্তাহকাল মধ্যে তক্ষক-দংশনে রাজার মৃত্যু হবে। এ জন্য শৃঙ্গী পিতার নিকট তিরস্কৃত হন, কিন্তু তাঁর শাপ অব্যর্থ ছিল এবং রাজা পরীক্ষিৎ সপ্তাহকাল মধ্যে সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন (মহাভারত)।

শূরসেন—যদু বংশের রাজা। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব এঁর পুত্র। শূরসেনের সহিত রাজা কুন্তিভোজের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি কুন্তিভোজকে তাঁর প্রথম সন্তান দান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হন। এঁর প্রথম সন্তানের নাম পৃথা। শূরসেন পৃথাকে বাল্যকালেই কুন্তিভোজকে দান করেন এবং সেখানে প্রতিপালিত হয়ে পৃথা কুন্তি নামে খ্যাতা হন। শূরসেনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রুতশ্রবাকে চেদিরাজ বিবাহ করেন। এঁরই গর্ভে শিশুপালের জন্ম হয় (মহাভারত—আদি)।

শেষনাগ—নাগ বংশের রাজা ও পাতালের অধিনায়ক। সহস্র ফণাযুক্ত শেষনাগের মস্তকে প্রত্যেক কল্পের শেষে বিষ্ণু অবস্থান করেন। পুরাণে কথিত আছে, এই শেষনাগ তাঁর মস্তকে সমস্ত পৃথিবী ধারণ করে আছেন। যখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তখন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়; তাতেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। প্রতি কল্পের শেষে শেষনাগ মুখ হতে

অগ্নি উদ্গীরণ করে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করেন। সমুদ্রমন্থন কালে দেবতারা শেষনাগকে মন্থন-রজ্জু রূপে ব্যবহার করেন।

পুরাণে লিখিত আছে, ইনি দক্ষের অন্যতমা কন্যা কশ্যপের স্ত্রী কদ্রুর গর্ভজাত নাগদের অন্যতম। সপত্নী বিনতাকে ছলনা করবার জন্যে কদ্রু নিজ পুত্রদের সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু শেষপ্রমুখ কয়েকটি নাগ মাতাকে সাহায্য করতে অসম্মত হয়। এর ফলে, মাতৃশাপে এঁকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এঁর অন্য নাম বাসুকি (হরিবংশ, অগ্নি পুরাণ, বায়ু পুরাণ)।

শৈলূষ—গন্ধর্বরাজ; গান্ধার দেশ এঁর পুত্রদের অধীন ছিল। কেকয়রাজের পরামর্শে ভরত-পুত্ররা গন্ধর্বদের হাত হতে রাজ্য কেড়ে নেন। বিভিষণের স্ত্রী সরমা শৈলূষের কন্যা।

শৈব্যা—সূর্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী। এঁর পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব। একদা হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক ভ্রমবশতঃ বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটায় মুনির কোপে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। তখন শৈব্যা স্বামী ও পুত্রের হাত ধরে একবস্ত্রে পথের ভিখারিণী হন। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য ও ধন দান করেন এবং তা সম্পূর্ণ করবার জন্য শিশুপুত্র রোহিতাশ্ব সহ শৈব্যাকে কাশীর এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করেন ও নিজেকে কাশীর শ্মশানপাল চণ্ডালের কাছে বিক্রয় করে দক্ষিণা সংগ্রহ করেন। রোহিতাশ্ব একদিন ব্রাহ্মণের পূজার ফুল সংগ্রহ করতে গিয়ে সর্পদষ্ট হয়ে নিহত হয়। রাজ্ঞী শৈব্যা পুত্রের সংকারের জন্য শ্মশানে উপস্থিত হলে হরিশ্চন্দ্র শবদেহের কর আদায় করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। সেখানে উভয়ে পরস্পরকে চিনতে পারেন। হরিশ্চন্দ্রের মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র রোহিতাশ্বের পুনর্জীবন ও হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

শৌনক—এক জন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। ইনি শুনকের পুত্র এবং গৃৎসমদের পৌত্র। ইনি বৃহৎদেবতা ও অন্যান্য গ্রন্থের গ্রন্থকার। অশ্বলায়ন এঁর ছাত্র ছিলেন।

(২) নৈমিষারণ্যনিবাসী জনৈক মহর্ষি। একদা এঁর দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে পুরাণকথক সৌতি সেখানে উপস্থিত হয়ে মহাভারত-কথা বর্ণনা করেন (মহাভারত—আদি)।

শ্বেত—বিদর্ভরাজ সুদেবের পুত্র; এক জন মহর্ষি। সুদেবের দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। শ্বেত জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের নাম সুরথ। পিতার মৃত্যুর পর পৌরজন শ্বেতকে রাজ পদে অভিষিক্ত করে। বহুকাল রাজ্য পালনের পর শ্বেত বুঝতে পারলেন, তাঁর আয়ু শেষ হয়েছে। তখন ভ্রাতা

সুরথকে রাজ্য দিয়ে তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি সহস্র বৎসর তপস্যার ফলে তাঁর ব্রহ্মলোক লাভ হোল, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা গেল না, তখন তিনি ব্রহ্মাকে বললেন, এই ব্রহ্মলোক ক্ষুৎপিপাসা বর্জিত, কিন্তু কোন কর্মবিপাকে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ করছেন। ব্রহ্মা বললেন, তুমি কেবল তপস্যাই করেছ, কিছুমাত্র দান করনি, তাই ক্ষুৎপিপাসার অধীন আছ। এখন তুমি নিজের শবমাংস আহার কর। এই বনে যখন অগস্ত্য আসবেন তখন তুমি এই গর্হিত আহার হতে মুক্ত হবে। তখন থেকে শ্বেত ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যে এসে আপন শব ভক্ষণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে থাকেন। ব্রহ্মার বরে ভক্ষিত অংশ আবার সম্পূর্ণতা লাভ করত। এক দিন অগস্ত্য সেই স্থানে এসে সরোবরে একটি অমলিন সুপুষ্ট শব দেখতে পেলেন। সেই সময় হংস-বাহিত এক দিব্য বিমানে বহু অপ্সরাসেবিত এক দিব্যপুরুষ নেমে এসে শবের মাংস ভক্ষণ করতে লাগলেন। আহারশেষে তাঁকে গমনোদ্যত দেখে অগস্ত্য তাঁর বিগর্হিত আহারের রহস্য জানতে চাইলেন। শ্বেত অগস্ত্যকে চিনতে পেরে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে সমস্ত ভোগ্যবস্তু অগস্ত্যকে দান করে মুক্তিলাভ করলেন এবং তাঁর পূর্ব দেহও বিনষ্ট হোল। অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই শ্বেত রাজার কাহিনী জানিয়ে তাঁর প্রদত্ত দিব্য আভরণ প্রভৃতি রামকে দান করেন (রামায়ণ—উত্তর)।

(২) মৎস্যরাজ বিরাটের পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিনে ভীষ্মের হস্তে নিহত হন।

শ্বেতকি—এক সদা যজ্ঞনিরত ধার্মিক রাজা। তাঁর পুরোহিতের চক্ষু ধূমে পীড়িত হওয়ায় তিনি পুনরায় আর যজ্ঞ করতে অসম্মত হন। তখন রাজা ঋত্বিক্‌দের পরামর্শে মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করলে মহাদেব বর দিতে আসেন। শ্বেতকি মহাদেবকে বলেন, আপনি ঋত্বিক্‌রূপে আমার যজ্ঞে পৌরহিত্য করুন। মহাদেব হাস্য করে বলেন, আমি তা পারি না। অবশেষে মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্বাসা শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সেই যজ্ঞে দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ঘৃতপানের ফলে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য রোগ হয়। প্রতিকারের জন্য তিনি ব্রহ্মার নিকট গেলে ব্রহ্মা সহাস্যে বলেন, তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ কর, তা'হলেই তুমি সুস্থ হবে। অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ করতে গেলে শত সহস্র হস্তী শুণ্ডদ্বারা ও বহুশীর্ষ নাগগণ মস্তকদ্বারা জল সেচন করে অগ্নি নির্বাপিত করে। ইন্দ্র-সখা তক্ষক এই বনে বাস করতেন বলে ইন্দ্র এই বন রক্ষা করতেন। সাত বার বিফল চেষ্টার পর অগ্নিদেব

আবার ব্রহ্মার কাছে গেলে তিনি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপী নর ও নারায়ণ ঋষির সাহায্য প্রার্থনা করতে পরামর্শ দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় অগ্নি খাণ্ডব দাহন করে অজীর্ণ রোগ হতে মুক্তি পান (মহাভারত—আদি)।

শ্বেতকেতু—মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র। একদা ইনি পিতামাতার নিকট উপবিষ্ট থাকার সময়ে এক ব্রাহ্মণ এঁর পিতার সমক্ষেই মাতার হস্ত ধারণ করে বল পূর্বক নিয়ে যান। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় উদ্দালক এঁকে ক্রোধ করতে নিষেধ করে বলেন, সকল স্ত্রীই গাভীদের মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না—ইহাই সনাতন ধর্ম। শ্বেতকেতু তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলপূর্বক মনুষ্য সমাজে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, আজ হতে যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ করবে, যে পুরুষ ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, এবং পতি-আজ্ঞা পেয়েও যে স্ত্রী ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনে আপত্তি করবে, তারা সকলেই ভ্রূণ-হত্যা পাপে লিপ্ত হবে (মহাভারত—আদি)।

শ্রীদাম—শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম ইত্যাদি সাত জন শ্রীকৃষ্ণের অনুচর ছিলেন।

শ্রীবৎস—ইনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। এঁর স্ত্রীর নাম চিন্তা। একবার শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে ধার্মিক শ্রীবৎসকে এর মীমাংসার জন্য অনুরোধ করা হয়। দেবতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট বলা অসঙ্গত মনে করে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুইটি সিংহাসন নির্মাণ করান। নির্দিষ্ট দিনে লক্ষ্মী এসে স্বর্ণ সিংহাসনে ও শনি রৌপ্য সিংহাসনে বসলেন। এতে সহজেই দুই জনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। লক্ষ্মী প্রীত হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ শনি রাজার অনিষ্ট চেষ্টায় নিরন্তর ছিদ্র সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন শ্রীবৎস আহারের পর পাদ-প্রক্ষালন করতে ভুলে গেলে, সেই রন্ধ্রের সাহায্যে শনি তাঁর দেহে প্রবেশ করেন। শনির প্রভাবে শ্রীবৎস দিন দিন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ক্রমে রাজ্য-ভ্রষ্ট হন। অবশেষে এক কাঁথার মধ্যে রত্নরাজি বেঁধে সস্ত্রীক রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পথে শনি এক মায়া-নদী সৃষ্টি করে স্বয়ং একটি জীর্ণ নৌকা নিয়ে উপস্থিত হন। নৌকাটি অতি জীর্ণ হওয়ায় এবং একটির অধিক জিনিস তাতে বহন করা সম্ভব নয় বলে শ্রীবৎস প্রথমে কাঁথায় জড়ানো রত্নরাজি নৌকায় তুলে মাঝিকে সেটি অন্য পারে রেখে আসতে বলেন। শনি সেই কাঁথা

সমেত নৌকা করে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নৌকা সমেত অদৃশ্য হয়ে যান। তখন নিঃস্ব শ্রীবৎস সস্ত্রীক এক কাঠুরিয়ার গৃহে আশ্রয় নেন।

এতেও শনির ক্রোধ শান্ত হয় না। তিনি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করতে থাকেন। একদিন শ্রীবৎস কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বনে গেলে এক মহাজনের নৌকা চড়ায় আটকে যায়। তখন শনি সেখানে দৈবজ্ঞের বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, কাঠুরিয়া পল্লীতে এক সতী আছেন, তিনি এসে নৌকা স্পর্শ করলেই নৌকা আবার চলবে। মহাজনের অনুরোধে চিন্তা নৌকা স্পর্শ করা মাত্র নৌকা ভেসে উঠল। আবার যদি নৌকা কখনো চড়ায় আটকে যায়, এই আশঙ্কায় মহাজন চিন্তাকে সবলে নৌকায় তুলে নিলেন। চিন্তা তখন সূর্যের স্তব করে কুরূপা হবার প্রার্থনা করলেন। ফলে কুরূপা হওয়াতে তাঁর সতীত্ব নাশের কোন ভয় রইল না।

এদিকে শ্রীবৎস ঘরে এসে চিন্তাকে দেখতে না পেয়ে, চিন্তার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে এক রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেই দেশের রাজকন্যা ভদ্রা শ্রীবৎসকে বরমাল্য প্রদান করেন। শ্রীবৎস রাজকন্যার সাহায্যে রাজাকে অনুরোধ করিয়ে, নদীতীরে বাণীজ্যতরীর শুল্ক সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে অনেক দিন পর অনুসন্ধান করতে করতে সেই পূর্বেকার মহাজনের নৌকায় তিনি চিন্তাকে দেখতে পান। শ্রীবৎসের পরিচয় পেয়ে রাজা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। সূর্যের কৃপায় চিন্তা আবার তাঁর পূর্বশ্রী ফিরে পেলেন। তখন শ্রীবৎস ও চিন্তা স্বরাজ্যে এসে লক্ষ্মীর কৃপায় হৃতরাজ্য আবার ফিরে পেলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত অষ্টাদশ খণ্ড শ্লোকযুক্ত মহাপুরাণ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি সমস্ত বেদ, বেদান্ত ও পুরাণাদির সার মর্ম সংগ্রহ করে ব্রহ্মবিদ্যা সমন্বিত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাঁর পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। ভগবতের দ্বাদশ খণ্ডই শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্য লীলা নিয়ে রচিত।

শ্রুতকীর্তি—(১) মিথিলার রাজা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা ও শত্রুঘ্নের স্ত্রী। এঁর গর্ভে সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। (২) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন হতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকীর্তি জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রুতবর্মা—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভজাত পুত্র। অন্যান্য ভ্রাতাদের মত ইনিও বলশালী ছিলেন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের শেষে পাণ্ডব শিবিরে

সুপ্ত অবস্থায় অশ্বত্থামার হাতে অন্যান্য ভ্রাতাদের সঙ্গে ইনিও নিহত হন।

শ্রুতশ্রবা—দম ঘোষের স্ত্রী; শিশুপালের মাতা।

শ্রুতসোম—মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ও দ্রৌপদীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় মহারথ ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু শত্রু বিনাশের পর পাণ্ডব শিবিরে নিশীথে সুপ্তাবস্থায় ইনি অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন।

শ্রুতসেন—পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্র। ইনিও মহারথ ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে অন্য ভ্রাতাদের ন্যায় অশ্বত্থামার হস্তে সুপ্তাবস্থায় ইনি নিহত হন।

শ্রুতায়ু—(১) বীর কলিঙ্গরাজ। ইনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন। (২) পুরূরবা হতে উর্বশীর গর্ভজাত এক পুত্র। (৩) সত্যযুগের এক দানবরাজ। ইনি দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয়রাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (৪) মহাদেবের অন্যতম গণ। ইনি দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুগমন করেছিলেন।

শ্রুতি—যাহা শ্রুত হয়। যাহা ভগবান কর্তৃক উদ্ঘাটিত হয়। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে শ্রুতি বলা হয়। উপনিষদকেও এই পর্যায়ে ফেলা হয়।

শ্রুতর্ষি—যে ঋষিদের নিকট বেদ উদ্ঘাটিত বা প্রতিভাত হয় নাই। যে ঋষিরা এই বেদ অন্যান্য বৈদিক ঋষিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্রুবাবতী—মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী হবার জন্য দুষ্কর ব্রত অনুষ্ঠান করে অপেক্ষা করতে থাকেন। শতবর্ষ তপস্যা করার পর ইন্দ্র প্রীত হয়ে এঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে বশিষ্ঠের রূপ ধরে এঁর কাছে উপস্থিত হন। তখন শ্রুবাবতী বলেন যে তিনি সাধ্যমত বশিষ্ঠের সেবা করবেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী হতে পারবেন না। কারণ তিনি ইন্দ্রকে স্বামিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করছেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্র বললেন, তোমার ইচ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ হবে। তোমাকে আমি পাঁচটি কুল দিচ্ছি; এই কুল রান্না করে রাখ। এই বলে ইন্দ্র প্রস্থান করলেন ও যাতে কুল রন্ধনের ব্যাঘাত ঘটে, তার জন্যে তীর্থে গিয়ে জপ করতে আরম্ভ করলেন। এদিকে শ্রুবাবতী পবিত্র চিত্তে সমস্ত দিন কুল রন্ধন করলেও তা সুপক্ক হলো না। বহুদিন গত হলে রান্নার জন্য সঞ্চিত সমূহ কাষ্ঠও নিঃশেষিত হলো। তখন শ্রুবাবতী নিজের দেহই আগুনে প্রদান করবেন স্থির করে নিজের দুই পা আগুনে বিস্তার করে দগ্ধ করতে লাগলেন। শ্রুবাবতীর এই অসাধারণ কাজে পরম প্রীত হয়ে ইন্দ্র নিজরূপ ধারণ করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমার ভক্তি ও তপশ্চর্যায়

আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবং এই দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে আমার সঙ্গে তুমি বাস করবে। এই বলে ইন্দ্র প্রস্থান করলেন (মহাভারত—শল্যপর্ব)।

ষ

ষট্‌কর্ম—স্মৃতি মতে—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। তন্ত্র মতে—মারণ (প্রাণহারী ক্রিয়া—দেবতা কালী); উচ্চাটন (স্বস্থান হতে উচ্ছেদ করবার ক্রিয়া—দেবতা দুর্গা); স্তম্ভন (সকলের প্রবৃত্তিরোধক অর্থাৎ কার্যকারিতা শক্তি অবরোধকারী ক্রিয়া—দেবতা রমা); বিদ্বেষণ (প্রণয়ীদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষজনক ক্রিয়া—দেবতা জ্যেষ্ঠা); বশীকরণ (যে ক্রিয়ায় লোক বশীভূত হয়—দেবতা বাণী) ও শান্তি (যে ক্রিয়া দ্বারা রোগ, খারাপ কাজ, গ্রহদোষ নিবারিত হয়—দেবতা রবি)। যোগশাস্ত্র—যোগের ছয়টি ক্রিয়া—দৃঢ়তা (আসনের দ্বারা), ধৈর্য (প্রত্যাহার দ্বারা), স্থৈর্য (মুদ্রা দ্বারা), লাঘব (প্রাণায়াম দ্বারা), প্রত্যক্ষ (ধ্যানের দ্বারা), নির্লিপ্ত (সমাধি দ্বারা), শোধন (ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকা, ত্রাটক, ও কপালভাতি)।

ষষ্ঠী—(১) প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ রূপা কার্ত্তিকেয়-ভার্যা; মাতৃকা বিশেষ। দেবসেনা। ইনি শিশুদিগের প্রতিপালন-কারিণী। পুত্রপৌত্র দাত্রী ও ত্রিভুবনধাত্রী। দ্বাদশ মাসে এঁর পূজা হয়। মঙ্গলার্থ শিশুর জন্মের ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে এঁর অর্চনার বিধান আছে (স্কন্দ পুরাণ)।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্বদা তপস্যায় নিরত থাকতেন। এক দিন ব্রহ্মা এঁকে সন্তান লাভের জন্য বিবাহ করতে বলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইনি বিবাহ করলেও বহুকাল পর্যন্ত এঁর কোন সন্তান হলো না। তখন ইনি কশ্যপ ঋষির সাহায্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। রাজার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে মৃত পুত্র প্রসব করলেন। এই মৃত পুত্রকে নিয়ে রাজা শ্মশানে গেলে এক উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে সেখানে এক দেবী এলেন। তিনি রাজার সমস্ত কথা শুনে বললেন, আমি ব্রহ্মার মানসকন্যা, আমার নাম, দেবসেনা, মাতৃকার মধ্যে আমি প্রধানা, কার্তিকেয় আমার স্বামী। আমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা, সেই জন্য আমার নাম ষষ্ঠী। তপস্যা দ্বারা এই মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করে দেবী সঙ্গে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা তখন এই দৃশ্য দেখে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী বললেন, তুমি আমার পূজার অনুষ্ঠান করলে এই পুত্রকে

আমি প্রত্যর্পণ করব। রাজা স্বীকৃত হয়ে ষষ্ঠীর পূজা করলেন। শিশুর জন্ম হতে ৬ষ্ঠ দিনে ও ২১ দিনে সন্তানের কল্যাণের জন্য এই পূজা প্রচলিত হলো (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)।

(২) মহাভারতে মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধের বিবরণে জানা যায়—জরা রাক্ষসীর নামান্তর। ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। ইনি গৃহস্থের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করতেন বলে ব্রহ্মা এঁর নাম রাখেন "গৃহদেবী"। মহাভারতের আদি পর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যে ব্যক্তি যৌবনসম্পন্না সপুত্রা এঁর মূর্তি গৃহে রাখে, তার গৃহ সর্বদা ধনধান্য, পুত্র-কন্যাদিতে পূর্ণ থাকে। এঁর নাম ষষ্ঠী দেবী।

(৩) মতান্তরে, কার্তিকের কৃত্তিকাদি যে ছয় মাতৃকার স্তন্যপানে পালিত হয়েছিলেন তাঁদের সমবেত মূর্তি।

ষড়্দর্শন—বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা—এই ছয়টি দর্শন শাস্ত্র।

ষড়ঙ্গ—বেদের ছয়টি ভাগ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

ষড়ানন—ছয়টি মুখ বলে কার্তিকেয়ের এই নাম।

ষণ্ড—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র। এই দুই ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক ছিল। বরাহকল্পে দেবাসুরের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেব পক্ষে থেকে এরা যুদ্ধ করে। প্রথমে এরা অসুরদেরই সেনাপতি ছিল এবং দেবতাদের পরাজিত করে। তখন দেবতারা মন্ত্রণা করে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ষণ্ডামার্ককে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত করেন। এই দুই জনকে অমৃত পান করিয়ে দেবতারা এদের অসুর পক্ষ ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। অমৃত পানে মত্ত এই দুই দানব-সেনাপতি তখন অসুর পক্ষ ত্যাগ করে। ফলে দেবতারা অসুরদের পরাজিত করেন। (বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণ)

ষড়্ভুজা—দুর্গার মূর্তিভেদ। চণ্ডিকা রুদ্রচণ্ডা ও চণ্ডাবতী—এই তিন মূর্তি ষড়্ভুজা বলে নির্দিষ্ট হয়েছেন।

ষোড়শী—(১) দেবী শতাক্ষীর (দুর্গাদেবীর এক নাম) দেহ হতে উৎপন্ন এক মহাশক্তি। (২) দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত তৃতীয় মহাবিদ্যা।

ষোড়শমাতৃকা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা—এই ষোলজন মাতৃকা।

স

সংজ্ঞা—বিশ্বকর্মার কন্যা ও সূর্যের স্ত্রী। সূর্যের ঔরসে এঁর গর্ভে

তিনটি সন্তান হয়—বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা। বিবস্বতের পুত্র বলে মনু বৈবস্বত নামে খ্যাত হন। সংজ্ঞা সূর্যের অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে সূর্যকে দেখলে চক্ষু নিমীলিত করতেন। এই জন্য সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, সংজ্ঞা তাঁর চক্ষু সংযমন করার জন্যে প্রজাদের সংযমনকারী যমকে প্রসব করবেন। তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে সংজ্ঞা চপলভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তাঁর এই চপল চক্ষু দেখে সূর্য বললেন যে, তিনি চঞ্চলস্বভাবা নদীকে প্রসব করবেন। তখন চঞ্চলা যমুনার জন্ম হলো। পরে স্বামীর কোপ হতে রক্ষা পাবার জন্য নিজের অনুরূপ ছায়া নামে এক নারীকে সৃষ্টি করে সূর্যের কাছে রেখে ও তাঁর উপর নিজের পুত্র-কন্যার পরিচর্যার ভার দিয়ে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে ফিরে যান। কন্যার আগমনে বিশ্বকর্মা অসন্তুষ্ট হয়ে কন্যাকে সূর্যের কাছ ফিরে যেতে বলেন; কিন্তু স্বামীর কাছে না গিয়ে সংজ্ঞা উত্তর কুরুবর্ষে ঘোটকীর রূপ ধরে ভ্রমণ করতে থাকেন। এদিকে সূর্য ছায়াকে সংজ্ঞা জ্ঞানে তাঁর গর্ভে পুত্রকন্যার জন্মদান করলেন; কিন্তু ছায়া নিজের সন্তানদের মত সংজ্ঞার সন্তানদের প্রতিপালন করতেন না। এতে যম একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতাকে পদাঘাত করতে উদ্যত হন। পরমুহূর্তেই যম ছায়ার ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁর পদ স্খলিত হবে। যম সূর্যের কাছে এই শাপের কথা প্রকাশ করলে সমস্ত বিবরণ গোপন রেখে ছলনা করবার জন্য সূর্য ছায়াকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন ছায়া সমস্ত কথা স্বীকার করলে সূর্য সমাধিস্থ হয়ে সংজ্ঞার অশ্বীরূপ ধারণ দেখতে পেলেন। এরপর সূর্য বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে নিজের তেজ কর্তন করে অশ্বরূপ ধারণ করে ঘোটকীরূপিণী সংজ্ঞার কাছে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। মিলনের ফলে প্রথমে যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমার ও পরে রেবন্তের জন্ম হলো। এরপর সূর্য তাঁর তেজ সংহৃত করাতে সংজ্ঞা নিজের রূপ ধারণ করে স্বামিগৃহে ফিরে এলেন (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

সংবরণ—চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা; সূর্যের তপতী নামে এক কন্যা ছিল। সূর্যভক্ত রাজা সংবরণ প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতেন। তিনি ধার্মিক, রূপবান ও বিখ্যাত বংশের রাজা বলে সূর্য তাঁকে কন্যাদান করতে মনস্থ করলেন। এক দিন মৃগয়াকালে সংবরণের অশ্ব পিপাসার্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। এই সময় সংবরণ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে এক অসামান্যা রূপবতী কন্যাকে দেখতে পান এবং উভয়েই

পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তপতী পিতাকে তপস্যায় প্রীত করে তাঁকে ঊর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে পুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষিকে যোগবলে স্মরণ করতে বললেন। বশিষ্ঠ যোগবলে সংবরণের আকাঙ্ক্ষা জানতে পেরে সূর্যের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, আপনার তপতী নাম্নী কন্যাকে মহারাজ সংবরণের জন্যে প্রার্থনা করছি। সূর্য সম্মত হয়ে তপতীকে তাঁকে দান করলেন। বশিষ্ঠ তপতীকে নিয়ে এলে সংবরণ এঁকে বিবাহ করলেন। তপতীকে স্ত্রী রূপে পেয়ে সংবরণ মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়ে বনে উপবনে স্ত্রীর সঙ্গে বারো বৎসর বাস করলেন। সংবরণকে এইরূপ ভোগসুখে মত্ত দেখে ইন্দ্র ক্ষুন্ন হলেন। ইন্দ্রের অভিশাপে সেই বারো বৎসর রাজ্যে এক বিন্দু বৃষ্টিপাত হলো না। স্থাবর-জঙ্গমসহ সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল। লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পুত্রকন্যা ত্যাগ করে চারিদিকে বিচরণ করতে লাগল। বশিষ্ঠ তখন সংবরণ ও তপতীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনলেন। তখন ইন্দ্র আবার বারি বর্ষণ করলেন, চারিদিকে শস্য উৎপন্ন হলো। তপতীর গর্ভে কুরু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। সেই থেকেই কুরুবংশের উদ্ভব। (মহাভারত—আদি)।

সংবর্ত—অঙ্গিরার দুই পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি ও মহর্ষি সংবর্ত। বৃহস্পতি ভ্রাতা সংবর্তের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং সর্বদা দুর্ব্যবহার করতেন। সেই জন্য সংবর্ত সংসার ত্যাগ করে দিগম্বর অবস্থায় অরণ্যে প্রস্থান করলেন। বৃহস্পতি ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজা অবীক্ষিতের কুল-পুরোহিত ছিলেন। ঐ বংশের রাজা মরুত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠানে বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যের জন্যে অনুরোধ করেন; কিন্তু বৃহস্পতি মরুত্তের অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন না; কারণ, পূর্বেই তিনি ইন্দ্র কর্তৃক দেবতাদের গুরুপদে বৃত হয়েছিলেন। তখন নারদ বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্ত দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করতে বলেন এবং জানান যে, সংবর্ত এখন দিগম্বর অবস্থায় চারিদিকে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন ও বর্তমানে মহাদেবের দর্শন কামনায় বারণসীতে অবস্থান করছেন। মরুত্ত যেন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃত দেহ স্থাপন করে প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন এবং তা দেখেই সংবর্ত সেখান থেকে প্রস্থান করলে তখনি তাঁর অনুসরণ করে তার শরণাপন্ন হন। তদনুযায়ী মরুত্ত সংবর্তের সম্মুখীন হলে তিনি রাজার গাত্রে কর্দম ইত্যাদি নানা প্রকার দূষিত দ্রব্য নিক্ষেপ করে তাকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করেন এবং মরুত্তকে জানান যে, তাঁর মত বিকৃতমস্তিষ্ক ও অস্থিরচিত্ত

লোকদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত নয়। তাঁর ভ্রাতা বৃহস্পতির দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলে মরুত্তের মঙ্গল হবে। মরুত্ত বললেন, দেবগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বৃহস্পতি মর্ত্যবাসীর যজ্ঞে আর পৌরহিত্য করবেন না। তখন সংবর্ত বললেন, তিনি এই যজ্ঞে পৌরহিত্য করলে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি উভয়েই কুপিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন। তবে সংবর্তের উপব মরুত্তের দৃঢ় ও অচলা ভক্তি থাকলে এই যজ্ঞ সম্পাদন সম্ভব হবে। তা না হলে সংবর্তের অভিশাপে স্বপরিজন মরুত্ত ভস্মে পরিণত হবেন। তখন মরুত্ত চিরকাল তাঁর অনুগত থাকবেন অঙ্গীকার করায় সংবর্ত তাঁর যজ্ঞে পৌরহিত্য করতে সম্মত হন। এই সংবাদে বৃহস্পতি উদ্বিগ্ন হয়ে ইন্দ্রকে তা জানালেন। তারপর ইন্দ্র মরুত্তের কাছে অগ্নিকে পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, বৃহস্পাতি এখন এই যজ্ঞ করতে সম্মত আছেন; কিন্তু পূর্বের অবমাননা স্মরণ করে মরুত্ত বৃহস্পতির এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। অগ্নি বিফল হয়ে ফিরে এলে ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর কাছে পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে প্রলোভন ও পরে ভীতিপ্রদর্শন করলেও মরুত্ত কিছুতেই সম্মত হলেন না। সংবর্ত কর্তৃক এই যজ্ঞ সম্পাদিত হতে লাগল। শেষে সংবর্তের আহ্বানে ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত এই যজ্ঞে এসে যজ্ঞীয় সোমরস পান করলেন (মহাভারত, রামায়ণ)।

সংশপ্তকগণ—যে সব যোদ্ধা শপথ ও মরণ পণ করে যুদ্ধে যায়, তারা 'সংশপ্তক' নামে অভিহিত। তাঁদের প্রতিজ্ঞা ছিল যুদ্ধে তাঁরা পরাঙ্মুখ হলে তাঁরা নরকে যাবেন, আর যুদ্ধে জয়লাভ করলে তাঁরা স্বর্গে যাবেন। অযুত রথীর সহিত ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর পঞ্চভ্রাতা, তিন অযুত রথের সহিত মালব এবং তুণ্ডিকেরগণ, অযুত রথীসহ মাবেল্লক, ললিথ ও মদ্রকগণ এবং অন্যান্য বহু-জনপদ হতে আগত অযুত রথীগণ অগ্নিতে হোম করে কৌরবপক্ষে যোগ দেন এবং অর্জুনকে বধ করবার জন্য উক্ত শপথ গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুন এঁদের বিনষ্ট করবার জন্য ব্যস্ত থাকায় অভিমন্যু দ্রোণ-নির্মিত চক্রব্যূহে প্রবেশ করে নিহত হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুন সমস্ত সংশপ্তককে বিনষ্ট করেন (মহাভারত)।

সংহিতা—যাতে বিষয় সমূহ সংহিত বা একত্র করা হয়েছে। যেমন ঋগ্বেদসংহিতা, মনুসংহিতা ইত্যাদি। মনু, অত্রি প্রভৃতি ঋষিরা যে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাদের সংহিতা বলা হয়। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ

ইত্যাদি প্রণীত ঊনবিংশ সংহিতা। এই সব সংহিতায় ধর্ম, অর্থাৎ জীবের কর্ম, চতুবর্ণের ধর্ম, অশৌচ, সংস্কার-কর্ম, জীবিকা প্রভৃতি সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে-বর্ণিত হয়েছে।

সংহ্রাদ—(১) এক রাক্ষস সেনাপতি। এ রাবণের সহায়করূপে দিগ্বিজয়ে যায়। লঙ্কার যুদ্ধে বানর সেনার হস্তে এর মৃত্যু হয় (রামায়ণ—লঙ্কা)।

(২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র ও প্রহ্লাদের ভ্রাতা। এর পুত্রেরা নিবাতকবচ নামে খ্যাত। ব্রহ্মার বরে এরা দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতির অবধ্য হয়েও শেষে অর্জুনের হস্তে নিহত হয়।

সগর—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। স (সহ) গর (বিষ)—বিষের সহিত জাত বলে এঁর নাম সগর। রাজা বাহুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী যাদবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যাদবী গর্ভবতী হলে তাঁর ঈর্ষ্যান্বিতা সপত্নী গর্ভনাশের জন্য তাঁর খাদ্যে বিষ প্রদান করেন; কিন্তু দৈবশক্তিবলে যাদবী বিষপান সত্ত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হন না বা তাঁর গর্ভ নষ্ট হয় না। একবার শত্রুরা মিলিত হয়ে বাহুর রাজ্য আক্রমণ করে ও তাঁকে অরণ্যে বিতাড়িত করে। গর্ভবতী যাদবীও স্বামীর সঙ্গে বনগমন করেন। বিষের প্রভাবে পুত্র শতবর্ষ মাতার গর্ভে আবদ্ধ থাকে। শেষে বনমধ্যে রাজার মৃত্যু হলে যাদবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে প্রাণত্যাগ করা স্থির করেন। কিন্তু ঋষি ঔর্ব তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, তাঁর গর্ভে এক অমিত শক্তিশালী পুত্রের জন্ম হবে। পরে যাদবী বিষের সঙ্গে এক পুত্র প্রসব করেন। ঔর্ব এই সন্তানের নাম দেন সগর। সগর বড় হয়ে পিতৃরাজ্য লোপের বিবরণ জানতে পেরে শত্রুদের বিনাশ করবেন বলে স্থির করেন, এবং কালে তালজঙ্ঘ, হৈহয় প্রভৃতি শত্রুদের পরাজিত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকেন (পদ্ম পুরাণ)।

মহাভারতে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে—ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সগরের দুই স্ত্রী ছিল—জ্যেষ্ঠা বিদর্ভরাজকন্যা কেশিনী ও কনিষ্ঠা অরিষ্টনেমীর কন্যা সুমতি। রাজা সগর হৈহয় ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুদের যুদ্ধে বিনাশ করেন। বহুদিন গত হলেও কোন সন্তান না হওয়ায় দুই স্ত্রীর সহিত তিনি মহাদেবের নিকট কঠোর তপস্যা করেন। এর ফলে মহাদেব বর দেন, এক স্ত্রীর অতি বলবান ষাট হাজার পুত্র হবে; কিন্তু তারা কালে এক সঙ্গে সকলে বিনষ্ট হবে, আর অন্য স্ত্রীর একজন বলবান বংশধর পুত্র হবে। অতঃপর দুই স্ত্রী গর্ভবতী হলে কেশিনী একটি লাউ প্রসব করেন এবং সুমতির গর্ভে এক দেবতুল্য পুত্র

হয়। এই পুত্রের নাম হয় অসমঞ্জ। লাউ প্রসবের পর দৈববাণী হয়, এই লাউ ঘৃতপূর্ণ উষ্ণ পাত্রে রাখলে তার বীজ হতে ৬০,০০০ পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। বহুকাল পরে এই হতে পুত্রদের জন্ম হয়। পুত্ররা অতি বলবান্ ও নিষ্ঠুর হয়ে সকলের উপর অত্যাচার করতে থাকে। পরে সগর তাঁর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। সগর যখন যজ্ঞ সুরু করেন, তখন ইন্দ্র খুব ভীত হয়েছিলেন, পাছে তাঁর ইন্দ্রত্ব লোপ পায়। অশ্বমেধের অশ্বের ভার ছিল সগরের মহাপরাক্রম ষাট সহস্র পুত্রের উপর। ইন্দ্র কৌশলে অশ্বটিকে চুরি করে বেঁধে রেখে এলেন কপিলমুনির আশ্রমে পাতালে (সাগরে)। সগরের ষাট সহস্র পুত্ররা যখন অশ্ব খুঁজতে খুঁজতে কপিলমুনির আশ্রমে এলেন, তখন দেখেন অশ্ব সেখানে বাঁধা আছে। মুনিকে তাঁরা চোর মনে করে তাঁর উপর অত্যাচার সুরু করে দিলেন; ফলে মুনির রোষানলে তাঁরা ভস্ম হয়ে গেলেন। নারদের কাছ হতে ষাট হাজার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ব্যথিত হয়ে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে যজ্ঞাশ্ব খুঁজে যজ্ঞ সমাপ্ত করতে ও সগরপুত্রদের উদ্ধার করতে বলেন। অংশুমান কপিলমুনিকে সন্তুষ্ট করে অশ্ব ফিরিয়ে এনে দিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন হয়। কপিলমুনি বলেছিলেন, অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনলে গঙ্গার পবিত্র ধারা এই ভস্মরাশির উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেই তাঁদের হবে মুক্তি।

হিমালয়ের জটিল জটার বন্ধন থেকে গঙ্গার ধারাটি অংশুমানের পৌত্র (দিলীপের পুত্র) ভগীরথ সত্যই এক দিন বের করে এনেছিলেন। সমগ্র আর্যাবর্তের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই ধারা পাতালে (অর্থাৎ সমুদ্রে) এসে মিলিত হোল। এই ধারা পাতালে এনে ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের মুক্ত করেন। নিজের সন্তানদের ভস্মাধার বলে সগর সমুদ্রকে কল্পনা করেছিলেন, তাই সমুদ্রের নাম সাগর (মহাভারত—বনপর্ব)।

সঙ্কর্ষণ—পাতালের সর্বনিম্নে বিষ্ণুর 'শেষ' নামে তামসী তনু আছে। সিদ্ধগণ তাঁকে অনন্ত বলে থাকেন। এঁর সহস্র শিরা এবং মস্তকে চিহ্ন তার ভূষণ স্বরূপ। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি সহস্র ফণা দ্বারা চারিদিক আলোকিত করে থাকেন এবং অসুরদের বলহীন করেন। তাঁর এক হস্তে লাঙ্গল এবং অন্য হস্তে মুষল। লক্ষ্মী ও বারুণী দেবী তাঁর পরিচর্যা করেন। কল্পের শেষে তাঁর মুখ থেকে সঙ্কর্ষণ নামে রুদ্র বের হয়ে ত্রিজগৎ ধ্বংস করেন (বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত)। (২) শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের এক নাম।

সঞ্জয়—সূতবংশীয় গবল্গনের পুত্র। ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সারথি। পরে অন্যতম মন্ত্রী হন। কুরুপাণ্ডবের বিরোধ উপস্থিত হলে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের দূতরূপে উভয়পক্ষের মঙ্গলের জন্য সন্ধির প্রার্থনা করেন এবং যুদ্ধ নিবারণের জন্য বহু চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। সঞ্জয় ব্যাসদেবের কাছ থেকে দিব্যচক্ষু লাভ করে অদৃষ্টদর্শী হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখতে পান এবং অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ঘটনাগুলি শ্রবণ করান। সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা—এইরূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাগুলি মহাভারতে বিবৃত হয়েছে। বেদব্যাসের বরে সঞ্জয় অস্ত্রে অনাহত ও শ্রমে অক্লান্ত এবং জীবিত অবস্থায়ই এই মহাযুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পান। ইনি ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। যুদ্ধের শেষে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনবাসী হন এবং দাবানলে ধৃতরাষ্ট্রাদির দেহনাশ হলে ব্যাসদেবের উপদেশে হিমালয়ে তপস্যা করে জীবন শেষ করেন (মহাভারত)।

সঞ্জীবনী—যে বিদ্যার ফলে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা যায়, তার নাম সঞ্জীবনী-বিদ্যা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই বিদ্যা জানতেন।

সতী—ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা ও মহাদেবের স্ত্রী। দক্ষ মহামায়াকে কন্যারূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। মহামায়া এতে সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। দক্ষ বর প্রার্থনা করলেন, মহামায়া যেন তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে শিবের স্ত্রী হন। মহামায়া এই বরে সম্মত হয়ে বললেন, আমার প্রতি কখনও অন্যায় ব্যবহার করলে আমি দেহত্যাগ করব। দক্ষ প্রজা সৃষ্টির মানসে বীরণ-কন্যা বীরিণী বা অসিক্নীকে বিবাহ করেন। এঁরই গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষ এই কন্যার নাম রাখলেন সতী। সতী যৌবনে পদার্পণ করলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের কাছে এসে সতীকে বিবাহ করতে অনুরোধ করলেন। কারণ শিবের বিবাহ না হলে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটবে। তখন দক্ষ-প্রজাপতি নিজ-কন্যা সতীকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান করলেন। কিন্তু মহাদেব দক্ষকে যথোচিত সম্মান কোনদিন দেখাতে পারেন নি মনে করে, দক্ষ শিবের উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। সতীর বিবাহের পর দক্ষ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সকলেই নিমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু সতী ও মহাদেব নিমন্ত্রিত হননি। সতী এই যজ্ঞের কথা নারদের মুখে অবগত হয়ে তথায় যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিব সতীকে এই দক্ষযজ্ঞে যেতে বাধা দিলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সতী পরমাপ্রকৃতি মহামায়ারূপে বিভূতি প্রকাশ

করলেন। কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী—এই দশ মূর্তিতে মহাদেবকে তিনি বিভ্রান্ত করলেন। এর ফলে শিবের আদেশ পেয়ে সতী দক্ষযজ্ঞে গেলেন। যজ্ঞস্থলে তিনি সর্ববন্দিতা হয়েও পিতার মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করে পিতার সম্মুখেই দেহত্যাগ করলেন। সতীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ শিব নিজের জটা ছিন্ন করেন এবং তা হতে মহাবীর বীরভদ্রের আবির্ভাব হয়। এর পর শিব সমস্ত অনুচরের সহিত দক্ষপুরীতে উপস্থিত হন। শিবের অনুচররা দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে। দক্ষপত্নীর কাতর ক্রন্দনে ও দক্ষপিতা ব্রহ্মার অনুরোধে শিব দক্ষকে প্রাণদান করেন বটে, কিন্তু শিব-নিন্দা-কলুষিত স্বমুণ্ড থেকে বঞ্চিত করে, তাঁকে ছাগমুণ্ড দান করেন। সতী-শোকে ক্রুদ্ধ শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে ভীষণ নৃত্য সুরু করলেন। তাতে সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হলো; তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীর দেহ ক্রমশঃ খণ্ড-বিখণ্ড করতে লাগলেন। সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হয়, সেই সব স্থান 'মহাপীঠ' নামে খ্যাত। এইরূপে একান্ন মহাপীঠের উৎপত্তি হয়। দক্ষগৃহে দেহত্যাগ করে সতী হিমালয়ের গৃহে হিমালয়-পত্নী মেনকার নিকটে এসে তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করা স্থির করলেন। যথাকালে পার্বতী-রূপে মেনকার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় একদিন নারদ এসে হিমালয়কে বলেন তাঁর কন্যা শিবের স্ত্রী হবেন। পার্বতী তপস্যার দ্বারা শিবকে প্রসন্ন করে গৌরবর্ণ লাভ করে গৌরী নামে খ্যাতা হন। কিছুকাল পরে তপস্যার জন্য শিব হিমালয় পর্বতে এলে হিমালয় পার্বতীকে নিয়ে শিবের পূজা করেন। পার্বতী ও তাঁর সখীরা শিবের আরাধনা করতে থাকেন। পার্বতী প্রায় সর্বদাই মহাদেবেরই চিন্তায় ও সেবায় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু পার্বতী তাঁর সম্মুখে অবস্থান করলেও, শিব কোন দিন সম্যক্‌রূপে পার্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি। এদিকে দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁদের জানালেন, শিবতেজ হতে উৎপন্ন পুত্রই তারকাসুরকে বধ করতে সমর্থ হবে। সেইজন্য মহাদেবের বিবাহের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তখন বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র শিবের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য মদনকে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে পার্বতীর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রেরণ করেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে মদন শিবের কোপানলে পড়ে ভস্মীভূত হন। মদনভস্মের পর

শিব সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করেন। পার্বতী তখন শোকে ও দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে শিবের ধ্যানে মগ্ন হন। এমন সময় একদিন ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নারদ এসে পার্বতীকে বলেন, এতদিন পার্বতী তপস্যা ব্যতীত শিবের আরাধনা করেছেন, সেই জন্য শিব তাঁর অনুরক্ত হয়েও তাঁকে গ্রহণ করছেন না। তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করতে হবে, তবেই তিনি শিবকে পাবেন। কারণ, পার্বতী ভিন্ন অন্য কোন নারীকে শিব গ্রহণ করবেন না। নারদের কথায় পার্বতী কঠোর তপস্যায় রত হবেন স্থির করলেন। কিন্তু তাঁর মাতা এই অভিপ্রায় ত্যাগ করতে বললেন। পার্বতী এতে রাজী না হওয়ায় মেনকা তাঁকে 'উ—মা' বলে সম্বোধন করে তপস্যায় রত হতে নিষেধ করায় পার্বতীর নাম হলো 'উমা'। যে স্থানে মদন ভস্ম হয়েছিলেন, সেই স্থানে পার্বতী এসে তপস্যায় রত হলেন। প্রথমে ফলাহার, পরে জলপান, তারপর পতিত বৃক্ষের পাতা ও শেষে নিরাহারে তিনি তপস্যা করতে লাগলেন। বহু বৎসর তপস্যার পর ব্রহ্মা একদিন এসে বললেন, এখন তিনি মহাদেবের গ্রহণযোগ্যা হয়েছেন কিন্তু তখনো পার্বতী শিবের সাক্ষাৎ পেলেন না। কিছুকাল পরে শিব এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে পার্বতীকে পরীক্ষা করবার জন্য উপস্থিত হলেন। পার্বতীর পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেই শিবনিন্দা আরম্ভ করলেন এবং তাঁকে অন্য পতি গ্রহণ করতে বললেন। পার্বতী ব্রাহ্মণবেশী শিবকে সেই স্থান ত্যাগ করতে বললেন। তখন শিব নিজমূর্তি ধারণ করলেন ও এর ফলে তাঁরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পিতা হিমালয়ের সম্মতি গ্রহণ করে তাঁদের দুই জনের বিবাহ সম্পন্ন হলো (কালিকা পুরাণ)।

সত্য—একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দরিদ্রতার জন্য ইনি যজ্ঞ সম্পাদন করবার সময় পশু সংগ্রহ করতে না পেরে ফলমূলকেই পশুদের স্বরূপ করে যজ্ঞ সম্পন্ন করতেন। একদিন ধর্ম মৃগরূপ ধারণ করে এঁকে বললেন, এই অঙ্গহীন যজ্ঞে তোমার পাপ সঞ্চয় হচ্ছে, আমাকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। তা হলে তুমি স্বর্গে যেতে পারবে। মৃগকে হত্যা করতে উদ্যত হলে দেবী সাবিত্রী এই কার্য করতে নিষেধ করলেন। দেবীর কথায় মৃগ বধ না করাতে মৃগরূপী ধর্ম আবার ব্রাহ্মণকে পশু-হত্যা করতে অনুরোধ করলেন। ফলে মৃগ ও ব্রাহ্মণ দুই জনেই স্বর্গে গমন করবেন। ব্রাহ্মণ তখন পশু হত্যায় উদ্যত হলে ধর্ম ছদ্মবেশ ত্যাগ করে যজ্ঞের জন্য প্রাণীহিংসা করতে নিষেধ করলেন। ধর্মের কথায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞে প্রাণী বধ একেবারে

ত্যাগ করলেন (মহাভারত—শান্তি)।

সত্যক—ইনি যদুবংশীয় রাজা শিনির পুত্র এবং সাত্যকির পিতা।

সত্যকাম—ইনি সত্যকাম জাবালি নামে পরিচিত (জবালা দেখুন)।

সত্যবতী—(১) ব্যাস-জননী। চেদিরাজ উপরিচর বসু একদা মৃগয়াকালে তাঁর রূপবতী স্ত্রী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাবিষ্ট হন এবং তাঁর স্খলিত শুক্র এক শ্যেনকে দিয়ে রাজমহিষীর নিকট প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণে এই শুক্র যমুনার জলে পড়ে ও ব্রহ্মশাপে মৎসীরূপিণী অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা এই জল পান করে গর্ভবতী হয় এবং দশম মাসে এক ধীবর কর্তৃক ধৃত হয়। ধীবর এই মৎসীর উদরে একটি পুরুষ ও একটি কন্যাশিশু পায় ও মৎসী শাপমুক্ত হয়। পুত্রের নাম হয় মৎস্য ও কন্যার নাম সত্যবতী। কিন্তু কন্যার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ প্রবল ছিল বলে এঁর নাম হয় মৎস্যগন্ধা। বসুরাজের এই কন্যা ধীবর-পালিতা হয়ে যৌবনে যমুনায় খেয়া পারাপারের কাজ করতেন। একদা তীর্থ পর্যটন-রত পরাশর মুনি এঁর নৌকায় উঠে এঁর অপরূপ সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে তাঁর কাছে এক পুত্র প্রার্থনা করেন, এবং কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে নদীর মধ্যে তাঁর সহিত সঙ্গম করেন। পরাশরের ঔরসে সদ্য গর্ভধারণ করে সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রসব করেন। পরাশরের বরে পুত্র প্রসবের পরেও সত্যবতী কুমারীই থাকেন ও তাঁর দেহ সুগন্ধময় হওয়াতে তাঁর নাম হয় গন্ধবতী। এক যোজন দূর হতে তাঁর দেহের সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে তাঁকে যোজনগন্ধাও বলা হোত। একদা হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু যমুনা তীরবর্তী বনে ভ্রমণ করবার সময়ে এঁর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এঁকে দেখে ও পরিচয় পেয়ে এঁর পালকপিতা দাসরাজার নিকট কন্যাকে প্রার্থনা করেন। দাসরাজের সর্ত ছিল যে, সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্য দান করতে হবে। শান্তনু এই কথা শুনে অসম্মত হলেন ; কারণ, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্মকেই তিনি রাজ্যদান করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু এই কথা শোনার পর ভীষ্ম তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করে পিতার ইচ্ছা পূরণ কবেন। সত্যবতী ও শান্তনুর বিবাহের ফলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ পুত্র যৌবন লাভ করার পূর্বেই শান্তনুর মৃত্যু হয়। ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে বিচিত্রবীর্য রাজা হন। তাঁর সহিত কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ হয় ; কিন্তু সাত বৎসর পরে বিচিত্রবীর্যের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। পুত্রশোকার্তা সত্যবতী

তাঁর দুই বধূকে সান্ত্বনা দানের পর রাজ্য ও বংশরক্ষার জন্য ভীষ্মকে ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে বলেন, নতুবা বিবাহ করে স্বয়ং রাজা হতে বলেন। ভীষ্ম পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে সত্যবতীর কথায় অসম্মত হলে তিনি তাঁর কন্যাকালে জাত পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে আহ্বান করেন এবং মাতার নির্দেশে দ্বৈপায়ন অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে পুত্র ব্যাসদেবের প্রেরণায় সত্যবতী বনবাসিনী হয়ে তপশ্চর্যায় নিযুক্ত থাকেন। এই ভাবে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

(২) ঋচীক মুনির স্ত্রী ও জমদগ্নির মাতা। একদা কুশিক-পুত্র গাধি অরণ্যে তপস্যা করছিলেন। এই সময় সত্যবতী নামে এঁর এক কন্যা হয়। ঋচীক বিবাহ করবার মানসে গাধির কাছে এসে এই কন্যা প্রার্থনা করেন। গাধি বললেন, উপযুক্ত শুল্ক পেলে তিনি এই কন্যা দান করতে রাজী আছেন এবং শুল্কস্বরূপ তিনি এক সহস্র কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব চাইলেন। ঋচীক অশ্ব সংগ্রহের জন্য বনে গিয়ে বরুণকে তপস্যায় প্রীত করে তাঁর কাছ থেকে সহস্র অশ্ব সংগ্রহ করেন। তখন গাধি ঋচীকের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। এরপর ভৃগু, পুত্রের স্ত্রী দর্শনার্থ ঋচীকের কাছে এসে পুত্রবধূকে বর দিতে চাইলেন। তখন সত্যবতী নিজের জন্য তপোনিষ্ঠ পুত্র ও মাতার জন্য অমিত বলশালী পুত্র প্রার্থনা করেন। ভৃগু 'তথাস্তু' বলে পুত্রবধূকে দুইটি চরু দিয়ে বললেন, ঋতুস্নান করে তুমি ও তোমার মাতা এই চরু আহার করবে। এই আরক্ত চরু তোমার মাতার ও এই শুভ্রবর্ণ চরু তোমার। কিন্তু ভ্রমক্রমে বা মাতার কৌশলে এই দুই চরু ভক্ষণে বিপর্যয় ঘটে ও তাঁরা বিপরীত চরু ভক্ষণ করেন। এই ব্যাপার জানতে পেরে ভৃগু সত্যবতীকে বলেন যে, তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হবে, আর তোমার মাতা ব্রাহ্মণাচারী ক্ষত্রিয়-পুত্র প্রসব করবেন। তখন সত্যবতী বললেন, আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন হয়। ভৃগু তাই হবে বলে বর দিলেন। ফলে সত্যবতী পরশুরামের পিতা জমদগ্নির জন্ম দিলেন ও তাঁর মাতা বিশ্বামিত্রের জন্ম দিলেন (কালিকা পুরাণ)।

(৩) দেবর্ষি নারদের মাতা। ব্রহ্মার অভিশাপে নারদের যখন মানব জন্ম হয়, ইনি তাঁর গর্ভধারিণী হন।

সত্যবান—শাল্বদেশের রাজা দ্যুমৎসেনের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী শৈব্যার গর্ভে সত্যবানের জন্ম হয়। দৈবনিগ্রহে অন্ধ ও শত্রুনিগ্রহে হৃতরাজ্য হয়ে দ্যুমৎসেন স্ত্রী ও শিশুপুত্র সত্যবানের সহিত বনবাসী হয়ে তপশ্চর্যায়

ব্রতী হন। সত্যবান মাতাপিতার সেবা করে তাপসের জীবনযাপন করতেন। বনবাসী সত্যবান যৌবনে পদার্পণ করলে মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী সত্যবানকে দেখে তাঁর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে কৃতসঙ্কল্প হন ও পিতাকে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। দেবর্ষি নারদ এই কথা জানতে পেরে অশ্বপতিকে বলেন, সত্যবান সর্বগুণান্বিত। মাতা এবং পিতা সত্য কথা বলেন বলে ব্রাহ্মণরা এঁকে সত্যবান নামে অভিহিত করেন। বাল্যকালে সত্যবান অতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিলেন ও মৃত্তিকার সাহায্যে অশ্বমূর্তি নির্মাণ করতেন। সে জন্য তার নাম হয় চিত্রাশ্ব। কিন্তু দোষের মধ্যে সত্যবান অল্পায়ু। এক বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হবে। অশ্বপতি তখন কন্যাকে অন্য পতি নির্বাচন করতে বললে সাবিত্রী অস্বীকার করে সত্যবানকেই বিবাহ করেন। বৎসরান্তে নির্দিষ্ট কালরাত্রে সত্যবান বনে ফল ও কাষ্ঠ আহরণে যাত্রা করতে উদ্যত হলে, সাবিত্রী শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে সত্যবানের সহিত অরণ্যে গমন করেন। ফল ও কাষ্ঠ-সংগ্রহ করতে করতে সত্যবান হঠাৎ শিরঃপীড়া অনুভব করে অবসন্ন হয়ে পড়ে যান। অতি কষ্টে বৃক্ষতলে সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে সত্যবান নারদের কথিত মত মুহূর্তে প্রাণত্যাগ করেন। এমন সময় সাবিত্রী রক্তবস্ত্র পরিহিত বিরাটকায় এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে পাশহস্তে সত্যবানের পাশে দণ্ডায়মান দেখেন। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে তিনিই যম। সত্যবান পুণ্যাত্মা ও সাবিত্রী পতিব্রতা বলে যমদূতগণ সত্যবানকে নিয়ে যেতে অশক্ত হলে, যম স্বয়ং তাঁকে নিতে আসেন। সত্যবানকে পাশবদ্ধ করে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখে সাবিত্রী যমের অনুসরণ করলেন। যম তখন সাবিত্রীকে নিবৃত্ত হতে বলেন; কিন্তু সাবিত্রীর স্তবে ও স্তুতিবাক্যে যম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বামীর জীবন ছাড়া অন্য কোন বর প্রার্থনা করতে বলেন। তাতে সাবিত্রী শ্বশুরের অন্ধত্ব দূর হবার বর প্রার্থনা করেন। 'তথাস্তু' বলে যম সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু সাবিত্রী নানা অনুনয়-বিনয় করে যমকে মুগ্ধ করেন। যম আবার সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা করতে বললেন। সাবিত্রী পুনরায় শ্বশুরের রাজ্যলাভ ও পিতার শত পুত্র লাভ প্রার্থনা করেন। এই বর দান করে যম সাবিত্রীকে পুনরায় ফিরে যেতে বললেও তিনি যমের পশ্চাদ্গমন করা থেকে নিবৃত্ত হন না। সাবিত্রীর স্তবে তুষ্ট হয়ে যম তাঁকে চতুর্থ বারের মত বর প্রার্থনা করতে বলেন। তখন সাবিত্রী বলেন, তাঁর গর্ভে সত্যবানের ঔরসে যেন শত পুত্র

হয়। এই বর দান করে যম সাবিত্রীকে প্রত্যাবর্তন করতে বললে, সাবিত্রী বলেন যে, শত পুত্রবতী হবার বর দেওয়ার পরেও যম কেন তাঁর স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন। যম এই কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে সত্যবানের জীবনদান করে বলেন যে, সত্যবান চারি শত বৎসর সাবিত্রীর সঙ্গে জীবিত থাকবেন। তখন সাবিত্রী সত্যবানের দেহের নিকট ফিরে এলে সত্যবান সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠে সাবিত্রীর সঙ্গে আশ্রমে ফিরে যান। দ্যুমৎসেনের চক্ষু ও রাজ্যলাভ এবং অশ্বপতির শতপুত্র লাভ হয় (মহাভারত—বন)।

সত্যভামা-রাজা সত্রাজিতের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। বিবাহের অব্যবহিত পরেই অক্রূর ও কৃতবর্মার প্ররোচনায় এঁর পিতা শতধন্বা কর্তৃক নিদ্রিত অবস্থায় নিহত হন। নববধূ সত্যভামা-পিতার মৃতদেহ তৈলমধ্যে রক্ষা করে স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। তখন শতধন্বাকে হত্যা করে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে তৃপ্ত করেন। একবার নারদ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য স্বর্গ হতে কল্পবৃক্ষের কয়েকটি ফুল নিয়ে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ফুলগুলি পেয়ে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেন; কিন্তু ভুলক্রমে এই ফুল তিনি সত্যভামাকে দিতে বিস্মৃত হন। সত্যভামা এই ফুল না পেয়ে অভিমান করেন। তখন সত্যভামার সন্তোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বর্গ হতে কল্পতরু এনে সত্যভামার গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপণ করেন। ইনি ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, শিবের স্ত্রী গৌরী ও অগ্নির স্ত্রী স্বাহার মত পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করে নারদকে স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন এবং তৎপরে তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখন শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত তুলসীপত্রের বিনিময়ে নারদের নিকট হতে স্বামীকে ফিরে পান। যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর অন্যান্য যাদব মহিলাদের সঙ্গে ইনি অর্জুন কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে নীত হন। পরে ইনি হিমালয় অতিক্রম করে কলাপগ্রামে গিয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে কাটিয়ে সমাধি লাভ করেন। এঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়।

সত্যযুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগ। এই চার যুগের মধ্যে সত্যযুগ প্রথম যুগ। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই যুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগে ভগবানের চারিটি অবতার—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। এই যুগ পুণ্যপূর্ণ, পাপশূন্য এবং সকলেই এই যুগে পুণ্যকর্মা। এই যুগে ধর্ম চতুষ্পদ, এই যুগে কুরুক্ষেত্র তীর্থ, গ্রহাংশ, ব্রাহ্মণ, প্রাণ মজ্জাগত, ইচ্ছা মৃত্যু, ব্যাধি প্রভৃতিতে কারো মৃত্যু নাই।

সত্যযুগে মানবদেহ একবিংশতি হস্ত পরিমাণ এবং পরমায়ু লক্ষ বৎসর পরিমাণ। এই যুগে বলি, বেণ, মান্ধার্তা, পুরূরবা, ধুন্ধুমার ও কার্ত্তবীর্য—এই কয় জন রাজা।

সত্রাজিৎ—শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পিতা। ইনি শিনির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিম্নের পুত্র ও যদুবংশীয় রাজা। সত্রাজিৎ সূর্যের উপাসক ছিলেন এবং সূর্যের সহিত অতিশয় প্রীতি থাকাতে সূর্য প্রণয়চিহ্নস্বরূপ এঁকে স্যমন্তক মণি দান করেন। এই মণি অনাবৃষ্টি নিবারণ ও প্রত্যহ রাশি রাশি স্বর্ণদান করত। মণির অধিকারীকে পুণ্যবান ও সংযমী হয়ে থাকতে হত। সত্রাজিৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে এই মণি দান করেন। সত্রাজিতের মত প্রসেন পুণ্যবান ছিলেন না। তাই এই মণি ধারণ করে মৃগয়া করতে গিয়ে ইনি সিংহ কর্তৃক নিহত হন। জাম্ববান সেই সিংহকে হত্যা করে এই মণি সংগ্রহ করেন ও নিজের পুত্রকে দান করেন। সত্রাজিৎ প্রসেনকে দেখতে না পেয়ে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণই বোধ হয় মণির লোভে প্রসেনকে হত্যা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা জানতে পেরে বনে গিয়ে নিহত প্রসেন ও সিংহকে দেখতে পান; কিন্তু মণির সন্ধান পেলেন না। ঋক্ষ-পদচিহ্ন অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে জাম্ববানকে পরাজিত করে মণি উদ্ধার করেন ও সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দেন। বৃথা দোষারোপে লজ্জিত হয়ে সত্রাজিৎ মণি ও কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে অর্পণ করে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণি গ্রহণ করে এবং সত্রাজিৎকে মণি ফিরিয়ে দেন। অক্রূর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। বিফল মনোরথ হয়ে অক্রূর ও কৃতবর্মা সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণি গ্রহণের জন্যে শতধন্বাকে উত্তেজিত করেন। এর ফলে সত্রাজিৎ নিদ্রিত অবস্থায় শতধন্বা কর্তৃক নিহত হন।

সনক—ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মা সৃষ্টি করবার সঙ্কল্প করে প্রথমে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। এই অবিদ্যা হতে তমিস্র, অন্ধ-তমিস্র, মোহ ও মহামোহ প্রভৃতির জন্ম হয়। এই সকল অসৎ সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মা শান্তি পান না। তখন তিনি ধ্যানস্থ হয়ে মন দ্বারা অন্য প্রকার সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন এর ফলে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। এই সকল পুত্ররা নিষ্ক্রিয় ও ঊর্ধ্বরেতা হলেন। ব্রহ্মা এই সকল পুত্রকে সৃষ্টি করতে বললে তাঁরা বললেন, সংসার দুঃখ ও মায়াময়। মায়ায় বদ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করতে তাঁদের ইচ্ছা নাই। এই বলে তাঁরা ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করতে লাগলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্রদের

অন্যতম। ইনি জন্মিবামাত্র যতিধর্ম আশ্রয় করে পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে প্রজাধর্ম ও ভোগবিলাস ত্যাগ করেছিলেন। যে প্রকার শরীরে জন্মেছিলেন, সেই প্রকার শরীরেই বিদ্যমান আছেন বলে ইনি নিত্যকুমার বা সনৎকুমার নামে খ্যাত (হরিবংশ)।

সনৎসুজাত—মহাযোগী মহর্ষি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর লক্ষণ ও মোক্ষ লাভের উপায়, মৌন শব্দের অর্থ ইত্যাদি উপদেশ দেন (মহাভারত)।

সনন্দ—ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র। চার মানসপুত্রের নাম যথাক্রমে—সনৎকুমার, সনন্দ, সনক ও সনাতন। এঁরা সংসারধর্ম ও পুত্রের জন্মদান করতে অস্বীকার করে চিরকাল পবিত্র ও কুমার রূপে অবস্থান করেন।

সনাতন—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনিও সংসারধর্ম ত্যাগ করে অন্যান্য ভ্রাতাদের মত নিষ্ক্রিয় ও উর্ধ্বরেতা হয়ে ধর্মচিন্তায় জীবন কাটিয়ে দেন।

সপ্তর্ষি—ব্রহ্মার মানসপুত্র সাত জন ঋষি। বিভিন্ন মন্বন্তরে যে সাত জন ঋষি আবির্ভূত হয়ে ধর্মের ব্যবস্থা ও লোকরক্ষা করেছেন, এঁদের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ লেখা হয়েছে। আকাশের ঈশান কোণে এঁরা অবস্থান করেন। এরাই সপ্তর্ষি মণ্ডল নামে পরিচিত। এই সপ্তর্ষির নাম—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। এই সাত জনের যথাক্রমে কলা, অনসূয়া, ক্ষমা, হবির্ভূ, সন্নতি, শ্রদ্ধা ও অরুন্ধতী এই সাত জন স্ত্রী। এঁরা সকলেই লোকজননী (পদ্ম পুরাণ)। প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল সপ্তর্ষি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ছিলেন। মনু চতুর্দশ; সুতরাং সপ্তর্ষিও চতুর্দশ মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন (হরিবংশ)।

সপ্তজিহ্ব—অগ্নি। অগ্নির সাতটি জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বনিরূপিণী।

সপ্তদ্বীপ—জম্বুক, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর—এই সাতটি মহাদ্বীপ।

সপ্তলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য—উপরিস্থ এই সাতটি লোক।

সপ্তশতী—দেবী মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ—চণ্ডী। সাত শত শ্লোক থাকায় ইহা সপ্তশতী নামে খ্যাত।

সপ্তজনা—কিষ্কিন্ধ্যার নিকটে এক পর্বতে সপ্তজনা নামে ঋষিগণ বাস করতেন। এঁরা সর্বদা অধঃশির হয়ে তীব্র তপস্যা করতেন। জলমাত্র পান না করে এবং বায়ুভক্ষ হয়ে সাত বৎসর তপস্যা করে এঁরা স্বর্গে গমন করেন (রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যা)।

সন্ধ্যা—(১) একজন দানব। এর কন্যা হোতির পুত্র বিদ্যুতকেশের

স্ত্রী (রামায়ণ-উত্তর)। (২) সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা যে সকল পুত্র-কন্যার জন্ম দেন সন্ধ্যা তার অন্যতমা। এই মানস-কন্যার সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করলে মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করেন। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই তিন ভাগে বিভক্ত করে নিজের দেহ ত্যাগ করেন (মহাভারত)। (৩) ব্রহ্মা ধ্যানস্থ থাকবার সময় মানসকন্যা সন্ধ্যার জন্ম হয়। তাই তাঁর নাম সন্ধ্যা। এই কন্যার সম্বন্ধে ভাববার সময় ব্রহ্মার মন হতে এক পরমসুন্দর পুরুষের জন্ম হয়। তিনিই কামদেব নামে খ্যাত। ব্রহ্মা কামদেবের হস্তে সন্ধ্যাকে অর্পণ করেন (কালিকা পুরাণ)।

সপ্তরথী—যে সাত জন রথারোহী বীর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণ নির্মিত চক্রব্যূহের মধ্যে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেন, তাঁরা সপ্তরথী নামে খ্যাত। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, জয়দ্রথ ও দুঃশাসন।

সবিতা—ঋগ্‌বেদের ১১টি সূক্তে সবিতার স্তুতি পাওয়া যায়। সবিতা হিরণ্যদ্যুতি, হিরণ্যপাণি, হিরণ্যজিহ্ব। হিরণ্ময় রথে শুভ্র পদ ও লোহিত বর্ণ অশ্ব তাঁকে বহন করে। তিনি তাঁর হিরণ্যহস্ত উত্তোলন করে সকল প্রাণীকে জাগ্রত ও আশীর্বাদ করেন। তাঁর মহৎ হিরণ্যদ্যুতি পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ পরিব্যাপ্ত করে। এঁর বেশ পীতবর্ণ। ইনি পূর্ব দিকে উদিত হয়ে দুঃস্বপ্ন, রাক্ষস, পাপ প্রভৃতি দূর করেন। বায়ু ও জল এঁর অধীন। সবিতাকে সূর্য হতে পৃথক বিবেচনা করা হয়েছে। সূর্য রশ্মিতেই সবিতার দীপ্তি; সবিতা সূর্য চালনা করেন এবং সূর্যের নিকট মানুষের নিষ্পাপত্ব ঘোষণা করেন। সবিতার উদ্দেশ্যে বিশ্বমিত্রের রচিত প্রসিদ্ধ একটি ঋক (৩।৬২।১০) প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা উচ্চারিত হয়ে আসছে। এটি গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলে গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধ।

সব্যসাচী—অর্জুনের এক নাম। ইনি উভয় হস্তেই সমভাবে বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে এঁর এই নাম।

সমাধি—সমাধি নামে এক ধনলোভী বৈশ্য স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক গৃহ-বিতাড়িত হয়ে দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন। দেবীর আরাধনা করে বর পেয়ে ইনি পরম জ্ঞান লাভ করেন (দেবী-ভাগবত)।

সমন্তপঞ্চক—তীর্থবিশেষ। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। পঞ্চ-হ্রদ সমন্বিত ছিল বলে এর নাম সমন্তপঞ্চক। পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে ক্ষত্রিয়দের রক্তে এই পাঁচটি হ্রদ সৃষ্টি করে সেই রক্তে পিতার তর্পণ করেন।

সমুদ্র মন্থন—সত্যযুগে দেবতা ও অসুরগণ স্থির করেন তাঁরা অমৃত পান করলে অজর, অমর ও নিরাময় হবেন। অমৃত লাভের আশায় তাঁরা মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করতে আরম্ভ করেন। সহস্র বৎসর মন্থনের পর বাসুকী বিষ বমন ওদন্তদ্বারা শিলা দংশন করতে থাকেন। তখন দেবতারা ভীত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন শঙ্খচক্রধারী হরি সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্থনজাত বিষ অগ্রপূজা হিসাবে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে পান করতে বলেন। মহাদেব সেই উত্থিত বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করেন। বিষের তেজে তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ হয় বলে এঁর এক নাম নীলকণ্ঠ। দেবাসুরগণ আবার মন্থন আরম্ভ করলে মন্দরপর্বত পাতালে প্রবিষ্ট হল। তখন দেবতা ও গন্ধর্বদের প্রার্থনায় বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে নিয়ে সাগরতলে শয়ন করেন। আরও সহস্র বৎসর মন্থনের ফলে ধন্বন্তরির আবির্ভাব হয়। তারপর ওঠেন অসংখ্য অপ্সরাগণ। 'অপ' হতে উত্থিত বলে এদের নাম হয় অপ্সরা। দেব বা দানবরা এঁদের গ্রহণ না করায় এরা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হলেন। এরপর উঠলেন বরুণের কন্যা বারুণী বা সুরা। দিতির পুত্ররা তাঁকে গ্রহণ না করে অসুর হলেন ও অদিতির সন্তানগণ তাঁকে নিয়ে সুর হলেন। এর পর ক্রমে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি ও সর্বশেষে অমৃত উত্থিত হলো। এই অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হলেবিষ্ণুমোহিনীরূপে অমৃত হরণ করে আক্রমণকারীদের বিনষ্ট করলেন। দেবতারা বহু অসুর নিহত করে যুদ্ধে জয়ী হন ও ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হন (রামায়ণ—বালকাণ্ড)।

মহভারতে সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। দেবগণ সুমেরু-পর্বতে অমৃত প্রাপ্তির মন্ত্রণাকালে ব্রহ্মা তাঁদের অসুরদের সহিত সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন। তাঁরা নাগরাজ বাসুকীর সাহায্যে মন্দরপর্বত উৎপাটিত করে কূর্মপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক বাসুকীকে মন্থন রজ্জুরূপে সমুদ্র মন্থন করেন। দেবগণ বাসুকীর লাঙ্গুল ও অসুরগণ মুখভাগ গ্রহণ করেন। বহুকাল মন্থনের পর সমুদ্র হতে দুগ্ধ ও ঘৃত উৎপন্ন হলো। ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ অমৃত প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মন্থন করতে লাগলেন। এর পর ক্রমান্বয়ে সমুদ্র হতে চন্দ্রদেব ও ঘৃত হতে লক্ষ্মী, সুরাদেবী, উচ্চৈঃশ্রবা ও কৌস্তুভ মণি উত্থিত হলো। শেষে অমৃতভাণ্ড হস্তে ধন্বন্তরি ও পরে গজরাজ ঐরাবত উত্থিত হলো। কৌস্তুভ মণি নারায়ণ এবং উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত ইন্দ্র গ্রহণ করলেন। এর

পরেও মন্থন করায় কালকূট বিষ উৎপন্ন হলো। তার গন্ধে ত্রিলোক মূর্ছাগত হলে ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব তা পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। অমৃত ও লক্ষ্মীর অধিকার নিয়ে দেবাসুরের ভীষণ যুদ্ধে নারায়ণ মোহিনীরূপে অসুরদের মোহিত করে অমৃত তাদের হাত থেকে অধিকার করেন। দেবগণ নারায়ণের নিকট হতে উক্ত অমৃত পান করেন। সেই সময় রাহু নামে এক দানব দেবতার ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে উক্ত অমৃতের অংশ গ্রহণ করে পান করে। রাহুর কণ্ঠদেশে অমৃত উপস্থিত হতেই চন্দ্র ও সূর্য তা ব্যক্ত করেন। তখন নারায়ণ সুদর্শনচক্রে রাহুর কণ্ঠচ্ছেদ করেন। সেই অবধি চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে রাহুর শত্রুতা। অতঃপর দারুণ যুদ্ধে অসুরদের পরাস্ত করে দেবগণ ত্রিলোক অধিকার করেন ও অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করে নারায়ণের কাছে রাখেন (মহাভারত—আদি)।

সমুদ্র-শাসন—সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় সেতুবন্ধনের পূর্বে রাম সমুদ্র পার হবার জন্য ত্রিরাত্র ' আরাধনা করেন। কিন্তু সমুদ্র রামকে দর্শন না দেওয়ায় রাম ক্রুদ্ধ হয়ে সমুদ্রের জল শোষণ করবার জন্য শর গ্রহণ করেন। তিনি সমুদ্র শুষ্ক করবেন, বানররা পদব্রজে সমুদ্র পার হবে। রাম জগত কম্পিত করে বজ্রনাদে শরমোচন করলেন। তখন জলের ভিতর থেকে সমুদ্র স্বয়ং মূর্তিমান হয়ে উত্থিত হয়ে রামের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করেন ও নলের সাহায্যে সেতুবন্ধন করে সমুদ্র পার হবার পরামর্শ দেন। রাম তাঁর বাণ সংবরণে অসমর্থ হয়ে তা নিক্ষেপ করবার স্থান জানতে চাইলে, সমুদ্র বলেন—আমার উত্তর দিকে দ্রুমকুল্য নামক স্থানে আভীর প্রভৃতি দস্যুগণ তাঁর জলপান করে। সেই পাপীদের স্পর্শ হতে মুক্ত হবার জন্য সমুদ্র রামকে সেখানে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে বলেন। রাম তাই করলে, সেই শর পতনের স্থান মরুকান্তার নামে খ্যাত হয় এবং শরবিদীর্ণ গহ্বরের মুখ থেকে জল উঠতে লাগল। তার নাম হলো ব্রণকূপ। রামের বরে মরুকান্তার উর্বর হয়। নল বিশ্বকর্মার পুত্র। পিতার নিকট লব্ধ বরের প্রভাবে আদিষ্ট হয়ে সমুদ্র বক্ষে সেতু নির্মাণ করল। শত যোজন দীর্ঘ দশ যোজন বিস্তৃত নলকৃত সেতুর সাহায্যে সহস্র কোটি বানর লাফাতে লাফাতে সগর্জনে সমুদ্র পার হোল (রামায়ণ—যুদ্ধকাণ্ড)।

সম্পাতি—অরুণ ও তাঁর স্ত্রী শ্যেনীর দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ু। সম্পাতি জ্যেষ্ঠ। পুরাকালে বৃত্রবধের পর জটায়ু ও সম্পাতি ইন্দ্রকে জয় করবার ইচ্ছায় আকাশ পথে যাত্রা করে; কিন্তু পথে সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে জটায়ু

অবসন্ন ও সন্তপ্ত হলে স্নেহবশে সম্পাতি নিজের পক্ষবিস্তার করে ভ্রাতাকে আচ্ছাদন করে রক্ষা করে। তাতে সম্পাতির পক্ষ দগ্ধ হয় ও সে বিন্ধ্য পর্বতে নিপতিত হয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকে। চিরজীবী বলে এর প্রাণান্ত হয় নাই। পক্ষ দগ্ধ হবার ছয় দিন পরে জ্ঞান হয় এবং উগ্রতপা ঋষি নিশাকরের পাদবন্দনা করতে থাকে। তার ফলে, ঋষি তাকে বলেন, তার ডানা ও পালক আবার উদ্গত হবে। পঙ্গু অবস্থায় এর পুত্র সুপার্শ্ব একে খাদ্য দিয়ে যেত। তার কাছেই সম্পাতি এক ভয়ঙ্কর পুরুষ কর্তৃক এক বরবর্ণিনী রমণী অপহরণের বার্তা শোনে। সীতা অন্বেষণে ব্যর্থকাম বানরগণ সমুদ্রতীরস্থ বিন্ধ্যপর্বতে উপস্থিত হলে, অঙ্গদের কাছে সীতা হরণ ও জটায়ুর নিধনবার্তা জানতে পারে। পরে বানরদের সাহায্যে সমুদ্রের জলে মৃত ভ্রাতার উদ্দেশে তর্পণ করে। শেষে দশরথের বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ সম্পাতি রাবণ ও লঙ্কাপুরীর বৃত্তান্ত বলে দিব্যচক্ষুর প্রভাবে সীতা যে লঙ্কায় বন্দিনী আছেন, সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে ও হনুমান প্রভৃতিকে সাগর লঙ্ঘনের পরামর্শ দেয়। এই বৃত্তান্ত বিবৃত করতেই তার পুনরায় পক্ষোদগম হয় (রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড)।

সরমা—(১) গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা এবং রাবণ-সহোদর বিভীষণের স্ত্রী। মানস সরোবর তীরে এঁর জন্ম হয়। এই সময় বর্ষাকালে ক্রমবর্ধিত মানস সরোবরের জল সদ্যোজাতা কন্যার নিকট আগমন করলে, শৈলুষ-স্ত্রী : সরঃ মা বর্দ্ধত, অর্থাৎ সরোবর, আর তুমি বর্দ্ধিত হয়ো না বলে নিষেধ করেন। সেই জন্য কন্যার নাম হয় সরমা। ইনি আকাশ-পথে প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারতেন। অশোক বনে বন্দিনী সীতাকে ইনি সর্বদাই রক্ষা করতেন। বিদ্যুজ্জিহ্ব কর্তৃক সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড দেখালে সরমা সীতাকে রামের কুশল সংবাদ দিয়ে সান্ত্বনা করেন। ইনি স্বামীর ন্যায় ধর্মশীলা ও ন্যায়পরায়ণা ছিলেন। তরণীসেন এঁর গর্ভজাত পুত্র (রামায়ণ)।

(২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী। ইনি ভ্রমর, ভৃঙ্গরোল, চরটা (ভিমরুল, বোলতা) প্রভৃতি দংশক, পতঙ্গ ও মধুমক্ষিকাদির জনয়িত্রী।

(৩) ঋকবেদে ইন্দ্রের কুকুর এবং সারমেয় নামে দুই কুকুরের মাতা। এই দুই কুকুরের প্রত্যেকটির চারিটি করে চক্ষু ছিল এবং এরাই যমের কুকুর।

সর্বদমন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পুত্র। এই বালক ছয় বৎসর বয়সেই আশ্রম-স্থিত সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি ধরে

গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখত, এদের পিঠে আরোহণ করে খেল। কমত এবং সকলকেই দমন করে রাখত। এই জন্য এর নাম সর্বদমন। শকুন্তলা পুত্রকে দুষ্মন্তের কাছে নিয়ে গেলে, প্রথমে দুষ্মন্ত বালকের পিতৃত্ব অস্বীকার করেন ও পরে দৈববাণী হলে গ্রহণ করেন ও তার নাম রাখেন ভরত। ভরত কালে দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধযজ্ঞকারী রাজা হন। এঁর তিন মহিষী ছিল। তাঁদের গর্ভে এঁর নয় পুত্র হয়। তারা পিতার অনুরূপ হয়নি বলে পিতৃ-সমাদরে বঞ্চিত ছিল। ফলে মহিষীরা ক্রোধে এঁদের বিনষ্ট করেন। বহু পরে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুরোধে ভূমন্যু নামে এক বংশধর পুত্রলাভ হয়। ভরত হতেই বিখ্যাত ভরত বংশের উৎপত্তি।

সর্বমঙ্গলা—(১) অন্যতমা যোগিনী। (১) দেবী মাহেশ্বরীর দেহ সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। (৩) সকলকে অভিষ্ট-ফল দান করেন বলে দুর্গার এক নাম সর্বমঙ্গলা।

সরযূ—পূতসলিলা নদী। এর উৎস কৈলাস পর্বতে ব্রহ্ম-কল্পিত মানস-সরোবরে। সর অর্থাৎ মানস সরোবর থেকে এই নদী নির্গত হয়েছে বলে সরযূ নামে খ্যাত্যা। এই নদীতীরে বহু যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, সে জন্য ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। কোশলরাজ্য সরযূ তীরে অবস্থিত ছিল। প্রসিদ্ধ মহানগরী অযোধ্যা ছিল এর কূলবর্তী। লক্ষ্মণ রাম-কর্তৃক বর্জিত হয়ে সরযূতে প্রাণ বিসর্জন করে স্বর্গে গমন করেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সরযূ সলিলে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেন। রাম-ভক্তরা সরযূতে প্রাণ দিয়ে মুক্তিলাভ করেন। বৈদিক যুগে এই নদীর তীরে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল।

সরস্বতী—বেদে সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আর্যরা ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করলে সেই স্থানের নদী বিশেষেরও এই নাম হয়। সরস্বতী দেবী নদীরূপে দেশকে উর্বরা করতেন, জলকে পবিত্র করতেন। দেশে অর্থ-সম্পদ আনতেন। বাগ্‌দেবীরূপে বেদে সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, এই নদীতীরেই ঋষিদের গ্রাম ও আবাসস্থল ছিল। সমস্ত বৎসর এই স্থানে বেদধ্বনি হোত বলে ইহা বাগ্‌দেবীর বাসস্থান বলে অভিহিত। কালক্রমে এই নদী সরস্বতী নাম প্রাপ্ত হয়। বেদের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালে নদী বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত হন। পূর্বে তাই বাগ্‌দেবীকে বোঝাতে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেও বোঝাত।

নদী অর্থে এঁর মাহাত্ম্য এইরূপ—

পবিত্র-তোয়া যজ্ঞময়তীরশালিনী সরস্বতীদেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন। মনোহর বেদবাক্য সকলের প্রেরণকর্ত্রী, সুন্দর স্তুতির উদ্বোধনকারিণী, সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করেছেন। ইনি আপন স্রোতরূপ পতাকাদ্বারা মহার্ণব প্রকাশ করেন। বাগ্‌দেবী অর্থে এঁর মাহাত্ম্য এইরূপ—মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন, যিনি যজ্ঞশালিনী এবং অন্নদাত্রী সেই সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন। ইনি সুন্দর ও সত্য বাক্যের প্রেরণকর্ত্রী, ইনি সুবুদ্ধির উদ্বোধনকারিণী, ইনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্রী। ইনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মার চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন। ইনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন।

সরস্বতীর দেবী রূপে উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে: পরমাত্মার মুখ হতে একটি দেবীর আবির্ভাব হয়। এই দেবী শুক্লবর্ণা, বীণাধারিণী ও চন্দ্রের শোভাযুক্তা। এই দেবী শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কবিদের ইষ্টদেবতা—এই জন্য এই দেবীর নাম সরস্বতী। সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাঁচভাগে বিভক্ত হন—রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। এর মধ্যে এক শক্তি সরস্বতী কৃষ্ণ-কণ্ঠ হতে উদ্ভূতা। শ্রীকৃষ্ণ এই দেবীকে প্রথমে পূজা করেন। সেই হইতে এই দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। দেবী শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই কামনা করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে নারায়ণ ভজনা করতে বলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)। দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই জনই নারায়ণের স্ত্রী।

সহজন্যা—স্বর্গের ছয়জন প্রধান অপ্সরাদের মধ্যে সহজন্যা অন্যতমা। অর্জুনের জন্ম হলে এই অপ্সরারা নৃত্যগীত করেছিল (মহাভারত—আদি)।

সহদেব—(১) ইনি পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পাণ্ডব। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ও পাণ্ডুর ক্ষেত্রে, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। কুন্তীর পুত্রলাভ দেখে মাদ্রী একদিন স্বামীকে তাঁর সন্তানলাভের উপায় উদ্ভাবন করতে অনুরোধ করেন। মুনির শাপে পাণ্ডুর স্ত্রীরা সহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। মাদ্রী স্বামীকে জানান কুন্তীকে এই বিষয়ে অনুরোধ করতে তাঁর লজ্জা ও অভিমান হয়। তখন পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রের প্রভাবে কোন এক দেবতাকে স্মরণ করতে বলেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করলে মাদ্রীর গর্ভে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয়। মাদ্রী সহমরণে

গেলে নকুল ও সহদেব বিমাতা কুন্তীর মাতৃস্নেহেই প্রতিপালিত হন। দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে সহদেব অসি যুদ্ধে অদ্বিতীয় হন। গোতত্ত্বেও এঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। ইনি বীর রথী ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু শত্রু নিধন করেন। দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের বনগমন কালে সহদেব শকুনিকে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে সহদেব শকুনি ও তাঁর পুত্র উলূকের ভল্লের আঘাতে শিরশ্ছেদ করেন। দ্রৌপদীর গর্ভে সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র সুপ্ত অবস্থায় পাণ্ডব শিবিরে অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হন। মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে সহদেব স্বয়ংবরে লাভ করেন। তাঁর গর্ভে সুহোত্র নামে এক পুত্র হয়। এ ভিন্ন জরাসন্ধের কন্যা ও যদুবংশীয় ভানুর কন্যা ভানুমতীকে সহদেব বিবাহ করেন। ইনি ভ্রাতাদের সহিত দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও বিরাট-গৃহে তন্তিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষরূপে অজ্ঞাতবাস করেন। এই সময় এঁর গুপ্ত নাম ছিল জয়দ্বল। এঁর শঙ্খের নাম মণিপুষ্পক। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মহাপ্রস্থানে যাত্রার সময় অতি পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য পাপস্পর্শহেতু ইনি সুমেরুপর্বত শিখরে পতিত হন (মহাভারত)।

(২) মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্র; ইনি জরাসন্ধের মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করেন ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন (মহাভারত)।

সহস্রপাদ—জনৈক ঋষি। খগম নামে এঁর এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিল। একদিন খগম অগ্নিহোত্র কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে সহস্রপাদ কৌতুকচ্ছলে তৃণ নির্মিত সর্প দ্বারা এঁকে ভয় দেখান। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে খগম এঁকে শাপ দেন, যে তিনি একটি নির্বীষ সাপে পরিণত হবেন। এর ফলে সহস্রপাদ ডুণ্ডুভ রূপ প্রাপ্ত হলেন। বন্ধুর শাপে অত্যন্ত কাতর হয়ে সহস্রপাদ খগমের কাছে মুক্তির উপায় জানতে চান। তখন খগম বললেন, প্রমতির পুত্র রুরু সর্পকুল নাশ করতে উদ্যত হলে তার দর্শন পেয়ে সহস্রপাদ শাপমুক্ত হবেন (মহাভারত—আদি)।

সহস্রাক্ষ—(১) গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের সর্ব শরীর স্ত্রী-চিহ্ন সদৃশ চিহ্নে আচ্ছাদিত হয়। পরে এঁরই বরে উক্ত চিহ্নগুলি চক্ষুরূপে পরিবর্তিত হয়। সেই জন্য ইন্দ্রের অন্য নাম সহস্রাক্ষ।

(২) পাণ্ডুদেশে সহস্রাক্ষ নামে এক জন রাজা বাস করতেন। একবার তিনি দুর্বাসা মুনিকে দেখে প্রণাম করেন নি। ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসা এঁকে শাপ দেন, "রাক্ষস হও"। রাজা সহস্রাক্ষ তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে

দুর্বাসার নিকট মুক্তির উপায় জানতে চাইলেন। তখন দুর্বাসা বললেন, শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শলাভ করলে সহস্রাক্ষ শাপমুক্ত হবেন। ঐ সহস্রাক্ষই দুর্বাসার শাপে দ্বাপরের তৃণাবর্ত নামে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়ে তিনি শাপমুক্ত হন।

সাকল্য—প্রাচীন বৈয়াকরণিক ও বেদের প্রবক্তা। ইনি যাস্কের পূর্বে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি বেদের সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন এবং অনেক শিষ্যদের তা শিক্ষিত করান; এঁর অন্য নাম দেবমিত্র।

সাত্যকি—যদুবংশীয় রাজা শিনির পৌত্র ও সত্যকের পুত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন। সাত্যকির অন্য নাম যুযুধান। অর্জুনের কাছে ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন ও শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহ-ভাজন ছিলেন। সাত্যকি কিঞ্চিৎ উগ্রস্বভাব ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের পরদিন পাণ্ডবগণ যাদবদের সঙ্গে রাজ্যোদ্ধারের পরামর্শ কালে, দ্যূতক্রীড়ারত বলরাম যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতার কথা উল্লেখ করে শকুনিকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করলে, সাত্যকি বলরামকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলে, সাত্যকি সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধে মত দেন। কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণ শেষবারের মত শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় এলে, সাত্যকি তাঁর সঙ্গে যান। সেখানে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করবার অভিসন্ধি করলে সাত্যকি তা বুঝতে পেরে সভা ত্যাগ করে কৃতবর্মাকে সৈন্যদের ব্যূহবদ্ধ সভাদ্বার রক্ষা করতে বলে পুনরায় সভায় আসেন ও ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের অভিসন্ধি প্রকাশ করেন। সাত্যকি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের অন্যতম সেনাপতি এবং একজন অতিরথ ছিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে ইনি অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন। চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে জয়দ্রথ বধের জন্যে অর্জুন জয়দ্রথের অভিমুখে অগ্রসর হলে সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য থাকতে বলেন। অর্জুন দুর্যোধনকে পরাস্ত করেন ও শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করেন। তাতে অর্জুনের বিপদাশঙ্কায় যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অর্জুনের রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। সাত্যকি দ্রোণের সারথি, রাজা জলসন্ধ ও সুদর্শনকে নিহত করে কৌরবব্যূহে প্রবেশ করেন ও বহু কৌরব সৈন্য বিনষ্ট করে অর্জুনের অভিমুখে অগ্রসর হন। সাত্যকির বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে প্রেরণ করেন। ভীম ব্যূহভেদ করেন ও কর্ণের নিকট পরাজিত হন। তখন অর্জুন কর্ণকে আক্রমণ করায় ভীম সাত্যকির রথে উঠে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হন।

তখন ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বাধা দেন ও যুদ্ধে পরাস্ত করে শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হন। তখন অর্জুন শরাঘাতে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন। এই অন্যায় যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে তিরস্কার করে ভূরিশ্রবা প্রায়োপবেশনে বসেন এবং সাত্যকি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও খড়্গাঘাতে যোগমগ্ন ভূরিশ্রবার শিরচ্ছেদ করেন। অঙ্গদ নামে এঁর এক পুত্র ছিল। পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শিরচ্ছেদ করে পাণ্ডব শিবিরে কৃতকর্মের জন্য আস্ফালন করলে, পাণ্ডবগণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। সাত্যকি গুরুহত্যার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিরস্কার করলে, উভয়ে উভয়কে হত্যা করতে ধাবিত হন। ভীমসেন, সহদেব ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে উভয়কেই শান্ত করেন। ষোড়শ দিনের যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা বিন্দ ও অনুবিন্দকে সাত্যকি নিহত করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় সাত্যকি সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে সুপ্ত পাণ্ডবপক্ষীয়দের হত্যার জন্য কৃতবর্মাকে তিরস্কার করেন। কৃতবর্মাও ভূরিশ্রবা বধের জন্য সাত্যকিকে নিন্দা করেন। তাতে সাত্যকি সত্রাজিৎ বধের উল্লেখ করায়, সত্যভামা পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ প্রার্থনা করেন। সাত্যকি মত্ত অবস্থায় খড়্গাঘাতে কৃতবর্মার শিরচ্ছেদ করেন ও অন্যান্য বান্ধবদের হত্যা করতে থাকেন। তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যকিকে বেষ্টন করে উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র দ্বারা প্রহার করে তাঁকে হত্যা করেন (মহাভারত)।

সাঙ্খ্য-দর্শন—মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্য মতের প্রবর্ত্তক। ইনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁর মতে প্রথমে কিছু না থাকলে, অকস্মাৎ অমনি কোন বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না। সকল বস্তুই পূর্বস্থিত কোন না কোন বস্তু হতে উৎপন্ন হয়। যেমন মাটি হতে ঘট, দুধ হতে দই, রূপা হতে মুদ্রা ইত্যাদি। কপিল প্রকৃতি-পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন। প্রকৃতি অচেতন স্বরূপ অর্থাৎ জড়। এরই পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার উৎপন্ন হয়েছে। এই প্রকৃতি আদি কারণ। এর আর কারণ নাই। কপিল একে অমূল-মূল বলে বর্ণনা করেছেন। মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির মূল নাই, অতএব প্রকৃতি মূল শূন্য। সেই আদি কারণ হতে ক্রমশঃ কার্য-পরম্পরার উৎপত্তি হয় বলেই কপিল তারই নাম 'প্রকৃতি' রেখেছেন। প্রকৃতি আদি কারণের নাম মাত্র। জগতের সমস্ত পদার্থ মূল প্রকৃতিরই কার্যপরম্পরা মাত্র। পুরুষ চেতন সরূপ, কিন্তু দুঃখ-সুখাদি শূন্য। ইনি অপরিণামী অর্থাৎ বিকারশূন্য এবং অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্যই করেন না। সমস্ত

বিশ্ব ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য। এই পুরুষই প্রাণীদের আত্মা স্বরূপ। কপিল জগতের সচেতন অচেতন দুই প্রকার পদার্থ দেখে তার মূলস্বরূপ এই দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। প্রকৃতি নিজে জড় হলেও পুরুষ সংযোগে সংসারের ব্যাপার সম্পাদন করতে সমর্থ হয়।

সাধ্যগণ—ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলে ১৬৪তম সূক্তের পঞ্চাশতম ঋকে সাধ্যদেবগণ ছন্দোহভিমানী। শতপথ-ব্রাহ্মণের মতে এঁদের বাস দেবলোকের উপরিভাগ। যাস্ক মতে এঁরা ভূবর্লোকবাসী। মনুসংহিতার বর্ণনায় এঁরা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্ট সাধ্যগণ নামক সূক্ষ্ম দেবগণ। বিরাটপুত্র সোমসদগণ এঁদের পিতৃগণ। হরিবংশ মতে দক্ষকন্যা ধর্মপত্নী সাধ্যার গর্ভে এঁদের জন্ম। এঁরা সংখ্যায় দ্বাদশ—মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, আপন, বীর্যবান বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রমুঞ্চ। অন্য মতে এঁরা তের জন।

সান্দীপনি—মুনি বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরু। এই মুনি ব্রহ্মের অংশ বিশেষ ও মহাযোগী। কাশীর নিকট অবন্তীপুরে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সান্দীপনি ঋষি অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সকল প্রকার শিক্ষালাভ করেন। মুনি এঁদের দুইজনকে ধনুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। তাঁরা গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে সান্দীপনি তাঁর মৃত পুত্রের পুনর্জীবনপ্রার্থনা করেন। প্রভাসতীর্থে স্নানের সময় পঞ্চজন নামে একটি শঙ্খাসুর সান্দীপনির ভাসমান পুত্রকে ধরে সাগর গর্ভে নিয়ে যায়। এই অসুর একটি নাতিবিশাল দুর্ভেদ্য ও দুচ্ছেদ্য শঙ্খের মধ্যে নিরাপদে বাস করত। সান্দীপনির অনুরোধে কৃষ্ণ ও বলরাম এই শঙ্খাসুর পঞ্চজনকে বধ করে তাঁর পুত্রকে উদ্ধার করেন এবং এই শঙ্খটি নিয়ে একটি ফুৎকার দেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ এই শঙ্খাসুরের দেহ দিয়ে নিজের শঙ্খ তৈরী করেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই শঙ্খ পঞ্চজন্য নামে প্রসিদ্ধ।

সাবর্ণি মনু—সাবর্ণি মনু অষ্টম মনু। স্ত্রী সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সবর্ণা ছায়াকে নির্মাণ করে সূর্যের কাছে রেখে পিতার ভবনে গমন করেন। এই ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। সংজ্ঞার সবর্ণা ছায়ার পুত্র বলে এঁর নাম সাবর্ণ হয়েছে।

সাবিত্রী—(১) বেদমাতা গায়ত্রী। যা হতে সর্বলোকের সৃষ্টি হয় তিনিই সবিতা। এই সবিতা যাঁর দেবতা তিনি সাবিত্রী বা যিনি নিখিল বেদ প্রসব করেছেন তিনিই সাবিত্রী। মৎস্য পুরাণে আছে, ইনি নিজের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে পুরুষ

এবং এক ভাগে নারী হন। এই নারীই সাবিত্রী দেবী সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রাহ্মী।

(২) মদ্ররাজ অশ্বপতির একমাত্র কন্যা সাবিত্রী। অশ্বপতি সন্তান কামনায় সূর্যাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর তপস্যা করে এই তেজস্বিনী কন্যা লাভ করেন। দেবী সাবিত্রীর দান বলে এঁর নাম সাবিত্রী হয়। এঁর মাতা মালবী। এঁর তেজের জন্য কেহ এঁকে বিবাহ করতে অগ্রসর না হওয়ায়, যৌবনপ্রাপ্তা কন্যাকে অশ্বপতি স্বামী অন্বেষণে যাত্রা করতে বলেন। সাবিত্রী কাহাকেও পছন্দ করতে না পেরে বনবাসী, রাজ্যহারা শাল্বরাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকেই মনে মনে বরণ করেন। নারদের কাছে অশ্বপতি জানতে পারেন, সত্যবান গুণবান, রূপবান, কিন্তু স্বল্পায়ু। এক বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হবে। তখন তিনি সাবিত্রীকে অন্যপতি নির্বাচন করতে বললে সাবিত্রী অসম্মত হন। বাধ্য হয়ে অশ্বপতি সত্যবানের হাতেই সাবিত্রীকে সমর্পণ করেন। সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে বনবাসে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করতে থাকেন ও সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। নারদের বাক্য স্মরণ করে তিনি দিন গণনা করতে থাকেন এবং শেষে স্বামীর মৃত্যুর চার দিন মাত্র বাকী দেখে ত্রিরাত্র উপবাসের ব্রত গ্রহণ করেন। সত্যবানের মৃত্যুর দিন তিনি সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সত্যবান ফল ও কাষ্ঠ আহরণের জন্য বন গমনে উদ্যত হলে, শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে যাত্রা করলেন। ফল আহরণ করে কাঠ কাটবার সময় সত্যবান অসহ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হলে, সাবিত্রী তাঁর মাথা কোলে নিয়ে ভূমিতে বসলেন। মুহূর্তকাল পরে পাশ হস্তে রক্তবসনধারী এক বিশাল পুরুষকে সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখে স্বামীর মাথা কোল থেকে নামিয়ে উঠে কৃতাঞ্জলিপুটে সাবিত্রী সেই পুরুষের পরিচয় জানতে চাইলেন ও জানতে পারলেন স্বয়ং যম সত্যবানের সূক্ষ্ম শরীর নিতে এসেছেন। তারপর যম সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ (সূক্ষ্মশরীর) পাশবদ্ধ করে টেনে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করলেন, সাবিত্রীও যমের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর পশ্চাদ্‌গমন করতে থাকেন। যম তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে সাবিত্রী নিজ সঙ্কল্পে অচল থাকেন। তাঁর বাক্যে তুষ্ট হয়ে যম সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোন বর প্রার্থনা করতে বললেন। সাবিত্রী প্রথমে অন্ধ শ্বশুরের চক্ষুলাভ ও সূর্যের ন্যায় তেজলাভ প্রার্থনা করলেন। যম 'তথাস্তু' বলে সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বললেন; কিন্তু সাবিত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গ ও

যমের ন্যায় সজ্জনের সঙ্গই বাঞ্ছনীয় বলায় যম সত্যবানের জীবন ভিন্ন তাঁকে আরেকটি বর দিতে চাইলেন। দ্বিতীয় বরে সাবিত্রী তাঁর শ্বশুরের পুনর্বার রাজ্যলাভ প্রার্থনা করলেন। এইরূপে বাক্যদ্বারা যমকে তুষ্ট করে তৃতীয় বরে পিতা অশ্বপতির শত পুত্রলাভ ভিক্ষা করলেন। যমও 'তথাস্তু' বলে সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বললেন। তারপর তাঁর মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হয়ে যম সাবিত্রীকে আর একটি বর দিতে উদ্যত হলে, সাবিত্রী নিজের গর্ভে সত্যবানের ঔরসে বলবীর্য-সম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করলেন। যম সেই বর দিয়ে সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বললে, সাবিত্রী সত্যবানের জীবন-ভিক্ষা করলেন। কারণ, যম তাঁর পতিকে নিয়ে তাঁকে শতপুত্রবতী হবার বর দিতে পারেন না। অগত্যা যম হৃষ্টচিত্তে সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ করে, তাঁকে চার শত বৎসর আয়ু দান করলেন। সাবিত্রী স্বামীর দেহের কাছে ফিরে এসে তাঁকে জাগ্রত করে তাঁর হাত ধরে সেই রাত্রেই আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে দ্যুমৎসেন চক্ষুলাভ করে সস্ত্রীক পুত্র ও পুত্রবধূর অন্বেষণে রত ছিলেন। এমন সময় সাবিত্রী সত্যবানসহ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর দ্যুমৎসেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি নারদের কথা থেকে সত্যবানের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। তারপর দ্যুমৎসেনের রাজ্যলাভ ও অশ্বপতির শত পুত্র লাভ হলো। সত্যবান যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন এবং সাবিত্রী শত পুত্রবতী হলেন। সাধ্বী সাবিত্রী আপন একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা সকলকে সুখী করলেন ও সর্ব বিষয়ে সিদ্ধকাম হলেন (মহাভারত—বনপর্ব)।

সারণ—রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। বানর সৈন্যের সঙ্গে রাম লঙ্কায় উপস্থিত হলে, রাবণ শুক ও সারণ নামে দুই মন্ত্রীকে বানর-সৈন্যের সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠান (রামায়ণ—লঙ্কা)।

সামবেদ—চতুর্বেদের মধ্যে সাম নামে এক বেদ। ...'যে মন্ত্রবাক্য গান করা যায় তাহাই সাম। ঋক্ মন্ত্র সুর দিয়া গান করিলেই উহা সামে পরিণত হয়। একালে যাহাকে রাগরাগিণী বলে, সাম তাহাদেরই তুল্য'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। যজ্ঞ-সম্পাদনে কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হয়ে গীত হোত। এই গেয় ঋক্গুলিকে সামবেদ বলা হোত। ঋক্ বেদের নবম মণ্ডলের দেবতার নাম সোম। সেই জন্য সামবেদের অধিকাংশই ঋক্ বেদের নবম মণ্ডল হতে গৃহীত।

সারমেয়—এরা ইন্দ্রের প্রহরী কুকুর। সরমার দুই পুত্র 'সারমেয়' নামে

খ্যাত। এরা দুজনেই যমের প্রহরী। প্রত্যেকের চারটি করে চক্ষু আছে।

সিদ্ধাশ্রম—সরযুর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত আশ্রম বিশেষ। এই স্থানে বামনরূপী বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন, সেইজন্য এই তপোবন সিদ্ধাশ্রম নামে খ্যাত। এখানে বাস করে বিশ্বামিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মারীচ-সুবাহু প্রমুখ রাক্ষসগণ এখানে এসে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে উৎপাত করত। পরে রামের নিকট এরা পরাজিত হয়।

সালকটঙ্কটা—সন্ধ্যা নামে এক রাক্ষসের কন্যা। বিদ্যুতকেশ রাক্ষসের সঙ্গে এর বিবাহ হয়। বিদ্যুতকেশ হতে গর্ভ ধারণ করে সালকটঙ্কটা মন্দর পর্বতে এই গর্ভ ত্যাগ করে। মাতৃ-পরিত্যক্ত এই রাক্ষস-শিশু শিব-পার্বতীর বরে আকাশগামী হয় ও যশ লাভ করে (রামায়ণ—উত্তর)।

সিন্ধু—বৈশ্যবংশজাত অন্ধ মুনির ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত জনৈক মুনিকুমার। ইনি সরযূতীরে বাস করতেন। একদা কুমার অবস্থায় দশরথ সরযূতীরে রাত্রিতে শীকার করতে আসেন, তখন মুনিকুমার কলসীতে জলপূরণ করছিলেন। উক্ত শব্দ হস্তীর জলপানের শব্দ অনুমান করে দশরথ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন। অতঃপর দশরথ মুনিকুমারের আর্তনাদ শ্রবণকরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হন ও সিন্ধুর অনুরোধে তাঁর পিতামাতাকে এই দুঃসংবাদ দেন। পরে তাঁর অনুরোধে পিতামাতাকে সেখানে নিয়ে আসেন। এই স্থানেই সিন্ধুর মৃত্যু হয়। পিতামাতা সিন্ধুর পিতৃ-সেবার কথা উল্লেখ করে বিলাপ করেন ও পুত্রের তর্পণ করেন। সিন্ধু তখন দিব্যরূপ ধারণ করে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে যান ওপিতামাতাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বলেন। তখন বৃদ্ধ মুনি দশরথকে পুত্র-শোকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ে চিতারোহণ করেন (রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড)।

সিংহিকা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা। (২) কশ্যপ হতে দিতির গর্ভে সিংহিকা নামে এক কন্যা জন্মে। বিপ্রচিত্তি সিংহিকাকে বিবাহ করে। সিংহিকার গর্ভে সিংহিকেয় নামে দানবরা জন্মগ্রহণ করে (হরিবংশ)।

(৩) লঙ্কার নিকট সাগরের মধ্যে সিংহিকা নামে এক কামরূপিণী রাক্ষসী বাস করত। সে জলের উপর জীবগণের পতিত ছায়া আকর্ষণ করে তাদের ভক্ষণ করত। হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে সাগর লঙ্ঘন করছিলেন, তখন এই রাক্ষসী তাঁর ছায়া আকর্ষণ করে তাঁর পথরোধ করে। সহসা গতিরুদ্ধ হওয়ায় হনুমান সমুদ্রোত্থিতা বিকটাননা রাক্ষসীকে দেখতে পান। অনন্যোপায় হয়ে হনুমান তখন বর্ষার মেঘের ন্যায়

নিজের শরীর বর্ধিত করতে লাগলেন। তাতে রাক্ষসী আকাশ ও পাতালব্যাপী মুখ-গহ্বর বিস্তার করে। তখন হনুমান অতি ক্ষুদ্রকায় হয়ে সিংহিকার মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন ও তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তাকে বধ করে তার শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন (রামায়ণ—সুন্দর)।

সীতা—মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় জনক এঁকে সীতায় অর্থাৎ লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রে হলমুখ থেকে উৎপন্ন বলে এঁর নাম হোল সীতা। এই মানসী কন্যাকে জনক নিজ কন্যার মত লালন-পালন করতে লাগলেন। মহর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী রাবণ কর্তৃক হৃতধর্মা হবার ভয়ে জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করবার সময় রাবণকে বলেন, ত্রেতাযুগে আমিই তোমাকে বধ করবার জন্য কোন ধার্মিকের অযোনি-সম্ভবা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব। সেই বেদবতীই ত্রেতায় সীতারূপে অবতীর্ণ হন। দক্ষযজ্ঞের সময় মহাদেব ব্যবহৃত ধনু পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে জনক পেয়েছিলেন। সীতা বিবাহযোগ্যা হলে জনক পণ করেন, যে এই হরধনু ভঙ্গ করবে তার হাতেই সীতাকে তিনি সমর্পণ করবেন। পৃথিবীর সকল রাজা ও রাজকুমারগণ এই হরধনু তুলতে অসমর্থ হলে রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে এই ধনুতে জ্যারোপণ করে এই ধনু ভঙ্গ করেন ও সীতার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার সঙ্কল্প করলে মন্থরা-প্ররোচিত রাণী কৈকেয়ীর প্রার্থনায় রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ হয়। রামের নিষেধ সত্ত্বেও সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত স্বেচ্ছায় বনগমন করেন। চিত্রকূট ত্যাগের সময় অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতাকে দিব্য বর-মাল্য, অলঙ্কার, অঙ্গরাগাদি উপহার দেন। দণ্ডকারণ্যে বিরাধ রাক্ষস সীতাকে হরণ করে; কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ তাকে নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করেন।

পঞ্চবটীতে বাস করবার সময় রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণের নিকট প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে লাঞ্ছিতা হন। এই সংবাদে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে হরণ করবার জন্য অমাত্য মারীচকে স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করেন। সীতার অনুরোধে রাম মায়া-মৃগের অনুসরণ করলেন। মারীচ রামকে প্রলুব্ধ করে অনেক দূরে নিয়ে যায়। রাম শর-নিক্ষেপ করলে মৃত্যুকালে মারীচ রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে 'হা সীতা' 'হা লক্ষ্মণ' বলে চীৎকার করে। রামের কোন বিপদ উপস্থিত মনে করে সীতা লক্ষ্মণকে রামের

সন্ধানে যেতে বললেন। লক্ষ্মণ সীতাকে রক্ষা করবার জন্য রাম কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং রামের কোন বিপদ হতে পারে না মনে করে যেতে অস্বীকার করেন। তখন সীতা মতিভ্রমে লক্ষ্মণকে তীব্র তিরস্কার করে বললেন, তাঁকে কামনা করেন বলেই লক্ষ্মণ রামের বিপদে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক। তখন বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মণ রামের অনুসন্ধানে গেলে পরিব্রাজকরূপে রাবণ সীতার নিকট উপস্থিত হন। সীতা অতিথি সংকারের আয়োজন করেন। রাবণ তখন আত্মপরিচয় দিয়ে সীতাকে তাঁর সঙ্গে লঙ্কায় যেতে বললেন। সীতা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলে রাবণ তাঁকে সবলে হরণ করে মায়াময় রথে লঙ্কার পথে যাত্রা করেন। পথে জটায়ু রাবণকে বাধা দিলে, তিনি রাবণ কর্তৃক ছিন্নপক্ষ হয়ে ভূতলে নিপতিত হন। পথিমধ্যে সীতা অলঙ্কারাদি নিয়ে ফেলে দেন। কিষ্কিন্ধ্যার নিকট এক পর্বতশৃঙ্গে পাঁচটি বানরকে দেখে সীতা তাঁর উত্তরীয় ও আভরণাদি সেখানে ফেলে দেন। রাবণ প্রথমে সীতাকে নিয়ে লঙ্কার অন্তঃপুরে রাখেন। সীতা তাঁর বশে না আসায় রাবণ তাঁকে অশোকবনে রাক্ষসী বেষ্টিত অবস্থায় বন্দিনী করে রাখেন এবং বলেন যে দ্বাদশ মাসের মধ্যে রাবণের বশ্যতা স্বীকার না করলে সীতাকে খণ্ডিত করে ভক্ষণ করা হবে। সীতার পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদির চিহ্ন ধরে জটায়ুর নির্দেশে রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবের সাহায্যে সীতাকে অন্বেষণ করতে থাকেন। পরে হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কা হতে সীতার খবর ও অভিজ্ঞান-স্বরূপ অঙ্গুরী নিয়ে আসেন। তারপর রাম বানরসেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হন। রাবণ সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বাণ দেখিয়ে বশে আনবার চেষ্টা করেন। এই সময় অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য রাবণ সেস্থান ত্যাগ করতেই মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বান অন্তর্হিত হয় এবং বিভীষণ-পত্নী সরমা প্রকৃত রহস্য জানিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দেন। ছয় মাস যুদ্ধের পর রাবণ সবংশে নিহত হলে হনুমান সীতাকে আনতে যান ও সীতার পার্শ্বচরী রাক্ষসীদের বিনাশ করতে উদ্যত হন। সীতা হনুমানকে তা করতে নিষেধ করে এই দাসীদের ক্ষমা করেন। রামের নিকট উপস্থিত হলে রাম সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে সীতাকে যথা ইচ্ছা যেতে বলেন। সীতা অভিমান ভরে রামকে তিরস্কার করে লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বলেন এবং অগ্নিতে প্রবেশ কালে বলেন যে, যদি তিনি সতী হন এবং রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকেন,

তবে স্বয়ং অগ্নিই তাঁকে রক্ষা করবেন। অগ্নিদেব স্বয়ং সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে ওঠেন এবং তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা বলে রামকে পুনরায় তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে রাম সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন ও ভরতের কাছ হতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এরপর সীতা অন্তঃসত্ত্বা হন। সীতার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে রাম নিঃসন্দেহ হলেও ভদ্র নামক জনৈক হাস্যকারের সাহায্যে জানতে পারেন যে, প্রজাদের মনে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই লোকাপবাদে প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্যই রাম সীতাকে লক্ষ্মণকে দিয়ে তমসার তীরবর্তী বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত করেন। এখানে যথাসময়ে সীতার কুশ ও লব নামে দুইটি যমজ সন্তান হয়। বাল্মীকি এঁদের জাতকর্ম সম্পাদন করে নিজের রচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করান। রাম অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, নিমন্ত্রিত বাল্মীকির সঙ্গে কুশ ও লব এই যজ্ঞে এসে রামায়ণ গান করেন। এঁদের গান শুনে রামের বিশ্বাস হয় যে, এঁরা সীতারই পুত্র। সীতাকে পুনরায় গ্রহণের জন্য রাম বাল্মীকির কাছে সংবাদ পাঠান; সীতা যদি নিষ্পাপ হন, তবে তিনি যেন বাল্মীকির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করেন ও সকলের সমক্ষে শপথ করেন। বাল্মীকি সম্মত হয়ে জানান যে, সীতা প্রয়োজনীয় শপথ ও পরীক্ষা দেবেন। পরদিন সভামধ্যে বাল্মীকি সীতার নির্দোষিতার কথা প্রকাশ করেন। রাম বাল্মীকিকে বলেন, সীতার শুদ্ধ স্বভাবের কথা তিনি জানেন, কেবল লোকাপবাদ ভয়েই সীতাকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন; সেজন্য বাল্মীকি যেন রামকে ক্ষমা করেন। সীতার প্রতি যেন রামের প্রীতি জন্মায়। সীতা তখন সর্বসমক্ষে কৃতাঞ্জলি হয়ে নিম্নদিকে তাকিয়ে বললেন, যদি আমি সতী হই এবং রাম ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনে চিন্তা না করে থাকি,—মনে, কর্মে, বাক্যে রামকেই অর্চনা করে থাকি, তবে পৃথিবীদেবী যেন বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দেন। শপথ কালে ভূতল থেকে নাগবাহিত এক আশ্চর্য রথে বসুমতী উত্থিত হয়ে সীতাকে উভয় বাহুতে ধারণ করে, সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক রসাতলে প্রবেশ করেন (রামায়ণ)।

সীরধ্বজ—মিথিলা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মিথির পুত্র জনক। এই জনকের নাম হতেই এই বংশীয় রাজাগণ জনক নামে পরিচিত হতেন। এই জনক বংশে হ্রস্বরোমণ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্র, সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ। এই সীরধ্বজ জনকরাজ নামে পরিচিত। এঁর কন্যা সীতা বা

জানকী রামের স্ত্রী। সীরধ্বজের অন্য কন্যার নাম উর্মিলা, লক্ষ্মণের স্ত্রী (রামায়ণ—আদি)।

সুকন্যা—বৈবস্বত মনুর পুত্র রাজা শর্যাতি সুকন্যা নামে এক কন্যালাভ করেন। একবার শর্যাতি কন্যাসহ সসৈন্যে এক বনে প্রবেশ করে চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলে সুকন্যা দেখতে পান, এক স্থানে বল্মীক স্তূপের মধ্যে দুটি উজ্জ্বল পদার্থ জ্বলছে। বালিকা-সুলভ চাপল্যবশে সুকন্যা এই উজ্জ্বল পদার্থ দুটি কণ্টক-বিদ্ধ করেন। এই উজ্জ্বল পদার্থ দুটি প্রকৃতপক্ষে বল্মীকস্তূপমধ্যস্থ তপস্যারত চ্যবনের চক্ষু। দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে চ্যবনের দেহ বল্মীক, পিপীলিকা ও লতায় আবৃত হয়। এইরূপে কণ্টকবিদ্ধ হয়ে হঠাৎ অন্ধ হওয়ায় চ্যবন ক্রুদ্ধ হয়ে শর্যাতির সৈন্যদের মলমূত্র রুদ্ধ করে দেন। সৈন্যদের কষ্ট দেখে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে চ্যবনকে বলেন, আমার বালিকা-কন্যা অজ্ঞানতাবশে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে আপনি ক্ষমা করুন। চ্যবন রাজাকে বলেন, তাঁর কন্যা দম্ভ ও অবজ্ঞাবশে তাঁকে এইরূপ বিদ্ধ করেছে, সেজন্য কন্যাকে তাঁর হস্তে সম্প্রদান করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। তখন শর্যাতি বাধ্য হয়ে সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করেন। একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় যৌবনদীপ্তা সুকন্যাকে স্নানের পর নগ্নাবস্থায় দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ চ্যবনকে ত্যাগ করে তাঁদের একজনকে গ্রহণ করতে বলেন। তাঁরা সুকন্যাকে আরও বলে, তাঁরা দেবচিকিৎসক, চ্যবনকে যুবক ও রূপবান করে দেবেন। তারপর তিন জনের মধ্যে একজনকে সুকন্যা বরণ করবেন। সুকন্যা চ্যবনকে এই কথা জানালে তিনি সম্মত হন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করেন ও মুহূর্তকাল পরে তিন জনেই দিব্যরূপে ও একই প্রকার বেশে জল থেকে উঠে আসেন। সকলেরই আকৃতি একপ্রকার ও সুন্দর হলেও, সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ করেন। চ্যবন আনন্দিত হয়ে রূপ, যৌবন ও স্ত্রী পাবার জন্য দেবরাজের সমক্ষেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তিনি শর্যাতিকে দিয়ে এক যজ্ঞ করিয়ে ইন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানের অধিকারী করেন (মহাভারত)।

সুকেতু—এক যক্ষ। ব্রহ্মাকে আরাধনায় তুষ্ট করে এই যক্ষ সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে তাড়কা নামে এক কন্যা লাভ করে। এই তাড়কা রাক্ষসী রাম কর্তৃক নিহত হয়।

সুকেশ—এক রাক্ষস। বিদ্যুৎকেশের পুত্র। সন্ধ্যার কন্যা সালকটঙ্কটার

সঙ্গে বিদ্যুৎকেশের বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে এই কন্যা গর্ভবতী হয়। তারপর মন্দর পর্বতে পুত্র সুকেশের জন্ম দিয়েই তাকে পরিত্যাগ করে, এবং বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে বিহার করবার জন্য অন্যত্র চলে যায়। এদিকে হর-পার্বতী বায়ুমার্গে ভ্রমণ করতে করতে এই পরিত্যক্ত শিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে একে তুলে নেন এবং শিব কর্তৃক বর্ধিত এই রাক্ষসকুমার শিবের প্রসাদে অমরত্ব ও আকাশ ভ্রমণের শক্তি লাভ করে। সেই থেকে পার্বতী রাক্ষসদের বর দেন যে, তারা সদ্যই গর্ভধারণ করে সদ্যই তা প্রসব করবে, এবং সদ্যপ্রসূত সন্তান মাতার তুল্য বয়স প্রাপ্ত হবে। গ্রামণী নাম্নী গন্ধর্বের কন্যা দেববতী সুকেশের স্ত্রী। এর গর্ভে মাল্যবান, সুমালী ও মালী —এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। এরাই রাক্ষসদের পূর্বপুরুষ (রামায়ণ—উত্তর)।

সুগ্রীব—কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ। ইনি বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বালি ইন্দ্রপুত্র ও সুগ্রীব সূর্যপুত্র বলে খ্যাত। একদিন যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ব্রহ্মার নয়ন হতে অশ্রুপাত হয়। এই অশ্রু হতে তৎক্ষণাৎ ঋক্ষরজা নামে এক দিব্য বানরের সৃষ্টি হয়। কিছুকাল পরে এই বানর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কোন সরোবরে জল পান করতে যায় এবং জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে শত্রু জ্ঞানে তাকে সংহার করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে সে এক অপরূপ নারীতে পরিণত হয়। ইন্দ্র ও সূর্য এই নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে অধৈর্য হন। তার ফলে ইন্দ্রের স্খলিত বীর্য এঁর কেশে পড়লে তা থেকে বালি ও সূর্যের স্খলিত বীর্য এঁর গ্রীবায় পড়লে তা থেকে সুগ্রীবের জন্ম হয়। পরদিন ঋক্ষরজা পূর্বরূপ পেয়ে সসন্তানে ব্রহ্মার কছে উপস্থিত হলে ব্রহ্মা তাকে সমস্ত বানরদের অধিপতিরূপে কিষ্কিন্ধ্যায় নিযুক্ত করেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ বালি রাজা হন। সুগ্রীব তাঁর স্ত্রী রুমাকে নিয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকেন। দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র অসুর মায়াবীর সঙ্গে কোন স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারে বালির শত্রুতা হয়। একদিন কিষ্কিন্ধ্যায় এসে তিনি বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সুগ্রীবও ভ্রাতাকে সাহায্য করবার জন্য উপস্থিত হন। ভীত মায়াবী এক ভূবিবরে প্রবেশ করলে, বালি তাকে বধ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত সুগ্রীবকে বিবরদ্বার রক্ষা করতে বলে বিবর মধ্যে প্রবেশ করেন। এক বৎসরেরও অধিক অপেক্ষার পর বালি প্রত্যাবর্তন করেন না। পরে বিবর মুখে সফেন রুধির দেখে বালির মৃত্যু হয়েছে ভেবে সুগ্রীব এক বৃহৎ শিলাখণ্ডে বিবরদ্বার রুদ্ধ করে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে রাজপদ গ্রহণ করেন এবং বালির বিধবা স্ত্রী

তারাকে বিবাহ করেন। এদিকে অসুরকে হত্যা করে বালি ফিরে এসে বিবরদ্বার রুদ্ধ দেখে সুগ্রীবকে তিরস্কার করেন। ক্রন্দন করলেও বালি সুগ্রীবকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন ও তাঁর স্ত্রী রুমাকেও অধিকার করেন। বিতাড়িত হবার পর সুগ্রীব বানরগণ সহ ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ-মুনির আশ্রমের কাছে আশ্রয় নেন। কারণ, মতঙ্গের অভিশাপে বালি সেই স্থানে আসতে পারতেন না। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার অন্বেষণ করতে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণ সেখানে উপস্থিত হলে, সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের মিত্রতা হয়। বালিকে নিহত করার পরিবর্তে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে ও উদ্ধারে রামকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে বালিকে যুদ্ধে আহ্বানের জন্য সুগ্রীবকে বলেন এবং যুদ্ধকালে বালিকে বধ করবেন ইহাও জানান। প্রথম দিনের যুদ্ধে পরস্পরের একরূপ আকারের জন্য রাম বালিকে শরত্যাগ করতে পারেন নি। সুগ্রীব এইদিন কোনও সুযোগে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। দ্বিতীয় দিন রাম চিহ্নস্বরূপ সুগ্রীবের কণ্ঠে গজপুষ্পীলতা বেঁধে যুদ্ধে যেতে বলেন। দ্বিতীয় দিনে অন্তরাল হতে বাণদ্বারা রাম বালিকে বধ করেন। সুগ্রীব নিজ স্ত্রী রুমাকে উদ্ধার করেন ও বালির স্ত্রী তারাকেও গ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেক কা
রাম সুগ্রীবকে মণিময় কাঞ্চনহার
অন্যান্য উপহার দেন। তারপ
সুগ্রীব বানর-সেনা সংগ্রহ করে সীতা
অন্বেষণ আরম্ভ করেন। হনুমা
সীতার সংবাদ আনবার পর, রা
সুগ্রীব ও বানর-সেনার সাহায্যে সেতু বন্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হন
লঙ্কাযুদ্ধে সুগ্রীব বিশেষ বীরত্ব প্রকা
করেন। কুম্ভ, বিরূপাক্ষ, মহোদ
প্রভৃতি রাক্ষসরা সুগ্রীবের হাতে নিহত হয়। সীতা উদ্ধারের প
অযোধ্যায় রামের অভিষেক-কা
সুগ্রীব উপস্থিত ছিলেন। রাম সরযূতে প্রাণ বিসর্জন করবার পর সুগ্রী
দেহত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবে
করেন (রামায়ণ)।

সুজাতা—মহর্ষি উদ্দালকের কন্যা। উদ্দালক শিষ্য কহোড়ের সহি
কন্যা সুজাতার বিবাহ দেন। সুজাতা গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠরত কহোড়কে বলেন, পিতা, আপনার প্রসাদে আমি গর্ভবাস কালেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি; কিন্তু আপনার বেদপাঠ ঠিক হচ্ছে না। কহোড় গর্ভস্থ পুত্রের এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুকে অভিশাপ দেন। এর ফলে শিশুর দেহের অষ্টস্থান বক্র হয় ও সেই জন্য ইনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। পূর্ণগর্ভা অবস্থায় সুজাতা স্বামীকে বলেন: তিনি একেবারে নিঃস্ব। এখন

বা সন্তান পালনের জন্য তাঁর কোন অর্থই নাই। তখন কহোড় অর্থসংগ্রহের জন্য জনকরাজার সভায় উপস্থিত হন। সেখানে বরুণ-পুত্র বন্দী কহোড়কে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে জলে নিমজ্জিত করে রাখেন। উদ্দালক এই সংবাদ কন্যা সুজাতাকে গর্ভস্থ শিশুর কাছে গোপন রাখতে বলেন। জন্মের পর অষ্টাবক্র উদ্দালককেই পিতা বলে মনে করতেন। একদিন তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু তাঁকে উদ্দালকের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলেন, এ তোমার পিতার কোল নয়। তখন সুজাতা পুত্রকে সমস্ত ঘটনা বলতে বাধ্য হন। তারপর অষ্টাবক্র জনকসভায় গিয়ে বন্দীকে পরাস্ত করে পিতাকে উদ্ধার করেন (মহাভারত—বন)।

সুতীক্ষ্ণ—দণ্ডকারণ্যে মন্দাকিনীর নিকটস্থ এক আশ্রমবাসী মহাতেজা ধার্মিক ঋষি। ইনি পুণ্যবলে সর্বলোক জয় করেন। রামচন্দ্র বনবাসকালে এখানে এলে ইনি বলেন, দেবরাজ ইন্দ্র এখানে এসেছিলেন, কিন্তু আমি তোমার প্রতীক্ষায় দেহত্যাগ করে দেবলোকে যাইনি। ইনি রামকে এঁর সমস্ত তপোলব্ধ পুণ্য দিতে চান, কিন্তু রামচন্দ্র তাতে অস্বীকৃত হন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এঁর আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করেন (রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড)।

সুদর্শন—(১) মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্মা সর্ব দেবতার তেজ নিয়ে এক চক্র অস্ত্র প্রস্তুত করেন। পরে দৈত্য-দানবাদি বিনাশার্থ এই চক্র মহাদেব বিষ্ণুকে দান করেন। সুদর্শন চক্রই বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র।

(২) দুর্যোধনের এক ভ্রাতা।

(৩) লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর নামে এক রাক্ষস এই হস্তীর উপরে আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিল।

(৪) মাহিষ্মতী নগরীতে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দুর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। এঁর ঔরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সুদর্শনা নামে এক রূপবতী কন্যার জন্ম হয়। অগ্নিদেব এই কন্যাকে বিবাহ করেন। অগ্নিদেবের ঔরসে সুদর্শনার গর্ভে এক পুত্র হয়, তাঁর নাম সুদর্শন। সুদর্শনের সহিত নৃগরাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতীর বিবাহ হয়। সুদর্শন অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তিনি স্ত্রীকে অতিথি সেবায় নিয়োজিত করে বলেন, প্রয়োজন হলে স্ত্রী যেন নির্বিচারে নিজেকেও দান করেন। কারণ, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নয়। ওঘবতী এই আদেশ পালন করবেন বলে স্বীকৃত হন। একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতি কালে ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে এসে ওঘবতীর সঙ্গম কামনা করেন। অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখিয়ে

ওঘবতী এঁকে সন্তুষ্ট করতে অসমর্থ হলে স্বামীর কথা স্মরণ করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্য গৃহে তিনি মিলিত হন।

এই সময় সুদর্শন গৃহে ফিরে এসে বার বার স্ত্রীকে ডাকতে থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের বাহুপাশে আবদ্ধ থাকায় নিজেকে অশুচি মনে করে ওঘবতী স্বামীর এই আহ্বানের উত্তর দেন না। এমন সময় অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহের ভিতর হতে বাহিরে এসে সুদর্শনকে জানান, তোমার স্ত্রী আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। সুদর্শনের পশ্চাতে লৌহ-মুদ্গরধারী মৃত্যু অদৃশ্য ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য, সুদর্শন অতিথি সৎকার না করলে মৃত্যু সুদর্শনকে বধ করবেন। সুদর্শন অতিথিকে বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে অতিথি সৎকারের জন্য দান করেছি। অতিথি সুদর্শনকে জানালেন, তিনিই ধর্ম, তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য এখানে এসেছিলেন। মৃত্যু সর্বদা রন্ধ্র অনুসন্ধান করছিলেন, মৃত্যুকে এখন তিনি জয় করেছেন। তাঁর স্ত্রী পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী, নিজ গুণে রক্ষিতা। তাঁর স্ত্রী নিজের তপস্যার প্রভাবে অর্ধ-শরীরে ওঘবতী নদী রূপে লোক-পাবন করবেন এবং অর্ধ-শরীরে স্বামীর অনুগমন করবেন। আর তিনি ও তাঁর স্ত্রী সশরীরে অক্ষয় স্বর্গলাভ করবেন। এর পর দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র অশ্বযোজিত রথে সুদর্শন ও ওঘবতীকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন (মহাভারত—অনুশাসন)।

সুদর্শনা—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দুর্যোধনের কন্যা। অগ্নিদেবের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এঁর পুত্র সুদর্শন (মহাভারত—অনুশাসন)।

সুদক্ষিণা— ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দিলীপের স্ত্রী। রাজদম্পতি পুত্র কামনায় মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে তাঁর উপদেশে বশিষ্ঠের ধেনু সুরভি ও তার বৎস নন্দিনীর পরিচর্যা করেন। তখন সুরভির কৃপায় ইনি গর্ভবতী হয়ে রঘুকে পুত্ররূপে লাভ করেন। ইনি রামচন্দ্রের প্রপিতামহী।

সুদামা—শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সান্দীপনি মুনির অন্যতম ছাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহপাঠি। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যথাকালে বিবাহ করে সংসারী হলেও দারিদ্র্যের অবধি ছিল না। অবশেষে স্ত্রীর অনুরোধে বাল্যবন্ধু দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেবার জন্য একমুষ্টি চিপিটক ভিক্ষা করে নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হলে তিনি এই চিপিটক তাঁকে উপহার দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বন্ধু কৃষ্ণকে নিজের দারিদ্র্যের কথা বলা, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান নিজের দারিদ্র্য ও দুঃখের কথা বাল্যবন্ধুকে কিছুতেই জানাতে পারেন না। গৃহে ফিরে এসেই ইনি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য

দেখতে পান। তিনি দেখেন যে, তাঁর জীর্ণ-কুটীর ধনধান্যে ও মণিরত্নে পূর্ণ হয়ে রাজ প্রাসাদে পরিণত হয়েছে। এই সুদামাই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম।

সুদেষ্ণা—(১) মৎস্যরাজ বিরাটের স্ত্রী। অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীবেশে এঁরই কাছে বাস করতেন। এঁর ভ্রাতা কীচক রূপে মুগ্ধ হয়ে দ্রৌপদীকে কামনা করলে ছদ্মবেশী ভীম কর্তৃক নিহত হন (মহাভারত—বিরাট)।

(২) বিরোচন-পুত্র বলির স্ত্রী। এঁর গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষি হতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম—এই পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে (হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত)।

সুন্দ—(১) মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পরাক্রান্ত পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। এই দুই ভ্রাতাই প্রবল প্রতাপশালী দৈত্য। পরস্পর এরা অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দুই ভ্রাতা ত্রিলোক বিজয়ের কল্পনায় বিন্ধ্য পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হয়। এই তপস্যার ফলে ব্রহ্মার কাছে এরা কামরূপী ও অমর হবার বর প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা বলেন, ত্রিলোক বিজয়ের জন্য তপস্যা করাতে এরা অমরত্বের বর পাবে না বটে, কিন্তু অন্য কারো হস্তেও এদের মৃত্যু হবে না। যদি মৃত্যু হয় তো পরস্পরের হস্তেই মৃত্যু হবে। এই বর পেয়ে এরা ইন্দ্রলোক, যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী, নাগ ইত্যাদি সকলের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। দেবতা ও মহর্ষিদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তখন বিশ্বকর্মাকে এক অদ্বিতীয়া পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বলেন। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের তিল তিল অংশ মিলিত করে বিশ্বকর্মা এক সুন্দরীকে সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর সমস্ত উত্তম বস্তুর মিলনে এই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ব্রহ্মা এঁর নাম রাখেন তিলোত্তমা। ব্রহ্মা এঁকে সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করবার জন্য আদেশ দিলেন। তিলোত্তমা যাবার পূর্বে দেবতাদের প্রদক্ষিণ করেন। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যে দিকেই যান, তাঁকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি মুখ নির্গত হয়। এইরূপে তিনি চতুর্মুখ হন; ইন্দ্রেরও সহস্র লোচন হল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন বলে তাঁর নাম হয় স্থাণু। তিলোত্তমা সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট উপস্থিত হলে তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হস্তগত করার জন্য দুই জনের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হয়। দুই জনেই তিলোত্তমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে চায়। এবং এই বিরোধের ফলে উভয়ে উভয়ের হাতে নিহত হয়।

(২) জম্ভ দৈত্যের পুত্র। এর সঙ্গে সুকেতু যক্ষের কন্যা, যক্ষী

তাড়কার বিবাহ হয়। তাড়কার গর্ভে সুন্দের মারীচ নামে এক পুত্রলাভ হয়। কোন অপরাধের ফলে সুন্দ অগস্ত্য মুনি কর্তৃক বিনষ্ট হয়।

সুধন্বা—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। একদা পরম রূপবতী কন্যা কেশিনীর স্বয়ংবরের সময় প্রশ্ন ওঠে—প্রহ্লাদ-পুত্র বিরোচন ও সুধন্বার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? অভিজ্ঞ প্রহ্লাদের কাছে উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্যে এঁদের দুই জনের জীবন পণ রাখা হয়। প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণ সুধন্বাকেই শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। নিজ পুত্র বিরোচনের প্রাণসংশয় জেনেও প্রহ্লাদ সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেন; কিন্তু নিজ পুত্রের প্রাণভিক্ষাও করেন। সুধন্বা প্রহ্লাদের জন্য বিরোচনকে মুক্তি দেয়। তখন বিরোচন কুমারী কেশিনীর সমক্ষে সুধন্বাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দান করে তৃপ্ত করেন। কেশিনী শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণকেই বরণ করে ধন্যা হয় (মহাভারত—উদ্‌যোগ)।

(২) সঙ্কাশ্যার রাজা। মিথিলার রাজা সীরধ্বজের হরধনু ও জানকী প্রার্থনা করলে জনকরাজ অসম্মত হন। ফলে সঙ্কাশ্যাধিপতি সুধন্বা মিথিলা আক্রমণ করেন। রাজা সীরধ্বজ এঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে এঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন (রামায়ণ—আদি)।

সুধর্মা—মণিরত্নখচিত ইন্দ্রসভাগৃহ। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে এই সভা যাদবদের সম্মেলন গৃহের জন্য উগ্রসেনকে দান করতে আদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই সভাগৃহ ইন্দ্রালয়ে আবার ফিরে আসে।

সুনীতি—ধ্রুব-জননী ও রাজা উত্তানপাদের অনাদৃতা প্রথমা স্ত্রী (ধ্রুব দেখ)।

সুপর্ণ—গরুড়ের এক নাম। পক্ষিরাজ গরুড়ের মাতা বিনতা বিমাতা কদ্রুর দাসীত্ব করতেন। মাতাকে দাসীত্ব হতে মুক্ত করার জন্য গরুড় অমৃত আহরণে বের হন। অমৃত আহরণ কালে ইন্দ্র এঁকে বজ্রাঘাত করেন। বজ্রাহত হয়েও গরুড় হাস্যমুখে বলেন, দেবরাজ, তোমার বজ্রাঘাতে আমার ব্যথা লাগেনি; কিন্তু তোমার এবং দধীচিমুনির অস্থিজাত বজ্রের সম্মানার্থ আমি একটি পক্ষ পরিত্যাগ করছি। এই বলে গরুড় তাঁর একটি পক্ষ ত্যাগ করেন। দেবতারা তাঁর এই সুন্দর পালক দেখে গরুড়ের অন্য নাম দেন ‘সুপর্ণ’। এরপর ইন্দ্রের সঙ্গে গরুড়ের বন্ধুত্ব হয় (মহাভারত—আদি)

সুপার্শ্ব—(১) অরুণ-পুত্র পক্ষীরাজ সম্পাতির পুত্র। দগ্ধ-পক্ষ পিতার জন্য আহার অন্বেষণে গিয়ে সুপার্শ্ব এক দিন আকাশচারী বিমানে ক্রন্দনশীলা সীতা ও রাবণকে দেখতে পায়। তখন রথসুদ্ধ সমস্তই নিজের ভোজ্য

মনে করে সে রথের পথ রোধ করে। সুপার্শ্ব রাবণ বা সীতাকে চিনত না। সে জন্য রাবণের অনুরোধে সে তাঁদের পথ মুক্ত করে দেয়। পরে গগনচারী সিদ্ধগণের কাছ থেকে সে জানতে পারে সীতাকে হরণ করে রাবণ মহাবেগে পলায়ন করেছে। সুপার্শ্ব রাবণকে বন্দী করে সীতাকে উদ্ধার করে নি বলে পিতা সম্পাতি কর্তৃক তিরস্কৃত হয় (রামায়ণ)।

(২) রাবণের সৎস্বভাবসম্পন্ন এক অমাত্য। পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হবার পর ক্রুদ্ধ রাবণ সীতাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সুপার্শ্ব সৎপরামর্শ দিয়ে তাঁকে এই স্ত্রীহত্যা পাপকার্য থেকে বিরত করেন। (রামায়ণ—লঙ্কা)।

সুপ্রতীক—বিভাবসু নামে এক কোপন-স্বভাব ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধন বিভাগের জন্যে সুপ্রতীক বিভাবসুকে বারবার অনুরোধ করলে বিভাবসু ক্রুদ্ধ হয়ে সুপ্রতীককে হস্তিদেহ ধারণের অভিশাপ দেন। সুপ্রতীকও বিভাবসুকে কচ্ছপ হবার অভিশাপ দেন। এর ফলে এক সরোবরে উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করতে থাকেন। অমৃত হরণ কালে বিনতার পুত্র গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে পিতা কশ্যপের কাছে আহার্য বস্তু প্রার্থনা করায় কশ্যপ তাঁকে যুদ্ধরত এই গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করতে বলেন। গরুড় এক নখে গজ ও আর নখে কচ্ছপকে তুলে এক পর্বত শৃঙ্গে বসে তাদের ভক্ষণ করেন (মহাভারত—আদি)।

সুবল—(১) ইনি গান্ধাররাজ। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত এঁর কন্যা গান্ধারীর বিবাহ হয়। ইনি দুর্যোধনাদির মাতামহ। সুবলের আর এক কন্যার নাম মতি ও পুত্রের নাম শকুনি (মহাভারত—আদি)।

(২) শ্রীকৃষ্ণের জনৈক সখা, বৃন্দাবনবাসী বালক।

সুবর্চা—মহর্ষি দধীচির স্ত্রী। দেবতাদের প্রার্থনায় দধীচি প্রাণ উৎসর্গ করলে পতিহীনা সুবর্চা দেবতাদের অভিসম্পাত দেন। এর ফলে দেবতারা সন্তান লাভে বঞ্চিত হন। দধীচির আত্মত্যাগের সময় তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। এই সময় তিনি নিজের উদর বিদীর্ণ করে গর্ভ নিষ্কাশন করেন এবং যোগবলে দেহত্যাগ করেন (স্কন্দ পুরাণ)।

সুবাহু—(১) এক কামরূপী শক্তিশালী রাক্ষস ও রাবণের অনুচর। মারীচ ও সুবাহু বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবিঘ্নকারী ছিল। রামচন্দ্র কর্তৃক এই রাক্ষস সানুচর নিহত হয়।

(২) এক বানর দলপতি। লঙ্কার যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

সুব্রহ্মণ্য—কার্তিকেয়ের অন্য এক নাম।

সুভদ্রা—অর্জুনের দ্বিতীয়া স্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ঔরসে এবং

তাঁর স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে সুভদ্রার জন্ম হয়। সুতরাং ইনি বলরামের সহোদরা ও শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। অর্জুন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বার বৎসর বনবাসে থাকার সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইনি একবার রৈবত পর্বতে গমন করেন। সেখানে অর্জুনের সংবর্ধনার জন্য এক মহোৎসব হয়। অর্জুন সেখানে সুভদ্রার রূপে মুগ্ধ হন। অর্জুনের মনোভাব জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে সম্মত হন। তিনি বলেন, ক্ষত্রিয়দের স্বয়ংবর বিবাহই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সুভদ্রা কার গলায় বরমাল্য দান করবেন, তার কোন স্থিরতা নাই; সেই জন্য ক্ষত্রিয়রা বলপূর্বক কন্যা হরণ করে বিবাহ করাকে প্রশস্ত পথ বলেছেন; শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করবার পরামর্শ দেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে রৈবতকে পূজার পর সুভদ্রা যখন দ্বারকায় ফির-ছিলেন, তখন অর্জুন তাঁকে হরণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে নিয়ে যান। এতে যাদবরা অপমানিত বোধ করেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্বাক্ থাকেন। বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা স্থির করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত বলেন। সত্যভামার উদ্‌যোগে মহা-সমারোহে দ্বারকায় সুভদ্রার সহিত অর্জুনের বিবাহ হয়। অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। পাণ্ডবদের বনবাসকালে সুভদ্রা অভিমন্যুকে নিয়ে পিত্রালয়ে বাস করেন। প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রও এই সময়ে দ্বারকায় বাস করত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ইনি দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডব শিবিরে বাস করতেন। মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠির সুভদ্রার পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করে সুভদ্রাকে ধর্মরক্ষা ও সকলের পালনের ভার দিয়ে যান (মহাভারত)।

শুভ্রা—কুণিগর্গ নামে এক ঋষির মানসকন্যা। কুণিগর্গের মৃত্যুর পর ইনি আশ্রম নির্মাণ করে কঠোর তপস্যা করেন। কঠোর তপস্যায় ও বার্ধক্যে কৃশ হয়ে ইনি চলৎশক্তিরহিত হন। তখন ইনি স্বর্গবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, নারদ এসে এঁকে বলেন যে, তাঁর মত অবিবাহিতা কন্যার কি করে স্বর্গলাভ হবে? তখন শুভ্রা ঋষিদের জানান, যিনি তাঁকে বিবাহ করবেন, তিনি তাঁর তপস্যার অর্ধভাগ পাবেন। গালবের পুত্র প্রাক্‌শৃঙ্গবান এঁর সঙ্গে একরাত্রি বাসের সর্তে শুভ্রাকে বিবাহ করেন এবং শুভ্রা সুন্দরী তরুণীরূপে পতির সঙ্গে রাত্রিবাস করেন। রাত্রি প্রভাত হলে শুভ্রা দেহত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেন। তখন প্রাক্‌শৃঙ্গবান স্ত্রীর শোকে অধীর হয়ে স্ত্রীর তপস্যার অর্ধভাগের বলে তাঁকে অনুসরণ করেন। শুভ্রার বরে

সেই তীর্থে যে দেবগণের তর্পণ করে এক রাত্রি বাস করবে, সে আটার বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনের ফল পাবে। এই স্থান বৃদ্ধকন্যাশ্রম তীর্থ বলে খ্যাত (মহাভারত—শল্যপর্ব)।

সুমতি—সগর রাজার অন্য এক স্ত্রী। ইনি তুম্বাকার এক মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। উহা ভেদ করে ৬০,০০০ পুত্র নির্গত হয়। ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ মধ্যে এরা বর্দ্ধিত হয়েছিল (রামায়ণ)।

সুমন্ত্র—মহারাজ দশরথের আট জন অমাত্যের মধ্যে ইনি একজন। ইনি অর্থসচিব ছিলেন; এঁরই পরামর্শে দশরথ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনেন। রামের বনগমনকালে সুমন্ত্র রথের সারথি হয়ে গঙ্গাতীর পর্যন্ত এঁদের অনুগমন করেন। (রামায়ণ—আদি)।

সুমালী—রাক্ষস সুকেশ ও দেববতীর মধ্যম পুত্র। রাবণ এর মাতামহ। সুকেশের তিন পুত্র—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। এঁরা অত্যন্ত তেজস্বী ও উগ্র স্বভাবসম্পন্ন ছিল। এরা সুমেরু পর্বতে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে এবং তাঁর বরে শত্রুহন্তা, অজেয়, চিরজীবী ও পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়। এরা সুরাসুরের উপর অত্যাচার করতে থাকে। এদের অনুরোধে বিশ্বকর্মা ত্রিকূট পর্বতের উপর লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেন। নর্মদা নামে এক গান্ধর্বীর তিন কন্যার সহিত এই তিন ভ্রাতার বিবাহ হয়। সুমালীর স্ত্রীর নাম কেতুমতী। এর গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দন্তী, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদ, প্রঘস ও ভাসকর্ণ—এই কয়টি পুত্র ও কুম্ভীনসী কৈকসী, পুষ্পোৎকটা ও রাকা—এই কয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মাল্যবান, সুমালী ও মালীর অত্যাচারে দেবতা ও ঋষিগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু এদের বধ করতে সম্মত হন এবং যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে মালীকে বধ করেন এবং মাল্যবান ও সুমালী সস্ত্রীক পাতালে পলায়ন করলে কুবের লঙ্কা অধিকার করেন। দীর্ঘকাল পরে সুমালী মর্ত্যে ভ্রমণ করতে এসে কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর মত ঐশ্বর্য লাভের আশায় নিজ কন্যা কৈকসীকে কুবেরের পিতা বিশ্রবার সহিত বিবাহ দেন। কৈকসীর গর্ভে রাবণাদির জন্ম হয়। তিন দৌহিত্র তপস্যা করে বর পেয়েছে শুনে সুমালী নির্ভয়ে সানুচর রসাতল হতে এসে রাবণকে লঙ্কাপুরী পুনঅধিকার করতে প্ররোচিত করেন। রাবণ বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরকে গুরুজন মনে করে শত্রুতায় অসম্মত হলে সুমালী নিরস্ত হন; কিন্তু সুমালীর পুত্র প্রহস্তের উত্তেজনায় রাবণ লঙ্কা অধিকার করেন। রাক্ষসকুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সুমালীর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তারপর সুমালী রাবণের সুরলোক

জয়ের সঙ্গী হয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধকালে অষ্টম বসু সাবিত্রের গদাঘাতে নিহত হন।

সুমুখ—(১) গরুড়ের পুত্র।

(২) নাগরাজ ঐরাবতের বংশজাত অন্যতম নাগ। ইনি চিকুরের পুত্র ও আর্যকের পৌত্র। রূপে ও গুণে প্রীত হয়ে ইন্দ্রের সারথি মাতলি এঁর সঙ্গে নিজ কন্যা গুণকেশীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন; আর্যক বলেন, সুমুখ ও গুণকেশীর এই বিবাহ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য, কিন্তু গরুড় তাঁর পুত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে এক মাস পরে সুমুখকেও ভক্ষণ করবে। তখন মাতলি গরুড়কে নিবৃত্ত করবার জন্য সুমুখের সহিত ইন্দ্রের কাছে যান, সেখানে ভগবান বিষ্ণুও ছিলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে বিষ্ণু সুমুখকে অমৃত পান করিয়ে অমর হতে বলেন। ইন্দ্র সুমুখকে দীর্ঘায়ু করেন; কিন্তু অমৃত পান করান না। তারপর সুমুখ ও মাতলি-কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয় (মহাভারত—উদ্‌যোগ)।

সুমিত্র—ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা সুরথের পুত্র।

সুমিত্রা—দশরথের তৃতীয়া স্ত্রী ও যমজ সন্তান লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা। বনবাস গমনের সময় লক্ষ্মণ মাতার চরণস্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে তিনি বলেছিলেন, পরিব্রাজক অবস্থায় তুমি রামকে অনুসরণ কোরো। রামকে পিতা, সীতাকে মাতা ও বনকে অযোধ্যা বলে মনে কোরো। রামের বনবাসকালে ইনি কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতেন। দীর্ঘকাল পরে রামের রাজত্বকালে সুমিত্রা বহুবিধ ধর্মানুষ্ঠান করে দেহত্যাগ করেন (রামায়ণ)।

সুমেরু—স্বর্ণগিরি। পুরাণ মতে এই পর্বতে বিশ্বদেব ও মরুদগণ সন্ধ্যাকালে সূর্যের উপাসনা করতেন, তারপর সূর্য অস্তাচলে গমন করতেন। এর শিখরে জ্যোতির্ময় বরুণালয় আছে। তিব্বত দেশের উত্তর এবং চীনদেশের পশ্চিমস্থ পর্বতশ্রেণীকে সুমেরু বলা হয়। সুমেরু পর্বত দেবতাদের বাসভূমি বলে প্রসিদ্ধ।

সুযোধন--দুর্যোধনের অপর নাম। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে এই নামে সম্বোধন করতেন।

সুরভি—(১) সমুদ্র মন্থনকালেউত্থিতা অতি শক্তিশালিনী, অদ্ভুতকর্মা কামধেনু। এঁর স্তন হতে সর্বদা ক্ষীরধারা ঝরত। ঐ ক্ষীরধারা হতে ক্ষীরোদ সমুদ্র উত্থিত। মতান্তরে প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পান করে যে উদ্গার তোলেন, তা হতে কামধেনু সুরভি উৎপন্ন হয়। সুরভি স্বর্ণবর্ণা, কান্তিমতী, কপিলা গাভীদের জননী।

(২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী। ইনি দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যা বলে খ্যাত। সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর এঁর

গর্ভে জন্ম হয়েছে। এঁর স্তনধারা হতে নিয়ত ক্ষীরধারা প্রবাহিত হোত। ঐ ক্ষীরধারা হতে ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন।

সুরসা—নাগমাতা। ইনি সমুদ্রতলে অবস্থান করতেন। হনুমান সীতার অন্বেষণে সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কাযাত্রার উদ্‌যোগ করলে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষিরা হনুমানের শক্তি পরীক্ষার জন্য সুরসাকে রাক্ষসরূপ ধারণ করে হনুমানের যাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করতে বললেন। তখন সুরসা ভয়াবহ মূর্তিতে হনুমানের পথরোধ করে বললেন—দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন ; তুমি আমার মুখে প্রবেশ কর, তোমাকে আমি ভক্ষণ করব। হনুমান বললেন, তিনি সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কায় রামের দূত হয়ে যাচ্ছেন। সীতার সংবাদ রামকে দিয়ে তিনি সুরসার মুখে প্রবেশ করবেন। তখন সুরসা বললেন, আমি বর পেয়েছি, কেহই আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না ; তাই প্রথমে আমার মুখে প্রবেশ করো, পরে তুমি লঙ্কায় যাত্রা করবে। এই বলে সুরসা বিরাট ভাবে তার মুখ ব্যাদান করলেন। প্রথমে হনুমান দশ যোজন বিস্তৃত সুরসার মুখ দেখে নিজেও দশ যোজন হলেন ; তারপর সুরসা ২০ যোজন হলে হনুমান ৩০ যোজন হলেন। এই রূপে দুই জনের আয়তন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন হনুমান নিজে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হয়ে সুরসার মুখে প্রবেশ করে আবার নিক্রান্ত হলেন। তখন সুরসা স্বমূর্তি ধারণ কার হনুমানকে আশীর্বাদ করলেন (রামায়ণ)।

সুরথ—চন্দ্রবংশীয় রাজা। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ; অত্রির পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র চৈত্র, চৈত্রের পুত্র সুরথ। দ্বিতীয় মনু স্বরোচিষের অধিকার কালে সুরথ চৈত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা হন ; কিন্তু কালক্রমে শত্রুগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে রাজ্য হতে বিতাড়িত হন। অরণ্যে ভ্রমণ কালে সমাধি নামে এক বৈশ্যের সহিত এঁর সাক্ষাৎ হয়। সেও অসাধু পুত্র ও আত্মীয় কর্তৃক বনে বিতাড়িত হয়েছিল। উভয়ে শান্তি লাভের আশায় মেধস মুনির আশ্রমে এসে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেন। মেধস মুনি এঁদের জগতের সমস্ত বিষয়ের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং দেবী আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্তন করেন। দেবীর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে মেধস দেবীকে আরাধনা করতে বলেন। এই দুইজনেই দেবীর পূজা করে নিজ নিজ প্রার্থিত বর পান। পৃথিবীতে সুরথ রাজাই প্রথমে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এই মেধস ঋষি কর্তৃক কীর্তিত দেবীমাহাত্ম্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে

খ্যাত (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

সুরা—সমুদ্র মন্থন হতে সুরা দেবীর উদ্ভব হয়। ইনি দেব ও দানবদের নিকট যান। দানবরা এঁকে প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু দেবতারা সুরা দেবীকে সমাদরে গ্রহণ করেন। এই জন্য সুরাগ্রাহী নয় বলে দানবরা অসুর নামে অভিহিত হয়।

সুরুচি—রাজা উত্তানপাদের দ্বিতীয়া ও প্রিয়া স্ত্রী; উত্তমের মাতা। এঁর ঈর্ষা ও বাক্যবাণে আহত হয়ে ধ্রুব তপস্যার জন্য বনে গমন করেন এবং পরে বিষ্ণুকে লাভ করেন (ধ্রুব দেখ)।

সুলভা—একজন ব্রহ্মচারিণী। রাজর্ষি প্রধানের বংশে এঁর জন্ম। ব্রহ্মচর্য ব্রত শেষ হবার পর ইনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু যোগ্য স্বামী না পেয়ে মোক্ষ ধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাজা জনক (অন্য নাম ধর্মধ্বজ) সন্ন্যাসধর্ম, দণ্ডনীতি ও মোক্ষশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেছেন জেনে তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য সুলভা মিথিলা নগরে যান ও যোগবলে মনোহর রূপ ধারণ করে রাজসভায় উপস্থিত হন এবং নিজের সত্তা, বুদ্ধি, চক্ষু রাজার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করেন। রাজা এঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। পরে এঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এঁর প্রভাবে অবিচলিত থাকেন ও নানা যুক্তি ও তর্কে তাঁকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সুলভা নানা সারগর্ভ বিচারে এঁর সকল যুক্তি খণ্ডন করাতে ইনি সুলভার অগাধ পাণ্ডিত্যের কাছে নতি স্বীকার করেন (মহাভারত—শান্তি)।

সুশর্মা—ইনি ত্রিগর্তরাজ। কুরুরাজ দুর্যোধনের সহিত এঁর মিত্রতা ছিল। বিরাটরাজ তাঁর শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের সাহায্যে সুশর্মার রাজ্য অধিকার করতে গেলে, ইনি দুর্যোধনের সাহায্য পান। পরে ভীম কর্তৃক কীচক নিহত হলে দুর্যোধনের প্ররোচনায় ইনি বিরাট রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করে বহু গোধন হরণ করেন। বিরাট্ তা নিবারণ করতে গিয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধে সুশর্মার কাছে পরাজিত ও বন্দী হন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম সুশর্মাকে পরাস্ত করে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করেন ও বিরাটকে উদ্ধার করেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় বন্দী সুশর্মা মুক্তিলাভ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সুশর্মা সংশপ্তকগণের সহিত অর্জুনের হাতে নিহত হন (মহাভারত—বিরাট)।

সুশ্রুত—বিশ্বামিত্রের পুত্র। ধন্বন্তরির নিকট ইনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন ও মানবের হিতের জন্য তা প্রকাশ করেন (গরুড় পুরাণ)। সুশ্রুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর এক উপাখ্যান আছে। ইন্দ্র মর্ত্যলোকে মানবদের ব্যাধি-প্রপীড়িত দেখে ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং

কাশীধামে দিবোদাস নামে ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মগ্রহণ করতে বলেন। ধন্বন্তরি কাশীধামে দিবোদাসরূপে জন্মগ্রহণ করলে বিশ্বামিত্র ধ্যানে জানতে পারেন, ধন্বন্তরি দিবোদাস নামে রাজা হয়েছেন। তখন বিশ্বামিত্র নিজের পুত্র সুশ্রুতকে বললেন, কাশীর রাজা দিবোদাস স্বয়ং ধন্বন্তরি; তুমি তাঁর কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দেশের মহৎ উপকার কর। তখন সুশ্রুত বারাণসীতে রাজা দিবোদাসের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তারপর সুশ্রুত আয়ুর্বেদ বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক সুশ্রুত সংহিতা নামে বিখ্যাত।

সুষেণ—(১) কিষ্কিন্ধ্যাবাসী এক বানর দলপতি। বরুণের অংশে এঁর জন্ম। ইনি বানররাজ বালির শ্বশুর ও তারার পিতা। ইনি বানর-সেনার সুদক্ষ শল্য-চিকিৎসক ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে ইনি বহু সহস্র বানরের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন এবং সুগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে সীতা অন্বেষণে প্রেরিত হন। সুষেণ লঙ্কাযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুন্মালী নামে এক প্রসিদ্ধ রাক্ষস সেনাপতি সুষেণ কর্তৃক নিহত হয়। লঙ্কাযুদ্ধে লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানর-সেনারা অস্ত্রাঘাতে আহত হলে ইনি ঔষধ প্রয়োগে এঁদের আরোগ্য করেন। রাবণের শক্তিশেলে অচেতন লক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করবার জন্যে হনুমানকে ঔষধি পর্বত থেকে বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, মৃতসঞ্জীবনী ও সন্ধানী—এই চার প্রকার মহৌষধি আনতে পাঠান। হনুমান ঔষধি খুঁজে না পেয়ে পর্বত-শৃঙ্গ উৎপাটন করে নিয়ে আসেন। সুষেণ সেই ঔষধি পেষণ করে লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করিয়ে সুস্থ করেন (রামায়ণ)।

(২) বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আট পুত্র হয়। তার মধ্যে সুষেণ দ্বিতীয়।

(৩) মহর্ষি জমদগ্নির অন্যতম পুত্র। সুষেণ প্রভৃতি পুত্ররা জমদগ্নির আজ্ঞায় তাঁদের মাতাকে বধ করতে অসম্মত হওয়ায় এঁরা পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হন (মহাভারত)।

(৪) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র।

(৫) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত এক নাগ। ইনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন (মহাভারত—আদি)।

সুহোত্র—একদা কুরুবংশের রাজা সুহোত্র পথে উশীনর-পুত্র শিবিরাজাকে দেখতে পান। বয়স অনুসারে তাঁরা দুই জনেই পরস্পরকে সম্মান দেখালেন; কিন্তু গুণে দুই জনেই সমান ভেবে কেহ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময় নারদ এসে দুই জনের নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে

রাজারা উত্তর দিলেন—তাঁরা দুই-জনেই তুল্যগুণশালী; কে শ্রেষ্ঠ,—ঠিক করতে না পারায় দুই জনেই পথ ছাড়বেন না। তখন নারদ বললেন, শিবিরাজা সুহোত্রর চেয়ে সাধু স্বভাব সম্পন্ন। তাঁরা দুই জনেই উদার। যিনি অধিকতর উদার, তিনিই পথ ছেড়ে দিয়ে চরম উদারতা দেখান। তখন সুহোত্র শিবিকে প্রদক্ষিণ করে পথ ছেড়ে দিলেন। এইরূপে সুহোত্র তাঁর মাহাত্ম্য দেখালেন।

(২) উতথির পুত্র সুহোত্র। ইন্দ্র এর রাজ্যে এক বৎসর স্বর্ণ বৃষ্টি করেন; ফলে ঐ সময় নদীর প্রবাহে স্বর্ণ বৃষ্টি হোত। ইন্দ্র নদীতে স্বর্ণময় কূর্ম, কর্কটক, মকর ইত্যাদি নিক্ষেপ করতেন। সুহোত্র এইগুলি সংগ্রহ করে কুরু-জঙ্গলে যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের স্বর্ণাদি দান করেন (মহাভারত—আদি)।

সুত—ব্রাহ্মণীতে জাত ক্ষত্রিয় পুত্র। এঁদের অশ্বদমন, অশ্বযোজন ও রথ-সারথ্য জীবিকা ছিল। এই সারথ্যের জন্য জাতিবাচক সুত শব্দ 'সারথি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সূর্য—আর্যদের উপাস্য দেবতা সূর্য। আর্যজাতির বিভিন্ন শাখায় এঁর উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়। ইনি গ্রীকদের Helios, লাতিনদের Sol, টিউটনদের Tyr, ইরাণীয়দের 'খুরসেদ'। "সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু"—এই পাঁচটি বিভিন্ন নামে সূর্যের স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে ও মহিমায় সূর্যকে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাস্ক বলেন—আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন, সূর্য উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাহাই সবিতা, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সেই সূর্য। এই সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্ত-গমন, এই তিনটি বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। বিবস্বান শব্দে আকাশও বোঝায়। অহোরাত্র বিভাগের কর্তা অর্যমা; তিনি মিত্র ও বরুণের (দিবা ও রাত্রির) মধ্যবর্তী দেবতা।

ঋগ্‌বেদের ১০টি সূক্তে সূর্যের স্তুতি আছে। এই সূর্য জড় জ্যোতিঃ-পিণ্ড নন, ইনি সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী দেবতা। আলোকোদ্ভাসিত আকাশ এঁর মুখ, সূর্যমণ্ডল এঁর চক্ষু, ইনি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী, বিশ্বভুবনের চর, মর্ত্যজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী। সপ্তাশ্ব-যোজিত একচক্র রথে ইনি বিশ্বপর্যটন করেন। বরুণ এঁর পথ পরিষ্কার করে দেন। সূর্য মনুষ্যদিগের কর্মে প্রবর্তিত বা জাগ্রত করেন। স্থাবর ও জঙ্গম, সমস্ত পদার্থের ইনি প্রাণস্বরূপ। সমস্ত প্রাণী এঁর অধীন,

ইনি বিশ্বস্রষ্টা। সূর্যের মাতা দ্যৌঃ বা অদিতি। ধাতা সূর্য ও চন্দ্রকে কল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। অশ্বিদ্বয় সূর্যের পুত্র। উষা সূর্যের জনয়িত্রী; সূর্য প্রণয়ীর ন্যায় এই সুন্দরী দেবীর অনুগমন করেন। সূর্য উষার কোলে দীপ্তি পান, আবার উষা এঁর স্ত্রী। ইনি পুরুষের চক্ষু হতে উৎপন্ন। ইনি আকাশে পক্ষীর ন্যায় বা বৃষের ন্যায় অথবা উজ্জ্বল অশ্বের ন্যায় বিচরণ করেন। ইনি আকাশের রত্ন, উজ্জ্বল অস্ত্র, রথের চক্র। মিত্রাবরুণ এঁকে মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করেন। ইন্দ্র সূর্যকে পরাজিত করে তাঁর রথচক্র হরণ করেন, অর্থাৎ মেঘে বা সূর্যগ্রহণে সূর্যমণ্ডল আবৃত হয়ে পড়ে। স্বর্ভানু রাক্ষস অন্ধকারে সূর্যকে আচ্ছাদন করে গ্রহণ করে। অত্রি সূর্যকে মুক্ত করে আবার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথর্ববেদে রাহুর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। সূর্য সময়ের সৃষ্টিকর্তা। ইনি ৩৬০ দিনে সম্বৎসর গঠন করেন। সূর্যচক্রে ১২টি অরা (মাস) আছে। তা আকাশে ৭২০ বার (৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি) আবর্তিত হয়। অথর্ববেদে ও আরণ্যকে সপ্ত সূর্যের উল্লেখ আছে। ইহা ঋগ্‌বেদের সপ্তাশ্ব ও সপ্ত রশ্মি।

রামায়ণ ও মহাভারত মতে সূর্য কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। সেই জন্য এঁর নাম আদিত্য। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সহিত এঁর বিবাহ হয় এবং সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামক তিনটি সন্তান হয়। সূর্যের প্রখর দ্যুতি ও তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা স্বানুরূপা ছায়াকে সৃষ্টি করেন এবং স্বামীর সঙ্গিনীরূপে তাঁর কাছে পাঠিয়ে, উত্তরকুরুবর্ষে অশ্বরূপা ধারণ করে ভ্রমণ করতে থাকেন। ছায়া সূর্যের পরিচর্যায় রত হন। ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করে সূর্য তাঁর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠ সাবর্ণি মনু, দ্বিতীয় শনি ও কন্যা তপতী। পরে সংজ্ঞার শঠতা বুঝতে পেরে সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তরকুরুতে গিয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। তারপর সূর্য সংজ্ঞাকে ফিরিয়ে আনেন। বিশ্বকর্মা সূর্যের উগ্র তেজ হ্রাস করবার জন্যে তাঁর দেহের অষ্টম অংশ ছেদন করে দেন। এই কর্তিত অংশ জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পতিত হলে বিশ্বকর্মা এই জ্বলন্ত অংশদ্বারা বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়ের তরবারি ও অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র প্রস্তুত করেন।

মহাভারত অনুসারে সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। ঋক্ষরজার গ্রীবায় পতিত সূর্যের বীর্য থেকে সুগ্রীবের জন্ম হয়। বৈবস্বত মনু ইক্ষ্বাকুর পিতা; অতএব সূর্যের পৌত্র

হতে সূর্যবংশের নাম হয়। চন্দ্রবংশীয় সংবরণের সঙ্গে সূর্য-কন্যা তপতীর বিবাহ হয়।

সূর্য বংশ—সূর্য বা ক্ষত্রিয় বংশ সূর্যের পৌত্র ইক্ষ্বাকু হতে উদ্ভূত। রামচন্দ্র এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাজারা এই বংশোদ্ভূত। এই সূর্য বংশের দুইটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। ইক্ষ্বাকু এই বংশের স্থাপয়িতা। অন্য শ্রেণী মিথিলায় রাজত্ব করতেন। ইক্ষ্বাকুর অন্য পুত্র নিমি হতে এই বংশ উদ্ভূত।

সৃঞ্জয়—রাজা শ্বিত্যের পুত্র। একদিন দেবর্ষি নারদ ও পর্বত তাঁদের বন্ধু রাজা সৃঞ্জয়ের সহিত দেখা করতে এসে একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখতে পান। নারদ জানতে পারলেন এ সৃঞ্জয়ের কন্যা। তখন নারদ এই কন্যাকে স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করলেন। পর্বত ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে বললেন, তিনিও এই কন্যাকে মনে মনে বরণ করেছেন। তিনি নারদকে অভিশাপ করলেন যে, নারদ নিজের ইচ্ছা অনুসারে স্বর্গে যেতে পারবেন না। তখন নারদও পর্বতকে শাপ দিলেন, আমার সঙ্গ ভিন্ন তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পরের অভিশাপের ফলে দুই জনই সৃঞ্জয়ের কাছে বাস করতে লাগলেন। এরপর রাজা সৃঞ্জয় ব্রাহ্মণদের সেবা করে তাঁদের কাছ থেকে বর চাইলেন এবং এর ফলে তাঁর এক তেজস্বী পুত্র হলো। এই পুত্রের পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ সবই স্বর্ণময়। এই জন্য পুত্রের নাম হলো সুবর্ণষ্ঠীবী। একদল দস্যু সুবর্ণলুব্ধ হয়ে এই পুত্রকে হরণ করে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে; কিন্তু তাদের কোনও অর্থ লাভ হলো না। রাজপুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন লুপ্ত হোল। তখন দস্যুরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পরস্পরকে বধ করে নরকে গেল। পুত্রের মৃত্যুতে সৃঞ্জয় মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। তখন নারদ নানা প্রকার উপাখ্যান বলে পুত্রশোক দূর করে রাজাকে বর দিলেন, তার পুত্র পুনর্জীবিত হবে। এই বরে সুবর্ণষ্ঠীবী আবার বেঁচে উঠলেন (মহাভারত—দ্রোণপর্ব)।

সেতুবন্ধ—লঙ্কা গমনের জন্য রাম কর্তৃক সমুদ্রের উপর নির্মিত সেতু। রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেলে, সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের পরামর্শে রাম সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় গমন করেন। সুগ্রীব বিশ্বকর্মার পুত্র নলের উপর এই সেতু নির্মাণের ভার দেন। নল প্রথম দিনে ২৪ যোজন, দ্বিতীয় দিনে ২০ যোজন, তৃতীয় দিনে ২২ যোজন, চতুর্থ দিনে ২২ যোজন, পঞ্চম দিনে ২২ যোজন সেতু নির্মাণ করে লঙ্কার বেলাভূমি পর্যন্ত সংযুক্ত করে দিলেন। সেতু শত যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন বিস্তৃত হয়েছিল। যেখান হতে এই

সেতু আরম্ভ হয়, তা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে খ্যাত (রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড)।

সৈরিন্ধ্রী—রাজ-অন্তঃপুরে নারীদের কেশসংস্কার কার্যে নিযুক্তা পরিচারিকাকে সৈরিন্ধ্রী বলা হত। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস কালে দ্রৌপদী ঐরূপ সৈরিন্ধ্রী বেশে বিরাটরাজের অন্তঃপুরে রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচারিকারূপে বাস করেন (মহাভারত—বিরাট)।

সোম—ঋগ্‌বেদে সোম এক প্রকার গুল্ম বা লতা। এই লতার রস আর্যদের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। এই রস হতে উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হত। পূজার সময় দেবতারা সোমরসে পূজিত হতেন। সোমরস যজ্ঞের প্রধান আহুতি। ঋগ্‌বেদের সমস্ত নবম মণ্ডল সোমের স্তবে পরিপূর্ণ। সোমবন্দনার সূক্ত-সংখ্যা ১২০। অপর ছয়টি সূক্তে সোমকে ইন্দ্র, অগ্নি, পূষা ও রুদ্রের সহিত এক সঙ্গে স্তুতি করা হয়েছে। এই সোম সর্বশক্তিমান, সর্বরোগ-নাশক, ধনরত্ন-প্রদায়ক। সোম দেবরূপে পরিগণিত হলেও তাঁর আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; কারণ, ঋষিদের মনে সোম-লতা ও তার রসের কথাই সর্বদা জাগরূক ছিল। সোমদেবতা পীত বা অরুণ বা হরিদ্বর্ণ, সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। সোম কবি, সুকর্মা, বিদ্বান্, সর্বদর্শী, সহস্রচক্ষু, পবমান ও বলবান। সোম বৃত্রহা, সোম অমর। সোম হস্তে তীক্ষ্ণ ও ভয়ানক অস্ত্র ধারণ করেন। এঁর অপর অস্ত্র পাশ। ইনি ধনু হতে সহস্র সূচিমুখ বাণ নিক্ষেপ করে শত্রু বিনাশ করেন। বায়ুর রথের অশ্বের ন্যায় অশ্ব তাঁর রথে যোজিত। সোম ইন্দ্রের সহিত এক রথে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি রথিশ্রেষ্ঠ। তিনি মরুদ্‌গণ পরিবৃত হয়ে থাকেন।

সোমরস শুভ্রবর্ণ, ঈষৎ অম্ল ও মাদকতাজনক। এই রস বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হয় বলে তা ইন্দু। সোমের জন্মস্থান মুজবান্ পর্বতে। স্বর্গ হতে শ্যেনপক্ষী সোম আহরণ করে এনেছিল। সোমকে পর্বত হতে শকটে করে যজ্ঞস্থানে আনা হত। যজ্ঞস্থানে পাথর বা লোহা দ্বারা ছেঁচে সোমরস নিষ্কাশন করা হত; রস নিষ্কাশনের জন্য সোম একটু প্রতপ্ত করা হত। দুই হাতের দশ আঙুল দিয়ে চেপে রস নিংড়ানো হত এবং পরে তনা নামে মেষলোম-নির্মিত ছাঁকনা দ্বারা ছেঁকে দুগ্ধ মিশ্রিত করে সোমরস পান করা হত। 'যজ্ঞকথায়' রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সোম সম্বন্ধে লিখেছেন, "ইহার স্তুতিগানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ এবং মুখর। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারিগণ ইহার প্রশংসার্থ মন্ত্রপাঠ করিতেন, ঋক্‌মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেন, উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীগণ সামমন্ত্রে ইহার স্তুতিগান করিতেন। ঋকসংহিতার নবম মণ্ডলটাই ইহার

স্তুতিগীতে পরিপূর্ণ। ঋকসংহিতা ব্যাপিয়া ইহার প্রশংসাবাক্য ছড়াইয়া আছে। ঋষিগণ পরস্পর স্পর্ধার সহিত ইঁহার গুণগান করিয়াছেন। বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না। এই অমর্ত্যদেব, এই চিরনবীন শিশু, এই জ্যোতির্ময় গন্ধর্ব, আকাশের ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত ছিলেন। এই নবীন যুবা বিশ্বজয়ের জন্য জন্মিয়াছেন, ইনি দিব্যরূপে রূপবান, ইনি নরের প্রতি কৃপাবান, ইনি জগতের আয়ু-স্বরূপ।”

এই রস পান করলে অমর হওয়া যায়। সোম রোগ ও অঙ্গের বিকলতা দূর করে। সোম ইন্দ্রের প্রিয় পানীয় ছিল। সোম-বলে বলীয়ান হয়ে ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঋগ্বেদে আছে, এই সোম স্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, ধেনু ও জল সৃষ্টি করেন ও ধারণ করেন। ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে সোম চন্দ্রের নামান্তর হয়ে চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্নরূপে স্তুত হয়েছেন।

পৌরাণিক যুগে সোমকেই চন্দ্র বোঝাত। ইনি ঋষি অত্রির পুত্র, মাতার নাম অনসূয়া। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। দক্ষের ২৭ জন কন্যাকে (নক্ষত্র) চন্দ্র বিবাহ করেন। প্রকৃত পক্ষে, চন্দ্র এই ২৭ রকম চান্দ্রভাগের প্রতীক। এই কন্যারা অতুলনীয়া রূপবতী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র রোহিণীকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন; সেই জন্য অন্যান্য স্ত্রীরা অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিতা ও রুষ্টা হয়ে পিতার কাছে অভিযোগ করেন। দক্ষ জামাতা সোমকে তিরস্কার করলে সোম সমস্ত স্ত্রীর প্রতি সমভাব প্রদর্শন করা স্থির করেন; কিন্তু পরে রোহিণীর প্রতিই তিনি আবার আসক্ত হয়ে পড়েন। তখন দক্ষের অভিশাপে সোম যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে ক্ষীণ হতে থাকেন। চন্দ্রের ক্ষয়ে দেবতারা বলেন যে, দক্ষের শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন। এর ফলে লতা, ওষধি, বীজ এবং প্রজাগণ ক্ষীণ হচ্ছে এবং দেবতারাও ক্ষীণ হচ্ছেন। দক্ষ তখন বলেন, তাঁর শাপ কখনো মিথ্যা হবার নয়, চন্দ্র তাঁর সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করুন। সরস্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে স্নান করলে চন্দ্র নিরোগ হবেন কিন্তু মাসার্ধকাল নিত্য তাঁর ক্ষয় হতে থাকবে এবং মাসার্ধকাল নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেন। চন্দ্র প্রভাসতীর্থে গিয়ে অমাবস্যায় স্নান করে তাঁর শীতল কিরণ পুনঃপ্রাপ্ত হলেন। এর পর সোম রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং তার ফলে অত্যন্ত উদ্ধত ও গর্বিত হন। তখন তিনি বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করেন। ব্রহ্মার আদেশে বা বৃহস্পতির অনুরোধেও তিনি তারাকে প্রত্যর্পণ করেন নি। এর ফলে ভীষণ কলহের সূত্রপাত হয়। সোমের পক্ষে সমস্ত দৈত্য, দানব

ইত্যাদি দেব-বিদ্বেষীরা যোগদান করে। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সূচনায় শিবের ত্রিশূলাঘাতে সোমের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন ব্রহ্মা এসে এই যুদ্ধ বন্ধ করে দেন ও তারাকে ফিরিয়ে দিতে সোমকে বাধ্য করেন। তৎকালে তারা গর্ভবতী ছিলেন। পরে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তারা স্বীকার করেন, এই পুত্র সোম হতে উৎপন্ন। এই পুত্রের নাম হয় বুধ। বুধ হতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি।

সোমক—(১) পুরুবংশীয় রাজা। এঁর এক শত স্ত্রী ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে এঁর একটি পুত্র হয়। সোমকের শত স্ত্রী সর্বদাই এই পুত্রের জন্য চিন্তিত থাকতেন। তাই তিনি একদিন তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে পুত্র না থাকাই শ্রেয়, কারণ এক পুত্র উদ্বেগের কারণ। আমার ও আমার স্ত্রীদের যৌবন অতীত হয়েছে, এখন এমন কোন উপায় আছে কিনা, যাতে তাঁদের শত পুত্র লাভ হতে পারে। পুরোহিত জানান যে, যজ্ঞের ব্যবস্থা করে পুত্র জন্তুকে আহুতি দিলে রাজার শত পুত্র লাভ হতে পারে। জন্তুও আবার তার মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এবং তার বামপার্শ্বে একটি কনকবর্ণ চিহ্ন থাকবে। রাজা সম্মত হলে যজ্ঞ আরম্ভ হয় এবং ক্রন্দনরত রাজপত্নীদের কাছ থেকে পুরোহিত জন্তুকে সবলে টেনে এনে হত্যা করে যথাবিধি হোম করেন। তাঁর গন্ধ আঘ্রাণ করে রাজপত্নীরা গর্ভবতী হয়ে শত পুত্র প্রসব করেন এবং জন্তুও কনকবর্ণ চিহ্ন ধারণ করে তাঁর ভূতপূর্ব মাতার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। তারপর সেই পুরোহিত ও সোমক দুই জনেই পরলোক গমন করেন। পুরোহিতকে নরকভোগ করতে দেখে, সোমক এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় পুরোহিত বলেন যে, সোমকের জন্য যজ্ঞ করার ফলেই তাঁকে নরকভোগ করতে হচ্ছে। সোমক তখন এঁর মুক্তির জন্য যমের কাছে প্রার্থনা করেন এবং পরিবর্তে স্বয়ং নরকভোগ করতে সম্মত হন। যম জানান যে, একের পাপের ফলে অন্যে নরকভোগ করতে পারে না। তখন সোমক বলেন, তিনি তাঁর পুরোহিতকে পরিত্যাগ করে পুণ্যফল ভোগ করতে চান না; পুরোহিতের সঙ্গে নরকভোগই তাঁর কাম্য। দুই জনেই একই কর্ম করেছেন, তাঁদের পাপপুণ্যের ফল সমভাব হোক। যমের সম্মতিক্রমে তখন দুই জনেই নরকভোগ করেন (মহাভারত—বন)।

(২) কালিন্দী নামে স্ত্রীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। এই পুত্র প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দিগ্বিজয়ে গমন করেন (শ্রীমদভাগবত)।

সোমদত্ত—কুরুবংশীয় বহ্লীকরাজের পুত্র। ভূরিশ্রবার পিতা। দেবকরাজকন্যা দেবকীর স্বয়ংবর সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের জন্য দেবকীকে বলপূর্বক হরণ করতে চেষ্টা করলে ইনি বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত হন এবং শিনি সকলের সম্মুখে এঁকে পদাঘাত করেন। দারুণ লজ্জায় ও ক্ষোভে ইনি তপস্যায় রত হন। মহাদেবকে তুষ্ট করে ইনি বর পান, এঁর পুত্র শিনির পৌত্রকে সকলের সম্মুখে পদাঘাত করবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধের চৌদ্দ দিনের দিন সাত্যকির হাতে এঁর মৃত্যু হয়।

সৌতি—সূতবংশীয় লোমহর্ষণের পুত্র। সূতজাতি বলে এঁর উপাধি সৌতি। পুরাণ-কথনই এঁর কার্য ছিল। এঁর প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা। ইনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত শ্রবণ করেন। নৈমিষারণ্যে সমাগত মুনিদের কাছে এই পুরাণ-বক্তা মহাভারত শোনান (মহাভারত—আদি)।

সৌদাস—ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা সুদাসের পুত্র। এঁর অন্য নাম কল্মাষপাদ। (কল্মাষপাদ দেখ)। একদা ইনি মৃগয়া করবার সময় ব্যাঘ্ররূপী দুই রাক্ষসকে দেখতে পেয়ে এক জনকে বধ করেন। অন্য জন প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে—এই ভয় দেখিয়ে অদৃশ্য হয়। একদিন রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন; এই যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ। পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধরে রাজার কাছে সমাংস খাদ্য প্রার্থনা করলে, রাজা খাদ্যের উদ্যোগ করে দেন। তখন রাক্ষস গোপনে সমাংস অন্নের স্থলে নরমাংস মিশ্রিত করেছিলেন। ঋষি বশিষ্ঠ আহারের সময় নরমাংস দেওয়া হয়েছে বুঝতে পেরে রাজাকে অভিশাপ দিলেন—যে খাদ্য তুমি আমাকে দিয়েছ তা তোমার খাদ্য হোক। বিনা অপরাধে অভিশপ্ত হয়ে রাজাও অভিশাপ দেবার জন্য জলগণ্ডুষ নিলে তাঁর স্ত্রী স্বামীকে নিরস্ত করলেন। তখন তাঁর পায়ে সেই তেজযুক্ত জল পড়লে তাঁর দুই পা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। সেই থেকে রাজার নাম হোল 'কল্মাষপাদ'।

সৌবল—দুর্যোধনের মাতুল শকুনি অনেক স্থলে সৌবল নামে উল্লিখিত হয়েছেন।

সৌভরি—তপশ্রেষ্ঠ সৌভরি দীর্ঘকাল যমুনার জলে নিমগ্ন থেকে তপস্যা করেন। একদিন জলে নিমগ্ন অবস্থায় তপস্যা করতে করতে মীনরাজের মৈথুন-ক্রীড়া দেখে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন এবং এতে তাঁর অতিশয় অনুরাগ জন্মে। এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা

রাজা হয়ে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করছিলেন। এই মান্ধাতার তিন পুত্র ও পঞ্চাশটি কন্যা ছিল। সৌভরি যমুনার জল হতে উঠে মান্ধাতার কাছে একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। মান্ধাতা বলেন যে, আমার কন্যারা স্বয়ংবরা হবে। তারা আপনাকে বরমাল্য দান করলে আপনি তাদের গ্রহণ করবেন। সৌভরি বুঝতে পারেন, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হয়েছেন বলে রাজা কৌশলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন সৌভরি তপঃপ্রভাবে তাঁর উজ্জ্বলকান্তি যৌবনরূপ ফিরে পান এবং রাজ-অন্তঃপুরে যান। রাজকন্যারা তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে বিমোহিত হন। সকল কন্যারাই তাঁকে উপযুক্ত পাত্র মনে করে তাঁর গলায় মাল্যদান করেন। সৌভরি তখন এই ৫০টি স্ত্রী নিয়ে ৫০টি ভবনে আনন্দসম্ভোগ করতে লাগলেন। গৃহাশ্রমে তাঁর ভোগ-লালসা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। এমন সময় এক ঋষি তাঁর এই ভোগ-বিলাসের ব্যাপারে তাঁকে সচেতন করে দিলে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর সমস্ত তপঃপ্রভাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনুতপ্ত সৌভরি সংসার ত্যাগ করে আবার তপস্যায় রত হতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। সৌভরি আবার তীব্র তপস্যা করে পরমব্রহ্মে বিলীন হলেন ও তাঁর স্ত্রীরাও সত্যপথের পথিক হলেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

স্কন্দ—দেবসেনাপতি স্কন্দ অগ্নির তেজ-সম্ভূত ও স্বাহার গর্ভজাত। সপ্তর্ষিদের যজ্ঞকালে অগ্নি হোমকুণ্ড হতে উঠে সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামাবিষ্ট হন ও তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্পে বনগমন করেন। অগ্নির প্রতি আসক্তিবশতঃ দক্ষকন্যা স্বাহা সপ্তর্ষিগণের এক একজনের স্ত্রীর রূপ ধারণ করে অগ্নির সহিত ছয় বার সংগম করেন। কেবল বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবের জন্য স্বাহা তাঁর রূপ ধারণ করতে পারেন নি। স্বাহা ছয় বার সংগম করে ছয় বার কৈলাসে এক কাঞ্চন-কুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করেন। সেই স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত শুক্র হতে স্কন্দ বা কার্তিকেয় উৎপন্ন হন। তাঁর ছয় মস্তক, এক গ্রীবা ও এক উদর। মহাদেব যে ধনুদ্বারা ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন, সেই ধনু নিয়ে বালক স্কন্দ গর্জন করে উঠলেন। সপ্তর্ষিদের মধ্যে ছয় জন প্রকৃত ঘটনা না জেনে নিজ পত্নীদের স্কন্দের মাতা মনে করে তাঁদের ত্যাগ করলেন। তখন স্বাহা নিজেকে এই পুত্রের জননী বলে প্রকাশ করলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র কামার্ত অগ্নির পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন বলে তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন এবং সপ্তর্ষিদের

জানান, তাঁদের স্ত্রীরা এ বিষয়ে নিরপরাধ ; কিন্তু এ সব কথা ঋষিগণ অবিশ্বাস করেন। স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, স্কন্দ অত্যন্ত শক্তিশালী ও বীর্যবান হবে, তাই এঁকে ইন্দ্র বধ করুন ; কিন্তু ইন্দ্র সাহসী না হওয়ায় দেবতারা স্কন্দকে বধ করবার জন্য শিবের অনুচরী লোকমাতৃকাদের প্রেরণ করলেন ; কিন্তু তাঁরা স্কন্দকে স্তন্যপান করিয়ে মাতৃস্থানীয়া হলেন এবং অগ্নি মাতৃকাদের সহিত মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করলেন। স্কন্দকে জয় করা দুঃসাধ্য জেনেও ইন্দ্র সদলে স্কন্দের কাছে গিয়ে গর্জন করলে স্কন্দও গর্জন করেন এবং তাঁর মুখনির্গত অগ্নিতে বহু দেবসেনা দগ্ধ হয়। এরপর ইন্দ্র স্কন্দের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করলে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হয়ে এক শক্তিশালী যুবার আবির্ভাব হয়। বজ্রাঘাতের ফলে ইনি উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে এঁর নাম হয় বিশাখ। তখন ইন্দ্র ভীত হয়ে স্কন্দকে দেবসেনাপতি করেন। ব্রাহ্মণরা রুদ্রকে অগ্নি বলে থাকেন। সেই জন্য স্কন্দকে মহাদেবের পুত্র বলা হয়। মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্র উৎপাদন করেন। ইন্দ্র প্রজাপতির কন্যা দেবসেনাকে স্কন্দের হাতে সমর্পণ করেন। ঋষিপত্নীরা তাঁদের কলঙ্ক মোচনের জন্য স্কন্দের কাছে এলে তিনি তাঁদের মাতৃসম্বোধন করে 'তথাস্তু' বলে তাঁদের রক্ষা করেন। অগ্নির অনুরাগিণী স্বাহা স্কন্দের কাছে এসে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন, তিনি অগ্নিকে ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গেই তিনি বাস করতে চান। তখন স্কন্দ বললেন, ব্রাহ্মণরা হোমাগ্নিতে হবি অর্পণ করবার সময় 'স্বাহা' বলবেন ; এর ফলে অগ্নির সঙ্গে তাঁর সর্বদা বাস করা হবে। এরপর স্কন্দ দেবসেনাপতি হয়ে দেবাসুরের যুদ্ধে যান। প্রথমে বিপুল অসুর সৈন্যের আক্রমণে দশ সহস্র দেবসৈন্য নিহত হয়। তখন স্কন্দ প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করে মহাদানব মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। এই দেবশত্রু ও শত শত দানব সংহার করে স্কন্দ দেবতাদের ভয়মুক্ত করেন।

পালিকা মাতৃকাগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কয়েক জন কুমারকুমারীকে স্কন্দগ্রহ (অপদেবতা) বলা হয়। এঁরা ষোল বছর পর্যন্ত বালকবালিকাদের নানারূপ অমঙ্গল ঘটায়। এই সব গ্রহের শান্তি ও কার্তিকেয়ের পূজা করলে মঙ্গল, আয়ু ও বীর্যলাভ হয় (মহাভারত—বন)।

স্থাণু—(১) নীল-লোহিত রুদ্রকে ব্রহ্মা যখন প্রজাসৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, তখন তিনি 'স্থিতোহস্মি'- আমি বিরত হোলাম—এই বাক্য উচ্চারণ করে প্রজাসৃষ্টি কার্য ত্যাগ করেন। এই 'স্থিতোহস্মি' উচ্চারণ

করায় ইনি 'স্থাণু' নামে প্রসিদ্ধ হন। (কূর্ম পুরাণ, বায়ু পুরাণ)।

(২) মহাদেবের এক নাম স্থাণু। তিনি স্থির.স্থিরলিঙ্গ, এবং নিজে ঊর্ধ্বে অবস্থান করে প্রাণীদের বিনাশ সাধন করেন—এই জন্য তিনি 'স্থাণু' নামে পরিচিত (মহাভারত—অনুশাসন)।

স্থূণাকর্ণ—জনৈক যক্ষ। দ্রুপদের পুত্ররূপে পালিতা কন্যা শিখণ্ডিনীর সঙ্গে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহের পর শিখণ্ডিনীর স্ত্রীরূপ জানতে পেরে হিরণ্যবর্মা দ্রুপদরাজ্য আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করেন। শিখণ্ডিনী দুঃখে বনগমন করেন ও বনমধ্যে স্থূণাকর্ণের ভবনে এসে উপবাসে দেহত্যাগ করতে উদ্যত হন। স্থূণাকর্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পেরে দয়াবশতঃ আপন পুরুষত্ব কিছুকালের জন্য দান করে শিখণ্ডিনীর স্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। শিখণ্ডিনী শিখণ্ডীরূপে পিতৃগৃহে ফিরে পিতাকে বিপদ হতে উদ্ধার করেন। ইতিমধ্যে কুবের একদিন স্থূণাকর্ণের ভবনে এসে সমস্ত ব্যাপার অবগত হয়ে যখন দেখেন, স্থূণাকর্ণ স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন যে, শিখণ্ডীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে পূর্বরূপ ফিরে পাবে না। কিছুকাল পরে শিখণ্ডী পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে পুরুষত্ব প্রত্যর্পণের জন্য ফিরে এলে স্থূণাকর্ণ কুবেরের শাপের কথা জানিয়ে শিখণ্ডীকে বিদায় দেন। শিখণ্ডী আনন্দিত হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন (মহাভারত—উদ্যোগ)।

স্থূলকেশ—সর্বভূত হিতে রত এক মহর্ষি। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সহবাসে মেনকা গর্ভবতী হয়ে তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে নদীতীরে পরিত্যাগ করেন। স্থূলকেশ এই সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেয়ে নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে থাকেন। এই কন্যা স্বভাবে, রূপে, গুণে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ বলে মহর্ষি এঁর নাম দেন প্রমদ্বরা।

স্থূলশিরা—জনৈক ঋষি। শ্রী দানবের পুত্র দনু অতি সুপুরুষ ছিল ; কিন্তু সে রাক্ষসরূপে ঋষিদের ভয় দেখাত। একদা স্থূলশিরার আহৃত ফলমূল কেড়ে নেওয়ায় ঋষির শাপে দনু কুৎসিত হয়ে যায়। অনুতপ্ত দনু শাপ মোচনের জন্য স্থূলশিরার কাছে প্রার্থনা করায়, তিনি বলেন, রাম যখন বনমধ্যে তার বাহু ছেদন করে তাকে দগ্ধ করবেন, তখন সে পূর্বরূপ ফিরে পাবে। এই দানবই কবন্ধ (রামায়ণ—অরণ্য)।

স্বর্গ—দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গ বা দেবলোক। দেবতারা ভক্তদের বর দান করেন। দেবতাদের নৈতিক আদর্শ মানুষের ন্যায়। স্বর্গে সকলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। এক জন্ম হতে অন্য জন্মের মধ্যে মানুষ সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গলাভ করে। দেবতারা তপস্যা করেন না বা

তাঁরা 'অবতার' নন। মানুষ তপস্যা দ্বারা, বা সৎকর্মের দ্বারা স্বর্গে স্থান পায়; কিন্তু এতে মানুষের পুনর্জন্মের শান্ত হয় না, কিম্বা মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয় না। দেবতাদের বাসস্থান ছাড়া, ঋষিরা যেমন নারদ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ও প্রজাপতিরা এখানে বাস করেন। ঋষিরা দেবতাদের পুরোহিত এবং প্রজাপতিরা উপাসক। স্বর্গে পৌরাণিক জীবদের বাসস্থান—যেমন, অপ্সরা, গন্ধর্ব, কিন্নর বা কয়েক রকম পৌরাণিক জীবজন্তু, যথা বিষ্ণুর গরুড়, গণেশের মূষিক ইত্যাদি। অপ্সরা, গন্ধর্ব, বা কিন্নর কখনও মানব জন্ম প্রাপ্ত হয় না। অসুর, দৈত্য ও রাক্ষস অপদেবতা শ্রেণীর। এরা দেবতাদের সহিত চিরন্তন যুদ্ধে নিযুক্ত। দেবতারা ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণুর নিকট এই সকল অপদেবতার অত্যাচার হতে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করছে।

স্বধা—ক্ষীরোদ সমুদ্র হতে উত্থিতা পিতৃপুরুষদের স্ত্রী। শ্রীমদ্ভাগবত মতে ইনি দক্ষকন্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে ইনি ব্রহ্মার মানসকন্যা। ইনি মাতৃকাদেবী। ব্রহ্মা প্রথমে সাত জন পিতৃদেব সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার পর ব্রহ্মা এঁদের আহার্য ঠিক করে দেন—শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু ও তর্পণ; কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশে এই দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, তাঁরা নিতে সমর্থ হন না। তখন এঁরা ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রহ্মার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। সে কথা শুনে ব্রহ্মা এক সুন্দরী নারী সৃষ্টি করেন। এই নারীকে ব্রহ্মা পিতৃগণের হাতে সম্প্রদান করেন; আর ব্রাহ্মণদের বলেন যে, পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তুর শেষে 'স্বধা' বলতে হবে। তবেই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হবেন (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)।

পিতৃগণের উদ্দেশে জলপিণ্ড এঁর নামে উচ্চারণ করে উৎসর্গ করতে হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে দেয় বস্তুর মন্ত্র "স্বধা"।

স্বয়ম্বরা—হিন্দু বিবাহের এক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে কন্যা নিজের স্বইচ্ছায় নিজের স্বামী নির্বাচিত করে নেয়। স্বয়ম্বর-সভায় ভাবী স্বামীরা সমবেত হলে কন্যা স্ব-ইচ্ছায় যার গলায় মাল্যদান করে, সেই তার স্বামী হয়। পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদ নিজ কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভা করেছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি সতীর বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর-সভা আহূত করেছিলেন। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় নিষাদরাজ নল দময়ন্তীকে জয় করেন।

স্বয়ম্ভু—সর্ব প্রথমে সৃষ্টির কামনায় ভগবান বিষ্ণু জল সৃষ্টি করে তার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করেন। জলে এই বীজ নিহিত হলে তা হতে এক সুবর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হয়ে জলের উপর ভাসতে থাকে। সেই অণ্ডে ব্রহ্মা স্বয়ং

উৎপন্ন হন। সেই জন্য তাঁকে স্বয়ম্ভু বলা হয় (অগ্নি পুরাণ)।

স্বয়ম্প্রভা—মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা। ইনি চীরাজিনধারিণী তেজোময়ী তাপসী। রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে ইনি ময়দানব নির্মিত হিরণ্ময় অরণ্যে ও স্বর্ণপুরীতে বাস করতেন। সীতান্বেষণরত ক্ষুধার্ত বানররা ঋক্ষবিল নামে এক প্রকাণ্ড গুহা মধ্যে প্রবেশ করে এক আলোকিত বনে উপস্থিত হয় এবং সেখানে বৃদ্ধা তাপসী স্বয়ম্প্রভার সাক্ষাৎ লাভ করে। হনুমান তাঁর ও সেই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, হেমা নামে এক অপ্সরার প্রতি আসক্ত হয়ে ময়নামেএক মায়াবী দানব ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে নিহত হন। তখন ব্রহ্মা হেমাকে এই বিশাল হিরণ্ময় অরণ্য ও বনাদি সম্পত্তির অধিকারিণী করেন। ময়দানব ব্রহ্মার বরে ও মায়াবলে এই হিরণ্যবন ও ভবন রচনা করেন। স্বয়ম্প্রভা হেমার সখী; তাই হেমারই অনুরোধে তিনি সেই পুরী রক্ষা করছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হনুমান প্রমুখ বানরগণকে ইনি ফল-মূল-ভোজ্য-পানীয় দান করে সেই জীবন-বিপন্নকারী গুহা থেকে তপোবলে তাদের নিমেষ মধ্যে উদ্ধার করে বিন্ধ্যগিরির প্রস্রবণ ও মহাসমুদ্রের কাছে পৌছে দেন (রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যা)।

স্বারোচিষ—স্বরোচিষের পুত্র দ্বিতীয় মনু। প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে দ্বিতীয় স্বরোচিষ মনুর অধিকার কালে স্বায়ম্ভুব মনুর মত এই মনুও চরাচর জগৎ সৃষ্টি ও পালন করে নিজ মন্বন্তরকাল পর্যন্ত ভোগ করে থাকেন। এই মনুর নাম দ্যুতমান; কিন্তু স্বরোচিষের পুত্র স্বারোচিষ নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরকালে পারাবত ও তুষিতগণ দেবতা ও বিপশ্চিৎ ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। উর্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। শ্রীমদ্ভাগবত মতে এই মনু অগ্নির পুত্র। এই মন্বন্তরে অবতার বিভু, যোচন ইন্দ্র, তুষিতাদি দেবগণ এবং উর্ধ্ব স্তম্ভাদি সপ্তর্ষি।

স্বায়ম্ভুব—চতুর্দশ মনুর মধ্যে প্রথম মনু। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হতে এঁর জন্ম বলে এঁর নাম স্বায়ম্ভুব হয়েছে। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করে সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য নিজের দক্ষিণাঙ্গ হতে মনুকে এবং বামাঙ্গ হতে শতরূপা নামে এক স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন এবং শতরূপাকে স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রীরূপে নির্দিষ্ট করেন। এঁদের প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং কাকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা হয়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যম প্রভৃতি দেবতা এবং মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

স্বাহা—(১) ব্রহ্মা হতে উদ্ভূত অর্ধ

নর ও নারীরূপের নারী অংশ স্বাহা ও স্বধা।

(২) দেবতারা ব্রহ্মার নিকট আহার প্রার্থনা করলে, ব্রহ্মা হরির শরণাপন্ন হন। তখন হরি নির্দেশ দেন, যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবি দেবতাদের আহার্য হবে। সেই হতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সকলে যজ্ঞে হবি দান করতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সেই হবি দেবতারা না পাওয়ায় আবার তাঁরা ব্রহ্মার কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। এর উপায় স্থির করবার জন্য ব্রহ্মা প্রকৃতিদেবীর পূজা করতে থাকেন। পূজায় দেবী প্রীত হয়ে ব্রহ্মাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। ব্রহ্মা বর চান, আপনি অগ্নির দাহিকাশক্তি ও স্ত্রী হন। অগ্নি যেন আপনার সাহায্য ভিন্ন কোন হোমীয় দ্রব্য ভস্ম করতে না পারেন। তার মন্ত্র দ্বারা আপনার নাম উচ্চারণ করে যে হবি প্রদান করবে, সে ঘৃত যেন দেবতাদের তৃপ্তিদায়ক হয়। স্বাহা সম্মত না হয়ে বিষ্ণুর আরাধনার জন্য প্রস্থান করেন। সুদীর্ঘ কাল আরাধনার পর বিষ্ণু স্বাহাকে বলেন, আমি দ্বাপরে যখন মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করব, তখন তুমি নগ্নজিৎ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে আমাকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হবে। এখন তুমি অগ্নির দাহিকাশক্তি ও স্ত্রীরূপে পৃথিবীতে পূজা প্রাপ্ত হবে। তখন ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি স্বাহাকে বিবাহ করেন। সেই হতে মুনি-ঋষিরা এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরা মন্ত্রের শেষে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করে যজ্ঞে হবি প্রদান করেন (দেবীভাগবত)।

(৩) অন্য মতে ইনি দক্ষের কন্যা। ইনি অগ্নিকে কামনা করতেন। সপ্তর্ষিদের যজ্ঞে উত্থিত হয়ে অগ্নি এঁদের স্ত্রীদের দেখে কামার্ত হন ও এঁদের অপ্রাপ্য জেনে দুঃখে বনগমন করেন। স্বাহা তখন এক এক বার এক এক ঋষিপত্নীর রূপ ধরে ছয় বার অগ্নির সহিত মিলিত হন ও ছয়বার অগ্নির বীর্য কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। তা থেকে স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপঃপ্রভাবে স্বাহা তাঁর রূপ ধারণ করতে পারেন নি। অন্যান্য ঋষিরা এই ঘটনায় স্ত্রীদের সন্দেহ করে তাঁদের পরিত্যাগ করলে স্বাহা স্বীকার করেন, স্কন্দ তাঁরই পুত্র। বিশ্বামিত্র প্রকৃত ব্যাপার জানতেন বলে, তিনিও ঋষিস্ত্রীদের নির্দোষী বলেন; কিন্তু ঋষিগণ তা বিশ্বাস করেন না। স্কন্দ দেবসেনাপতি হলে ঋষিপত্নীদের প্রার্থনায় তাঁদের কলঙ্ক মোচন করেন এবং স্বাহা স্কন্দের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে অগ্নিকে প্রার্থনা করেন। তাতে স্কন্দ বলেন যে, হোমাগ্নিতে হবি প্রদানকালে ব্রাহ্মণরা 'স্বাহা' বলবেন, তাতেই তাঁর সর্বদা

অগ্নির সঙ্গে বাস করা হবে (মহাভারত—বন)।

স্মৃতি—পূর্বানুভূত বিষয়ে জ্ঞান। যা মানুষের স্মৃতিশক্তিতে আছে এবং গুরু পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। বেদাঙ্গ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ইত্যাদি স্মৃতির পর্যায়ে পড়ে।

স্যমন্তক মণি—যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিৎ সূর্য-ভক্ত ছিলেন। সূর্যের সহিত বিশেষ সম্প্রীতি থাকায় সূর্য হতে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ তিনি এক দ্যুতিমান স্বর্ণপ্রসূ মণি লাভ করেন। এই মণির প্রভাবে দেশ হতে অনাবৃষ্টি, ব্যাধি, ভয়, জন্তু, অগ্নি ও দস্যু ভয় দূর হত ও এই মণি দুর্ভেদ্য দ্রব্যের প্রতিরোধক ছিল। তবে কেবলমাত্র ধার্মিকের পক্ষেই এই মণি ধারণ সুফল-প্রসূ ছিল। এই মণি অধার্মিকদের পক্ষে অনিষ্টকর। একদিন সত্রাজিৎ মণি ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দ্বারকায় উপস্থিত হলে এই মণির জ্যোতি দেখে অধিবাসীরা সূর্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন ভেবে শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দেয়। এই মণি দেখে শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজের জন্য প্রার্থনা করেন। সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে এই মণি দানে অসম্মত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ পাছে এই মণি অপহরণ করেন, এই ভয়ে তিনি তাঁর ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে এই মণি দান করেন। প্রসেনজিৎ সত্রাজিতের ন্যায় ধার্মিক ছিলেন না। একদিন এই মণি ধারণ করে মৃগয়া করতে গিয়ে তিনি এক সিংহ কর্তৃক নিহত হন। ভল্লুকরাজ জাম্ববান সিংহকে হত্যা করে এই মণি অধিকার করেন; কিন্তু সত্রাজিৎ মনে করেন, মণির লোভে শ্রীকৃষ্ণই প্রসেনজিৎকে হত্যা করে মণি আত্মসাৎ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা জানতে পেরে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যে বনমধ্যে প্রবেশ করে নিহত সিংহ ও প্রসেনজিৎকে দেখেন ও শেষে ঋক্ষ-পদচিহ্ন অনুসরণ করে জাম্ববানের গুহায় প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর জাম্ববান পরাস্ত হলে তাঁর কন্যা জাম্ববতী উক্ত মণি শ্রীকৃষ্ণের হাতে অর্পণ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এই মণি সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দেন। সত্রাজিৎ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজ কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন। অক্রুর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা সকলেই সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। বিফল মনোরথ হয়ে অক্রুর ও কৃতবর্মা সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণি হরণ করবার জন্য শতধন্বাকে উত্তেজিত করেন। শতধন্বা নিদ্রিত অবস্থায় সত্রাজিৎকে হত্যা করে এই মণি হরণ করেন। সদ্যোবিবাহিতা সত্যভামা পিতার মৃতদেহ তৈল মধ্যে রক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে

উপস্থিত হন। তখন সত্যভামাকে তুষ্ট করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শতধন্বার পশ্চাদ্ধাবন করেন। পলায়নকালে শতধন্বা এই মণি অক্রূরকে দিয়ে যান। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন শতধন্বাকে একা ধৃত ও নিহত করেন, তখন তাঁর কাছে এই মণি পাওয়া যায় না। আবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই মণি না দেখতে পেয়ে বলরাম মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই মণি হরণ করে গোপন করছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। পরে যখন অক্রূর এই মণি সকলের সম্মুখে প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সত্যভামা সকলেই এই মণি দাবী করেন। শেষে বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হয়, যে অক্রূরই এই মণির অধিকারী হবেন।

হ

হংস—একজন ক্ষত্রিয় বীর। এঁর ভ্রাতা ডিম্বক। দুই ভ্রাতা তপশ্চর্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করে বর ও অস্ত্র লাভ করে অজেয় হয়ে ঘোর অত্যাচারী হয়ে ওঠেন এবং একদিন দুর্বাসাকে অপমানিত করে ঋষির কৌপীন ছিন্ন করে দেন। দুর্বাসা নিজের তপস্যা নষ্ট হবে এই আশঙ্কায় এঁদেরকে ভস্মীভূত না করে দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ঘটনা জানান। শ্রীকৃষ্ণ এঁদের বিনাশ করবেন বলে প্রতিশ্রুত হন। পিতার রাজসূয় যজ্ঞে হংস শ্রীকৃষ্ণের কাছ হতে কর দাবী করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কর দিতে অস্বীকার করলে উভয়ে যুদ্ধে রত হন। শ্রীকৃষ্ণ হংসকে নিহত করেন। ডিম্বক ভ্রাতৃশোকে যমুনার জলে নিজের জীবন বিসর্জন দেন।

হনুমান—কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ ও বায়ুর ঔরস পুত্র। একদিন অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ হয়ে বায়ু তাঁকে আলিঙ্গন করেন; অঞ্জনা বায়ুকে তিরস্কার করলে বায়ু বলেন, তিনি অঞ্জনার সঙ্গে মনে মনেই মিলিত হয়েছেন, এতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। এর ফলে তাঁর পরাক্রমশালী ও বায়ুর মত বেগবান পুত্র হবে। তখন অঞ্জনা গুহা মধ্যে হনুমানকে প্রসব করেন। জন্মের পর অঞ্জনা বন মধ্যে ফল আনতে গেলে ক্ষুধিত হনুমান নবোদিত রক্তবর্ণ সূর্যকে ফল মনে করে ধরবার জন্য লাফ দিয়ে বহু শত যোজন ওঠেন। পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য বায়ু শীতল হন। সূর্যও এঁকে শিশু মনে করে দগ্ধ করেন নি। সেই দিন রাহু সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হন, কিন্তু রাহুকে সূর্যের রথের উপর দেখতে পেয়ে হনুমান তাঁকেই আক্রমণ করেন। রাহু ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে তখনি সূর্যের কাছে উপস্থিত হন। হনুমান

সূর্যকে ছেড়ে রাহুকেই ফল মনে করে ধরতে যান। ইন্দ্র রাহুকে অভয় দিতে, হনুমান ঐরাবতকে প্রকাণ্ড ফলভ্রমে গ্রাস করতে যেতেই ইন্দ্র বজ্র-প্রহার করেন। এর ফলে বাম হনু ভগ্ন হয়ে হনুমান পর্বত শিখরে পতিত হন। পুত্রের এই দশা দেখে বায়ু তাঁকে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলে সর্বভূতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বায়ুর অভাবে ত্রিলোকে হাহাকার পড়ে গেল। তখন দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা সকলকে নিয়ে বায়ুর কাছে উপস্থিত হন ও তাঁর করস্পর্শে হনুমান পুনর্জীবিত হন। বায়ুও তখন পৃথিবীর চার দিকে প্রবাহিত হতে থাকেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে হনুমানকে বর দিতে থাকেন। ইন্দ্র বলেন যে, বজ্রাঘাতে হনু ভগ্ন হয়েছে বলে এই শিশুর নাম হবে হনুমান এবং বজ্রে আর এঁর মৃত্যু হবে না। ইন্দ্র এঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দেন। সূর্য তাঁর তেজের শতাংশ দান করেন। ব্রহ্মা বর দেন, হনুমান ব্রহ্মজ্ঞ ও চিরায়ু হবেন ও সমস্ত ব্রহ্মশাপের অবধ্য হবেন। মহাদেব ও বিশ্বকর্মা বলেন, হনুমান তাঁদের অস্ত্রসমূহের অবধ্য হবেন। বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতিও হনুমানকে নানারূপ বরদান করেন। বরলাভ করে বলশালী হয়ে হনুমান ঋষিদের আশ্রমে উপদ্রব করতে থাকেন। এর ফলে তাঁদের অভিশাপে হনুমান দীর্ঘকাল নিজের বল ও কীর্তি সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত থাকেন। সাগর লঙ্ঘনের পূর্বে জাম্ববান তাঁর পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দিলে হনুমান নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে সাগর লঙ্ঘন করেন।

সীতা অন্বেষণে-রত রাম-লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হলে সুগ্রীব হনুমানকেই তাঁদের পরিচয় জানবার জন্যে প্রেরণ করেন। তাঁদের পরিচয় পেয়ে হনুমান তাঁদের উভয়কে পৃষ্ঠে বহন করে সুগ্রীবের কাছে আনেন এবং সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের মিত্রতা স্থাপিত হয়। সীতান্বেষণে চতুর্দিকে প্রেরিত বানরদের মধ্যে হনুমান দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হন। রাম তাঁকে নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দান করেন। নানা স্থান অনুসন্ধান করে অবশেষে সম্পাতির কাছে সীতার সন্ধান পেয়ে হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কায় উপস্থিত হন ও সীতাকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়ে আশ্বস্ত করেন। সীতাও তাঁকে অভিজ্ঞানস্বরূপ চূড়ামণি দান করেন। পথিমধ্যে দেবগণ হনুমানের শক্তিপরীক্ষা করবার জন্য নাগমাতা সুরসাকে পাঠালে হনুমান তাঁকে পরাস্ত করেন। সিংহিকা নামে এক রাক্ষসী জীবদের ছায়া আকর্ষণ করে তাদের ভক্ষণ করত। সে হনুমানকে এই ভাবে আকর্ষণ করলে হনুমান নিজ শরীর বৃদ্ধি করেন।

সিংহিকাও তার মুখবিস্তার করে। হনুমান সহসা ক্ষুদ্রকায় হয়ে সিংহিকার দেহে প্রবেশ করে নখরঘাতে তার মর্মভেদ করে তাকে নিহত করেন। লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে হনুমান নিজের দেহ ক্ষুদ্র মার্জারের সদৃশ করে সীতাকে অন্বেষণ করতে থাকেন। অশোক বনে প্রবেশ করে সীতাকে দেখতে পেয়ে এবং সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে হনুমান নিজ পরিচয় দেন। রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সীতা তাঁর মস্তকের মণি হনুমানকে দেন। তারপর হনুমান নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেবার জন্য অশোকবন ধ্বংস করতে থাকেন। তাঁকে বন্ধনের জন্য রাবণ বহু রাক্ষস সৈন্য প্রেরণ করেন। হনুমান তাদের সকলকে ও রাবণের পাঁচ জন সেনাপতি ও কুমার অক্ষকে বধ করলে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে হনুমানকে বন্ধন করেন। রাবণের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় হনুমান বন্ধন-কষ্ট সহ্য করেন। রাক্ষসরা তাঁকে আবার রজ্জুবদ্ধ করলে ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন খুলে যায়। রাবণের কাছে হনুমানকে উপস্থিত করলে হনুমান সীতাহরণের জন্য রাবণকে তীব্র তিরস্কার করেন। রাবণ তাঁকে বধ করতে চান। বিভীষণের অনুরোধে সে ইচ্ছা ত্যাগ করে তিনি হনুমানের লাঙ্গুল দগ্ধ করবার আদেশ দেন। হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি সংযোগ করে তাঁকে লঙ্কাপুরী প্রদক্ষিণ করানো হয়। তিনি লঙ্কা পরিদর্শন কালে রাক্ষসদের গৃহে লাঙ্গুল দ্বারা অগ্নিসংযোগ করে রাবণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির গৃহ দগ্ধ করেন। সীতার প্রার্থনায় অগ্নি হনুমানের লাঙ্গুল দগ্ধ করেন না। অবশেষে সমুদ্রের জলে লাঙ্গুলের অগ্নি নির্বাপিত করে পুনরায় হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে রামের কাছে এসে সীতার সংবাদ ও অভিজ্ঞান দান করেন। তারপর সাগর-বন্ধন করে রাম সদলে লঙ্কায় উপস্থিত হন। লঙ্কার যুদ্ধে হনুমান অশেষ বীরত্ব দেখান। তার হস্তে জম্বুমালী ধুম্রাক্ষ, অকম্পন, দেবান্তক, ত্রিশিরা, নিকুম্ভ প্রভৃতি রাবণ-সেনাপতি ও বহু রাক্ষস নিহত হয়। লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মৃতপ্রায় হলে, সুষেণের পরামর্শে হনুমান ওষধি পর্বতে উপস্থিত হন এবং ঔষধ সংগ্রহ করতে না পেরে সমগ্র পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত করে নিয়ে আসেন। এই পর্বতস্থ ওষধি আঘ্রাণ করে লক্ষ্মণ সুস্থ হন। ইন্দ্রজিৎ বধের সময় হনুমান লক্ষ্মণের বাহন হন। হনুমান সীতাকে রাবণ-বধের সংবাদ দেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময় রাম হনুমানকে নন্দীগ্রামে ভরতের মনোভাব জানবার জন্যে প্রেরণ করেন। অভিষেককালে রাম সুগ্রীবাদিকে রত্নহার, অঙ্গদ (বাজু) ইত্যাদি

উপহার দেন ও সীতাকে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে এক উজ্জ্বল মুক্তাহার প্রদান করেন। সীতা সেই হার হনুমানকে উপহার দেন। অভিষেকের পর বানরদের কিষ্কিন্ধ্যা প্রত্যাবর্তনকালে রাম তাঁর অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার হনুমান ও অঙ্গদকে দান করেন ও নিজ কণ্ঠের হার হনুমানের কণ্ঠে প্রদান করে বলেন যে, হনুমান তাঁর যা উপকার করেছেন তার প্রত্যেকটির জন্য প্রতিদান করলেও তিনি হনুমানের কাছে ঋণী থাকবেন। হনুমান প্রার্থনা করেন, রামের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা যেন অবিচলিত থাকে। পৃথিবীতে যতকাল রামের কথা প্রচলিত থাকবে, ততকাল যেন তিনি জীবিত থাকেন। ধৈর্য মিশ্রিত তেজ, নীতির সঙ্গে সারল্য, সামর্থ্য, বিনয়, পৌরুষ ও বুদ্ধি এই সকল পরস্পর বিরোধী গুণ হনুমানের চরিত্র আশ্রয় করেছিল। হনুমান ছিলেন নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত আদর্শ। তাঁর রামভক্তি ও সেবা সম্পূর্ণ অহেতুক। তাঁর চিত্ত কামনাশূন্য, দৃষ্টি বিলাসবর্জিত ও ভবিষ্যৎদর্শী। হনুমান বায়ুর ন্যায় বেগবান ছিলেন, বৃক্ষ উৎপাটিত করতেন ও পর্বত বহন করতেন। প্রশান্ত পর্বতের মত এঁর আকৃতি ছিল এবং বিশাল স্তম্ভের মত ছিল এঁর দৈর্ঘ্য। দ্বাপরে পবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে পবনের কনিষ্ঠ পুত্র ভীমকে দর্শন দিয়েছিলেন। ভীম দ্রৌপদীর অনুরোধে পদ্ম সংগ্রহের জন্য ভ্রমক্রমে মনুষ্যের অগম্য স্বর্গের পথে উপস্থিত হওয়ায় হনুমান এই পথ রোধ করেন। ভীম হনুমানকে পথ ছেড়ে দিতে বললেন, কিন্তু হনুমান পথ ছাড়তে রাজী হলেন না। তখন ভীম বললেন, হনুমান যেমন করে সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন আমিও সেই রকম তোমাকে লঙ্ঘন করতাম। কিন্তু প্রতি প্রাণীতে পরমাত্মা আছেন, তাই তোমাকে লঙ্ঘন করবো না, তুমি পথ ছেড়ে দাও। ভীমের মুখে হনুমানের নাম শুনতে পেয়ে হনুমান জিজ্ঞাসা করলেন—হনুমান কে? ভীম উত্তর দিলেন—হনুমান বায়ুর পুত্র ও তাঁর অগ্রজ। তাঁর অগ্রজের মত তিনি শক্তিশালী, পথ ছেড়ে না দিলে যমালয়ে যেতে হবে। হনুমান বললেন—আমি বার্দ্ধক্যের জন্য অসমর্থ, আমার লাঙ্গুলটি সরিয়ে গমন কর। ভীম দুই হাত দিয়ে লাঙ্গুল তোলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? তখন হনুমান নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাম বর দিয়েছিলেন যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন আমি জীবিত থাকব। সীতার বরে সর্ব প্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত হয়। এই কথা শুনে ভীম হৃষ্ট হয়ে সমুদ্র

লঙ্ঘনের সময় তাঁর যে রূপ ছিল, তা দেখাতে বললেন। হনুমানের ভীষণ বিন্ধ্যপর্বততুল্য দেহ দেখে ভীম অবাক হলেন। এরপর হনুমান ভীমকে পদ্মবনের সন্ধান দিলেন এবং বললেন—মহাযুদ্ধে ভীমকে সাহায্য করবেন, অর্জুনের ধ্বজের উপর বসে নিদারুণ নিনাদ করবেন—এতে শত্রু বধ হবে।

হরধনু—মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করবার সময় তাঁর ধনুর জ্যা কর্ষণ করে দেবগণকে বলেছিলেন, তিনি যজ্ঞ-ভাগ চাচ্ছেন, কিন্তু দেবতারা তা দিচ্ছেন না, সে জন্য তাঁর ধনুর দ্বারা দেবতাদের শিরশ্ছেদন করবেন। দেবতারা ভয় পেয়ে স্তুতি করতে থাকলে মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁদের এই ধনু দিলেন। দেবতারা তা জনকের পূর্বপুরুষ দেবরাতের কাছে গচ্ছিত রাখলেন। তারপর একদিন ক্ষেত্র কর্ষণ করতে করতে লাঙ্গলের রেখা থেকে রাজা জনক একটি কন্যা পান। ক্ষেত্রশোধন কালে হলরেখা থেকে উত্থিত বলে লোকে তাকে সীতা বলে। তাঁর এই অযোনিজা কন্যা সীতা বীর্যশুল্কা হবে অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশরূপ পণ দিয়ে এঁকে বিবাহ করতে হবে, জনক এইরূপ স্থির করেন। অর্থাৎ যে এই হরধনু ভঙ্গ করতে সমর্থ হবে তাঁর হাতে তিনি এই কন্যা দান করবেন। অনেক রাজা সীতাকে বিবাহ করবার জন্য হরধনু ভঙ্গ করতে এলেন কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে পলায়ন করলেন; তখন রাম এই হরধনু তুলে অবলীলায় জ্যা রোপণ করে আকর্ষণ করলেন এবং ভেঙ্গে ফেললেন। তখন রামের সহিত সীতার বিবাহ সম্পন্ন হোল।

হরিবংশ—হরিবংশ-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিজ বংশের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট বলে গণ্য হয়। এর তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে সৃষ্টি ও বিভিন্ন রাজ্যের বর্ণনা; দ্বিতীয় ভাগে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও লীলা, তৃতীয় ভাগে ভবিষ্যৎ কথা, পৃথিবীর কথা ও কলিযুগের পাপ বর্ণনা।

হরিশ্চন্দ্র—সূর্য বংশের রাজা। এঁর পিতার নাম ত্রিশঙ্কু, স্ত্রী শৈব্যা, পুত্র রোহিতাশ্ব। ইনি দান, ধ্যান ও ন্যায়বিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক থাকাতে পুত্র লাভের জন্য বরুণদেবের কাছে প্রার্থনা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে বরুণদেবের প্রীতির জন্য নরমেধ যজ্ঞ করবেন। পুত্রলাভ হলে বরুণদেব একদিন হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, তুমি পুত্রকে পশুরূপে কল্পনা করে এই নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন কর; কিন্তু পর পর নানা বাধাবিঘ্নের উল্লেখ করে হরিশ্চন্দ্র এই যজ্ঞ সম্পাদনে দেরী করতে লাগলেন। তখন বরুণদেব বললেন, এই যজ্ঞ সম্পন্ন না করলে

হরিশ্চন্দ্রকে অভিশপ্ত হতে হবে। ইতিমধ্যে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত পিতার প্রতিশ্রুতির কথা শুনে পিতার অগোচরে পলায়ন করলেন। এইরূপে প্রতারিত হয়ে বরুণদেব হরিশ্চন্দ্রকে অভিসম্পাত দিলেন, যার ফলে তিনি জল উদরী রোগে আক্রান্ত হলেন। তখন রোগগ্রস্ত রাজা কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে এর প্রতিকার জিজ্ঞাসা করলেন। বশিষ্ঠ নিজ পুত্রের অভাবে উচিত মূল্য দিয়ে এক পুত্রকে ক্রয় করে এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে বললেন। তখন হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণ অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে এই যজ্ঞ সম্পাদন করতে উদ্যোগী হলেন; কিন্তু শুনঃশেফ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কৃপায় রক্ষা পেলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে—একদিন রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ায় বেরিয়ে হঠাৎ বন মধ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেলেন। এই আর্তনাদ সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী সিদ্ধিস্বরূপিণী দেবীর—যাঁকে আয়ত্ত করবার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বনে ঘোরতর তপস্যায় রত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র তখন এই আর্ত নারীকে রক্ষা করতে গেলেন; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রেব হস্তক্ষেপে মহর্ষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এর ফলে এই দেবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন এবং হরিশ্চন্দ্রও নিরাশ্রয় হয়ে চরম দুর্দশায় পতিত হলেন। তখন রাজার কৃতকর্মের জন্যে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের প্রাপ্য হিসাবে হরিশ্চন্দ্রের কাছ থেকে দান চাইলেন। হরিশ্চন্দ্রও তিনি যা চাইবেন, যথা—স্বর্ণ, নিজ পুত্র, স্ত্রী, নিজের জীবন, রাজ্য ইত্যাদি তাঁর সব প্রিয় জিনিস, দান করতে রাজী আছেন বললেন। তখন কঠোর-হৃদয় বিশ্বামিত্র তাঁর কাছ থেকে সমস্তই আদায় করে নিলেন; অবশিষ্ট রইল কেবল তাঁর পরিধেয় বল্কল, স্ত্রী ও পুত্র। রিক্ত হস্তে রাজা রাজ্যত্যাগ করলেন এবং বিশ্বামিত্রের হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কাশীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাঁর সন্ধানে সেখানেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপস্থিত হলেন। রাজার দান করবার অবশিষ্ট যা ছিল তাও দক্ষিণা-স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে—এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। তখন হরিশ্চন্দ্র নিজের স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করলেন। অবশিষ্ট রইলেন কেবলমাত্র হরিশ্চন্দ্র নিজে। এমন সময় ধর্ম বীভৎস-মূর্তি চণ্ডালের রূপ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে মূল্য দিয়ে হরিশ্চন্দ্রকে দাসরূপে ক্রয় করতে রাজী আছেন জানালেন। হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বিশ্বামিত্র বললেন, চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করে তাঁকে শেষ দক্ষিণা না দিলে তিনি অভিশাপ দিবেন। তখন চণ্ডাল মূল্যের বিনিময়ে

হরিশ্চন্দ্রকে দাসরূপে গ্রহণ করলেন। চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে নিজের গৃহে নিয়ে চার দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলেন। চণ্ডালের ভৃত্যরূপে তিনি শ্মশানে কাজ করতে আরম্ভ করলেন এবং এই কাজে তাঁর ১২ মাস অতীত হোল। ইতোমধ্যে একদিন পুত্র রোহিতের হঠাৎ সর্পাঘাতে মৃত্যু হোলে মাতা শৈব্যা দাহের জন্য মৃত-পুত্রকে শ্মশানে নিয়ে এলেন। এখানে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা পরস্পরকে চিনতে পারলেন। তাঁরা দুই জনেই ঠিক করলেন, পুত্রের চিতায় দুই জনেই প্রাণ বিসর্জন করবেন। তবে দাস বলে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিষ্ণুর উপাসনায় রত হলেন। এমন সময় দেবতারা ধর্ম ও বিশ্বামিত্রের সহিত সেখানে উপস্থিত হলেন। ধর্ম হরিশ্চন্দ্রকে সহমৃত হতে নিষেধ করলেন এবং ইন্দ্র বললেন—তিনি, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র সৎকর্মের দ্বারা স্বর্গ জয় করেছেন। তখন হরিশ্চন্দ্র সকলকে জানালেন, তাঁর প্রভু চণ্ডালের অনুমতি ব্যতীত, তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন না। ইন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের কথা মেনে নিলেন। চণ্ডাল তখন বললেন, তিনিই ধর্ম। এরপর হরিশ্চন্দ্র জানালেন যে, তাঁর প্রজাদের ত্যাগ করে তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন না। ইন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের এই কথাও মেনে নিলেন। তখন রোহিতকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কর হরিশ্চন্দ্র প্রজা ও অনুচরদের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে আসার পর নারদের প্ররোচনায় হরিশ্চন্দ্র নিজের কৃতকর্মের প্রশংসা করেন। এর ফলে তিনি স্বর্গ থেকে পতিত হবার সময় অনুতপ্ত হন এবং দেবতাদের ক্ষমা লাভ করতে সমর্থ হন। তখন তাঁর স্বর্গ হতে পতন রুদ্ধ হয়। তিনি ও তাঁর অনুচররা একটা বায়বীয় স্থানে বাস করতে থাকেন। এখনও মধ্যে মধ্যে মধ্যাকাশে এঁদের দেখা যায়।

হর্যশ্ব—(১) প্রজাপতি দক্ষের পাঁচ হাজার পুত্র হর্যশ্ব নামে অভিহিত। পৃথিবীতে প্রজা সৃষ্টি করবার জন্য দক্ষ এঁদের জন্ম দেন, কিন্তু নারদ এঁদের প্রজা সৃষ্টি হতে বিরত থাকতে বলেন। তখন তাঁরা নানা দেশে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান এবং আর ফিরে আসেন না (হরিবংশ)।

(২) পুরুবংশীয় চক্ষুর পুত্র হর্যশ্ব। এঁর মঙ্গল, সঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র ছিল। এই পুত্ররা পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিলেন।

হলায়ুধ—বলরামের অন্য নাম।

হয়গ্রীব—(১) দৈত্য বিশেষ ও হয়গ্রীব শিরোধর বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। অসুর হয়গ্রীব দিতির পুত্র। সরস্বতী নদীর তীরে মহামায়ার আদেশে হয়গ্রীব কঠোর তপস্যা করতে থাকে।

সহস্র বৎসর পরে মহামায়া তপস্যায় প্রীত হয়ে একে বর দিতে চান। হয়গ্রীব দেবীর নিকট অবধ্য হবার বর প্রার্থনা করে। হয়গ্রীবের এই প্রার্থনা শুনে দেবী বলেন, এ বর দেওয়া সম্ভবপর নয়; কারণ, জন্ম হলেই মৃত্যু হবে, তাই অন্য বর প্রার্থনা কর। তখন হয়গ্রীব এমন বর চায়—যাতে হয়গ্রীব ছাড়া অন্য কোন প্রাণী তাকে বধ করতে পারবে না। তখন দেবী এই বরই তাকে প্রদান করেন। বর পেয়ে হয়গ্রীব নির্ভয়ে দেবতা ও ঋষিদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। তাকে দমন করতে না পেরে দেব ও ঋষিগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে, তিনি হয়গ্রীব মূর্তি ধারণ করে এই অসুরকে বিনাশ করেন (দেবী ভাগবত)।

(২) কল্পান্তকাল এই পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। তখন ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় সলিল মধ্যে শয়ন করেছিলেন। এক আমি বহু হব—বিষ্ণু এই চিন্তা করতে করতে পিতামহ ব্রহ্মার উদ্ভব হয় এবং তিনি সহস্র-দল পদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকেন। পদ্মের মধ্যস্থ দুই জলবিন্দু হতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের উদ্ভব হয়। এই দৈত্যরা সনাতন বেদ সকল বলপূর্বক গ্রহণ করে জল মধ্যে রসাতলে প্রবেশ করে। এই বেদ উদ্ধার করার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণু যোগনিদ্রা ত্যাগ করে হয়গ্রীব শিরোধর মূর্তি গ্রহণ করে রসাতলে প্রবেশ করে মধু ও কৈটভের কাছ হতে বেদ উদ্ধার করে ব্রহ্মাকে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর এই অসুর হয়গ্রীব অবতার বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয় (মহাভারত-শান্তি)।

হয়শিরা—অশ্ব-মস্তক বিশিষ্ট। মহাভারতে আছে, ঋষি ঔর্ব সমুদ্রের মধ্যে তাঁর ক্রোধের অগ্নি নিক্ষেপ করেন। ফলে অগ্নি হয়শিরা রূপ গ্রহণ করে।

হস্তী—ভরত বংশীয় বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী। এঁর তিন পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ়, ও পুরুমীঢ়। এই হস্তীই হস্তীনাপুর স্থাপন করেন (মৎস্য পুরাণ)।

হংস—(১) সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন পুত্রের মধ্যে অন্যতম। (২) ষড়গর্ভ নামে খ্যাত হিরণ্যকশিপুর পুত্রদের অন্যতম। (৩) সূর্যের এক নাম হংস। ইনি কাশী দর্শন ইচ্ছায় আকাশে অতি দ্রুত গমন করেছিলেন। তাই এঁর এই নাম হয়। (৪) ব্রহ্মার বাহন হংস। দক্ষকন্যার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে এই হংস ব্রহ্মাকে ফেলে পলায়ন করে। এতে ব্রহ্মা তাঁকে শাপ দেন। পরে ব্রহ্মার নির্দেশে রেবা তীরে এই হংস এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শাপমুক্ত হয় (স্কন্দ পুরাণ)।

হংস-ডিম্বক—হংস ও ডিম্বক দুই ভ্রাতা শাল্বদেশের রাজা ব্রহ্মদত্তের দুই

পুত্র। উভয়েই অভিন্নহৃদয় ছিল। তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে এরা দুর্ধর্ষ ও অজেয় হয় এবং অভেদ্য বর্মাদিও লাভ করে। মহাদেব-প্রদত্ত অস্ত্রে দেব, দানব ও ঋষিদের উপর এরা অত্যাচার করতে থাকে। এরপর এরা দিগ্বিজয় করে তাদের পিতার-দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে মনস্থ করে। তারপর এই দুই ভ্রাতা সরোবরে তপো-নিরত দুর্বাসাকে অসম্মান করায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এদের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করেন। সেই সময় হংস ও ডিম্বক অন্যান্য নরপতির মত দ্বারকা-পতি শ্রীকৃষ্ণের কাছেও কর আদায় করবার জন্য দূত প্রেরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ কর দিতে অস্বীকার করলে, হংস ও ডিম্বকের সহিত পুষ্করে তাঁর ঘোর যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে হংস নিহত হলে ভ্রাতৃবৎসল ডিম্বক যমুনার জলে আত্ম-বিসর্জন করে। এরা দুই ভাই শ্রীকৃষ্ণের শত্রু মগধরাজ জরাসন্ধের সখা ছিল।

হরি—নারায়ণের এক নাম।

হরিহর—বিষ্ণু ও শিবের নামের সমন্বয় এবং এক দেবতারূপে পরিগণিত।

হারিত—সবুজবর্ণ। ঋক্‌বেদে সূর্যের অশ্বদের হারিত বলা হোত। সংখ্যায় এরা সাত কিংবা দশ—সূর্যের আলোর প্রতীকস্বরূপ।

হারীত—(১) বেদব্যাসের শিষ্য ঋষি, শাস্ত্র প্রযোজক ও সংহিতাকার। (২) সূর্য বংশের ইক্ষ্বাকু হতে যুবনাশ্বের পুত্র। যুবনাশ্ব হতে অঙ্গিরস ক্ষত্রিয়-কুল প্রবর্তিত হয়েছে।

হাহা ও হুহু—এরা স্বর্গের গন্ধর্ব। হাহা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্যরথে বাস করতেন। হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বরা সূর্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। হাহা অর্থাৎ গানে হা এইরূপই নিন্দাসূচক শব্দ দূরীভূত করে যে। হুহু অর্থাৎ গানে হু-এইরূপ শব্দ করে যে।

হিমবান—মেনকার স্বামী। হিমালয়াধিপতি। শিবপত্নী সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করে হিমবানের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

হিমালয়—পর্বতরাজ হিমালয় পিতৃ-লোক-দুহিতা মেনকাকে বিবাহ করেন। মেনকার গর্ভে তাঁর মৈনাক নামে এক পুত্র ও গঙ্গা ও পার্বতী নামে দুই কন্যার জন্ম হয়।

হিরণ্যকশিপু—অসুর সম্রাট। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। বৈকুণ্ঠে হরির জয় ও বিজয় নামে দুই দ্বারপাল ছিল। একদিন সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোকে এলে জয় ও বিজয় এঁদের অদ্ভুত মূর্তি দেখে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। এতে ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, এরা অসুরযোনি প্রাপ্ত হবে। এইরূপে অভিশপ্ত হওয়া মাত্র

এরা স্বর্গ হতে পতিত হতে থাকে। ঋষিরা দয়াপরবশ হয়ে শেষে বলেন, তিন জন্মের পর এরা শাপমুক্ত হবে। এই জয় ও বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ ও তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে।

কশ্যপের দুই স্ত্রী—দিতি ও অদিতি। অদিতির পুত্ররা দেবতা ও অমর হয়। দিতি একদা সন্ধ্যাকালে কশ্যপের কাছে এসে এক বলবান পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তাঁকে গর্ভদান করে বলেন, তোমার চিত্ত অপবিত্র এবং তুমি কামাতুরা—এই জন্য তোমার দুই অধম পুত্র হবে এবং তারা সকলকে অত্যাচার করবে। কোন সময়ে ভগবান বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়ে এদের বধ করবেন। তখন দিতি প্রার্থনা করলেন, তাঁর দুই পুত্র যেন বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়। কশ্যপ তখন তাই স্বীকার করে বলেন, তোমার এক পুত্রের নাম হবে হিরণ্যকশিপু। এরই পুত্র প্রহ্লাদ হতে তোমরা সকলে পবিত্র হবে। শত বর্ষ গর্ভধারণ করার পর দিতির দুই পুত্র, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। হিরণ্যাক্ষ বরাহরূপী বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়। হিরণ্যকশিপু এই সংবাদ পেয়ে বিষ্ণুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বধ করতে মনস্থ করে। নিজেকে অজেয়, অমর, প্রতিপক্ষহীন, অদ্বিতীয় রাজা হবার জন্য কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে বর প্রার্থনা করে, কোন সৃষ্ট প্রাণী হতে যেন তার মৃত্যু না হয়, অভ্যন্তরে বা বাইরে, দিনে বা রাত্রে ব্রহ্মার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য হতে যেন তার মৃত্যু না হয়। নর ও পশুর সে যেন অবধ্য হয়। ভূমিতে বা আকাশে যেন তার মৃত্যু না হয়—ইত্যাদি। ব্রহ্মার এই সকল বর লাভ করে আরও শক্তিশালী হয়ে হিরণ্যকশিপু যথেচ্ছাচারে রাজত্ব করতে থাকে। তার স্ত্রীর নাম ছিল কয়াধু। কয়াধুর গর্ভে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ সংহ্লাদ ও হ্লাদ নামে চার পুত্র হয়। বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করায় পিতার সমস্ত ক্রোধ এই পুত্রের উপর পতিত হয়। হিরণ্যকশিপু নানা ভাবেপুত্রকে হত্যা করতে চেষ্টা করা সত্বেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হয় না। কোন রূপেই প্রহ্লাদকে নিহত করতে না পেরে, হিরণ্যকশিপু একদিন সন্ধ্যায় পুত্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রহ্লাদ বলেন, আমার হরি আমাকে সর্বদা রক্ষা করেন, এবং তিনি সব সময়ে সর্বত্র বিরাজমান। তখন প্রাসাদস্থ এক স্ফটিক স্তম্ভকে দেখিয়ে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করে, এই স্তম্ভেও কি হরি বিদ্যমান? প্রহ্লাদ বলেন—হাঁ, ঐ স্তম্ভেও তিনি বিদ্যমান। তখন

হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাতে সেই স্তম্ভ ভগ্ন করলে, তার ভিতর হতে নরসিংহ-রূপধারী বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে নিজের জানুদ্বয়ের উপর স্থাপন করেন এবং নখরাঘাতে উদর বিদীর্ণ করে তাকে হত্যা করেন। দেব, দানব, মানব বা জন্তু কারো হাতে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয় না। অর্ধনর ও অর্ধসিংহের হস্তে তার মৃত্যু হয়। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, দিবসে বা রাত্রে মৃত্যু না হয়ে জানুর উপর সন্ধ্যাকালে তার মৃত্যু হয়।

হিরণ্যগর্ভ—সৃষ্টির আদিম পুরুষ। ব্রহ্মা স্বর্ণ-ডিম্ব বা স্বর্ণ-গর্ভরূপে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্ট হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীকে রক্ষা করেন। সুবর্ণময় অণ্ড হতে ব্রহ্মার জন্ম বলে ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিপুরুষ প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন। তারপর সেই জলে তিনি তাঁর বীর্য নিক্ষেপ করলেন। সেই বীর্য এক হিরণ্যবর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হলে অণ্ড মধ্য হতে পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। এই কারণে তিনি হিরণ্যগর্ভ নামে খ্যাত (বিষ্ণু ও কূর্ম পুরাণ)।

মনুর মতে ইনিই ব্রহ্মা, প্রথম পুরুষ। ডিম্বের মধ্যে এক বৎসর বাস করে ইনি ডিম্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ দ্বারা পৃথিবী ও আর এক ভাগ দ্বারা স্বর্গ নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে ইনি আকাশ, অষ্ট দিক ও সমুদ্র স্থাপন করেন (মনুসংহিতা)।

হিরণ্যরেতা—অগ্নির এক নাম। মহাদেব বীর্যত্যাগ করলে অগ্নি প্রথমে এই বীর্য ধারণ করেন। তাতে অগ্নির তেজ মন্দ হয়। অগ্নি দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। পথে কুটিলা দেবীকে দেখে অগ্নি তাঁকে মহাদেবের তেজ ধারণ করতে বলেন। সেই দেবী তখন মহাদেবের তেজ ধারণ করেন। এই তেজ ধারণ করায় অগ্নির মাংস, অস্থি, রক্ত, মেদ, মজ্জা, রোম ও কেশাদি হিরণ্যবর্ণ হয়েছিল। সেই থেকে অগ্নির নাম হিরণ্য হয়েছে। হিরণ্য হয়েছে রেতঃ যার—মহাদেব, অগ্নি, সূর্যকে বোঝায় হিরণ্যরেতা (বামন পুরাণ)।

হিরণ্যাক্ষ—মহর্ষি কশ্যপ ও দিতির পুত্র। হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ব্রহ্মার বরে অতি দুর্ধর্ষ হয়ে সে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গে উপস্থিত হয়। দেবতারা ভয়ে পলায়ন করেন। তারপর অসুর জলক্রীড়ার জন্য সমুদ্রে নামে। সেখান হতে বরুণের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সে সুখে বাস করতে থাকে। এখানে বরুণের সাক্ষাৎ পেয়ে সে বরুণকে যুদ্ধে আহ্বান করে। বরুণ বলেন, পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ কেহ নাই। একমাত্র ভগবান বিষ্ণু তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ।

তুমি তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান কর। তখন হিরণ্যাক্ষ হরির সন্ধানে রসাতলে প্রবেশ করে বরাহরূপী বিষ্ণুকে দেখে তাঁকে জলচর বরাহ মনে করে আক্রমণ করে। এই দানবকে দেখে এই বরাহ দন্তদ্বারা সমস্ত পৃথিবী উত্তোলন করে হিরণ্যাক্ষকে আক্রমণ করে। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর বরাহরূপী বিষ্ণু দন্ত দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণ করে নিহত করেন। অন্য মতে, হিরণ্যাক্ষ ত্রিলোক জয় করে পৃথিবীকে সমুদ্রতলে নিক্ষেপ করে। বিষ্ণু বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দশনাগ্রে রসাতল হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন।

হিড়িম্ব—এক প্রসিদ্ধ রাক্ষস। ভীমের স্ত্রী হিড়িম্বার ভ্রাতা। পাণ্ডবরা কুন্তীসহ জতুগৃহ হতে উদ্ধার পেয়ে বন মধ্য দিয়ে পলায়ন করার সময় বনের শালবৃক্ষে হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা বাস করত। একদা বন মধ্যে ভীম ছাড়া অন্য পাণ্ডবরা সুপ্ত ছিলেন। তাঁদের দেখে হিড়িম্বের নরমাংস ভক্ষণের ইচ্ছা হয়। সে ভগিনী হিড়িম্বাকে এঁদের বধ করবার জন্য পাঠায়। ভীমের রূপে মুগ্ধ কামাতুরা হিড়িম্বা ভ্রাতার কথা অমান্য করে এক সুন্দরী স্ত্রী রূপে ভীমের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ভ্রাতার অভিসন্ধি প্রকাশ করে তাঁদের উদ্ধার করতে চায়। ভগিনীর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগিনীর রূপ ও বেশ পরিবর্তন এবং ভীমের সঙ্গে কথোপকথন করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ভগিনীকেও বিনাশ করবার ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে যায়। ভীম নিদ্রিত ভ্রাতাদের জাগ্রত না করে, হিড়িম্বকে দূরে টেনে নিয়ে বাহু যুদ্ধে রত হন; কিন্তু পাণ্ডবরা ভীষণ যুদ্ধের শব্দে জাগরিত হন। ভীম তখন হিড়িম্বকে তুলে ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করে বধ করেন (মহাভারত—আদি)।

হিড়িম্বা—রাক্ষস হিড়িম্বের ভগিনী অরণ্যাচারিণী রাক্ষসী। জতুগৃহ হতে পলায়ন করে বন মধ্যে পাণ্ডবরা হিড়িম্বের বাসস্থানে উপস্থিত হন। হিড়িম্ব পাণ্ডবদের মাংস আহার অভিপ্রায়ে তাঁদের বধ করবার জন্য ভগিনীকে প্রেরণ করলে, সে ভীমের রূপে মুগ্ধ হয়ে সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে ভ্রাতার অভিসন্ধি প্রকাশ করে পাণ্ডবদের উদ্ধার করতে চায়। ভগিনীর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব সেখানে উপস্থিত হয় ও ভীমের হস্তে নিহত হয়। ইতোমধ্যে হিড়িম্বা কুন্তী সমীপে ভীমের প্রতি তার অনুরাগ ও তাঁকে পতিত্বে বরণ করবার বাসনা জানায়। ভীম হিড়িম্বকে বধ করে হিড়িম্বাকেও বধ করতে চান। যুধিষ্ঠির ভীমকে স্ত্রীহত্যা করতে নিষেধ করেন। তখন হিড়িম্বা কুন্তীর শরণ নিয়ে বলে সে ভীমের প্রতি অনুরক্তা,

প্রত্যাখ্যাতা হলে সে আর জীবিত থাকবে না এবং ভীমের সঙ্গে কিছুকাল ইচ্ছানুরূপ বিচরণের পর তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। যুধিষ্ঠির তখন এই সর্ত করেন, ভীম স্নান-আহ্নিক শেষ করে হিড়িম্বার সঙ্গে মিলিত হবেন ও সূর্যাস্তের পর পুনরায় ভ্রাতাদের কাছে ফিরে আসবেন। একথা শুনে ভীম বলেন, যতদিন না তাঁর পুত্র হয়, ততদিন তিনি হিড়িম্বার সঙ্গে বাস করবেন। হিড়িম্বা তখন ভীমের সহিত আকাশপথে চলে যায়। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র হয় (মহাভারত—আদি)।

হৃষীকেশ—(১) নারায়ণ অথবা বিষ্ণুর নাম। (২) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম।

হুতাশন—অগ্নির এক নাম। যজ্ঞাদিতে উৎকৃষ্ট জিনিস বেশী পরিমাণে ভোজন করে দেবতা ও মহর্ষিরা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হন। তখন তাঁরা প্রতিকারপ্রার্থী হয়ে হুতাশনের শরণাপন্ন হন। হুতাশন তাঁদের বলেন—আপনারা আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞাদি কার্যের অন্ন ভোজন করুন, তাহলেই আপনারা অজীর্ণ রোগ হতে মুক্তি পাবেন। এইরূপে হুতাশনের দয়ায় দেবতা ও মহর্ষিরা অজীর্ণ রোগ হতে মুক্ত হন। এই জন্য যজ্ঞাদিতে সর্ব প্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করা হয়, তাতে ব্রহ্ম-রাক্ষসরা যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না (মহাভারত—অনুশাসন)।

মহর্ষি ভৃগু একবার হুতাশনকে 'সর্বভুক্ হও' বলে শাপ দেন। এর উত্তরে হুতাশন বলেন, আমাকে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাতেই দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন; অতএব আমি সর্বভুক্ কি করে হব। এই কথা বলে হুতাশন অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া হতে অন্তর্হিত হলেন। এর ফলে ঋষিরা উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলেন, যিনি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন, তিনি কি করে সর্বভুক্ হবেন। ব্রহ্মা তখন মিষ্ট কথায় হুতাশনকে বললেন, তুমি ত্রিলোকের ধারয়িতা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক। তুমি সদা পবিত্র, সর্ব শরীর দিয়ে তুমি সর্বভুক্ হবে না। তোমার গুহ্যদেশে যে শিখা আছে এবং তোমার যে মাংসভক্ষক শরীর আছে, তাই সর্বভুক্ হবে। তোমার মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে, তাই দেবগণের ও নিজের ভাগ রূপে গ্রহণ কর (মহাভারত—আদি)।

হেমকূট—এ পর্বত কিম্পুরুষবর্ষের সীমা পর্বত। এই পর্বত দৈর্ঘ্যে নবতি-সহস্র যোজন ও প্রস্থে দ্বিসহস্র যোজন। হিমালয়ের উত্তরে এই পর্বত অবস্থিত (শ্রীমদ্ভাগবত)।

হেমা—স্বর্গের এক অপ্সরা। এঁর গর্ভে এবং ময়দানবের ঔরসে রাবণের

স্ত্রী মন্দোদরীর জন্ম হয়। ময়দানব হেমার প্রতি আসক্ত হওয়ায় ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাতে বধ করেন। ময়দানবের মৃত্যুর পর তাঁর আশ্চর্যপুরীর অধিকারিণী হয় হেমা (মহাভারত)।

হৈমবতী—হিমালয়ের কন্যা বলে পার্বতীর এক নাম হৈমবতী।

হৈহয়—(১) হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বাহুকে পরাজিত করে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন। পরে রাজা বাহুর পুত্র সগর এদের পরাভূত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন (মহাভারত—বন)।

(২) কার্তবীর্যার্জুন হৈহয়দের রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হৈহয়রা অর্থকষ্টে পতিত হয়। তখন তাঁরা তাঁদের পুরোহিত ভার্গবদের কাছে অর্থ প্রার্থনা করে। লোভী ভার্গবরা হৈহয়দের অর্থদান করলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হৈহয়রা ভার্গবদের হত্যা করে ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন (দেবী ভাগবত)।

হ্রস্বরোমা—জনকবংশীয় স্বর্ণরোমার পুত্র। এঁর পুত্র প্রসিদ্ধ সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ। এই সীরধ্বজ সাধারণতঃ জনকরাজ নামে পরিচিত (রামায়ণ—আদি)।

হ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র। হ্লাদের স্ত্রী ধমনী এবং পুত্র ইল্বল ও ও বাতাবি।

অসি—ধাতুনির্মিত ২।৩ হাত লম্বা ছেদন অস্ত্র। অগ্রভাগ সরু ও বাঁকা। একদিকে তীক্ষ্ণ ধার।

অঙ্কুশ—লৌহদণ্ড বিশেষ। ইহার অগ্রভাগ বাঁকা। হস্তিতাড়নের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

অর্ধচন্দ্র বাণ—যা দিয়ে অর্জুন ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন।

অঞ্জলিক বাণ—এই বাণ দিয়ে অর্জুন ভীষ্মের মস্তকে উপাধান প্রদান করেন।

অন্তর্বাণ—কুবের যে অস্ত্র অর্জুনের কাছ হতে পেয়েছিলেন।

অষ্টবজ্র—বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের কুলিশ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি,কালীর খড়্গ—এই কয়টি অষ্টবজ্র।

আগ্নেয় অস্ত্র—এই অস্ত্র ভরদ্বাজ অগ্নিপুত্র অগ্নিবেশ্যকে দেন। অগ্নিবেশ্য তা দ্রোণকে অর্পণ করেন। আগ্নেয়াস্ত্র ঔর্ব ঋষি সগর রাজাকে দান করেন।

ঐন্দ্র অস্ত্র—ইন্দ্রের এক প্রকার অস্ত্র, যা হতে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে শত্রু সংহার করতো।

কুঠার বা পরশু—যষ্টির এক পাশে ধাতু নির্মিত ছেদন অস্ত্র। ইহা পরশুরামের প্রিয় অস্ত্র। ইহা দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করেছিলেন। কার্য—আঘাতে ছেদন।

কৃপাণ, তরবারি, খড়্গ—লৌহ নির্মিত তীক্ষ্ণধার অসি জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ।

ক্ষুরপ্র বাণ—অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ বিশেষ; খুরপার মত ক্ষেপণাস্ত্র। এই অস্ত্র অর্জুন ভীষ্মের প্রতি ব্যবহার করেছিলেন।

গদা—মুদ্গরের তুল্য যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ।

গরুড়াস্ত্র—এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে সর্পবেষ্টিত নাগপাশ-অস্ত্র নিষ্ফল হয়। ইহা ক্ষেপণে নাগপাশের সর্পগণ ভয়ে পলায়ন করে।

গাণ্ডিব—অর্জুনের ধনু। ব্রহ্মা নির্মাণ করে এই ধনু প্রজাপতিকে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র সোমকে ও সোম বরুণকে দান করেন। এরপর অগ্নি বরুণের নিকট প্রার্থনা করে এই গাণ্ডিব অর্জুনকে দেন।

চক্র—ইহা কুণ্ডলাকার, প্রান্তভাগ উত্তম কোণযুক্ত ও ধারাল, এবং নীল জলের ন্যায় বর্ণ। চক্রের কার্য—ছেদন, ভেদন, নিপাতন ও শারিত করণ।

চক্রব্যূহ—চক্রাকার সেনা সন্নিবেশ। দ্রোণাচার্য এই ব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধ

করেছিলেন। এই যুদ্ধে মহাবীর অভিমন্যু মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চন্দ্রহাস—প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্র। ইহা একটি লাঠির মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার লৌহফলক। এর আস্ত বিস্তৃত, সম্মুখে চকচকে খুব সরু মুখ ও মস্তকে শিখা, বাহু পরিমিত লম্বা। ইহা পাতন ও ছেদন কার্য করে।

চর্ম—ঢাল। ইহাদ্বারা শত্রুর আঘাত প্রতিহত করা যায়।

জিম্ভকাস্ত্র—রামায়ণে উল্লিখিত—যে অস্ত্র নিক্ষেপে শত্রু ঘুমিয়ে পড়ে।

তোমর—অস্ত্র বিশেষ, লৌহের শাবল; ইহা দণ্ডযুক্ত এবং সমস্ত লৌহময়। এই দুই প্রকার তোমর প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: উত্তম, মধ্যম ও অধম। পাঁচ হাত প্রমাণ উত্তম, সাড়ে চার হাত প্রমাণ মধ্যম ও চার হাত প্রমাণ অধম। এইরূপ ষড়আঙুল তোমর উত্তম, সাড়ে পাঁচ আঙুল মধ্যম ও পঞ্চাঙুলি অধম রূপে গণ্য হয়েছে।

ত্রিশূল—মহাদেবের অস্ত্র। ধাতুনির্মিত লম্বা যষ্টির অগ্রভাগে পাশাপাশি তিনটি ভল্লের মতন। দুই পার্শ্বের ভল্লগুলি একটু বাঁকা। কার্য—ছেদন, নিপাতন ও শাম্বিতকরণ।

দর্পণ—গোলাকৃতি, একদিকে হাতল। ইহার দ্বারা শত্রুর চোখে আলো নিক্ষেপ করে দৃষ্টি বিঘ্ন করা হয় এবং পশ্চাতের শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হয়।

নাগপাশ—মন্ত্রসিদ্ধ অস্ত্র। এই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলে লক্ষিত ব্যক্তির সর্বাঙ্গ সর্পরজ্জু দ্বারা দৃঢ় ভাবে বন্ধন করত।

নারাচ অস্ত্র—লৌহময় বাণ।

নালীক—বাণ বিশেষ, শল্যাস্ত্র।

পট্টিশ—তরবারি বিশেষ। ইহা প্রায় খড়্গাকৃতি, পুরুষপ্রমাণ দীর্ঘ, দুই দিকে ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ এবং মুঠ হস্তত্রাণযুক্ত।

পরিখ—লৌহমুখ বা লৌহকণ্ঠকযুক্ত মুদ্গর। কার্য—পিটন ও শাম্বিত করণ।

পাশ—এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র। ইহা লম্বায় দশ হাত। গুণরজ্জু, কাপাশরজ্জু, মুঞ্জরজ্জু, পশু বিশেষের স্নায়ু বা আকন্দ ত্বকের সূত্র ও চর্ম বিশেষের সূক্ষ্ম ৩০ গাছি তন্তু একত্র ভাল ভাবে পাক দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। পাশাস্ত্রের ক্রিয়া এইরূপ—যুদ্ধকালে এই পাশ কক্ষ প্রদেশে প্রয়োগের সময় কুণ্ডলাকৃতি করে মস্তকের উপর একবার ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করতে হয়। এদ্বারা শত্রুকে ইচ্ছানুরূপ বেঁধে নিজের কাছে আকর্ষণ করা যায় এবং পরে কৃপাণ দ্বারা বধ করা হয়। এই পাশ প্রয়োগের তিন প্রকার গতি আছে—বলগণ, প্রবন ও পত্রজন। এই সকল গতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ বন্ধন করে নিকটে আনা যায়।

পাশুপত—মহাদেবের অমোঘ অস্ত্র ত্রিশূল।

প্রাস—ক্ষেপণাস্ত্র। প্রাসের আকৃতি এইরূপ—সাত হাত লম্বা বংশাদি দণ্ড, তার মাথায় লোহার তীক্ষ্ণ ফলক, মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা, ফলকের নীচে ও মূলে রেশম স্তবকে সুশোভিত। এর চার রকম ব্যবহারের নিয়ম—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন (অর্থাৎ ইতস্ততঃ পরিচালন) ও পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ।

বজ্র—ইন্দ্রের অস্ত্র বিশেষ। চলিত ভাষায় বাজ।

বজ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে আছে: বিশ্বকর্মা রবিকে ভ্রমিযন্ত্রে ভ্রমণ করিয়ে তাঁর তেজ পৃথক করেছিলেন। এই সহস্র কিরণযুক্ত সূর্যতেজ বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল এবং ইন্দ্রের বজ্ররূপে পরিণত হয়েছিল। বামন পুরাণে আছে একবার ইন্দ্র দৈত্যমাতার উদরে প্রবেশ করে দেখেন, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত রেখে ঊর্ধ্বমুখে আছে, তার কাছে এক মাংসপেশী আছে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে যেমন ঐ মাংশপেশী মর্দন করতে লাগলেন, তখন তা খুব কঠিন হতে ও নীচে বেড়ে যেতে লাগল। পরে ঐ মাংসপেশী হতে কুলিশ উৎপন্ন হল। ভাগবতে আছে—ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধের জন্য দধিচী মুনির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্মাকে বজ্র নির্মাণ করতে আদেশ দেন। বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের আদেশে দধিচী মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র তৈরী করেন।

বরুণ বাণ—বারিবর্ষণকারী ক্ষেপক অস্ত্র। যে বাণ নিক্ষেপ করলে চতুর্দিক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে প্রবল বেগে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়।

বাণ—রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। ইহা ধনুতে জ্যা রোপিত করিয়া শত্রুর উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতে হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন নামের বাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিজয় ধনু—কর্ণের ধনু। এই ধনু দ্বারা ইন্দ্র দৈত্যদের জয় করেছিলেন। এই ধনু ইন্দ্র পরশুরামকে দান করেন এবং এই ধনু দিয়ে পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী জয় করেছিলেন।

বৈষ্ণবাস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নরককে বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসুরের কাছ থেকে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন। জগতে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহ নাই। মহাভারত যুদ্ধে ভগদত্ত এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে শ্রীকৃষ্ণ এই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করেন এবং তা বৈজয়ন্তীমালারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষলগ্ন হয়।

ব্যূহ—সৈন্য সমাবেশ, সৈন্যদলকে শৃঙ্খলাপূর্বক সজ্জিত করা। বিশেষ কৌশলে বিন্যস্ত সৈন্যসমূহ। সাধারণতঃ ব্যূহ ছয় প্রকার: বজ্র, মকর, শকট,

শ্যেন, সর্বতোভদ্র এবং সূচী বা সূচীমুখ। পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বজ্রব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন। মহাভারতে উল্লিখিত অন্যান্য ব্যূহের নাম: অর্ধ-চন্দ্র, ক্রৌঞ্চারুণ, গারুড়, চক্র, চক্রশকট, পদ্ম, ব্যাস, মণ্ডল, শৃঙ্গাটক এবং সাগর।

ব্রহ্মশির অস্ত্র—ব্রহ্মতেজপূর্ণ অস্ত্র-বিশেষ। এই অস্ত্র দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাকে দান করেছিলেন। অর্জুনও এই অস্ত্র মহাদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন; কিন্তু দ্রোণ তাঁর পুত্রকে নিতান্ত বিপন্ন হলেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছিলেন। অশ্বত্থামাকে নিহত করবার জন্য অর্জুন, ভীম ও যুধিষ্ঠির রথে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, অশ্বত্থামা ভয় পেয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তখন কালান্তক যমের মত অগ্নি উদ্গত হোল। তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জুন তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র মোচন করে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করতে চেষ্টা করেন। কারণ, অস্ত্র দ্বারাই অস্ত্র নিবারিত হয়। তাঁর অস্ত্র প্রলয়াগ্নির মত জ্বলে উঠল। তখন নারদ ও ব্যাস দুই জনকেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করতে বললেন। অর্জুন তখন ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রত্যাহার করলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা তা পারলেন না। ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রত্যাহার তার পক্ষে অসাধ্য। তখন তা পাণ্ডব নারীদের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হোল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমার মহাস্ত্র অব্যর্থ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশু মরবে। কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে দীর্ঘায়ু হবে (মহাভারত)।

ভল্ল—বর্শা বিশেষ। লম্বা যষ্টির মাথায় ফলক অস্ত্র। কার্য—নিক্ষেপে ছেদন, নিপাতন ও শায়িত করণ।

ভূষণ্ডী—পাষাণ-প্রক্ষেপক চর্মরজ্জুময় যন্ত্র। বৃহৎ পাথর অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, এমন লৌহগুলিকা ক্ষেপণ-যন্ত্র।

শঙ্খ—রণবাদ্যযন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র, অর্জুনের দেবদত্ত, নকুলের সুঘোষ, সহদেবের মনিপুষ্পক।

মুগুর বা মুদ্গর—বড় হাতুড়ি। ইহাও একপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ।

মুষল—ইহাও মুদ্গর জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র।

যষ্টি—লম্বা লাঠি বিশেষ। নানা প্রকার আয়ুর্বেদিক তৈলাদি দ্বারা মার্জিত। কঠিন অথচ বাঁকিয়া যায়, সহজে ভাঙে না। কার্য—পিটন ও কষাঘাত।

শতঘ্নী—একই সময়ে শত সৈন্য হননকারী বলে এই নাম। কণ্টকিত লৌহসার নির্মিত, মুদগর কল্প, সুদৃঢ় ও বর্তুল প্রমাণ চার হস্ত। মুঠযুক্ত, গদাযুদ্ধের বলগন অর্থাৎ প্রয়োগ-কালীন আস্ফালন যেরূপ এর বলগনও সেইরূপ।

শক্তি—প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র। ইহা অনধিক দুই হাত লম্বা, সিংহমুখাকৃতি, তীক্ষ্ণ

নখর ও জিহ্বাবিশিষ্ট। মুঠা করে ধরবার জন্য খুব বড় হাতল-বিশিষ্ট; ঘণ্টানাদ দ্বারা ভয়জনক, শত্রু-রক্তে রঞ্জিতাঙ্গ অস্ত্র, তাতে বিজড়িত গাঢ় নীলবর্ণ। অত্যন্ত দূরগামিনী। তীর্যক গতিযুক্ত, পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমগিরিকেও বিদীর্ণ করতে সমর্থ। দেখতে অতি ভীষণ, ইহা দুই হাতে তুলে প্রেরণ করতে হয়।

শক্তিশেল—অশনি-তুল্য শক্তিশেল। শত্রুশোণিত-পায়ী অস্ত্র। ময়দানব নির্মিত অষ্টঘণ্টা-যুক্ত অস্ত্র। এই অস্ত্রে রাবণ লক্ষ্মণকে ভূপাতিত করেন।

সীর—প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। ইহা লাঙ্গলাস্ত্র। এর দুই স্থান বাঁকা ও শিখশূন্য। মূলাংশ ও মুখ লৌহবদ্ধ, সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ। এর কাজ—আকর্ষণ ও নিপাতন।

সুদর্শন চক্র—সুন্দরদর্শন তীক্ষ্ণতম ও অব্যর্থ চক্রাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ ইহা ব্যবহার করতেন।

হল—লাঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম ইহা নিজের প্রিয় অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন বলে তাঁর নাম ছিল হলধর বা হলায়ুধ।

বিবিধ

অধিপতি—

বরুণ—জলরাশি। বিষ্ণু—আদিত্য।
পাবক—বসুগণ। দক্ষ—প্রজাপতি।
বাসব—মরুদগণ। প্রহ্লাদ—দৈত্য ও মানব।
যম—পিতৃগণ। শিব—যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত।
হিমবান—শৈলবান। সাগর—নদীগণ।
চিত্ররথ—গন্ধর্ব। বাসুকি—নাগগণ।
তক্ষক—সর্প। ঐরাবত—গজ।
উচ্চৈঃশ্রবা—অশ্ব। গরুড়—পক্ষিগণ।
শার্দুল—মৃগগণ। প্লক্ষ—বনস্পতি।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী।

আদিত্য—দেবমাতৃকা অদিতির পুত্ররা সংখ্যায় ১২ জন। সূর্যের প্রতীক ১২ মাসের জন্য এই ১২টি নাম। আদিত্য, বরুণ, সূর্য, বেদাঙ্গ, ভানু, রবি, গাভস্তি, যম, স্বর্ণরেতা, দিবাকর, মিত্র ও বিষ্ণু।

ইন্দ্রহস্তী—ঐরাবত

ইন্দ্রঅস্ত্র—হ্লাদিনী, দম্ভোলি

ইন্দ্ররথ—ব্যোমযান

ইন্দ্রনগরী—অমরাবতী

ইন্দ্রঘোটক—উচ্চৈঃশ্রবা

ইন্দ্রসারথি—মাতলি

ইন্দ্রবন—নন্দন

ইন্দ্রপ্রাসাদ—বৈজয়ন্ত

ইন্দ্রপুত্র—জয়ন্ত

ওষুধি—মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, সন্ধানী। হিমালয়ের অব্যবহিত সুবর্ণময় ঋষভ পর্বত, নিকটে কৈলাস পর্বত। এই দুই পর্বতের মধ্যে সর্ব প্রকার ঔষধি বিশিষ্ট পর্বত। ইন্দ্রজিৎশরে মৃতপ্রায় বানরদের সঞ্জীবিত করবার জন্য হনুমান এই ঔষধি নিয়ে আসে।

কিম্পুরুষ—কুবেরের অনুচর, এরা কেহ কেহ মনুষ্যদেহ অশ্বমুখ আকার, কেহ কেহ অশ্বদেহ মনুষ্যমুখ।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ—যুদ্ধশেষে মাত্র দশ জন জীবিত ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাতজন—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি; কৌরব পক্ষে তিন জন—কৃপাচাচার্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা। ১৮ দিন ব্যাপী যুদ্ধ হয়েছিল।

কুমার—ব্রহ্মার চার মানসপুত্র। এঁরা প্রজা সৃষ্টি অস্বীকার করে চিরদিন কুমার ছিলেন। এঁদের নাম—সনৎকুমার, সনন্দ, সনক এবং সনাতন। পরে পঞ্চম পুত্র বিভুও এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

কালকেয়—কালকা গর্ভ-সম্ভূত মহাবিক্রমশালী ৬০,০০০ অসুর।

কুবেরের নাম—ত্র্যম্বকসখা, যক্ষরাজ, গুহ্যকেশ্বর, ধনদ, কিন্নরেশ, বিশ্রবণ, পৌলস্ত্য, নরবাহন, একপিঙ্গল।

কুবেরউদ্যান—চিত্ররথ।

কুবেরপুত্র—নলকুবর।

কুবের স্থান—কৈলাস।

কুবেরপুরী—অলকা।

কুবেররথ—পুষ্পক।

কুষ্মাণ্ড—এরা শিবের অনুচর। এক শ্রেণীর দানব।

গণদেবতা—গণদেবতা নয় শ্রেণীর। (১) আদিত্য ১২ জন।(২) বিশ্বদেব ১০ জন। (৩) বসু ৮ জন। (৪) তুষিত ৩৬ জন। (৫) আভাশ্বর ৬৪ জন। (৬) অনিল ৪৯ জন। (৭) মহারাজিক ২২০ জন। (৮) সাধ্য ১২ জন। (৯) রুদ্র ১১ জন। এই গণদেবতারা শিবের অনুচর। এঁদের নেতা গণেশ। এঁরা গণপর্বত কৈলাসে বাস করেন।

চিরজীবী—অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম।

দনুজ—দানব (কশ্যপ ও স্ত্রী দনুর গর্ভজাত)।

দর্শন—হিন্দু দর্শন ছয় ভাগে বিভক্ত। কপিলকৃত সাংখ্য, পাতঞ্জলিকৃত যোগ, কণাদকৃত বৈশেষিক, গৌতম কৃত ন্যায়, জৈমিনী কৃত পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা ও বেদব্যাস কৃত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত।

দায়ভাগ—উত্তরাধিকারের আইন। জীমূতবাহন এই আইন বাংলা দেশে প্রচলন করেন।

দেবগুরু—বৃহস্পতি।

দেবযোনি—(১) বিদ্যাধর—বিদ্যা-ধারণ করে যে। (২) অপ্সরা—জলে গমন করে যে। (৩) যক্ষ—এরা দেবতাদের পূজা করে, কুবের ইত্যাদি। (৪) রাক্ষস, রাক্ষসী—রক্ষা করা যায় এই অর্থ হতে, সুকেশ, মাল্যবান ইত্যাদি। (৫) গন্ধর্ব—এদের গান ধর্ম। (৬) কিন্নর—কুৎসিত নর, কিন্নর দুই প্রকার, এক প্রকারের মানুষের মত মুখ ও অশ্বের মত শরীর। অন্য প্রকারের অশ্বের মত মুখ ও মানুষের মত শরীর। (৭) পিশাচ—পিশিত (মাংস) ভোজন করে এরা। (৮) গুহ্যক—গোপন করে যে, মণিভদ্র প্রভৃতি।(৯) সিদ্ধ—সিদ্ধি করেছে যে। (১০) ভূত (ঐশ্বর্য) আছে এদের।

দৈত্যগুরু—শুক্রাচার্য।

দৈত্যনিসূদন—বিষ্ণু।

দৈত্যপতি—হিরণ্যকশিপু।

নক্ষত্র—সংখ্যায় ২৭টি; অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা; ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব-ভাদ্রপদ, উত্তর-ভাদ্রপদ, রেবতী।

নন্দী—শিবের অনুচর—করাল দর্শন, বামন, বিকটাকার, মুণ্ডিত মস্তক, ক্ষুদ্রবাহু, মহাবল।

নটরাজ—নৃত্যকলার উদ্ভাবক বলে মহাদেবের এক নাম নটরাজ। এঁর বিশ্ব ধ্বংসের সময়কার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। অন্য মতে উত্তেজক দ্রব্য পানের পর ইনি স্ত্রীর সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্যে রত হন। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চে।

নবগ্রহ—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।

নাগরাজ—বাসুকি। দক্ষ কন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপ। শেষ নাগ বা অনন্ত নাগ নামেও ইনি অভিহিত। এঁর ভগিনী জরৎকারু বা মনসা। সমুদ্রমন্থনকালে নাগরাজ বাসুকিকে দেবতা ও দৈত্যগণ মন্থনরজ্জু রূপে ব্যবহার করেন।

নারায়ণ—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। ইনি ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তির একতম ও সৃষ্টির পালক। এঁর শয্যা অনন্ত, স্ত্রী লক্ষ্মী, পুত্র কামদেব, ধাম বৈকুণ্ঠ, বাহন গরুড়। এঁর শঙ্খ পাঞ্চজন্য, চক্র সুদর্শন, গদা কৌমোদকী, ধনু শাজ, অসি নন্দক ও মণি কৌস্তুভ। ইনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহায্য করবার জন্য ও দানবদলনের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন।

নারায়ণের চতুর্ভুজ—পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমদকী গদা ও পদ্মপুষ্প।

পঞ্চকন্যা—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী—এই পাঁচ জন প্রাতে নিত্য স্মরণীয়া।

পঞ্চবট—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী।

পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

পঞ্চতীর্থ—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর।

পরলোক—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সত্যলোক, মহর্লোক, তপলোক ও জনলোক—এই সপ্ত দেবলোক।

পিতৃলোক—ব্রাহ্মণদের সোমপা, ক্ষত্রিয়গণের হবির্ভুজ, বৈশ্যদের আজ্যপা এবং শূদ্রগণের সুকালিন নামে পিতৃলোক।

পৌলস্ত্য—পুলস্তের বংশধর—কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ।

পুষ্পক—ব্যোমযান। হংসচালিত মহাবেগশালী বিমান। এই রথ কুবেরের সামগ্রী। ব্রহ্মা কুবেরকে উপহার দিয়েছিলেন। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে পুষ্পক রথ অধিকার করে। এতে রত্নময় বিহঙ্গ,

স্বর্ণময় ভুজঙ্গ এবং প্রাণময় তুরঙ্গ শোভিত ছিল। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত বক্র। এতে পুষ্প খচিত ছিল। পদ্মপরাগ মণ্ডিত ও শুণ্ডে পদ্মপত্র শোভিত হস্তী ছিল। কোথাও বা পদ্মের উপর কমলা পদ্মহস্তে বিরাজমান। এই রথ আরোহীদের ইচ্ছা অনুসারে ও ইচ্ছানুরূপ স্থানে চালিত হোত। রাত্রিচর ভূতগণ এই পুষ্পক বহন করতো। এই রথ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত।

পৌলমী—পুলমার কন্যা, ইন্দ্র-পত্নী শচী।

বুদ্ধ—ভগবানের দশাবতারের নবম অবতার। জীবহিংসা নিরোধ ও জীবে প্রেম বিতরণের জন্য ভগবান খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৭ অব্দে) নেপালের কপিলাবস্তু নগরে গৌতম বুদ্ধ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্যবংশীয় নায়ক। এঁর মাতার নাম ছিল মায়া দেবী। এঁর স্ত্রীর নাম ছিল যশোধরা বা গোপা। বুদ্ধের পিতৃদত্ত নাম ছিল সিদ্ধার্থ। গৌতম গোত্রীয় বলে তাঁর এক নাম ছিল গৌতম এবং শাক্যবংশীয় বলে তাঁর আর এক নাম ছিল শাক্য সিংহ। তিনি "তথা" বা পরম অবস্থানে গত হয়েছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম হল তথাগত। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৮৭ অব্দে আশী বৎসর বয়সে বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার কুশী নগরে এঁর দেহান্তর বা "পরিনির্বাণ" হয়।

বালকৃষ্ণ—এঁর দেহকান্তি বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায়, নেত্র রক্তপদ্মের তুল্য এবং ইনি বালবেশে পদ্মের উপর নৃত্যরত। ইঁহার পদে ও কটিদেশে শব্দায়মান নূপুর ও কিঙ্কিনী, এক হস্তে নবনীত ও অন্য হস্তে পায়স বিদ্যমান। ইঁহার কণ্ঠদেশ ব্যাঘ্রনখালঙ্কারে অলঙ্কৃত। জগৎ-পূজ্য বালকরূপী কৃষ্ণ গো, গোপ ও গোপীগণে পরিবেষ্টিত।

বাসুদেব—বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

বাহন—

শিব—বৃষ। দুর্গা—সিংহ
কার্তিক—ময়ূর গণেশ—মূষিক
লক্ষ্মী—পেচক সরস্বতী—হংস
নারায়ণ—গরুড় অগ্নি—ছাগ
শীতলা—গর্দভ ষষ্ঠী—বিড়াল
নারদ—ঢেঁকি ইন্দ্র—মেষ, ঐরাবত

বিষ্ণুর অবতার—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ বা নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

বিষ্ণুচক্র—সুদর্শন।

বিষ্ণুশঙ্খ—পাঞ্চজন্য

বিষ্ণুগদা—কৌমদকী

বিষ্ণুখড়্গ—নন্দক

বিষ্ণুমণি—কৌস্তভ

ব্রহ্মার মানসপুত্র— জন—স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ, ঔত্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণ, দক্ষ-

সাবর্ণ, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য।

বিদেহী—বিদেহ রাজকন্যা সীতা।

বৈশ্রবণ—কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভিষণ।

বৈরোচন—বিরোচন-পুত্র দৈত্যরাজ বলি।

বৈশম্পায়ন—মহাভারত প্রবক্তা ব্যাসশিষ্য ঋষি।

ভুবনেশ্বরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপাদয়ত্রী, ও ত্রিজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্রী, আনন্দময়ী ভুবনেশ্বরী দেবী সর্বদা পদ্মের মূলাধারে বিরাজ করেন। ইনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও চন্দ্রে সর্বদা বিরাজমানা। ইনিই কামদেবের দেহবিনাশকারী শিবের প্রলয় শক্তির উৎস।

বিলম্বিত কেশ, মনোহর মুখমণ্ডল, স্বর্ণবর্ণা, সালাঙ্কারা চতুর্ভুজা দেবী হস্ত চতুষ্টয়ে জ্ঞানমুদ্রা, জপমালা, কলস ও পুস্তক ধারণ করেন। ইনি লক্ষ্মীস্বরূপা, অভয় ও বরদায়িনী।

মকর—শৃঙ্গবিশিষ্ট মৎস্য বিশেষ। গঙ্গার বাহন, কামদেবের ধ্বজ। দশমরাশি।

মন্বন্তর—ব্রহ্মার চতুর্দশ মানসপুত্রের এক এক জনের রাজত্ব কালের নাম এক মন্বন্তর। ৪,৩২০,০০০ বৎসর।

মহাকালী—শিব ও শক্তির সমন্বয়ে মহাশক্তির উৎপত্তি। যে শক্তির সঙ্গে মহাদেব সমন্বিত হয়ে মহাশক্তি সৃষ্টি করেন তিনিই হচ্ছেন মহাকালী। তন্ত্রসাধকদের মতে এই দেবীর পাঁচটি মুখ। প্রতি মুখে তিনটি করিয়া নেত্র। ইনি অতীব রৌদ্রমূর্তি, দক্ষিণ ও বাম করে শক্তি শূল ধনু বাণ খড়্গ খোটক বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারিণী। ইনি সর্বালঙ্কার ভূষিতা।

মহাভারত—মহাভারতের এই কয়টি পর্ব—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্‌যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, শ্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ।

যাজ্ঞসেনী—যজ্ঞসেন অর্থাৎ দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদী।

যাস্ক—নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গকার।

রামায়ণ—রামায়ণের এই কয়টি কাণ্ড—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা, উত্তরা।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী—বিষ্ণু, নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তি। পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমদিক গদা এবং পদ্মপুষ্প—এই চার অস্ত্র যাঁর চতুর্ভুজে শোভা পায়।

শম্ভুক—রাম কর্তৃক নিহত শূদ্র মুনি।

ষোড়শ বিদ্যাদেবী—বিদ্যাদেবী বলতে আমরা সরস্বতী দেবীকেই বুঝি এবং সাধারণভাবে ইনি আমাদের নিকট বাণী, বীণাপাণি বাগ্দেবী, শুভ্রা, হংস-বাহনা প্রভৃতি নামে

সবিশেষ পরিচিতা। এই সুপরিচিতা দেবী সরস্বতী জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিশ্বরী। এই দেবী নানা স্থানে নানা নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। দেবীর বহু রূপ, বহু বাহন ও বহু লীলা। দেবী কখনো দ্বিভুজা, কখনো চতুর্ভুজা, আবার প্রয়োজন বোধে কখনো বা ষোড়শভুজা। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রানুসারে এই দেবীকে সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত ষোড়শ বিদ্যাদেবী রূপে দেখা যায়। বিদ্যাদেবীগণের সকলেরই মস্তকের উপর মন্দিরের মত উঁচু মুকুট। সকলেই ললিত মুদ্রাসনে আসীনা, একটি পা নীচু করিয়া রাখিয়াছেন আর একটি পা সম্মুখ দিকে গুটানো। সকলেইর দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি বরমুদ্রায় স্থাপিত, বামহস্ত যোড়া এবং উঁচুতে তোলা।

(১) রোহিণী—সরস্বতীর ষোড়শ নামের প্রথম নাম রোহিণী। ইহার বাহন জলচৌকি। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ ও বাম হস্ত চক্র। দেবীর অপর নাম 'অজিতবলা'।

(২) প্রজ্ঞপ্তী—সরস্বতীর দ্বিতীয় নাম প্রজ্ঞপ্তী। ইহার বাহন হংস। দেবী ষড়্ভুজা। হস্তে অসি, কুঠার, চন্দ্রহাস ও দর্পণ। দেবীর অপর নাম 'দুরিতারী'।

(৩) বজ্রশৃঙ্খলা—সরস্বতীর তৃতীয় নাম বজ্রশৃঙ্খলা। এই চতুর্ভুজা দেবীর বাহন হংস। হস্তে পরিঘ ও বৈষ্ণবাস্ত্র।

(৪) কুলিশাঙ্কুশা—সরস্বতীর চতুর্থ নাম কুলিশাঙ্কুশা। ইহার বাহন অশ্ব। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে অসি ও বাম হস্তে ভূষণ্ডী। দেবীর অন্যান্য নাম যথাক্রমে 'মনোবেগা', 'মনোগুপ্তি' ও 'শ্যামা'।

(৫) চক্রেশ্বরী—সরস্বতীর পঞ্চম নাম চক্রেশ্বরী। ইহার বাহন গরুড়। দেবী ষোড়শভুজা। উপর দক্ষিণ ও বাম হস্তে শতঘ্নী এবং ১০ হাত মুষ্টিবদ্ধ। দুই হাত কোলে স্থির ও দুই হাতে বরদান।

(৬) পুরুষদত্তা ভারতী—সরস্বতীর ষষ্ঠ নাম পুরুষদত্তা ভারতী। ইহার বাহন হস্তী। দেবী চতুর্ভুজা। দেবীর দক্ষিণ হস্তে চক্র ও বাম হস্তে শতঘ্নী। দেবীর মুখমণ্ডল চৌকা পুরুষাকৃতি। দেহগঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কোমর সিংহের মত সরু।

(৭) কালী—সরস্বতীর সপ্তম নাম কালী। এই কালী দশ মহাবিদ্যার কালী নহেন। ইহার বাহন বৃষ। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম হস্তে শতঘ্নী। দেবীর অপর নাম 'শান্তা'।

(৮) মহাকালী—সরস্বতীর অষ্টম নাম মহাকালী। ইনিও দশ মহাবিদ্যার মহাকালী নহেন। এই চতুর্ভুজা দেবীর কোন বাহন নাই। এঁর দক্ষিণ হস্তে যষ্টি ও বাম হস্তে শতঘ্নী। দেবীর অপর নাম 'অজিতা' ও 'সুরতারকা'।

(৯) গৌরী—সরস্বতীর নবম নাম গৌরী। ইহার বাহন বৃষ। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে মঙ্গল ঘট ও বাম হস্তে যষ্টি। দেবীর মস্তকের মন্দিরাকৃতি মুকুটের বাম পার্শ্বে চন্দ্র। দেবীর অপর নাম 'মানসী' ও 'অশোকা'।

(১০) গান্ধারী—সরস্বতীর দশম নাম গান্ধারী। এই চতুর্ভুজা দেবীর কোন বাহন নাই। দক্ষিণ হস্তে পরিখ ও বাম-হস্তে সীর। দেবীর অপর নাম 'চণ্ডা'।

(১১) সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা—সরস্বতীর একাদশ নাম সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা। ইহার বাহন বৃষ। দেবী অষ্টভুজা। দক্ষিণ হস্তে অসি, ত্রিশূল, ভল্ল ও বৈষ্ণবাস্ত্র এবং বাম হস্তে ব্রহ্মণীর অস্ত্র, তীর ও পাশ। মস্তকে মন্দিরাকৃতি বিরাট মুকুট। মুকুটের চতুর্দিকে অরণ্য। দেবীর অপর নাম 'জ্বালামালিনী' ও 'ভৃকুটী'।

(১২) মানবী—সরস্বতীর দ্বাদশ নাম মানবী। ইঁহার বাহন সর্প। চতুর্ভুজা দেবীর দুই হস্তে দর্পণ ও এক হস্তে যষ্টি, অপর হস্ত বরমুদ্রায় স্থাপিত। দেবীর অপর নাম 'অশোকা'।

(১৩) বৈরাট্যা—সরস্বতীর ত্রয়োদশ নাম বৈরাট্যা। ইঁহার বাহন সর্প। দেবী চতুর্ভুজা। দুই হস্তে বৈষ্ণবাস্ত্র ও সঙ্গে ভল্ল। দেবীর অপর নাম 'বৈরোটী'।

(১৪) অচ্ছুপ্তা—সরস্বতীর চতুর্দশ নাম অচ্ছুপ্তা। ইঁহার বাহন হংস। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে ভল্ল ও বাম হস্তে বিজয় ধনু। দেবীর অপর নাম 'অনন্তবতী' ও 'অঙ্কুশা'।

(১৫) মানসী—সরস্বতীর পঞ্চদশ নাম মানসী। ইঁহার বাহন সিংহ। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে ভল্ল ও কুঠার এবং বাম হস্তে দর্পণ ও বিজয় ধনু। দেবীর অপর নাম 'কন্দর্পা'।

(১৬) মহামানবী—সরস্বতীর ষোড়শ নাম মহামানবী। ইঁহার বাহন ময়ূর। চতুর্ভুজা দেবীর দক্ষিণ হস্তে ভল্ল ও বাম হস্তে চক্র। দেবীর অপর নাম 'নির্বাসী'।

সপ্তজিহ্ব—অগ্নির সাতটি জিহ্বার নাম—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা এবং প্রদীপ্তা।

সপ্তদ্বীপ—জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—সসাগরা পৃথিবীকে প্রাচীন আর্য ঋষিরা এই সাত মহাবিভাগে বিভক্ত করেন।

সন্তানক—স্বর্গের নন্দনকাননের পাঁচটি বৃক্ষের অন্যতম। স্বর্গের ফুল।

সপ্তপাতাল—তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল ও রসাতল। এই সাতটি অধোভুবন।

সপ্তরথী—দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি, কৃপাচার্য, অশ্বথামা ও দুর্যোধন—এঁরা একযোগে অভিমন্যুবধকারী সাত জন মহারথ।

সপ্তশতী—সাতশত শ্লোক হেতু এই নাম। চণ্ডিকা মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

সপ্তলোক বা স্বর্গ—ভু, ভূবঃ, স্ব, জন, মহঃ, তপ ও সত্য—পুরাণোক্ত এই সপ্তলোক।

সপ্ত সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল—পুরাণোক্ত এই সপ্ত সমুদ্র।

সপ্তর্ষি—মরিচী, অত্রি, অঙ্গীরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাতটি নামে খ্যাত সাতটি তারকা সাতটি ঋষি বলে প্রসিদ্ধ।

সিদ্ধগণ—এক শ্রেণীর দেবতাবিশেষ। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী আকাশে বাস করেন। এঁরা সংখ্যায় ৮৮,০০০।

সিদ্ধপিঠ—যে স্থানে লক্ষ বলি, কোটি সংখ্যক হোম এবং সেই পরিমিত জপ হয়েছে।

সব্যসাচী—অর্জুন, যিনি দুই হাতেই সমান ভাবে বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন। যাঁর দুই হাতেই সমান জোর।

সুধর্মা—স্বর্গের দেবসভা।

প্রমাণ-পঞ্জী

Coleman, Charles—Hindu Mythology

Gupte, G. A.—Hindu Holidays and Ceremonials

Keith, A. B.—Indian Mythology (Mythology of All Races, Vol.6)

Macdonnel, A.A.—Vedic Mythology

Moore, E.—Hindu Pantheon

Towney, C.H.—Ocean of Stories

Wilson,H.H—Vishnu Purana

Mackenzie, D.A.—Indian Myths and Legends

Thomas, P.—Epics, Myths and Legends of India

Cunningham—Ancient Geography of India

Max Muller—Sacred Books of the East

Max Muller—History of Ancient Sanskrit Literature

Max Muller—Chips from a German workshop

Weber—History of Indian Literature

Bloomfield—Religion of Veda

Dowson—Classical Dictionary of Hindu Mythology

H.H. Wilson—Rig Veda

Max Muller—Rig Veda

Macdonnel & Keith—Vedic Index of Names and Subjects

R.C. Dutt—A History of Civilization in Ancient India

B. G. Tilak—The Arctic home of the Vedas

A. C. Das—Rigvedic India

Griffiths—Hymns of Rig Veda

Dikshitkar—Pauranic Index (3 vols)

রাজশেখর বসু—মহাভারত

রাজশেখর বসু—রামায়ণ

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মহাভারত

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনী কোষ

নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—অভিধান

যোগেশচন্দ্র রায়—বাংলা শব্দকোষ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ

রমেশচন্দ্র দত্ত—বেদ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বেদবাণী

দুর্গাদাস লাহিড়ী—পৃথিবীর ইতিহাস (১ম খণ্ড, ভারতবর্ষ)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—যজ্ঞ কথা

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—মানবের আদি জন্মভূমি

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—বেদ প্রবেশিকা

অষ্টাদশ পুরাণ

উপপুরাণ

নাম-সূচী

নাম	পৃষ্ঠা
অ	
অংশ	১
অংশুমান	১
অক্রূর	১
অকম্পন	২
অগস্ত্য	২
অক্ষক্রীড়া	৪
অক্ষপাদ	৫
অক্ষয়	৫
অক্ষয় তৃতীয়া	৫
অক্ষৌহিণী	৫
অগ্নি	৫
অগ্নিবেশ্য	৭
অগ্নিকোণ	৭
অগ্নিবেশ	৭
অগ্নিদগ্ধ	৭
অগ্নিজিহ্বা	৭
অগ্নিজিহ্ব	৭
অগ্নিবর্ণ	৮
অগ্নিকুমার	৮
অগ্নিধ্র	৮
অগ্নিপুরাণ	৮
অগ্নিপরীক্ষা	৮
অঘাসুর	৯
অঘোর	৯
অঙ্গ	৯
অঙ্গদ	১০
অঙ্গারপর্ণ	১০
অঙ্গিরা	১১
অঙ্গিরসগণ	১১
অচ্যুত	১১
অজ	১১
অজাতশত্রু	১২
অজামিল	১২
অজমুখ	১২
অজিত	১৩
অণীমাণ্ডব্য	১৩
অর্জুন	১৪
অতিকায়	১৬
অতিবলা	১৬
অত্রি	১৬
অথর্ববেদ	১৭
অথর্বা	১৭
অঞ্জনা	১৭
অদিতি	১৭
অদৃশ্যন্তী	১৭
অদ্রিকা	১৮
অধিরথ	১৮
অর্ধনারীশ্বর	১৮
অনংশা	১৮
অনরণ্য	১৮
অনন্ত	১৮
অন্তরীক্ষ	১৯
অনু	১৯
অন্ধক	১৯
অন্ধক	২০
অনুশল্য	২০
অনসূয়া	২০
অয়োমুখী	২১
অনঙ্গ	২১
অনিরুদ্ধ	২১
অপর্ণা	২২
অপ্সরা	২২
অবতার	২৩
অভয়া	২৫
অভিমন্যু	২৫

নাম পৃষ্ঠা

অমরকণ্টক ... ২৬
অমরাবতী ... ২৬
অমাবসু ... ২৬
অম্বরীষ ... ২৬
অমোঘা ... ২৭
অম্বা ... ২৭
অম্বিকা ... ২৮
অম্বালিকা ... ২৮
অমৃত ... ২৮
অরিষ্ট ... ২৯
অরিষ্টনেমা ... ২৯
অরিষ্টনেমি ... ৩০
অযোধ্যা ... ৩০
অযোনিসম্ভবা ... ৩০
অরুন্ধতী ... ৩০
অরুণ ... ৩০
অরুণা ... ৩১
অলর্ক ... ৩১
অলকা ... ৩১
অলকানন্দা ... ৩১
অলক্ষ্মী ... ৩১
অলম্বুষ ... ৩২
অলম্বুষা ... ৩২
অলায়ুধ ... ৩২
অশ্বত্থামা ... ৩২
অশ্বমেধ ... ৩৪
অশ্বিনী ... ৩৪
অশ্মক ... ৩৫
অশ্বিনীকুমার ... ৩৫
অশ্বসেন ... ৩৫
অশ্বপতি ... ৩৬
অষ্টতারিণী ... ৩৬
অষ্টদিকপাল ... ৩৬
অষ্টদিগ্‌গজ ... ৩৬
অষ্টনাগ ... ৩৬
অষ্টনায়িকা ... ৩৬
অষ্টাদশ পুরাণ ... ৩৬
অষ্টাবক্র ... ৩৬
অষ্টক ... ৩৭
অষ্টবসু ... ৩৮
অস্থি ... ৩৮
অসুর ... ৩৮
অসমঞ্জ ... ৩৮
অসিতদেবল ... ৩৯
অসিক্নী ... ৩৯
অসিতলোমা ... ৩৯
অহল্যা ... ৪০

আ

আগমনী .. ৪০
আগ্নেয় ... ৪১
আগ্নেয়াস্ত্র ... ৪১
আদিপুরাণ .. ৪১
আদিত্য ... ৪১
আদ্যাশক্তি ... ৪১
আত্রেয়ী ... ৪১
আর্যাবর্ত ... ৪২
আয়ান ... ৪২
আয়োদধৌম্য ... ৪২
আয়ুর্বেদ ... ৪২
আরুণি ... ৪২
আরণ্যক ... ৪৩
আশ্রম ... ৪৩
আস্তিক ... ৪৩
আকৃতি ... ৪৪
আগ্নিমাঠর ... ৪৪
আপস্তম্ব ... ৪৪
আয়ু ... ৪৪
আহুক ... ৪৪

ই

ইক্ষ্বাকু ... ৪৪

নাম	পৃষ্ঠা
ইড়া ...	৪৫
ইন্দুমতী ...	৪৫
ইন্দ্র ...	৪৬
ইন্দ্রকীল ...	৫০
ইন্দ্রজিৎ ...	৫০
ইন্দ্রপ্রস্থ ...	৫১
ইন্দ্রধ্বজ ...	৫১
ইন্দ্রদ্যুম্ন ...	৫২
ইন্দ্রধনু ...	৫২
ইন্দ্র প্রমতি ...	৫২
ইন্দ্রপ্রমিতি ..	৫২
ইন্দ্রসেন ...	৫২
ইন্দ্রবর্মা ...	৫২
ইন্দ্রলোক ...	৫৩
ইন্দ্রসাবর্ণি ...	৫৩
ইন্দ্রসেনা ...	৫৩
ইন্দ্রাণী ...	৫৩
ইন্দ্রানুজ ...	৫৩
ইরা ...	৫৩
ইরাবান ...	৫৩
ইল ...	৫৪
ইলবিলা ...	৫৪
ইলা ...	৫৪
ইল্বল ...	৫৫
ইলাবৃত ...	৫৫
ঈ	
ঈশান ...	৫৫
ঈশানী ...	৫৫
ঈশানকোণ ...	৫৫
ঈর্ষা ...	৫৫
উ	
উগ্র ...	৫৬
উগ্রচণ্ডা ...	৫৬
উগ্রতারা ...	৫৬
উগ্রসেন ...	৫৬

নাম	পৃষ্ঠা
উচ্চৈঃশ্রবা ...	৫৭
উজ্জয়িনী ...	৫৭
উতঙ্ক ...	৫৭
উতথ্য ...	৫৯
উত্তর ...	৫৯
উত্তম ...	৫৯
উত্তমৌজা ...	৬০
উত্তর কুরু ...	৬০
উত্তরা ...	৬০
উদ্ধব ...	৬০
উদ্দালক ...	৬১
উত্তানপাদ ...	৬১
উপপ্লব্য ...	৬১
উপমন্যু ...	৬১
উপকীচক ...	৬২
উপবেদ ...	৬২
উপসুন্দ ...	৬৩
উপরিচর বসু ...	৬৩
উর্ব ...	৬৪
উর্বশী ...	৬৪
উমা ...	৬৬
উলূপী ...	৬৭
উলূক ..	৬৭
উশীনর ...	৬৮
উপনিষদ ...	৬৮
উপপুরাণ ...	৬৯
উশিজ ...	৬৯
ঊ	
ঊর্ধ্বরেতা ...	৬৯
ঊর্মিলা ...	৭০
ঊষা ...	৭০
ঊর্ব ...	৭১
ঋ	
ঋক্ ...	৭১
ঋক্ষ ...	৭১

নাম … পৃষ্ঠা

ঋক্ষরাজ … ৭১
ঋগ্‌বেদ .. ৭১
ঋচীক … ৭২
ঋতধ্বজ … ৭২
ঋতুপর্ণ … ৭২
ঋত্বিক … ৭৩
ঋভু … ৭৩
ঋষি … ৭৩
ঋষ্যমূক … ৭৪
ঋষ্যশৃঙ্গ … ৭৪
ঋক্ষরজা … ৭৫
ঋষভ … ৭৬

এ

একচক্রা … ৭৬
একজটা … ৭৬
একপর্ণা … ৭৬
এক পটলা … ৭৬
একদন্ত … ৭৬
একলব্য … ৭৬
একাক্ষ … ৭৭
একাম্নী .. ৭৮
একাদশতনু … ৭৮

ঐ

ঐতরেয় … ৭৮
ঐন্দ্রিলা … ৭৮
ঐরাবত … ৭৮
ঐলদিল … ৭৮
ঐলাবৃতবর্ষ … ৭৮

ও

ওঘবতী … ৭৯
ওম … ৮০

ঔ

ঔর্ব … ৮০

ক

কচ … ৮০

নাম … পৃষ্ঠা

কর্কোটক … ৮২
কর্দম … ৮২
কক্ষ .. ৮৩
কর্ণ … ৮৪
কর্ণিক … ৮৮
কত্তি … ৮৮
কণাদ … ৮৮
কন্দর্প … ৮৯
কণ্ব … ৯০
কণ্ডু … ৯০
কন্যাকুব্জ … ৯০
কন্দলী .. ৯১
কবন্ধ … ৯১
কপালী … ৯১
কঙ্ক … ৯২
কমলা … ৯২
কল্প … ৯২
কল্পসূত্র … ৯২
কল্পতরু … ৯৩
কলা … ৯৩
কলাবতী … ৯৩
কলি … ৯৩
কলিযুগ … ৯৩
কল্কী … ৯৪
কলিঙ্গ … ৯৪
কল্মাষপাদ … ৯৪
কশ্যপ … ৯৫
কংস … ৯৬
কংসবতী … ৯৭
কয়াধু … ৯৭
কপিঞ্জল … ৯৭
কপিল … ৯৭
কপিলা … ৯৮
কমলযোনি … ৯৮
কঠোপনিষদ … ৯৮

নাম		পৃষ্ঠা
ককুৎস্থ	...	৯৯
কহোড়	...	৯৯
কাত্যায়ন	..	১০০
কাত্যায়নী	...	১০০
কার্ত্তিকেয়	...	১০০
কাক্ষীবতী	...	১০১
কার্ত্তবীর্য	...	১০১
কাক্ষাবান	...	১০২
কাণ্ডষি	...	১০৩
কামদেব	...	১০৩
কামধেনু	...	১০৪
কামাক্ষ্যা	...	১০৪
কালকা	...	১০৪
কালকেতু	...	১০৪
কালকেয়	...	১০৪
কালনেমি	...	১০৫
কালপুরুষ	...	১০৫
কালভৈরব	...	১০৬
কালযবন	...	১০৬
কালিকাপুরাণ	...	১০৭
কালীয়	...	১০৭
কালী	...	১০৭
কাশ্যপ	...	১০৮
কাশিরাজ	...	১০৯
কাশ্যা	...	১০৯
কিন্নর	...	১০৯
কিম্পুরুষ	...	১১০
কিমিন্দম	...	১১০
কিরীটী	...	১১০
কির্মীর	...	১১০
কিরাত	...	১১০
কিষ্কিন্ধ্যা	...	১১০
কীচক	...	১১০
কুঞ্জর	...	১১১
কুৎস	...	১১১

নাম		পৃষ্ঠা
কুন্তী	...	১১১
কুন্তিভোজ	...	১১৫
কুবলাশ্ব	...	১১৫
কুবের	...	১১৬
কুব্জা	...	১১৬
কুমার	...	১১৭
কুম্ভী বা কুম্ভযোনি	...	১১৭
কুম্ভকর্ণ	...	১১৭
কুম্ভীনসী	...	১১৮
কুষ্মাণ্ড		১১৯
কূর্ম	...	১১৯
কুরু	...	১১৯
কুরুক্ষেত্র	..	১১৯
কুশ	...	১২০
কুশনাভ	...	১২০
কুশধ্বজ	...	১২১
কুশিক	...	১২১
কুৎস	...	১২১
কৃতবীর্য	...	১২১
কৃতবর্ম্মা	...	১২২
কৃত্তিকা	...	১২২
কৃপ	...	১২২
কৃপী	...	১২৩
কৃষ্ণ	...	১২৩
কৃষ্ণা	...	১২৮
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন	...	১২৮
কেকয়	...	১৩০
কেতু	...	১৩০
কেতুধর্ম্মা	...	১৩০
কেতুমতি	...	১৩০
কেতুমান	...	১৩০
কেশব	...	১৩০
কেশরী	...	১৩০
কেশিনী	...	১৩১
কেশী	...	১৩১

নাম … পৃষ্ঠা

কৃশাশ্ব … ১৩১
কৈকেয়ী … ১৩১
কৈকসী … ১৩২
কৈটভ … ১৩২
কৈলাস … ১৩৩
কোজাগর … ১৩৩
কোশল … ১৩৩
কৌন্তেয় … ১৫৩
কৌমোদকী … ১৩৩
কৌরব … ১৩৩
কৌরব্য … ১৩৩
কৌশল্যা … ১৩৩
কৌশিক … ১৩৪
কৌশিকী … ১৩৫
কৌস্তুভ … ১৩৫
ক্রতু … ১৩৫
ক্রোধ … ১৩৫
ক্রোধবশা … ১৩৫
ক্ষমা … ১৩৫

খ

খগম … ১৩৫
খট্টাঙ্গ … ১৩৬
খর … ১৩৬
খসা … ১৩৬
খ্যাতি … ১৩৬
খাণ্ডবদাহ … ১৩৬

গ

গঙ্গা … ১৩৭
গঙ্গাজ … ১৪১
গঙ্গাধর … ১৪১
গদ … ১৪১
গার্গী … ১৪১
গর্গ্য … ১৪২
গার্গ্য … ১৪২
গজকচ্ছপ … ১৪২

নাম … পৃষ্ঠা

গজাসুর … ১৪৩
গণ … ১৪৩
গণ-দেবতা … ১৪৩
গণেশ … ১৪৩
গদাধর … ১৪৫
গন্ধমাদন … ১৪৫
গন্ধর্ব … ১৪৬
গন্ধর্ববেদ … ১৪৭
গন্ধর্বলোক … ১৪৭
গন্ধবতী … ১৪৭
গয় … ১৪৭
গরুড় … ১৪৮
গরুড়পুরাণ … ১৫১
গায়ত্রী … ১৫১
গাধি … ১৫১
গাঙ্গেয় … ১৫১
গান্ধার … ১৫১
গান্ধিনী … ১৫১
গান্ধারী … ১৫২
গালব … ১৫৪
গাণ্ডীব … ১৫৫
গিরিকা … ১৫৬
গিরিজা … ১৫৭
গিরিব্রজ … ১৫৭
গীতা … ১৫৭
গুড়াকেশ … ১৫৭
গুণকেশী … ১৫৭
গুণবতী … ১৫৮
গুহক বা গুহ … ১৫৮
গুহ্যক … ১৫৮
গোপালী … ১৫৯
গোতম … ১৫৯
গোকুল … ১৫৯
গোতমী … ১৫৯
গোবর্ধন … ১৫৯

নাম … পৃষ্ঠা

গোলোক … ১৫৯
গৌতম … ১৬০
গৌতমী … ১৬১
গৌরমুখ … ১৬২
গৌরী … ১৬২
গ্রন্থিক … ১৬৩

ঘ

ঘটোৎকচ … ১৬৩
ঘটোৎভব … ১৬৩
ঘণ্টাকর্ণ … ১৬৩
ঘৃতাচী … ১৬৪
ঘোষযাত্রা … ১৬৫
ঘোষা … ১৬৫

চ

চ্যবন … ১৬৫
চতুরাশ্রম … ১৬৮
চতুর্মুখ … ১৬৮
চতুর্যুগ … ১৬৮
চতুর্বর্ণ … ১৬৮
চতুর্বেদ … ১৬৮
চণ্ডী … ১৬৮
চণ্ড … ১৬৮
চণ্ডনায়িকা … ১৬৯
চণ্ডকৌশিক … ১৬৯
চন্দ্র … ১৬৯
চন্দ্রকেতু … ১৭০
চন্দ্রবংশ … ১৭০
চন্দ্রভানু … ১৭০
চন্দ্রলেখা … ১৭০
চন্দ্রাবলী … ১৭০
চন্দ্রভাগা … ১৭০
চন্দ্রহাস … ১৭০
চরক … ১৭০
চক্র … ১৭০
চক্রব্যূহ … ১৭২
চম্পকারণ্য … ১৭২
চম্পা … ১৭২
চার্বাক … ১৭২
চর্মণ্বতী … ১৭২
চামুণ্ডা … ১৭২
চিকুর … ১৭২
চিত্রকেতু … ১৭৩
চিত্রকূট … ১৭৩
চিত্রগুপ্ত … ১৭৩
চিত্রভানু … ১৭৩
চিত্ররথ … ১৭৩
চিত্রলেখা … ১৭৪
চিত্রশিখণ্ডী … ১৭৪
চিত্রসেন … ১৭৪
চিত্রাঙ্গদ … ১৭৫
চিত্রাঙ্গদা … ১৭৫
চিরঞ্জীবী … ১৭৬

ছ

ছায়া … ১৭৬
ছিন্নমস্তা … ১৭৭

জ

জগদ্ধাত্রী … ১৭৭
জগন্নাথ … ১৭৭
জটাধর … ১৭৮
জটায়ু … ১৭৮
জটাসুর … ১৭৯
জটিলা … ১৭৯
জড়ভরত … ১৭৯
জতুগৃহ … ১৮০
জনক … ১৮১
জনক-বংশ … ১৮১
জনমেজয় … ১৮১
জনা … ১৮৩
জনার্দন … ১৮৩
জবালা … ১৮৩

নাম পৃষ্ঠা

জমদগ্নি ... ১৮৩
জয় ও বিজয় ... ১৮৫
জয়সেন ... ১৮৫
জয়দ্রথ ... ১৮৫
জয়ধ্বজ ... ১৮৭
জয়ন্ত ... ১৮৭
জয়ন্তী ... ১৮৭
জয়া ... ১৮৭
জরৎকারু ... ১৮৭
জরা ... ১৮৯
জরাসন্ধ ... ১৮৯
জলন্ধর ... ১৯০
জম্ভ ... ১৯১
জম্ভ ... ১৯১
জম্বুমালী ... ১৯১
জম্বুদ্বীপ ... ১৯১
জহ্নু ... ১৯২
জহ্নু কন্যা ... ১৯২
জানপদী ... ১৯২
জাজলি ... ১৯২
জাবালি ... ১৯৩
জামদগ্ন্য ... ১৯৩
জারিতা ... ১৯৪
জাম্ববান ... ১৯৪
জাম্ববতী ... ১৯৪
জাম্বুমালী ... ১৯৫
জাহ্নবী ... ১৯৫
জিষ্ণু ... ১৯৫
জীমূত ... ১৯৫
জীমূতবাহন ... ১৯৫
জৃম্ভিক ... ১৯৫
জৈগীষব্য ... ১৯৫
জৈমিনী ... ১৯৬
জ্বর ... ১৯৬
জ্যামঘ ... ১৯৬

নাম পৃষ্ঠা

ড

ডাকিনী ... ১৯৭
ডিম্বক ... ১৯৭
ডুণ্ডুভ ... ১৯৭

ত

তন্ত্র ... ১৯৮
তক্ষ ... ১৯৯
তক্ষক ... ১৯৯
তক্ষশীলা ... ২০০
তন্তিপাল ... ২০০
তপতী ... ২০১
তমসা ... ২০১
তরণীসেন ... ২০১
তাড়কা ... ২০১
তামস ... ২০২
তামসী ... ২০২
তারকাক্ষ ... ২০২
তারকাসুর ... ২০২
তারা ... ২০৩
তিলোত্তমা ... ২০৪
তুলসী ... ২০৫
তুলাধার ... ২০৬
তুর্বসু ... ২০৬
তুণ্ডুক ... ২০৬
তৃণাবর্ত ... ২০৭
তৈত্তিরীয় ... ২০৭
ত্রিকূট ... ২০৭
ত্রিজট ... ২০৭
ত্রিজটা ... ২০৮
ত্রিত ... ২০৮
ত্রিপুর ... ২০৯
ত্রিপুরারি ... ২১০
ত্রিপাদ ... ২১০
ত্রিমূর্তি ... ২১০
ত্রিলোচন ... ২১০

নাম ... পৃষ্ঠা
ত্রিশির ... ২১০
ত্রিশিরা ... ২১০
ত্রিশঙ্কু ... ২১১
ত্রেতাযুগ ... ২১৩
ত্র্যম্বক ... ২১৩

দ

দক্ষ ... ২১৩
দক্ষ সাবর্ণি ... ২১৫
দগ্ধরথ ... ২১৫
দত্তাত্রেয় ... ২১৫
দধীচি ... ২১৬
দধিমুখ ... ২১৭
দনু ... ২১৭
দন্তবক্র ... ২১৭
দণ্ডকারণ্য ... ২১৭
দণ্ডপানি ... ২১৭
দণ্ডী ... ২১৭
দম ... ২১৮
দমন ... ২১৮
দমঘোষ ... ২১৮
দম্ভোদ্ভব ... ২১৮
দময়ন্তী ... ২১৯
দশমহ বিদ্যা ... ২২২
দল ... ২২২
দশরথ ... ২২৩
দশদিক্পাল ... ২২৩
দশানন ... ২২৪
দশাবতার ... ২২৪
দশহরা ... ২২৪
দশাশ্বমেধ ... ২২৪
দংশ ... ২২৪
দানব ... ২২৫
দাক্ষায়ণী ... ২২৫
দ্বারক ... ২২৫
দ্বাপর ... ২২৫
নাম ... পৃষ্ঠা
দ্বারকা ... ২২৫
দিগ্‌গজ ... ২২৬
দিতি ... ২২৬
দিবোদাস ... ২২৭
দিলীপ ... ২২৮
দীর্ঘতমা ... ২২৮
দীর্ঘরোমা ... ২২৯
দুর্গা ... ২২৯
দুন্দুভি ... ২৩০
দুর্বাসা ... ২৩০
দুর্মুখ ... ২৩১
দুর্যোধন ... ২৩১
দূষণ ... ২৩৬
দুষ্মন্ত ... ২৩৬
দ্যু ... ২৩৭
দ্যুমৎসেন ... ২৩৮
দ্রুহ্য ... ২৩৮
দ্রুপদ ... ২৩৮
দুঃশলা ... ২৩৯
দুঃশাসন ... ২৩৯
দেবকী ... ২৪০
দেবতা ... ২৪০
দেববর্ণিনী ... ২৪১
দেবযানী ... ২৪১
দেবযোনি ... ২৪৩
দেবরাত ... ২৪৩
দেবল ... ২৪৪
দেবর্ষি ... ২৪৪
দেবসেনা ... ২৪৪
দেবহুতি ... ২৪৪
দেবব্রত ... ২৪৪
দেবী ... ২৪৪
দৈত্য ... ২৪৫
দৈত্যসেনা ... ২৪৫
দ্বৈতবন ... ২৪৫

নাম পৃষ্ঠা

দ্বৈপায়ন ... ২৪৫
দ্রোণ ... ২৪৬
দ্যৌ ... ২৪৮
দ্রৌপদী ... ২৪৮

ধ

ধনপতি ... ২৫৩
ধন্বন্তরী ... ২৫৩
ধর্ম ... ২৫৪
ধর্মধ্বজ ... ২৫৪
ধনঞ্জয় ... ২৫৫
ধর্মপুত্র ... ২৫৫
ধর্মব্যাধ ... ২৫৫
ধর্মব্রতা ... ২৫৭
ধর্মশাস্ত্র ... ২৫৭
ধর্মরথ ... ২৫৮
ধর্মরাজ ... ২৫৮
ধর্ম সাবর্ণি ... ২৫৮
ধাতৃ ... ২৫৮
ধূম্রবর্ণ ... ২৫৮
ধুমাবতী ... ২৫৯
ধুন্ধু ... ২৫৯
ধুন্ধুমার ... ২৫৯
ধুম্র ... ২৬০
ধুম্রলোচন ... ২৬০
ধুম্রাক্ষ ... ২৬০
ধৃতরাষ্ট্র ... ২৬০
ধৃতবর্মা ... ২৬৪
ধৃষ্টকেতু ... ২৬৪
ধৃষ্টদ্যুম্ন ... ২৬৪
ধেনুক ... ২৬৫
ধৌম্য ... ২৬৫
ধ্রুব ... ২৬৬

ন

নকুল ... ২৬৭
নগ্নজিৎ ... ২৬৯

নাম পৃষ্ঠা

নন্দ ... ২৬৯
নন্দন কানন ... ২৬৯
নন্দিনী ... ২৬৯
নন্দী ও ভৃঙ্গী ... ২৭০
নন্দী ... ২৭০
নন্দীশ্বর ... ২৭০
নন্দীগ্রাম ... ২৭০
নন্দীমুখ ... ২৭০
নবদুর্গা ... ২৭০
নভগ ... ২৭০
নমুচি ... ২৭০
নরক ... ২৭১
নর-নারায়ণ ... ২৭২
নরমেধ ... ২৭২
নরসিংহ ... ২৭৩
নল ... ২৭৩
নলকুবর ... ২৭৬
নহুষ ... ২৭৬
নবদুর্গা ... ২৭৭
নাগ ... ২৭৭
নাগপাশ ... ২৭৮
নাগলোক ... ২৭৮
নারদ ... ২৭৮
নারায়ণী সেনা ... ২৮০
নচিকেতা ... ২৮০
নায়িকা ... ২৮২
নিকষা ... ২৮২
নিকুম্ভ ... ২৮২
নিকুম্ভিলা ... ২৮২
নিবাতকবচ ... ২৮২
নিধি ... ২৮৩
নিমি ... ২৭৩
নিরুক্ত ... ২৮৪
নিশুম্ভ ... ২৮৪
নিষাদ ... ২৮৫

নাম ... পৃষ্ঠা
নীল ... ২৮৫
নীলকণ্ঠ ... ২৮৬
নীললোহিত .. ২৮৬
নৃগ ... ২৬৮
নৈমিষারণ্য ... ১৮৭

প

পঞ্চকন্যা ... ২৮৭
পঞ্চজন ... ১৮৭
পঞ্চবটী ... ২৮৭
পঞ্চবৃক্ষ ... ২৮৭
পঞ্চানন ... ২৮৭
পঞ্চলক্ষনা ... ২৮৭
পঞ্চশিখ ... ২৮৮
পর্জন্য ... ২৮৮
পর্ণাদ ... ২৮৮
পতঞ্জলি ... ২৮৮
পদ্মা ... ২৮৮
পবন ... ২৮৯
পম্পা ... ২৮৯
পরশুরাম ... ২৮৯
পরাবসু ... ২৯২
পরাশর ... ১৯৩
পরীক্ষিৎ ... ২৯৫
পশুপতি ... ২৯৭
পাকশাসন ... ২৯৭
পাঞ্চজন্য ... ২৯৭
পাঞ্চাল ... ২৯৭
পাঞ্চালী ... ২৯৭
পাণ্ডু ... ২৯৭
পাণ্ডব ... ২৯৮
পাণ্ড্যরাজ ... ২৯৮
পাতঞ্জলদর্শন ... ২৯৮
পাতাল ... ২৯৯
পাতালকেতু ... ২৯৯
পার্থ ... ৩০০

নাম ... পৃষ্ঠা
পার্বতী ... ৩০০
পারিজাত ... ৩০০
পাবক ... ৩০০
পাশুপত অস্ত্র ... ৩০০
পিতামহ ... ৩০১
পিতৃপুরুষ ... ৩০১
পিতৃগণ ... ৩০১
পীঠস্থান ... ৩০১
পিনাকপাণি ... ৩০১
পিপ্পলাদ ... ৩০১
পুঞ্জিকস্থলা ... ৩০১
পুণ্ড্র ... ৩০২
পিতৃলোক ... ৩০২
পিশাচ ... ৩০২
পীতাব্ধি ... ৩০২
পুণ্ডরীকাক্ষ ... ৩০৩
পুত ... ৩০৩
পুতনা ... ৩০৩
পুতঞ্জয় ... ৩০৩
পুরাণ ... ৩০৪
পূর্বমীমাংসা ... ৩০৮
পুরু ... ৩০৮
পুরুকুৎস ... ৩০৮
পুরূরবা . ৩০৯
পুরোচন ... ৩১০
পুলস্ত্য .. ৩১০
পুলহ ... ৩১১
পুলোমা বা পুলোমন ... ৩১১
পুলোমজা ... ৩১১
পুরুষোত্তম ... ৩১১
পুষ্কর ... ৩১১
পুষ্কল ... ৩১১
পুষ্পক ... ৩১২
পুষ্পদন্ত ... ৩১২
পুষ্পোৎকটা ... ৩১২

নাম পৃষ্ঠা

পূর্বচিত্তি ... ৩১২
পূষা ... ৩১২
পৃথা ... ৩১৩
পৃথু, পৃথি ... ৩১৩
পৃশ্নি ... ৩১৪
পৈল ... ৩১৪
পৌণ্ড্রক বাসুদেব ... ৩১৪
পৌরব ... ৩১৫
পৌলস্তী ... ৩১৫
পৌলস্ত্য ... ৩১৫
পৌলম ... ৩১৫
পৌষ্য ... ৩১৫
প্রচেতা ... ৩১৬
প্রজা ... ৩১৬
প্রজাপতি ... ৩১৬
প্রতর্দন ... ৩১৭
প্রতিবিন্ধ্য ... ৩১৭
প্রদ্বেষী ... ৩১৭
প্রদ্যুম্ন ... ৩১৭
প্রবীর ... ৩১৮
প্রভাস ... ৩১৮
প্রভাবতী ... ৩১৮
প্রমতি ... ৩১৯
প্রমথ ... ৩১৯
প্রমদ্বরা ... ৩১৯
প্রমীলা ... ৩১৯
প্রম্লোচ্চা ... ৩২০
প্রলম্ব ... ৩২০
প্রলয় ... ৩২০
প্রসূতি ... ৩২০
প্রসেনজিৎ ... ৩২০
প্রহ্লাদ ... ৩২১
প্রহস্ত ... ৩২২
প্রিয়ব্রত ... ৩২২

নাম পৃষ্ঠা

ব

বক ... ৩২২
বকাসুর ... ৩২৩
বগলা ... ৩২৩
বঙ্গ ... ৩২৩
বজ্র ... ৩২৩
বজ্রকেতু ... ৩২৪
বজ্রজ্বালা ... ৩২৪
বজ্রদংষ্ট্র ... ৩২৪
বজ্রদত্ত ... ৩২৪
বজ্রনাভ ... ৩২৪
বজ্রপাণি ... ৩২৫
বজ্রবায়ক ... ৩২৫
বড়বামুখ ... ৩২৫
বৎসাসুর ... ৩২৫
বড়বানল ... ৩২৫
বর্ণাশ্রম ... ৩২৬
বদরিকাশ্রম ... ৩২৬
বধূসরা ... ৩২৬
বন্দী ... ৩২৬
বপুষ্টমা ... ৩২৭
বভ্রু ... ৩২৭
বভ্রুবাহন ... ৩২৭
বরুণ ... ৩২৮
বরাহ ... ৩২৯
বর্চা ... ৩২৯
বর্গা ... ৩৩০
বলরাম ... ৩৩০
বল্লভ ... ৩৩২
বলি ... ৩৩২
বরদা ... ৩৩২
বশিষ্ঠ ... ৩৩৩
বর্ষ ... ৩৩৫
বসু ... ৩৩৫

নাম		পৃষ্ঠা	নাম		পৃষ্ঠা
বসুদেব	...	৩৩৭	বিদ্যুৎকেশ	...	৩৫১
বসুধারা	...	৩৩৭	বিদ্যুৎজিহ্ব	...	৩৫১
বসুমনা	..	৩৩৭	বিদ্যুন্মালী	...	৩৫১
বসুমতী	..	৩৩৮	বিধাতা	...	৩৫২
বসুষেণ	...	৩৩৮	বিনতা	...	৩৫২
বৎসাসুর	...	৩৩৮	বিনায়ক	...	৩৫৩
বাজশ্রবা	...	৩৩৮	বিন্ধ্য	...	৩৫৩
বাণ	...	৩৩৯	বিপ্রচিত্তি	...	৩৫৩
বাতাপি	..	৩৩৯	বিপাশা	...	৩৫৪
বানপ্রস্থ	...	৩৪০	বিভাণ্ডক	...	৩৫৪
বামন	...	৩৪০	বিভাবসু	...	৩৫৪
বারুণী	...	৩৪১	বিভীষণ	...	৩৫৪
বারণাবত	...	৩৪১	বিবস্বান	...	৩৫৫
বালখিল্য ঋষি	...	৩৪১	বিরজা	...	৩৫৬
বাল্মীকি	...	৩৪২	বিরাটরাজ	...	৩৫৬
বালী	...	৩৪৩	বিরাধ	...	৩৫৭
বাসুদেব	...	৩৪৫	বিরূপাক্ষ	...	৩৫৮
বাসুকি	...	৩৪৫	বিরোচন	...	৩৫৮
বাসন্তী	...	৩৪৫	বিশাখ	..	৩৫৮
বাস্কল	...	৩৪৬	বিশল্যকরণী	...	৩৫৮
বাহন	...	৩৪৬	বিশ্বকর্মা	...	৩৫৯
বাহ্লিক	...	৩৪৬	বিশ্বদেব	...	৩৫৯
বাহুক	...	৩৪৬	বিশ্বাবসু	...	৩৬০
বায়ু	...	৩৪৬	বিশ্বামিত্র	...	৩৬০
বিকর্ণ	...	৩৪৭	বিশ্বরূপ	...	৩৬৪
বিকর্তন	...	৩৪৭	বিশ্রবা	...	৩৬৪
বিকুক্ষি	...	৩৪৭	বিষ্ণু	..	৩৬৫
বিচিত্রবীর্য	...	৩৪৭	বিষ্ণুযশা	...	৩৬৬
বিজয়	...	৩৪৮	বীতহব্য	...	৩৬৬
বিজয়া	...	৩৪৮	বীরণ	...	৩৬৬
বিদেহ	...	৩৪৮	বীরভদ্র	...	৩৬৬
বিদুর	...	৩৪৮	বুধ	...	৩৬৭
বিদুলা	..	৩৫০	বৃকোদর	...	৩৬৮
বিদর্ভ	..	৩৫১	ব্যুষিতাশ্ব	...	৩৬৮
বিদ্যাধর এবং বিদ্যাধরী	...	৩৫১	বৃত্র	...	৩৬৮

নাম ... পৃষ্ঠা
বৃত্রঘ্ন ... ৩৭০
বৃন্দা ... ৩৭০
বৃন্দাবন ... ৩৭১
বৃষকেতু ... ৩৭১
বৃষপর্বা ... ৩৭১
বৃষসেন ... ৩৭১
বৃহদারণ্যক ... ৩৭১
বৃহন্নলা ... ৩৭২
বৃহস্পতি ... ৩৭২
বৃহদ্দেবতা ... ৩৭৪
বেতাল ... ৩৭৪
বেদ ... ৩৭৪
বেদবতী ... ৩৭৫
বেদব্যাস ... ৩৭৬
বেদাঙ্গ ... ৩৭৮
বেদান্ত ... ৩৭৯
বেণ ... ৩৭৯
বৈকর্তন ... ৩৮০
বৈকুণ্ঠ ... ৩৮০
বৈনতেয় ... ৩৮০
বৈজয়ন্ত ... ৩৮০
বৈবস্বত ... ৩৮০
বৈতরণী ... ৩৮০
বৈদেহ ... ৩৮০
বৈশেষিক দর্শন ... ৩৮১
বৈশ্বানর ... ৩৮১
বৈষ্ণবী ... ৩৮১
বৈশম্পায়ন ... ৩৮১
বৈশ্রবণ ... ৩৮১
ব্যোমকেশ ... ৩৮২
ব্রজ ... ৩৮২
ব্রহ্ম ... ৩৮২
ব্রহ্মণস্পতি ... ৩৮২
ব্রহ্মদত্ত ... ৩৮২
ব্রহ্মর্ষি .. ৩৮৩
নাম ... পৃষ্ঠা
ব্রহ্মা ... ৩৮৩
ব্রাহ্মণ ... ৩৮৩

ভ

ভগদত্ত ... ৩৮৪
ভগবতী ... ৩৮৪
ভগবৎ পুরাণ ... ৩৮৪
ভগীরথ ... ৩৮৪
ভঙ্গাশ্বন ... ৩৮৫
ভদ্রকালী ... ৩৮৬
ভবিষ্যপুরাণ ... ৩৮৭
ভরত ... ৩৮৭
ভরদ্বাজ ... ৩৮৮
ভানুমতী ... ৩৮৯
ভার্গব ... ৩৯০
ভীম ... ৩৯০
ভীমা ... ৩৯৪
ভীষ্ম ... ৩৯৪
ভীষ্মক ... ৪০০
ভুবর্লোক ... ৪০০
ভূরিশ্রবা ... ৪০০
ভুশুণ্ডী ... ৪০০
ভৃগু ... ৪০১
ভৃঙ্গী ... ৪০২
ভৈরব ... ৪০২
ভৈরবী ... ৪০২
ভোগবতী ... ৪০৩

ম

মকর ... ৪০৩
মকরাক্ষ ... ৪০৩
মঙ্গলচণ্ডী ... ৪০৩
মণিগ্রীব ... ৪০৩
মণিমান ... ৪০৩
মণ্ডুক ... ৪০৪
মণ্ডুকরাজ ... ৪০৪
মতঙ্গ ... ৪০৪

পৃষ্ঠা নাম পৃষ্ঠা

মৎস্য অবতার ... ৪০৫
মৎস্যগন্ধা ... ৪০৬
মৎস্য ... ৪০৮
মৎস্যদেশ ... ৪০৮
মদ ... ৪০৮
মদন ... ৪০৮
মদয়ন্তী ... ৪০৯
মথুরা ... ৪১০
মদালসা ... ৪১০
মধু ... ৪১১
মধুকৈটভ ... ৪১২
মধুচ্ছন্দা ... ৪১২
মধুচ্ছন্দস ... ৪১২
মধুমতী ... ৪১২
মধুসূদন ... ৪১২
মনসা ... ৪১২
মন্থরা ... ৪১৪
মন্দপাল ... ৪১৪
মন্দর ... ৪১৪
মন্দাকিনী ... ৪১৫
মন্দোদরী ... ৪১৫
মন্বন্তর ... ৪১৫
মন্মথ ... ৪১৫
মনু ... ৪১৫
মনুসংহিতা ... ৪১৭
মনোরমা ... ৪১৮
ময়দানব ... ৪১৮
মরিচি ... ৪১৯
মরুৎ ... ৪১৯
মরুত্ত ... ৪২০
মহাকাল ... ৪২২
মহাদেব ... ৪২২
মহাপার্শ্ব ... ৪২৭
মহাপ্রলয় ... ৪২৭
মহাপুরাণ ... ৪২৭
মহাবিদ্যা ... ৪২৭
মহাভারত ... ৪২৭
মহাভিষ ... ৪২৮
মহারাজিক ... ৪২৮
মহাশ্বেতা ... ৪২৮
মহামায়া ... ৪২৮
মহিষমর্দিনী ... ৪২৮
মহিষ্মতী ... ৪২৯
মহিষাসুর ... ৪২৯
মহোদর ... ৪৩০
মাণ্ডকর্ণি ... ৪৩০
মাণ্ডবী ... ৪৩০
মাণ্ডব্য ... ৪৩১
মাতঙ্গী ... ৪৩১
মাতলী ... ৪৩১
মাণ্ডুকেয় ... ৪৩১
মাতৃকাগণ ... ৪৩১
মাদ্রী ... ৪৩১
মাধবী ... ৪৩২
মানসপুত্র ... ৪৩৩
মান্ধাতা ... ৪৩৪
মায়াবতী ... ৪৩৫
মায়াবী ... ৪৩৫
মায়াসীতা ... ৪৩৫
মারীচ ... ৪৩
মারিষা ... ৪৩৬
মার্কণ্ডেয় ... ৪৩৭
মার্তণ্ড ... ৪৩৭
মৃত্যু ... ৪৩৭
মালী ... ৪৩৮
মালিনী ... ৪৩৮
মাল্যবান ... ৪৩৮
মিত্রাবরুণ ... ৪৩৯
মিথি ... ৪৩৯
মিথিলা ... ৪৪০

নাম … পৃষ্ঠা

মুচুকুন্দ … ৪৪০
মুণ্ড … ৪৪০
মুদ্গল … ৪৪০
মূক … ৪৪১
মেঘনাদ … ৪৪১
মেনকা … ৪৪১
মেনা … ৪৪১
মেরু … ৪৪২
মেরু সাবর্ণ … ৪৪২
মৈত্রেয় … ৪৪২
মৈত্রেয়ী … ৪৪২
মৈথিলী … ৪৪৩
মৈনাক … ৪৪৩

য

যক্ষ … ৪৪৩
যজ্ঞ … ৪৪৪
যজুর্বেদ … ৪৪৪
যবক্রীত … ৪৪৫
যম … ৪৪৬
যম দ্বিতীয়া … ৪৪৯
যমী বা যমুনা … ৪৪৯
যমলার্জুন … ৪৪৯
যদু … ৪৫০
যযাতি … ৪৫০
যশোদা … ৪৫১
যাজ্ঞবল্ক্য … ৪৫২
যাজ্ঞসেনী … ৪৫৩
যাজ ও উপযাজ … ৪৫৩
যাতুধান … ৪৫৩
যাতুধানী … ৪৫৩
যাস্ক … ৪৫৫
যাদবী … ৪৫৫
যুধাজিৎ … ৪৫৫
যুধিষ্ঠির … ৪৫৫
যুবনাশ্ব … ৪৬২

নাম

যুযুৎসু
যোগ
যোগনিদ্রা … ৪৬২
যোগবাশিষ্ঠ … ৪৬৩
যোগমায়া … ৪৬৩
যোগিনী … ৪৬৩
যোজনগন্ধা … ৪৬৪
যোনী … ৪৬৪

র

রক্তবীজ … ৪৬৪
রক্ষরজা … ৪৬৪
রঘু … ৪৬৫
রজ … ৪৬৫
রজি … ৪৬৫
রতি … ৪৬৫
রত্নাকর … ৪৬৬
রন্তিদেব … ৪৬৭
রম্ভ … ৪৬৭
রম্ভা … ৪৬৭
রাকা … ৪৬৮
রাক্ষস … ৪৬৮
রাজসূয় … ৪৬৯
রাধা … ৪৬৯
রাধেয় … ৪৭১
রাবণ … ৪৭১
রামচন্দ্র … ৪৭৫
রামায়ণ … ৪৭৯
রাহু … ৪৭৯
রুক্মরথ … ৪৭৯
রুক্মিণী … ৪৮০
রুক্মী … ৪৮০
রুচি … ৪৮১
রুদ্র … ৪৮১
রুমা … ৪৮৩
রুদ্রসাবর্ণ … ৪৮৩

নাম … পৃষ্ঠা

রুরু … ৪৮৩
রেণুকা … ৪৮৪
রেবত … ৪৮৫
রেবতী … ৪৮৫
রেবন্ত … ৪৮৫
রৈবত … ৪৮৫
রৈবত মনু … ৪৮৬
রৈভ্য … ৪৮৬
রোদসী … ৪৮৬
রোমহর্ষণ … ৪৮৬
রোহিত … ৪৮৬
রোহিণী … ৪৮৭
রৌচ্য … ৪৮৭
রৌরব … ৪৮৭

ল

লক্ষ্মণ … ৪৮৭
লক্ষ্মণা … ৪৮৮
লক্ষ্মী … ৪৮৯
লঙ্কা … ৪৮৯
লব … ৪৮৯
লবণাসুর … ৪৯০
ললিতা … ৪৯০
লিঙ্গ … ৪৯১
লোক … ৪৯১
লোকপাল … ৪৯১
লোপামুদ্রা … ৪৯২
লোমপাদ … ৪৯৩
লোমশ … ৪৯৩
লোমহর্ষণ … ৪৯৩
লৌহিত্য … ৪৯৩
লোলা … ৪৯৪
লৌহভীম … ৪৯৪

শ

শকুনি … ৪৯৪
শকুন্তলা … ৪৯৪

নাম … পৃষ্ঠা

শক্তি … ৪৯৬
শক্তিশেল … ৪৯৬
শক্ত্রি … ৪৯৬
শঙ্কু … ৪৯৭
শঙ্কর … ৪৯৭
শঙ্খ … ৪৯৭
শঙ্খচূড় … ৪৯৭
শচী … ৪৯৮
শতক্রতু … ৪৯৮
শতদ্রু … ৪৯৮
শতধনু … ৪৯৯
শতধন্বা … ৪৯৯
শতপথব্রাহ্মণ · ৪৯৯
শতমুখ … ৫০০
শতরূপা … ৫০০
শতযূপ … ৫০০
শত্রুঘ্ন · ৫০০
শত্রুজিৎ … ৫০১
শতানন্দ · ০১
শতানীক ‥ ৫০১
শনি … ৫০১
শবর … ৫০২
শবরী … ৫০২
শবলাশ্ব … ৫০২
শমিতা … ৫০২
শমীক … ৫০২
শম্বর … ৫০৩
শম্বূক … ৫০৩
শর্মিষ্ঠা … ৫০৪
শর্বাণি … ৫০৫
শরদ্বান … ৫০৫
শরভঙ্গ … ৫০৫
শল … ৫০৬
শল্য … ৫০৬
শশবিন্দু … ৫০৬

নাম ... পৃষ্ঠা
শশাদ ... ৫০৭
শ্বফল্ক ... ৫০৭
শাকল্য ... ৫০৭
শাকম্ভরী ... ৫০৭
শাণ্ডিল্য ... ৫০৭
শান্তনু ... ৫০৭
শান্তা ... ৫০৯
শাম্ব ... ৫০৯
শালগ্রাম ... ৫০৯
শাল্ব ... ৫১০
শিখণ্ডী ... ৫১০
শিনি ... ৫১২
শিব ... ৫১২
শিবানী ... ৫১৩
শিলাদ ... ৫১৩
শিবি ... ৫১৩
শিশুপাল ... ৫১৪
শৃঙ্গবেরপুর ... ৫১৫
শিশুমার ... ৫১৫
শুক ... ৫১৫
শুকদেব ... ৫১৬
শুক্রাচার্য ... ৫১৭
শুনঃশেফ ... ৫১৯
শুম্ভ ৫২০
শূর্পনখা ... ৫২০
শৃঙ্গী ... ৫২১
শূরসেন ... ৫২১
শেষনাগ ... ৫২১
শৈলূষ ... ৫২২
শৈব্যা ... ৫২২
শৌনক ... ৫২২
শ্বেত ... ৫২২
শ্বেতকি ... ৫২৩
শ্বেতকেতু ... ৫২৪
শ্রীদাম ... ৫২৪

নাম ... পৃষ্ঠা
শ্রীবৎস ... ৫১০
শ্রীমদ্ভাগবত ... ৫২৫
শ্রুতকীর্তি ... ৫২৫
শ্রুতবর্মা ... ৫২৫
শ্রুতশ্রবা ... ৫২৬
শ্রুতসোম ... ৫২৬
শ্রুতসেন ... ৫২৬
শ্রুতায়ু ... ৫২৬
শ্রুতি ... ৫২৬
শ্রুতর্ষি ... ৫২৬
শ্রুবাবতী ... ৫২৬

ষ

ষট্‌কর্ম ... ৫২৭
ষষ্ঠী ... ৫২৭
ষড়্‌দর্শন ... ৫২৮
ষড়ঙ্গ ... ৫২৮
ষড়ানন ... ৫২৮
ষণ্ড ... ৫২৮
ষড়্‌ভূজা ... ৫২৮
ষোড়শী ... ৫২৮
ষোড়শ মাতৃকা ... ৫২৮

স

সংজ্ঞা ... ৫২৮
সংবরণ ... ৫২৯
সংবর্ত ... ৫৩০
সংশপ্তকগণ ... ৫৩১
সংহিতা ... ৫৩১
সংহ্রাদ ... ৫৩২
সগর ... ৫৩২
সঙ্কর্ষণ ... ৫৩৩
সঞ্জয় ... ৫৩৪
সঞ্জীবনী ... ৫৩৪
সতী ... ৫৩৪
সত্য ... ৫৩৬
সত্যক ... ৫৩৭

নাম … পৃষ্ঠা

সত্যকাম … ৫৩৭
সত্যবতী … ৫৩৭
সত্যবান … ৫৩৮
সত্যভামা … ৫৪০
সত্যযুগ … ৫৪০
সত্রাজিৎ … ৫৪১
সনক … ৫৪১
সনৎকুমার … ৫৪১
সনৎসুজাত … ৫৪২
সনন্দ … ৫৪২
সনাতন … ৫৪২
সপ্তর্ষি … ৫৪২
সপ্তজিহ্ব … ৫৪২
সপ্তদ্বীপ … ৫৪২
সপ্তলোক … ৫৪২
সপ্তসতী … ৫৪২
সপ্তজনা … ৫৪২
সন্ধ্যা … ৫৪২
সপ্তরথী … ৫৪৩
সবিতা … ৫৪৩
সব্যসাচী … ৫৪৩
সমাধি … ৫ ৩
সমন্তপঞ্চক … ৫৪৩
সমুদ্র মন্থন … ৫৪৪
সমুদ্র শাসন … ৫৪৫
সম্পাতি … ৫৪৫
সরমা … ৫৪৬
সর্বদমন … ৫৪৬
সর্বমঙ্গলা … ৫৪৭
সরযূ … ৫৪৭
সরস্বতী … ৫৪৭
সহজন্যা … ৫৪৮
সহদেব … ৫৪৮
সহস্রপাদ … ৫৪৯
সহস্রাক্ষ … ৫৪৯

নাম … পৃষ্ঠা

সাকল্য … ৫৫০
সাত্যকি … ৫৫০
সাঙ্খ্যদর্শন … ৫৫১
সাধ্যগণ … ৫৫২
সান্দীপনি … ৫৫২
সাবর্ণি মনু … ৫৫২
সাবিত্রী … ৫৫২
সারণ … ৫৫৪
সামবেদ … ৫৫৪
সারমেয় … ৫৫৪
সিদ্ধাশ্রম … ৫৫৫
সালকটঙ্কটা … ৫৫৫
সিন্ধু … ৫৫৫
সিংহিকা … ৫৫৫
সীতা … ৫৫৬
সীরধ্বজ … ৫৫৮
সুকন্যা … ৫৫৯
সুকেতু … ৫৫৯
সুকেশ … ৫৫৯
সুগ্রীব … ৫৫৯
সুজাতা … ৫৬১
সুতীক্ষ্ণ … ৫৬২
সুদর্শনা … ৫৬৩
সুদক্ষিণা … ৫৬৩
সুদামা … ৫৬৩
সুদেষ্ণা … ৫৬৪
সুন্দ … ৫৬৪
সুধন্বা … ৫৬৫
সুধর্মা … ৫৬৫
সুনীতি … ৫৬৫
সুপর্ণ … ৫৬৫
সুপার্শ্ব … ৫৬৫
সুপ্রতীক … ৫৬৬
সুবল … ৫৬৬
সুবর্চা … [illegible]

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
সুবাহু	৫৬৬	স্কন্দ	৫৮০
সুব্রহ্মণ্য	৫৬৬	স্থাণু	৫৮১
সুভদ্রা	৫৬৬	স্থূণাকর্ণ	৫৮২
সুভ্রূ	৫৬৭	স্থূলকেশ	৫৮২
সুমতি	৫৬৮	স্থূলশিরা	৫৮২
সুমন্ত্র	৫২৮	স্বর্গ	৫৮২
সুমালী	৫৬৮	স্বধা	৫৮৩
সুমুখ	৫৬৯	স্বয়ম্বরা	৫৮৩
সুমিত্র	৫৬৯	স্বয়ম্ভু	৫৮৩
সুমিত্রা	৫৬৯	স্বয়ম্প্রভা	৫৮৪
সুমেরু	৫৬৯	স্বারোচিষ	৫৮৪
সুযোধন	৫৬৯	স্বায়ম্ভুব	৫৮৪
সুরভি	৫৬৯	স্বাহা	৫৮৪
সুরসা	৫৭০	স্বাতী	৫৮৬
সুরথ	৫৭০	স্যমন্তক মণি	৫৮৬
সুরা	৫৭১	**হ**	
সুরুচি	৫৭১	হংস	৫৮৭
সুলভা	৫৭১	হনুমান	৫৮৭
সুশর্মা	৫৭১	হরধনু	৫৯১
সুশ্রুত	৫৭১	হরিবংশ	৫৯১
সুষেণ	৫৭২	হরিশ্চন্দ্র	৫৯১
সুহোত্র	৫৭২	হর্যশ্ব	৫৯[illegible]
সূত	৫৭৩	হলায়ুধ	৫৯৩
সূর্য	৫৭৩	হয়গ্রীব	৫৯৩
সূর্যবংশ	৫৭৫	হয়শিরা	৫৯৪
সৃঞ্জয়	৫৭৫	হস্তী	৫৯৪
সেতুবন্ধ	৫৭৫	হংস-ডিম্বক	৫৯৪
সৈরিন্ধ্রী	৫৭৬	হরি	৫৯৫
সোম	৫৭৬	হরিহর	৫৯৫
সোমক	৫৭৮	হারিত	৫৯৫
সোমদত্ত	৫৭৯	হারীত	৫৯৫
সৌতি	৫৭৯	হাহা ও হুহু	৫৯৫
সৌদাস	৫৭৯	হিমবান	৫৯৫
সৌবল	৫৭৯	হিমালয়	৫৯৫
সৌভরি	৫৭৯	হিরণ্যকশিপু	৫৯৫

নাম পৃষ্ঠা

হিরণ্যগর্ভ ... ৫৯৭
হিরণ্যরেতা ... ৫৯৭
হিরণ্যাক্ষ ... ৫৯৭
হিড়িম্ব ... ৫৯৮
হিড়িম্বা ... ৫৯৮
হৃষীকেশ ... ৫৯৯
হুতাশন ... ৫৯৯
হেমকূট ... ৫৯৯
হেমা ... ৫৯৯
হৈমবতী ... ৬০০
হৈহয় ... ৬০০
হ্রস্বরোমা ... ৬০০
হ্লাদ ... ৬০০

অস্ত্র-শস্ত্র

অসি ... ৬০১
অঙ্কুশ .. ৬০১
অর্ধচন্দ্রবাণ ... ৬০১
অঞ্জলিকবাণ ... ৬০১
অন্তর্বান ... ৬০১
অষ্টবজ্র ... ৬০১
আগ্নেয়-অস্ত্র ... ৬০১
ঐন্দ্র-অস্ত্র ... ৬০১
কুঠার বা পরশু ... ৬০১
কৃপাণ তরবারি খড়্গ ... ৬০১
ক্ষুরপ্রবাণ ... ৬০১
গদা ... ৬০১
গরুড়াস্ত্র ... ৬০১
গাণ্ডীব ... ৬০১
চক্র ... ৬০১
চক্রব্যূহ ... ৬০১
চন্দ্রহাস ... ৬০২
চর্ম ... ৬০২
জিম্ভকাস্ত্র ... ৬০২
তোমর ... ৬০২
ত্রিশূল ... ৬০২
দর্পণ ... ৬০২
নাগপাশ ... ৬০২
নারাচ অস্ত্র ... ৬০২
নালীক ... ৬০২
পট্টিশ ... ৬০২
পরিঘ ... ৬০২
পাশ ... ৬০২
পাশুপত ... ৬০৩
প্রাস ... ৬০৩
বজ্র ... ৬০৩
বরুণ বান ... ৬০৩
বাণ ... ৬০৩
বিজয়ধনু ... ৬০৩
বৈষ্ণবাস্ত্র ... ৬০৩
ব্যূহ ... ৬০৩
ব্রহ্মশির অস্ত্র ... ৬০৪
ভল্ল ... ৬০৪
ভূষণ্ডী ... ৬০৪
মুদ্গর বা মূর্দার ... ৬০৪
মুষল ... ৬০৪
যষ্টি ... ৬০৪
শঙ্খ ৬০৪
শতঘ্নী ... ৬০৪
শক্তি ... ৬০৪
শক্তিশেল ... ৬০৫
সীর ... ৬০৫
সুদর্শন চক্র ... ৬০৫
হল ... ৬০৫

বিবিধ

নাম		পৃষ্ঠা	নাম		পৃষ্ঠা
অধিপতি	…	৬০৬	দৈত্যপতি	…	৬০৭
অষ্টনায়িকা	..	৬০৬	নক্ষত্র	…	৬০৭
আদিত্য	…	৬০৬	নন্দী	…	৬০৮
ইন্দ্রহস্তী	…	৬০৬	নটরাজ	…	৬০৮
ইন্দ্র অস্ত্র	…	৬০৬	নবগ্রহ	…	৬০৮
ইন্দ্ররথ	…	৬০৬	নাগরাজ	…	৬০৮
ইন্দ্রনগর	…	৬০৬	নারায়ণ	…	৬০৮
ইন্দ্রঘোটক	…	৬০৬	নারায়নের চতুর্ভুজ	…	৬০৮
ইন্দ্রসারথি	…	৬০৬	পঞ্চকন্যা	…	৬০৮
ইন্দ্রবন	…	৬০৬	পঞ্চবট	…	৬০৮
ইন্দ্রপ্রাসাদ	…	৬০৬	পঞ্চভূত	…	৬০৮
ইন্দ্রপুত্র	…	৬০৬	পঞ্চতীর্থ	…	৬০৮
ওষধি	…	৬০৬	পরলোক	…	৬০৮
কিম্পুরুষ	…	৬০৬	পিতৃলোক	…	৬০৮
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ	…	৬০৬	পৌলিস্ত্য	…	৬০৮
কুমার	…	৬০৬	পুষ্পক	…	৬০৮
কালকেয়	…	৬০৭	পৌলমী	…	৬০৮
কুবেরের নাম	…	৬০৭	বুদ্ধ	…	৬০৯
কুবেরউদ্যান	…	৬০৭	বালকৃষ্ণ	…	৬০৯
কুবেরপুত্র	…	৬০৭	বাসুদেব	…	৬০৯
কুবেরস্থান	…	৬০৭	বাহন	…	৬০৯
কুবেবপুরী		৬০৭	বিষ্ণুর অবতার	.	৬০৯
কুবেররথ	…	৬০৭	বিষ্ণুচক্র	…	৬০৯
কুষ্মাণ্ড	…	৬০৭	বিষ্ণুশঙ্খ	…	৬০৯
গণদেবতা	…	৬০৭	বিষ্ণুগদা	…	৬০৯
চিরজীবী	…	৬০৭	বিষ্ণুখড়্গ	…	৬০৯
দনুজ	…	৬০৭	বিষ্ণুমণি	…	৬০৯
দর্শন		৬০৭	ব্রহ্মার মানসপুত্র	…	৬০৯
দায়ভাগ	.	৬০৭	বিদেহী	…	৬১০
দেবগুরু	.	৬০৭	বৈশ্রবন	…	৬১০
দেবযোনি	.	৬০৭	বৈবোচন	…	৬১০
দৈত্যগুরু	…	৬০৭	বৈশম্পায়ন	…	৬১০
দৈত্যনিসূদন	…	৬০৭	ভুবনেশ্বরী	…	৬১০

নাম		পৃষ্ঠা	নাম		পৃষ্ঠা
মকর	...	৬১০	সপ্তানক	...	৬১২
মন্বন্তর	...	৬১০	সপ্তপাতাল	...	৬১২
মহাকালী	...	৬১০	সপ্তরথী	...	৬১২
মহাভারত	...	৬১০	সপ্তশতী	...	৬১৩
যাজ্ঞসেনী	...	৬১০	সপ্তলোক বা স্বর্গ	...	৬১৩
যাস্ক	...	৬১০	সপ্তসমুদ্র	...	৬১৩
রামায়ণ	...	৬১০	সপ্তর্ষি	...	৬১৩
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী	...	৬১০	সিদ্ধগণ	...	৬১৯
শম্বুক	...	৬১০	সিদ্ধপিঠ	...	৬১৩
ষোড়শ বিদ্যাদেবী	...	৬১০	সব্যসাচী	...	৬১৩
সপ্তজিহ্ব	...	৬১২	সুধর্না	...	৬১৩
সপ্তদ্বীপ	...	৬১২			

চিত্রসূচী

ইন্দ্রাণী (জাজপুর)
বিষ্ণু
দুর্গা
গঙ্গা
দুইনাগ
কিম্পুরুষ
শিব ও পার্বতী
উড়ন্ত বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী
উড়ন্ত বিদ্যাধর বিরূপাক্ষের মন্দির (৭৪০ শতাব্দী)
সূর্য্য
ষষ্ঠী
ঋষি
নাগিনী (মহাবলীপুরমের গঙ্গতন হতে)
মহিষমর্দিনী
রাহু
গন্ধর্ব
ত্রিমূর্তি
যমুনা
ষষ্ঠী—মথুরা মিউজিয়াম (দ্বিতীয় শতাব্দ বা পরে)
নাগরাজ
অপ্সরী
ব্রহ্মা
বিষ্ণু
শিব
ইন্দ্র
বালকৃষ্ণ
বীরভদ্র
হনুমান
সূর্য
চন্দ্র
অগ্নি
মহাকালী
যক্ষ
চামুণ্ডা
ভদ্রকালী
মৎস্য

[illegible]
বরাহ
নৃসিংহ বা নরসিংহ
বামন
পরশুরাম
রামচন্দ্র
বলরাম
বুদ্ধ
কল্কি
উমা
কমলা
কালী
তারা
ষোড়শী
ভৈরবী
মাতঙ্গী
ছিন্নমস্তা
বগলা
ধূমাবতী
ভুবনেশ্বরী
কমলা

যোগিনী
কালীয়দমন
মহাদেব
কার্তিকেয়
সরস্বতী
লক্ষ্মী
গণেশ
অনন্ত শয্যা
কুবের পৃষ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ,
কুবের
কামাক্ষী
নাগরাজ
রাক্ষস
বজ্রশৃঙ্খলা
পুরষদত্তা ভারতী
প্রজ্ঞপ্তি
রোহিণী
গৌরী
মেষবাহনা সরস্বতী
বিষ্ণুর পরিবার রূপে দণ্ডায়মানা সরস্বতী